যুগে যুগে ছন্দের পারম্পর্য্য

মহেঞ্জোদারোর কারুশিল্পী ৫০০০ বছর পূর্ব্বে একটি ধাতু মূর্ত্তিতে ভাবনাহীন নর্ত্তকী মেয়েটির একটি নৃত্যভঙ্গীমা রূপায়িত করেন। এটিতে যেন ছন্দ ও আনন্দ রূপ পেয়েছে।

সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে, ছাঁচে ঢালাই মূর্ত্তি তৈরীর পারম্পর্য্য, এখনও চলে আসছে। আদিবাসী ঢালাই শিল্পীগণ, তাঁদের রক্ষাকর্ত্তা দেব-দেবীগণের সহজ সরল মূর্ত্তি তৈরী করেন। যে জীবজন্তু বা পক্ষীর শক্তি, সজীবতা ও আনন্দ, তাঁদের জীবনেও ছন্দ ও শক্তি যোগায় তাঁরা ধাতু ঢালাই ক'রে সেগুলির মূর্ত্তি তৈরী করেন।
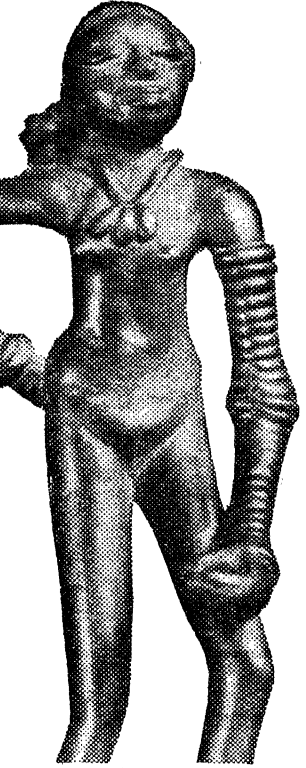
প্রসিদ্ধ শিল্পীগণ অবশ্য "শিল্প শাস্ত্রে" বর্ণিত দেব দেবীগণের নির্দিষ্ট বিবরণী অনুযায়ী মূর্ত্তি তৈরী করেন। প্রতিটি মূর্ত্তিতে মূল আকার যদিও যথাসম্ভব বজায় রাখা হয় তবুও সুপবিত্র জীবন সম্পর্কে শিল্পীর যে নিজস্ব কল্পনা থাকে তা সেই মূর্ত্তিতে রূপ পায়।

এমন কি বর্ত্তমান কালেও সুদক্ষ শিল্পীগণ যে সব মূর্ত্তি ঢালাই করেন, সেগুলিতে তাঁদের বিশ্বাস ও ধারণা রূপ পায় এবং বিভিন্ন ধরণের ঢালাই সম্পর্কে তাঁদের সুনিপুণ কুশলতাও প্রকাশিত হয়।

অখিল ভারত হস্তশিল্প বোর্ড

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৫ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫ · ১৮৯০ শক
সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য দেড় টাকা

পসারিণী

শিল্পী নন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৫ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫ · ১৮৯০ শক

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

১

[ফেব্রুয়ারি ১৯১৮]

প্রমথকে বিষয় ভাগের কথা লিখে দিয়েছি। তুই তাকে তাড়া লাগিয়ে কাজটা শীঘ্র সেরে নিস্। আবার যেন বেধে না যায়। দ্বিপুর অনুরোধে তোকে মোটর গাড়ির কথা লিখেচি। সে সম্বন্ধে যা ভাল বুঝিস্ করিস্— অবশ্য গাড়ি থাক্‌লে সকলেরই সুবিধে। দ্বিপু আমাকে ভাগে কিন্‌তে বলেছিল রাজি হইনি। অচলায়তন সংক্ষিপ্ত করে 'গুরু' নাম দিয়ে রামানন্দবাবুর ওখানে ছাপতে দিয়েচি। সব সুদ্ধ ৫।৬ ফর্ম্মার বেশি হবে না। তার কাগজের দাম চাচ্চেন। মণিলালকে জিজ্ঞাসা করিস্ ওটা যদি পাব্লিশিং হৌস্ থেকে প্রকাশ হয় তাহলে ওর খরচের ভার যেন নেন্— নইলে আমার টাকা থেকে দিস্। যদি তুই আমেরিকায় যেতে ইচ্ছা করিস্ তাহলে এখন থেকেই পাস্‌পোর্টের চেষ্টা করিস্। অবশ্য জাপানের পথ দিয়ে যেতে হবে— অন্য পথে বিপদ আছে।

২

ওঁ

[ফেব্রুয়ারি ১৯১৮]

কল্যাণীয়েষু

আইবুড় ভাত পাঠাতে হবে।[১] C. R. Das একটা internment meeting-এ আমাকে প্রেসিডেণ্ট হবার জন্যে ধরেচে। সুরেনকে বলে রাখিস্ সে কোনোমতেই সম্ভবপর হবেনা। আমার শরীর খুবই পরিশ্রান্ত আছে। আমাকে ধরা পাকড়া করবার চেষ্টা করে মিছিমিছি আমাকে হয়রান করা হবে।

আক্কেল দাঁত ওঠা নিয়ে মীরা বড় কষ্ট পাচ্চে।

অচলায়তনের শেষ প্রুফ আজ পাঠালুম। প্রভাতকে দিয়ে ওর গোটাকতক প্রুফের ফাইল আনিয়ে তোরা দেখে রাখ্‌তে পারিস্। এখন ওটা অভিনয় করা খুবই সহজ হবে। আমি এখন যোগ দিতে না পারলেও অজিত অনায়াসেই পঞ্চকের পার্ট করতে পারবে। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১ শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের কন্যা শ্রীমতী বিজলীর বিবাহ উপলক্ষে

প্রভাতকে বলে দিস্ "গুরু" একটা ছোট ভূমিকা লিখে দিলুম— সেটার জন্যে আবার যেন আমার কাছে প্রুফ না পাঠান হয়। প্রভাত নিজেই সেটা দেখে ছাপবার অর্ডর দিলে চল্‌বে। সেটা লাইন তিনেক মাত্র। চার ফর্ম্মা বইয়ের কত মূল্য হওয়া দরকার মণিলালকে জানিয়ে ঠিক করে দিস্।

৩

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সুরেন যদি ইজারা নিয়ে আমাদের ৪১ হাজার টাকা বার্ষিক খাজানা স্বরূপে দেয় আমার তাতে আপত্তি নেই। আমার কেবল ভয় হয় সুরেনের জন্যে— সে এতটা দায় সাম্‌লাবে কি ক'রে জানিনে।

এস্টেটের দেনা যদি তুলাখ টাকা হয় তাহলে আমাদের অংশের একলাখ টাকা দেনা আমার পাওনা থেকে বাদ পড়বে বই কি। কেবল একটা কথা মনে রাখতে হবে— আমি নোবেল প্রাইজের এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা বিদ্যালয়কে দিয়েচি— যতদিন ঐ কুড়ি হাজার পুনরায় পুরিয়ে দিতে না পারি ততদিন তার সুদ বিদ্যালয়কে দিতে হবে। এই ১,২০,০০০ টাকার ৮ পার্সেণ্ট সুদ না পেলে বিদ্যালয়ের চল্‌বেনা। একটা কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলুমনা— য়ুনিভর্সিটির টাকাটা শুধে দেওয়া হয়েচে বলেই আমি জান্‌তুম— কিন্তু তোর চিঠি থেকে বোধ হচ্চে সেটা এখনো শোধা হয়নি। তার কারণ কি?

যাই হোক জমিদারী প্রভৃতি সম্বন্ধে কি করলে ভাল হয় সেকথা তোকেই ভাবতে হবে। এটাকে ঠিক আমি নিজের বিষয় বলে মনেই করিনে। তুই যদি ইজারার ব্যবস্থায় সম্মত থাকিস্ তাহলেই কথাটা পাকা করতে পারিস।

যদি কোনো কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করতে ইচ্ছা করিস তাহলে এখানে একবার এলে ভাল হয়। দরকার হলে সুরেনকেও আনতে পারিস। যদি কোনো খট্‌কা না থাকে তাহলে দরকার নেই।

সেই well boring যন্ত্রগুলো কি পাঠাবার এখনো উপায় নেই? একবার খবর নিয়ে দেখিস্।

বিচিত্রার সভা কি তোদের চল্‌চে? অচলায়তনের Acting Edition ছাপতে দিয়েচি। কিন্তু দুর্ফর্ম্ম হয়ে ছাপা অনেক দিন বন্ধ আছে। প্রভাতকে তাগিদ দিস্।

তোদের শরীর কেমন আছে জানবার জন্যে আমার মন উদ্বিগ্ন আছে। ইতি ৩০ মাঘ [১৩২৪]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখাপড়া শেষ করে আগামী বৎসরের আরম্ভ থেকেই যেন কাজ চল্‌তে থাকে।

৪

ওঁ

[১৯১৮]

কল্যাণীয়েষু

সুরেন সেই টাকা সংগ্রহের ব্যাপারে ব্যস্ত আছে, একটা কিছু পাকা না করে সে ত যেতে পারবে না। বোধহয় শীঘ্রই পাকা খবর কিছু পাওয়া যাবে।

বিচিত্রায় শরৎ চাটুজ্যে যে গল্প পড়েছিলেন সে ত নেহাৎ মন্দ হয়নি। আমার ত বোধহয় অধিকাংশ শ্রোতারই ভাল লেগেছিল। পরশু বুধবারে শাস্ত্রী মশায়কে আগে থাকতে বলা হয়েচে নইলে এইবার দিনুকে নিয়ে একটু গান বাজনার আয়োজন করা যেত। শাস্ত্রী মশায়ের প্রবন্ধটা খুব যে সরস হবে তা আশা করা যায় না। দিনু যদি এর পরের বুধবার পর্য্যন্ত থাকে তাহলে দেখা যাবে।

বড়দাদার হঠাৎ শরীর খুব খারাপ হওয়াতে তাঁকে কলকাতায় আনা হয়েছিল। প্রথমটা মনে হয়েছিল আরোগ্যের কোনো আশা নেই— কিন্তু এখন অনেকটা সেরে উঠেচেন, আর ভাবনার কারণ নেই বলে আজই দ্বিপু আশ্রমে ফিরে যাচ্চেন।

গোপাল শিলাইদা থেকে ফিরে এসেই খুব জ্বরে পড়েচে। তার পক্ষে ওখানে যাতায়াতটা বড় কঠিন হয়েছিল।

পয়লা বৈশাখের কাছাকাছি আমাকে একবার শান্তিনিকেতনে যেতে হবে। নববর্ষের উপাসনা শেষ করে ফিরে আসব।

এণ্ড্রুজ এখন কিছু দিন কলকাতায় আছেন। বড়দাদার সেবা উপলক্ষ্যে তিনি দিল্লি থেকে এখানে চলে এসেচেন।

বৌমা ওখানে গিয়ে নিশ্চয় খুব একলা পড়েচেন। কুঠিবাড়ির চারদিকে বাগান করতে যদি লেগে যান তাহলে অনেকটা কাজ পাবেন। পড়বার মত বই নিশ্চয় তাঁর হাতে অনেক আছে। বৌমাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাস।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

ওঁ

[পোস্ট মার্ক—শান্তিনিকেতন ২৮ মে ১৯১৮]

কল্যাণীয়েষু

Lovers Gift কয়েক কাপি এসেছে। তোরা তিনধারিয়া যাচ্চিস্ কি না ঠিক জানিনে বলে পাঠালুম না। ম্যাকমিলানরা একটা ৫০০ টাকার চেক পাঠিয়েচে। জারুল, কাঞ্চন, বিলিতি অশোক প্রভৃতি বড় ফুলের গাছের চারা এখানে পাঠাতে ভুলিস নে—বৃষ্টির সময় পুঁৎতে হবে। এখানে আজ মেঘ করেছে, এর পূর্ব্বে খুব গরম ছিল—বোধ হয় রাত্রে বৃষ্টি হবে। Parrot's Training এক এক কপি Rothenstein, Ernest Rhys, Yeats, Roberts (Montaguর Secretary) Sturge Moore Manchester Guardianকে পাঠাস— Mrs. Seymourকেও পাঠাস। ভারতবর্ষে Mr. Cousins, Woodroffe, Blaunt, Bombay chronicle প্রভৃতিকে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

ওঁ

[১৯১৮]

কল্যাণীয়েষু

কৃতীর কাছে শুনলুম পারুলের অবস্থা সঙ্কটপন্ন— শুনে মনটা খারাপ হয়ে আছে। কি রকম থাকে লিখে দিস্।

তোর কাছে সেই যে বইয়ের ফর্দ্দ দিয়েছিলুম সেগুলোর খোঁজ করেছিস্ কি ?

মাদ্রাজি মিস্ত্রির কাছ থেকে আমার কাঠের বাক্স দুটো পেয়েছিস্ ?

ছাদের উপর খড়ের চাল দিয়ে আমার সেই ছোট্টো ঘরটি করিয়ে নিস্। খড়ের চাল যদি সুবিধে না হয় তাহলে asbestos টালির উপর সেই শিলাইদহে যে রকম সাদা রং-ধরানো চট্ মুড়ে দেওয়া হয়েছে সেরকম হলেও চলে— তার উপরে একটা ঘন গোছের লতা চড়িয়ে দিলেই ছাতটা বেশ ঠাণ্ডা থাক্‌তে পারে। আমি ঐখানে রাত্রে শুতে, এবং দিনের বেলা পড়াশুনো করতে পারি এমনতর বন্দোবস্ত হলে ভালো হয়। বোটের ঘরের চেয়ে বড় ঘর হবার দরকার নেই— আমি ছোট ঘরই চাই— কেবল চারদিকে আমার আকাশের দরকার— ছাতে তার অভাব হবেনা। সিঁড়ির দিকের কোণটাতেই ঘর হলে রোদবৃষ্টিতে যাতায়াতে তেমন অসুবিধা হবেনা। সিঁড়ির উপরে একটা ঢাকা থাকলে কোনো কথাই থাকে না। আমার ঐ ঘরের চারদিকে অল্প একটু projection থাকবে, তার উপরে টব দিয়ে ফুল গাছ দেওয়া যায়। পশ্চিম দিকে দরজার বাইরে লোহার জালের screen রেখে দিলে তার উপরে লতা চড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

সাতই পৌষে আসিস্ নইলে আটই পৌষে ছেলেরা দুঃখিত হবে। বিদ্যালয় সম্বন্ধে পরামর্শের বিষয় অনেক আছে সেগুলোও চুকিয়ে ফেলা দরকার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার এখন আর নড়া চড়া করবার ইচ্ছে নেই— অনেক ঘুরে ক্লান্ত হয়েচি, এখন ছুটিতে এইখানেই চুপ করে পড়ে থাকব বলে মনে স্থির করেচি। আজকাল আমি লেখাপড়া কিম্বা কোনো কাজই করিনে —অধিকাংশ সময়ই শুয়ে কাটাই। সুরমার বিয়েতে নলিনী আমাকে ডেকেচে কিন্তু কলকাতায় যেতে ইচ্ছে নেই, আর বিয়ের গোলমালের মধ্যে যোগ দেবার শক্তিও নেই। আমিই অনুষ্ঠানের কাজ করব নলিনীদের এই বিশেষ ইচ্ছা কিন্তু এই সব হাঙ্গামের মধ্যে যেতে আমার কিছুতেই মন যায় না। আমার আর এক উপসর্গ দেখা দিয়েচে। কিছু দিন থেকে আমার কান প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। সেইটেতেই আমাকে কিছু উদ্বিগ্ন করেচে। ক্ষিতিবাবুকে নিয়ে হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসার চেষ্টা করা

যাচ্চে। এণ্ড্রুজ কয়েকদিন থেকে এখানে নেই। সে রুদ্রের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লিতে যাবে। হয় ত বা আমেদাবাদে গান্ধির কাছেও যেতে পারে। ইতিমধ্যে গান্ধিকে আমি একটা চিঠি লিখেচি সেটা আজকের কাগজে বেরিয়েচে দেখলুম।— আমাদের এদিকে এখনও বৃষ্টি হয় নি— অথচ মেঘ করে পশ্চিমে হাওয়া দিয়ে মাঝে মাঝে বেশ একটু ঠাণ্ডা হচ্চে। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

ওঁ

[১৯১৯]

রথী তোর চিঠি আমার নামে এসেছিল পাঠাই।

এতদিনে কাগজে আমার চিঠি পড়ে থাকবি। এই নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম।

হোমিয়োপ্যাথি ওষুধে মীরা ভাল আছে।

···র বিবাহে নিমন্ত্রণ আমি ত নেবনা। কিন্তু···ই ত এই বিবাহ নিজে ইচ্ছা করে ঘটিয়েচেন এখন নিমন্ত্রণের কথা নিয়ে এত ভাবচেন কেন?

মনীষার ছেলে মেয়ের খুব অসুখ। বিবাহ হয়ত পিছিয়ে যাবে। আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা করচি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

ওঁ

[নভেম্বর ১৯১৯]

কল্যাণীয়েষু

আমার Centre of Indian Culture এক কপি অবনকে আর এক কপি Lord Ronaldshay-কে দেবার জন্যে তোর কাছে পাঠাচ্চি। Ronaldshay-র কপির ভিতর তার নাম লেখা আছে— তাকে পাঠাতে ভুলিসনে।

সুরেনের সঙ্গে কথা হয়েচে এখন লেখা পড়া যত শীঘ্র হয়ে যায় সেরে ফেলিস।

St. Paul's College-এর প্রিন্সিপাল আসচে— দু'দিন থাক্‌বে তার জন্যে পাঁউরুটি এবং অল্প স্বল্প রসদ পাঠিয়ে দিস।

এখানকার জন্যে কলকাতা থেকে গোটা ছয়েক লোহার কমোড পাঠিয়ে দিস্— মেলার সময় দরকার হবে, পরেও হবে। জানুয়ারি মাসে পাঁচ ছ জন ইংরেজের দল আসবে, তার মধ্যে Ladiesও আছে।

রামাচারিয়ার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গায়ের কাপড় নেই। শোবার বিছানা নেই। যদি অবন তাঁদের সোসাইটি থেকে ওর কোনো বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন তাহলে ও বেঁচে যায় নইলে ওর থাকা শক্ত হবে।

ক্ষিতিবাবু আপিসের জন্যে একজন স্থায়ী লোক চান। আমাদের প্রাক্তন ছাত্রের মধ্যে কেউ হলেই ভাল হয় নতুবা বীরেশ্বরের মত জানা লোক চাই। তাছাড়া হিসাবের লোক একজন দরকার।

মাষ্টারেরা বাড়ি তৈরি করবেন, টাকার সুদ দেবেন, মেরামতও করবেন, কিন্তু আসল শোধ দেবেন না। অর্থাৎ বাড়ী বিদ্যালয়েরই থাকবে— এই রকম প্রস্তাব হয়েচে। এইটে সবচেয়ে সহজ। নইলে স্বত্বাধিকারকে conditional করতে গেলেই আইনে বাধবে। আট পার্সেণ্ট সুদ দেবার কথা হচ্চে।

তাঁবু পাওয়া গেলনা। চেষ্টা করা যাচ্চে মীরার বাড়ীটা এর মধ্যে কোনমতে বাস যোগ্য করে তুলতে। তাহলে টানাটানি হবে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অ্যামেরিকায় কপিরাইটের কথা ভুলিস্‌নে। সীমুরকেই আমার সেখানকার এজেণ্ট করলেই ত হয়। লাভের পাঁচ পারসেণ্ট তাঁকে দিলেই হবে।

আমি মঙ্গলবারে কলকাতায় যাব। লেখাটা বৈঠকে শোনাতে চাই। বুধ কিম্বা বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যার সময় আমাদের দল জোটাস্‌। ব্রজেন্দ্রবাবুকেও চাই। ডাক্তারকে বাদ দিস্‌নে। আমাদের আবার অন্তত শুক্রবারে ফিরতেই হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবব্রতকেও নিমন্ত্রণ করা যাবে।

প্রমথ চৌধুরী ক্ষুদ্র অর্ঘ্য

অমিয় চক্রবর্তী

প্রমথ চৌধুরী শতবার্ষিকী সংখ্যার জন্যে সম্পাদক কিছু লেখা চেয়েছেন। হাতের কাছে তাঁর কোনো বই আমার এখানে নেই ; উল্লেখের সাহায্যকল্পে কোনো লাইব্রেরি, চিঠিপত্র বা বন্ধুজনের সঙ্গে আলাপ এই গ্রাম্য মার্কিন দিগন্তের অতীত। শুধুমাত্র স্মৃতির উপরই আমার দূর-নির্ভর।

অথচ যা আমার জীবনের গভীরে প্রবাহিত তাকে দূর বলা চলে না। বাংলা ভাষায় এবং তারও চেয়ে অন্তরঙ্গ প্রাণের ভাষায় কৈশোর হতে আজ পর্যন্ত মনস্বী প্রমথবাবুর রচনা, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর ব্যক্তিগত সৌজন্য আমার চৈতন্যে মিশ্রিত। রবীন্দ্রনাথকে জীবনে প্রথম দেখেছিলাম প্রমথবাবুর সঙ্গে, একত্র গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনে কবির অতিথি হয়ে— ১৯১৭ সালে। দুজনের সঙ্গেই তার আগে চিঠিপত্রের যোগ ঘটেছিল কিন্তু মহর্ষিদেবের প্রতিষ্ঠিত পুরাতন আশ্রমগৃহের দ্বিতলে সেই দিনটি যেন সূর্য-চন্দ্রোদয়ে স্বাক্ষরিত। একান্ত উৎসাহে ভাস্বর সেই অভিজ্ঞতা আজ পর্যন্ত আমার মানসিক অধিকারের বাইরে রয়ে গেছে। শালবীথির তপ্ত ছায়াবৃত মর্মর, ছাতিমতলার শুভ্র স্তব্ধ পাথর এবং উৎকীর্ণ মন্ত্র, রবীন্দ্রনাথের গভীর বাক্যালাপ এবং অজস্র আতিথ্য, প্রমথবাবুর হাস্যকৌতুকময় প্রখর মননশীল আলোচনা ও বন্ধুত্বের অযাচিত দান একটি অপরিণত, অজ্ঞাত বাঙালি ছেলের সমস্ত আশা-কল্পনাকে ছাপিয়ে অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছিল। আজও বুকে জেগে আছে আকাশমাঠখোয়াইয়ের পাণ্ডুর উজ্জ্বল বলয়-চক্র, দারুণ গ্রীষ্মে উৎফুল্ল আমলকী-সারি এবং বহু দূরে পাড়-বসানো সবুজ তালতড়ি। আশ্রমেরই অভিন্ন অন্তর্গত রূপে সেই দৃষ্টি আমার কৈশোরজীবনে প্রসারিত। কলকাতায় তাঁর ব্রাইট্ স্ট্রিটের বাড়িতে প্রমথবাবু ফিরিয়ে আনলেন, তারপর আমার দিদিমার ওখানে ভবানীপুরে রাত কাটালাম— কিন্তু ইতিমধ্যে একটি পুনর্জন্ম ঘটেছিল।

তখন পুরোপুরি সবুজ পত্রের যুগ। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন পাতার ঠোঙায় প্রমথ পরিবেশন করছেন খাঁটি বাংলা ; সেই তেজস্ক্রিয় রস নতুন আমেজ লাগা গল্পে প্রবন্ধে কবিতায় ভরে উঠল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই সৃজন-পরিবেশনে যোগ দিলেন, এটা তাঁরও সবুজ পত্রের দিন। যৌবনের ঐশ্বর্যে প্রমথ চৌধুরী অভিষিক্ত ছিলেন, কমবয়সী লেখকদের তাজিয়ে তোলা এবং সেই সঙ্গে যৌবনের অন্যতম কবি রবীন্দ্রনাথকেও বিকাশের ভঙ্গীতে ভাষায় প্রবৃত্ত করার মূলে দেখি প্রমথবাবুর একটি বিশেষ উদ্দীপনা। সংখ্যায় সংখ্যায় বেরিয়েছে ফাল্গুনী, চতুরঙ্গ, ছবি, তাজমহল কবিতা, বোষ্টমীর মতো গল্প। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে নিজস্ব অন্তর সৃষ্টি প্রমথবাবুর চার-ইয়ারি কথা ; তাঁর বড়োবাবুর বড়োদিন ; পদচারণের কিছু সনেট, তেপাটি ; বীরবলের উজ্জ্বল নিবন্ধ সমালোচনা ; 'রায়তের কথা' নামক গভীর সামাজিক অর্থনৈতিক অনুশীলন (রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উত্তরে)। দিন গুনেছি আমরা এইসব রচনার অস্ফুট প্রত্যাশায়। এখন তারা শাশ্বত বাংলা সাহিত্যের সম্পদ।

বেশি নাম করব না কিন্তু সবুজ পত্র যুগের নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে শীঘ্রই শ্রেষ্ঠ নতুন এবং প্রবীণ রচনা সম্ভার

নিয়ে দেখা দিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। 'কাব্যজিজ্ঞাসা' সবুজ পত্রেরই অর্ঘ্য। তাঁকে কবি এবং পত্রিকার সম্পাদক দুজনেই কতদূর স্নেহশ্রদ্ধা করতেন বারেবারেই তা দেখেছি, শুনেছি।

চক্র তৈরি হল, প্রমথবাবুকে ঘিরে দেশীবিদেশী সাহিত্যের নবরূপসন্ধানী উৎসুক আসর জমে উঠল— প্রায় প্রতি সপ্তাহে— তাঁর পূর্বের বাড়িতে এবং পরে মে-ফেয়ারে। ভোজ্যের আয়োজন উৎকৃষ্ট, ভৃত্যবন্ধু 'ননী'র নম্র তৎপরতা গৃহস্বামী-স্বামিনীর আতিথ্যের সংযুক্ত। ইন্দিরা দেবীর পিয়ানো-বাজনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গান ওখানেই শুনেছি, অনেক কবিতা প্রবন্ধ প্রথম পড়া হয়েছে প্রমথবাবুর মজলিশে। ধূর্জটিবাবুর সুরসিক বিদ্যুৎবাক্যজালে আমরা স্বেচ্ছাবন্দী হয়েছি। তাঁর উৎকর্ষবান সুহৃৎ মনে ছিল মুক্তির দীপ্তি। সংগীতশাস্ত্র আলোচনায় পারদর্শী ছিলেন তিনি; অন্য দিকে প্রমথবাবু, তিনিও ভারতীয় সংগীতজ্ঞ, গূঢ় শ্রুতিজ্ঞান এবং অনুভূতি -সম্পন্ন। প্রায়ই হঠাৎ আসতেন রবীন্দ্রনাথ— স্রষ্টা এবং গীতসম্রাট। ইন্দিরা দেবী পূর্ব-পশ্চিম সুরজগতে সমানচারী, তাঁর আনুকূল্যে ঠাকুরবাড়ি এবং চৌধুরী-বংশীয় মেয়েরা কত অপরূপ গান আমাদের শুনিয়েছেন। এখনো কানে জেগে আছে ঘনমধুরগম্ভীর 'তিমির অবগুণ্ঠনে'— সেদিন প্রমথবাবুর চোখ আর্দ্র হয়ে এসেছিল— তিনি সহজে হৃদয়ের ভাব দেখাতেন না। কেন জানি 'তোর ভিতরে জাগিয়া কে যে' এই সদ্যরচিত গান আজও আমার জীবনে আলোকিত হয়ে আছে,— রবীন্দ্রনাথ শেখাচ্ছেন নাৎনিকে, সঙ্গে মৃদু বাজনা। তার পরেই হাওড়া ব্রিজ পেরোতে হয়েছিল, মনে হচ্ছিল গঙ্গানদী, এমন-কি কঠিন, লোহার সাঁকোটা যেন অনবদ্য ঐ হাল্কা-ব্যথিত সুরে কোন্ স্বর্গমর্তের যোগে আন্দোলিত।

তে হি নো দিবসা গতাঃ কিন্তু কোথায়-বসে আছেন মহাকাল, সেখানে কিছুই হারায় না। আজ প্রমথবাবুকে স্মরণ করছি যেন বিলুপ্ত স্তরের পার থেকে, অথচ সবুজ পত্র যুগের পরেও শান্তিনিকেতনে সেই বিদগ্ধপ্রসন্ন বার্ধক্যে-স্নিগ্ধ মূর্তি বারে বারে দেখেছি, তাঁর এবং ইন্দিরা দেবীর স্নেহে কখনো বঞ্চিত হই নি। ছেলেবেলায় একটা অলীক গোছের কবিতায় লিখেছিলাম 'দীপালয় দীপগুলি নিভে গেছে হায়। একে একে চিরতরে ব্যথার পবনে (আমাদের এক বাড়ির নাম দিয়েছিলাম, দীপালয়)— শৈশবের উপযুক্ত অনির্ভর। এখন ভাবি কোনো দীপই নেভে নি, নিভবে না। হয়তো এটাও অতিনির্ভর।

প্রমথবাবু যে দীপগুলি বাংলা ভাষায় জালিয়ে গেলেন, কিছু সনেট, জল্‌জ্বলে প্রবন্ধ, গল্প (চার-ইয়ারি কথা সহজেই ছায়াছবি এবং নাটকে পরিণত করা সম্ভব, সাহিত্যে এমন রচনা অতুলনীয়)—পাঠকরূপে জানি তার অবসান নেই। তিনি যে যুগান্তর এনেছেন মাতৃভাষায় তা একটি জন্মান্তর— নবানী দেহী— সর্বদেশীয় আধুনিক সত্তার সঙ্গে নতুন বাংলা যুক্ত হল। অন্যেরা, এমন-কি, শ্রেষ্ঠতম সাধকেরাও মধ্যে মধ্যে ভ্রষ্ট হয়েছেন, কিন্তু প্রমথবাবুর বাংলা তিলমাত্র বিচ্যুত হয় নি, পুরোনো অভ্যাসের কৃত্রিমতায় ফিরে গিয়ে তিনি হার মানেন নি।

২০ জুন ১৯৬৮

ন্যুইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়। ন্যু পল্‌জ্‌, ১২৫৬১

পুনশ্চ

এইমাত্র ৺ শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবীর ঘরোয়া একটি মর্মস্পর্শী চিঠি[১] উদ্ধার করেছি— স্নেহের ভাষায় তিনি উল্লেখ করেছেন প্রথম আমার তাঁদের বাড়িতে যাবার কথা। তখন আমার চৌদ্দ বছর— অর্থাৎ ১৯১৫ সাল। সেই তখন প্রমথবাবুর সঙ্গে আমার জীবনের প্রথম সাক্ষাৎ—

ওঁ

ডাঃ শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী

অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। হৈমন্তী ও সেমন্তী কতকটা তোমার প্রতিনিধিস্বরূপ মাঝে ২ চকিতের মত দেখা দিয়ে যায়। সম্প্রতিও উপস্থিত। কিন্তু শীঘ্রই চলে যাবে। তোমার দুটি পাওনা সুদও দেখলুম— বেশ লাগ্‌ল। বড়টির স্বাভাবিক কোঁকড়া রেশমী চুল দেখবার মত জিনিষ। ছোটটি এখনো ফুটে ওঠেনি। কথায় বলে আসলের চেয়ে সুদ বেশি। সেই সুদের লোভই যখন তোমাকে এখানে ধরে রাখতে পারে না, তখন আমরা ত কোন্ ছার। তবু সেই "চোদ্দ বছরের ছেলেকে" দেখবার জন্য পুরণো কমলালয়ের বাড়ীতে বুবু ও মঞ্জু কিরকম ওৎ পেতে বসেছিল সে কি ভোলা যায়? তুমিও নিশ্চয় ভোলনি— "পুরাণো সে দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়"।

১ শান্তিনিকেতন, বীরভূম, জুন ২৯শে, ১৯৫৮

প্রমথ চৌধুরী

ভবতোষ দত্ত

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-যুগ বলে একটা কথা চলতি আছে। ঠিক কোন সময় থেকে এর ব্যাপ্তি, কোন পর্যন্তই বা এর সীমা— তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে; কিন্তু সাহিত্যের কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রখর প্রভাব এসে পড়েছে— এটা অস্বীকার কববার নয়। তেমনি সেকালে ছিল বঙ্কিম-যুগ যখন বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাস-রচনার ছাপ এবং প্রবন্ধ-রচনার রীতি বাংলার লেখকদের মধ্যে বেশ স্থায়িভাবেই পড়েছিল। এসব নামকরণ নিয়ে কোনো সংশয়েব অবকাশ কখনোই ঘটে নি।

প্রমথ-যুগ বলে কোনো শব্দ বাংলা সাহিত্যে এখনও পর্যন্ত গড়ে উঠেছে বলে শোনা যায় নি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের উপর প্রমথ চৌধুবী মহাশয়ের যে প্রভাব পড়েছে, তাতে এবকম একটা শব্দ প্রচলিত হলে বিস্ময়ের বিষয় হত না। উপন্যাস এবং নাটক বাদ দিয়ে এ সাহিত্যের গল্প কবিতা এবং প্রবন্ধের বৃহৎ অংশে প্রমথ চৌধুরীব সুস্পষ্ট ছাপ আছে। আর-কিছু না হোক বাংলা ভাষারীতির পরিবর্তনে তাঁর দান তো বাঙালি সাহিত্যপাঠক নিত্যই স্মরণ করবেন। এ প্রভাব এমনই যে রবীন্দ্রনাথও একে স্বীকার করেছিলেন, অনুবর্তন করেছিলেন এবং পরিণতি দিয়েছিলেন। সাহিত্যের যে-তিনটি দিকের চর্চা প্রমথ চৌধুরী করেছিলেন, সেই তিনটিতেই তিনি যে অভিনবত্ব দেখিয়ে গিয়েছেন তা বিস্ময়জনক। এই তিনটি দিকেই রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ প্রশস্তি তিনি অর্জন করেছিলেন— সে সময়ে প্রমথ চৌধুরীর মৌলিকতায় অন্য সকলে সংশয়মুক্ত হতে পারে নি। তার পরে সবুজ পত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল এক লেখকগোষ্ঠী। তাঁরা প্রমথ চৌধুরীকে গুরু বলে মান্য করতেন। এই-সব সাহিত্যশিষ্যের মধ্যে দিয়ে এবং নিজেও প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে লিখে তিনি সাহিত্যের এক নতুন রুচি এবং রীতি তৈরি করতে পেরেছিলেন। সুতবাং বাংলা সাহিত্যেব একটি পর্যায়কে প্রমথ-যুগ বললে হয়তো অনুচিত হত না।

কিন্তু তা যে হয় নি, তার কাবণ প্রমথ চৌধুবীর ব্যক্তিত্ব ও রচনাবৈশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহিত। আমরা যখন 'বঙ্কিম-যুগ' বা 'রবীন্দ্র-যুগ' বলি তখন আমবা সাহিত্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গভীরতর প্রবণতাকেই বুঝি। সাহিত্যের বহিরঙ্গ রীতি দিয়ে যুগকে চিহ্নিত করি না। বঙ্কিম যুগ বলতে জীবন ও সাহিত্যের একটা দৃঢ় এবং গভীর মূল্যবোধকে বোঝায়। গভীব স্বদেশপ্রীতি, অটল সমাজকল্যাণবোধ, কঠোর মনুষ্যত্বসাধন— বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিকে এই-সব মূল্যবোধে দীক্ষিত করেছিলেন। এই আদর্শ নিয়ে উনিশ শতকে তাঁর সময়ে কেউ প্রশ্ন তোলে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের এই-সব ভাবনা অন্যান্য মনীষীরাও জ্ঞাত বা অজ্ঞাত -সারে অনুসরণ করে এসেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো নিজে এই আদর্শকে একা তৈরি করেন নি, কিন্তু তাঁর সময়েব ভাবনাকে তিনি সংহত রূপ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্র-যুগে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুললেন নতুনতর মূল্যবোধ— সৌন্দর্যবোধ, বিশ্বতোমুখিনতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। প্রবন্ধে গল্পে কবিতায় এই আদর্শ সমসাময়িকদের প্রভাবিত করেছে। 'সোনার তরী' 'চিত্রা'-যুগের সৌন্দর্যচর্চা দীর্ঘকাল, কল্লোল-পর্ব পর্যন্ত, কবিদের আকর্ষণ করেছে। গল্পগুচ্ছের পল্লীচিত্রও তেমনি অনুকৃত হয়ে এসেছে; চোখের বালির

উপন্যাসরীতি তো আজও অব্যাহত; চিন্তার ক্ষেত্রে বাঙালিকে বিশ্বতোমুখী করে তুলতে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম। 'রবীন্দ্র-যুগ' কথাটা যে সার্থক তাতে কি আর সন্দেহ আছে?

এ দিক দিয়ে দেখলে প্রমথ চৌধুরী আমাদের মনের জগতে কোন স্থায়ী মূল্যমান সৃষ্টি করে গিয়েছেন? তাঁর অপ্রতিহত ব্যক্তিত্ব সাহিত্যের বাহির-মহল ছাড়িয়ে অন্দর-মহলে পৌঁচেছে কি— যেখানে অন্তঃপুরলক্ষ্মী তাঁর স্নেহ দিয়ে হৃদয় দিয়ে সন্তানকে গড়ে তোলেন, যেখানে কল্যাণময়ী শ্রী সংসার ও সমাজকে আড়াল থেকে প্রভাবিত করে রূপ দেয়? প্রমথ চৌধুরীর রচনাকে এ দিক দিয়ে যাচাই করে মূল্য নির্ধারণ করবার সময় এসেছে। হয়তো এই গভীরতর নিশ্চয়াত্মক আদর্শের অভাবেই 'প্রমথ-যুগ' কথাটি অপ্রচলিত থেকে গিয়েছে।

২

ম্যাক্স বীয়ারবোম সম্বন্ধে ভারজিনিয়া উলফ বলেছিলেন তিনি সাহিত্যে এনেছেন ব্যক্তির উপস্থিতি। প্রমথ চৌধুরী যখন বীরবল নাম নিয়ে বর্তমান শতকের গোড়ার দশকে মাসিকপত্রে আবির্ভূত হলেন তখন তাঁর সম্বন্ধে এই কথা বলাও খুবই স্বাভাবিক হত। সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে ব্যক্তিরূপের যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সে তত্ত্ব নতুন করে আলোচনার দরকার নেই। বঙ্কিমের আগের বাংলা গদ্যের সঙ্গে বঙ্কিমের গদ্যের তুলনা করলেই সেটা আপনা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বীরবল লিখতে আরম্ভ করার আগেই বাংলায় সাহিত্যিক গদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর-হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা বাংলা সাহিত্যে গদ্যের ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছে। এঁদের গদ্য যে সাহিত্যসম্পদরূপে স্বীকৃত হয়েছে, তার অর্থ ব্যক্তিমনের ছাপ এই গদ্যরচনার মধ্যে আঁকা হয়ে গিয়েছে। তবু বীরবলের লেখায় ফুটে উঠল ব্যক্তি-মনের আর-এক রূপ। এর বিশেষত্ব এই যে, এই ব্যক্তিত্ব নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে না, নিজেকে সশব্দে এবং সপ্রত্যয়ে ঘোষণা করে। অপ্রয়োজনের মধ্যে দিয়ে, খেয়ালি লেখাতেই যথার্থ সৃষ্টি— এই কথাটি বলতে গিয়ে বীরবল বলেছিলেন,

'খেয়ালী লেখা বড়ো দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কারণ সংসারে বদখেয়ালী লোকের কিছু কমতি নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকের বড়োই অভাব! অধিকাংশ মানুষ যা করে তা আয়াসসাধ্য; সাধারণ লোকের পক্ষে একটুখানি ভাব অনেকখানি ভাবনার ফল। মানুষের পক্ষে চেষ্টা করাটাই স্বাভাবিক, সুতরাং সহজ। স্বতঃউচ্ছ্বসিত চিন্তা কিংবা ভাব শুধু দু-এক জনের নিজ প্রকৃতিগুণে হয়। যা আপনি হয় তা এতই শ্রেষ্ঠ ও এতই আশ্চর্যজনক যে, তার মূলে আমরা দৈবশক্তি আরোপ করি।' —খেয়ালখাতা, ১৩১২

প্রায় একই ধরণের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'বাজে কথা' প্রবন্ধে—

'অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম-অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে।

যেমন বাজে খরচ তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। উপদেশের কথা যে রাস্তা দিয়া চলে মনুর আমল হইতে তাহা বাঁধা, কাজের কথা যে পথে আপনার গোযান টানিয়া আনে সে পথ কেজো সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণপুষ্পশূন্য চিহ্নিত হইয়া গেছে। বাজে কথা নিজের মতো করিয়াই বলিতে হয়।' —'বাজে কথা', ১৩০৯, বিচিত্র প্রবন্ধ

বীরবলী ভঙ্গি যে তীক্ষ্ণ সে শুধু কথ্যরীতির জন্যই নয়, বলার ভঙ্গিতেই একটি উৎকেন্দ্রিক প্রত্যয় আছে। এই প্রত্যয় থেকেই একটি অহম্মন্য ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে বক্তব্য নির্বিশেষ, তাতে লেখকের ব্যক্তিত্ব স্নিগ্ধ প্রচ্ছন্ন এবং শান্ত। এ যেন কবির নিজের কথা নয়, এ সকলেরই কথা। বিচিত্র প্রবন্ধের লেখা পড়লেই দেখা যায়, সাহিত্যে একটি নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে— সাহিত্য সমষ্টিমনের সৃষ্টি নয়, ব্যক্তিমনের সৃষ্টি। পঞ্চভূতের প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ এই কথার ইঙ্গিত দিয়েছেন। দুটি বইয়ের লেখাগুলির রচনাকাল গত শতাব্দীর শেষ দশক এবং বর্তমান শতকের প্রথম দশক। 'কেকাধ্বনি'তে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ,

'আমাদের এই মায়াবী মনটিকে সৃজনের অবকাশ না দিলে সে কোনো মিষ্টতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিয়া গণ্য করে না। সে উপযুক্ত উপকরণ পাইলে কঠোর ছন্দকে ললিত, কঠিন শব্দকে কোমল করিয়া তুলিতে পারে। সেই শক্তি খাটাইবার জন্য সে কবিদের কাছে অনুরোধ প্রেরণ করিতেছে।'

এই সৃজনী মনটির কথা রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যে'র এ-সময়ে লেখাতেও বলেছেন—

'জগৎ হইতে মন আপনার জিনিস সংগ্রহ করিতেছে, সেই মন হইতে বিশ্বমানবমন পুনশ্চ নিজের জিনিস নির্বাচন করিয়া নিজের জন্য গড়িয়া লইতেছে।' —'সাহিত্যের সামগ্রী', ১৩১০

সুতরাং সাহিত্যক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর পদার্পণের আগেই সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যক্তিমনের ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় সৃষ্টিশীল মনের কথা সেভাবে বলেন নি। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাতেই ব্যক্তিমনের স্বীকৃতি। চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ববাদের এই উদ্ভব সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর উপস্থিতির পূর্বসূচনা মাত্র। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীতে এই লেখকমনটি একটু উগ্র হয়েই দেখা দিল। বীরবলের রচনাতে প্রায়শই 'আমি' এবং 'আমার' শব্দ দুটির সাক্ষাৎ মেলে। এই প্রয়োগ কিন্তু সেই উগ্র ব্যক্তিত্ববাদেরই ইঙ্গিতবহ। রবীন্দ্রনাথ যে-মনটির কথা বলেন, লেখকের সৃষ্টিতে সেই মন থাকে প্রচ্ছন্ন— If the style be the man, in all the colour and intensity of a veritable apprehension, it will be in a real sense impersonal। রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনাতে অনুগ্র ব্যক্তিত্বের মৃদু স্পর্শ সহজেই অনুভব করা যায়। সেটাই তাঁর লেখার বিশিষ্ট স্বাদ। প্রমথ চৌধুরী যেখানে সাহিত্যসৃষ্টির কথা বলেছেন সেখানে ব্যক্তিমনের সংজ্ঞা যেমন আলাদা তেমনি তাঁর নিজের লেখার ব্যক্তিস্বাদটিও আলাদা। 'সবুজ পত্রের মুখপত্রে' তিনি বলছেন,

'সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ। সুতরাং সাহিত্যের পক্ষে মনের ঐ পড়ে-পাওয়া-চৌদ্দআনার চাইতে ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব দুআনার মূল্য ঢের বেশি। কেননা ঐ দুআনা হতেই তার সৃষ্টি এবং স্থিতি, বাকি চৌদ্দআনায় তার লয়। যার সমাজের সঙ্গে ষোলোআনা মনের মিল আছে, তার কিছু বক্তব্য নেই। মন পদার্থটি মিলনের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আর বিরোধের স্পর্শে জেগে ওঠে। এবং মনের এই জাগ্রত ভাব থেকেই সকল কাব্য সকল দর্শন সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি।'

প্রমথ চৌধুরী নিজের চিন্তায় এবং রচনায় এই বিরোধের ভাবটিকেই জাগিয়ে রাখতে চেয়েছেন। নিজের চিন্তা এবং অনুভূতিকে তিনি বিশিষ্ট এবং আলাদা করেই ফুটিয়ে রেখেছেন। যা প্রচলিত, যা অভ্যস্ত, যা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করছে না কিংবা সমাজের চৌদ্দআনা লোক যা আলোচনা করে সুখ পায়, তিনি তাতে সুখ পান না। তিনি একটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করলেন, ভিন্ন সিদ্ধান্ত

করলেন। সেইজন্য প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের চিন্তাপ্রকৃতি একটা ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছে। বঙ্কিমের যুগ ছিল প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বাসের যুগ। স্পেন্সার ডারউইন জগতের যে নিয়ম বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, বাক্‌ল্ সভ্যতার ইতিহাসে সে-রকম নিয়মেরই পথ ধরেছিলেন, সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে টেন তেমনি নিয়মের অমোঘতায় বিশ্বাস করিয়েছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রও সেকালে বলেছিলেন—

'সকলই নিয়মের ফল, সাহিত্যও নিয়মের ফল' —বিদ্যাপতি ও জয়দেব

কিংবা

'বৈজ্ঞানিক যখন Lawর মহিমা কীর্তন করেন আর আমি যখন হরিনাম করি দুইজনই একই কথা বলি। দুইজনে এক বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্তন করি'। —ধর্মতত্ত্ব, ৬

জগৎকে যখন 'নিয়মের রাজত্ব' বলে মনে করি তখন বস্তুতঃ প্রাণের তত্ত্বটিকে আমরা উপেক্ষা করি, তেমনি সাহিত্যকে যখন নিয়মের ফল বলে মনে করি, তখন সৃষ্টিশীল মনটিকে আমরা ভুলে যাই। উনিশ শতকের চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়ায় ডারউইনের পর এসেছিলেন বার্গসঁ, তেমনি আমাদের দেশেও ক্ষুদ্রতর পরিধিতে বঙ্কিম-যুগের পর রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী। প্রথম চৌধুরী তো স্পষ্টতই বার্গসঁকে বলেছেন 'আমার দার্শনিক গুরু'। সবুজ পত্রের প্রথম সংখ্যাতেই বার্গসঁ-শিষ্য লিখলেন,

'পাতা কখনও আর কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না। প্রাণ পশ্চাৎপদ হতে জানে না—তার ধর্ম হচ্ছে এগোনো। তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় অমৃতত্ব নয় মৃত্যু। যে মন একবার কর্মের তেজ ও জ্ঞানের ব্যোমের পরিচয় লাভ করেছে, সে এ উভয়কে অন্তরঙ্গ করবেই,—কেবলমাত্র ভক্তির শান্তিজলে সে তার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে রাখতে পারে না। আসল কথা হচ্ছে তারিখ এগিয়ে কিম্বা পিছিয়ে দিয়ে যৌবনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।'

এই অগ্রগতি কখনোই যান্ত্রিক নিয়ম-মাফিক যাত্রা নয়। এ হচ্ছে প্রাণের যাত্রা নতুন সৃষ্টির পথে, মনের যাত্রা চিন্তার ও কল্পনার পথে। এইজন্যই তিনি সব রকম জড়তার বিরোধী, স্থবিরের শাসন-নাশন যৌবনশক্তির প্রতীক।

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ গল্প ও কবিতা—এই তিনেরই মূলে ছিল সপ্রতিভ জাগ্রত মন। এইজন্যই তিনি প্রচলিত ভাষারীতি পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। চলতি ভাষাতে জাগ্রত সজীব মনটি সোজাসুজি নিজের কথা বলতে পারে—অন্য কোনো পূর্বনির্দিষ্ট রীতির ফরমে নিজেকে বদ্ধ করে না। চলতি ভাষার পক্ষে এই যুক্তি সর্বজনস্বীকার্য হবে কি না জানি না। সাধু গদ্যের একটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ চেহারা আছে। অবশ্য সাধুগদ্যের মধ্যে ব্যক্তিরূপকে ফোটানো যায় না, এ কথা একেবারেই অগ্রাহ্য। তবু সাধু গদ্যের একটা সংযমের শাসন আছে, তাতে কোনো কোনো চলতি ইডিয়মকে স্ল্যাঙ্ মনে হতে পারে কিংবা চলতি বাক্যগঠন বা হসন্ত-উচ্চারণ তাতে অশোভন মনে হতে পারে। ফলে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার জগতের সঙ্গে সাধু গদ্যাশ্রয়ী ভাবনার একটা ব্যবধান তৈরিও হতে পারে। এই ব্যবধান ঘোচাতে হলে ইডিয়ম-সম্মত চলতি গদ্যকেই স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু চলতি গদ্যকে সহ্য করতে অনেকে পারেন নি, তার একটি কারণ তার উচ্চারণভঙ্গি, অন্য কারণ হচ্ছে 'অ-সাধু' ইডিয়ম-প্রয়োগ।

'ভদ্রলোকেরা প্রবাদ উচ্চারণ করেন না'— ইংরেজিতে প্রচলিত এই প্রবাদটির মূলে যে-রুচি আছে, সে-রুচি থেকে নব্য ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি একেবার মুক্ত ছিল না। প্রমথ চৌধুরী এখানেই বাংলা গদ্যভাষায় নতুনত্বের সৃষ্টি করলেন। হসন্তবহুল এবং প্রস্বরসমন্বিত বাংলা উচ্চারণভঙ্গি তিনি দুঃসাহসিকতার সঙ্গেই সাহিত্যিক গদ্যে প্রবর্তন করলেন। একটি দৃষ্টান্ত দিই—

'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি'-জিনিসটা এ দেশে একটা মস্ত ঠাট্টার সামগ্রী। কিন্তু বারো পাত বইয়ের তেরো পাত সমালোচনা দেখে কারোই হাসি পায় না। অথচ বীজ পরিমাণে এক হাত কমই হোক কি এক হাত বেশিই হোক, তার থেকে নতুন ফল জন্মায়; কিন্তু ঐরূপ সমালোচনায় সাহিত্যের কিংবা সমাজের কি ফললাভ হয়, বলা কঠিন।' —মলাট-সমালোচনা, ১৩১৯

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, চলতিরীতির প্রতি প্রমথ চৌধুরীর বিশেষ ঝোঁক ছিল বলে সাধারণ আলাপের ভাষার মতোই তাঁর গদ্যভাষা অসজ্জিত বা বিশৃঙ্খল— এ কথা অবশ্যই বলা যায় না। তিনি চলতি রীতির একটি সাহিত্যিক রূপ দিয়েছিলেন। শব্দনির্বাচনে তিনি কৃত্রিমভাবে সতর্ক ছিলেন না; তাঁর শব্দচয়ন অনায়াস-সাধু—

'দেহ ও মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হলেও দেহমনের পার্থক্যের উপরেই আমাদের চিন্তারাজ্য প্রতিষ্ঠিত। দেহের যৌবনের সঙ্গে মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাকলেও দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র। এই মানসিক যৌবন লাভ করতে পারলেই আমরা তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারব। দেহ সংকীর্ণ ও পরিচ্ছিন্ন; মন উদার ও ব্যাপক।' —'যৌবনে দাও রাজটিকা', ১৩২১

তাঁর চলতি গদ্যের আর-একটি ফল এই যে প্রস্বরবাহুল্য ঘটায় বাংলা গদ্যের এতকাল প্রচলিত মাত্রাগুণ কমে গেল। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে'র গদ্য পড়তে গেলে আপনা থেকেই একটা টানা সুর আসে। তার থেকেই বোঝা যায় সাধু শব্দ এবং সাধু ক্রিয়াপদের উচ্চারণে এই মাত্রাগুণ স্বভাবতই আসে। প্রমথ চৌধুরীর গদ্য মাত্রাগুণবর্জিত এবং প্রস্বরিত। ফলে বাংলা গদ্যের প্রকৃতিকেই তিনি যেন অনেকটা বদলে দিলেন। এটা তাঁর একটি বিশেষ স্মরণীয় কীর্তি।

প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যকে কৃত্রিমতামুক্ত করে লোকের মুখের ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, এই প্রয়াসের মূলে ছিল তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে এক নতুন ধারণা। সেকালে তিনিই বুঝেছিলেন বাংলা সাহিত্যে গণধর্ম প্রসারের যুগ এসে গিয়েছে, বহুশক্তিশালী অল্পলেখকের জায়গায় অল্পশক্তিশালী বহু লেখকেরা আসতে আরম্ভ করেছেন; সাহিত্য সংবাদপত্রাশ্রিত হয়ে উঠেছে; অসাধারণ চরিত্র-সৃষ্টির পরিবর্তে সাধারণ চরিত্র-সৃষ্টির দিকে লেখকদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' (১৩২২) এবং 'আধুনিক বঙ্গসাহিত্য' (১৩২০) প্রবন্ধ দুটিতে প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতির পরিবর্তনগুলি চমৎকার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, তাতে অন্তর্দৃষ্টি এবং দূরদৃষ্টি দুইই অসাধারণ। অবশ্য এই যুগান্তরের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূতের অন্তর্গত 'মনুষ্য' প্রবন্ধটিতে। প্রমথ চৌধুরী প্রবল জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন একাল হচ্ছে 'চুটকি' অর্থাৎ ক্ষুদ্রকায় সাহিত্য-সৃষ্টির কাল। আপাতদৃষ্টিতে এই তত্ত্বটিকে তাঁর নিজের লেখার সমর্থন বলে মনে হলেও কথাটি সাধারণভাবেই সত্য। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ যেমন সাময়িকপত্রেরই স্থানোপযোগী পরিমিতদেহ, তাঁর গল্প এবং কবিতাও তেমনি ক্ষুদ্রদেহ। তিনি উপন্যাস লেখেন নি, তেমনি ধর্মতত্ত্ব বা কৃষ্ণচরিত্রের মতো তত্ত্বগ্রন্থও লেখেন নি।

বস্তুত প্রমথ চৌধুরী মূলতই সাহিত্যিক, তাত্ত্বিক নন, দার্শনিক নন, কিংবা ঐতিহাসিক নন। তবে সাহিত্যিক বলতে আমরা সাধারণত বুঝি গল্প-কবিতার লেখক। গুরু-প্রবন্ধের লেখকরা হয় দার্শনিক নাহয় ঐতিহাসিক। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্য নিয়েও লিখেছেন কিন্তু তার চেয়েও বেশি লিখেছেন ইতিহাস সমাজ বা অন্যান্য বিষয় নিয়ে। তথাপি তাঁর পরিচয়, তিনি সাহিত্যিক। এর কারণ, নানা বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনার ফলে তাঁর লেখায় সত্য ও তত্ত্বের চমক থাকলেও তত্ত্ব-রচনা ছিল তাঁর গৌণ উদ্দেশ্য। বিষয় যাই হোক, সেই বিষয়কে পরিবেশনের রীতিই প্রধানত পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট করে রাখে। লেখার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে নিপুণ বাক্‌কুশলী বৈদগ্ধ্যপরায়ণ, বুদ্ধি-উজ্জ্বল পরিহাসনিপুণ লেখক ব্যক্তিটি, পাঠকদের মনে তারই ছাপটি পড়তে থাকে। 'এসে' নামক বস্তুটি এই ভাবেই সাহিত্য-গুণান্বিত হয়ে পাঠকের পরম আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। এই বিশিষ্ট অর্থে প্রমথ চৌধুরীর মতো 'এসেইস্ট' আমাদের সাহিত্যে কমই দেখা গিয়েছেন। এসেইস্ট যেমন অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে কথার ফুলঝুরি তৈরি করতে পারেন তেমনি গুরুবিষয় নিয়েও পারেন কিন্তু বিষয়গৌরবটাকেই প্রধান না করে বাচনভঙ্গিমাকেই আর্টে পরিণত করতে হয়—'the charm of the essay depends upon the charm of the mind that has conceived and recorded the impression.'

এত বড়ো শক্তিশালী গদ্যলেখক যিনি ব্যঙ্গে পরিহাসে ভাষার দ্যুতিতে বাঙালির চিন্তাজড়তা ঘোচাতে চেয়েছিলেন, সবুজ পত্রের সম্পাদকরূপে দেখা দেবার আগে দু বছর তিনি কবিতাচর্চা করেছিলেন। তাঁর সনেট পঞ্চাশৎ ১৯১৩-তে বেরোয়। রবীন্দ্রনাথ তখন বিলেতে। বিলেতে থেকেই তিনি সনেট পঞ্চাশৎ পড়ে বিস্ময় প্রকাশ করে ইন্দিরাদেবী এবং প্রমথ চৌধুরীকে চিঠি লেখেন। রবীন্দ্রনাথের সেই মন্তব্যগুলি বর্তমানে সুপরিচিত হয়েছে। 'বীণাপাণির খড়্গপাণি মূর্তি' 'সরস্বতীর বীণায় ইস্পাতের তার' 'ভাবটুকু এক-একটি নিরেট মাণিকের মতো' 'কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ'— রবীন্দ্রনাথের এই-সব মন্তব্য প্রমথ চৌধুরীর কবিতা সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি বলে পরিগণিত হয় নি। এতে প্রমথ চৌধুরীর কবিতার যে অভ্রান্ত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়েছে তা বাংলা কবিতার স্মরণীয় দিক্‌পরিবর্তনের ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিত যে রবীন্দ্রনাথের মুখেই পাওয়া গেল, এ ঘটনাও কম অর্থপূর্ণ নয়।

প্রমথ চৌধুরী তখনও পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধ কিছু কিছু লিখেছেন চলতি ভাষাতেই তবু তাঁর আবির্ভাবে তখনও কেউ সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যকে দেখে নি। 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাংলা ওরফে সাধুভাষা' (পৌষ ১৩১৯) নামে রচনাটাই নতুন ভাষান্দোলনের সূত্রপাত করে প্রমথ চৌধুরীর খ্যাতিকে ভিন্নপথে চালিত করল। সেই বছরের ভারতী পত্রিকাতে তিনি কয়েকটি সনেট লিখেছিলেন, সমাজপতির সাহিত্য পত্রিকাতেও তাঁর সনেট বেরোয়। সেইগুলিই গ্রন্থবদ্ধ হয়ে সনেট পঞ্চাশৎ রূপে প্রকাশিত হয়। সে-সময় তাঁর কবিতা সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকসমাজে তেমন কোনো সাড়া পড়ে নি। 'পদচারণ' নামে তাঁর আর-একটি কবিতার বই ১৯১৯ সালে বেরোয়। তখন তিনি সবুজ পত্রের বিখ্যাত সম্পাদক, নব্যরীতির প্রবন্ধের সুপ্রতিষ্ঠিত পথিকৃৎ, নতুন ভাষা ও চিন্তার গুরু। হয়তো এই কারণেই কবি হিসাবে তাঁর আলোচনা করার বা মূল্যনির্ধারণের চেষ্টা সেকালের পাঠকেরা করে নি।

কিন্তু গদ্যলেখাতে প্রমথ চৌধুরীর যে নিজস্বতা ছিল পদ্যেও তাঁর সেই নিজস্বতা ছিল। কবিতা লেখাতে তিনি গতানুগতিক ধারায় চলেন নি। তখন রবীন্দ্রনাথের হাতে কবিতার মুক্তি ঘটেছে এবং

যেমনি ছুটিল বাণীর বন্ধ
উচ্ছ্বসি উঠে বীণার ছন্দ
সুরের সাহসে আপনি চকিত
বীণার তার।

এ সাহস ছড়িয়ে গেছে বহু কবির মধ্যে। প্রমথ চৌধুরী সচেতন ভাবেই রবীন্দ্র-প্রবর্তিত আদর্শের থেকে মুক্ত থাকতে চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজেরই স্পষ্ট উক্তি আছে। তিনি বড়ো কবিতা লেখেন নি। সনেট বা তেরজারিমা জাতীয় ছোটো কবিতা লিখেই তিনি স্বস্তি পেতেন। তাঁর কবিতার এই ফর্ম ভাবাবেগমুখর কবিদের কাছে আবেগসংযমনের আদর্শ স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ নৈবেদ্যের সনেটে বস্তুত সনেটের কঠোর শাসনকে মানেন নি; তা ছাড়া শব্দ-চয়নের ও চিত্ররচনার একটা স্বতন্ত্র কাব্যিক প্রকৃতিও দেখিয়ে দিলেন। প্রমথ চৌধুরী সনেটের নিয়মকে ফিরিয়ে আনলেন; ভাবাবেগে অন্ধভাবে চালিত না হয়ে জাগ্রত বুদ্ধির শাসনকে প্রবর্তন করলেন। কবিতার ভাষাকেও আমাদের গদ্যময় অনুভূতির জগতের ভাষার নিকটবর্তী করে দিলেন। 'জোর-করা ভাব আর ধার-করা ভাষা'র প্রতিক্রিয়াতেই তিনি লিখেছিলেন কবিতা।

তাঁর কবিতা আবেশজাত কবিতা নয়; তাই তাঁর মনোভাবে আত্মমগ্নতার ছাপ নেই। সনেট সম্বন্ধে বলাই হয় যে তা গাঢ়-গভীর অনুভূতির পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি। প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় বিচারহীন অনুভূতির স্থান নিয়েছে জাগ্রত বিচারশীলতা অর্থাৎ একটি ক্রিটিকের মন। তাঁর ফুল-সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিতে তাঁর মনটির এই বিশেষত্ব—

বিলাসের অঙ্গ লাগি তুমি হও জল,
নারীর আদুরে ফুল, শৌখিন গোলাপ!
নবাবেরই ভোগ্য তব রূপগুণবল,
নবাবের যোগ্য তুমি হকিমী জোলাপ! —গোলাপ

—গোলাপ যে নবাবের ভোগ্য এবং যোগ্য এ সিদ্ধান্ত করতে হয়েছে যুক্তি পারম্পর্য দিয়ে। প্রমথ চৌধুরীর একটি উৎকৃষ্ট কবিতা 'বসন্তসেনা'। তার শেষ চার লাইন—

কলঙ্কিত দেহে তব সাবিত্রীর মন
সারানিশি জেগে ছিল, করিয়ে প্রতীক্ষা
বিশ্বজয়ী প্রণয়ের, প্রাণ যার পণ।—
তারি বলে সহ তুমি অগ্নির পরীক্ষা!

কবিতাটি সুন্দর সন্দেহ নেই। কিন্তু এ যেন উৎকৃষ্ট সাহিত্যসমালোচকের রসবিচার— রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলার সমালোচনারই মতো।

লক্ষ্য করবার বিষয় তাঁর কবিতা আত্মগত ভাবনা নিয়ে নয়, প্রকৃতি নিয়েও নয়। অনেকগুলি কবিতার বিষয় নেওয়া হয়েছে পড়া বই থেকে। কতকগুলি নেওয়া হয়েছে চার পাশের লোকসমাজ থেকে

আর কতকগুলির বিষয় হয়েছে ফুল, যে ফুল বাগানে ফোটে। অর্থাৎ কবিতার প্রেরণা এসেছে— যদি প্রেরণাই বলতে হয়, গদ্যের জগৎ থেকে। এই জগতের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে প্রশ্ন ও মীমাংসা জেগেছে, তারই সংহত পরিমিত প্রতিফলন হয়েছে তাঁর সনেট-কবিতায়। এক-এক সময় মনে হয় তাঁর কবিতার মিলও যেন তাঁর গদ্যরচনার অনুপ্রাস বা শ্লেষ-যমকের মতো শব্দের খেলা। ভাবের অনুরণনে যে-সমধ্বনি অতি সহজ সাবলীল ভাবে বেজে ওঠে কবিতায়, প্রমথ চৌধুরীর কবিতার মিল সে জাতীয় নয়। এ বীণায় সত্যই সোনার তার নেই, আছে ইস্পাতের তার।

প্রমথ চৌধুরী একটি চিঠিতে বলেছেন 'আমার সনেটের অন্তরে হয়ত art-এর চাইতে artificiality বেশি'। আর-একটি চিঠিতে বলেছেন 'আমি আসলে গদ্যলেখক তা আমি জানি। কিন্তু এই Rhyme-এর চর্চা করলে শব্দের পুঁজি বেড়ে যায়। অনেক শব্দ বাদ দিতে হয় আর-একটি শব্দের সঙ্গে মেলে না বলে। আমার কবিতা লেখার ভিতর এ উদ্দেশ্যও বোধ হয় ছিল।' সৌভাগ্যক্রমে প্রমথ চৌধুরী শুধুই কবি ছিলেন না, ছিলেন ক্রিটিক। তাই নিজের কবিতা সম্বন্ধে এমন অকুণ্ঠ উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন। মনে রাখতে হবে তাঁর 'পদচারণে'র কবিতাগুলি যখন লেখা হচ্ছিল তখন বাংলা সাহিত্যে 'ভারতী'র যুগ। ভারতীর কবিরা একটা সমআদর্শে কবিতা রচনা করে চলেছেন। তাঁদের মধ্যমণি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ভাষায় ছন্দে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেও অনেকেই সফল কবিরূপে বাংলা সাহিত্য-সরস্বতীর প্রসন্ন দৃষ্টি অর্জন করেছেন। তাঁদের কবিতার মূল্য অস্বীকার করা কখনোই সম্ভব নয়। হয়তো এঁদের মধ্যে অনুকরণ ছিল, কিন্তু কবিতা হিসাবে এঁদের কবিতা মূল্যহীন এ কথা বলা দুঃসাহসিকতা নিশ্চয়ই।

আসলে কাব্যের ধর্ম নিয়ে প্রমথ চৌধুরীর কিছু বলবার ছিল না। একটি কবিতায় তিনি বড় মর্মস্পর্শী করেই কবিতারসমাধুর্যের বর্ণনা দিয়েছেন—

আমি চাহি শুধু আলো, ভালো নাহি বাসি কালো
অন্তরের ঘরে।
আর জানি এক খাঁটি পায়ের নীচেতে মাটি
আছে সবে ধরে।
মাটি আর আলো নিয়ে, দিতে চাই ছুঁয়ে বিয়ে
সসীমে অসীম।
যত কিছু লেখাপড়া তার অর্থ শুধু গড়া
মাটির পিদিম।

—'পত্র', পদচারণ

যিনি কালো ভালোবাসেন না, তিনি সৌন্দর্য ও আলোর পূজারী। এ কথা চিরপুরাতন আবার চিরনতুনও বটে। সসীমে-অসীমে মিলিয়ে দেবার বাসনাও বহুবারই রবীন্দ্র-কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হতে শুনেছি। প্রমথ চৌধুরীর কবি-বাসনাও ভিন্ন নয়। তথাপি তাঁর কবিতার বিশেষত্ব আছে, সে বিশেষত্ব কবিতার আদর্শে নয়, কবিতার রীতিতে। তাই সনেট লিখলেন, কিন্তু লিখলেন ফরাসি রীতির, লিখলেন ট্রিয়লেট ও তেরজারিমা। নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত তিনি দিলেন বাঙালি কবিদের।

প্রমথ চৌধুরী কবিতার ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ প্রভাবের যুগে তিনি নিজের ভঙ্গিতে কবিতাচর্চা করেছিলেন; মনে হয় এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। কিন্তু সত্যই

তিনি সঙ্গীহীন ছিলেন না। তাঁর কিছু আগে রবীন্দ্রনাথের যুগেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবিতায় এনেছিলেন এক ভিন্নতর ভঙ্গি। কবিতার ভাষাকে তর্কসঙ্কুল গদ্যাত্মক বাস্তবগন্ধী করে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা কবিতার একটা ভিন্ন জাতি তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা যদি অলক্ষ্যে তাঁর কাব্যে ছায়া ফেলে থাকে তবে বিস্ময়ের কি আছে? এ কথা আজ আর অস্বীকার্য নয় যে, বাংলা কাব্যরীতিতে প্রমথ চৌধুরী এবং দ্বিজেন্দ্রলাল কেউ শেষ পর্যন্ত অবজ্ঞাত থাকেন নি। যাঁরা বাংলা কবিতায় তীব্র তীক্ষ্ণ সত্যকে বাস্তবভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনা করেছেন, এঁরা দুজন চিরকালই তাঁদের পূর্বসূরী বলে গণ্য হবেন।

৫

গল্প লিখতে আরম্ভ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ ও কাব্যচর্চায় হাত পাকাবার পরে। তাঁর প্রথম গল্প প্রবাসস্মৃতি অবশ্য বেরিয়েছিল ১৩০৫-এর ভারতীতে। সে-গল্পটি সাধুভাষায় লেখা। তার পর দীর্ঘকাল গল্প তিনি বোধ হয় লেখেন নি। তাঁর বিখ্যাত 'চারইয়ারি কথা' সবুজপত্রে (১৩২২-২৩) বেরোল প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্ট ছাপ নিয়ে। তাঁর গল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বললেন—

'তোমার গল্পগুলি আর একবার পড়লুম। ইতিপূর্বেও পড়েচি। ঠিক যেন তোমার সনেটেরই মত— পালিশ করা, ঝকঝকে তীক্ষ্ণ। উজ্জ্বলতার বাতায়ন মগজের তিনতলা মহলে মধ্যাহ্নের আলো সেখানে অনাবৃত। রসাক্ত সুমিষ্টতা দোতলায়, সেখানে রসনার লোলুপতা। তোমার লেখনী সে পাড়া মাড়াতে চায় না।'

কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ বলেন 'নীললোহিতের আদিপ্রেম' গ্রন্থ (১৯৩৪) সম্পর্কে। কিন্তু কথাগুলি প্রমথ চৌধুরীর সব গল্প সম্বন্ধেই অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। 'রসাক্ত সুমিষ্টতা' তাঁর গল্পের ধর্ম নয়। এ কথা সত্য তাঁর প্রথম দিকের গল্প সম্বন্ধেও, যখন বাংলা গল্পসাহিত্যের ঐশ্বর্য তেমন ছড়িয়ে পড়ে নি। সাধনায় রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প লিখলেন। বাংলা সাহিত্যের আর-একটি নতুন পথ তিনি তৈরি করলেন। এতে তাঁর সার্থকতা এতই অপরিমেয় যে, আশা করা গিয়েছিল এর পর বাংলা গল্পের ধারা চলবে এই পথেই। সে-সম্ভাবনা অবশ্যই নিরর্থক ছিল না।

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ একটি বিষয়ে বারবার আমাদের অবহিত করিয়ে দিয়েছেন যে বাংলা-সাহিত্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে বাস্তবধর্মী গল্পের প্রবর্তন হয় গল্পগুচ্ছ থেকে। এর আগে লেখা হয়েছে অসাধারণ ঘটনার অসাধারণ গল্প। পল্লীগ্রামাঞ্চলে বেড়াতে-বেড়াতে যে-জীবনধারা রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল তাতে নাটকীয় উপকরণের একান্ত অভাব ছিল, কিন্তু তাতে গভীরতার অভাব নেই, 'রসাক্ত সুমিষ্টতা'রও অভাব নেই। ছোটগল্পের এই বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই সংগৃহীত। নানা হৃদয়মাধুর্যে, নানা সামাজিক সমস্যায়, বাঙালি পল্লীসংসারচিত্রের মধ্যেও নিটোল স্নিগ্ধতা আবিষ্কার করে রবীন্দ্রনাথ গল্পের একটা মান নির্দেশ করলেন। খুব বেশি অনুবর্তী অবশ্য দেখা গেল না; কিন্তু একজন অন্তত রবীন্দ্রনাথের এই মানটিকে স্বীকার ও পালন করেছিলেন— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। অবশ্য প্রভাতকুমারের অভিজ্ঞতার জগৎ ছিল আলাদা, তাঁর গল্প কৌতুক-স্নিগ্ধতায় অপরূপ। তাঁর গল্পের বাস্তবতা ভদ্র শিক্ষিত ধনী পরিবারের বাস্তবতা— অবশ্যই

তাতে কোনো তীক্ষ্ণ সমস্যার ছায়াপাত ঘটে নি। কিন্তু আমাদের সাধারণ বুদ্ধির জগতের কর্ম-ক্রিয়ার বাস্তবতা প্রভাতকুমারের গল্পে অব্যাহত। তাঁর গল্পের বয়নকৌশলও রবীন্দ্রনাথের মতোই ঘটনা-পরম্পরায় সাজানো।

ছোটগল্প রচনার এই রীতিতেও প্রমথ চৌধুরী ব্যতিক্রম ঘটালেন। প্রথম কথা এই যে. গল্পকে বাস্তবানুগত হতেই হবে, এমন কী আইন আছে? দ্বিতীয়ত, গল্পকে যে নাটকীয় ঘটনাপরম্পরায় সাজাতেই হবে তারই বা কি বাধ্যতা আছে? তৃতীয়ত, গল্পের মেজাজ। প্রভাতকুমারের গল্পের মেজাজকে যদি বলি সস্নেহ কৌতুকের, প্রমথ চৌধুরীর গল্পের মেজাজ তা হলে মজলিশি পরিহাসের। পাঠক জানেন প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের মেজাজও তাই।

এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে বলা হয়েছে বাস্তব থেকে দূরাপসারিত, রোম্যান্টিক। তার পর রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছে উত্তর ও মধ্য বাংলার পল্লীজীবনসমাজের রসমাধুর্য দিয়ে প্রশান্ত উপভোগ্যতার সৃষ্টি করলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি দরিদ্র, মধ্যবিত্ত 'চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজনবৎসল বাস্তুভিটাবলম্বী' বাঙালি জীবনকে সাহিত্যে প্রতিফলিত দেখার বাসনা প্রকাশ করেছেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের গল্পে এবং দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লীচিত্র' ইত্যাদি বইতে এ জীবনটি সত্যসত্যই আভাসিত হতে আরম্ভ করেছিল। তার পর অকস্মাৎ প্রমথ চৌধুরী এক নতুন সমাজ এবং জীবনের ছবি নিয়ে এলেন সাহিত্যে। তিনি যে সমাজ আঁকলেন আর্থিক অনটন তার ধারে-কাছে নেই, তিনি যে চরিত্র আঁকলেন তারা উচ্চ-শিক্ষিত বিলেত-ফেরত নাহয় বনেদী অভিজাত ধনী জমিদার। বন্দুক চুরুট এবং পানীয় তাদের সহচর। তাঁর গল্পের নায়িকারাও অসামান্য সুন্দরী, বিদ্যুল্লেখাবৎ। নানা বনেদী অভ্যাস এবং সংস্কারে তাদের আচরণ আমাদের সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের পক্ষে কিঞ্চিৎ অনভ্যস্ত এবং দূরাপগত। অর্থনীতি রাজনীতি সমাজনীতি বা পরিবারনীতি এদের সমস্যা নয়। সে দিক থেকে আমাদের এই স্থূল জীবনের বাস্তব তীক্ষ্ণতার সঙ্গে মুখোমুখি করিয়ে দেওয়া প্রমথ চৌধুরীর গল্পরচনার উদ্দেশ্য ছিল না। বলতে গেলে এ একরকমের শৌখিন সমাজের কাহিনী। সেজন্য প্রমথ চৌধুরী কিছুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে প্রয়োজননিবারণ নয়, লৌকিক লক্ষ্যসাধন যে সাহিত্যের কাজ নয়, তাঁর মতো এমন জোর করে আর কে বলেছেন? সুতরাং জীবনের বাস্তবকে আঁকলেই যে সাহিত্য সার্থক হয় এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও তাঁর গল্পনীতি বোঝানোর জন্য 'গল্পলেখা' গল্পটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

'যা নিত্য ঘটে, তার কথা কেউ শুনতে চায় না। ঘরে যা নিত্য খাই, তাই খাবার লোভে কে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়? যা নিত্য ঘটে না, কিন্তু ঘটতে পারে, তাই হচ্ছে গল্পের উপাদান।

এই তোমার বিশ্বাস?

এ বিশ্বাসের মূলে সত্য আছে। ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য রাতদুপুরে একটা পোড়ো মন্দিরে আশ্রয় নিলুম— আর অমনি হাতে পেলুম একটি রমণী, আর সে যে-সে রমণী নয়— একেবারে তিলোত্তমা! এ রকম ঘটনা বাঙালির জীবনে নিত্য ঘটে না, তাই আমরা এ গল্প এক বার পড়ি, দু বার পড়ি, তিন বার পড়ি— আর পড়েই যাব, যতদিন না কেউ এর চাইতেও বেশি অসম্ভব একটা গল্প লিখবে।

তা হলে তোমার মতে গল্পমাত্রই রূপকথা ?

অবশ্য।

ও দুয়ের ভিতর কোনো প্রভেদ নেই ?

একটা মস্ত প্রভেদ আছে। রূপকথার অসম্ভবকে আমরা ষোলোআনা অসম্ভব বলেই জানি, আর নভেল-নাটকের অসম্ভবকে আমরা সম্ভব বলে মানি।'

প্রমথ চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর প্লটে নিজের বিশ্বাসের সমর্থন পেয়েছেন। সুতরাং বঙ্কিম-উপন্যাসের তথাকথিত বাস্তবতার অভাব সাহিত্যরসবিচারের ক্ষেত্রে যেমন ধর্তব্যই নয়, প্রমথ চৌধুরীর গল্পের বিশেষ ধরণের ঘটনাবন্ধনে তথাকথিত বাস্তবতার অভাবও তেমনি মুখ্য বিবেচ্য নয়। তাঁর গল্পে অবশ্য বাঙালি জমিদার এবং ইঙ্গবঙ্গ সমাজের বাস্তবতা বর্তমান, তথাপি তাঁর মূল বক্তব্যের সঙ্গে বাঙালি সমাজের অবিচ্ছেদ্য যোগ নেই। সেইজন্য তিনি বিশ্বাস করেন গল্পের রস উপভোগে বাঙালির জাতীয় সংস্কার বাধা হওয়া উচিত নয়। ইংরেজ সমাজে যে-গল্প চলতে পারে বাঙালি সমাজেও তা চলতে পারে। তাঁর প্রথম যুগে লেখা 'চার-ইয়ারি কথা' 'নীললোহিত' এবং শেষ গল্প 'সত্য ও মিথ্যা'য় তিনি যে-সব পরিস্থিতি ও ঘটনা ব্যবহার করেছেন, সেগুলি বিচিত্র তো বটেই, বিশ্বাসকেও অতিক্রম করে যায়। তাঁর গল্পের উপভোগ্যতা নির্ভর করে এই পরিস্থিতি-বৈচিত্র্যের উপর অনেকখানি, আর অনেকখানি নির্ভর করে গল্পের অন্তর্গত শ্রোতাদের দ্বারা পরিস্থিতি বিশ্লেষণে। কেননা, এই বিশ্লেষণে পাঠকদের কোনো নিশ্চিন্ত মীমাংসা মেলে না এবং এতেই গল্পের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

এই-সব পরিস্থিতি নাটকীয় হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু হয় নি, তার কারণ প্রমথ চৌধুরীর গল্পরচনার বিশিষ্ট রীতি। এ রীতিও নতুন। তাঁর প্রথম গল্প চার-ইয়ারি কথাতে এ রীতিটির সাক্ষাৎ পাই এবং তার পর অল্পবিস্তর তাঁর অধিকাংশ গল্পেই তিনি এই রীতির অনুবর্তন করে গেছেন। তাঁর কাহিনীটি তিনি প্রত্যক্ষভাবে পাঠকের কাছে চরিত্র ও ঘটনা -সহযোগে উপস্থাপিত না করে, কোনো ব্যক্তির মুখ দিয়ে বিবরণের সাহায্যে বলিয়ে নেন। তাঁর গল্পের এই ভঙ্গিটি আর্ট হিসাবে অভিনব। প্রমথ চৌধুরীর গল্প মাত্রই যেন বন্ধুদের আলাপ মাত্র। কখনও সমবয়সী বন্ধুদের মজলিশি আলাপ, কখনও জমিদার-বাবুর পারিষদ-ভাষণ। সেইজন্যই গল্পের মধ্যে নাটকীয় উদ্‌বেগের সঞ্চার হয় নি। কাহিনী ঘটে যাবার পর আলাপের সূত্রে বন্ধুদের মধ্যে বিবৃত হচ্ছে মাত্র। গল্পটি যথার্থত আরম্ভ হওয়ার আগে বন্ধুবর্গের আলাপে এর একটা উপযুক্ত পটভূমি গড়ে ওঠে, পাঠকেরা প্রস্তুত থাকে। তার পরেই গল্পটি বিবৃত হয় একজনের মুখে। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর গল্পরীতি খানিকটা এই রকম। কিন্তু ক্ষুধিত পাষাণের ভাষার যে মর্মরসৌধ গড়ে উঠেছে, বলা নিষ্প্রয়োজন, সেটা আমাদের প্রাত্যহিক বসবাসের উপযুক্ত নয়; কিন্তু তার স্বপ্ন ও বাস্তবের অনুপম মেশামেশি পাঠকের সব জিজ্ঞাসাকেই নিরস্ত করে। এ ভাষার অমৃতস্বাদ কে ঠেলে ফেলবে? প্রমথ চৌধুরীর ভাষা শুধু কথ্য তা নয়, প্রখর চলতি ভঙ্গিতে সম্পন্ন। অবশ্য এ চলতি মার্জিত শিক্ষিত সমাজের চলতি ভাষা—গ্রাম্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত। ক্ষুধিত পাষাণের ভাষা আমাদের ভুলিয়ে দেয় পরিবেশকে, নিয়ে যায় স্বপ্নলোকে; প্রমথ চৌধুরীর ভাষা আমাদের পরিবেশ-সচেতন করে, প্রশ্নকে শাণিত করে। গল্পের অন্তর্ভুক্ত ঘটনা সম্বন্ধে কৌতূহলকে জাগ্রত করে—নির্বিচার আবেশে ঘুম পাড়িয়ে দেয় না। তাই গল্পটি শেষ হলে বন্ধুবর্গের মধ্যে গল্পটির বক্তব্য নিয়ে

নানা জিজ্ঞাসা উত্থাপিত হয়। উপসংহারটি দিয়ে লেখক বস্তুত পাঠককেই সাহায্য করেন। সাহায্য করেন সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত করতে নয়, বরং নানা ব্যাখ্যার সম্ভাবনা দেখিয়ে গল্পের রস-উপলব্ধিতে সৃষ্টি করেন এক ব্যাকুলতা। তিনি গল্পও লেখেন ক্রিটিকের মন নিয়ে।

বলবার এই কায়দাই প্রমথ চৌধুরীর গল্পের প্রাণ। গল্পের সার্থকতা কোথায়? বাস্তবতায়? সংহতিতে? না সংকেতে? গল্প বস্তুত শোনা এবং শোনানোর বস্তু। এটাই গল্পের আদি লক্ষণ। এ বিষয়ে বাগ্‌বাহুল্য অনাবশ্যক। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের এই শ্রেণীটির প্রকৃতি অভ্রান্তরূপে বুঝেছিলেন। ফলে তাঁর গল্প হয়েছে বচনশিল্প। উজ্জ্বল দীপ্ত শাণিত বর্ণনা, ভাষায় যেমন তীক্ষ্ণতা, ভঙ্গিতে তেমনি ঋজুতা। বর্ণনার মধ্যে মিশে থাকে সূক্ষ্মতা। কাহিনী অতীতচারণ-মূলক বলে কথকের মনের বিস্ময় বা আবেগ তত থাকে না। সে আবেগ যেন অনেকটাই অনুচিন্তায় থিতিয়ে এসেছে। তথাপি ভাষার গুণে এবং বিবরণের খুঁটিনাটিতে তিনি পাঠকের চোখের সামনে নতুন করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন কাহিনীটিকে। এ দিক থেকে দেখলে প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি একেবারে খাঁটি গল্প। একজন বক্তা শুনিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর নিজস্ব ভঙ্গি দিয়ে বিবরণটিকে জীবন্ত করে তুলছেন কোনো নাটকীয়তা বা আবেগ-উচ্ছ্বাসের আশ্রয় না নিয়ে; শুধু বর্ণনাতেই পাঠকের আগ্রহকে জাগিয়ে রাখা—এটাই খাঁটি গল্পের আদর্শ হওয়া উচিত। অর্থাৎ এই গল্পের একটি প্রধান আকর্ষণ হলেন বক্তা স্বয়ং। তাঁর ব্যক্তিত্বই জড়িয়ে আছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

প্রমথ চৌধুরীর এই মেজাজটিই তাঁর গল্পকে করে স্বাদু। ব্যঙ্গে পরিহাসে নির্বিকার উপস্থাপনায় আবার বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যে ভাষার বিদ্যুৎশিখায় গল্পটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁর ভাষার মধ্যে একটি মাত্রই আবেগ আছে, তা হচ্ছে তাঁর রূপের আবেগ। তিনি বরাবর রূপের ভক্ত। তাঁর নায়িকারা সকলেই রূপবতী, কিন্তু সে রূপ বর্ণনা করতে গিয়েও আবেগে অন্ধ হবার ব্যক্তি তিনি নন। তাঁর গল্পের নায়করা বুদ্ধিমান চতুর প্রেমবিহ্বল, নির্বোধ কঠিন নির্দয় নানা রকমেরই হয় কিন্তু নায়কদের সেই বৈশিষ্ট্য লেখকের চিত্তচেতনাকে অধিকার করে না। সে ক্ষেত্রে তাঁর নির্লিপ্ততা এবং জাগ্রত সমালোচনা-বৃত্তি অব্যাহত। এইজন্যেই বোধ হয় প্রমথ চৌধুরীর গল্পে আগাগোড়াই একটি ব্যঙ্গের আভাস স্ফুরিত। প্রমথ চৌধুরীর এই মেজাজ আমরা আর-একজন অসাধারণ গল্পকারের মধ্যে পাই—তিনি রাজশেখর বসু।

প্রমথ চৌধুরী

দীর্ঘ ঋজু দেহ বন্দী নেকটাঈ স্যুটে,
স্বচ্ছ পরকলা-ঢাকা দিঠি অন্তর্ভেদী।
সাহিত্যপ্রসঙ্গ কণ্ঠে স্বতোৎসার-বেদই ;
মৃদুস্বর, স্বল্পবাক্ গুঞ্জরণে ফোটে।
কাছে বসে র'ন্ যেন দূর-উচ্চকূটে,
অরসিকজন-সনে সহজ-বিচ্ছেদই।
নির্দোষ রসের ক্ষেত্রে প্রত্যয়িত জেদ্ই
লিখনে শাণিত হয়ে ঝলসিয়ে ওঠে।

চুরুট-চুম্বিত ওষ্ঠে দ্ব্যর্থ-হাসি'চ্ছুরি
সাহিত্যের বিশ্বামিত্র— প্রমথ চৌধুরী।

অনন্য ব্যক্তিত্ব আর দেখিনিকো হেন,
সরস-রুচির মিল সুযুক্তির সনে,
বুদ্ধির ভাস্কর্য-শিল্পে সিদ্ধহস্ত যেন।
— বৈদগ্ধ্যের প্রতিমূর্তি বাহিরে ও মনে।

রচনা ১৯২৯
পরিমার্জনা ১৯৬৮

সনেটশিল্পে আমার শিক্ষাগুরু প্রমথ চৌধুরী মশায়। ইতালীয়ান ইংরেজি আর ফরাসী সনেটের আঙ্গিক ও শৈলী সম্বন্ধে তাঁর মৌখিক আলোচনা থেকে প্রথম জ্ঞানলাভ করি। তাঁরই উপরে একটি সনেট লিখেছিলাম ১৯২৯ সালে। চৌধুরীমশায়কে দেখালে তিনি হেসে বলেছিলেন— "ফরাসী সনেট। এখনই ছাপতে পাঠিও না। ফেলে রাখো। বেশ কিছুদিন বাদে আর একবার ঘষে মেজে দিও ঝক্‌ঝকে পালিশ হয়ে যাবে।"

ফেলে-রাখা সনেট কাগজপত্রের স্তূপের তলায় হারিয়ে গিয়েছিল। স্মৃতিতেও নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। বহুকাল বাদে পুনরাবিষ্কৃত হওয়ায় অনেক স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল। কিছুটা ঘষা-মাজা করেছি। সনেটে অদলবদলের অবকাশ অবশ্য সামান্যই।

১৯২৯ সালে লিখেছিলাম— 'সাহিত্যব্রাহ্মণ একা প্রমথ চৌধুরী'। সরস্বতীর অর্ঘকে চৌধুরীমশায় কখনও পণ্য করেন নি। সবুজ পত্রের মৃত্যু স্বীকার করেছেন তবু তাকে ব্যবসায়িকতার মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখেন নি। তাঁর এই সাহিত্যিক-সাত্ত্বিকতাকে আমি ব্রহ্মণ্যগুণ বলতে চেয়েছিলাম সেদিন। এখন মনে হয় প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে সাহিত্যিক-ক্ষাত্রগুণের দার্ঢ্য উজ্জ্বল, অকৃত্রিম। ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্রকে তাই উপমায় স্মরণ করেছি।

রাধারানী দেবী

শিল্পশিক্ষার গতিপ্রকৃতি

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

১

শিক্ষার লক্ষ্য মানুষের পূর্ণ বিকাশ। মানবীয় চেতনার বিচিত্রমুখী গতিপ্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য হলেও এই লক্ষ্যে প্রায়ই মানুষ পৌঁছতে পারে না। কারণ বাধা পদে পদে উপস্থিত হয়। এই বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা থেকেই শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভব। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের বিকাশের পথে যেসব বাধা উপস্থিত হয় সেগুলিকে কি করে অতিক্রম করা যেতে পারে তারই নির্দিষ্ট পন্থার অপর নাম শিক্ষাপদ্ধতি। কিন্তু কোনো শিক্ষাপদ্ধতি চিরস্থায়ী নয়। লক্ষ্য এক হলেও রীতি-পদ্ধতির পরিবর্তন বারংবার ঘটেছে। এই কারণে বলা যেতে পারে শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তনশীল। অধিকাংশ সময়ই এই বিবর্তনের মূলে থাকে সমাজের প্রভাব। এই কারণে শিক্ষাপদ্ধতির বিবর্তন অনুসরণ করতে হলে বা নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করার কালে সমাজের অবস্থা-ব্যবস্থার দিকে লক্ষ দিতে হয়।

যদিও সমাজ মানুষেরই সৃষ্টি তৎসত্ত্বেও সমাজ বারংবার মনুষ্যত্বের বিকাশের পথে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সমাজ সকল সময়ই অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ কথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য, অভ্যাস ছাড়া কোনো শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে ওঠে না। অপর দিকে এ কথাও ঠিক যে, অভ্যাসকে অতিক্রম করতে না পারলে বৈচিত্র্যময় মানবজীবনের পূর্ণ বিকাশ কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। অভ্যাসের দ্বারা অর্জিত শিক্ষার দ্বারাই অভ্যাসকে ভাঙতে হয়। পুরানোকে ভেঙে নূতনের প্রবর্তন ব্যক্তিগত মানুষের ক্ষেত্রেই প্রথম অঙ্কুরিত হয়। ক্রমে তার প্রভাব প্রতিফলিত হয় সমাজজীবনে। ভাঙাগড়ার মুহূর্তে দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে এবং লড়াই লাগে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে।

মানবীয় জীবনের অন্যতম প্রকাশ রূপেই সমাজের উপযোগিতা। তবে কেন সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত মানুষের দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণভাবে আজও তিরোহিত হল না সে বিষয়ে প্রশ্ন স্বভাবতই জাগবার কথা।

এই প্রশ্নের জবাব অনেক জ্ঞানীগুণী দিয়েছেন। আলোচনার সঙ্গতি রক্ষার জন্য আমাদের এ বিষয়ে দু-এক কথা বলা দরকার। অভ্যাসের পথেই সঙ্ঘবদ্ধ জীবন তথা সমাজের সূচনা। অভ্যাসের দ্বারা যে শক্তি অর্জন করা হয় তার ফলে মানুষের মধ্যে একটা নিরাপত্তার ভাব আসে। জীবনধারণের সুশৃঙ্খল বিধিব্যবস্থা ও নিরাপত্তা যতই কাম্য হোক-না কেন অনেক সময় অভ্যাসের পরিণামরূপে যে সংস্কার গড়ে ওঠে সেটিকে ভাঙার প্রয়োজন হয়। ভাঙবার মুহূর্তে নূতন অভ্যাস নূতন শিক্ষা মুহূর্তে প্রবর্তন অপরিহার্য। কাজেই মানবীয় বিকাশের পথে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন একাধারে সম্পদ ও অপর দিকে বিপদ-বাধা উপস্থিত করে।

সূক্ষ্ম বা গভীর মানবীয় চেতনার অন্যতম প্রকাশ শিল্পকলা। এই চেতনা সম্বন্ধে যে কোনো ভাবেই হোক মানুষ সচেতন থেকেছে। তাই শিল্পের প্রভাববর্জিত সমাজ কোথাও দেখা যায় না। জীবন-ধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বা সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ সম্বন্ধে চেতনা কখনও নিষ্প্রভ কখনও উজ্জ্বল কিন্তু সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় নি।

জীবনধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত শিল্পরূপের সঙ্গে সমাজের অবস্থা-ব্যবস্থার সম্বন্ধ কতটা ঘনিষ্ঠ সূক্ষ্ম বা গভীর অনুভূতিগ্রাহ্য শিল্পের সঙ্গে সামাজিক বিধিবিধানের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষভাবে অনুসরণ করা সকল সময় সম্ভব হয় না।

শিল্পের প্রধান তাৎপর্য অভিব্যক্তির দিক দিয়ে। হৃদয়হীন মানুষ শক্তিশালী হলেও যেমন তার বর্বরতা ঘোচে না তেমনি শিল্পাশ্রিত অভিব্যক্তির অবর্তমানে সমাজে বিশেষ রকমের বর্বরতার লক্ষণ দেখা দিতে বাধ্য।

এক সময় শিল্পকলার সৃষ্টির ক্ষমতাকে ঐশী শক্তির অন্যতম প্রকাশ বলে ধরা হত। ক্রমে শিল্পসৃষ্টি ব্যক্তিগত প্রতিভার অবদান রূপেই গৃহীত হয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার যতই বেড়েছে ততই শিল্প-সৃষ্টির সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি অপেক্ষা নানা তথ্য জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে। এই মুহূর্তে যে শিল্পরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি তার লক্ষ্য প্রধানতঃ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

শিল্পের উদ্দেশ্য আদর্শ যেমন পরিবর্তিত হয়েছে তেমনি শিল্পের শিক্ষার সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতবর্ষের জীবনে যে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে তারই অন্যতম প্রকাশ আধুনিক শিল্প ও শিল্পশিক্ষা -পদ্ধতি।

ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে যে সমাজ ভারতের বৃহত্তর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল সেই সমাজকে শিল্প সম্বন্ধে সজাগ করার জন্যই এ দেশে নূতন প্রতিষ্ঠিত শহরগুলিতে শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্রমে জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে চেতনা উদ্ভূত হওয়ার সঙ্গে শিল্পশিক্ষার আর-একটি অধ্যায় শুরু হল। এই দুই ভিন্নমুখী শিক্ষানীতির প্রভাবে আজকের দিনে ভারতীয় শিল্প ও শিল্পশিক্ষার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে।

শিল্পশিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে আজকের দিনের মতো আর উনবিংশ শতাব্দীর মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য অনেক।

শিল্প যে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ এবং শৈশবকাল থেকেই এ বিষয় দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন এ কথা উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পশিক্ষকদের লক্ষের বাইরে ছিল বলেই শিল্পশিক্ষা অনেক দিন পর্যন্ত অপরিণত থেকেছে। শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আমাদের থাকা দরকার। দৈবক্রমে শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা তথাকথিত শিক্ষিত মহলেও দুর্লভ। সচরাচর তথ্য আহরণের সুযোগসুবিধা মুক্ত করাকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা শিক্ষার চূড়ান্ত আদর্শ বলে মনে করি। এরই অপর নাম বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। এই জাতীয় শিক্ষার দ্বারা মানুষের সকল রকমের বিকাশ হওয়া সম্ভব নয় বলেই বিজ্ঞান-প্রভাবান্বিত ইউরোপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেছে যে অনুভূতিগ্রাহ্য বিষয়-গুলিও শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এই কারণেই শিল্প ও কলা আজ শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়েছে।

শিল্পকলাকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করার পরিকল্পনা এ দেশে শুরু হয়েছিল প্রথম-মহাযুদ্ধের পর। এক শত বৎসরের তথ্যমূলক শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত ভারতবাসীর মন ও চিন্তা তথ্যের দ্বারা সে সময় ভারাক্রান্ত। এই কারণে নূতন পরিকল্পনা শিক্ষাব্রতীরা সেই সময় অনায়াসে গ্রহণ করতে পারেন নি। ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিদ্যালয়ের সময় থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত শিল্পশিক্ষার আদর্শ ও

শিক্ষাদানের রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করাই এই আলোচনার লক্ষ্য। ইংরাজ-পরবর্তী ভারতের শিল্পশিক্ষা এই আলোচনার বিষয় হলেও পাশ্চাত্য প্রভাব বহির্ভূত ভারতীয় শিল্পশিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা দরকার। কারণ ভারতীয় শিল্পের জাগরণ ও শিল্পশিক্ষার পরবর্তী বিধিব্যবস্থার ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় শিল্পশিক্ষার অভিজ্ঞতাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগে শিল্পশিক্ষার লক্ষ্য ছিল কারিগর তৈরি করা। তথাকথিত fine art ও applied art উভয়ের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন শিল্পশিক্ষার আদর্শ ছিল। এই কারণে অভিজ্ঞ শিল্পীর অধীনে সহযোগিতা করে শিল্পশিক্ষা শুরু হত। ইংরাজ-প্রবর্তিত শিল্পশিক্ষার প্রভাবে কারিগরি-সুলভ মনোভাব থেকে তংকালীন শিল্পশিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন। সে সময় কারুকলা সম্বন্ধে কঠিন অবজ্ঞা শিল্পরসিকদের মধ্যে জেগেছিল। কিন্তু কারিগরী শিক্ষার পথ অনুসরণ না করে যে নিস্তার নেই এ কথা আধুনিক কালে অনেকেই অনুভব করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পশিক্ষা বহু পরিমাণে সমাজবিমুখ। এই সমাজবিমুখতা থেকেই শিল্পীদের সমাজচেতন করে তোলার চেষ্টা থেকেই আধুনিক ভারতে শিল্পশিক্ষার নূতন অধ্যায় দেখা দিয়েছে। এই নূতন অধ্যায়ের অনুসরণ করার পূর্বে ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিদ্যালয়ের কর্মপ্রণালী ও আদর্শ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

মিশনারী ও ভারতীয় পণ্ডিতদের সহযোগিতায় উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরাজি শিক্ষার যে ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল সে ক্ষেত্রে শিল্পশিক্ষার কোনো স্থান ছিল না। মিশনারীদের শিক্ষাব্যবস্থার বহু পূর্বে থেকে এ দেশে ইউরোপীয় শিল্পী কিউরিয়ো ডিলারের যাতায়াত শুরু হয়েছিল। এইসব পর্যটক শিল্পীদের প্রভাবে দেশীয় সমাজে পাশ্চাত্য শিল্পবস্তুর প্রচলন হয়েছিল। ক্রমে এইসব শিল্পবস্তুর সংস্পর্শে এসে সম্ভ্রান্ত সমাজে রুচির পরিবর্তন ঘটে।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে কলকাতা শহরে স্টুডিয়ো করে অনেক আর্টিস্ট যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৌলতে সে সময় যাঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন, প্রধানতঃ তাঁরাই ছিলেন এইসব শিল্পীর পৃষ্ঠপোষক।

এইসব শিল্পীর সংস্পর্শে বাস্তবতার যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তারই পরবর্তী প্রকাশ পাশ্চাত্য-রীতিতে শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন। এই সময় নূতন ধরণের কারিগরেরও প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ছাপাখানার সঙ্গে যুক্ত নানা রকমের ছবি নক্শা ম্যাপ ইত্যাদি লিথো প্রেসে ছাপার ব্যবস্থা কলকাতা শহরেই প্রথম হয়েছিল। এইসব ছাপাখানায় দেশীয় কারিগররা হয়তো সহকারীরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে দেশীয় ভাষায় বই ছাপার জন্য যখন অক্ষর তৈরির আয়োজন হয়েছিল সেই সময় থেকে সত্যকারের পাশ্চাত্যরীতিতে শিল্পশিক্ষা শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে উইলকিন্স সাহেব ও তাঁর অধীনে শিক্ষিত কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রীর নাম উল্লেখ করতে হয়। কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রী সম্ভবত স্বর্ণকার ছিলেন। উইলকিন্স সাহেবের কাছ থেকে তিনি অক্ষর কাটার কাজ শেখেন ও অল্পকালের মধ্যে নিপুণ কারিগররূপে পরিচিত হন। কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকেই তাঁর পুত্র ও জামাতা কাজ শেখেন এবং শ্রীরামপুরে চিত্রিত পঞ্জিকা ইত্যাদি ছাপাতে শুরু করেন। বলা যেতে পারে ছাপাখানাকে কেন্দ্র করেই বিদেশী শিক্ষা দেশীয় কারিগর সমাজে প্রচলিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক অবস্থার সুরাহা করবার জন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কারিগরী শেখবার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্যই এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার অবদান, এবং শিল্পবিদ্যালয় নাম দিয়ে যে প্রতিষ্ঠান শুরু হয় তা থেকে কলকাতা শহরে শিল্পশিক্ষার পত্তন হল বলা চলে।

তৎকালীন বিখ্যাত ধনী হীরালাল শীলের বাড়িতে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলে হিন্দু মুসলমান অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সকল রকমের ছাত্রই প্রথম নিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি না পেয়ে ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেয়েছিল।

সে সময় শিল্পবিদ্যালয়ে কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হত তার একটা তালিকা দেওয়া গেল :

1. Elementary drawing; drawing from models and natural objects and architectural drawing.

2. Etching, engraving on wood, metals and stone.

3. Modelling including pottery.

সিলেবাস দেখলেই বোঝা যাবে উচ্চাঙ্গের শিল্প শেখাবার জন্যে শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষার রীতি প্রবর্তনের কালে ভারতীয় অবস্থা-ব্যবস্থার কথা স্মরণ না রেখে তৎকালীন ইংলণ্ডে টেক্‌নিক্যাল স্কুলের অনুকরণের চেষ্টা শুরু হল এই দেশে। দেশীয় কারিগরীর উন্নতি অপেক্ষা নূতন জাতের কারিগর তৈরি করাই এই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল। শিল্পবিদ্যালয়ের তৎকালীন অবস্থা-ব্যবস্থা নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যাবে—

"১৮৫৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে স্কুলের সংশ্লিষ্ট একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় খুলিবার কথা হইয়াছিল কিন্তু এ প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত হয়। সেই বৎসরের আরম্ভে ইংলণ্ড হইতে একজন কাঠের খোদাই শিখাইবার নিমিত্ত শিক্ষক আনা হয়। ঐ বৎসরই স্থির হয় যে স্কুলের তিনটি বিভাগ হইবে—

1. Modelling and Moulding Department.
2. Engraving and Lithographic Department.
3. Department of higher Drawing and Painting.

এতদ্ব্যতীত Photographic painting শিখাইবারও বন্দোবস্ত হয়। ইট গড়ানো শিখাইবার কথা উঠে— স্থির হয় যে স্কুলে এ বিষয় শিক্ষা না দিয়া পাথুরেঘাটায় ("where pottery clay is abundant") ইহার নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র স্কুল খোলা হইবে। এরূপ স্কুল কখন গঠিত হয় নাই। উপরে যে তিনটি বিভাগের কথা বলিলাম নিয়ম হইল যে ছাত্রেরা শিখিবার নিমিত্ত প্রতি বিভাগে আড়াই টাকা করিয়া মাসিক বেতন দিবে। তবে তাহাদিগের কর্তৃক নির্মিত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হইবে তাহার এক অংশ তাহারা পাইবে।

যখন স্কুলগুলি খুলিবার প্রস্তাব হয় তখন স্থির হইয়াছিল যে সাধারণ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। প্রথম দুই বৎসর মাসে২ প্রায় ২০০৲ টাকা চাঁদা উঠিত। তদ্ব্যতীত, এককালীন দান হইতেও কিছু টাকা জমে। দুই বৎসরের পর চাঁদার টাকা অনেক কমিয়া যায়। পরে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য স্কুল প্রতিপালনের প্রধান অবলম্বন হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের সময় গভর্ণমেণ্ট হইতে Grant-in-aid হিসাবে মাসিক ৬০০৲ টাকা দেওয়া হইত।

প্রথম বৎসর যখন স্কুলটি খোলা হয় তখন ২৬৩ জন ছাত্র ভর্তি হয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই

তাহাদের অধিকাংশ ছাড়িয়া দেয়। বৎসরের শেষে ৫৩ জন মাত্র ছাত্র ছিল। গড়ে ৬০ জন করিয়া ছাত্র পড়িত। ১৮৫৪ সালের অগাষ্ট মাসে স্কুলটি স্থাপিত হয়। ১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসের শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৫০৪ জন ছাত্র ভর্ত্তি হয়।

ইউরোপীয়—২
ফিরীঙ্গি—১৩৭
বাঙ্গালী হিন্দু— ৩৫৬
বাঙ্গালী মুসলমান—৭
হিন্দুস্থানী—২
মোট ৫০৪

…ইংলণ্ড হইতে ২৫০৲ টাকা বেতনে ড্রইং ও উড্ এন্‌গ্রেভিং শিখাইবার নিমিত্ত একজন শিক্ষক আনা হয়। ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে Moulding ও Modelling শিখাইবার নিমিত্ত আর একজন ইউরোপীয় শিক্ষক M. Regand নিযুক্ত হয়। সেই সময় হইতেই স্কুলের অবস্থা হীন হইয়া আসে। ১৮৫৮ সালে পরিদর্শক Lt. Williams স্কুল পরিদর্শন করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন : —

I am disposed to recommend Government to undertake the entire management of the school connecting it perhaps in some way with the C. E. College and looking to it to ultimately become a normal school for native drawing masters."[১]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে শিল্পবিদ্যালয়ের তৎকালীন অনিশ্চিত অবস্থা সম্বন্ধে আমরা ধারণা করে নিতে পারি। এই অনিশ্চিত অবস্থা থেকে শিল্পবিদ্যালয়কে উচ্চাঙ্গের আর্টস্কুলে পরিণত করার জন্য অধ্যক্ষ H. N. Lockeএর কৃতিত্ব স্মরণীয়।

অধ্যক্ষ লক আর্টস্কুলে যোগদান করেন ১৮৬৪ সালে। এই সময় থেকে পেন্টিং মডেলিং বিভাগের উন্নতি শুরু হয়। অপর দিকে শিল্পবিদ্যালয়ে যে বিষয়গুলি শেখার ব্যবস্থা ছিল সেগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ অধ্যক্ষ লক স্কুলের শিক্ষা দুটি অংশে ভাগ করলেন। এক দিকে fine art অন্য দিকে applied art। গ্রীক রোমান রেনার্সাঁ যুগের মূর্তির যথাযথ ছাঁচ (plaster cast) ও পাশ্চাত্য আদর্শে মূর্তি চিত্র ইত্যাদি (শেখবার) উপকরণের সাহায্যে শিক্ষা দেবার যে ব্যবস্থা অধ্যক্ষ লক করেছিলেন তার থেকে বড় রকমের কোনো পরিবর্তন ৩০ বৎসরের মধ্যে ঘটে নি। অর্থাৎ ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন অধ্যক্ষ লক। Oil Painting, Water Colour drawing, Cast drawing, Life study প্রতিকৃতি অঙ্কন এগুলি ছিল চিত্রকলা বিভাগের ছাত্রদের শিক্ষার বিষয়।

Modelling বিভাগের ছাত্রদের ছাঁচ নেওয়া বিশেষভাবে শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। Free-hand drawing মেকানিক্যাল drawing আলঙ্কারিক নকশার নকল এগুলি বাধ্যতামূলক ছিল।

---

১ হিন্দুজাতি ও শিক্ষা, দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

Mr. Schaumburg, Ghilardi ও Jobbins এই তিনজনের প্রভাবে আর্ট স্কুলের অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটলেও লকের পরিকল্পনা কোনোদিনই কেউই বর্জন করেন নি। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে আর্টস্কুলে কোনো অধ্যক্ষই দীর্ঘকাল অধ্যক্ষতার কাজ করতে পারেন নি। এই কারণে পরিচালনা এবং শিক্ষানীতির বারে বারে ব্যাঘাত ঘটেছিল। এই অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার ক্ষেত্রে Ghilardi ও Jobbinsএর প্রভাব বিশেষভাবে স্মরণীয়।

পোর্ট্রেট painting, still life ও oil paintingএর করণ-কৌশল অধ্যক্ষ Jobbinsএর আমলে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিল। যে কোনো কারণে হোক modelling বিভাগে অনুরূপ উন্নতি সে সময় হয় নি।

যে সময়ের ইতিহাস আমরা আলোচনা করছি সে সময় আর্টস্কুল সরকারী ও বেসরকারী নানা চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই আর্টস্কুলের উপযোগিতা সম্বন্ধে সরকারী মহলে কোনো-রকম সন্দেহ ছিল না। মিউজিয়াম, বোটানিক্যাল গার্ডেন, এশিয়াটিক সোসাইটি, মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি নানা সরকারী প্রতিষ্ঠানের নক্‌শা চার্ট plaster cast ইত্যাদি আর্টস্কুলের শিক্ষক ও ছাত্ররা সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই চাহিদার কারণে এন্‌গ্রেভিং ও লিথোগ্রাফ বিভাগ সকল সময়ই সক্রিয় ছিল।

আর্টস্কুলের শিক্ষার বিষয় ও বিধিব্যবস্থার আলোচনার সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষাপদ্ধতির যোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। এই কারণে তৎকালীন শিক্ষার প্রণালী উল্লেখ করা দরকার। তৎকালীন আর্টস্কুলের শিক্ষার বিধিব্যবস্থা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তা থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে শিক্ষা শিল্পদৃষ্টির অনুকুল ছিল না। বস্তুরূপে অনুকরণের দক্ষতা অর্জন করানোর দিকেই কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যই যতপ্রকারের ব্যবস্থা হতে পারে তার দিকে অধ্যক্ষ এবং ইংরেজ শিক্ষকরা লক্ষ্য রেখে-ছিলেন। এই কারণে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কোনো অভাবনীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি সে সময়কার শিক্ষকদের। অভ্যাসের পথে কতকগুলি করণ-কৌশল আয়ত্ত করাই ছিল ছাত্রদের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার সহায়ক ছিলেন শিক্ষকরা। সংক্ষেপে মধ্যযুগীয় কারিগরদের মতো কতকগুলি নির্দিষ্ট করণ-কৌশল প্রথানুগতভাবে শিক্ষক থেকে ছাত্রদের মধ্যে প্রবর্তিত হত। প্রায় সকল বিভাগেই ইংরেজ শিক্ষক কোনো-না-কোনো সময় ছিলেন। ক্রমে স্কুলের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা শিক্ষকতার কার্যে নিযুক্ত হন। এ দিক দিয়ে অন্নদাচরণ বাগচীর নাম বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। অন্নদাচরণ প্রথম যুগে শিল্পবিদ্যালয়ে এনগ্রেভিংএর কাজ শিখেছিলেন। পরে অধ্যক্ষ লকের কাছে তিনি বিশেষভাবে ছবি আঁকা শেখেন। এবং কিছুকালের মধ্যে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে আর্টস্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদ পান। অন্নদাচরণ এবং তাঁর অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররাই স্কুলের নানা বিভাগে শিক্ষকের কাজ করেছিলেন। যে ভাবে ইংরেজ অধ্যাপকদের কাছ থেকে তাঁরা শিক্ষা পেয়েছিলেন সেই শিক্ষাপ্রণালী যতদূর সম্ভব তাঁরা অনুসরণ করেছিলেন। ছাত্রদের উৎসাহ বাড়িয়ে তোলার অসাধারণ ক্ষমতা অন্নদাচরণের ছিল। অন্নদাচরণের প্রভাব লক্ষ্য করতে হলে স্কুলের বাইরে তৎকালীন আর্টস্কুলের শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ শিল্পীদের কর্মপ্রণালী অনুসরণ করার প্রয়োজন।

শিল্পবিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকে কলকাতা শহরে এনগ্রেভিংএর Studio লিথোপ্রেস প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ক্রমে আর্টস্কুলের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনভাবে Studio প্রতিষ্ঠা করেন। এইসব Studioতে কিছু কিছু শিক্ষার্থী হাতে-কলমে এন্‌গ্রেভিংএর কাজ শিখতেন। এইভাবে এন্‌গ্রেভিংএর একটি পরম্পরা কলকাতা শহরে গড়ে ওঠে। হাফটোন ব্লক চালু হবার পূর্ব পর্যন্ত এসব কারিগররা বাজারের সকল রকমের ব্লক প্রস্তুত করতেন। এবং জনপ্রিয় ছবিও কিছু কিছু প্রকাশিত হয় এইসব কারিগরদের সাহায্যে। ক্রমে আর্টস্কুলের Fine arts বিভাগের এক দল ছাত্র অন্নদাচরণের নেতৃত্বে আর্টস্টুডিও প্রতিষ্ঠা করেন।

অন্নদাচরণ বাগচী ও তাঁর ছাত্র-সহকর্মীদের চেষ্টায় এই আর্টস্টুডিও দীর্ঘকাল কলকাতাবাসীর নানা চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে লিথো ছাপা ছবি এই স্টুডিওর প্রধান অবদান। আর্টস্কুলে অ্যান্টিক স্টাডির প্রভাব এইসব লিথোগ্রাফে লক্ষ্য করা যাবে। অপর দিকে লিথো পদ্ধতিতে ছাপা ভারতীয় মনীষীদের প্রতিকৃতি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন।

'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' নামে একখানি শিল্পপত্রিকা এই সময় প্রকাশিত হয় অন্নদাচরণের উৎসাহে। স্কেচিং ক্লাব, প্রদর্শনী ইত্যাদির নানা পরিকল্পনার দিকে এই শিল্পীগোষ্ঠী লক্ষ্য দিয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটির অবসান ঘটে বিদেশী বণিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে।

আর্টস্কুলে যাঁরা সে সময় Portrait Painting শিখেছিলেন তাঁদের দিকেই শিক্ষিত সমাজের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। অপর দিকে আর্টস্কুলের কর্তৃপক্ষ এই বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। যদিও শিক্ষক ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ তৈলবর্ণের সাহায্যে প্রতিকৃতি অঙ্কনকে শিল্পের চরম সার্থকতা বলে মনে করতেন। কিন্তু প্রতিকৃতি অঙ্কনের সাহায্যে উপযুক্ত উপার্জন করার সৌভাগ্য সে সময় কম শিল্পীর ভাগ্যেই ঘটেছিল। ধীরে ধীরে ফটো স্টুডিয়ো তথা ক্যামেরা প্রতিকৃতি-শিল্পীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। এই কারণে অল্পকালের মধ্যে Portrait Painting ও ফটোগ্রাফ প্রায় এক স্তরে এসে পৌঁছে এবং বহু ক্ষেত্রে প্রতিকৃতি-শিল্পীরা ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট কাজে লিপ্ত হন। তৎকালীন সমাজের সকল রকমের চাহিদা যুগপৎ আয়ত্ত করার সংকল্প নিয়ে আর্টস্কুলে এইসব শিল্পীরা আর্ট-স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক advertisement agencyর প্রথম স্চনা এই প্রতিষ্ঠান।

আর্টস্টুডিওর দ্বারা প্রকাশিত ছবির চাহিদা সে সময় এতই হয়েছিল যে একদল ইংরেজ বণিক এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন এবং ইংলণ্ড থেকে সস্তায় ছাপা অনুরূপ ছবি বাজারে সস্তায় চালু হবার ফলে আর্টস্টুডিওর অবসান ঘটে।

এন্‌গ্রেভিং, লিথোগ্রাফ, তৈলচিত্র ইত্যাদির পরম্পরা এ দেশে ছিল না। এই কারণে এই শ্রেণীর কারিগর রা শিল্পীদের সঙ্গে সমকালীন প্রথানুগত কারিগরদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু মৃৎশিল্পের একটি পরম্পরা সজীব থেকেছে সকল সময়ই। এই কারণে আর্টস্কুলের শিক্ষাপ্রাপ্ত মৃৎশিল্পীদের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভিন্ন রকমের হয়েছিল। ছাঁচ নেওয়ার নূতন পদ্ধতি মৃৎশিল্পী মহলে সে সময় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রতিকৃতি বা মূর্তি গঠনের ক্ষেত্রে নব্যকালের শিক্ষিত মৃৎশিল্পীদের অবদান যৎকিঞ্চিৎ। বারোমাসের তেরো পার্বণের দেশে প্রতিমা, সং ইত্যাদি নির্মাণের সুযোগ-সুবিধা ছিল যথেষ্ট। এই পথেই নব্যভাবাপন্ন মৃৎশিল্পীরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে বাস্তবতার আদর্শ প্রচার করার প্রয়াস করেছিলেন কখনও স্বেচ্ছায় কখনো পৃষ্ঠপোষকদের চাহিদায়। যে বাস্তব আদর্শ সে সময় শিল্পী ও

রসিক মহলে জনপ্রিয় ছিল তার উত্তম দৃষ্টান্ত কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী। অপর দিকে পূজাপার্বণ উপলক্ষে এইসব শিল্পী কি রকম কৃতিত্বের সঙ্গে বাস্তব আদর্শ অনুযায়ী মূর্তি নির্মাণ করতেন তার একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ এখানে উল্লেখ করা গেল—

"বারোইয়ারি প্রতিমেখানি প্রায় বিশ হাত উঁচু— ঘোড়ায় চড়া হাইল্যাণ্ডের গোরা, বিবি, পরী ও নানাবিধ চিড়িয়া সোলার ফুল ও পদ্ম দিয়ে সাজানো— মধ্যে মা ভগবতী জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি—, সিংগির গা রূপলী গিল্‌টি ও হাতী সবুজ মখমল দিয়ে মোড়া। ঠাকুরুণের বিবিয়ানা মুখ— রং ও গড়ন আসল ইহুদী ও আরমানী কেতা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র দাঁড়িয়ে জোড়হাত করে স্তব কচ্চেন। প্রতিমের উপরে ছোট ছোট বিলাতী পরীরা ভেঁপু বাজাচ্চে— হাতে বাদশাই নিশেন ও মাঝে ঘোড়া সিংগিওয়ালা কুইনের ইউনিফরম্ ও ক্রেষ্ট"।[২]

আর্টস্কুল-প্রবর্তিত শিক্ষার অনুসরণে বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত স্কুলগুলিতে drawing শেখবার ব্যবস্থা শুরু হয় গত শতাব্দীর শেষ অঙ্কে। সে সময় drawing classএর কোনো স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট ছিল না। drawing classএর বিশেষ কোনো সাজ-সরঞ্জামও তখন ছিল না। অপরাহ্নে ড্রিল অভ্যাসের পরে drawing class শুরু হত। প্রায়ই ড্রিল ও ড্রয়িং একই শিক্ষক শেখাতেন। অভিজ্ঞ শিল্পী দৈবাৎ স্কুলে নিযুক্ত হতেন। ইংরাজি কপিবুক থেকে হাতের লেখা অভ্যাস করাই ছিল ছাত্রদের প্রধান কাজ।

স্কেল, divider, কম্পাস ইত্যাদির ব্যবহার শিখতে হত। কম্পাস দিয়ে ছোট বড় নানা আকারের বৃত্ত ডিভাইডারের সাহায্যে নির্দিষ্ট ব্যবধানে লাইন টানা ইত্যাদি ছিল drawing classএর দ্বিতীয় পাঠ। ক্রমে কাগজের উপর যতদূর সম্ভব কড়া পেন্সিলের সাহায্যে পরে পরে বিন্দু সাজিয়ে সেই বিন্দুগুলি জুড়ে সোজা লাইন টানতে হত। সে কালে এই অভ্যাসের নাম ছিল free-hand drawing।

স্কেল কম্পাস বিন্দুর সাহায্য না নিয়ে সোজা লাইন বা বৃত্ত টানতে পারাই ছিল এই শিক্ষার চরম লক্ষ্য।

ছবি আঁকার সহজাত বৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ছাত্ররা অনেক সময় ঘরে বা ক্লাসে পাঠ্যপুস্তক থেকে ছবি নকল করতেন। কল্পনা থেকে ছবি করবার সুযোগের চিহ্নমাত্র ছিল না। সম্ভ্রান্ত পরিবারে drawing painting শেখাবার জন্য বিশেষ শিক্ষক নিযুক্ত হতেন। এ ক্ষেত্রেও অনুলেখন ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। সে সময় মধ্যবিত্ত পরিবারে বিলাতী print মদের বিজ্ঞাপন আঁকা ফ্রেমে বাঁধা আয়না সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ছবি অনেক পরিবারে স্থান পেয়েছিল। এইসঙ্গে রবি বর্মা, বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বা আর্ট স্টুডিয়ো দ্বারা প্রকাশিত ছবির উল্লেখ করতে হয়। শৈশব কাল থেকে এইসব ছবি দেখে নকল করা শিশু ও বালকদের মধ্যে শিল্পশিক্ষা সীমিত ছিল। সংক্ষেপে free activity কথাটি তখনও শিক্ষিত সমাজের কাছে পৌঁছয় নি।

পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালা শিল্পশিক্ষার আদর্শ ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই শিক্ষার প্রভাব সম্বন্ধে যে আলোচনা করা গেল তারই প্রক্ষেপ বোম্বাই মাদ্রাজ লাহোর আর্টস্কুলে আমরা লক্ষ্য করি।

---

২ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত

এই আলোচনার প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈঠকখানা বা বাগানবাড়ি সাজাবার জন্যই পাশ্চাত্য শিল্পবস্তুর প্রয়োজন হয়েছিল। এই প্রয়োজনের সঙ্গে ভেতরবাড়ির তথা অন্তপুরের শিক্ষা বা রুচির কোনো সম্বন্ধ ছিল না। নূতন শহর যেমন বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন তেমনি শিল্পের এই নূতন শিক্ষা ও সাময়িক রুচি জীবনযাত্রার ব্যাপক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এক দিকে পুজো-পার্বণ-ব্রত স্থানীয় দেশীয় কারিগরের অবদানের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়েছে, অপর দিকে বিলাসব্যসনের উপকরণ জুগিয়েছে পাশ্চাত্য শিল্পবস্তু ও শিল্পাদর্শ। যে বস্তুর আদর্শ সম্বন্ধে গত শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজ প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন সে আদর্শ আজ পাশ্চাত্য জগৎ থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছে। এ দেশেও সে আদর্শের কোনো বিবর্তন ঘটে নি। অপর দিকে নূতন উপকরণ বা কারিগরী শিল্পশিক্ষার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে স্থায়ীভাবে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ নূতন উপকরণ ও বিভিন্ন করণ-কৌশল তথা technologyর শক্তিতেই পাশ্চাত্য শিল্প এ দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে, আদর্শের দ্বারা নয়।

শিল্প যে বিলাসিতার আনুষঙ্গিক নয়, জাতীয়-জীবনে শিল্পের গভীর তাৎপর্য এবং সে তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য সমকালীন শিল্পশিক্ষার বিধিব্যবস্থা যে অত্যন্ত প্রতিকূল এই কথাটি প্রথম উচ্চারণ করেন আর্টস্কুলের অন্যতম অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাবেল।

তিন দেশের ভাস্কর্য নরওয়ে-সুইডেন-ডেনমার্ক

কাঞ্চন চক্রবর্তী

শুধু নান্দনিক বিচার দিয়ে শিল্পের কোনো আলোচনা শুরু ও শেষ করা আজকের দিনে অবিধেয়। সমাজ ও অর্থনীতির পটভূমিতে তার বিশ্লেষণ না করলে আধুনিক মনের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। তাই নরওয়ে-সুইডেন-ডেনমার্ক তিন দেশ নিয়ে ভাস্কর্যের মূল বক্তব্যে প্রবেশ করার আগে প্রাসঙ্গিক কতকগুলি আলোচনা করে নেওয়া সংগত মনে হয়।

নরওয়ে-সুইডেন-ডেনমার্ক ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড নয়। কিন্তু এখানকার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যে সারা ইউরোপে এ দেশগুলি একটা স্বতন্ত্র গোষ্ঠী রচনা করেছে। দেশ হিসাবে এক-একটি প্রায় আমাদের বিভক্ত বাংলার সমান, আর লোকসংখ্যা এমনই কম যে সারা দেশ জুড়ে হয়তো কলকাতার মতো জনসংখ্যা পাওয়া যাবে। অথচ অনেক পুরানো ঐতিহ্যের দেশ এগুলি। এই তিন দেশে প্রকৃতি আবার তিনটি রূপে বিরাজিত। নরওয়ে একেবারে উত্তুঙ্গ রাজ্যের অভিসারী, ডেনমার্ক যেন সাগরগর্ভের দেশ, সুইডেন এই দুই প্রান্তের মাঝখানে নিয়েছে মধ্যপন্থাটি। তিন দেশের শিল্প-প্রয়াসে তাই তিনটি স্বর বেজেছে আর সেই তিনটি স্বর পশ্চিমী কনসার্টের মতোই একটা কনকর্ড বা স্বরসাম্য তৈরি করেছে, তিনস্বর তিনখানা হয়ে বাজে নি, একটা সিম্ফনি বা স্বর-বিচিত্রার সৃষ্টি হয়েছে।

ঐতিহ্যের কথা ধরতে গেলে ভাইকিংদের আমল থেকেই শিল্পরুচির সূত্রপাত। ব্যবহারের সমস্ত রকম পাত্রতৈজস থেকে শুরু করে ঢাল-তলোয়ার-বর্শা-বন্দুক পর্যন্ত সব কিছুকেই অলংকৃত করার দিকে ঝোঁক ছিল এদের। এরা ছিল শিকারী-গোষ্ঠী। সমস্ত শিল্পকর্মে তাই পশুমূর্তি নানান ঢঙে নানান ছাঁদে ঘুরে-ফিরে এসেছে। অলংকরণ-প্রিয়তা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানদের রক্তের সঙ্গে তাই মিশে আছে। ভাইকিংদের আমলের পর রোমানেস্ক, গথিক, রেনেসাঁ তাবং বিপ্লবের ঢেউই এখানে এসে পৌঁচেছে। ইটালি-প্রণোদিত নিও-ক্লাসিজম থেকে রিয়ালিজম বা বাস্তব-ধর্মিতায় স্বাভাবিক উত্তরণ হয়েছে। আধুনিক কালের কুলীন-অকুলীন সব ধারার ঢেউও এদের অন্দোলিত করেছে। এই আন্দোলনকে আত্মস্থ করে নেওয়ার মতো দিক্‌পাল শিল্পীদেরও আবির্ভাব হয়েছে সে দেশে।

অর্থনীতির কথা ধরতে গেলে আমরা জানি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া স্বাচ্ছন্দ্যের দেশ। সেখানকার অর্থনীতির কাঠামো হল উন্নত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কৃষিরীতি অথবা বাণিজ্যিক শিল্প এবং সমবায়। বাপ-মা-ছেলে-মেয়েকে নিয়েই কো-অপারেটিভের পত্তন। সবাই মিলে কাজ, সবাই লাভের অংশীদার। সমবায় এ সমস্ত দেশে বিত্তের এমন সহজ ও সুষম বণ্টন সম্ভব করেছে যে সাধারণ কোনো স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান গৃহস্থের কাছে আধুনিক সভ্য জীবনের কোনো চাহিদাই অলভ্য নয়। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া, রাশিয়ার ব্ল্যাক সী'র তীর, ইংলণ্ডের লেকডিস্ট্রিক্ট অথবা ইটালি-স্পেনের রৌদ্র-স্নাত সাগরসৈকতে নিজেদের কেনা হলিডে ভিলায় স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানরা ছুটি যাপন করতে যায়— কালেভদ্রে নয়— বেশ নিয়মিতই! ইউরোপের মধ্যে ক্রয়ক্ষমতা এ দেশে সবচেয়ে বেশি। ও দেশে একবার জুতো-পালিশের খরচে আমাদের দেশে দুবেলার ভুরিভোজ হয়ে যাবে! বিত্তের এই সুষম বণ্টনের জন্যই এ দেশের জাতীয় সংগীত গাইতে

পারে যে— 'অনেক আছে এমন লোকের সংখ্যাও যেমন কম, অল্প আছে তেমন লোকও আমাদের বিরল'।[১]

সামাজিক প্রগতির কথা বলতে হলে সেখানে সাধারণ কৃষকের ঘরের ছেলেমেয়েরাও ঘর থেকে পয়সা খরচ করে ফোক হাই স্কুলে (Folk High School) পড়তে আসে। এ-সমস্ত স্কুল কোনো ডিগ্রী বিতরণ করে না, এখানে পড়াশুনা করলে সমাজে তেমন কোনো বাহবা পাওয়ারও কিছু নেই, গোলামী করতেও সাধারণ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান লালায়িত নয় যে এই স্কুলের ছাপ তাদের চাকরীক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা এনে দেবে। আবার দুচার পয়সা খরচের ব্যাপার নয়। ছ মাসে তারা ঘর থেকে খরচ করে প্রায় পনেরো-বিশ হাজার টাকা। পাঠক্রম মূলতঃ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতিকে নিয়ে। কাজেই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সাধারণ মানুষেরা দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে এমনই ওয়াকিবহাল যে, অন্য যে কোনো দেশের লোক তাদের সঙ্গে আলাপ করে যেমন তৃপ্তি পাবে, এমন বোধহয় আর কোনো দেশেই নয়।

কল্যাণ রাষ্ট্রে (Welfare State) যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য আজকের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিঃসংশয় স্বীকৃতি অর্জন করেছে, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া অনেক দিনই তাদের কথা জেনে নিয়েছে। দাস-ব্যবসায় নিরোধ, বৃদ্ধ বয়সের পেনসন, স্বাস্থ্য-বীমা, সার্বিক অবৈতনিক শিক্ষা, অকর্মণ্যদের প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য— এ সব-কিছুর সুরাহা ও-দেশে হয়েছে আজকে নয়— দেড় শো দু শো বছর আগেই। ডেনমার্ক আবার ইউরোপের প্রাচীনতম রাজ্য। সুইডেনের উপসালাতে ইউরোপের প্রায় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হয়েছিল— সে-ও তো প্রায় পাঁচ শো বছরের কথা!

গোটা প্রথম-মহাযুদ্ধের আঁচ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার কোনো দেশেই লাগে নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও সুইডেন চতুরতার সঙ্গে এড়িয়ে গেছে। ফলে একটা বিরাট ও দীর্ঘ বিপর্যয় ধ্বংসের ছাপ এসব দেশকে আবিল করতে পারে নি।

প্রায় ছয়-মাস-রাত্রির দেশ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় প্রকৃতি দাক্ষিণ্যের পসরা না নিয়ে এলেও সামাজিক জীবনে তারা পেয়েছে অখণ্ড প্রাচুর্য ও নিরাপত্তা। এই সংগ্রাম ও শান্তি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার মনীষাকে দিয়েছে বিচিত্র সৃষ্টিপ্রবণতা। এক-একটি ছোট্ট দেশ, কিন্তু জগৎজোড়া শিল্পীসাহিত্যিক-গুণীজনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

হ্যান্স অ্যাণ্ডারসনের গল্প পড়ে নি এমন শিশু সভ্য দুনিয়ায় কমই আছে এবং এমন ভাষাও নেই যাতে অ্যাণ্ডারসনের 'পরীর গল্প' না অনূদিত হয়েছে। ইব্‌সেনের নাটক শুধু বাঙালী দর্শকের সামনে হাজির হয়েছে এমন নয়, দুনিয়ার তাবৎ রসিকের সঙ্গেই তাদের পরিচয় হয়েছে। শেল্‌মা ল্যাগার্‌লফও দুনিয়ার প্রথম রমণী যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বকে সচকিত করেছিলেন। অভিনয়ের ক্ষেত্রে গ্রেটা গার্বোর মতো কোনো দ্বিতীয়া রমণীকে আজও আমরা পর্দায় দেখতে পাই না। ইন্‌গ্রিড বার্গম্যানের যশও আজ বিশ্বজোড়া। পরিচালক হিসাবে পর্দায় ইংগমার বার্গম্যানেরও জুড়ি মেলা ভার।

এ সমস্ত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, শিল্প-প্রকাশের ক্ষেত্রেও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলি সমান প্রতিভার

---

[১] ডেনমার্কের জাতীয় সংগীতের একটি কলি।

পরিচয় দিয়েছে। শিল্পীদের সামাজিক পরিবেশের কথাই প্রথমে ধরা যাক। সামাজিক স্বীকৃতির জন্য এখানকার শিল্পীদের কোনো আন্দোলন করতে হয় নি। ব্যবহারের এমন কোনো বস্তু-সামগ্রী নেই যেখানে না সে দেশে শিল্পীর স্পর্শ আছে। সমস্ত শিল্পীই বাণিজ্যসংস্থা বা Industryর সঙ্গে জড়িত এবং পৃথিবীর বোধহয় আর কোনো দেশে এমন সহজ ব্যবস্থা নেই যেখানে কাজের সময়ের অর্ধেক শিল্পীরা নিজস্ব স্টুডিয়োর কাজে কাটাতে পারেন। এ দেশের মানুষ বিশ্বাস করে যে, যে চিত্রী বা ভাস্কর নিজস্ব সৃষ্টির সুযোগ ও মনোভাব হারাবেন তিনি শিল্পের ফলিত দিকেও বড়-একটা 'সুবিধা' করে উঠতে পারবেন না। শিল্পীদের যে ধরণের স্বাধীনতার নজির প্যারিস এ শতাব্দীতে সৃষ্টি করেছে, অন্যতর সুযোগ-সুবিধা এ দেশের শিল্পীরা বহুকাল আগে থেকেই ভোগ করে আসছেন।

ইউরোপের প্রান্তদেশ হিসাবে মূল ভূখণ্ডের সমস্ত হাওয়াই এখানে এসে পৌঁছেছে। ক্লাসিক, রোমানেস্ক থেকে শুরু করে বারোক, রোকোকো, কিউবিক, অ্যাবসট্রাক্ট বা বিমূর্ত কেউই বাদ যায় নি। কখনো হয়তো স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া তাকে গণ্ডূষে পান করে নিয়েছে, নিজের ঐতিহ্য ও চিন্তাধারার সঙ্গে তারা একীভূত হয়ে গেছে, কখনো হয়তো তাদের আত্মসাৎ করতে পারে নি এবং অনুকরণের গ্লানি তাকে স্পর্শ করেছে। এ সমস্ত আন্দোলনের বাঞ্ছনীয়তা যেমন এখানকার সৃষ্টিধরদের প্রভাবিত করেছে, মন্দও কখনো কোথাও জমা হয় নি এমন কথাও বলা চলে না। তবে উনবিংশ শতকের শেষ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া নিজস্ব একটি প্রকাশরীতির জন্ম দিয়েছে। এই নিজস্বতার মাঝেই একটি দেশাতীত সুর এসেছে, একটি চিরকালের রূপ বাঁধা পড়েছে এবং বিশেষ করে ভাস্কর্য ও কারুকৃতিতে একটি অভাবনীয় সার্থকতার ইতিহাস রচনা করেছে। মূলতঃ কারুশিল্প (crafts) নিয়ে এ দেশের সাধনা ও সিদ্ধি এমনই সহজ খাতে বইতে শুরু করেছে যে এককথায় বলা বাহুল্য হবে না এই যে কারুকর্মের অভিনবত্ব ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাদের রক্তের সঙ্গে যেন মিশে আছে। তবে একটি বিচিত্র ব্যতিক্রম এই যে, চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানরা আজও তেমন কোনো স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। শুধু মৌলিকত্ব কেন, তেমন কোনো প্রতিভাধর চিত্রীরও আবির্ভাব হয় নি গোটা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়।

এই আলোচনা প্রধানতঃ ভাস্কর্যকে নিয়ে এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ভাস্কর্যকে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের ধারা থেকে পৃথক্ করে আলোচনা করা কঠিন। তবে একটি ক্ষেত্রে এই পার্থক্য অবশ্যই বেশ স্পষ্ট, তা হল উপাদানের ব্যবহার নিয়ে। এ শতাব্দীর শুরু থেকেই আধুনিক যত যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক সব করণ-ক্রিয়া (technology) এ দেশের ভাস্কররা যেমন বহুলভাবে ব্যবহার করেছেন আর কোথাও আজও তেমন হয় নি।

নরওয়ের ভাস্করদের নিয়ে আলোচনা শুরু করি। প্রথমেই যাঁর নাম স্মরণে আসে তিনি হলেন স্টিফেন সিন্‌ডিং। উনবিংশ শতাব্দীর নব-ধ্রুপদবাদ (Neo-classicism) থেকে ভাস্কর্যকে ইনি সহজ বাস্তববাদে (Realism) মুক্তি দিয়েছিলেন। গত শতকের পরিপ্রেক্ষিতে সে দান নগণ্য নয়। তবে ভাস্কর্য যে সর্বসাধারণের জন্য একটি সার্বভৌম শিল্প এ কথাটি সম্যক্ উপলব্ধি করেছিলেন গুস্তাভ ভিগেলণ্ড। নরওয়েতে জন্ম হলেও তিনি শিক্ষা নিয়েছেন ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি খ্যাতনামা শিল্পকেন্দ্রে। প্রথমজীবনে প্রতিকৃতির (Portrait) ভাস্কর হিসাবে যশ অর্জন করেছেন। রেঁদার বলিষ্ঠ বাস্তবতার ছায়াপাত

ঘটলেও প্রতিকৃতি লালিত্যধর্মী ছিল। পরবর্তীকালে ক্লাসিক বা ধ্রুপদী ভাবধারা তাঁর কাজে নানাভাবে ফিরে এসেছে।

কিন্তু ভিগেলণ্ডের বিশ্বজয়ী খ্যাতির কারণ রয়েছে অন্যত্র। তিনি এক সুবিরাট ভাস্কর্যশ্রেণীর স্রষ্টা। মনের দিক থেকে তিনি কল্পধর্মী ছিলেন কিন্তু সে কল্পনা আকাশ-কুসুম রচনায় ব্যাপৃত থাকে নি। অদ্ভুত এক কর্মশক্তি ও মনোবল নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। তার স্বাক্ষর হল অস্‌লোর ফ্রগনার পার্ক। এখানে ফোয়ারার জন্যে ব্রোঞ্জের একটি কাজ দিয়ে ভিগেলণ্ড পার্কের সজ্জীকরণ শুরু করেন। এর পর প্রতি বছরই দু একটা কাজ তাতে যোগ হতে থাকে। জীবনের একটা বৃহৎ অংশই তিনি এখানকার কাজে ব্যয় করেছেন। এই ব্রোঞ্জের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ষাট। পরবর্তী কালে তিনি পাথর নিয়ে কাজ করেছেন নিরলস ভাবে। সেও অন্ততঃ শ খানেক হবে। কোনোটিই আবার একক নয়, Group বা শ্রেণী ভাস্কর্য। পাথরের মধ্যে গ্রানাইট ব্যবহার করেছেন।

ভিগেলণ্ডের মননশীল সত্তা কিন্তু ভাস্কর্যকৃতিতেই নিঃশেষিত হয় নি। ভাস্কর্যকে স্থাপত্য থেকে মুক্ত করে এনে তার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তার পরে ভাস্কর্যের মধ্যে স্থাপত্যের গুণপণা আরোপ করার যে চিন্তা-চেতনা বিংশ শতাব্দীর ভাস্করদের নাড়া দিয়েছে, ভিগেলণ্ড তাদেরই সমগোত্রীয়। ভাস্কর্যের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পার্কটিকে ইনি স্থাপত্যের লীলাক্ষেত্র হিসাবে কল্পনা করেছেন। Tactile বা স্পর্শঘন আবেদন ভাস্কর্যের শেষ কথা নয়। Mass or volume অর্থাৎ ঘনত্ব ও ত্রিমাত্রার ভাঙচুর করেও আধুনিক কালের ভাস্কর্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা চলে না। Space বা শূন্যতার মধ্যে তার স্ব-নির্ভর-স্থিতি ও স্থিতিস্থাপকতা এবং Structure বা অন্তর্লীন গঠন মাত্রিকতার সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি ও মনোজ্ঞতা ছাড়া আজকের দিনের স্থাপত্য গুণধর্মী ভাস্কর্য বা architectonic sculpture গড়ে উঠতে পারে না।

ভিগেলণ্ডের শতাধিক গ্রানাইট ও ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যশ্রেণীর মধ্যে একথাগুলির স্বতঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যাবে। প্রত্যেকের সেখানে সমান মূল্য-মর্যাদা, আবার প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিপূরক। সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক সামঞ্জস্যের সুর। এদেরই কেন্দ্রে উঠেছে প্রায় সত্তর ফুট উঁচু গোলাকার এক স্তম্ভ— আগাগোড়াই একটি পাথর কুঁদে করা। সর্বদেহ জুড়ে নিশ্ছিদ্র উঁচু রিলিফের কাজ। বিষয় হিসাবে এসেছে অগণিত নর, নারী, শিশু— আবরণ দিয়ে শিল্পী তাদের বিড়ম্বিত করেন নি। তারা পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে আছে, কেউ কারও থেকে বিচ্ছিন্ন নয়— কোথাও-বা একের থেকে অন্যের উদ্গতি। সকলের মধ্যে উন্মাদনার একটা ছাপ, সকলেই ব্যগ্র, ব্যাকুল, সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি সকলের মুখে চোখে। ভাস্কর এদের পরিচয় দিয়েছেন 'পুরুষ ও রমণীর দল' নামে। আসল কথাটি দর্শককে বোধহয় খুঁজে নিতে বলেছেন। এঁরা হলেন চিরকালের সংগ্রামশীল মানুষ : স্বাধীনতা, শান্তি ও মুক্তির কামনায় এঁদের এই সংগ্রাম।

চার দিক দিয়ে ঘুরে দেখতে দেখতে ভিগেলণ্ডের অদ্ভুত কর্মশক্তি আর বিচিত্র কল্পমনের কথা বারবার স্মরণে আসবে। প্রতি মুহূর্তেই দর্শকের মনে হবে যে এ তো শুধু ভাস্করের কথা নয়, শুধু সে দেশের কথা নয়, এ তো চিরকালের মানুষের কথা, সর্বদেশেই এ সংগ্রাম চলেছে! ব্যক্তি থেকে ব্যাপ্তিতে পৌঁছে দেওয়ার এই যে পথনির্দেশ এ ভিগেলণ্ডের মধ্যে যত সুপ্রকাশ এমন খুব কম ভাস্করদের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। ব্যক্তিগত ভাবে ভিগেলণ্ডের কাজ এত ভাল লাগে এই জন্য যে তাঁর মানুষেরা সবাই সাধারণ মানুষ, সাধারণ

চাওয়া-পাওয়ার প্রতিমূর্তি। নিত্যকারের লাভক্ষতির হিসাব করা অবৃহৎ মনোবৃত্তির অধিকারী সাধারণ পুরুষ-রমণী এরা। ভাস্কর কোথাও তাদের পরিকল্পিতভাবে মহতোমহীয়ান করতে চান নি। কিন্তু কেমন যেন চিরকালের সুর আছে তাদের মধ্যে— চিরকালের ব্যথা-বেদনা-সংগ্রামের কথা তারা অগোচরে বলে চলেছে।

তাঁর কাজকে বিশেষ কোনো রীতির, বিশেষ কোনো যুগের বা বিশেষ ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত বলা চলে না, তারা স্বকীয়তার সার্থক প্রতীক। এদিক থেকে ভিগেলণ্ড একেবারেই মৌলিক। ভিগেলণ্ড স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার শিল্পীদের মধ্যে সরকারী পৃষ্ঠপোষনা পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি। অস্‌লো মিউনিসিপ্যালিটি তাঁর ব্যবহার ও কাজের জন্য সর্ববিধ সাহায্য ও সুযোগ করে দিয়েছে এবং স্টুডিয়ো হিসাবে একটা বৃহৎ অট্টালিকা তাঁকে দান করেছে। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর স্টুডিয়োটি ভিগেলণ্ড মিউজিয়াম হিসাবে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। নরওয়েতে ভিগেলণ্ড-শিষ্য ও ভাবশিষ্যের সংখ্যা কম নয়। এদিক থেকে ফ্রেডেরিকসন নগর-ভাস্কর্যের নানা সার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

নরওয়ে থেকে যদি ডেনমার্কে যাত্রা করি তাহলে জাতীয় ভাস্কর্যের ব্যাখ্যাতা হিসাবে প্রথমেই পাই বিস্‌সেনের নাম। বিষয়ের দিক থেকে ইনি ভূমধ্যসাগর তীরের মানবীয় রোমান্টিক আদর্শ বাদ দিলেন। ভাস্কর্যে নাটকীয়গুণ প্রয়োগ করার দিকে ঝোঁক দিলেন বেশি। সাধারণ ড্যানিস সৈনিক তার উপজীব্য হল।

কিন্তু ডেনমার্কের প্রান্ত ছাড়িয়ে বাইরের জগতে যিনি মৌলিক কাজের জন্য যশ অর্জন করেছেন তিনি হলেন কাই-নীলসেন। মূলতঃ বাস্তব-ঘেঁষা প্রকাশরীতির লোক ইনি। এঁর সৃষ্টির একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে রমণী। নারী ও শিশুমূর্তির রূপায়ণে ইনি এক বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গির অবতারণা করেছেন। ভিগেলণ্ডের মতো নীলসেনের ভাবনাও সহজ খাতে বয়েছে। বিষয়কে অযথা কৃত্রিমতা দিয়ে ভারাক্রান্ত করেন নি, বলবার ভঙ্গির মধ্যে সহজ সাবলীলতা এসেছে। কিন্তু এই সহজিয়া ভাবের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে ভাস্কর্যের গুণগুলি। ত্রিমাত্রার মধ্যে প্রক্ষোভ বা emotionএর কথা বললে যদি আমাদের কোনো ধারণা আসে, জীবনোষ্ণ পেলবতা বা Plasticity কথাটি আমাদের মনে যে ছাপ রেখে যায় নীলসেনের কাজে তার পূর্ণতার একটি প্রকাশ দেখতে পাই। অন্তর্লীন গঠন-সৌষ্ঠব বা Structure বেশ পরিকল্পিত। বহিরঙ্গের রূপাকার বা Form সেখানে সার্থকভাবেই গতায়াত করেছে।

ভিগেলণ্ডের মতো নীলসেনও মূর্তিকলায় বিরাটত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন; মনে হবে ভাস্কর্য সত্যিই কোনো একজনের শিল্প নয়, একাধিক জনেরও নয়— একেবারে সর্বসাধারণের। তাই নীলসেনের কাজেও ব্যাপ্তির সুরটি রয়ে গেছে। কোপেনহেগেনের ব্লাগার্ডস প্লাড্‌স সড়ক জুড়ে নীলসেনের সার্থক সব কাজ দাঁড়িয়ে আছে। সেখানকার প্রাণোচ্ছল রমণীকুল নীলসেনের বলিষ্ঠ স্বকীয়তার কথা নিঃসংশয়ে জানিয়ে যায়। Vandmoderen বা জলমাতৃকা এবং Arhuspigen বা আরহুসকন্যার মতো একাধিক কাজ তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে।

সেরামিক (ceramic) ভাস্কর্য নিয়ে নানারকমের ভাঙাচোরা যাঁরা করেছেন বা করছেন ও-দেশে, তাঁদের মধ্যে জিন গগা, জেই নীলসেন এবং অ্যাক্সেল সলটো বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজে আজ যিনি সর্বজনের পরিচিত তিনি হলেন রবার্ট জ্যাকবসেন। এঁর লৌহ-ভাস্কর্য (iron

কার্ল মিলেস ॥ সুইডেন

কার্ল মিলেস ॥ সুইডেন

হ্যানসেন-জ্যাকবসেন ॥ ডেনমাক

sculpture) ইউরোপ আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই সুবিদিত। গাবো, পেভ্‌সনারের দেখানো পথটিকে ইনি বেছে নিয়েছেন কিন্তু এঁর কাজে গঠনগত (structure) আবেদন শুধু ব্যাকরণিক বা ব্যাখ্যা-নির্ভর নয়, দর্শকের মনের সঙ্গে তাদের সহজ মিতালি হয়।

আমাদের যাত্রা-শেষের দেশ হল সুইডেন। ভাস্কর্যে সুইডেনের স্বকীয়তা যিনি প্রথম মুদ্রিত করেছিলেন তাঁর নাম জন বরজেসন। বাস্তবধর্মী ভাস্কর হিসাবেই এঁর পরিচয়। তাহলেও রূপাকার বা form নিয়ে এত ভাঙচুর করেছেন এবং প্রকাশ বা expression এর ক্ষেত্রে এমনই ব্যঞ্জনা এনেছেন যে তাঁর নিজস্বতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশের অবকাশ নেই বলা চলে।

তবে ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভায় শীর্ষচূড় সুইডিশ ভাস্কর হিসাবে একটি নামই করা চলে— তিনি হলেন কার্ল মিলেস। জীবনের প্রায় অর্ধেকটাই কাটিয়েছেন মার্কিন দেশে। মিচিগানের ক্র্যানবুক অ্যাকাডেমি অফ আর্টে স্থায়ী ভাস্কর হিসাবে তিনি যে সমস্ত কাজ করেছেন আমেরিকার প্রধান সব শহরেই তার নিদর্শন আছে। অবশ্য সুইডেনের বড় বড় কোনো শহরও সেদিক থেকে বঞ্চিত হয় নি। বিশেষ করে উদ্যান-ভাস্কর্য, মুক্তাঙ্গন-ভাস্কর্য আর ফোয়ারার জন্য মূর্তির অভিনবত্ব নিয়েই তাঁর সমধিক প্রসিদ্ধি।

মিলেস মনে প্রাণে ভক্তিবাদী ছিলেন। তাঁর মূর্তিকলার মধ্যেও ধর্মভীরু আধ্যাত্মিকতার সুরটা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য গভীরে গেলেই তবে সে সুরের রেশ লাগে। বৃহৎ এক হাতের মাঝখানে পুত্তলিকাবৎ ঊর্ধ্বমুখী এক মানুষকে দেখলে আপাতদৃষ্টিতে বোঝা শক্ত হয়ে পড়ে যে ভাস্করের সত্যকারের বক্তব্য কি— কেনই বা সুউচ্চ বেদিকার (Pedestal) উপর হঠাৎ হাতটির আবির্ভাব! কিন্তু অনুধাবন করলেই বুঝতে ভুল হয় না যে বৃহৎ হাতটি বোধহয় বিধাতা অথবা প্রকৃতির প্রতীক! তাঁর হাতে মানুষ ক্রীড়নকমাত্র এবং মানুষের মুক্তির চাবিকাঠিটি বিধাতারই হাতে! আবার ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার কথা এলো বলে তিনি ক্লাসিক বা রেনেসাঁ যুগের প্রকাশরীতিতে বাঁধা পড়েছেন এমন কথাও একেবারেই বলা চলে না ; বরং তাঁর মধ্যে গথিক বা বারোক ভাবটি বেশি স্পর্শ করেছে। কিন্তু তা-ও ভাবনার দিক থেকে এমনই অভিনব এবং স্টাইলের দিক থেকে এতই নতুন যে সেগুলো মিলেসের মৌলিক প্রকাশভঙ্গি বলে মেনে নিতেই হয়। মিলেসের কৃতিত্ব হল এই যে, নানা সময়ে নানা ভাব অনুভাব তাঁকে মাতোয়ারা করেছে এবং তিনি সার্থকভাবে তাদের দাক্ষিণ্য বরণ করে নিয়েছেন। আদিম (আর্কেয়িক) গ্রীক ধারার ছায়ায় তিনি কাজ করেছেন, গথিক ও বারোক ভাবকে তিনি নিজের একটি বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছেন, কখনও বা বিচিত্র ও অদ্ভুত রূপাকৃতির প্রতি তাঁর ঝোঁক গেছে, এমন ধরণের ভাস্কর্যের খেলায় আবার মত্ত হয়েছেন যে পথে তিনিই প্রথম পথিক। ভাস্কর্যের গুণগুলি যেমন সেখানে বিদ্যমান তেমনই বিষয় ও ব্যঞ্জনা-বৈচিত্র্যও সেখানে কম নয়। Meeting of the waters— Fountain কিংবা তাঁর অগণিত Naiads ও Tritonsএর মাঝে সে পরিচয় স্পষ্ট হয়ে আছে।

দশ বারো বছর হল মিলেস মারা গিয়েছেন। জীবনের শেষের দিকে স্টকহল্মের কাছে এক বাগানবাড়ি কিনে তিনি সাজাতে শুরু করেছিলেন। এখানে তাঁর সারাজীবনের প্রায় সমস্ত কাজের প্রতিরূপ স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ 'মিলেসগার্ডেন' ঘুরে এলে শুধু বিভিন্নদেশে বিভিন্ন সময়ে তাঁর কাজের সঙ্গে পরিচয় হবে তা-ই নয়, একই সঙ্গে বোঝা যাবে যে ভাস্কর্যের যেখানে স্থাপনা হচ্ছে সেই পরিবেশ পটভূমি নিয়ে মিলেস কত গভীরভাবে ভেবেছেন। উদ্যানে হোক, মুক্ত প্রকৃতিতে হোক, স্থাপত্যের

পটভূমিতে হোক অথবা শুধু ফোয়ারার সজ্জীকরণে হোক পরিপার্শ্বের উপর নির্ভরশীল যে রূপাকার ও যে মুন্সিয়ানা (form and treatment) তা সহজেই মিলেসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করবে।

মিলেসের কল্পনাপ্রবণ মনটি সৃষ্টির পিছনে নিয়ত বিচরণশীল থেকেছে। তাই পুঙ্খানুপুঙ্খতা (details) পরিহার করে রূপাকার বা Formএর মধ্যে খানিকটা বিমূর্তি (abstraction) এনেছেন যার জন্য সহজেই ভাস্কর্য মণ্ডনধর্মী (decorative) গুণ পেয়েছে অর্থাৎ ক্ষুদ্র হোক বৃহৎ হোক মূর্তিরাজির মধ্যে একটি আপাত বিপুলত্বের মহিমা এসেছে। রূপাকার বা Formকে তিনি নানাভাবে নানাছন্দে নানাগতিতে মুক্তি দিয়েছেন এবং ত্বক ও ঘনত্ব (surface and volume) তাদের পূর্ণ স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই পরিবেশ এবং পরিবেশনা আধুনিক ভাস্কর্যের যে দুটি চাহিদা তার একটা সার্থক সম্মিলন হয়েছে মিলেসের কাজে। তিনি যে রীতি যে ধারা বা যে ছায়াতেই কাজ করুন-না কেন, মিলেসের এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁকে আধুনিক করেছে এবং আজকের দিনের তরুণ ভাস্করদের শ্রদ্ধাবনত স্বীকৃতি পেয়েছে।

মিলেস আর-একটি দিক দিয়ে আধুনিকতার দাবী রাখেন : এমন কোনো উপাদান ছিল না যাতে না তিনি কাজ করেছেন। পাথর, কাঠ, ব্রোঞ্জ এতো আছেই সেরামিক নিয়েও তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এমনকি শামুক পোড়ানো শক্ত চূর্ণেও তাঁর ছেনি হাতুড়ি কাজ করেছে।

উনিশ শো পঞ্চাশোত্তর ভাস্করদের মধ্যে আর্নে জোনস-এর নাম সবচেয়ে পরিচিত। ওঁর কাজ বিমূর্ত গোষ্ঠীর। কিন্তু তার মধ্যে সুরেলা একটা ভাব যেন আছে এবং ভাস্কর্য যে সর্বসাধারণের— তার যে একটা সামাজিক মূল্য আছে তিনি তা স্বীকার করেন।

একেবারে আধুনিক ভাস্করদের মধ্যে নতুন সব বৈজ্ঞানিক কায়দা-কানুন (technology) প্রয়োগের রেওয়াজ হয়েছে। পশ্চিমের সব দেশেই টেকনলজির কিঞ্চিদধিক প্রয়োগ রয়েছে। কিন্তু সুইডেনের ক্ষেত্রে এটি শুধু একটি যুগোপযোগী রেওয়াজ হিসাবেই বিরাজ করছে না— সেখানকার চিন্তন-মনন ও প্রকাশনের সঙ্গে যেন টেকনলজির একটি প্রাণের যোগ স্থাপিত হয়েছে। মূলতঃ বৈজ্ঞানিক কৌশলাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এদেশের একটি নিজস্ব প্রতিভা আছে। এর জন্য কোনো দেশের কোনো পরম্পরার (tradition) কাছেই সে ঋণী নয়। তার ঋণ শুধু তার নিজের দেশের কাছেই। বহুপূর্ব থেকেই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানরা টেকনলজির বহুল ব্যবহার করে আসছে। তাই বৈজ্ঞানিক সব কায়দা-কানুনে তারা শুধু সিদ্ধহস্ত নয় রীতিমত কেতাদুরস্ত (sophisticated) অথচ একেবারে মৌলিক। তাই অন্য দেশে যা সম্ভব হয় নি সুইডেনে তা নিতান্ত সহজেই সাধিত হয়েছে। একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় আমার বক্তব্য আরও স্পষ্ট হবে।

আধুনিক ভাস্করদের মধ্যে এরিক ওলসন পুরোধা। ইনি প্রধানতঃ সেরামিক ভাস্কর্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। সেরামিক্‌সের মধ্যে ইনি কৌশল করে এক বা একাধিক প্রিস্‌ম (prism) জাতীয় প্রতিসরণ খণ্ড অনুপ্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন। বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ধরণের আলোকপাতে ভাস্কর্যখণ্ড ঘিরে একটি বর্ণের যাদুকরী তৈরি হয়! এঁদের বক্তব্য ভাস্কর্যের মধ্যে চিত্রের গুণ একমাত্র প্রকৃতিই দিতে পারেন প্রতিসরণ ফলক ঢুকিয়ে দিয়ে আমরা তো নিমিত্তমাত্র। বর্ণের রামধনু তো তৈরি করছেন প্রকৃতি নিজেই! ওলসনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচয় হয়েছিল একটি সেমিনারে। জিজ্ঞেস

করেছিলাম— তোমার কাজের যেমন রীতি তাতে কি সত্যিকারের ভাস্কর্যের গুণ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না— এসব সস্তা জৌলুসের দিকে তোমাদের নজর কেন ? আমাকে উত্তর দিয়েছিলেন, ভাস্কর্যের গুণ কাকে বলো— এ যুগের ভাস্কর্য-গুণ কি হবে তাতো আজকের ভাস্করদের উপর নির্ভর করছে। ইলেকট্রনিক সংগীত সৃষ্টি করছে নানা সুরের রঙবেরঙ দিয়ে। দু'দশ বছর পরের দুনিয়া হয়তো মানুষ গাইয়ে-বাজিয়ের চেয়ে ইলেকট্রনিকের সংগীতসুধাপানে বেশি পরিতৃপ্তি পাবে ! সেই দুনিয়ায় বসে তখনও কি তুমি ছেনি হাতুড়ি চালাবে না ভাস্কর্যের ঐতিহ্য ভেসে গেল বলে হাহুতাশ করবে !

কেতুগ্রামের কবি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতায় এক পুরানো পুস্তকের দোকানে পুস্তকের সন্ধানে গিয়া সন ১৩৬৪ সালের একখানি মাসিক-পত্র হাতে পাইলাম। নাম 'হিমাচল।' হিমাচলের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় একটি লেখা দেখিলাম— 'কেতুগ্রামের কবি।' লেখাটি আদ্যোপান্ত পড়িলাম। লেখার আরম্ভ এইরূপ—

"তিনি ছিলেন কবি···

সেদিন কবির চোখের জল বাঁধ মানছিল না। "মঈ আঙ্গুল কাটিঞা কলম বানাইনু", চোখের বারিতে কালি" কবি তাঁর ভাবাবেগ নিজস্ব সাহিত্যের ভেতর দিয়ে মা চণ্ডীকে নিবেদন করেছিলেন সমস্ত প্রাণ; যে প্রাণে আছে তাঁর ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, এই প্রাণেই কবি মা চণ্ডীকে পেয়েছিলেন। শুধু পাওয়াই— কখনো কেউ সহজে পায় না। সেই প্রাচীন যুগে— যে যুগে ছিল না সাহিত্য, ছিল না ভাষা সেই যুগেরই কবি তিনি। কবি এমন সাহিত্য করেছিলেন যা আজও অবধি বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতের এক অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েচে। তার অমর লেখনী কখনো ব্যর্থ হয় নি, মুছে যায় নি তাঁর কাব্যসাধনা বাঙ্গালীর অন্তর থেকে।

আজ থেকে কয়েক শ বছর পূর্বে বাঙ্গালা দেশের রাঢ় অঞ্চলে তাঁর বিকাশ হয়। তিনি জাতিতে ছিলেন কুলীন অর্থাৎ উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ, জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার কেতুগ্রামে। প্রথমে চরণদাস ঠাকুর এই নামে ছিল তাঁর পরিচয়। তিনি পূজাদি কার্য করতেন বলে কেতুগ্রামের অধিবাসীরা তাঁকে ঠাকুর বলে সম্বোধন করত। তার পর তাঁর কাব্য-সাধনায় মা চণ্ডীকে তিনি জাগালেন সর্বসাধারণের হৃদয়ের মাঝে। লোকে তাঁকে চণ্ডীদাস বলে অভিহিত করল।

কেতুগ্রামের উত্তরপ্রান্তে চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ছিল এখন তাঁর নামানুযায়ী সেই জায়গাকে গ্রামের লোকে বলে 'চণ্ডীভিটা'। বর্তমানে সেই জায়গা এক ব্রাহ্মণ-পরিবারের কর্তৃত্বাধীনে।"

লেখক অতঃপর উক্ত প্রবন্ধে কেতুগ্রামের আরো প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, চণ্ডীদাস গ্রামের নীচজাতীয়া একটি বিধবাকে বিবাহ করেন। গ্রামের লোক এইজন্য চণ্ডীদাসের উপর বিরক্ত হইলে তিনি স্বপূজিতা বিশালাক্ষীদেবীকে লইয়া কেতুগ্রাম হইতে নানোরে এক বন্ধুর আশ্রয়ে চলিয়া যান। গ্রামের লোক তীর ধনুক লইয়া নানোর আক্রমণ করিলে নানোরের লোক সেই আক্রমণ প্রতিহত করেন। ব্যর্থমনোরথ গ্রামবাসীরা ফিরিয়া আসিয়া পীঠাধিষ্ঠাত্রী বহুলাক্ষীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ততদিনে বিবাদ মিটিয়া গিয়াছিল। কেতুগ্রামের অধিবাসীরা বহুলাক্ষী প্রতিষ্ঠার জন্য চণ্ডীদাসকেই পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বহুলাক্ষী ছিলেন কেতুগ্রামের পাশে মড়াঘাটে। তাঁহাকে গ্রামের মধ্যে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়।

দুর্গাপূজার সময় নানুরে বিশালাক্ষীদেবীর চার দিন বার্ষিক পূজা হয়। এই পূজায় মহানবমী পূজার দিন কেতুগ্রামের তিলিদের পূজাই সর্বাগ্রে গৃহীত হয়। তাহাদের প্রেরিত ছাগই বলিরূপে প্রথম প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই প্রথা আজিও চলিয়া আসিতেছে।

কেতুগ্রামের অধিবাসী শ্রীব্রজগোপাল গুপ্তের নিকট হইতে পত্র পাইয়া কেতুগ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে যাঁহার গৃহে উঠিলাম তাঁহার নাম শ্রীফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। তখন জানিতে পারিলাম, 'হিমাচল' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির লেখক শ্রীমান দীপ্তি ইঁহারই পুত্র। কয়েকদিন থাকিয়া ফণিভূষণের সাহায্যে গ্রাম হইতে হিমাচলে লিখিত প্রবাদের সমর্থনমূলক বহু তথ্যের সন্ধান পাইলাম। গ্রামের বহুলোকে এখনো এই প্রবাদে বিশ্বাস করে। গ্রামে যেমন চণ্ডীদাসের ভিটা আছে, তেমনই বিশালাক্ষী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। কেতুগ্রামে ভূপাল নামে এক রাজা ছিলেন। ভূপালের পুত্রের নাম চন্দ্রকেতু। ভূপাল পুত্রের নামে কেতুগ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামখানি প্রকাণ্ড, রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপ এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভূপাল ছিলেন তিলি জাতি। তাঁহারই বংশধরগণই আজিও বিশালাক্ষীর পূজা পাঠাইয়া দেন নবমী পূজার দিন।

এই গ্রামে চণ্ডীদাসের বংশে নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন নামে এক পণ্ডিত বাস করিতেন, তিনি গণমার্তণ্ড নামে ব্যাকরণের গণপাঠের বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে নৃসিংহ আত্মপরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—(প্রবাদের চণ্ডীদাস যে কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন সে কথা এখনো লোকে ভুলিতে পারে নাই। ভট্টাচার্য ইঁহাদের পাণ্ডিত্যের উপাধি)

ধীর শ্রীল নৃসিংহজে সুখ কূলে জাত কবিনাং রবি
র্বিদ্যায়া মনুকম্পয়া বিতরণে মহ্যাং সুপর্ণ দ্রুমঃ।
নানাশাস্ত্র বিচার চারু চতুরোহলঙ্কার টীকা কৃতি
ভট্টাচার্য্য শিরোমণির্বিজয়তে শ্রীচণ্ডিদাসাভিধঃ।

এই গণমার্তণ্ডে প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে নৃসিংহ একে একে পূর্বপুরুষগণের পরিচয় দিয়াছেন। চণ্ডীদাসের পাঁচ পুত্রের মধ্যে একজনের নাম গোপীনাথ। তৎপুত্র মাধব, মাধবের পুত্রের নাম নয়ন, নয়নপুত্র কুমুদ, কুমুদতনয় শ্রীহরি। শ্যামাদাস বিদ্যাবাগীশ শ্রীহরির আত্মজ। বিদ্যাবাগীশের পুত্র গোপাল সার্বভৌম। গোপালের তিন পুত্রের অন্যতম কুশল তর্কভূষণ। কুশলের পুত্র নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন। কুশলের পরিচয় দিয়াছেন নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন—

চণ্ডিদাস কুলাব্জার্ক কুশলস্তর্কভূষণঃ।
নৃসিংহ তৎসুতং বক্তি গণবৃত্তি নতং হরি ॥

চণ্ডীদাসের সময় হইতেই এই বংশ হরিপরায়ণ। কেতুগ্রামে কয়েকবারই গিয়াছি, নৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের ভিটা এবং তাঁহার টোলবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আসিয়াছি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস কেতুগ্রামের চণ্ডীদাসই নান্নুরের বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাস এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তাঁহারই রচনা। কেতুগ্রাম হইতে আমি একখানি দলিল সংগ্রহ করিয়াছি। তারিখ ১২১৮ সাল ৪ঠা অগ্রহায়ণ। এই দলিলে তর্কপঞ্চাননের পৌত্র শ্রীজগদানন্দ ভট্টাচার্য একটি পুষ্করিণী খরিদ করিতেছেন। বারশত আঠার সালের পূর্বেই তর্কপঞ্চাননের পুত্র রমাকান্ত ভট্টাচার্য ও তর্কপঞ্চানন উভয়েই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন দলিল হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চণ্ডীদাসের পিতার নাম অশ্বপতি। চণ্ডীদাস ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। এই দিক দিয়া এবং তর্কপঞ্চানন হইতে দশম পুরুষ পূর্বের কাল গণনা করিয়া চণ্ডীদাসের সময় খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের

মধ্যভাগে অনুমান করিতে হয়। আমি তাঁহাকে শ্রীমহাপ্রভুর অব্যবহিত পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করি। পূর্বেই বলিয়াছি ভূপাল জাতিতে তিলি ছিলেন। কেতুগ্রামে তাঁহার বংশধরগণ বর্তমান রহিয়াছেন। ভূপাল রাজবংশের সঙ্গে বিশালাক্ষীর পূজার সম্বন্ধ ছিল। রাজবংশধরগণ আজিও এই সম্বন্ধ বজায় রাখিয়াছেন। কেতুগ্রামের বহু পুরাতন প্রবাদে অবিশ্বাসের কোনো হেতু নাই। আধুনিক গবেষকগণ গিয়া কেহ এই প্রবাদ সৃষ্টি করেন নাই। কেতুগ্রামে নৃসিংহ তর্কপঞ্চাননকে পাইতেছি। এবং তাহার প্রদত্ত বংশতালিকার সঙ্গে কুলগ্রন্থ কথিত কৃত্তিবাসের বংশধারার ঐক্য রহিয়াছে। সুতরাং চণ্ডীদাস যে কেতুগ্রাম হইতেই নান্নুরে গিয়া বাস করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই।

কৃষ্ণকীর্তন লইয়া আমি সন ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত বীরভূম বিবরণে (তৃতীয় খণ্ড) বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলাম। আমি এই আলোচনায় চণ্ডীদাসের কবিত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি যে কৃষ্ণকীর্তন মহাকবির রচনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কৃষ্ণকীর্তন হইতে বহু পদ উদ্ধৃত করিয়া আমার মতের সমর্থক প্রমাণ দিয়াছিলাম। বইখানির তেমন প্রচার না হওয়ায় আমার অভিমত শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। বীরভূমবিবরণ তৃতীয় খণ্ডের রচনার সময় আমার ধারণা ছিল কৃষ্ণকীর্তনের কবিই পদাবলী-প্রচলিত দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতার পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণকীর্তন পাঠ করিয়া এখন সে মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে দ্বিজ চণ্ডীদাস পৃথক ব্যক্তি, এবং তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক কবি। তবে এ কথা ঠিক যে দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে কৃষ্ণকীর্তনের বংশীখণ্ডের এবং রাধাবিরহখণ্ডের প্রচুর প্রভাব আছে। কৃষ্ণকীর্তনের সুর—

বড়ায়ি গো কত দুখ কহিব কাহিনী।
দহ বুলি ঝাঁপ দিল সে মোর শুধাইল লো
মুই নারী বড় অভাগিনী॥

অথবা

সুখ দুখ পাঁচ কথা কহিতে না পাইল।
বালিয়ার জল যেন তখনই পলাইল॥

একেবারে দ্বিজ চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের বাঁধা সুর। বংশীখণ্ডের 'কেনা বাঁশী বাএ বড়াই কালিনী নঈ কূলে'— বুক ভাঙা আকুলতায় দ্বিজ চণ্ডীদাসকেও অতিক্রম করিয়াছে।

কৃষ্ণকীর্তন লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা আজিও ইহার সম্পূর্ণ মর্ম বুঝিতে পারেন নাই। আমি তাঁহাদের অবগতির জন্য কয়েকটি সূত্রের সন্ধান দিতেছি।

১. জয়দেবের অনুসরণে কৃষ্ণকীর্তন মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের যে লৌকিক ধারা,— তাহার মধ্যে দুইটি ধারা প্রধান। প্রথম ধারা বিরুদ্ধপক্ষের ভক্তকে নানা দুঃখ কষ্ট দিয়া আপনার মতের সুদৃঢ় সমর্থকে রূপান্তরিত করা। উদাহরণ মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর, চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগর। দ্বিতীয় ধারায় বিরুদ্ধপক্ষের অভক্তকে বধ করিয়া আপন ভক্তের বিজয় ঘোষণা। যেমন ধর্মমঙ্গলের লাউসেন ধর্মের কৃপায় কালীভক্ত ইছাই ঘোষকে বধ করিয়া ধর্ম-ঠাকুরের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্তন প্রথম ধারার অন্তর্গত কাব্য। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগর হেঁতালের বাড়ি মারিয়া মনসার ঘট ভাঙিয়া দিয়াছেন। ধনপতি চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্তনে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত ফুল পান বড়ায়ি-এর হাত হইতে লইয়া রাধা দু পায়ে

দলিয়াছেন। বড়ায়িকে চড় মারিয়াছেন। কৃষ্ণ নানা ছলে কৌশলে শ্রীরাধাকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। মনসামঙ্গলে, চণ্ডীমঙ্গলে, চাঁদ সদাগর ধনপতি সদাগর পুরুষ। কৃষ্ণকীর্তনে রাধা রমণী। সুতরাং আত্মসাতের পদ্ধতি পৃথক হইতে বাধ্য।

২. কৃষ্ণকীর্তনে 'বাণখণ্ড' সকলেই দেখিয়াছেন। কিন্তু বাণখণ্ডের প্রকৃত রহস্য কেহই উদ্ঘাটন করেন নাই। বহুদিন পূর্বে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় আমি 'রসশাস্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম— দেখিতেছি সে প্রবন্ধও কাহারো দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। আদিরসের দুই ভাগ, বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ চারি ভাগে বিভক্ত। পুরাতন মতে এই চারি ভাগ—পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ। করুণাখ্য বিপ্রলম্ভের লক্ষণ "যূনো রেকতরস্মিন্ গতবতী লোকান্তরং পুনর্লভ্যে"। যুবক যুবতীর দুইজনের মধ্যে একজন লোকান্তরিত হইবেন এবং পুনরায় সেই দেহেই তাহাদের মিলন ঘটিবে। ইহাই করুণাখ্য বিপ্রলম্ভ। লোকান্তর অর্থে মৃত্যুও হইতে পারে, কিংবা অন্য কোনো লোকও হইতে পারে। কাদম্বরীতে চন্দ্রাপীড়ের মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু দেহটি অবিকৃত ছিল এবং পুনরায় সেই দেহেই কাদম্বরীর সঙ্গে চন্দ্রাপীড়ের মিলন ঘটিয়াছিল। লোকান্তর-শকুন্তলাকে তাহার মাতা মেনকা অপ্সরাতীর্থ হইতে অপহরণ-পূর্বক কশ্যপের আশ্রমে লইয়া যান। শকুন্তলা সেখানেই ছিলেন। স্বর্গ হইতে ফিরিবার পথে মহারাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে তাঁহার সেইখানেই পুনর্মিলন হইয়াছিল। কৃষ্ণকীর্তনের বাণখণ্ডে এই করুণাখ্য বিপ্রলম্ভ বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনে পূর্বরাগ, মান, করুণ এবং প্রবাস আছে। একেবারে বিপ্রলম্ভের সম্পূর্ণ বর্ণনা।

বাণখণ্ডে কৃষ্ণ বড়ায়িকে বলিতেছেন— আমি রাধাকে মন্মথ বাণ মারিব। বড়ায়ি কৃষ্ণকে সমর্থনপূর্বক বিশেষরূপে উত্তেজিত করিতেছেন। বলিতেছেন—

হান পাঁচবাণে তাক না করিহ দয়া।
গোয়ালিনী রাধার খণ্ডুক সব মায়া॥

কথা কয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সব মায়া খণ্ডনের অর্থ— সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি নহে। তিনি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী এই স্মৃতি তাঁহার জাগ্রত হউক ইহাই নিগূঢ়ার্থ। বড়ায়ি বলিতেছেন—

ত্রিজগতে নাথ তোহ্মে দেব বনমালী।
তোহ্মাকে না করে ভয় রাধা চন্দ্রাবলী॥
উলটিঞা সে যাচু তোহ্মাকে যতনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে॥

এই বাণখণ্ড হইতেই কৃষ্ণকীর্তনের ধারা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বংশীখণ্ডে ও রাধাবিরহে শ্রীরাধাই কৃষ্ণকে প্রার্থনা করিয়াছেন। আর পূর্ব পূর্ব পালায় যে সমস্ত কথা বলিয়া রাধা কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন— কৃষ্ণ রাধাকে ঠিক সেই সেই কথা বলিয়াই গালাগালি সুদ সহ শোধ করিয়া দিয়াছেন। বাণ মারিবার পূর্বে বড়ায়ি রাধাকে কৃষ্ণের নিকট যাইতে বলিয়াছেন, রাধা সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। আবার বাণের ভয়ে কৃষ্ণকে কত যে কাকুতি করিয়াছেন রাধা, তাহার সংখ্যা হয় না। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে ফুলশরাঘাতে মারিয়া ফেলিয়াছেন। রমণী হত্যার জন্য বড়ায়ি তাঁহাকে বাঁধিয়াছেন। সখীগণ কত কটূক্তি করিয়াছেন। শেষে কৃষ্ণ রাধাকে জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন।

লক্ষ্য করিবার বিষয়— কৃষ্ণকীর্তনে আক্ষেপানুরাগের পদ আছে। কিন্তু প্রেমবৈচিত্ত্য নাই। আর সুদূর প্রবাসের পর যে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ রসশাস্ত্রসম্মত, চণ্ডীদাস এই বাণখণ্ডেই রাধার চেতনালাভের পর তাহার বর্ণনা দিয়াছেন।

৩. কৃষ্ণকীর্তন ঝুমুর গানের ধারায় রচিত। সংগীতদামোদরে ঝুমুরের সংজ্ঞা—

প্রায়ঃ শৃঙ্গার বহুলা মাধবীক মধুরা মৃদু।
একৈব ঝুমরী লোঁকে বর্ণাদি নিয়মোজ্‌ ঝিতা॥

শৃঙ্গার রস বহুলতা, মধুজাত সুরার ন্যায় মৃদুতা এবং বর্ণাদির কোনো নিয়ম না থাকা ঝুমুরের লক্ষণ। 'বর্ণাদি নিয়ম নাই অনিবদ্ধ গীতে।' সুতরাং ঝুমুর অনিবদ্ধ গীত। শ্রীমান রাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁহার সংগীত-সমীক্ষা গ্রন্থে অনুমান করিয়াছেন প্রাচীন ঝোম্বড়াই এখন ঝুমুর নামে পরিচিত। তিনি বলিয়াছেন প্রবন্ধ গানের তিন বিভাগ— সূড়, আলি, বিপ্রকীর্ণ। শুদ্ধ সূড় হইতেছে আটটি। সিংঘ ভূপাল ইহাদের মার্গসূড় বলিয়াছেন। এইগুলি হইতেছে এলা, করণ, ঢেঙ্কী, বর্তনী, ঝোম্বড়া লম্ভ, রাসক এবং একতালী। ঝোম্বড়া প্রবন্ধে উদ্‌গ্রাহের প্রথমার্ধটি দুইবার ও উত্তরার্ধটি একবার গাওয়া হয়। তাহার পর বিকল্পে গমক সংযুক্ত প্রয়োগাত্মক মেলাপকের অনুষ্ঠান হয়। অবশ্য এটি যে হইবেই এমন কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। কল্লিনাথ বলিয়াছেন এটি একেবারে অক্ষরবর্জিত প্রয়োগ হইবে এমন নহে। কিছু বাচক পদযুক্ত হইতে পারে। ইহার পরে দুইবার ধ্রুব অংশটি গাওয়া হয়।

ঝোম্বড়া প্রবন্ধে দশটি তাল প্রশস্ত। কল্লিনাথ বলিয়াছেন এই দশটির মধ্যে যে কোনো একটিকে অবলম্বন করিয়া গাওয়াই নিয়ম।…সবগুলি একত্র করিয়া ঝোম্বড়ার সংখ্যা হইল নব্বুই। আরও কয়েকটি ভেদ যেমন মাতৃকা, শ্রীপতি, সোম, রুচিত, সঙ্গত প্রভৃতি অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় শার্ঙ্গদেব ইহাদের পরিচয় দেন নাই।

বিশেষ বিনিয়োগ অনুসারে এই নব্বুইটি ঝোম্বড়ার তেরটি করিয়া ভেদ হইতে পারে। যথা— ব্রহ্মা, চক্রেশ্বর, বিষ্ণু, চণ্ডিকেশ্বর, নরসিংহ, ভৈরব, হংস, সিংহ, সারঙ্গ, শেখর, পুষ্পসার, প্রচণ্ডাংশু।

উপমা, রূপক, শ্লেষ এই তিনটি অলংকারে বদ্ধ ঝোম্বড়ার নাম ব্রহ্মা।…সম্ভবত অধুনা প্রচলিত ঝুমুরের আদিরূপ এই ঝোম্বড়া। ইহারই একটি শ্রেণী ক্রমে ঝুমুর নামে রূপান্তরিত হইয়াছে।

—'সংগীত সমীক্ষা' পৃ ১৬৫-৬৬

আমার অনুমান কৃষ্ণকীর্তন 'ব্রহ্মা' ঝোম্বড়ার অন্তর্ভুক্ত। পদাবলীতে আছে— 'ঝুমরী গাহিছে শ্যাম বাঁশী বাজাইয়া'। 'ঝুমরী দাদুরি বোল' ইত্যাদি। ঝুমুর গানের আর-একটি লক্ষণ সম্পর্ক পাতাইয়া দুই দলে গান আরম্ভ করে। কৃষ্ণকীর্তনে প্রথম দিকে যেমন রাধিকা মামী হইয়া ভাগিনেয় কৃষ্ণকে চাপান দিয়াছেন— দ্বিতীয় দিকে তেমনই কৃষ্ণ ভাগিনেয় হইয়া মাতুলানী রাধাকে উত্তর দিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যে চাঁদসদাগর মনসাদেবীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সদাগর চণ্ডীকে যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিতে সংকোচবোধ করেন নাই। কৃষ্ণকীর্তনের বৈশিষ্ট্য— রাধা এবং কৃষ্ণ উভয়েই উভয়কেই যাহা খুশি বলিয়াছেন। ইহাই ঝুমুরের সম্পর্ক পাতানোর উদাহরণ। পদের মধ্যেও ঝুমুর গানের ধারা অতি সুস্পষ্ট।

যশোদার পো অ আহ্মে হাথে ধরী বাঁশী।
তোমাকে দেখিল রাধা অধিক রূপসী। দানখণ্ড ॥

যশোদার পো অ আহ্মে নাম গোবিন্দ।
তোর রূপ দেখিঞা চক্ষুত নাই সে নিন্দ ॥ দানখণ্ড ॥

এই যে বিনা কারণে নিজের পরিচয় দিয়া রাধাকে তাহার রূপের কথা বলা, আপন মনের অবস্থা জানানো— ইহা ঝুমুর গানের বিশিষ্ট লক্ষণ। বাণখণ্ডে

তিরিবধিয়া কাহ্নাঞি ল
কাহ্নাঞি মোরে নাহি ছো।
মোরে নাহি ছো কাহ্নাঞি বারানসী যা।
অঘোর পাপে তোর বেয়াপিল গা।

ইহা ঝুমুরের নাচের ছন্দ।

বড়ায়ির নিকটে রাধার সমস্ত পরিচয় জানিয়াও কৃষ্ণ রাধাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তুমি কে, কোথায় যাইতেছ। রাধা উত্তর দিতেছেন (দানখণ্ড) রাধা বড়ায়িকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন বাঁশি কেমন, কৃষ্ণ কেমন করিয়া বাঁশি বাজায়। বড়ায়ি উত্তর দিয়াছেন। (বংশীখণ্ড) বাঁশির গান শুনিয়া রাধা রন্ধনে বিষম গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন, বড়ায়িকে এই কথা বলিলে বড়ায়ি বলিলেন, এক রাঁধিতে গিয়া অন্য রাঁধিয়াছ বলিতেছ, সেটা কি রকম তাহার তালিকাটা শোনাও, রাধা অমনি বলিতে আরম্ভ করিলেন— আম্বলে বেশর দিয়াছি ইত্যাদি, এ সমস্তই ঝুমুর গানের ধারা। বৃন্দাবনখণ্ডে ফুলের সঙ্গে রাধার দেহটিকে মিলাইয়াছেন। বাণখণ্ডে রাধা স্বর্গের দেবতাদের ধরিয়া নিজের দেহরক্ষা করাইয়াছেন। লক্ষ্য সাধারণ শ্রোতা।

কবি জয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দের অধিষ্ঠানভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন— শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান এই মহাসত্যের উপরে। তাহার পরও মাঝে মাঝে সর্গান্ত শ্লোকে অথবা সর্গের মধ্যে কিংবা সর্গারম্ভে বার বার আমাদিগকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। চণ্ডীদাসও কৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডে কৃষ্ণাবতারের কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণের সম্ভোগ জন্য লক্ষ্মীদেবীই দেবগণের প্রার্থনায় রাধারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন সে কথাও বলিতে বিস্মৃত হন নাই। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ শ্রীরাধাকে আপন পরিচয় দিয়াছেন।

আমিই বেদ উদ্ধার করিয়াছি মীনরূপে। বরাহরূপে ধরণীর উদ্ধার সাধন করিয়াছি, রামরূপে রাবণের হন্তারক আমি, কত বারই তো বলিয়াছেন। কিন্তু রাধা একটিবারও কৃষ্ণের কথা বিশ্বাস করেন নাই। শ্লেষের সঙ্গে কটুবাক্য বলিয়া বার বার সে কথায় উপেক্ষা করিয়াছেন। রাধা বলিলেন—

বল না কর মোরে কাহ্নাইল
আল বচন আহ্মার শুন।
দেবধরম কি সহিব তোরে
এহাত হৃদয়ে গুণ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন—

তবেসিঁ ধরমের ভয় রাধা ল
আল যদি মোএঁ হরোঁ পর নারী।
আপন অঙ্গের লখিমী হইআঁ
তোহ্মে না চিহ্নসি অনন্ত মুরারী॥

কৃষ্ণকীর্তনের দুই একটি ভিন্ন বাকি সমস্ত পালাগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই ধরনের প্রত্যেক পালাতেই এমন-সব উত্তর-প্রত্যুত্তর আছে যেন ইহার পূর্বে রাধা-কৃষ্ণের পরস্পর পরিচয় ছিল না। কিংবা পূর্বে তাহাদের মধ্যে মিলন ঘটে নাই। যমুনাখণ্ডে কবি নিজেই বলিয়া দিয়াছেন যেন পরিচয় নাই, পরিহাসরসে দেব দামোদর সেইভাবেই রাধার সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। রাধাও সঙ্গে সঙ্গে যথাযোগ্য উত্তর দিয়া চলিলেন। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি কৃষ্ণকীর্তনের সংস্কৃতগুলি কবির স্বরচিত। শ্লোকগুলির মধ্যে কবিত্বের পরিচয় আছে।

বৃন্দাবনখণ্ডে শ্রীরাধার আত্মনিবেদন চরম উৎকর্ষের শেষ প্রান্তে পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। গোপীগণকে কোন্ উপায়ে ভুলাইতে হইবে, শ্রীরাধাই কৃষ্ণকে তাহা বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু রাধার পরামর্শ অনুসারে গোপীগণকে সন্তুষ্ট করিয়া কৃষ্ণ যখন রাধা সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, তখন রাধাই তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া ফিরাইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ "যদি কিছু বোল বোলামি" জয়দেবের "বদসি যদি" গান করিয়া রাধার মান ভাঙাইতে না পারিয়া রসান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বৃন্দাবনের ফুলের ডাল ভাঙিয়া গাছ নষ্ট করিবার অপবাদ দিলেন। রাধার অন্তরে অভিমানের পরিবর্তে ক্রোধ আসিয়া দেখা দিল। সুযোগ বুঝিয়া কৃষ্ণ পুনরায় রাধার স্তুতি করিতে লাগিলেন। রাধার অন্তর হইতে ক্রোধ গেল, বলিলেন—

তোমার আহ্মার দুই মনে।
এক করি গাস্থিল মদনে॥
তার অনুরূপ বৃন্দাবনে।
তোর বোল না করিব আনে॥
বিধি কৈল তোর মোর নেহে।
একই পরাণ এক দেহে॥
সে নেহ তিয়জ নাহি সহে।
সে পুনি আহ্মার দোষ নহে॥

বিশ্বের প্রেমিকা নায়িকাগণের কণ্ঠে দেশে দেশে যুগে যুগে এই বাণীই উচ্চারিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস এই শাশ্বত বাণীরই গীতি কবি। ডক্টর শ্রীমান সুকুমার সেন বলিয়াছেন, পাত্র-পাত্রী ইহাতে তিনটি মাত্র—কৃষ্ণ, বড়ায়ি, রাধা। তিনটি চরিত্রই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে; তন্মধ্যে রাধা-চরিত্রের বিকাশে ও পরিণতিতে কবি যে দক্ষতা ও চাতুর্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিতীয় রহিত। তাম্বুলখণ্ডে যে চন্দ্রাবলী রাহীর সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হইল সে সংসার অনভিজ্ঞা রূঢ় অথচ সত্যভাষিণী অশিক্ষিতা গোপবালিকা। কিন্তু কবি প্রত্যেক ঘটনায় অসামান্য

কৌশলে এই মূঢ় বালিকাচিত্তের উন্মেষ ও জাগরণ দেখাইয়া যখন পাঠককে শেষ পালায় লইয়া আসিলেন তখন দেখি সেই গোপকন্যা কখন যে শাশ্বত রসিক চিত্ত বলভীর প্রৌঢ় পারাবতী শ্রীরাধায় পরিণত হইয়াছেন, তাহা জানিতেও পারি নাই।

ডক্টর সেনকে আমি এজন্য অজস্র আশীর্বাদ জানাইয়াছি। কিন্তু আমার মতে চণ্ডীদাসের রাধা মূঢ়া গোপবালিকা নহেন। তিনি রসশাস্ত্রসম্মত সর্বগুণান্বিতা নায়িকা। বাহু তুলিলে কেশ বন্ধন ছলে প্রভৃতি কৃষ্ণের উক্তির তিনি যে তীক্ষ্ণ সরস উত্তর দিয়াছেন, তাহা হইতেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। অনেকে আবার কৃষ্ণচরিত্রের কোনো মহিমাই বুঝিতে পারেন না। এই ত্রিদলের নাথ দেবরাজকে দেখিতে জানিলে এবং মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুসরণ করিতে পারিলে, তাঁহারা দেখিতেন যে মহাকবির হাতে ভক্তের ভগবান যথাযথরূপেই উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছেন। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড হইতে ভারখণ্ড ছত্রখণ্ড প্রভৃতি প্রতিটি খণ্ডেই ইহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাবিরহের চাতুর্মণ্য আছে, আবার বাঁশী শুনিয়া রাধার চারি প্রহর রাত্রির ও স্বপ্নদর্শনে চারি প্রহর রাত্রির আকুলতার পরিচয় আছে। ছন্দের দর্পিত গতি এবং ভাষার পারিপাট্যও লক্ষণীয়। কৃষ্ণকীর্তন কবিত্বপূর্ণ একখানি গীতিকবিতার সম্পুট।

কেতুগ্রাম পালরাজত্বের সমসময়েই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ধমান সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনকালে কেতুগ্রাম হইতে একটি চামুণ্ডা মূর্তি লইয়া গিয়াছিলেন। মূর্তিটি সাহিত্য পরিষদ্ মন্দিরে আছে।

দ্বিজ চণ্ডীদাসকে আমি বাসুদেব সার্বভৌমের সর্বকনিষ্ঠভ্রাতা বলিয়া মনে করি। বিশারদের চারি পুত্র— সার্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি, কৃষ্ণানন্দ এবং চণ্ডীদাস। আমার অনুমান, এই চণ্ডীদাসই দ্বিজ ভণিতার পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর সমকালীন ব্যক্তি। কেতুগ্রামের স্তূপগুলির প্রতি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও আধুনিক অসমীয়া নাটক

জীবন চৌধুরী

১

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যেদিন রচিত হবে সেদিন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে একটি বিশেষ মূল্যবান ঐতিহাসিক আসনের অধিকারী হবেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আন্তঃ-প্রাদেশিক সাহিত্যিক লেনদেনের ইতিহাসে তাঁর দান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় রচিত নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিবর্তনে তাঁর প্রেরণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, অদ্যাবধি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহলের কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা যায় নি। অবশ্য হিন্দী নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেরণা সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা হয়েছে।[১] কিন্তু এটি ব্যতিক্রম মাত্র। বর্তমান প্রবন্ধে আধুনিক অসমীয়া নাটকে, বিশেষভাবে ঐতিহাসিক নাটকে, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেরণা কোন্ পথে ফলপ্রসূ হয়েছে সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। বলা বাহুল্য, এ আলোচনা পূর্ণাঙ্গ নয়, ইঙ্গিতবাহী মাত্র।

২

জনৈক খ্যাতিমান অসমীয়া সমালোচক[২] মন্তব্য করেছেন: "The historical melodramas by Dwijendralal Roy of Bengal are also partly responsible for the growth and development of the chronicle plays in Assamese"। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক 'melodrama' কি না সে আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু তা যে অসমীয়া নাটককে নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করেছে ('partly' না বলে 'greatly' বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়) তাতে সন্দেহ নেই। এখন আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেরণার বিভিন্ন রূপ বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করব।

ক. নাটকীয় পরিস্থিতি

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক থেকে বহু সুবিদিত নাটকীয় পরিস্থিতি অসমীয়া নাটকে প্রবেশ করেছে; কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল:

বাংলা নাটকে

স্থান—সিন্ধু-নদতট; দূরে গ্রীক্ জাহাজ-শ্রেণী। কাল—সন্ধ্যা।

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এ আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘন-কৃষ্ণ মেঘরাশি গুরু-গম্ভীর-গর্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে; আমি নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী ধবল তুষারমৌলি নীল হিমাদ্রি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদনদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি বিরাট স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা কর্চ্ছে।—

—চন্দ্রগুপ্ত: ১/১, পৃ ১

এই পরিস্থিতিটি বিভিন্ন অসমীয়া নাটকে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। লক্ষণীয়, সিন্ধু-নদ-তীরে ভারত-বর্ণনা অসমীয়া নাটকে ব্রহ্মপুত্র অথবা অন্য কোনো নদী-তীরে আসাম-বর্ণনায় পর্যবসিত হয়েছে।

অসমীয়া নাটকে

(ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ, হিয়েনচাঙ আৰু কুমাৰ ভাস্কৰ) হি—প্ৰকৃতিৰ কাম্যভূমি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ! ইয়াৰ মাজেৰে বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈ হুয়ো কাষে মনোৰম দৃশ্যেৰে পূৰ্ণ কৰি—এখনি স্বৰ্গীয় উদ্যানৰ সৃষ্টি কৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঢৌৰ নৃত্যভঙ্গীৰ লগত জোনোৱালি কিৰণ পৰি—এখন চাবলগীয়া দৃশ্য গঢ়ি তুলিছে। চৌদিশে শান্তি, আনন্দৰ খেলা। ভাস্কৰ বৰ্মা: ৪/৩, পৃ ৫৪[৩]

(চতুফা আৰু ছুটীয়া ৰজা আহে)

চতুফা: ··· আহা সৌৱা কেনে প্ৰকৃতিৰ মনোৰম দৃশ্য। প্ৰকৃতিকুঞ্জত বিহগ বিহগীয়ে আনন্দেৰে ৰোল তুলিছে। তালবৃক্ষবোৰে বতাহৰ লগত নাচিব ধৰিছে। বেত বেতনিৰ মাজেৰে এই সুন্দৰ নৈ খনিয়ে কেনে সুন্দৰ খেলা কৰি নিজন হাবিৰ মাজে মাজে বৈ গৈছে। এয়ে নে সেই চফ্ৰাই নৈ সখি, যত শুনিছো হেনো স্বৰ্গীয় অপেচৰী সকলে গা ধুৱেহি। আহা প্ৰতি তৰঙ্গে তৰঙ্গে কেনে অপৰূপ ভঙ্গিমা, মলয়া বায়ৰ কেনে মনোহৰ জলকেলি। বামুণী-কোঁওৰ: ১/১, পৃ ১[৪]

নৈৰ পাৰত চক্ৰধৰ বৰ গোঁহাই

চক্ৰ—আহা, কি সুন্দৰ দৃশ্য! সোৱণশিৰীৰ দুই পাৰে সেউজিয়া গছ-গছনিয়ে কি এক অভিনৱ শোভা তুলি ধৰিছে। তাতে পচিমৰ বেলিটিৰ শেষ ৰঙা ৰেখাটিয়ে, ৰূপহী পানীত কেনেকৈ তিৰ্‌বিৰ্‌ কৰিছে! আহা, ধন্য এই ঠাই। এই ঠাইত থাকিলে, মানুহে পৰম পিতাৰ বিমল শান্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে। ৰাজ-উদ্যানকো নেওচি, কোন বিধতাই এই নিৰ্জনত এনে মনোৰম স্থান নিৰ্ম্মান কৰিলে!

চন্দ্ৰকান্ত সিংহ: ২/২, পৃ ২৩[৫]

বাংলা নাটকে

স্থান—উদয় সাগরের তীর। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি। রানা অমর সিংহ একটি বেদীর উপর হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন।···

···মানসীর প্রবেশ

মানসী। বাবা এখনও এখানে! ঘরের মধ্যে এসো। ঠাণ্ডা পড়ছে।

রানা। যাচ্ছি মানসী! একটু পরে। এই উদয় সাগরের তীরে খানিক বসলে মন শান্ত হয়।—মানসী। মেবার-পতন: ৪/১, পৃ ৮৮-৮৯

অসমীয়া নাটকে

ৰংপুৰ জয়সাগৰ পাৰ

চন্দ্ৰকান্ত—সংসাৰৰ সকলো বিপদৰ মাজত থাকিও, এই পুণ্য সৰোবৰৰ পাৰত বহিলে মন-প্ৰাণ শীতল পৰি যায়··· চন্দ্ৰকান্ত সিংহ: ২/১, পৃ ২১[৬]

বাংলা নাটকে

স্থান—উদয় সাগরের তীর। কাল—মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা

রানা অমরসিংহ একাকী

রানা। মেবারের আকাশ ক্রোধে গর্জ্জন কর্চ্ছে। মেবারের পাহাড় লজ্জায় মুখ ঢাকছে। মেবারের হ্রদ ক্ষোভে তটতলে আছড়ে পড়ছে। মেবারের কুল-দেবতারা রোষে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমার হাতে আমার মেবার, রানা প্রতাপের মেবারের আজ পতন হ'ল। মেবার-পতন : ৫/৮, পৃ ১৪১

অসমীয়া নাটকে

চন্দ্রকান্ত— নির্জ্জন পর্ব্বতৰ দাঁতিত বহিলোঁগৈ অল্প জিৰণি পাওঁ বুলি, তাতো শান্তি নাই। চাৰি-ওফালৰ পৰা গহীন প্রকৃতিয়ে যেন মোক ধিককাৰ দি কবলৈ ধৰিলে, "তোৰ দিনত, তোৰ ৰাজত্বত, অসমৰ স্বাধীন বেলি আজি বিদেশী মান-কেতুৱে গ্রাস কৰিলে!" অসহ্য, অসহ্য হ'ল!···

চন্দ্রকান্ত সিংহ : ৪/৬, পৃ ৭৭[৫]

খ. সং লা প - র চ না

বাংলা নাটকে

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকীয় সংলাপে মালোপমা ও ব্যতিরেকমালার ব্যবহার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। সাধারণত তিনটি উপমা অথবা ব্যতিরেক পর পর গ্রথিত হয়। উদাহরণ—

ক নিয়তির মত দুর্ব্বার, হত্যার মত করাল, দুর্ভিক্ষের মত নিষ্ঠুর··· চন্দ্রগুপ্ত : ১/১, পৃ ২

খ ···প্রভাত সূর্য্যের চেয়েও যা ভাস্বর, মৃত্যুর চেয়েও যা প্রবল, মাতার স্নেহের চেয়েও যা পবিত্র,···

চন্দ্রগুপ্ত : ২/৩, পৃ ৩৭

গ ···অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত, চিরন্তন প্রহেলিকার প্রশ্নের মত ;

চন্দ্রগুপ্ত : ২/৫, পৃ ৪৪

ঘ নির্ম্মেঘ উষার চেয়ে নির্ম্মল, বীণার ঝঙ্কারের চেয়ে সঙ্গীতময়, ঈশ্বরের নামের চেয়ে পবিত্র···

দুর্গাদাস : ১/৬, পৃ ৩৪

অসমীয়া নাটকে

ক ···হিমাদ্রীৰ হিমানীমালাৰ দৰে শুভ্র, ভাগিৰথীৰ বাৰিধাৰাৰ দৰে স্বচ্ছ, অভ্রভেদী গগনৰ ধ্রুবতৰাৰ দৰে সত্য। কাশ্মীৰকুমাৰী : ১/১ পৃ ৮-৯[৬]

খ বৰ্ষাৰ উত্তালময়ী তৰঙ্গৰ দৰে প্রলয়ৰ ভীম প্রভঞ্জনৰ দৰে, সপ্তবজ্র সম্মিলিত মহাশক্তিৰ দৰে···

কাশ্মীৰকুমাৰী : ৩/১, পৃ ৪৪[৬]

গ ···বজ্রৰ দৰে আমোঘ শক্তিৰে, দানবৰ দৰে ভীষণ অত্যাচাৰেৰে, মৃত্যুৰ দৰে নির্মমতাৰে···

শেষ পতাকা : ৪/৫, পৃ ১৩৫[৭]

বাংলা নাটকে

দ্বিজেন্দ্রলালের সংলাপ-রচনার আর-একটি বৈশিষ্ট্য হল তিনটি কাব্যিক বাক্যাংশকে পর পর সাজিয়ে 'ক্লাইম্যাক্স' গড়ে তোলা।

উদাহরণ—

ক যেন একটা কুসুমিত সঙ্গীত, একটা চিত্রিত স্বপ্ন, একটা অলস সৌন্দর্য্য। সাজাহান : ৩/৪, পৃ ৮৬

খ যেন একটা অশ্রান্ত ঝঙ্কার, যেন একটা অনন্ত বিশ্রান্তি, যেন একটা অসীম মোহ ;

দুর্গাদাস : ২/৩, পৃ ৪৭

অসমীয়া নাটকে

ক এটা হিয়াভৰা হুমুনীয়া, এটোপ তপত চকুলো, এটা করুণ বিননি ! শেষ পতাকা : ২/১ পৃ ৩৮[৭]

খ কাশ্মীৰৰ কৰবীত, অৰুণৰ উজ্জ্বল আভা, সুধাংশুৰ অমল প্ৰভা, তাৰকাৰ বিমল কান্তি।

কাশ্মীৰকুমাৰী : ২/৬, পৃ ৩৮[৬]

দ্বিজেন্দ্রলালের অনুসরণে পর পর তিনটি বাক্যাংশের প্রয়োগ-কৌশলটি অসমীয়া নাটকে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ; যেমন—

গ প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰে নৰকৰ দুৰ্গন্ধেৰে প্ৰেতৰ বিভীষিকাৰে দুৰ্জ্জয় নগৰ ছাই কৰি দিম।

শেষ পতাকা : ৪/২, পৃ ১২১[৭]

ঘ …আকাশৰ জোনটোক চিঙি আনিবলৈ, ফুলৰ গোন্ধ হৰণ কৰিবলৈ, চৰাইৰ সুৰলা মাত খুজি আনিবলৈ। শেষ পতাকা : ৩/৩, পৃ ৮১[৭]

ঙ …নীচ ষড়যন্ত্ৰৰ পৰিণাম কি ভয়াবহ, সতীৰ তেজৰ চেঁকা কিমান গভীৰ, নাৰী-পীড়নৰ কি অচিন্তনীয় ভীষণ প্ৰতিফল। সতীৰ তেজ : ৫ম অঙ্ক, পৃ ৭৭[৮]

চ আজি ইয়াত প্ৰেতৰ তাণ্ডবলীলা, সম্মুখত বিভীষিকাৰ দানবী মূৰ্ত্তি, পিচত অজ্ঞাত ষড়যন্ত্ৰৰ ভীষণ জাল ! সতীৰ তেজ : ২য় অঙ্ক, পৃ ২১[৮]

ছ ৰাজ্যজুৰি ধুমুহা মাৰিব, শিলাবৃষ্টিত জগৎ কঁপিব, দেৱতাৰ বজ্ৰত পাপীৰ হৃদয় চূৰ্ণ বিচুৰ্ণ হ'ব।

সতীৰ তেজ : ৪/১, পৃ ৪৬[৮]

জ মোৰ শত্ৰু, স্বদেশৰ শত্ৰু, স্বজাতিৰ শত্ৰু… কাশ্মীৰকুমাৰী : ১/২, পৃ ৮[৬]

ঝ …বেগবতী নদীক বালিভেটা দিবলৈ, পদুমৰ কোমল পাহিৰে শালগছ কাটিবলৈ, নইবা তিৰোতাৰ কোমল হাতেৰে পৰ্ব্বতৰ শিল ভাঙিবলৈ,… বদন বৰফুকন : ১/৭, পৃ ১৯[৯]

বাংলা নাটকে

কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল অনুপ্রাসযুক্ত চারটি সমধর্মী বাক্যাংশও পর পর গ্রথিত করেছেন ; উদাহরণ—

আমি জানি— তরবারির ঝনৎকার, ভেরীর ভৈরব নিনাদ, অশ্বের হ্রেষা, মৃত্যুর আর্ত্ত-ধ্বনি।

মেবার-পতন : ১/১, পৃ ২

অসমীয়া নাটকে

অসমীয়া নাট্যকাররাও কখনো কখনো এর অনুসরণ করেছেন ;

উদাহরণ—

এখনি ফুটি ওঠা কবিতাৰ ছন্দ, মৃদঙ্গৰ ধ্বনি, আনন্দৰ কল্লোল, সমুদ্ৰৰ হিল্লোল !

ভাস্কৰ বৰ্মা : ৩/৫, পৃ ৪৪-৪৫[৩]

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকীয় সংলাপ-রচনার অন্যান্য বহিরঙ্গ কৌশলগুলির মধ্যেও প্রায় সব কটিই অসমীয়া নাট্যকাররা ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ—

ক. বাংলা

কোথায় সেই শের খাঁ, কোথায় এই জাহাঙ্গীর! কোথায় অগাধ অসীম স্বচ্ছ নীল-সমুদ্র, কোথায় পুতিগন্ধময় ক্ষুদ্র পঙ্কিল জলাশয়! নূরজাহান: ২/৮, পৃ ৬৭

অসমীয়া

ক'ত আজি মোৰ ৰাজকাৰেঙ, ক'ত আজি মোৰ এই ভগা পঁজা। চন্দ্ৰকান্ত সিংহ: ৪/৬, পৃ ৭৫[৫]

খ. বাংলা

…ভারত সম্রাট্ যা'র কৃপা-কটাক্ষের জন্য লালায়িত হোত; শত রাজ্য জনপদ অলক্ষ্যে যা'র রোষকুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গ সভয়ে লক্ষ্য ক'র্ত্ত; দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ কৃপাণ দশ লক্ষ সেনানী যা'র তর্জ্জনীর দিকে ইঙ্গিতের অপেক্ষায় চেয়ে থাকৃতো! দুর্গাদাস: ৫/৬, পৃ ১৬২

অসমীয়া

… যাৰ আঙুলিৰ ঠাৰত সমগ্ৰ দেশ আজি কম্পমান! যাৰ ক্ষমতাত আজি আহোম ৰাজবংশ গৌৰবান্বিত, যাৰ কৌশলত আজি জাতীয় গৰীমা দেশে-বিদেশে বিয়পি পৰিছে…

বদন বৰফুকন: ১/৬, পৃ ১৮[৯]

গ. বাংলা

চারণী! তুমি কে? তোমার বাক্যে গর্জ্জন, তোমার চক্ষে বিদ্যুৎ, তোমার অঙ্গভঙ্গীতে ঝটিকা।

মেবার-পতন: ২/২, পৃ ৪৩

অসমীয়া

হটাৎ এটি বিজুলিৰ নিচিনা কোন নন্দনৰ সপোন মাধুৰি লৈ যে আহিছা তুমি কুৱঁৰী, উষাৰ নবীন জ্যোতি তোমাৰ গাত, পখিলাৰ বিচিত্ৰ ৰং তোমাৰ ইকাষে সিকাষে। শেষ পতাকা: ৩/২, পৃ ৭৮[৭]

ঘ. বাংলা

১. (অমর সিংহের মেবার-বর্ণনা)

…ছিন্নবসনা, ধূলিধূসরিতা, আলুলায়িতকেশা! মেবার-পতন: ৪/৬, পৃ ১০৬

২. (পিয়ারার বঙ্গ-বর্ণনা)

…শস্যশ্যামলা, পুষ্পভূষিতা, সহস্র-নির্ঝরঝঙ্কৃত অমরাবতী… সাজাহান: ২/৪, পৃ ৬০

অসমীয়া

(প্রতাপ-এর জন্মভূমি-বর্ণনা)

মহিমাময়ী, করুণাময়ী, প্রেমময়ী… কাশ্মীৰকুমাৰী: ১/২, পৃ ৮৯[৬]

ঙ. বাংলা

১. চন্দ্রগুপ্ত! তুমি জীবিত না মৃত? চন্দ্রগুপ্ত: ৪/৫, পৃ ৮৭

২. একি!— আমি স্বর্গে না মর্ত্ত্যে! চন্দ্রগুপ্ত: ৪/৬, পৃ ৯১

৩. দেখ ত (হাত বাড়াইলেন) আমি বেঁচে আছি কিনা? দেখ ত এ ইহকাল না পরকাল? এ স্বপ্ন না সত্য?… চন্দ্রগুপ্ত : ৫/৩, পৃ ১০২-৩

অসমীয়া

১. কত মই? স্বৰ্গত নে মানৱদেহত? বামুণী-কোওঁৰ : ৩/৪, পৃ ২৩[৮]

২. আহা মই পাৰ্থিৱ জগতত নে সৰগত? বামুণী-কোওঁৰ : ১/৫, পৃ ৮[৮]

চ. বাংলা

১. শতরঞ্চ খেলায় দাবা হারিয়েছো; তবু জিততে পারো। খেলে যাও। নুরজাহান : ৫/১, পৃ ১৩৭

২. …কিন্তু—দেখি—উঁহু! আচ্ছা এই গজের কিস্তি—চেপে দেবে। তারপর—এই কিস্তি। এই পদ। তারপর এই কিস্তি। কোথায় যাবে! মাৎ! সাজাহান : ৩/১, পৃ ৬৯

অসমীয়া

…সতৰাম চাৰিঙীয়া ফুকন ডবা খেলত হাৰিল, বুঢ়া গোহাঁই পূৰ্ণানন্দ জিকিল! মোৰ ডবা-বৰি মাত—আৰু দিন চেৰেক মই হাতত পোৱাহেঁতেন পূৰ্ণানন্দৰ ডবা-বৰি মাত হলহেঁতেন, এই কথা… বেলিমাৰ : ১/৭, পৃ ৩৪-৩৫[১০]

ছ. বাংলা

…একি আনন্দ! একি উৎসাহ!… মেবার-পতন : ১/৩, পৃ ১১

অসমীয়া

ইকি উন্মাদনা জননী, ইকি আকৰ্ষণ,… শেষ পতাকা : ১/৩, পৃ ১২[৭]

জ. বাংলা

সংলাপ রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের দুএকটি মুদ্রাদোষ আছে; যেমন 'একটা' শব্দের অত্যধিক ব্যবহার। এই মুদ্রাদোষটিও অসমীয়া নাটকে প্রবেশ করেছে। উদাহরণ—

বাংলা

১. …একটা দৈবশক্তির মত, একটা আকাশের বজ্রসম্পাত, একটা পৃথিবীর ভূমিকম্প, একটা সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস। মেবার পতন : ১/৩, পৃ ৮

২. সে একটা স্বচ্ছ স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্য। মেবার পতন : ২/৫, পৃ ৫৬

৩. তবে এটা বুঝেছি যে এটা একটা স্বর্গীয় কিছু। মেবার পতন : ২/৫, পৃ ৫৮

অসমীয়া

১. এটা মধুৰ সপোন দেখিছিলোঁ…কি থাকিল? এটা হিয়াভৰা হুমুনীয়া, এটোপ তপত চকুলো, এটা করুণ বিননি! শেষ পতাকা : ২/১, পৃ ৩৮[৭]

২. এই অসমত শান্তি স্থাপনৰ চেষ্টা এটা উন্মত্ততা মাথোন। বদন বৰফুকন : ২/২, পৃ ৩৭[৬]

৩. …মাজে মাজে দূৰনীৰ জ্যোতিৰ নিচিনা কি এটা অনিশ্চিত সুখ ভাহি আহি মনটো অস্থিৰ কৰি

তোলে। সকলো আশা সকলো শান্তি মাজে মাজে কি এটা অস্থিৰতাৰ মাজত বিলীন হৈ যায়।…

শেষ পতাকা : ২/৫, পৃ ৬২[৭]

ঝ. উচ্চকণ্ঠ, অতিনাটকীয় ভাষণ

বাংলা

১. যুদ্ধ চাই—যুদ্ধ চাই। সৈন্য সাজাও। মেবারের রক্তধ্বজা উড়াও। রণভেরী বাজাও। যাও প্রস্তুত হও। মেবার পতন : ৪/৬, পৃ ১০৬

২. …তবে যাবার আগে ব'লে যাই। মহারাজ নন্দ! তবে একবার এই কলিযুগেই এই বিশীর্ণ ধ্বংসাবশেষ ব্রাহ্মণের প্রতাপ দেখবে!… চন্দ্রগুপ্ত : ১/৩, পৃ ১২

৩. …এখনও এদের মাথার উপর আকাশের বজ্র ফেটে পড়ছে না! মেবার-পতন : ৪/৬, পৃ ১১১

অসমীয়া

১. …সৈন্যবোৰে মুহূৰ্ত্ততে সাজক। ঢোল খোল বাজি উঠক। প্ৰতিশোধ বা মৃত্যু! যোৱা!

ভাস্কৰ বৰ্ম্মা : ২/১, পৃ ২১[৩]

২. …সাজ, সাজ সৈন্যৰোৰ! আকৌ ৰণভেৰী বাজি উঠক। বামুণী-কোঁওৰ : ১/৩, পৃ ৪[৪]

৩. কিন্তু যোৱাৰ আগতে কওঁ, পূৰ্ণানন্দ! মনত ৰাখিবা, তুমি আজি এক সতৰামক নিৰ্ব্বাসন কৰিছা তোমাৰ স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ ফলত দেশত শতসহস্ৰ সতৰামৰ জন্ম হ'ব। বদন বৰফুকণ : ১/৯, পৃ ৩০[৯]

৪. বজ্ৰ পৰিব ধৰিছে? পাপীক সমুচিত শাস্তি দিবলৈ সৰগ ভাঙিব ধৰিছে। বামুণী-কোঁওৰ : ৩/৬, পৃ ২৫[৪]

ঞ. দ্বিজেন্দ্রলালের সংলাপ-রচনার আর-একটি বৈশিষ্ট্য হল— ক্ষেত্র বিশেষে নাটকীয় চরিত্রের কণ্ঠে অনাটকীয় ভাবেও, সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি-দ্বিজেন্দ্রলালের কণ্ঠ বেজে ওঠে; উদাহরণ—

বাংলা

একটা স্বর্গের কাহিনী। একটা নীহারিকা। একটা জগতের সারভূত সৌন্দর্য্য। সুন্দর বাতাস বইছে। আকাশে মেঘখণ্ডও নাই, জগৎ নিস্তব্ধ। কেবল উদয় সাগরের উপর দিয়ে একটা সঙ্গীতের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। আমার বোধ হচ্ছে, যে কতকগুলি কিশোর স্বর্ণাভা এসে ঐ ঢেউগুলিতে স্নান কর্চ্ছে। এই কল্লোল তাদের কলহাস্য! গাছগুলির পাতা জ্যোৎস্নালোকে নড়ছে, যেন বাতাসের সঙ্গে খেলা কর্চ্ছে— এই মর্ম্মর-ধ্বনি তাদের ক্রীড়ার কলরব। আমার বোধ হয়, অচেতন বস্তুও সৌন্দর্য্য অনুভব করে।

মেবার-পতন : ৪/১, পৃ ৯১

অসমীয়া

১. ৰূপগুনৰ সামঞ্জস্যই সৌন্দৰ্য্য। এই সৌন্দৰ্য্যই জগতৰ স্পন্দন। পূৰ্ণিমাৰ জনোৱালি ৰাতিয়ে মৃদু মলয়াৰ লগত খেলি খেলি নৈৰ বুকুত হিয়া উদিয়াই বাবটি ভাঙি ঢৌৱে ঢৌৱে নাচি যি সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টি কৰে, এয়াও তেনে এটা সৌন্দৰ্য্য বিকাশ!… বামুণী-কোঁওৰ : ১/৫, পৃ ৮[৪]

২. …এপিনে ফটিকা আনপিনে মনোহৰ উজ্জ্বল সৌন্দৰ্য্য। এপিনে সুন্দৰ মলয়াত নাচি ফুৰা জলতৰঙ্গ, আনপিনে শীতল চন্দ্ৰমাৰ উজ্জ্বল কিৰণ। তাৰ মাজত ভাবতৰঙ্গত উটি বুৰি চাইছোঁ অপৰূপ মাধুৰ্য্য।…

বামুণী-কোঁওৰ : ৩/৪, পৃ ২৩[৪]

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলালের সংলাপ-রচনার যে বিশিষ্ট লক্ষণগুলি আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে প্রায় সব কটিই এক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে : ভাষাকে বর্ণময়, গতিবেগসম্পন্ন এবং কাব্যধর্মী করে তোলা। পূর্ববর্তী বিশ্লেষণের পর—এ কথা বলাই বাহুল্য, এই লক্ষণটি অসমীয়া নাটকে গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। কয়েকটি সাধারণ উদাহরণ—

১. ...যি আকাশত সূর্য্যৰ হেমপ্রভা, সুধাকৰৰ সৌম্যমূৰ্ত্তি, সেই আকাশতে প্রলয়ৰ মেঘগৰ্জ্জন, বজ্রৰ তাণ্ডব নৃত্য। যি বতাহত ফুলৰ মধুৰ সৌৰভ, মলয়াৰ মৃদু হিল্লোল, সেই বতাহত শ্মশানৰ তীব্র গন্ধ, ধুমুহাৰ ভৈৰবলীলা! কাশ্মীৰকুমাৰী : ২/২, পৃ ২৮[৬]

২. ...সেই দিনা বুজিবি, পূর্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ প্রতিহিংসা কেনে নিষ্ঠুৰ, কেনে নিৰ্ম্মম, কেনে ভয়ঙ্কৰ!

বদন বৰফুকণ : ১/৬, পৃ ১৮[৯]

৩. আজি এই মিলনত ঢোল খোলৰ বাদ্য নাই, আছে অস্তৰৰ ৰুণুজুনু শব্দ! গীতৰ সুৰ নাই— আছে জিলিৰ অনন্ত ধ্বনি! ঘোষণা নাই—আছে গভীৰ গুহাৰ নীৰবতা! ভাস্কৰ বৰ্ম্মা : ৩/৫, পৃ ৪৪-৪৫[১০]

৩

আধুনিক অসমীয়া নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের ভঙ্গীগত প্রেরণার কথাই এতক্ষণ আলোচিত হল; কিন্তু তাঁর ভাগবত প্রেরণাও আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি বিশ্লেষণ করলে মুখ্যত চারটি ভাবসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়; এক : অতীত ভারতের গৌরবময় কাহিনীর সন্ধান; দুই : অতীত ব্যর্থতার বিশ্লেষণ; তিন : অতীত কাহিনীতে বর্তমান সংগ্রামশীল জাতির ভাবোদ্দীপনা আরোপন; চার : নাটকীয় চরিত্রের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে সংগ্রামরত জাতিকে নির্দেশ দান। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের এই সব কটি ভাবসূত্রই আসামের ঐতিহাসিক নাটকে গৃহীত হয়েছে। অসমীয়া সাহিত্যের ঐতিহাসিক ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা[১১] বলেছেন : "গিৰিশচন্দ্ৰ আৰু দ্বিজেন্দ্রলালৰ বিশেষকৈ পাছৰজনৰ কৃতকাৰ্য্যতাই অসমীয়া নাট্যকাৰ সকলক ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুলৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিছিল।" দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ঐ চারটি ভাবসূত্র কিভাবে অসমীয়া নাটকে ফলপ্রসূ হল দেখা যাক।

ঘ. অতীত ভারতের গৌরবময় কাহিনীর সন্ধান

এই লক্ষণটি অসমীয়া নাটকে মুখ্যত আহোম যুগের গৌরব এবং মহিমা আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হয়েছে। আহোম যুগের ইতিকথাকে কেন্দ্র করে রচিত নাটকগুলির মধ্যে পদ্মনাথ গোঁহাই বরুয়ার জয়মতী (১৯০০), গদাধর (১৯০৭), সাধনী (১৯১১), লাচিত বরফুকন (১৯১৫), লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জয়মতী কুঁয়রী (১৯১৫), বেলিমার (১৯১৫), চক্রধ্বজ সিংহ (১৯১৫), শৈলধর রাজখোয়ার প্রতাপসিংহ (রচনা ১৯২৬, প্রকাশ ১৯৫৩), কমলানন্দ ভট্টাচার্যের নগাকোঁওর (১৯৩১), মরাণ-জীয়রী, নকুলচন্দ্র ভূঞার বদন বরফুকন (১৯২৭), চন্দ্রকান্ত সিংহ, বিদ্রোহী মরাণ (১৯৩৮), দৈবচন্দ্র তালুকদারের বামুণী-কোঁওর, অসম প্রতিভা (১৯২৩), দণ্ডিনাথ কলিতার সতীর তেজ (১৯৩১), বিনন্দচন্দ্র বরুয়ার শরাইঘাট (১৯৩৬) —এই কখানি নাটকের নাম করা যেতে পারে।

ঙ. অতীত ব্যর্থতার বিশ্লেষণ

দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন অতীতের মোগল-রাজপুত সংগ্রাম কাহিনীকে কেবল নাট্যরূপ দিয়েই ক্ষান্ত হন নি,

ব্যর্থতার কারণও বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন, তেমনি অসমীয়া নাট্যকাররাও আহোম রাজশক্তির ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। এই রঙ্গমঞ্চে— অতীতের পটে— বর্তমানের আশা-আকাঙ্ক্ষাই রূপ পেয়েছে। উদাহরণ—

বাংলা নাটকে

ক মহাবৎ। তা জানি মহারাজ। রাজপুতের প্রতি মুসলমানের বিদ্বেষ তত আন্তরিক হবে না জানি,— তার নিজের জাতির বিদ্বেষ যত আন্তরিক হবে। আমি ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস পাঠ ক'রে এটা ঠিক বুঝেছি যে, স্বজাতির উপর পীড়ন ক'রে হিন্দুর যত আনন্দ, এত আনন্দ তার আর কিছুতে নয়! মহারাজ, রাজপুত জাতির উচ্ছেদ আপনার মত আর কেউ কর্ত্তে পার্ব্বে না জানি।…

মেবার-পতন : ৩/৪, পৃ ৯৬

খ রানা। যখন একটা জাতি যায়— সে নিজের দোষে যায়— সে এই রকম ক'রেই যায়। যখন জাত নির্জ্জীব হ'য়ে পড়ে, তখন ব্যাধি প্রবল হ'য়ে উঠে, আর এই রকম বিভীষণ তার ঘরে ঘরে জন্মায়।

মেবার-পতন : ৩/৪, পৃ ৯৮

গ মানসী।…এত ঈর্ষা! এত দ্বেষ! হা রে অধম জাত! তোমার পতন হবে না ত কার হবে।…

মেবার-পতন : ৪/৪, পৃ ১০০

ঘ মানসিংহ। স্বাধীনতা মহারাজ! জাতীয় জীবন থাক্‌লে তবে ত স্বাধীনতা! সে জীবন অনেক দিন গিয়েছে। জাতি এখন পচ্‌ছে।

চান্দেরী। কিসে?

মানসিংহ।…এসব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়! ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, অহঙ্কার,— এসব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়।— সেদিন গিয়েছে মহারাজ! প্রতাপসিংহ : ৬/৫, পৃ ১৭৪

অসমীয়া নাটকে

ক রুচিনাথ।…(চিঠিখন পঢ়ে)…কিন্তু পৰ্ব্বতীয়া আৰু আমাৰ দেশৰ অনেক দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ মানুহে মানৰ লগ লাগি মানৰ দৰে কাপোৰ পিন্ধি, মূৰত গামোছা মাৰি, মানৰ লেখ সৰহ কৰি পেলাইছে। আচল মানতকৈ এই স্বদেশদ্ৰোহী অসমীয়া নকল মান বোৰৰ অত্যাচাৰ হে আমাৰ দুখীয়া প্ৰজাৰ ওপৰত বেছি হৈছে।…[১২]

খ চন্দ্ৰকান্ত। (হুমুনিয়াহ পেলাই) হোঃ, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা! অসমীয়া জাতিটো ইমান তললৈ নামিল, সামান্য পেটৰ বাবে; দয়া, মায়া, স্নেহ সকলো বিসৰ্জ্জন দি অসমীয়াই অসমীয়াক কাটি মাৰি লুট-পাত কৰিছে! বুজিছো, অসমীয়া জাতিটো একেবাৰেই জাত এৰি বিজতৰীয়া হ'ল!…[১৩]

গ ধৰ্ম্মেশ্বৰ। দেশদ্ৰোহী পাপীইঁত! তইঁতেই আমাৰ দেশখন খালি!…[১৪]

ঘ পূৰ্ণানন্দ। দেশখনত মানুহতো নাই, যেনিয়ে চাওঁ তেনিয়ে কেৱল বিশ্বাসঘাতক। এই অসমত শান্তিস্থাপনৰ চেষ্টা এটা উন্মত্ততা মাথোন।[১৫]

ঙ পূৰ্ণানন্দ। (নিজে নিজে) কাক বিশ্বাস কৰিম? গোটেই দেশখন অবিশ্বাসতে চলিছে। যাকে আপোন বোলো সেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা কৰে।…কিন্তু হায়! যাকে আপোন বুলিছো সেয়ে

বিদ্ৰোহী হৈ উঠিছে। বদন বৰফুকন মোৰ মিতিৰ। আজি সেই বদনেও মোৰ বিপক্ষে, দেশৰ বিপক্ষে মান আনিলেগৈ! হায়! মোৰ আই সোনৰ অসম![১৬]

চ. অতীত কাহিনীতে সংগ্রামশীল জাতির ভাবোদ্দীপনা আরোপণ

বাংলা নাটকে

ক সত্যবতী। রাণা প্রতাপসিংহের পুত্রের কাছে কি বেছে নেওয়া এত শক্ত যে কোনটি শ্রেয়ঃ— অধীনতা কি মৃত্যু? মর্ব্বার ভয়ে আমার রত্ন দস্যুর হাতে সঁপে দেবো? আর এ— যে সে রত্ন নয়— আমার যথাসর্বস্ব, আমার বহু পুরুষের সঞ্চিত, বহু শতাব্দীর স্মৃতিস্নাত মেবারকে প্রাণভয়ে বিনাযুদ্ধে শক্র করে সঁপে দেবো? তারা নিতে চায় ত মেরে কেড়ে নি'ক। নিশ্চিত মৃত্যু? সে কি একদিন সকলেরই নাই? মান দিয়ে ক্রয় ক'রে রাণা কি প্রাণটা চিরকাল রাখতে পার্ব্বেন? উঠুন রাণা। মোগল দ্বারদেশে। আর স্বপ্ন দেখবার সময় নাই। মেবার-পতন: ৫/২, পৃ ৪৩

খ প্রতাপ। বন্ধুগণ! এতদিন সমরের যে উদ্যোগ করেছি, এখন তার পরীক্ষা হ'বে। আজ স্বহস্তে আমি যে অনল জ্বালিয়েছি, বীর-রক্তে সে অগ্নি নির্ব্বাণ কর্ব্বো। মনে আছে ভাই সে প্রতিজ্ঞা যে, যুদ্ধে যাই হয়— জয় কি পরাজয়— মোগলের নিকট এ উষ্ণীষ নত হবে না? মনে আছে সে প্রতিজ্ঞা যে, চিতোর উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দিব? প্রতাপসিংহ: ৮/১, পৃ ৪৭

গ সত্যবতী।…আপনি এই দীনা প্রপীড়িতা হৃতসর্ব্বস্বা জননী জন্মভূমি ছেড়ে মোগলের প্রসাদ-ভোজী হয়েছেন। সেই মোগলের দাস হয়েছেন,— যে আমাদের ভারতবর্ষ কেড়ে নিয়েছে, যে তার মন্দির বিচূর্ণ, তীর্থ অপবিত্র, নারীজাতিকে লাঞ্ছিত আর তার পুরুষজাতিকে মনুষ্যত্বহীন করেছে; যে মোগল দর্পে স্ফীত হ'য়ে এখন রাজপুতনার শেষ স্বাধীন রাজ্য মেবার, পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, বিধ্বস্ত করেছে, তার শ্যামলতার উপর দিয়ে তার নিজের সন্তানের রক্তের ঢেউ বইয়ে দিয়েছে আপনি সেই মোগলের কৃপাদত্ত স্পর্দ্ধায় আপনার ভায়ের পুত্রকে, রাণা প্রতাপসিংহের পুত্রকে, সিংহাসনচ্যুত করতে বসেছেন।

মেবার-পতন: ৭/২, পৃ ৬৮

অসমীয়া নাটকে

ক ৰাজমাও।…যি অসম সিংহাসনক পূৰ্ব্বপুৰুষ সকলৰ নিজৰ তেজ দি ইমান উজ্জ্বল কৰিছিল, যি স্বাধীনতাক শত সহস্ৰ প্ৰাণৰ বলি দি ৰক্ষা কৰিছিল, সি কি আজি তোমালোক জীৱিত থাকোতে লুপ্ত হ'ব? যোৱা, যোৱা, দেশৰ স্বাধীনতাৰ হন্তে প্ৰাণ উছৰ্গি আহাঁগৈ।[১৭]

খ চন্দ্ৰকান্ত। ভেন্তে আহা! এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত থিয় হৈ, সূৰ্য্যদেৱতাক সাক্ষী কৰি, পূৰ্ব্বপুৰুষ (?) সকলক স্মৰণ কৰি, প্ৰতিজ্ঞা কৰা, স্বাধীনতাৰ হন্তে, দেহত শেষ বিন্দু শোণিত থকালৈকে তৰোৱাল ধৰিম।[১৮]

গ চন্দ্ৰকান্ত। মোৰ মৰমৰ সৈন্যসকল আমি এতিয়া কৰ্ত্তব্যৰ দুৱাৰদলিত। এবাৰ তোমালোকে মনত পেলোৱা, তোমালোক কি আছিলা, তোমালোকৰ দেশ কি আছিল? আজি তোমালোকৰ তিৰোতাৰ ওপৰত পাশবিক অত্যাচাৰ কৰি, সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা প্ৰকৃতিৰ কাম্যভূমি সোনৰ অসমক বিদেশী অত্যাচাৰী মানে মৰিশালীত পৰিণত কৰিছে।…তোমালোকক মই আহ্বান কৰিছো, তোমালোকৰ চিৰ-স্বাধীনতাক দস্যু মানৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ। তোমালোকৰ পূৰ্ব্বপুৰুষ সকলৰ,

কত তেজেৰে এই সোনৰ অসমক গঢ়ি তুলিছিল, সেই স্বৰ্গতো অধিক জনমভূমিক কি তোমালোকৰ দিনত, তোমালোকে ধ্বংস হবলৈ দিবা? সৈন্য সকল, আজি স্বাধীন আৰু পৰাধীনৰ কথা! কোৱা, তোমালোকে পৰাধীন হৈ কুকুৰৰো অধম জীৱন যাপন কৰিবানে? নাই স্বাধীন হৈ স্বৰ্গসুখ ভোগ কৰি জয়-জয় ময়-ময় হ'বা?[১৯]

ছ. সংগ্রামরত জাতিকে নির্দেশ

বাংলা নাটকে

রানা। দূরে চলে' যাও মানসী! এ যুদ্ধে বাধা দিও না।

মানসী। ক্ষান্ত হৌন পিতা! সর্ব্বনাশ যা হবার হয়েছে। সে সর্ব্বনাশ আর নিজের ভ্রাতৃরক্তে রঞ্জিত কর্ব্বেন না। এ শোকের সান্ত্বনা হত্যা নহে— এর সান্ত্বনা— আবার মানুষ হওয়া।

রানা। মানুষ হওয়া— সে কি রকম করে' মানসী?

মানসী। শত্রুমিত্রজ্ঞান ভুলে গিয়ে। বিদ্বেষ বর্জ্জন ক'রে। নিজের কালিমা, দেশের কালিমা বিশ্বপ্রেমে ধৌত ক'রে দিয়ে।—গাও চারণীগণ। সেই গান যা তোমাদের শিখিয়েছি—"আবার তোরা মানুষ হ।"

মেবার-পতন: ৮/৫, পৃ ১৪৪

অসমীয়া নাটকে

চন্দ্রকান্ত। ...মই এতিয়া বুজিছো, ভালকৈয়ে বুজিছো, আমাৰ কিহৰ দোষত, আমাৰ কত শত তপস্যাৰ স্বাধীন অসমক চিৰদিনলৈ হেৰুৱালো। কেৱল, কেৱল অসমীয়াৰ পৰশ্ৰীকাতৰতা আৰু আত্মকন্দল! এতিয়াও কোন ক'ত আছা অসমীয়া! শুনা, এবাৰ কান পাতি শুনা, তোমালোকৰ পৰশ্ৰীকাতৰতা আৰু আত্মকন্দল বিসৰ্জ্জন দিয়া! অসমীয়াই অসমীয়াক বিশ্বাস কৰা, আদৰ কৰা আকোৱালি ধৰা। হতভাগ্য অসমীয়া তোমালোকৰ দেশ যদি এতিয়াও ৰাখিব খোজা, লুপ্ত স্বাধীনতা যদি উদ্ধাৰ কৰিব খোজা, তেন্তে তেন্তে তোমালোক আকৌ মানুহ হোৱা, মানুহ হোৱা, মানুহ হোৱা!...[২০]

৪

আধুনিক অসমীয়া নাটকে, সাধারণভাবে বাংলা নাট্যসঙ্গীতের অনুসরণে, নৃত্যগীতের যে বিশেষ ধারাটি গড়ে উঠেছিল, একাধিক অসমীয়া সমালোচকই তার উল্লেখ করেছেন। আসামের বিখ্যাত নাট্যকার এবং অসমীয়া চলচ্চিত্রশিল্পের জনক স্বর্গত জ্যোতিপ্রসাদ আগরালার মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর সুখ্যাত নাটক 'শোণিতকুয়ঁরী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। এই সংস্করণের ভূমিকায় 'শোণিতকুয়ঁরী'র রচনাকালের যে চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তা বিশেষ মূল্যবান। তিনি[২১] বলেছেন: "সেই সময়ত অসমীয়া নাট্যসাহিত্য আৰু সঙ্গীতৰ ওপৰত বঙলা নাটক আৰু সঙ্গীতৰ প্ৰচণ্ড প্ৰভাৱ। আমাৰ মঞ্চবোৰত বেছি ভাগেই অনুবাদ কৰা বঙলা নাটক আৰু সেই নাটকৰ বঙলা গীত-সুৰ চলিছিল।" জ্যোতিপ্রসাদ নিজে প্রতিভাবান অভিনেতাও ছিলেন। তেজপুরের 'বান থিয়েটার'এর সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সেখানে অভিনীত নাটকসমূহের আলোচনা করে তিনি[২২] লিখেছেন: "নাটকবোৰৰ গানৰ সুৰবোৰ আমি সদায় কলিকতাত সেই নাটকবোৰৰ অভিনয় চাই তাৰ পৰা সুৰ সংগ্ৰহ কৰি আনো।... সাহিত্যৰথী

বেজবৰুৱাৰ[২৩] নাটকৰ গীতৰ ভাষা যদিও জতুৱা ঠাচৰ আছিল তথাপিও সেই গীতবোৰো প্ৰচলিত হিন্দুস্থানী আৰু বঙলা সুৰতহে গোৱা হৈছিল।...” বর্তমান প্রসঙ্গে এই রীতি বা প্রবণতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যে কথাটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে তা হল— ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে এই প্রেরণার প্রধানতম উৎস দ্বিজেন্দ্রলাল। অসমীয়া ঐতিহাসিক নাটকে নৃত্যগীত পরিবেশনের যে রাজকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় এবং যে ধরণের সঙ্গীত নর্তকীদের মুখে দেওয়া হয়— তাতে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ছাপ স্পষ্ট। একটি উদাহরণ দেওয়া হল :

যোৰহাট নগৰৰ ৰাজ-কাৰেং,

ৰজাৰ তামুলী চ'ৰা চন্দ্ৰকান্ত সিংহ আৰু সতৰাম দুয়ো একে আসনতে বহি থাকে, নাচনী বিলাকে গীতৰ সুৰে সুৰে দুয়োকে পানীয় দিয়ে

নাচনী— (আজি) উলাহে হাঁহিছে ধৰণী
চৰায়ে গাইছে,
সমীৰে আনিছে
নতুন দেশৰ নতুন খবৰ
ঢৌৱাই ফুলনি ॥

চকুতে চকুটি
ওঠতে ওঠটি,
কটকী বতাহে কৈ যায় কিনো,
পৰাণ আকুল কৰি।[১]

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে আর-এক শ্রেণীর সঙ্গীতেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়: দেশপ্রীতিমূলক উদ্দীপনা-সঞ্চারী সঙ্গীত। ডক্টর সুর্যকুমার ভূঞা মহাশয়[২৪] এই গানগুলির আলোচনা করে মন্তব্য করেছেন : “দ্বিজেন্দ্ৰলাল ৰায়ৰ নাটকবোৰ জাতীয় মহাকাব্যৰ দৰে হৈছে···‘মেবাৰ পাহাড়’ গানে এতিয়াও শুনোতাঁৰ মন মতলীয়া কৰি তোলে, ‘আমাৰ জন্মভূমি’ গানে বাঙ্গালী জাতিৰ অস্তিত্ব থাকে মানে মানুহৰ মন-প্ৰাণ মুহি হৃদয়ত স্বদেশ-প্ৰেমৰ বীজ সিঁচাব বুলি ভবিষ্যৎবাণী কৰিব পাৰি।”

অসমীয়া নাট্যকাররা এই গানগুলিকেও গভীরভাবে অনুশীলন এবং অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ—

অসম অসম সোনৰ অসম
বীৰ প্ৰসৱিণী চেনেহী আই,
শ্যামল বৰণী তুমি গিৰিৰাণী
সৰগতো তোমাৰ তুলনা নাই।
প্ৰকৃতি জীয়াৰী মুনি মনোহাৰী
তুমি পৰাধীনা নোহোৱা আই,
শোভিছে শিৰতে অক্ষয় কিৰিটী,
ৰাজৰাজেশ্বৰী অসমা আই।

গিৰি নিৰ্জৰিণী গালে নিচুকানি
শুলে অসমীয়া চেতনা নাই,
উঠা বীৰনাৰী অসম কুৱঁৰী
বজোৱা শিঙ্গা জগোৱা আই।
শুনোৱা জননী চিলাৰায় কাহিনী
বাণ-ভগদত্তৰ কথা বিনাই,
গোৱা গিৰিৰাণী উষা আইৰ কাহিনী
উঠক অসমীয়া চেতনা পাই।[২৫]

এখানে প্রকৃতি-বর্ণনা এবং অতীত-স্মরণ— দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দীপনামূলক সঙ্গীতের দুটি কৌশলই গৃহীত হয়েছে ; গভীরতর অনুশীলনের চিহ্নও এখানে রয়েছে।

উঠা বীৰনাৰী অসম কুৱঁৰী
বজোৱা শিঙ্গা জগোৱা আই।—

এই অংশে দ্বিজেন্দ্রলালের— উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর[২৬] পঙক্তিটির অনুরণন স্পষ্ট শোনা যায়। আর-একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্য স্পষ্টতর হতে পারে:

তই পাহৰি পেলাচো' ভেদ,
তই কৰিছ কিহৰ খেদ,
ধৰ্ম্মজাতিৰ ভেদাভেদ এৰ
দুৰ্জ্জয় অসম তোৰ ॥[২৭]

সৈন্যদের সমবেতকণ্ঠে গীত এই গানটির উদ্ধৃত চার পঙক্তিতে 'মেবার-পতন' নাটকের শেষ দৃশ্যে চারণীদের সমবেতকণ্ঠে গীত সুবিখ্যাত গানটির ভাবগত এবং ধ্বনিগত অনুরণন শোনা যায়:

কিসের শোক করিস ভাই— আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই— আবার তোরা মানুষ হ'॥

মেবার-পতন : ৫/৮, পৃ ১৪৪

৫

এতক্ষণ সংলাপ, সঙ্গীত এবং ভাবোদ্দীপনার যে আলোচনা করা হল তা থেকেই অনুমান করা চলে যে ঐতিহাসিক নাটকের গঠন-রীতিতেও অসমীয়া নাট্যকাররা মুখ্যত দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালীয় আঙ্গিক তাঁরা যে কত গভীরভাবে অনুশীলন করেছেন প্রথমে তারই একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। মঞ্চে কোনো দৃশ্যে সমস্ত কুশীলবের প্রস্থান, এবং তার পর এক বা একাধিক চরিত্রের প্রবেশ— এই কৌশলটি বাংলা নাটকে প্রথম সার্থকভাবে ব্যবহার করেন দ্বিজেন্দ্রলাল। সম্ভবত তাঁরই অনুসরণে অসমীয়া নাটকেও এই কৌশলটি গ্রহণ করা হয়েছে। উদাহরণ—

ক ৰবিৰাম। ইয়াত থাকিলে কি হব? আগবাঢ়ি যাওঁহঁক বলা। মানে কাৰবাৰ সৰ্ব্বনাশ কৰিছে। আমি তাৰ যি পাৰোঁ প্ৰতিবিধান কৰোঁ গৈ। যি পাৰোঁ, যথাসাধ্য। [সকলোৰে প্ৰস্থান]

(চাৰিটা মানৰ প্ৰবেশ।)

[সিহঁতে এজনী গুৰণী তিৰুতাক ধৰি লৈ আহিছে। আৰু মতা মানুহ এটাক বান্ধি লৈ আহিছে।]

১ম মান। এইজনী মোৰ।

২য় মান। মোৰ। বেলিমাৰ : ৫/৫, পৃ ১২৫

খ গদা। আজি চুলিকফাক বুজাই দিওঁ— নীচ ষড়যন্ত্ৰৰ পৰিণাম কি ভয়াবহ, সতীৰ তেজৰ চেঁকা, কিমান গভীৰ, নাৰী-পীড়নৰ কি অচিন্তনীয় ভীষণ প্ৰতিফল। [সকলোৰে প্ৰস্থান]

(কেইটামান ৰজাঘৰীয়া ৰণুৱাৰ প্ৰবেশ।)

সকলোৱে। পলা পলা।

প্ৰথম। —হেৰ পলাবি কলৈ? বোলে নগাৰ চাঙৰ তলে হে বাট। সতীৰ তেজ : ৫ম অঙ্ক, পৃ ৭৭

৬

সাহিত্য-জগতে প্রেরণা জিনিসটা অনেকটা প্রাকৃতিক নিয়মের মতো। বিশ্বের আকাশে বায়ুস্রোত যেমন অবিরাম প্রবাহিত হচ্ছে তেমনি চিন্তাস্রোতও অবিরত দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। জীবন্ত প্রাণী যেমন

বিশ্বব্যাপ্ত বায়ুস্রোতকে অগ্রাহ্য করতে পারে না, তেমনি জীবন্ত সাহিত্যও ভুবনসঞ্চারী চিন্তাস্রোতকে এড়িয়ে যেতে পারে না। প্রাণের ধর্মই হচ্ছে গ্রহণ এবং স্বীকরণ। পাশ্চাত্যপ্রেরণাপুষ্ট দ্বিজেন্দ্র-নাটক এর প্রমাণ। আবার দ্বিজেন্দ্র-প্রেরণাপুষ্ট অসমীয়া ঐতিহাসিক নাটকও এর প্রমাণ। কিন্তু পরিবর্তনও প্রাণেরই ধর্ম। তাই কোনো সাহিত্যিক-প্রেরণাই নিত্যকালের জিনিস নয়। প্রেরণা যেমন সত্য, প্রেরণা-মুক্তিও তেমনি সত্য। অসমীয়া নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এই ব্যাপারটি কখন ঘটল? কোন্ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্র-প্রেরণামুক্ত নতুন ঐতিহাসিক নাটকের পথনির্দেশ দিলেন? অনেক সমালোচক মনে করেন এই কৃতিত্বটি শ্রীঅতুলচন্দ্র হাজরিকার প্রাপ্য। ডক্টর বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া[২৮] লিখেছেন: "It must be noted that Atul Chandra Hazarika writes dramas to meet the demand of the Assamese stage which, before he started writing, was practically monopolised by the dramas of the Bengali playwrights Girish Chandra and Dwijendralal Roy. Atul Hazarika liquidated this dependence once and for all." ডক্টর বরুয়া অন্যত্রও এই উক্তিরই প্রায় আক্ষরিক প্রতিধ্বনি করেছেন। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে সাহিত্য অকাদেমী কর্তৃক প্রকাশিত Contemporary Indian Literature—A symposium গ্রন্থের 'Assamese Literature' প্রবন্ধে অতুলচন্দ্র হাজরিকার নাটকসমূহের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন: "It must be noted that Atul Chandra Hazarika wrote dramas to meet the demand of the Assamese stage which, before he started writing, was practically monopolised by the works of Bengali authors. Hazarika liquidated this dependence."[২৯] অসমীয়া সাহিত্যের ঐতিহাসিক ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ শর্মাও[৩০] ঐ একই দাবী উত্থাপন করেছেন: "তথাপি ৰঙ্গমঞ্চৰ উপযোগী ইমানখিনি নাট ৰচনা কৰি দ্বিজেন্দ্রলাল, গিৰীশচন্দ্র, ক্ষিৰোদপ্রসাদ আদি বঙালী নাট্যকাৰ সকলৰ প্ৰভাৱ অসমৰ ৰঙ্গমঞ্চৰ পৰা আঁতৰ কৰি অসমীয়া নাট্যকলাৰ দেৱতাক ৰঙ্গমঞ্চৰ বেদীত সুপ্রতিষ্ঠিত কৰাত হাজৰিকাৰ দান অমূল্য বুলি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব।" ডক্টর বরুয়া এবং ডক্টর শর্মা শ্রীযুক্ত হাজরিকার পক্ষে যে দাবী উত্থাপন করেছেন এখানে তার পূর্ণাঙ্গ বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়; কারণ শ্রীযুক্ত হাজরিকা পৌরাণিক, অনুবাদমূলক এবং অন্যান্য শ্রেণীর নাটকও প্রচুর লিখেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া অন্যান্য বাঙালী নাট্যকারের সম্ভাব্য প্রেরণা আমাদের বর্তমান আলোচনা-সীমার আওতার বাইরে। কিন্তু 'কনৌজ-কুঁৱৰী'[৩১] (১৯৩৩) এবং 'ছত্রপতি শিৱাজী'[৩২] (১৯৪৭)—শ্রীযুক্ত হাজরিকার এই দু'খানি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক নাটকের দিকে তাকিয়ে মনে হয় সম্ভবত ঐ দাবীর পুনর্বিচারের প্রয়োজন রয়েছে। দু'খানি নাটকেই দ্বিজেন্দ্র-প্রেরণার লক্ষণ স্পষ্ট এবং প্রচুর। এখানে কয়েকটি ইঙ্গিত মাত্র দেওয়া হল:

ছত্রপতি শিৱাজী: অতুলচন্দ্র হাজৰিকা

ঔৰং। দিলিৰ খাঁ!

দিলিৰ। জাহাপনা!

ঔৰং। খিৰিকিৰে চাই পাঠিয়াচোন। সৌৱা দূৰৈত কি দেখিছা?

দিলিৰ। নীল আকাশ।

ঔৰং। আৰু কি দেখিছা ?

দিলিৰ। একো দেখা নাই জাহাপনা!

ঔৰং। ভালকৈ চোৱা দিলিৰ!

দিলিৰ। বান্দাৰ দৃষ্টিশক্তি এতিয়াও সিমান দুৰ্ব্বল হোৱা নাই জাহাপনা!

ঔৰং। ওহোঁ, বিশ্বাস নহয়।

দিলিৰ। জাহাপনা!

ঔৰং। মূৰ্খ— সৌ অস্তগামী সূৰ্য্যৰ ওচৰত সেই চপৰা কি ?

দিলিৰ। এ চপৰা সৰু ডাৱৰ জাহাপনা।

ঔৰং। দিলিৰ!

দিলিৰ। জাহাপনা!

* * * *

ঔৰং। মূৰ্খ— চকু মেলি চোৱা। দেখিবা।— সেই সৰু ডাৱৰ চপৰাই লাহে লাহে ক'লা আৰু ক'লা হৈ তোমাৰ অস্তগামী ৰাঙলী সূৰ্যক গ্ৰাস কৰি পেলালে।

দিলিৰ। জাহাপনা!

ঔৰং। তুমি কৈছা ধুমুহাৰ সম্ভাৱনা নাই। কিন্তু মই দিল্লীৰ বাদশ্বাহ ঔৰংজীবে কওঁ— ধুমুহা আহিব, জৰুৰ আহিব। এনে এটা ধুমুহা আহিব ধৰিছে দিলিৰ! যি তোমাক— মোক— সকলোকে গিলি থব।

ছত্ৰপতি শিৱাজী : ৫/১, পৃ ১০৯-১১০[৩৩]

চন্দ্রগুপ্ত : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

চাণক্য। ···চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব।

চাণক্য। ঊর্দ্ধে চাও দেখি।—কি দেখছো ?

চন্দ্রগুপ্ত। আকাশ।

চাণক্য। কি বর্ণ ?

চন্দ্রগুপ্ত। পাংশু বর্ণ।

চাণক্য। কি বুঝছো ?

চন্দ্রগুপ্ত। ঝড় উঠবে।

চাণক্য। ঠিক! ঝড় উঠ্‌বে। আর সম্মুখে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখ দেখি! কিছু দেখতে পাচ্ছ না ?

চন্দ্রগুপ্ত। না!

চাণক্য। অন্ধ! সেখানেও একটা ঝড় উঠবে! ···আমি আমার চক্ষুর সম্মুখে কি দেখছি জানো ?

চন্দ্রগুপ্ত। কি গুরুদেব!

চাণক্য। ···জলধি হ'তে জলধি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য— সে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুমি, আর তার পুরোহিত এই দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য।

চন্দ্রগুপ্ত : ১/৪, পৃ ১২

কর্নৌজকুঁৱৰী : অতুলচন্দ্র হাজৰিকা

১. সমৰসিংহ— ...ঘোপমৰা আন্ধাৰত পথভ্ৰষ্ট পথিকক তিৰবিৰ বিজুলীৰ ৰেখাই বাট দেখুৱাই দিয়াৰ নিচিনাকৈ আমাক কৰ্ত্তব্যৰ পথ দেখুৱাই দি গৈছে।... ১/৬, পৃ ২১

২. সংযুক্তা— ...বলা ভিল ছৰ্দ্দাৰ আৰু বীৰ ৰাজপুত সকল! ৰাজপুত পুৰুষৰ গাত তোমালকক পৰিচালনা কৰিবৰ শক্তি নাই! ৰাজপুত নাৰীয়ে সেই কাম কৰিব।... ৪/৫, পৃ ৯১

মেবার-পতন : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১. গোবিন্দ সিংহ— ...এই ঘনায়মান অন্ধকারে স্থির বিদ্যুতের মত এসে দাঁড়ালে, কে তুমি মা!... ১/৩, পৃ ১১

২. সত্যবতী— ...সামন্তগণ! তোমরা যুদ্ধের জন্য সাজ। রানা যদি তোমাদের যুদ্ধে নিয়ে যেতে অস্বীকৃত হন, আমি তোমাদের সেনাপতি হবো। ১/৩, পৃ ১১

বস্তুত নাটকটির সর্বত্রই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেরণা নানাভাবে কাজ করেছে; যেমন, নায়িকা সংযুক্তার চরিত্রে 'মেবার-পতন' নাটকের দু'টি নারীচরিত্র মানসী এবং সত্যবতীর স্পষ্ট ছায়া পড়েছে। মানসীর মতো সংযুক্তাও যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে চান; মানসীর মতোই তিনি[৩৪] বলছেন : "মানুহে মানুহৰ ওপৰত কিমান নিৰ্দ্দয় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাকো বুজি আহিম। মানুহে মানুহৰ ৰক্তপান কৰি কেনেকৈ মতলীয়া হয় সেই ভয়ঙ্কৰ দৃশ্য চাই আহিম। জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ আৰু ৰক্তপায়ী বনৰীয়া জন্তুৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য আছেনে তাকো জানি আহিম।" উদাহরণবাহুল্য, সম্ভবত নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত হাজরিকার নাট্যভাষায় দ্বিজেন্দ্র-প্রেরণা কিভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ দিয়েই আপাতত আমরা এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করছি।

কর্নৌজকুঁৱৰী : অতুলচন্দ্র হাজৰিকা

১. শত্ৰুক মিত্ৰ কৰিলি, চোহানৰ গৌৰব অটুট ৰাখিলি। ৰাঠোৰৰ নাক কটালি। ৩/৮, পৃ ৭০

২. কি সুন্দৰ! কি স্বৰ্গীয়! মোৰ মন প্ৰাণ হৰি নিলে। প্ৰাণেশ্বৰ! বিশ্বখনিকৰৰ বিনন্দ-বিলাস সৃষ্টিত তুমিও এটা সঙ্গীত মাথোন। ৪/১, পৃ ৭৩

৩. মানুহে মানুহক মাৰে— মানুহৰ ভেজেৰে মানুহে হাত ৰাঙলী কৰে— মানুহৰ জ্বালা-যন্ত্ৰণা চাই মানুহে পিশাচৰ নিচিনা বিকট হাঁহি মাৰে। ২/৩, পৃ ৩৪

৪. জাতিৰ বিৰুদ্ধে, জ্ঞাতিৰ বিৰুদ্ধে, স্বদেশৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰি নিজৰ ঘৰত জুই জলাই দিছো। সোনৰ ভাৰতভূমি শ্মশান কৰি, জী-জোৱাইৰ ওপৰত নিজৰ ওপৰত, দেশৰ ওপৰত, প্ৰতিশোধ লৈছো। ৫/৮, পৃ ১২৫-১২৬

৫. শ্মশানলৈ যাবৰ সময়ত, দুৰ্ভিক্ষত পীড়িতক ৰক্ষা কৰিবৰ সময়ত, শত্ৰুৰ হাতৰ পৰা স্বদেশক ৰক্ষা কৰিবৰ সময়ত, নিমন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজন নাই।...ঘোৰী কেৱল পৃথ্বীৰাজৰে শত্ৰু নহয়— মোৰো শত্ৰু— আপনাৰো শত্ৰু— প্ৰত্যেক ভাৰতবাসীৰে শত্ৰু। ভাৰত কেৱল পৃথ্বীৰাজৰে জন্মভূমি নহয়, মোৰো— আপনাৰো— প্ৰত্যেক ভাৰত সন্তানৰে। ৪/২, পৃ ৭৯

প্ৰমাণপঞ্জী

১ আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান— ডক্টর সুধাকর চট্টোপাধ্যায় (শরৎ পুস্তকালয়, কলিকাতা, ১৩৬৪)

২ 'Assamese Drama' by Dr. Satyendranath Sharma in *A Brochure on Assamese Literature and Culture* [Published on the occasion of UNESCO Nineth General Session in New Delhi, 1956.] General Editor : Sri Siva Prasad Barooah, p. 69

৩ ভাস্কৰ বৰ্ম্মা (১৯৫১)— দৈৱচন্দ্ৰ তালুকদাৰ

৪ বামুণী-কোঁৱৰ (১৯২৮, প্ৰথম অভিনয়, কামৰূপ নাট্যমন্দিৰ)— দৈৱচন্দ্ৰ তালুকদাৰ

৫ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ (১৯৩১)— নকুলচন্দ্ৰ ভূঞা

৬ কাশ্মীৰকুমাৰী— গণেশচন্দ্ৰ গগৈ

৭ শেষ পতাকা (ৰচনা : ১৯৩৪-৩৫, প্ৰকাশ : ১৯৪৮)— উমাকান্ত শৰ্মা

৬ কাশ্মীৰকুমাৰী— গণেশচন্দ্ৰ গগৈ

৮ সতীৰ তেজ (১৯৩১)— দণ্ডিনাথ কলিতা

৯ বদন বৰফুকন (১৯২৭)— নকুলচন্দ্ৰ ভূঞা

১০ বেলিমাৰ (১৯১৫)— লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা

১১ 'বেজবৰুৱাৰ ঐতিহাসিক নাট কেইখন', অসম সাহিত্যসভা পত্ৰিকা। পঞ্চদশ বছৰ। ১৮৭৮ শক, ভাদ। দ্বিতীয় সংখ্যা। পৃ. ৮২

১২ বেলিমাৰ (২য় সং), ৫ম অঙ্ক, ৩য় দৰ্শন, পৃ. ১১৯

১৩ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, ৫ম অঙ্ক. ৫ম পট, পৃ. ৯৪

১৪ বেলিমাৰ, ৫ম অঙ্ক, ৫ম দৰ্শন, পৃ. ১৩০

১৫ বদন বৰফুকন (ষষ্ঠ তাঙৰণ), ২য় অঙ্ক, ২য় পট, পৃ. ৩৭

১৬ ঐ, ৫ম অঙ্ক, ২য় পট, পৃ. ৮৫

১৭ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, ৪ৰ্থ অঙ্ক, ৬ষ্ঠ পট, পৃ. ৭৬

১৮ ঐ, ৫ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ পট, পৃ. ৯৮

১৯ ঐ, ৫ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ পট, পৃ. ৯৮

২০ ঐ, ৫ম অঙ্ক, ৯ম পট, পৃ. ১০৯-১১০

২১ শোণিত-কুঁৱৰী— জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰালা (দ্বিতীয় তাঙৰণৰ পাতনি, পৃ. ।/০)

২২ ঐ, পৃ. ।০-।/০

২৩ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ; (এঁকে অসমীয়া সাহিত্যের সম্রাট বলা হয়।)

২৪ 'দ্বিজেন্দ্ৰলাল ৰায়' : পদ্মনাথ গোঁহাই— বৰুৱা সম্পাদিত উষা, তেজপুৰ, ৫ম বছৰ, ৫ম সংখ্যা, ১৯১২ খৃঃ, পিঠি ১৩০-১৩৬ ; [শ্ৰীযুক্ত ভূঞার 'জোনাকী' (৩য় সং, ১৯৫৫) গ্রন্থেও প্রবন্ধটী স্থান পেয়েছে ; পৃ. ৬৬]

২৫ স্বৰ্গদেও প্ৰতাপসিংহ (ৰচনা : ১৯২৬, প্ৰকাশ : ১৯৫৩)— শৈলধৰ ৰাজখোৱা ; ১।২, পৃ. ৭

২৬ সাজাহান ; ১।৪, পৃ. ২৪

২৭ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ : ৫।৬, পৃ. ৯৭

২৮ Modern Assamese Literature (1957), p. 63

২৯ লক্ষণীয়, এখানে once and for all (?) ' অংশটী বর্জিত হয়েছে।

৩০ অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিবৃত্ত (২য় সং, ১৯৬১), পৃ. ২৪৪

৩১ ৰচনা : ১৯২৩ ৩২ প্ৰথম অভিনয় : ১৯২৭ ৩৩ দ্বিতীয় তাঙৰণ, ১৯৪৯ ৩৪ কনৌজ কুঁৱৰী ১।৪, পৃ. ১২

পুষ্পাঞ্জলি

রবীন্দ্রসদন-পাণ্ডুলিপি ৮৫

শান্তিনিকেতনস্থিত রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্ররচনার অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। এই-সকল পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থাতিরিক্ত অনেক অংশ, মুদ্রিত রচনার সহিত বহু পাঠভেদ, লক্ষ্য করা যায় ; কোনো কোনো শব্দ বা ছত্র বারংবার পরিবর্তন করিয়া কবি কিভাবে শেষ পাঠে উপনীত হইয়াছেন তাহার ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রে এই-সকল পাণ্ডুলিপিতে বিধৃত।

বর্তমানে এই-সকল পাণ্ডুলিপির বিবরণ প্রস্তুত হইতেছে ; তন্মধ্যে একটি বিবরণ এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইল।

পাণ্ডুলিপিতে যে-সকল স্বতন্ত্র পাঠ ও বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন গ্রন্থের পাঠভেদ-সংবলিত সংস্করণে তাহা সংকলন করিবারও সংকল্প আছে।

শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী এই পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতীকে দান করেন। ঐ সময়ে বিবরণে লেখা হয়— "পোকায় কাটা লাল মলাটের বড়ো খাতা", ইহার ৩১ খানি পাতা বা ৬২ পৃষ্ঠা। সংরক্ষণের উদ্দেশে পাতাগুলি পৃথক্ করিয়া লইয়া, আস্বচ্ছ কাগজে ছুই পিঠ মুড়িয়া, বর্তমানে নূতন ভাবে বোর্ডে ও সবুজ কাপড়ে বাঁধানো হইয়াছে। রেকর্ডে "পোকায় কাটা" থাকিলেও, কোনো কোনো পাতার বহিঃপ্রান্ত জীর্ণ দেখাইলেও, ভিতরে ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন তেমন নাই। ইহাতে মনে হয় বর্জিত মলাট পোকায় কাটা ছিল।

নূতন বাঁধাইয়ের পর পাণ্ডুলিপির বাহিরের মাপ মেট্রিক শতাংশে প্রায় ২৭·৫ × ২৪। কয়েকটি পাতার বহিঃপ্রান্তের জীর্ণতা উপেক্ষা করিলে, ভিতরে মূল পাতাগুলির মাপ : ২৫·৭৫ × ২০·৩৫। রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে ইহার অভিজ্ঞান-সংখ্যা : ৮৫। এই পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রসদনে আসিবার পরে নূতনভাবে বাঁধাইবার কালে ইহার বিজোড় পৃষ্ঠাগুলির দক্ষিণোর্ধ্ব কোণে কোণে ইংরাজিতে একাদিক্রমে বিজোড় সংখ্যা বসানো হইয়াছে। জোড় পৃষ্ঠাগুলির অঙ্ক পূর্বাপর মিলাইয়া বুঝিতে হইবে।

1-24 — প্রথম হইতে চতুর্বিংশ পৃষ্ঠা অবধি রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে পাওয়া যায়।

25-59 — পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী -কর্তৃক ইংরাজি ফরাসী ও বাংলা সাহিত্য হইতে স্মরণীয় রচনাবলীর সংকলন। তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাংশ পাওয়া যায়।

61 — লিখিত সর্বশেষ পৃষ্ঠা ইন্দিরাদেবীর দিনলিপি বলা যায়। তারিখ ৯ কার্তিক ১২৯৪ বা ২৫ অক্টোবর ১৮৮৭। এক বৎসর পূর্বে এইদিনে জোড়াসাঁকোর বাটীতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সন্তানের জন্ম ; তাহারই কথা লেখা হইয়াছে।

2, 42, 60, 62 — চারি পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ রচনারিক্ত বা সাদা।

1 — প্রথম পৃষ্ঠা আখ্যাপত্ররূপে গণ্য। রবীন্দ্রনাথ খয়েরী কালো কালীতে বড়ো বড়ো অক্ষরে পৃষ্ঠার প্রায় মাঝামাঝি লিখিয়াছেন : পুষ্পাঞ্জলি। /

3-24 — তৃতীয় হইতে চতুর্বিংশ পৃষ্ঠা অবধি ঐরূপ কালীতে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের অন্যতম গদ্য রচনা 'পুষ্পাঞ্জলি' এবং সমকালীন কতকগুলি গান ও কবিতা। গান ও কবিতাগুলি আদৌ পুষ্পাঞ্জলির অঙ্গীভূত থাকিলেও স্বতন্ত্রভাবে ভারতী পত্রে ও পরে নানা গ্রন্থে, রবিচ্ছায়ায় এবং কড়ি ও কোমল কাব্যে, প্রকাশিত ও সংকলিত।

পুষ্পাঞ্জলির গদ্য রচনাংশই বিশেষভাবে 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে খ্যাত; রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে কোনো রবীন্দ্র-গ্রন্থে পরিণত বা সংকলিত না হইলেও, উহা ঐ নামে ১২৯২ বৈশাখের ভারতী পত্রে (পৃ ৪-১৩) মুদ্রিত। বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত সপ্তদশখণ্ড (ফাল্গুন ১৩৫০) রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে, মুখ্যতঃ ভারতী-ধৃত পাঠের অনুসরণে, পুষ্পাঞ্জলি প্রথম সংকলন করা হয়। ইহাই রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে জীবনস্মৃতির চতুর্থ সংস্করণে (১৩৬৮, পৃ ২২৫-২৩৩) বিস্তারিত গ্রন্থ-পরিচয়ের অংশ-রূপে পুনঃ প্রকাশিত। এই মুদ্রণে আধুনিক বানান ও প্রচলিত বিরতি চিহ্নাদি গ্রহণ করা হয়।

অতঃপর পাণ্ডুলিপি (১২৯১), ভারতী (১২৯২) ও জীবনস্মৃতি (১৩৬৮) -ধৃত পাঠের তুলনায় আলোচনা করা যাইতেছে। বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে বুঝিতে হইবে তুলনার্থে কেবল পাণ্ডুলিপির ও জীবনস্মৃতির পৃষ্ঠাঙ্ক যথাক্রমে নির্দেশ করা হইয়াছে। জীবনস্মৃতির পৃষ্ঠাঙ্ক -নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে, প্রয়োজন হইলে কোন্ ছত্র উল্লেখ করা হইবে। ছত্র ২ — দ্বিতীয় ছত্র। ছত্র ২ — নিম্ন হইতে গণনায় দ্বিতীয় ছত্র। পাণ্ডুলিপির পাঠসংকলনে যে শব্দ বা শব্দাংশের পূর্বে (×) চিহ্নটি যুক্তভাবে প্রয়োগ করা হইল আর যে শব্দাবলীর পূর্বে ও পরে অযুক্তভাবে ঐ চিহ্নই প্রযুক্ত, সেই শব্দ এবং শব্দাবলী পাণ্ডুলিপিতে লিখিবার পরে বর্জনচিহ্নিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

মুদ্রণপ্রমাদহেতু ভারতীতে (পৃ ৪, ছত্র ৪) 'রজনীগন্ধ' পাই, পাণ্ডুলিপিতে যথাস্থানে তৃতীয় পৃষ্ঠার দ্বিতীয়-তৃতীয় ছত্রে, 'রজনী-গন্ধা' ছিল। ইহা ছাড়া পাণ্ডুলিপিতে—

		উল্লেখ-সংখ্যা
3/২২৬ ছত্র ২	'খেলিত,' স্থলে : খেলিত, এম্‌নি করিয়াই হাসিত, ...	(১)
4/২২৬ ছত্র ৭	'গেল' স্থলে : গেল, একেবারে ছায়া হইয়া গেল, একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল	(২)
5/২২৬ ছত্র ১৩	'অল্প' স্থলে : সামান্য	(৩)
	'হৃদয়েও' স্থলে : হৃদয়ের মধ্যেও স্থান নাই, আর পৃথিবীর উপরেও	(৪)

ছত্র ৫	'সকলে' স্থলে : সকলে একেবারে ··· ···	(৫)
ছত্র ২	'আমাদের' স্থলে কাটিয়া : আমার ··· ···	(৬)
6/২২৭ ছত্র ৭	'গান' শব্দটি ছিল না। ··· ··· ···	(৭)
ছত্র ১৬	'কবির' ছিল না। ··· ··· ···	(৮)
ছত্র ২৪	'প্রিয়ব্যক্তিকে' স্থলে : প্রিয় ব্যক্তিদিগকে ··· ···	(৯)
7/২২৮ ছত্র ১	ভারতী পত্রিকায় বর্জিত এই একটি বাক্যের অনুচ্ছেদ পাণ্ডুলিপি হইতে গ্রন্থে সংকলিত। ··· ··· ···	(১০)
8/২২৮ ছত্র ১১	'সেই' স্থলে : এই ··· ··· ···	(১১)
9/২২৯ ছত্র ৮	'হইতেই' স্থলে : হইতে ··· ··· ···	(১২)
ছত্র ১৮	'কাঁদিয়া' স্থলে : কাঁদিয়া কাঁদিয়া ··· ···	(১৩)
10/২২৯ ছত্র ৯	'সেদিন' স্থলে : সে সেদিন ··· ···	(১৪)
10/২৩০ ছত্র ৮	'শান্তিহীন' স্থলে : শান্তিহীন আশাহীন ··· ···	(১৫)
11/২৩০ ছত্র ১৫	'তাহা··· গুরুতর বলিয়া মনে হয়।' বাক্যটি পাণ্ডুলিপিতে নাই, ভারতীতে পাওয়া যায়। ··· ··· ···	(১৬)
ছত্র ৮	'আমরা কাহার' স্থলে : কার ··· ··· ···	(১৭)
ছত্র ৬	'দৈবক্রমে' স্থলে : দৈবাৎ ··· ··· ···	(১৮)
ছত্র ৫	'তিষ্ঠিয়া' স্থলে : বিরাজ করিতে ··· ···	(১৯)
12/২৩০ ছত্র ৩	ইহার অনুবৃত্তি : দুরাকাঙ্খা সাধন যাহার ব্রত সে কেন প্রেমিক হৃদয়ের উপর আসিয়া পড়ে? কোন্ অভিশাপে প্রেমিকের সহিত তাহার মিলন হয়? যাহার চিরচঞ্চল অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কখন সদর দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করে না, চারি দিকে বাঁকা বাঁকা সিঁধ কাটিয়া আপনার পথ উদ্‌ঘাটন করে সেই সুড়ঙ্গনিবাসী তীক্ষ্ণতা কেন × শেলের মত × সরল হৃদয়ের উপরে শেলের মত নিক্ষিপ্ত হয়? যে লোক স্বার্থপর সে মৃতব্যক্তির মত অতি গুরুভার, সে মাটির উপর চাপিয়া থাকে, কিছুতেই মাটি ছাড়ে না; × অদ দুরদৃষ্টবশতঃ যে দুর্ভাগারা তাহার নীচে পড়ে, তাহাদের একেবারে জীবিতসমাধি। স্বার্থপর তাহার নিজ-দেহের বিপুল মাংসরাশি বিস্তার করিয়া জগতের আর সমস্তই নেপথ্যে রাখিতে চায়। /	(২০)
২৩১ ছত্র ১	'নিষ্ঠুর' স্থলে : গোঁয়ার স্বভাব ··· ···	(২১)
ছত্র ২	'হৃদয়ের' ছিল না। ··· ··· ···	(২২)
ছত্র ৭	'হইবে,' ছিল না। ··· ··· ···	(২৩)
ছত্র ৮	'উপরে' স্থলে : উপরে আর ··· ··· ···	(২৪)
13/২৩১ ছত্র ১১	'সমস্তটা' স্থলে : সবটা ··· ··· ···	(২৫)
ছত্র ১২	'আমরা নিজেই' স্থলে : আমি নিজেই ··· ···	(২৬)

ছত্র ১৫	'দেয়।' স্থলে: দেয়। এ কথা আমার কেমন বিশ্বাস হয় না! ফাঁকি ত ক্ষুদ্রেরাই দেয়, যাহার কিছু নাই সেই ফাঁকি দেয়। ...	(২৭)
	'যাহার রাজ্যে' স্থলে: যেখানে	(২৮)
14/২৩২ ছত্র ১২	'ফেলিয়া দিতে পারে' ছিল না।	(২৯)
20/২৩২ ছত্র ৫	'ধ্বনি' ছিল না।	(৩০)
21/২৩৩ ছত্র ১	'আজিও' ছিল না।	(৩১)
ছত্র ১-২	'তোমার স্বর্গলোকের সংগীতের জন্য ইহাকে ডাকিয়া লও' ছিল না।	(৩২)
ছত্র ৭	ইহার পরে কষি টানিয়া ভারতী-বহির্ভূত নূতন অনুচ্ছেদ:	

আমি ×বলি ভাবিতেছি— আজন্মকাল যে বীণা এত সঙ্গীত জগৎকে দা[ন] করিয়া গিয়াছে, সেও ত মুহূর্ত্তের মধ্যে নীরব হইয়া যায়— তাহার মধুর ধ্বনি দু দণ্ডের স্মৃতি হইয়া অবশেষে অনন্ত কালের মত লুপ্ত হইয়া যায়। তবে আর আ[শ্চর্য্য] কি যে মহৎ হৃদয় ও মধুর হৃদয়দেরও পরিণাম এইরূপ! তাহারা আপন আপন গান শেষ করিয়া কখন বা অসম্পূর্ণ রাখিয়া চলিয়া যায়— তার পরে×কি আর কি সে গান গাহিবে— আর কি সে গান সম্পূর্ণ করিবে!

উল্লিখিত পাঠভেদগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে বক্তব্য এই যে, কতকগুলি কবি-কৃত সংশোধন এবং যোগ বিয়োগ ও পরিবর্তন মনে হয়; কতকগুলি ভারতী পত্রিকার সাধারণ মুদ্রণপ্রমাদমাত্র (উল্লেখসংখ্যা ৫, ৬, ১১, ?১২, ২৪); আর কতকগুলি ছাপাখানার বহুখ্যাত 'কপি ছাড়'এর বিশেষ দৃষ্টান্ত (উল্লেখ-সংখ্যা ১, ২, ৪, ১০, ১৪, ১৫, ২৭)— মুদ্রণ বিষয়ে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা ইহার প্রকার ও প্রকৃতি সহজেই বুঝিবেন।

সপ্তদশখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর অথবা চতুর্থসংস্করণ জীবনস্মৃতির গ্রন্থপরিচয়-ধৃত পাঠ মুখ্যতঃ ভারতী মাসিকপত্রের অনুরূপ তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। একটিমাত্র বাক্য বা অনুচ্ছেদ (জীবনস্মৃতি, পৃ ২২৮, ছত্র ১) পাণ্ডুলিপি হইতে নূতন সংকলন তাহাও ঐ দুটি গ্রন্থে বা পূর্ববর্তী তালিকায় নির্দেশ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের যে গান ও কবিতা আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে প্রথম আবিষ্কৃত এবং পুষ্পাঞ্জলির অঙ্গীভূতই বলা যায়, তাহাদের তালিকা ও বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে। ইহার কতকগুলি, রচনার কিছুকালের মধ্যে বিভিন্ন নামে রূপে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়; পরে গানগুলি রবিচ্ছায়ায় (১২৯২ বৈশাখ) ও কবিতাগুলি কড়ি ও কোমল (১২৯৩) কাব্যে সংকলিত। নিম্নতালিকায় প্রত্যেক উল্লেখের পূর্বেই পূর্ববৎ পাণ্ডুলিপির ও জীবনস্মৃতি (১৩৬৮) গ্রন্থের পৃষ্ঠা যথাক্রমে নির্দেশ করা হইবে।

পাণ্ডুলিপিতে—

14/২৩২	জীবনস্মৃতি-ধৃত প্রথম অনুচ্ছেদের পরে: সিন্ধু কাফি।/কেহ কারো মন বুঝে না ইত্যাদি (১)
15/২৩২	দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পরে: অভিমান ক'রে কোথায় গেলি ইত্যাদি (২)

17/	পূর্বানুবৃত্তি : থাক্ থাক্ চুপ কর্ তোরা ইত্যাদি (৩)
19/	পূর্বানুবৃত্তি : ললিত। / তোরা বসে গাঁথিস্ মালা ইত্যাদি (৪) ভৈরবী / কেন এলিরে, ভাল বাসিলি ইত্যাদি (৫)
20/	পূর্বানুবৃত্তি : মিশ্র পূরবী / যে ফুল ঝরে সেই ত ঝরে ইত্যাদি (৬) ভৈরবী / কেনরে চাস্ ফিরে ফিরে ইত্যাদি (৭)
21/২৩৩	সর্বশেষে, অর্থাৎ মুদ্রিত সর্বশেষ অনুচ্ছেদের অনুবর্তী যে অপ্রকাশিতপূর্ব অনুচ্ছেদ বর্তমান পাণ্ডুলিপি-বিবরণে সংকলিত তাহার পরেই : খট্, ললিত। / ওকে কেন কাঁদালি ইত্যাদি (৮)
22/	পূর্বানুবৃত্তি : কোথায়! / হায়, কোথা যাবে! ইত্যাদি (৯)

উল্লিখিত তালিকার বিভিন্ন গান ও কবিতা সম্পর্কে (তালিকাধৃত ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখ -পূর্বক) জ্ঞাতব্য তথ্য ও প্রয়োজনীয় সংকলন পরে দেওয়া যাইতেছে।—

২

'আকুল আহ্বান।' শিরোনামে বালক মাসিক পত্রের ১২৯২ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় (পৃ ৩২৭-২৯) মুদ্রিত ; উহাতে বহু এবং বিচিত্র পাঠান্তর আছে, ছত্র সংখ্যা বাড়িয়া ৩৬ স্থলে ৭৬ হইয়াছে। সাজানোর কৌশলে ছত্র সংখ্যা কম-বেশি হয় নাই। (বালকের পাঠ বর্তমান পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনার শেষে স্বতন্ত্র ভাবে সংকলন করা হইল।)

বস্তুতঃ বালকের ১টি কবিতা ভাঙিয়া, ৮টি ছত্র (ছত্রাঙ্ক ২৯-৩৬) বাদ দেওয়ার পরেও কড়ি ও কোমল কাব্যের প্রথম প্রকাশ কালেই ৩টি কবিতা হইয়াছে : পাষাণী মা (পৃ ৪৭), আকুল আহ্বান (পৃ ৯৯), মায়ের আশা (পৃ ১০১)। বালক পত্রে ইহাদের ছত্রাঙ্ক হইবে যথাক্রমে ৪১-৫৬, ১-২৮ ও ৩৭-৪০, ৫৭-৭৬।

শিশু গ্রন্থে (সপ্তমভাগ কাব্যগ্রন্থ / ১৩১০ আশ্বিন) সম্ভবতঃ ইহার শেষ বিবর্তন দেখা যায়। কবিতার শিরোনাম 'আকুল আহ্বান' থাকিয়াছে, বালক পত্রের যতটা ইহাতে সংযুক্তভাবে আছে তাহার ছত্রাঙ্ক দেওয়া যাইতেছে : ৫-২৪, ৩৭-৪০, ৫৭-৬৪, ৬৯-৭৬। বালক অথবা কড়ি ও কোমল কাব্য, যে কোনোটির সহিত তুলনা করিলে শব্দগত বহু পাঠভেদ পাওয়া যাইবে ; শিশুর পরবর্তী মুদ্রণে বা সংস্করণে ঐরূপ আরও পরিবর্তন কবি করিয়াছেন, তাহা মুখ্যতঃ ছন্দের শ্রুতিমাধুর্য বিবেচনা করিয়া করা হইয়াছে এরূপ মনে হয়।

আকুল আহ্বানের মূল যে পাঠ পুষ্পাঞ্জলিতে পাওয়া যায় তাহা নিম্নে সংকলিত হইল :

অভিমান ক'রে কোথায় গেলি,
ও মা, ফিরে আয়!

দিন রাত কেঁদে কেঁদে ডাকি
ও মা ফিরে আয়!
সন্ধে হয়ে এল, আমার গৃহ অন্ধকার,
মাগো, প্রদীপ জ্বলে না!
সবাই ফিরে এল ঘরে একে একে গো
আমায়— মা ত কেউ বলে না!
ঐ সময় হ'য়ে এল যে মা বেঁধে দেব চুল
তোরে পরিয়ে দেব রাঙা কাপড়খানি!
বাছারে সেই মুখ্‌খানি তোর আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে
চাঁদ মুখের শুন্‌ব ছুটি বাণী!

কি খেলা খেলালি আজি মা,
অনাদর কে তোরে করেছে,
চোখের জলে চলে গেলি রে,
মা তোর, মলিন মুখ মনে পড়েছে!
সেই বড় বড় আঁখি ছুখানি,
রৈলি যখন মুখের পানে তুলে,
বড় স্নেহে গেলি তাদের কাছে
তবু তারা নিলে না কি কোলে!
এ জগৎ কঠিন— কঠিন—
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া,
সেই খানে তুই আয় রে বাছা আয়,
এত ডাকি দিবিনে কি সাড়া!

ফুলের দিনে সে যে চলে গেল,
ফুল-ফোটা সে দেখে গেল না,
তারি গাছে এত ফুল ফুটেছে
একটি সে ত পর্‌তে পেল না!
সে ফুলগুলি তোরা পরিস্ কেন,
সে বুঝি বা পর্‌বে ফিরে এসে!
ও-গুলি সব কুড়িয়ে রেখে দিই,
দেখা হলে পরাব তার কেশে!

সন্ধ্যা বেলায় শূন্য কোলে ব'সে—
এখন্ কি মা ছেড়ে থাক্‌তে আছে !
আঁধার হল, সবাই ঘরে এল
ফিরে আয় মা, ফিরে আয় মা কাছে !

৩

'শান্তি' শিরোনামে ও বহু পরিবর্তনে ১২৯২ শ্রাবণের ভারতীপত্রে (পৃ ১৯৮) ও কড়ি ও কোমল (১২৯৩) কাব্যে প্রকাশিত। নানা পাঠভেদ সত্ত্বেও সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে মোটের উপর মিল আছে, মূল রচনা হইতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পার্থক্য কতদূর তাহা পুষ্পাঞ্জলির যে পাঠ নিম্নে সংকলন করা গেল তাহার সহিত তুলনায় বুঝা যাইবে।

থাক্ থাক্ চুপ কর্ তোরা !
ও— আমার ঘুমিয়ে পড়েছে ;—
আবার যদি জেগে ওঠে বাছা
কান্না দেখে কান্না পাবে যে !

ওর— ফুরিয়েছিল সাধের খেলাধুলা,
ওর— বুকের মাঝে ছিল পাষাণ ভার,—
ও কেঁদে কেঁদে আজ ঘুমোলো
ওরে তোরা কাঁদাস্ নে আর !

ওর— বুকফাটা স্বর শুনিস্ নি কি তোরা ?
অসহায় প্রাণের বেদনা
চাঁদের পানে দেখ্‌ত শুধু চেয়ে,
কোথাও কি ওর ছিলরে সান্তনা !
সবার পরে ছিল ভালবাসা,
কোথায় পাবি এত কোমল স্নেহ,
সবার তরে কান্না পেত ওর—
ওর তরে কি কেঁদেছিলি কেহ !
যে গাছে ও জল দিতরে
কাঁটা তারি ফুটে যেত পায়—
তবু কি ও কথাটি বলেছে,
ওর চোখের ভাষা কে বুঝিত হায় !

আহা আজ ঘুমিয়ে পড়েছে,
এমন ঘুম বুঝি ঘুমোত না,
রাতে বুঝি হৃদয় নিয়ে তার
খেলাইত অশান্ত বেদনা!
কত রাত গিয়েছে এমন
বয়েছেরে বসন্তের বায়,
পূবের জানালা দিয়ে ধীরে
চাঁদের আলো পড়েছে ওর গায়!
কত রাত গিয়েছে এমন
দূর হতে বাজিতরে বাঁশি!
স্বরগুলি কেঁদে কেঁদে ফিরে
বিছানার কাছে কাছে আসি।
কত রাত গিয়েছে এমন
কোলেতে বকুল ফুল রাশ,
নতমুখে উলটি পালটি
চেয়ে চেয়ে ফেলেছে নিশ্বাস!

সে সব রজনী পোহাল রে,
ফুরাল রে হৃদয়-বেদনা,
এখন তবে ঘুমোক্ আরামে,
বাছা আর কেঁদনা কেঁদনা!

৯

ভারতী পত্রের ১২৯১ পৌষ সংখ্যায় (পৃ ৪০৮) প্রকাশিত ও পরে কড়ি ও কোমল (১২৯৩) কাব্যে সংকলিত। মূলে ৯টি স্তবক, পঞ্চম স্তবকটি ভারতীতে এবং গ্রন্থে বর্জিত; সেটি এই:

যারা তব আদরের ধন,
বড় যারা ছিল রে আপন,
যদিরে তাদের কাছে প্রাণ মন যেতে চায়,
আর নাহি পাবে!
হায়, কোথা যাবে!

প্রথম ৪টি স্তবকে বিন্যাসেরও প্রভেদ এই দেখা যায় যে, মূলের অথবা ভারতীর স্তবক ১, ২, ৩ ও ৪ গ্রন্থে যথাক্রমে স্তবক ১, ৩, ৪ ও ২ হইয়াছে। ইহা ছাড়া ছত্রে ছত্রে বহু পাঠভেদ অবশ্যই আছে।

১, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ -সংখ্যক রচনা গান ; সামান্য পাঠান্তরে অথবা বিনা পরিবর্তনে ১২৯২ বৈশাখের রবিচ্ছায়া গ্রন্থে সংকলিত। ৪-সংখ্যক গানটি ভারতী পত্রিকার ১২৯১ কার্তিক সংখ্যায় (পৃ ১৯১) প্রকাশিত ; শিরোনাম ছিল : হায়। /

জীবনস্মৃতির 'মৃত্যুশোক' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন : 'আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশু বয়সের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়, কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী, নূতন-বৌঠান কাদম্বরীদেবীর আকস্মিক ও অকাল মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ এই মর্মান্তিক দুঃখ-আঘাত লাভ করেন তাহা রবীন্দ্রজীবনের আলোচনায় জানা যায়। ১২৯১ বৈশাখের ৮ তারিখে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হয়।[১] রবীন্দ্রনাথের তখনকার মনোভাব বহু বৎসর পরে তিনি জীবন-স্মৃতির উল্লিখিত অধ্যায়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সদ্য-শোকের অভিঘাতে অভিভূত চিত্তের বেদনা ও বিমূঢ়তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে আলোচ্য পাণ্ডুলিপির গদ্য অনুচ্ছেদগুলিতে, কবিতায়, গানে। ভারতী পত্রে এগুলির প্রথম প্রকাশের বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে। মর্মান্তিক দুঃখের অভিজ্ঞতায় ১২৯১ সনের প্রথম দিকেই এগুলির রচনা তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সম্ভবতঃ বৈশাখ মাসেই। এক দিনের রচনা নহে (না হইবারই কথা) তাহার ইঙ্গিতও রচনার মধ্যেই রহিয়াছে। কেননা তৃতীয় অনুচ্ছেদে (6/২২৭, নূতন অনুচ্ছেদের ছ ৪-৫) বলা হইয়াছে : 'প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার এই কথাগুলি তোমাকে বলিতেছি'।

জীবনের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত এবং ব্যক্তিগত, এজন্য এগুলি সঙ্গে সঙ্গে ছাপা হয় নাই ; কোনো কালে ছাপা উচিত কিনা হয়তো সে বিষয়েও দ্বিধা ও সংশয় ছিল। বৎসর ঘুরিয়া গেলে প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকীর[২] অর্ঘ্য বা পুষ্পাঞ্জলি রূপে ভারতী পত্রের প্রথমেই[৩] গদ্যাংশের প্রায় সবটা মুদ্রিত হয়।

পুষ্পাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি হইতে একটি গান ও একটি কবিতা ১২৯১ সনের ভারতী পত্রে, অতঃপর এক-একটি কবিতা ১২৯২ সনের ভারতীতে ও বালকে প্রকাশিত হয় এ বিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে।

---

১ কাদম্বরী [কাদম্বিনী] দেবী। জন্ম, ২১ আষাঢ় ১২৬৬/৪ জুলাই ১৮৫৯/১৬।৫০।০ ॥ বিবাহ, ২৩ আষাঢ় ১২৭৫/৫ জুলাই ১৮৬৮ ॥ মৃত্যু, ৮ বৈশাখ ১২৯১/১৯ এপ্রিল ১৮৮৪ ॥ পিতা শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়, নিবাস কলিকাতা ॥

২ সম্পাদকরূপে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের নাম থাকিলেও, ভারতী বস্তুতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানসকন্যা', এবং কাদম্বরী-দেবীর প্রেরণাও ইহার পিছনে ছিল ইহা নানা সূত্রে জানা যায়। বিশেষ দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত (১৩৫১ কার্তিক-পৌষ) 'ভারতীর ভিটা' প্রবন্ধ (জীবনস্মৃতির গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত, পৃ ১৯৮-৯৯)। কাদম্বরীদেবী যে রবীন্দ্রনাথের আবাল্য 'সাহিত্যের সঙ্গী' ছিলেন তাহা জীবনস্মৃতি হইতে জানা যায় ; 'সাহিত্যের সঙ্গী' অধ্যায় বিশেষ দ্রষ্টব্য।

৩ ঠিক প্রথমে নয়— ভারতী পত্রের নূতন সম্পাদিকার যৎসামান্য নিবেদন দিয়া নূতন বর্ষের সূচনা। তাহার পরেই দ্বিতীয় পৃষ্ঠা হইতে রবীন্দ্রনাথের 'নূতন' কবিতা— 'পুরাতন' শীর্ষক কবিতা ছাপা হয় এক মাস আগে ভারতী পত্রের ১২৯১ চৈত্র সংখ্যায়— উভয় কবিতাতেই কাদম্বরীদেবীর মৃত্যু-শোকের ছায়াপাত আছে, গূঢ় গভীর মর্মবেদনার ব্যঞ্জনা আছে ; উভয়ই অল্পকাল পরে কড়ি ও কোমল কাব্যে সংকলিত হয়।

পুষ্পাঞ্জলির গদ্যরীতি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গদ্যরচনার রীতি হইতে বিশেষ ভাবেই পৃথক্। গদ্য হইলেও ইহার অন্তর্নিহিত ছন্দঃস্পন্দ একেবারে অগোচর অননুভূত থাকে না। আর ইহা বহুগুণে স্পষ্ট হইয়া উঠে বহুপরবর্তী লিপিকার প্রথম অংশের কতকগুলি রচনায়;[৪] সেগুলিই আরও পরের পুনশ্চ কাব্যের গদ্য ছন্দের নিদান তাহাও শেষোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হইয়াছে।

লিপিকার যে রচনাগুলিতে পুষ্পাঞ্জলির ভাব ভাষা অথবা বিষয়ের ছায়াপাত হইয়াছে, প্রথম প্রকাশের উল্লেখ-সহ নিম্নে সেগুলির তালিকা দেওয়া গেল :

১	বাঁশি	সবুজ পত্র	কার্তিক ১৩২৬
২	সন্ধ্যা ও প্রভাত	মানসী ও মর্মবাণী	কার্তিক ১৩২৬
৩	কৃতঘ্ন শোক	ভারতী	কার্তিক ১৩২৬
৪	সতেরো বছর	ভারতী	কার্তিক ১৩২৬
৫	প্রথম শোক	সবুজ পত্র	আষাঢ় ১৩২৬

তালিকার প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ রচনায় পুষ্পাঞ্জলির নির্দিষ্ট কতকগুলি অংশের ভাব অথবা ভাষার কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। বিষয় একই, অথচ সর্বাঙ্গীণ ভাবান্তর ও রূপান্তরের ফলে আশ্চর্যজনক। আর, তালিকার সর্বশেষ রচনা ভাবে ভাষায় একেবারে স্বতন্ত্র হইলেও, বিষয়ের দিক দিয়া পুষ্পাঞ্জলিকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া গেলেও, যে অভিজ্ঞতা হইতে পুষ্পাঞ্জলির উদ্ভব তাহারই সৌম্য শান্ত পরিণামকে ব্যক্ত করিতেছে, সমগ্র পুষ্পাঞ্জলির অপূর্ব ফলশ্রুতি শুনাইয়া আমাদের চমৎকৃত করিতেছে অবশ্যই বলা চলে : 'যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।' সুদীর্ঘকাল গহন মনের 'ছায়াতলে গোপনে বসে' ছিল, এই অভাবিত রূপান্তরে তাহাকে বরণ করা হইবে বলিয়া। 'পঁচিশ বছরের যৌবন' তাহার 'গলার হার' হইয়াছে, 'সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপড়িও খসে নি।'

পুষ্পাঞ্জলির সহিত ভাব অথবা ভাষার দিক দিয়া লিপিকার যে রচনাগুলিতে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়, অতঃপর সংকলন করা গেল। সংকলিত পুষ্পাঞ্জলির পাঠ পাণ্ডুলিপি-সম্মত, লিপিকার পাঠ প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ -অনুসারে। পুষ্পাঞ্জলির ক্ষেত্রে, মার্জিনে পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া গেল। দণ্ডচিহ্নের পরের সংকলন নূতন অনুচ্ছেদ বা নূতন অনুচ্ছেদের অংশ বুঝিতে হইবে।

১

3 পুষ্পাঞ্জলির সূচনা (জীবনস্মৃতি, পৃ ২২৫) : সূর্য্যদেব তুমি কোন্ দেশ অন্ধকার করিয়া এখানে উদিত হইলে? কোন্‌খানে সন্ধ্যা হইল? এ দিকে তুমি জুঁইফুল-গুলি ফুটাইলে, কোন্‌খানে রজনীগন্ধা ফুটিতেছে? ইত্যাদি

লিপিকার 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' রচনায় ইহার বিশেষ রূপান্তর, 'প্রভাত' হইয়াছে 'সন্ধ্যা' : এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব, কোন্ দেশে কোন্ সমুদ্রপারে তোমার প্রভাত হ'ল?/ অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠ্‌চে রজনীগন্ধা,… কোন্‌খানে ফুট্‌ল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা? ইত্যাদি

৪ এ বিষয়ে প্রথম উল্লেখ ও আলোচনা করেন শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; রবীন্দ্রজীবনী ১ (১৩৪০), পৃ ১৫১।

২

8/ পুষ্পাঞ্জলিতে (জীবনস্মৃতি, পৃ ২২৮) একটি অনুচ্ছেদের সূচনায় : আমাকে যাহারা চেনে সকলেই ত আমার নাম ধরিয়া ডাকে,… সকলকেই কিছু একই ব্যক্তি সাড়া দেয় না !… সে আমাকে কতদিন হইতে জানিত ;— আমাকে কত প্রভাতে, কত দ্বিপ্রহরে, কত সন্ধ্যাবেলায় সে দেখিয়াছে ! কত বসন্তে, কত বর্ষায় কত শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম।… সে আমাকে যখন ডাকিত, তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই, আমার এই সতের বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধূলা লইয়া তাহাকে সাড়া দিত।… / আমি কেবল ভাবিতেছি, এমন ত আরও সতের বৎসর যাইতে পারে !… তাহার সহিত তাঁহার ত কোন সম্পর্কই থাকিবে না ! ইত্যাদি

লিপিকায় 'সতেরো বছর'এর সূচনা : আমি তার সতেরো বছরের জানা। / … কখনো বা ভোরের ভাঙা ঘুমে শুকতারার আলো, কখনো বা আষাঢ়ের ভর-সন্ধ্যায় চামেলি ফুলের গন্ধ, কখনো বা বসন্তের শেষ প্রহরে ক্লান্ত নহবতের পিলু-বারোয়াঁ, সতেরো বছর ধরে এই সব গাঁথা পড়েছিল তার মনে। / আর তারি সঙ্গে মিলিয়ে সে আমার নাম ধরে ডাকৃত। ঐ নামে যে-মানুষ সাড়া দিত… সে যে তারই সতেরো বছরের জানা দিয়ে গড়া… / তার পরে আরো সতেরো বছর যায়। কিন্তু এর দিনগুলি এর রাতগুলি সেই নামের রাখি-বন্ধনে আর ত এক হয়ে মেলে না,— ইত্যাদি

৩

12 পুষ্পাঞ্জলিতে (জীবনস্মৃতি, পৃ ২৩০) একটি অনুচ্ছেদের সূচনায় : হৃদয়ে যখন গুরুতর আঘাত লাগে তখন সে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজেকে আরও যেন অধিক পীড়া দিতে চায়। এমন কি, সে তাহার আশ্রয়ের মূলে কুঠারাঘাত করিতে থাকে।… কেহ যদি তাহাকে সান্তনা করিতে আসিয়া বলে— "এত প্রেম, এত স্নেহ, এত সহৃদয়তা, তাহার পরিণাম কি ঐ খানিকটা ভস্ম ! কখনই নহে !" তখন সে যেন উদ্ধত হইয়া বলে, "আশ্চর্য্য কি ! তেমন সুন্দর মুখখানি,— কোমলতায় সৌন্দর্য্যে লাবণ্যে হৃদয়ের ভাবে আচ্ছন্ন সেই জীবন্ত চলন্ত দেহখানি সেও যে—, আর কিছু নয়, দুই মুঠা ছাইয়ে পরিণত এই বা কে হৃদয়ের ভিতর হইতে বিশ্বাস করিতে পারিত ! বিশ্বাসের উপরে আর বিশ্বাস কি !" এই বলিয়া সে বুক ফাটিয়া কাঁদিতে থাকে। … … … … …

13 হৃদয়ের এই অন্ধকারের সময় আশ্রয়কে আরো বেশী করিয়া ধরি না কেন ?… বিশ্বের নিয়ম কখনই এত ভয়ানক ও এত নিষ্ঠুর হইতেই পারে না ! সে আমাকে… আশ্রয় দিবেই ! ইত্যাদি

লিপিকার 'কৃতঘ্ন শোক' রচনায় : বন্ধু এসে বল্‌লেন, "যা ভালো তা সত্য, তা কখনো যায় না ; সমস্ত জগৎ তাকে রত্নের মত বুকের হারে গেঁথে রাখে।" / আমি রাগ করে' বল্‌লেম, "কি করে' জান্‌লে ? দেহ কি ভালো নয় ?··· / ছোট ছেলে যেমন রাগ করে' মাকে মারে তেমনি করেই বিশ্বে আমার যা-কিছু আশ্রয় সমস্তকেই মারতে লাগ্‌লেম। বল্‌লেম, "সংসার বিশ্বাসঘাতক।" / ··· তারা-ছিটিয়ে-দেওয়া অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি ভর্ৎসনা এল··· ইত্যাদি

৪

9 পুষ্পাঞ্জলিতে (জীবনস্মৃতি, পৃ ২২৯) একটি অনুচ্ছেদের সূচনায় : কোথায় নহবৎ বসিয়াছে। সকাল হইতে না হইতে বিবাহের বাঁশি বাজিয়া উঠিয়াছে।··· বাঁশি বাজাইয়া যে সকল উৎসব আরম্ভ হয়, সে সব উৎসবও কখন একদিন শেষ হইয়া যায় ! তখন আর বাঁশি বাজে না ! বাপমায়ের যে স্নেহের ধনটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশেষে কঠিন পৃথিবী হইতে নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায়··· সে ছেলেমানুষ ছিল··· বাঁশির গানের মধ্যে, হাসির মধ্যে, লোকজনের আনন্দের মধ্যে, চারিদিকে ফুলের মালা ও দীপের আলোর মধ্যে, সেই ছোট মেয়েটি গলায় হার পরিয়া পায়ে দু-গাছি মল পরিয়া বিরাজ করিতেছিল।··· /

10 কিন্তু সেদিনকার সকালবেলার মধুর বাঁশি কি এত কথা বলিয়াছিল ?··· এই বাঁশি বাজাইয়া কত হৃদয় দলন হইতেছে, কত জীবন মরুভূমি হইয়া যাইতেছে, কত কোমল হৃদয় আমরণকাল অসহায়ভাবে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্ত··· ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছে— অথচ একটি কথা বলিতেছে না··· হৃদয়ের মধ্যে চিরপ্রচ্ছন্ন তুষের আগুন। ইত্যাদি

লিপিকার 'বাঁশি'তে : আজ ভোরবেলাতেই উঠে শুনি, বিয়ে-বাড়িতে বাঁশি বাজ্‌চে। / বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সঙ্গে, প্রতিদিনের সুরের মিল কোথায় ? গোপন অতৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য ; অবহেলা অপমান অবসাদ ; তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য— বাঁশির দৈববাণীতে এ-সব বার্ত্তার আভাস কোথায় ? / ··· মালা-বদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠ্‌ল তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে দু'গাছি মল, সে যেন কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপরে দাঁড়িয়ে। ইত্যাদি

পুষ্পাঞ্জলি পাণ্ডুলিপির সমুদয় রচনা ১২৯১ বৈশাখে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর অল্পকালের মধ্যে লেখা হইয়া থাকিবে পূর্বে বলা হইয়াছে। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বহির্দেশে (P 25-59) শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী দেশী-বিদেশী বাণীগুলি চয়ন করিয়াছেন কিছুকাল ধরিয়া এরূপ মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের যে-সব উক্তি

সংকলন করা হইয়াছে তন্মধ্যে ছিন্নপত্রের নানা অংশ আছে, এগুলি মূল পত্র হইতে সংকলিত হওয়া অসম্ভব নয়। তাহা ছাড়া পঞ্চভূত এবং বিচিত্র প্রবন্ধেরও নানা অংশ দেখা যায়, তন্মধ্যে সাময়িক পত্রে ১৩০৯ সনে প্রকাশ পাইয়াছে এমন রচনাও রহিয়াছে।

মোটের উপর বর্তমান পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, ইহার বিভিন্ন রচনা ১২৯১-৯২ সনে ভারতী পত্রিকায় ও বালক পত্রে, ১২৯২ সনে রবিচ্ছায়া গ্রন্থে এবং ১২৯৩ সনে কড়ি ও কোমল কাব্যে প্রকাশিত হইলে, রবীন্দ্রনাথ এখানি শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীকে দিয়া দেন।

মুখের পানে চেয়ে দেখ, আঁখিতে মিলাও আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখো না ঢাকি!
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না,
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায় হায়!

— ৯ —

তোমার মৃত শয্যানে যখন চারিদিকের ফুল ফুটিয়াছে, তখন সে তোমাকে দেখিতে পাইল না, তাহাতে তেমন আক্ষেপ নাই। কিন্তু যখন দেখি ঘরে ঘরে রোগের মূর্ত্তি, তখন যে রোগীর শিয়রের কাছে তুমি বসিয়া নাই, এ যে কেমন বিশ্বাস হয় না। উৎসবের মধ্যে তুমি নাই, বিলাপের মধ্যে তুমি নাই, রোদনের মধ্যে তুমি নাই! তোমার ঘরে যে প্রতিদিন অতিথি আসিতেছে— হৃদয়ের সরল প্রীতির সহিত তাহাদিগকে কেহ যে আদর করিয়া বসাইতে পারে না। তুমি যাহাকে বড় ভাল বাসিতে সেই [illegible] সে আজ সন্ধ্যা বেলায় আসিয়াছে— তাহাকে আদর করিয়া খেতে দিবে কে! এখন আর কে তাহাকে দেখিবে: যে অপরিমিত প্রীতি স্নেহ মমতায় সমস্ত সংসার অভিষিক্ত ছিল সে নির্ঝর শুষ্ক হইয়া গেল — এখন কেবল কতকগুলি দৃঢ় স্বার্থপর কঠিন পাষাণখণ্ড অনাবৃত ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল!

— ১০ —

অভিমান ক'রে কোথায় গেলি,
'ও মা, ফিরে আয়!
দিন রাত কেঁদে কেঁদে ডাকি
ও মা ফিরে আয়!
সাঁঝ হয়ে এল, আমার দুয়ার অন্ধকার,
ঘরেতে, প্রদীপ জ্বলে না!
সবাই ফিরে এল ঘরে একে একে গো
আমায় — মা ও কেউ বলে না!
ঐ সময় হ'য়ে এল যে মা ঠেঁটে চেঁকে ফুল
তোরে পাইলে দেব খোঁপায় বাঁধি।

আকুল আহ্বান।

১ অভিমান ক'রে কোথায় গেলি,
আয় মা ফিরে, আয় মা ফিরে আয়!
দিন রাত কেঁদে কেঁদে ডাকি
৪ আয় মা ফিরে, আয় মা, ফিরে আয়!
সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার,
মাগো, হেথায় প্রদীপ জলেনা!
একে একে সবাই ঘরে এল,
৮ আমায় যে, মা, মা কেউ বলে না!
সময় হ'ল বেঁধে দেব চুল,
পরিয়ে দেব রাঙা কাপড় খানি।
সাঁজের তারা সাঁজের গগনে—
১২ কোথায় গেল, রাণী আমার রাণী!

(ওমা) রাত হ'ল, আঁধার করে আসে
ঘরে ঘরে প্রদীপ নিবে যায়।
আমার ঘরে ঘুম নেইক শুধু—
১৬ শূন্য শেজ শূন্যপানে চায়।
কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে ভরা,
(সেই) নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে!
শ্রান্ত দেহ ঢুলে ঢুলে পড়ে
২০ (তবু) মায়ের তরে আছে বুঝি চেয়ে!

আঁধার রাতে চলে গেলি তুই,
আঁধার রাতে চুপি চুপি আয়।
কেউ ত তোরে দেখ্‌তে পাবে না,
২৪ তারা শুধু তারার পানে চায়।
পথে কোথাও জন প্রাণী নেই,
ঘরে ঘরে সবাই ঘুমিয়ে আছে।
মা তোর শুধু একলা দ্বারে বসে,
২৮ চুপি চুপি আয় মা মায়ের কাছে।

আমি তোরে লুকিয়ে রেখে দেব,
রেখে দেব বুকের মধ্যে কোরে—
থাক্ মা সে তার পাষাণ হৃদি নিয়ে
৩২ অনাদর যে করেছে তোরে।
মলিন্ মুখে গেলি তাদের কাছে,
তবু তারা নিলেনা মা কোলে?
বড় বড় আঁখি দুখানি
৩৬ রৈলি তাদের মুখের পানে তুলে?
এ জগৎ কঠিন—কঠিন—
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া,
সেইখানে তুই আয় মা ফিরে আয়,
৪০ এত ডাকি দিবিনে কি সাড়া?

৪১ হে ধরণী, জীবের জননী,
শুনেছি যে মা তোমায় বলে!
তবে কেন তোর কোলে সবে
৪৪ কেঁদে আসে কেঁদে যায় চ'লে!
তবে কেন তোর কোলে এসে
সন্তানের মেটে না পিপাসা!
কেন চায়—কেন কাঁদে সবে,
৪৮ কেন কেঁদে পায়না ভালবাসা!
কেন হেথা পাষাণ পরাণ!
কেন সবে নীরস নিষ্ঠুর!
কেঁদে কেঁদে দুয়ারে যে আসে
কেন তারে করে দেয় দূর!
৫৩ কেঁদে যে জন ফিরে চলে যায়,
তার তরে কাঁদিস্নে কেহ,
এই কি মা, জননীর প্রাণ,
৫৬ এই কি মা জননীর স্নেহ!

৫৭ ফুলের দিনে সে যে চলে গেল,
ফুল-ফোটা সে দেখে গেল না,
ফুলে ফুলে ভরে গেল বন

৬০ একটি সে ত পর্‌তে পেল না।
ফুল ফোটে, ফুল ঝ'রে যায়—
ফুল নিয়ে আর সবাই পরে,
ফিরে এসে সে যদি দাঁড়ায়,
৬৪ একটিও রবে না তার তরে!
তার তরে মা কেবল আছে,
আছে শুধু জননীর স্নেহ,
আছে শুধু মা'র অশ্রুজল,
৬৮ কিছু নাই—নাই আর কেহ!
খেল্‌ত যারা তারা খেল্‌তে গেছে,
হাস্‌ত যারা তারা আজো হাসে,
তার তার [তরে] কেহ ব'সে নেই
৭২ মা শুধু রয়েছে তারি আশে!
হায়, বিধি, এ কি ব্যর্থ হবে!
ব্যর্থ হবে মার ভালবাসা!
কত জনের কত আশা পুরে,
৭৬ ব্যর্থ হবে মার প্রাণের আশা!

—বালক। আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২। পৃ ৩২৭-২৯

পাঠপরিচয়॥ উল্লিখিত কবিতার পাণ্ডুলিপি-ধৃত ও বালক পত্রে মুদ্রিত দুটি পাঠের পার্থক্য সম্পর্কে পূর্বপ্রবন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে। পাঠক নিজেও তুলনায় আলোচনা করিতে পারিবেন। বালক পত্রের পরিবর্ধিত পাঠ কড়ি ও কোমল (১২৯৩) কাব্যে, কাব্যগ্রন্থাবলী-ভুক্ত (১৩০৩ আশ্বিন) কড়ি ও কোমলের পরবর্তী সংস্করণে ও শিশু কাব্যে (কাব্যগ্রন্থ / সপ্তমভাগ / ১৩১০ আশ্বিন) উত্তরোত্তর আরও কিভাবে পরিবর্তিত হয় তাহাও সংকলিত কবিতার (বালক-ধৃত পাঠের) ছত্রাঙ্ক নির্দেশে এস্থলে সংক্ষেপে বলা যায়। (কড়ি ও কোমল কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০১) প্রথম সংস্করণের অনুসরণে 'আকুল আহ্বান' মুদ্রিত, কিন্তু 'পাষাণী মা' ও 'মায়ের আশা' বর্জিত।) উল্লিখিত পাঠে ছত্রাঙ্ক আমাদের আরোপিত, নহিলে পাঠ সর্বাংশে বালক পত্রের প্রতিরূপ।

কড়ি ও কোমল (১২৯৩)

ছত্র ১-৪০ লইয়া আকুল আহ্বান কবিতা। তন্মধ্যে ছত্র ২৯-৩৬ বর্জিত। কড়ি ও কোমল, পৃ ৯৯-১০০

ছত্র ৪১-৫৬, পাষাণী মা কবিতা। পরিবর্তিত পাঠে ছত্র ৫৩: কাঁদিয়া যে ফিরে চলে যায় / পৃ ৪৭

ছত্র ৫৭-৭৬, মায়ের আশা কবিতা। পৃ ১০০-১০১

কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩) -ভুক্ত

কড়ি ও কোমল

আকুল আহ্বান। ৮ ছত্রের ৫টি স্তবকে বালক-পত্রের এই ছত্রগুলি পর-পর সংকলিত— ছত্র ৫-২৪, ৩৭-৪০, ৫৭-৬৪ এবং ৬৯-৭৬। পরিবর্তন— ছত্র ১৯, 'ঢুলে ঢুলে পড়ে' স্থলে : ঢুলে পড়ে, তবু / ছত্র ২০, '(তবু)' বর্জিত। কাব্যগ্রন্থাবলী, পৃ ১১৮

শিশু

কাব্যগ্রন্থ / সপ্তম ভাগ (১৩১০)

আকুল আহ্বান। ৮ ছত্রের ৫টি স্তবকে পূর্ববর্তী পাঠেরই পুনর্মুদ্রণ বলা যায়; নূতনত্ব এই যে, অতিপর্বিক (ওমা) এবং (সেই) বর্জিত। কাব্যগ্রন্থ, সপ্তম, পৃ ১৪৯-৫১

শিশুর প্রচলিত স্বতন্ত্র সংস্করণে পূর্বোক্ত 'আকুল আহ্বান' কবিতায় আরও কিছু পাঠভেদ পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, যেমন—

ছত্র ১৩, 'রাত হল' স্থলে : রাত্রি হল।

ছত্র ৬১-৬২ পরিবর্তিত পাঠ :

ফুল যে ফোটে, ফুল যে ঝরে যায়—
ফুল নিয়ে যে আর-সকলে পরে, /

ছত্র ৭১-৭২ পরিবর্তিত :

তার তরে তো কেহই বসে নেই,
মা যে কেবল রয়েছে তার আশে। /

ছত্র ৭৩, 'হায়' ও 'এ কি' স্থলে : হায় রে / সব কি /

ছত্র ৭৪, 'মার' স্থলে : মায়ের /

ছত্র ৭৬, 'প্রাণের' স্থলে : প্রাণেরই।

কবি এ-সকল পরিবর্তন করেন প্রধানতঃ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের অষ্টমখণ্ড কাব্যগ্রন্থে আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহার পরেও স্বতন্ত্র শিশু কাব্যে।

কানাই সামন্ত

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ। ৩য় খণ্ড। নেপাল মজুমদার। চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড। ৭৭।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। বার টাকা।

রবীন্দ্রনাথের ভাবভুবন এত বড় যে তার যে কোনো বিভাগ নিয়েই এক-একখানি বই হতে পারে। কার্যত হয়েছেও তাই। কেউ লিখেছেন তাঁর স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে, কেউ আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে, কেউ ধর্ম-প্রবক্তা বা শিক্ষা-সংস্কারক রবীন্দ্রনাথের ছবি তুলে ধরেছেন। কেউ তাঁর বিজ্ঞানচেতনা বা ইতিহাসবোধ ব্যাখ্যা করেছেন। কারো বিশ্লেষণী মন সন্ধান করেছে রবীন্দ্র-দর্শনের মর্ম, তাঁর জীবন ও জন্মমৃত্যু সম্পর্কীয় প্রত্যয়গুলি ব্যাখ্যা করেছে। তাঁর অলঙ্কার বিন্যাস ও ব্যাকরণ বিধির পর্যালোচনও বাদ পড়ে নি। আর সুরকার ও চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ, নাট্য-ব্যবস্থাপক রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ, পর্যটক রবীন্দ্রনাথ এবং গৃহস্থ রবীন্দ্রনাথ তো আলোচিত হয়েছেনই। হয়েছেন মানুষ রবীন্দ্রনাথও।

এই খণ্ড খণ্ড অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হয়েছে যে অখণ্ড রবীন্দ্রসত্তার, তার সমগ্র রূপটি পূর্ণাঙ্গ একখানি বইয়ে ধরে দেবার চেষ্টা এখনো বেশি হয় নি এবং তা না হওয়ার কারণও সুবোধ্য। নানা বৈচিত্র্যে ও বৈপরীত্যের সমীকরণ করে তার মধ্যে ঐক্যসূত্রটি কোথায়, তা ধরতে না পারলে তো সে আলেখ্য তৈরি করা সম্ভব নয়। তথ্যভারাক্রান্ত ও সাল-তারিখ-কণ্টকিত অসুখপাঠ্য জীবনী বা ছাত্রসহায়ক অধিকতর অসুখপাঠ্য আলোচনা-গ্রন্থই তাই এখনো আবর্তিত হচ্ছে আমাদের রবীন্দ্রচর্চার মর্মান্তিক স্মারক রূপে। দর্শনেতিহাসে ভূয়িষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও সবল লিখন শক্তির অধিকারী কোনো লেখক উঠেই একদিন এই দুঃখ দূর করবেন আমাদের, এ আশা কে না করি আমরা?

শ্রীনেপাল মজুমদার লিখিত তিন খণ্ড ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ নামক বইখানি হাতে পেয়ে বুঝলাম সে আশা আমাদের সম্ভাব্যতার মাটি স্পর্শ করতে আরম্ভ করেছে ধীরে ধীরে। ভারতে জাতীয় চেতনার উন্মেষ কাল থেকে কত বিচিত্র পথে ও কি পরিমাণ ভাঙাগড়ার স্রোত অতিক্রম করে আমাদের স্বাজাত্যবোধ ও বিশ্ববোধ পরস্পরের পরিপূরক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং রবীন্দ্রনাথ কবি, সংস্কারক ও সংস্কৃতি-নায়ক রূপে সেই অগ্রযাত্রায় কি ভূমিকা নিয়েছেন, তার আনুপূর্বিক ইতিহাস উপস্থাপিত করেছেন লেখক। তিনি শুধু এক শতাব্দীর পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত আমাদের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসই তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেন নি, তার আলোয় রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি পর্বে প্রতিফলিত জীবনদর্শন ও সমাজবোধেরও মূল্যায়ন করেছেন এবং নিজস্ব মননের আলোয় যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তিনি, তার মধ্যে আমরা তাঁর আপন প্রত্যয়ের চেহারাটিও পরিষ্কার দেখি। এই প্রত্যয়ই হল যে কোনো বিচারের ভিত্তি।

আমাদের দেশে সাধারণ ভাবে রবীন্দ্রনাথকে জাতীয়তাবাদী, ধর্মপুনরুজ্জীবনবাদী ও মানবতাবাদী কবি রূপে দেখা হয় এবং এক দিকে উপনিষদ, বৈষ্ণব কবিতা ও সন্তবাউলাদির রচনার সঙ্গে যেমন তাঁর রচনার সমধর্মিতা খোঁজার প্রয়াস হয়, অন্য দিকে তেমনি গান্ধী আইনস্টাইন রলাঁ অয়কেন প্রমুখ বিশ্বশান্তিকামীদের সঙ্গেও তাঁকে গ্রন্থিবদ্ধ করে দেখা হয়। বলা দরকার এ বিচার ভুল নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক নিরীক্ষায় একে সম্পূর্ণও বলা যাবে না। কারণ এই রকম একটা গড়পড়তা বিচারে

সকলের আগে যে জিনিসটি বাদ পড়ে যায়, তা হল রবীন্দ্রমানসের অভিব্যক্তিতে স্তরপরম্পরার প্রশ্নটি। রবীন্দ্রনাথ কি একই সঙ্গে তিন ছিলেন এবং জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এরা কি পরস্পর হাত ধরাধরি করেই চলেছে তাঁর মননের রাজ্যে? সার্থক রবীন্দ্রোপলব্ধির জন্যে এই জিজ্ঞাসার সমাধান চাই। কিন্তু উত্তর দেবেন কে?

আমরা দেখতে পাই, জীবনের প্রথম ধাপে রবীন্দ্রনাথ বাংলার কবি। বাংলার নদী-মাঠ-আকাশ-বনে পরিব্যাপ্ত প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য, বাঙালীর বিচিত্র সুখ দুঃখে তরঙ্গিত প্রতিদিনের জীবন অপরূপ কাব্যমূর্তি ধরেছে তাঁর লেখায়। বাংলা দেশের অন্তর্লোক থেকে উঠেছিল যে স্বদেশী আন্দোলন, তাতেও আমরা দেখি তাঁকে সক্রিয় সৈনিক রূপে অগ্রবর্তী হতে। কাব্যে গানে প্রবন্ধে নিবন্ধে তাঁর লেখনী শতমুখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সে সময়। তার পরের ধাপে আমরা দেখি, বাংলা থেকে তাঁর দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে বিশাল ভারতবর্ষে। এই অধ্যায়ে তিনি উপনিষদের বাণী, বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের অনুশাসন, সন্ত সাধুদের প্রেমদর্শন আশ্রয় করে পুরানো তপোবন-সংস্কৃতির একটা আধুনিক ভাষ্য রচনা করছেন এবং এই ভাবে ভারতবর্ষ ও ভারতীয়তার নূতন একটা অর্থ প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন।

এই বিবর্তনে এসেছিলেন তিনি কি ভাবে? বোধ হয় স্বদেশী আন্দোলন যখন হিংস্র সন্ত্রাসের আন্দোলনে রূপান্তরিত হল তখন তাঁর কবিমন স্বাভাবিক কারণেই ঘা খেয়ে পিছিয়ে এল তা থেকে। তার পর সাংসারিক জীবনে সংঘটিত মৃত্যুশোক একের পর এক তাঁর জীবনচিন্তার মূলকে নাড়া দিতে লাগল প্রবল বেগে। তখনি তিনি শাশ্বত কোনো প্রত্যয় খুঁজেছিলেন হয়তো ধরে দাঁড়ানোর জন্যে এবং তা পেয়েছিলেন তিনি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে। এই ভাবেই বিশাল ভারতবর্ষ, আর্যঋষি ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ভারতবর্ষ, শিখ মারাঠী ও মুঘলের ভারতবর্ষ, বাউল বৈষ্ণব ও সাধু সন্তের ভারতবর্ষ অধিকার করল তাঁর চিত্তকে এবং মৈত্রী ও সমন্বয় দর্শনের তত্ত্বে যোগনিবদ্ধ হলেন তিনি। এর পরই আবার নূতন উজ্জীবন দেখি আমরা তাঁর, আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও বিশ্বপ্রেমের সাক্ষাৎ বিগ্রহ রূপে।

নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পর শুধু তাঁর নাম ও রচনাই বৃহৎ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হল না, তাঁর মন এবং দৃষ্টিও আলিঙ্গন করল সমগ্র জগৎকে। বৈজ্ঞানিক মনীষার চরম উৎকর্ষে পৌঁছে প্রতীচ্য জীবনদর্শন যে ভাবে ইহ-সর্বস্ব হয়ে পড়েছে, যে ভাবে যুদ্ধ ও জাতিবৈর অনতিক্রম্য ভাগ্যলিপি হয়ে উঠেছে মানবজাতির, তার ধাক্কায় এবং দুনিয়ার দিকে দিকে শোষণ পীড়ন ও লাঞ্ছনায় ক্লিষ্ট হচ্ছে কোটি কোটি মানুষ, তার দিকে আকৃষ্ট হল তাঁর মন। বিশ্বশান্তি ও মানবপ্রেমের কল্যাণব্রতী সাধক রূপে মাথা তুলে দাঁড়ালেন তিনি। ভারতপ্রেমিক রূপে একদিন গড়েছিলেন তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের আদর্শে, এবার মানবপ্রেমিক রূপে রূপান্তরিত করলেন তিনি তাকেই বিশ্বভারতীতে। যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্। এই অধ্যায়ে বিশ্বের নিপীড়িত দেশগুলির সমস্যাকে দরদের সঙ্গে ভাষা দিয়েছেন তিনি, আবার জাপান আমেরিকা বিজ্ঞানগর্বী অন্যান্য আধুনিক রাষ্ট্রকে শ্রেয় পথেরও দিশা দেখিয়েছেন।

কিন্তু এখানেই কি ছেদ টানতে হবে? না, ১৯৩০ সালে তিনি গেলেন সোভিয়েট মুল্লুক দেখতে এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর মননশীলতা আবার নূতন দিগন্তে উন্নীত হল। ১৯৩১ থেকে ৪১ এই শেষ দশ বৎসরের রচনাবলী তল্লাস করলে দেখা যাবে, রাশিয়ার চিঠি, বিশ্বপরিচয়, কালান্তর, সভ্যতার সংকট, জন্মদিনে, আরোগ্য, রোগশয্যায় প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ফুটেছে নূতন এক রবীন্দ্রনাথের

মূর্তি, সে রবীন্দ্রনাথ শ্রমকারী মানুষের সহযাত্রী, তিনি বিজ্ঞানবোধি ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার সমর্থক। শুধু তাই নয়, পরমার্থ বিষয়ে নিস্পৃহ, এমন-কি সংশয়াপন্ন বললেও বলা যেতে পারে। এ রবীন্দ্রনাথকে সোনার তরী গল্পগুচ্ছ ঘরে বাইরে, কিংবা গোরা গীতাঞ্জলি নৈবেদ্য ও প্রাচীন সাহিত্য অথবা শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালা ও মানুষের ধর্মের রবীন্দ্রনাথের অনুবৃত্তি বলে চালানো শুধু অতথ্য নয়, অসত্য এবং এই অসত্যের কুয়াশামুক্ত হতে না পারলে আমরা ধাপে ধাপে রবীন্দ্রচিন্তার এই চতুরাশ্রমের অভিব্যক্তিটা ঠিক ধরতে পারব না। দিনের পরে দিন খালি চলতি কথারই পুনরাবৃত্তি করতে থাকব।

সুখের কথা শ্রীমজুমদার এই কুয়াশা-বিমুক্ত স্বচ্ছ মন নিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন। তাই রবীন্দ্রচিন্তার এই স্তরবিন্যাসগুলি সম্বন্ধে যেমন তিনি সম্পূর্ণ অবহিত, তেমনি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের কোন্ পর্বে তিনি কি মত পথ ও আদর্শের সমর্থক ছিলেন, তাঁর কোন্ চিন্তা ও কর্মের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে দেশে, সমসাময়িক কালের নায়ক ভাবুক ও লেখকরা কে কি ভাবে নিয়েছেন তাঁর প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে, তার পূর্ণাঙ্গ খতিয়ান তৈরি করেছেন তিনি প্রামাণ্য বই পুঁথি ও পত্রপত্রিকা মন্থন করে। এই কাজে যে শ্রমশীলতার পরিচয় রয়েছে, তা অধিকাংশ সাহিত্যব্রতীর নাগালের বাইরে বলেই নয়, সমস্ত আহৃত তথ্যকে একটি কেন্দ্রীয় তত্ত্বে এনে দাঁড় করানোর মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সজাগ বিচারশক্তি, তা খুব সচরাচর চোখে পড়ার মতো জিনিস নয়। তাই বইটিকে একই সঙ্গে রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যভাষ্য বলেও, আবার জাতীয়-ইতিহাস সমীক্ষা বলেও স্বাগত জানাচ্ছি।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমাদের জাতীয়-জাগরণের সূচনা হয় ১৭৫৭ সালের অব্যবহিত পর থেকেই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বাংলা বিহার উড়িষ্যার শাসন কর্তৃত্ব দখল করে নূতন রাজধানী-শহর হিসাবে গড়ে তুলল কলকাতাকে এবং গতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটিয়ে এক দিকে তার অর্থনীতির কাঠামো পাল্টে ফেলল, অন্যদিকে পশ্চিমী ধাঁচের শিক্ষাদীক্ষা প্রবর্তন করে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশেও নূতন চেহারা আনল, তখন থেকেই জনসাধারণ হয়ে গেল দ্বিধাবিভক্ত। গ্রামের অশিক্ষিত কৃষক ও কারিগর সমাজ আর শিক্ষিত শহুরে সমাজে সৃষ্টি হল দুরতিক্রম্য ব্যবধান। এই শেষোক্ত সমাজ প্রথম ধাপে বিদেশী শাসনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বাভাবিক কারণেই, আর প্রথমোক্ত সমাজ গোড়া থেকেই সচেষ্ট হলেন এই শাসন উচ্ছিন্ন করার প্রয়াসে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ একের পর এক আত্মপ্রকাশ করেছে এই সমাজের নেতৃত্বেই।

শিক্ষিত শহুরে সমাজ এইসব বিদ্রোহে সহযোগিতা তো করেনই নি, যথাসম্ভব এসবের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেছেন। এমন-কি কোম্পানী শাসনের এক শো বছর পরে ১৮৫৭ সালে সমস্ত নরপতিরা, হৃতবিত্ত কৃষকরা এবং অসন্তুষ্ট সরকারী সিপাহীরা যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে নামেন, শিক্ষিত সমাজ তাকেও মোটেই সুনজরে দেখেন নি। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁতিয়া তোপে, নানা সাহেব ও লছমী বাঈকে তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করে করে প্রভাকরে কবিতা লেখেন। নেটিভ ফাইডেলিটি নামে বই লিখে কৃষ্ণদাস পাল বোঝান যে আমরা শিক্ষিত মানুষেরা সবাই রাজভক্ত। এই রাজভক্তি বা মনিবানুগত্য যায় নি আমাদের মন থেকে হিন্দুমেলার আমলেও, কংগ্রেসের গোড়ার চার দশকেও। ১৯১৪-১৮র মহাযুদ্ধে ইংরেজের জয়লাভকে তাই কংগ্রেস আনন্দ প্রকাশের উপলক্ষ বলে মনে করে।

অবশ্য বিপিন চন্দ্র পাল, তিলক ও লালা লাজপত রায় চরম পন্থার তথা পূর্ণস্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন,

কিন্তু স্বরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতারা মোটেই তা চান নি। সবাই তাঁরা মনে করতেন কানাডা অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের মতো বৃটিশ সংরক্ষণের আওতায় দায়িত্বশীল শাসনাধিকার পেলেই যথেষ্ট হবে আমাদের। অবশ্য কংগ্রেসের বাইরে সশস্ত্র বিদ্রোহের মানসিকতা ছিল এবং তা ছিল আদি পর্বের চাষী বিদ্রোহের উত্তরাধিকার হিসাবেই। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তপ্ত মাটি থেকে অল্প প্রস্তুতি সত্ত্বেও একদিন তাই তা শিখা বিস্তার করেছিল। কিন্তু কংগ্রেস সশস্ত্র মোকাবিলার পক্ষে ছিল না কোনো দিনই। এমন-কি গান্ধীযুগে পূর্ণ স্বরাজ যখন লক্ষ্য বলে গৃহীত হয়েছে এবং কংগ্রেস নিজে বার বার প্রবল আন্দোলন করছে, তখনো এ পথ তার কাছে নিন্দার্হই থেকেছে। হয়ত বা মধ্যবিত্ত মনের স্থিতিকামিতাই এর মূলে শক্তি জুগিয়েছে। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধাবসানে দেশভাগের সর্ত মেনে নিয়েও ১৯৪৭এ আমরা স্বাধীনতা নিয়েছি, এ তো ইতিহাসের সত্য।

এই দীর্ঘ ১৯০ বৎসরের রাজনীতিক ঘটনার ধারা পর্যালোচনা করে এর পরিপ্রেক্ষিতে যদি রবীন্দ্র-চিন্তার অনুধ্যান করি, তা হলে আমরা কি দেখি? সিপাহী বিদ্রোহের চার বছর পরে তাঁর জন্ম, তিনি যখন শিশু তখন গঠিত হয়েছে হিন্দুমেলা, কংগ্রেসের আবির্ভাব তাঁর যৌবনে, ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে যখন তিনি সক্রিয় অংশ নিয়েছেন, তার অল্প পরেই শুরু হয়েছে বিদ্রোহীদের সশস্ত্র সন্ত্রাস, তিনি যখন আন্তর্জাতিক খ্যাতির শিখরে তখন কংগ্রেস-মঞ্চে আবির্ভাব হয়েছে গান্ধীর, আর তিনি যখন শেষ রোগশয্যায়, তখন বাইরে হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দেশে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় অসহযোগিতা করে কংগ্রেস নেতারা হয়েছেন কারারুদ্ধ— এই কিঞ্চিদধিক ষাট বছরের রচনাবলী তন্ন তন্ন করে যাচাই করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন সশস্ত্র যুদ্ধে ইংরেজকে হঠানোর স্বপ্ন দেখেন নি, আবার সুবুদ্ধির আবেদনে তার মন গলিয়ে দান হিসাবে স্বাধীনতা পাওয়াকেও সম্ভব ভাবেন নি। অথচ তিনি স্বাধীনতা চেয়েছেন এবং অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গেই চেয়েছেন।

তা হলে কি ছিল তাঁর স্বাধীনতা লাভের পন্থা? তিনি চাইতেন, আত্মশক্তির উদ্বোধন ও আত্মসংগঠন। বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে, হিন্দু মুসলমানে এবং তথাকথিত উন্নত অনুন্নতে যে ভেদের গণ্ডী অনড় হয়ে আছে সুপ্রাচীন কাল থেকে, তিনি চাইতেন তার অপসারণ। তিনি চাইতেন গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন, সর্বজনীন শিক্ষার ব্যাপ্তি, ব্যক্তি স্বাধিকারের ভিত্তিতে গোষ্ঠীর সংহতি। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা এই মৌলিক প্রশ্নগুলিকে বেষ্টন করেই আবর্তিত হয়েছে এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের, প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের ভাবগত সমন্বয়ের দৃষ্টিও ক্রমবিবর্তিত হয়েছে তাঁর এই আদি উৎস ধরেই। বিশ্বশান্তি ও মানবমুক্তির আদর্শ এই দৃষ্টিরই স্বাভাবিক পরিণতি। এই যাত্রাপথে দেশে বিদেশে যাঁরা এবং যে যে প্রতিষ্ঠান তাঁর সহযাত্রী, তাঁদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছে প্রত্যাশিত কারণেই। কিন্তু কোনো দিনই তিনি কোনো দলের লেবেলে আত্মপ্রকাশ করেন নি।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইটহুড বর্জন করেছেন তিনি, দেউলী বন্দী-নিবাস থেকে পাঠানো তরুণ বিদ্রোহীদের অর্ঘ্যকে কবিতায় অভিনন্দন জানিয়েছেন, হিজলী ব্যারাকে রাজবন্দীদের গুলি করে মারাকে ধিক্কার দিয়েছেন মনুমেণ্টের নীচে দাঁড়িয়ে, আবার জারবেদা জেলে গান্ধীজীর অনশনভঙ্গেও উপস্থিত থেকেছেন। কোনো ক্ষেত্রেই বিশেষ দল বা মতের প্রতি পক্ষপাত দেখান নি তিনি। জাতীয়-ব্যাপারে যেমন আন্তর্জাতিক ব্যাপারেও তেমনি তাঁর দৃষ্টি ও মননের পরিধি

বহুবিস্তৃত। মানবতাবাদীরূপে জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সাকে নিন্দা করেছেন তিনি, চীন ও কোরিয়ার মুক্তি চেয়েছেন, এশিয়া আফ্রিকার সাম্রাজ্য ও উপনিবেশগুলির বন্ধনমুক্তি চেয়েছেন, ফ্যাসিস্ট নৃশংসতার সঙ্গে যুদ্ধ-নিরত দুনিয়ার গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির তিনি জয় কামনা করেছেন, যদিও বিদ্যা ও বিজ্ঞানে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির অগ্রগামীতার তিনি ছিলেন অকপট সমর্থক। তলস্তয় নয়, এ জায়গায় রলাঁ ও আইন্‌স্টাইনেরই সহযাত্রী তিনি।

কিন্তু এর পরেও কিছু অপরিচিতি রেখে গেছেন তিনি। যে কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে সোভিয়েট রাশিয়া স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছেন, তা তাঁর শান্তিকামী জীবনদর্শনের অনুকূল না হলেও, যে নীতি সাম্যবাদের অন্তর্লগ্ন প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে তাকে স্বাগত জানাতে ভোলেন নি তিনি। তাই দেখি শেষজীবনে সমাজের অস্তিবানগোষ্ঠীর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি নাস্তিবান মানুষকে সসম্মান স্বীকৃতি দিচ্ছেন। যাঁরা চাষ করেন, নৌকা চালান, নগর বন্দর কারখানা সচল রয়েছে যাঁদের শ্রমে, সমস্ত ঐশ্বর্য যাঁদের সৃষ্টি, অথচ নিজেরা যাঁরা রিক্ত নিঃসম্বল, সেই প্রতিদিনের মানুষকে কাছে থেকে দেখেন নি বলে ক্ষোভ জেগেছে তাঁর চিত্তে। মহাভারতের সমাজ ব্যাখ্যা সম্বন্ধীয় অসমাপ্ত রচনাটিতে ভারতেতিহাসে এই শ্রমকারী মানুষের ভূমিকা কি, তা বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শারীরিক অপটুতার কারণেই রচনাটি শেষ হয় নি। না হোক, রাশিয়ার চিঠি থেকে কালান্তর ও সভ্যতার সংকট পর্যন্ত এলেও আমরা তাঁর এই দিকটা ধরতে পারি অনায়াসেই। বুঝতে পারি ভাবের আন্তর্জাতিকা বিবর্তিত হয়ে বাস্তবের মৃত্তিকায় এসে পা রেখেছে আস্তে আস্তে।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনের গৃহীত প্রত্যয়গুলি একে একে প্রায় সবই ঝেড়ে ফেলেছিলেন। তাই এই অধ্যায়ে আমরা দেখি পরমার্থ নয় পরমাণুতত্ত্ব আশ্রয় করেই জগৎ-রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। আঁকা ছবিতে জীবনের সেই সব ক্ষুদ্ধতৃষ্ণা, বিকারবৈকল্যকে মূর্তি দিচ্ছেন, যাদের সাহিত্যের অঙ্গনে তিনি জলাচরণীয় ভাবেন নি কোনো দিন। যে ভ্রান্তির বাতাবরণ সৃষ্টির পথ আবৃত করে জটিল রহস্য রূপে সরল জীবনে মিথ্যা কুহকের ফাঁদ পেতে রেখেছে, তাকে চাইছেন তিনি প্রজ্ঞার আলোয় ছিন্ন করতে। অর্থাৎ নূতন কালের জীবনদর্শন, যাতে রাজনীতি অর্থনীতি সমাজতত্ত্ব পদার্থবিদ্যা মনোবিজ্ঞান মিলেমিশে একাকার হয়েছে, তা অধিকার করছিল একটু একটু করে রবীন্দ্র-চেতনাকে। আশীতে না হয়ে এক শোতে জীবনান্ত হতো যদি এই রবীন্দ্রনাথের, তা হলে আমরা পেতাম আর-এক রবীন্দ্রনাথকে, যিনি হয়ত আদি রবীন্দ্রনাথকেই অতিক্রম করে যেতেন আপন মনোধর্মের পর্যাপ্ত অভিনবতায়। কিন্তু সে কল্পনাবিলাস থাক, যা পেয়েছি তাতেও অচেনা থাকেন নি তিনি মোটেই।

দীর্ঘ ও একনিষ্ঠ শ্রমে শ্রীনেপাল মজুমদার রবীন্দ্র-বিবর্তনের এই বিভাগটির পূর্ণ ইতিবৃত্ত উদ্‌ঘাটিত করেছেন এবং ভারত ও জগতের সামূহিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকটি সোপানের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন। তথ্যের পর্যাপ্ততায় দিশাহারা হন নি তিনি, দ্বিধায় ও বৈষয়িক লাভালাভের চিন্তায় সত্যভাষণেও কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর বিশ্লেষণ আগাগোড়া তথ্যভিত্তিক এবং সিদ্ধান্ত যুক্তিনির্ভর। ব্যক্তিগত অভিরুচি বা শিবিরগত মতের গোঁড়ামি তাঁর আলোচনার পথ আটকে দাঁড়ায় নি। নিয়মতান্ত্রিক পথে দাবী-দাওয়া পেশ থেকে আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহের পথে কংগ্রেসী রাজনীতির ক্রমিক রূপান্তরকে তিনি যেমন সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন, তেমনি সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টাগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণেও প্রয়োগ

করেছেন একই নিরপেক্ষ বিচারণার মাপকাঠি। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত যে ১৯০৭-৮ সালের সন্ত্রাসবাদী তরুণদের এ দেশে সাধারণভাবে আমরা বিপ্লবী বলে অভিহিত করলেও, খাঁটি অর্থে এই অভিধাটি অপপ্রযুক্ত হয়ে থাকে। ওঁরা আসলে ছিলেন বিদ্রোহী, বিপ্লবী নন।

বিপ্লব উৎসারিত হয় একটি নূতন জীবনদর্শনের উদ্দীপনায়। তা চায় সমাজ সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার চলতি ভিত ভেঙে তাকে নূতন করে গড়তে, নূতন মূল্যমানে বলীয়ান নূতন জীবনাদর্শ প্রবর্তন করতে। এই সংগঠনের জন্যেই যেখানে আছে যা বাধা ও প্রতিবন্ধক, তাকে চূরমার করে বিপ্লব। এ ভাঙা-গড়ার জন্যেই, তাকে তাই বলা হয় মাতৃজঠর থেকে রক্তস্নাত নবজাতকের ভূমিষ্ঠ হওয়ার মতো ঘটনা। আমাদের সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টাগুলির লক্ষ্য ছিল বিদেশী শাসন উচ্ছিন্ন করা এবং সেজন্যে সংগ্রামী তরুণরা দুষ্করতম ত্যাগও স্বীকার করেছেন। কিন্তু কোথাও ছিল না তাঁদের লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে জীবনবোধ ও সমাজ-দৃষ্টিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর আদর্শ। আনন্দমঠ এবং বিবেকানন্দ অরবিন্দ প্রভাব বরং তাঁদের অজ্ঞাতেই চালিয়েছিল কতকটা হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের দিকে। তার ফলে হিন্দু মুসলমানে হুজুরে একাকার হয়ে একাত্মিক জাতীয়তার মনস্তত্ত্ব তৈরি হয় নি দেশে। মুসলিম স্বাজাত্যের মানসিকতাই দৃঢ় হয়েছে, চাষী ও কারিগর সমাজ ভদ্রলোকের রাজনীতি থেকে দূরেই সরে গেছেন এবং ধনাধিকারীরাই দেশহিতের অগ্রসৈনিকরূপে এগিয়ে এসে সমাজকর্তৃত্ব দখল করে নিয়েছেন।

অথচ মৌল পরিবর্তন আনতে পারতেন সশস্ত্র বিদ্রোহীরাই, যদি সামনে পেতেন তাঁরা জীবন্ত একটি বিপ্লবের দর্শন। বিস্ময়ের কথা যে, এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটি সেদিন ধরা পড়েছিল শুধু রবীন্দ্রনাথের চোখেই, আর অংশত বিপিনচন্দ্র পালের চোখে। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলি সন্ধান করলেই এ কথার সারবত্তা বোঝা যাবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রের মানুষ ছিলেন না, তিনি কবি এবং কবিরূপে তিনি যা দেখেছেন তা দেখার চোখ খুব বেশি লোকের ছিল না সেদিন। শ্রীমজুমদারের বইয়েই আজ প্রথম এই দিকের কথা কিছুটা উত্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে। আশা রইল তিনি বা তাঁরই মতো আর কোনো সন্ধিৎসু সাহিত্যব্রতী আগামী কোনোদিন স্বদেশী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও আমাদের জাতীয়তার উপর তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপটি আরো বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। কারণ রাজনৈতিক ইতিহাসের এই অধ্যায়টায় অনেক দিন থেকে রকমারি গোঁজামিল চলছে, যা পরিষ্কার না হলে প্রকৃত মূল্যায়ন হবে না অনেক জিনিসেরই। আমাদের আজকের সংকটও তা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় হয়তো পাব আমরা সেই মুক্ত দৃষ্টির সমীক্ষা ও সিদ্ধান্তের মধ্যেই।

মোটের উপর শ্রীমজুমদারের এই তিন খণ্ড সুবৃহৎ বই বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ সংযোজন এবং শ্রমবিমুখ ও চুটকি কাজে অভ্যস্ত পেশাদার প্রাবন্ধিকদের সামনে এই বই একটি সার্থক আদর্শ বলে বিবেচিত হবার যোগ্য। তবে বুদ্ধিদীপ্ত রচনা গ্রহণ ও পরিপাকের লোক আমাদের এখনো বেশি বাড়ে নি, তাই হয়তো লেখকের ভাগ্যে তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি পেতে দেরি হবে। যাই হোক, এই বইটি শেষ করার পর একারমানের রোজনামচায় উদ্ধৃত গ্যেটের একটি উক্তির কথা মনে পড়ল। গ্যেটে তাতে বলেছেন, মানুষ মাত্রেই আপন আপন ভৌগোলিক নৃতাত্ত্বিক ধর্মীয় ও ভাষাগত স্বাধিকারের হাতে এমন অসহায় যে মহৎ মননশীলতা ভিন্ন এই জন্মগত সীমানা কাটিয়ে কেউ বিশ্বমানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন না। সেই মহৎ মননশীলতা যাঁর মধ্যে জন্মায়, তিনিই ভূগোলের মাটিতে দাঁড়িয়েও

ইতিহাসের আকাশ ছুঁতে পারেন। ইউরোপের ইতিহাসে গ্যেটে স্বয়ং এই রকম মানুষ, যেমন রবীন্দ্রনাথ আমাদের ইতিহাসে। এ দুজনের শুধু সমধর্মিতা নয় সমমর্মিতা এত স্পষ্ট যে উভয়কে একই ভাববলয়ের অন্তর্ভুক্ত করে দেখা বিবেকসম্মত।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বসোরার উজীররা। শ্রীঅরবিন্দ রচিত মূল ইংরাজী নাটকের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, কলিকাতা ১২। চার টাকা।

শ্রীঅরবিন্দ বিচিত্র প্রতিভাধর মহামানব। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসিকের কৃতী ছাত্র ছিলেন। দেশে ফিরিয়া বরোদায় শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করিলেন। তার পর তাঁহার পরিচয় বাংলার তথা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্নিযুগের স্রষ্টা হিসাবে। ইহার পর তিনি দার্শনিক, যোগী ও ঋষি রূপে পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। কিন্তু তিনি শুধু সত্যের সন্ধানী বা স্বাধীনতার সৈনিকই নহেন, সুন্দরের উপসাকও। সাহিত্যসাধনা তাঁহার চিন্তাধারা ও কর্মধারাকে মালার মতো গাঁথিয়া দিয়াছে। তাঁহার পরিণত জীবন-বেদও প্রকাশিত হইয়াছে 'সাবিত্রী' মহাকাব্যে।

বরোদায় থাকিতে তিনি যেসব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কয়েকখানির পাণ্ডুলিপির সন্ধান অনেক দিন পাওয়া যায় নাই, যেমন মেঘদূতের ইংরেজি অনুবাদ ও *The Viziers of Bassorah* নামক নাট্যকাব্য। প্রথমটির সন্ধান আজও পাওয়া যায় নাই, দ্বিতীয়টি সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে আলিপুর কোর্টে পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে। এই অপ্রত্যাশিত উদ্ধারের পর এই নাটকটি মুদ্রিত হইয়াছে এবং ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালী পাঠকবর্গকে ঋণী করিয়াছেন।

যে ভাবে পাণ্ডুলিপিখানি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে মনে হয় এই নাটকখানির প্রতি শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ মমত্ব ছিল। সেইজন্যই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেও তিনি পাণ্ডুলিপিখানি সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত নাটকের সঙ্গেও সুপরিচিত ছিলেন এবং কালিদাসের বিক্রমোর্বশীর ইংরেজি রূপান্তর করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান নাটকের বিষয়বস্তু বা রচনারীতিতে গ্রীক বা সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য নাই। ইহা নিছক্ রোমান্স; হারুন-অল্-রশিদের বসোরা ও বাগদাদ ইহার রচনাভূমি। নাটকীয় ঘটনাপরম্পরার ও বাস্তবতা অপেক্ষা রূপকথার অলীক স্বপ্নবিলাসের প্রাধান্য। এই নাটকে ঘটনার অপ্রতুলতা নাই, কিন্তু দ্রুত পটপরিবর্তনের মধ্যে কার্যকারণ-শৃঙ্খলা সব সময় যুক্তি মানিয়া চলে না। ইহার অন্যতম আকর্ষণ রূপকথার বাতাবরণ, কিম্বদন্তী-বর্ণিত মধ্যপ্রাচ্যের অপরিচিত পরিবেশের প্রভাবে অসম্ভাব্য ভাগ্যপরিবর্তন এখানে সম্ভাব্য হইয়া উঠে।

শ্রীঅরবিন্দ নাটকখানি লিখিয়াছিলেন ইংরেজিতে। তাই ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তুলনার কথা সহজেই মনে আসে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কোনো কোনো কবি মধ্যপ্রাচ্যের কিম্বদন্তীসুলভ কাহিনী অবলম্বনে কাব্যনাট্য লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফ্লেচারের *Hassan or the Golden Journey to Samarkand* ও ক্লিফোর্ড ব্যাক্সটার *The Poetasters of Ispahan* নাটকের কথা সহজেই মনে আসিবে। উভয় নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য অপরিচিত পটভূমির অবতারণা করিয়া চমৎকার উৎপাদন করা।

শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজি সাহিত্যে এই ঝোঁকের সঙ্গে পরিচিত থাকিতে পারেন কিন্তু আলোচ্য নাটকটি ফ্লেচার ও ব্যাক্সটার নাটকের পূর্বে রচিত। সুতরাং এই ধারার প্রথম নাটক হিসাবে ইহা ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসেও উল্লিখিত হইবার দাবি রাখে। এই নাটকের অন্যতম প্রধান লক্ষণ দৃঢ়নীতিবোধ; এই নীতিবোধই অসম্ভাব্য কাহিনীও বিস্ময়কর পরিমণ্ডলকে বাস্তবতা দান করিয়াছে। ইহা বিশেষভাবে ভারতীয় সাহিত্যের সুর। রামায়ণ-মহাভারত ইলিয়াড-ওডেসির মতো শৌর্যের কাহিনী এবং উভয়ক্ষেত্রেই অলৌকিকের অভ্যাগমে মানুষের ইতিহাস বিশালতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত নীতির আলোকে উদ্ভাসিত; যতোধর্মস্ততো জয়ঃ এই মহাসত্য ইহাদের সমস্ত সম্ভব-অসম্ভব কাহিনীকে সজীবতা দান করিয়াছে। ইলিয়াড বা ওডেসির এই রকম কোনো নৈতিক ভিত্তি নাই। এই নাটকেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। নাটকের নায়িকা আনিস্-আলজালিস বসোরার বাজারে কেনা সুন্দরী বাঁদী। তাহার একনিষ্ঠ প্রেম শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিয়াছে এবং খলিফা হারুন-অল্-রশিদের কৃপায় সে বসোরার রানীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। যে সমাজে তাহার জন্ম ও শিক্ষাদীক্ষা তাহা নীতিবোধের পরিপন্থী কিন্তু এই প্রতিকূল পরিবেশে তাহার প্রেমের অম্লান শুভ্রতা ও আসক্তির দৃঢ় সংসক্তি আজগুবি রূপকথাকে আদর্শের আলোকে উদ্দীপিত করিয়াছে। অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যেও নাট্যপ্রতিভার আভাস পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খলিফার উদ্যানরক্ষক শেখ ইব্রাহিম। এই চরিত্রে নাট্যকার রাজদরবারের কলুষলিপ্ত জীবনস্রোতকে হাস্যরসের মধুর আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ পড়িয়া আনন্দিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। ইহা মূলানুসারী এবং শ্রীঅরবিন্দের ভাষার লালিত্য ইহার মধ্যে বিধৃত হইয়াছে। অথচ ইহা অতিশয় সুখপাঠ্য, ইহা মৌলিক রচনার মতো স্বচ্ছন্দগতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। কোথাও মনে হইল না অনুবাদ পড়িতেছি। এই গ্রন্থখানি বাংলার অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অনুবাদক একটি মনোজ্ঞ ভূমিকা লিখিয়াও পাঠকবর্গকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

স্বরলিপি

ওগো পড়োশিনি,
শুনি বনপথে সুর মেলে যায় তব কিঙ্কিণী ॥
ক্লান্তকূজন দিনশেষে, আম্রশাখে,
আকাশে বাজে তব নীরব রিনিরিনি ॥
এই নিকটে থাকা
অতিদূর আবরণে রয়েছে ঢাকা।
যেমন দূরে বাণী আপনহারা গানের সুরে,
মাধুরীরহস্যমায়ায় চেনা তোমারে না চিনি ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II সা -া । গা -া I -পা -া । গা না I [ম]ধা -র্সনা । ধপা -া I
ও ০ গো ০ ০ ০ প ড়ো শি ০ ০ নি ০ ০

I পা র্সা । না ধা I পা -ক্ষা । পা -া I পক্ষা -র্সা । না ধা I
শু নি ব ন প ০ থে ০ সু ০ র্ মে লে

I ধপা -ক্ষপা । মা গা I সা -া । রা -া I গা -া । -মা -পা II
যা ০ ০ য়্ ত ব কি ঙ্ কি ০ ণী ০ ০ ০

II পা -ক্ষা । ধা পা I না ধা । না না I [ধ]নর্সা -না । র্সা -না I
ক্লা ন্ ত কূ জ ন দি ন শে ০ ০ ষে ০

I [ধ]না -ধা । না না I র্সা -া । -া -া I র্সা র্গা । র্গা র্গর্রা I
আ ০ ম্রা শা খে ০ ০ ০ আ কা শে বা ০

I [র্র]র্গা -র্রা । র্রর্সা র্সা I [র্স]র্গাঃ -র্রঃ । র্রা র্সা I সা সা । রা -া I
জে ০ ত ০ ব নী ০ র ব রি নি রি ০

I গা -া । -মা -পা II
নি ॰ ॰ ॰

II -া -া । সা -া I { সা সা । মা গা I পা -া । -া -া I
॰ ॰ এ ই নি ক টে থা কা ॰ ॰ ॰

I ধা না । র্সা -র্গা I র্গা র্রা । র্সা না I ধা পক্ষা । পধা ধপা I
অ তি দূ র্ আ ব র ণে র যে॰ ছে॰ ঢা

I পা -মা । (সা -া)} I -া -া I পা -ক্ষা । ধা পা I না -া । -ধা -না I
কা ॰ এ ই ॰ ॰ যে ॰ ম ন দূ ॰ ॰ ॰

I র্সা -া । -া -না I ধনা -ধা । ধর্সা -না I ধা না । র্সা না I
রে ॰ ॰ ॰ বা ॰ নী ॰ আ প ন হা

I ধপা -া । পক্ষা -না I না ধা । পক্ষা -ধা I ধপা -মা । -া -া I
রা॰ ॰ গা॰ ॰ নে র সু॰ ॰ রে ॰ ॰ ॰

I র্সর্গা র্গা । র্গা র্গা I র্গা -া । র্গা র্গা I র্রা -া । -র্সা -া I
মা॰ ধু রী র হ ॰ শ্য মা য় ॰ ॰ য়্

I র্গা র্গা । র্রা র্রর্সা I র্সা -না । র্রর্সা -া I সা -া । গা -া I
চে না তো মা॰ রে ॰ না ॰ চি ॰ নি ॰

I -মা -া । -পা -া II II
॰ ॰ ॰ ॰

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায় বর্ষ ২৫ সংখ্যা ২ কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫

টাটাভিশন

মহৎ কল্পনা, যদি সাধারণ মানুষের কাজে না লাগে তাহলে তার কোন দাম নেই।

জামসেদপুরে কোনো মহৎ কল্পনা কাজে লাগানো যায় নি এমন দৃষ্টান্ত বড় একটা চোখে পড়ে না। এর একটি বড় উদাহরণ হল জামসেদপুরের পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী।

এই পরিকল্পনা চালু হওয়ার তিন বছরের মধ্যে পরিবার কল্যাণের আলোচনাচক্রে যোগদানকারী লোকের সংখ্যা দশগুণ বেড়ে গেছে। এর ফলে দেখা গেল ১৯৬৫ সাল থেকে জামসেদপুরের জন্মহার কমতে শুরু করেছে।

টাটা স্টীলের পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী কি ভাবে কাজ করে

শহরে দুটি আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র এবং ছটি মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে জন্মনিরোধের জিনিসপত্র এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়।

শহরের দুটি কেন্দ্রে ও টাটা মেন হাসপাতালে পুরুষদের 'ভ্যাসেকটমি' অস্ত্রোপচার করা হয়। কোম্পানীর কর্মী হ'লে বিনা খরচে অস্ত্রোপচার ছাড়াও ২০০৲ টাকা নগদ গ্র্যান্ট দেওয়া হয়। গতবছর আগষ্ট থেকে ডিসেম্বরের ভেতর অন্যূন ১,৬৫০ জন অস্ত্রোপচার করিয়েছেন। কর্মীদের স্ত্রীদেরও 'টিউবেকটমি' অস্ত্রোপচার করলে বা লুপ ধারণ করলে নগদ টাকা দেওয়া হয়।

টাটা স্টীল

TN 4124

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৫ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫ · ১৮৯০ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য দেড় টাকা

শস্য　　　　শিল্পী নন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৫ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫ · ১৮৯০ শক

চিঠিপত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

রথী

বিশ্বভারতীর বিদ্যায়তনের শিক্ষা প্রভৃতির যে আদর্শ খাড়া করা হয়েচে সে সম্বন্ধে অনেক তর্কের বিষয় আছে। আর একবার সকলে বসে না আলোচনা করলে চল্‌বেনা। যে কথা বলে আমি ভারতবর্ষের লোককে বিশেষ ভাবে আপীল করেচি সে হচ্চে বিশ্বভারতীতে ভারতীয় বিদ্যার সমবায়। এখানে বৈদিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পারসী প্রভৃতি সকল বিদ্যার একটা সমন্বয়ক্ষেত্র হবে তোদের আদর্শের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই।

পিয়ানোটা এই সুযোগে দেখে শুনে কিনে পাঠালে ভালো হয়। মঙ্গলবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

ওঁ

[পোষ্ট মার্ক ১০ নভেম্বর ১৯২০]

কল্যাণীয়েষু রথী,

সমুদ্রের মাঝে কয়দিন খুব দোলা লেগেছিল। এরকম বৌমা সইতে পারবে না। বিশেষত তোদের আসবার সময় আরো বেশি দোলার সময় আস্‌বে। Pondএর wireless পেয়েছি— হোটেলে জায়গা ঠিক করেচে— দেখা না হলে সমস্ত বিবরণ জানতে পারব না। আমার খুব ভরসা হচ্চে এবারকার যাত্রা সফল হবে। জাহাজে সেই Education সম্বন্ধে লেকচার পড়েচি তাতেও কিছু পাওয়া গেছে। কেদার খুব উত্তেজিত হয়ে আছে। অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েচে সকলেরই শ্রদ্ধা পাওয়া যাচ্চে। Mrs Moodyর কোনো খবর এখনও পাইনি। সেই ফ্রেঞ্চ ও জার্ম্মান বইগুলো কেনার বন্দোবস্ত করতে ভুলিসনে।

ওঁ

[মার্চ ১৯২৩]

কল্যাণীয়েষু

রথী লক্ষ্ণৌএ মামুদাবাদের রাজার সঙ্গে দেখা করে খুব আশান্বিত হয়েচি। তিনি আমাদের জন্যে খাটতে প্রস্তুত হয়েচেন। তাতে অনেক ফলের আশা করি।

এণ্ড্রুজ যে টাকা হাতে পেয়েচেন তা তোকে পাঠাতে চেষ্টা করচি। হয়ত কাল এক কিস্তি যাবে।

যারা গোরা তর্জ্জমা করতে চাচ্চে ৫০ টাকা নিয়ে তাদের পুরো rights দেবার কোনো মানে নেই। যে খুসি ৫০ টাকা দিয়ে তর্জ্জমা করবার right নিলে ত কোনো দোষ নেই। আমি ত বরাবর সকলকেই এই রকম অধিকার দিয়ে এসেচি।

ব্যস্ত আছি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

পোরবন্দর
[নভেম্বর ১৯২৩]

কল্যাণীয়েষু

মোটের উপর কাঠিয়াবাড়ে আমাদের আসর জমেচে। দুই তিনটি জায়গা ছাড়া আর সর্ব্বত্রই আশার অতীত ফল লাভ করা গেচে। এখানকার মহারাজা খুব চমৎকার লোক। আমি না চাইতেই তিনি আমাদের পঁচিশ হাজার টাকা দিতে চাইলেন। তা ছাড়া ভবিষ্যতেও সুবৎসরে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা আছে। এল্‌ম্‌হর্স্ট্ আমার সঙ্গে থাকাতে ভারি সুবিধে হয়েচে। আরো দিন দশেক ওকে আমার সঙ্গে ঘুরিয়ে তার পরে স্রুলে পাঠিয়ে দেব। হায়দ্রাবাদের সেই collectionটা ও থাকলে হয়ত জোগাড় করা সহজ হবে। তা ছাড়া কৃষি সম্বন্ধে এখানে ও বক্তৃতা করচে তাতে খুব উপকার হচ্চে। লিমডির কুমার ত নিজেই একটা farm খুলবেন, তার সঙ্গে আমাদের স্রুলের যোগ থাক্‌তে পারবে। এখানেও হয়ত কিছু হতে পারবে। নন্দলালদেরও এ দিকে হয়ত একটা opening হবে। আমাদের খুব দরকার হচ্চে ওখানে একটা furnitureএর কারখানা খোলা। এদিককার কোনো রাজা যদি একবার আমাদের design অনুসারে ঘর সাজায় তাহলে ক্রমে ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে আমাদের কলাভবনের আদর্শ ছড়িয়ে যাবে।

শাস্ত্রীমশায়কে যে চিঠি লিখ্‌লুম সেটা পড়ে দেখিস্‌। তাতে বিশ্বভারতীর অধ্যয়ন অধ্যাপনার কথা বিস্তারিত করে লিখেচি। একজন পারসী যুবক, অক্সফোর্ডের বি, এ, লাটিন গ্রীকে ওস্তাদ, আমাদের ওখানে ইংরেজি অধ্যাপনার ভার নিতে হয়তো পারেন। মাসে একশো টাকা ও সপরিবারে থাকবার একটি বাসা পেলেই সে আমাদের কাজে যোগ দিতে রাজি। Collinsএর বাংলাটা তাকে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে কাশীর হিন্দু য়ুনিবরসিটি শুনচি তাকে গ্রহণ করেচে। আমাদের ওখানে তখন ওর বাসার জোগাড় ছিলনা বলে আরবারে ওকে কথা দিতে পারিনি। মরিস্‌ বল্‌চে যে সে আমাদের ওখানে আসবার জন্যে এত ব্যাকুল যে কাশীর কাজ ছেড়েও সে আসতে পারে।

গোয়ালিয়র ইন্দোর প্রভৃতি রাজাদের সঙ্গে হয়ত সাক্ষাৎ হবার সুযোগ এখান থেকে হতেও পারে। তাহলে বোম্বাইয়ে বিরলা প্রভৃতির সঙ্গে কাজ শেষ করে তারপরে ওদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করতে হবে। সব কাজ সেরে ৭ই পৌষের হয়ত দুই একদিন আগে আশ্রমে পৌঁছতে পারব। যদি এবার জোগাড় না হয়ে ওঠে তাহলে যত শীঘ্র পারি চলে যাব। এখানকার রাজাদের টাকা দেবার কথা

রাষ্ট্র হয়ে গেচে বলেই অন্য রাজাদের কাছ থেকে টাকা পাবার পথ সুগম হবার সম্ভাবনা। এই ঝোঁকের মাথায় হয়ত কাজ সহজ হতে পারে।

ভাওনগরবাসী একজন ভালো গাইয়ের গান শুনেচি। লোকটি ওস্তাদ সন্দেহ নেই, গলাও খুব ভালো। কিন্তু দেশ ছেড়ে যেতে চায় না। সমস্ত কাঠিয়াবাড়ে ঐ হচ্চে একমাত্র গায়ক। কাজেই এখানে তার যথেষ্ট খাতির ও আয় আছে। বলছিল, তার ছেলেকে আর দু' বছর শিক্ষা দিলেই সে পাকা হয়ে উঠ্‌বে তারপরে সে আমাদের আশ্রমে যাবে। অন্য জায়গায় গাইয়ের সন্ধান করব। পালনপুর নবাবের ওখানে আমাদের যাবার কথা আছে সেখানে হয়ত ভালো গাইয়ে বাজিয়ের সন্ধান মিল্‌তে পারবে।

ওদিকে পিঠাপুরম্‌, বিজয়নগরমকে চেষ্টা দেখ্‌তে হবে। যদি সম্ভব হয় তবে ৭ই পৌষ সেরেই সেইদিকে যাবার চেষ্টা করতে হবে।

... চিঠিপত্রে এল্‌ম্‌হর্স্টের মন কিছু বিগ্‌ড়ে ছিল। এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেচে। ... স্থরুল সম্বন্ধে কি সব বলেছিল সেই কথা ওর মনকে বেশি ঘা দিয়েছিল— ওর মনে হয়েছিল স্থরুলের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নেই টান নেই। যাই হোক্‌ ওর মন এখন পরিষ্কার হয়ে গেচে। ও বোম্বাই থেকে একেবারে স্থরুলে না গিয়ে আমাদের সঙ্গে যে ঘুরতে পেরেচে তাতে অনেকটা উপকার হয়েচে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

ওঁ

পোরবন্দর

কল্যাণীয়েষু

বিলেত থেকে জামনগরে জাম সাহেব এসে পৌঁচেছেন। তাঁর নিমন্ত্রণ পেয়েচি। আজ রাত্রে সেখানে রওনা হব। টাকার দিক থেকে তাঁর কাছ থেকে কতটা সাহায্য পাব জানিনে, কিন্তু রাজাদের উপর তাঁর বিশেষ প্রভাব আছে— তিনি যদি আমাদের পক্ষ নেন তাহলে অন্যদের কাছ থেকে পাবার পথ হবে। পোরবন্দরে আমরা খুব আনন্দ পেয়েচি। এখানকার সঙ্গে আমাদের একটা স্থায়ী সম্বন্ধ হল। গোরার কাছ থেকে সব শুন্‌তে পাবি।— দিনুকে স্থর-কুটীরটা বেচে দিস্‌। ... কাসাহারার স্ত্রী আমার যে গরম কাপড় তৈরি করে পাঠিয়েচে সেটা বাহিরের জোব্বা, ভিতরের কাপড়টা কোথায় খোঁজ করে শীঘ্র পাঠিয়ে দিস্‌। ক্রমেই বেশ ঠাণ্ডা পড়ে আসচে।

আমেদাবাদ থেকে এখন আমরা অস্থায়ীভাবে যা পাচ্চি এবং তার উপরেও যা deficit পড়চে সে সমস্তর স্থায়ী সংস্থান করতে পাঁচ লাখ টাকার দরকার। অর্থাৎ এখন যা আছে ঠিক সেইটেকেই পাকা করবার জন্যে এই টাকাটা চাই। টাকা সংগ্রহ করতে এসে এটুকু বুঝেচি যে, আমাদের দেশ থেকে এত টাকা আদায় করা বিষম শক্ত। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের বাৎসরিক deficit কি উপায়ে ঠেকানো যাবে? কলকাতার আপিসে কি অনেকটা অনাবশ্যক খরচ হচ্চে না? এক সময়ে মনে হয়েছিল সম্মিলনীর সহায়তায় কলকাতা থেকে অনেকটা আয় হবে, সেই টাকাটা আদায় প্রভৃতির জন্যে সেখানে আপিস

রাখা দরকার হবে। আয় ত কলকাতায় কিছুই হচ্চেনা, সম্মিলনীতে কেবল ব্যয়ই হয়। এমন অবস্থায় এই ভার কি আমাদের বহন করা উচিত?

কলাভবনের বাড়ি তৈরিতে খুব বেশি খরচ করা ঠিক হবেনা। এই fundএর যতটা স্থায়ী করা সম্ভব তারই চেষ্টা করা উচিত। কলাভবনে এখন যে মাসিক খরচটা হয় তার একটা পাকা সংস্থান হলে জিনিষটা চিরন্তন হয়ে থাকবে। বিশ্বভারতীর অন্য সব গেলেও ওটা মরবে না। বিশ্বভারতীর প্রত্যেক বিভাগকেই এইরকম স্বতন্ত্রভাবে স্থায়ী করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে যার প্রাণ বেশি স্বাভাবিক নিয়মে সে আপনিই টিঁকে যাবে। ইতি ২৭ নবেম্বর ১৯২৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[১৯২৩]

কল্যাণীয়েষু

ধরাঙ্গধরায় কাল এসেচি। এখানকার রাজার সঙ্গে দেখা হয়েচে। লোকটি ভাল বলে কাল তাঁকে বেশ একটু চেপে ধরতে পেরেছিলুম। আমি ৫০,০০০ হাজারের জন্যে দাবী করেছিলুম শেষকালে ২৫ হাজারে রফা হয়েচে— পাঁচহাজার করে' পাঁচ বৎসরে শোধ হবে। এই প্রথম কাঠিয়াবাড়ে এবার চেষ্টা আরম্ভ হল, প্রথমেই এই টাকাটা পাওয়ায় বোধহয় অন্য সকলের কাছ থেকে বেশি পাবার সম্ভাবনা হল। কিছু কিছু জিনিষপত্রও পাওয়া যাবে— পাঠিয়ে দেব কিন্তু হারিয়ে না যায় যেন।

গোরাকে বোম্বাইয়ে চেষ্টা করবার জন্যে রেখে এলুম। সেখানে সে technicalএর জন্যে কিছু করতে পারবে বলে আশা হয়। লেগে থাকতে পারলে তবে চেষ্টা সফল হতে পারে, একবার এসে ঘুরে গেলে কিছুই হয় না। Morris বলেচে এবার বোম্বাইয়ে গিয়ে মাসখানেক রীতিমত চেষ্টা করলেই টেকনিকালের দরকারমত টাকা ও জিনিষ সে নিশ্চয় জোগাড় করতে পারবে। এণ্ড্রুজকে লিখে দিয়েচি টাটাকে এই জন্যে বিশেষ করে ধরতে। ··· বাবু এলে টাকা তোলার কাজে শিকি পয়সার সাহায্য হত না, সুতরাং না এসে ক্ষতি হয় নি। শাস্ত্রীর প্রধান লক্ষ্য পুঁথিসংগ্রহে, সেই কাজে তিনি লেগে গেছেন, কিন্তু টাকা সংগ্রহ তাঁর দ্বারা কতটা হবে ঠিক জানিনে। বোধ হচ্চে তিনি লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে কিছু টাকা তুল্‌তেও পারেন। আমাদের ওখানে ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বই খুব কম আছে— যদি লাইব্রেরির নামে হাজার দশেক টাকা ওঠে তাহলে research করবার উপযুক্ত বই সংগ্রহ হতে পারবে।

শিশু ভোলানাথের যে তর্জ্জমাটা হরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় করেছিল তার typescript কপিটা ভুলে ফেলে এসেচি— সেটা সংগ্রহ করে যত্ন করে রেখে দিস্ হারায় না যেন। এবারে টাকার পিছনে ঘুরতে ঘুরতে শেষে কবে দেশে গিয়ে ফিরতে পারব বুঝতে পারচিনে। ডিসেম্বরের গোড়ায় কিছুদিন বোম্বাইয়ে কাজ করতে হবে, বিরলার ওখানে থাকব। তার পরে বরদা গোয়ালিয়র প্রভৃতি জায়গায় যাবার সম্ভাবনা আছে। দেখা যাক্। গোরাকে কিন্তু কিছুকাল ছুটি দেওয়া চাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

ওঁ

Morvi State

[১৯২৩]

কল্যাণীয়েষু

মোর্ব্বি দশহাজার দিয়েচেন। কাল যাচ্চি গোণ্ডল।

শাস্ত্রীজি লাইব্রেরির Endowmentএর জন্যে এখানে সেখানে খুচ্‌রো খুচ্‌রো টাকা তুল্‌তে লেগেচেন। আমার বিশ্বাস, তিনি কিছুকাল এই রকম কাজ করলে লাইব্রেরির বিস্তর ভার লাঘব করতে পারবেন। কিন্তু আমাদের ওখানে পুঁথির অনাদর নিয়ে তাঁর মন বড় ক্ষুন্ন আছে। অনেক পুঁথি বর্ষার সময়ে ষ্টেষণে পড়ে ভিজে damaged হয়েচে— demurrage দিয়ে তাদের খালাস করে আন্‌তে হয়েচে— কোনো কোনো পুঁথির উপরকার নূতন ভালো কাপড়ের মোড়ক চুরি গেচে, কেউ খেয়াল করে নি— ইত্যাদি। এবারে আমি ফিরে গিয়ে লাইব্রেরি ও আপিস সম্বন্ধে একটা পাকা ব্যবস্থা নিজে করব। বড় বড় দানের রসিদ অনেকে পায় নি বলে আমেদাবাদে আমাদের বদনাম হয়েচে— এতে টাকা সংগ্রহের ক্ষতি হচ্চে।

গোরাকে বোম্বাই পাঠিয়ে দিয়েচি। সেখানে টেকনিকালের জন্যে সে কাজ করচে। কিছুকাল তার ছুটি মঞ্জুর করতে হবে।

পিয়র্সনের বাড়িটা আমার জন্যে বাসযোগ্য করে রেখে দিস্— এবার ফিরে গিয়ে যেন থাকতে পারি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মরিসের চিঠি পাঠাই। তোরা ইতিমধ্যে দিল্লি অভিমুখে রওনা হয়েচিস কিনা জানিনে। যা হোক্ যথাবিহিত ব্যবস্থা করিস। দেখা যাচ্চে দিল্লিতে বরোদার মহারাজা যাচ্চেন না; তিনি যাবেন কাশীতে। তোদের ঠিক সেই সময়ে দিল্লিতে থাকতে হবে। তাহলে বরোদাকে তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে কাশীতে আমার যাবার দরকার কিনা শীঘ্র লিখিস্। কাশীতে ভিজিয়ানগরমের মহারাণীও যাচ্চেন। যদি আমাকে কাশীতে যেতে হয় তাহলে সেখান থেকে ফিরে ঢাকায় যেতে হবে। ততদিনে তোরাও ফিরবি। বরোদার সঙ্গে বমনজিও কাশীতে আসতেও পারেন এমন কথা ছিল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাওনগর থেকে ১৫০০০ হাজার টাকার চেক আজ পাওয়া গেল। তার প্রাপ্তি স্বীকার কোথা থেকে হবে? চেকটা মরিসের নামে— C/o. Dr. Rabindranath Tagore। মরিস নিজের নামটাকে নানা আকারে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেচে।

গাইয়ের খোঁজ করতে ভুলিস্‌নে। দিল্লিতে কারো সন্ধান পেতেও পারিস।

Pond।	আমেরিকার লেক্‌চার ব্যুরো— Pond Lyceum-এর পক্ষ হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করেন।
কেদার।	কেদারনাথ দাশগুপ্ত
Mrs. Moody।	রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা ভ্রমণকালে ইঁহার গৃহে কয়েকবার আতিথ্য গ্রহণ করেন। *Chitra* নাট্যকাব্য কবি ইঁহার নামে উৎসর্গ করেন।
শাস্ত্রীমশায়।	বিধুশেখর শাস্ত্রী
Collins।	W. Collins, ভাষাতত্ত্ববিদ্। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক
মরিস্।	হীরজিভাই পেষ্টনজি মরিস্ (পার্শী অধ্যাপক)
গোরা।	গৌরগোপাল ঘোষ
দিনু।	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কাসাহারা।	শ্রীনিকেতনের জাপানী কর্মী
শাস্ত্রী, শাস্ত্রীজি।	অনন্ত শাস্ত্রী। প্রাচীন পুঁথিসংগ্রাহক-কর্মী
হরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	কবি হরীন্দ্র [হারীন্দ্র] চট্টোপাধ্যায়
মোর্ব্বি।	গুজরাটের তৎকালীন করদরাজ্য
বমনজি।	বোম্বাইবাসী পার্শী ধনকুবের। কবি বোম্বাইয়ে একবার ইঁহার অতিথি হন।

রবীন্দ্রনাথের দুইটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ যেসকল পত্রপত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সেগুলির বিবরণ সংবলিত একটি প্রবন্ধ এই সংখ্যায় মুদ্রিত হল। এই বিবরণ থেকে লক্ষ করা যাবে যে ঐসকল পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা উদ্ধারযোগ্য। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদকপদ থেকে অবসরগ্রহণ-কালে এবং 'ভাণ্ডার' পত্রিকার সম্পাদকপদ-গ্রহণ-কালে লিখিত রবীন্দ্রনাথের দুইটি রচনা এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ

এক বৎসর ভারতী সম্পাদন করিলাম। ইতিমধ্যে নানা প্রকার ক্রটি ঘটিয়াছে। সে সকল ক্রটির যতকিছু কৈফিয়ৎ প্রায় সমস্তই ব্যক্তিগত। সাংসারিক চিন্তা চেষ্টা আধিব্যাধি ক্রিয়াকর্মে সম্পাদকের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীকেও নানারূপে বিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছে। নিরুদ্বিগ্ন অবকাশের অভাবে পাঠকদেরও আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই এবং সম্পাদকের কর্তব্য সম্বন্ধে নিজেরও আদর্শকে খণ্ডিত করিয়াছি।

সম্পাদক যদি অনন্যকর্মা হইয়া কর্ণধারের মত পত্রিকার চূড়ার উপর সর্বদাই হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন তবেই তাঁহার যথাসাধ্য মনের মত কাগজ চালানো সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের সম্পাদকের পত্রসম্পাদন হালগোরুর দুধ দেওয়ার মত,— সমস্ত দিন ক্ষেতের কাজে খাটিয়া কৃশ প্রাণের রসাবশেষটুকুতে প্রচুর পরিমাণে জল মিশাইয়া যোগান দিতে হয় ;— তাহাতে পরম ধৈর্যবান্ জন্তুটারও প্রাণান্ত হইতে থাকে, ভোক্তাও তাঁহার বার্ষিক তিনটাকা হিসাবে ফাঁকি পড়িল বলিয়া রাগ করিয়া উঠেন।

ধনীপল্লীতে যে দরিদ্র থাকে তাহার চাল খারাপ হইয়া যায়। তাহার ব্যয় ও চেষ্টা আপন সাধ্যের বাহিরে গিয়া পড়ে। য়ুরোপীয় পত্রের আদর্শে আমরা কাগজ চালাইতে চাই— অথচ অবস্থা সমস্ত বিপরীত। আমাদের সহায় সম্পদ অর্থবল লোকবল লেখক পাঠক সমস্তই স্বল্প— অথচ চাল বিলাতী, নিয়ম অত্যন্ত কড়া ;— সেই বিভ্রাটে হয় কাগজ, নয় কাগজের সম্পাদক মারা পড়ে।

ঠিক মাসান্তে ভারতী বাহির করিতে পারি নাই ; সে জন্য যথেষ্ট ক্ষোভ ও লজ্জা অনুভব করিয়াছি। একা সম্পাদককে লিখিতে হয়, লেখা সংগ্রহ করিতে হয় এবং অনেক অংশে প্রুফ ও প্রবন্ধ সংশোধন করিতে হয়। এদিকে দেশী ছাপাখানার ক্ষীণ প্রাণ, কম্পোজিটর অল্প, শারীরধর্মবশতঃ কম্পোজিটরের রোগ তাপও ঘটে এবং প্লেগের গোলমালে ঠিকা লোক পাওয়াও দুর্লভ হয়।

যে ব্যক্তি পত্র চালনাকেই জীবনের মুখ্য অবলম্বন করিতে পারে, এই সকল বাধাবিঘ্নের সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করা তাহাকেই শোভা পায়। কিন্তু পত্রের অধিকাংশ নিজের লেখার দ্বারা পূরণ করিবার মত যাহার প্রচুর অবকাশ ও ক্ষমতা নাই, নিয়মিত পরের লেখা সংগ্রহ করিবার মত অসামান্য ধৈর্য ও অধ্যবসায় নাই, এবং ছাপাখানা ইত্যাদির সর্বপ্রকার সঙ্কট নিবারণ যাহার সাধ্যের অতীত তাহার পক্ষে সম্পাদকের গৌরবজনক কাজ প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহু বামনের চেষ্টার মত হয়। ফলও যে নিরবচ্ছিন্ন মিষ্টস্বাদ এবং লোভের কারণও যে অত্যধিক তাহাও স্বীকার করিতে পারি না। আশা করি

এই ফলের যাহা কিছু মিষ্ট তাহাই পাঠকদের পাতে দিয়াছি, এবং যাহা কিছু তিক্ত তাহা চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে নিজে হজম করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

প্রশ্ন উঠিতে পারে এ সকল কথা গোড়ায় কেন ভাবি নাই। গোড়াতেই যাঁহারা শেষটা সুস্পষ্ট দেখিতে পান, তাঁহারা সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি এবং তাঁহারা প্রায়ই কোন কার্যে ব্রতী হন না,— আমার একান্ত ইচ্ছা সেই দলভুক্ত হইয়া থাকি। কিন্তু ঘূর্ণাবাতাসের মত যখন কর্মের আবর্ত ঘেরিয়া ফেলে তখন ধুলায় বেশি দূর দেখা যায় না এবং তাহার আকর্ষণে অসাধ্য স্থানে গিয়া উপনীত হইতে হয়।

উপদেষ্টা পরামর্শদাতাগণ অত্যন্ত শান্ত স্নিগ্ধভাবে বলিয়া থাকেন একবার প্রবৃত্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হওয়া ভাল দেখায় না। এ প্রসঙ্গে জনসনের একটি গল্প মনে পড়ে। একদা জনসন পার্শ্বে কোন মহিলাকে লইয়া আহারে প্রবৃত্ত ছিলেন। না জানিয়া হঠাৎ এক চামচ গরম স্যুপ মুখে লইয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ভোজন পাত্রে নিক্ষেপ করিলেন— এবং পার্শ্ববর্তিনী ঘৃণাসঙ্কুচিতা মহিলাকে কহিলেন 'ভদ্রে, কোন নির্বোধ হইলে মুখ পুড়াইয়া গিলিয়া ফেলিত।' গরম স্যুপ যে ব্যক্তি একেবারেই লয় না সেই সব চেয়ে বুদ্ধিমান, যে ব্যক্তি লইয়া লজ্জার অনুরোধে গিলিয়া ফেলে, সর্বত্র তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করি না।

যাহাই হউক, সম্পাদন কার্যে ত্রুটি উপলক্ষে যাহারা আমাকে মার্জনা করিয়াছেন এবং যাঁহারা করেন নাই তাঁহাদের নিকট আর অধিক অপরাধী হইতে ইচ্ছা করি না। এবং সম্পাদক পদ পরিত্যাগ করিতেছি বলিয়াই যে-সকল পক্ষপাতী পাঠক অপরাধ গ্রহণ করিবেন তাঁহারা প্রীতিগুণেই পুনশ্চ অবিলম্বে ক্ষমা করিবেন বলিয়া আমার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে। এক্ষণে গত বর্ষশেষে যে স্থান হইতে ভারতীর মহত্ভার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলাম বর্ষান্তে ঠিক সেই জায়গায় তাহা নামাইয়া ললাটের ঘর্ম মুছিয়া সকলকে নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ভারতী ১৩০৫ ফাল্গুন-চৈত্র

সূত্রধারের কথা

'ভাণ্ডার'-প্রকাশের উদ্দেশ্য কি কি আছে সর্বপ্রথমেই খোলসা করিয়া তাহার একটি ফর্দ দিবার জন্য প্রকাশক মহাশয়েরা আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, কারণ, উদ্দেশ্য জানাইয়া কাজ আরম্ভ করাই দস্তুর।

কিন্তু পাঠকদিগকে আমি আশ্বাস দিয়া বলিতেছি যে, যদিও আমি সম্পাদক, তবু আমার মনে কোন প্রকার স্পষ্ট রকমের উদ্দেশ্য নাই। সাধু উদ্দেশ্যের উৎপীড়নে যাহারা পৃথিবীকে এক মুহূর্ত স্থির হইতে দিতেছে না, আমি তাহাদের দলে নাম লিখাইতে প্রস্তুত নই।

তবে আমি এই কাগজ-সম্পাদনের কাজে ধরা দিলাম কেন— এ কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমার জবাব এই যে, ব্যাধের বাঁশি শুনিয়া হরিণ যে কারণে ধরা দেয়, আমারও সেই একই কারণ। অর্থাৎ তাহা কৌতূহল, আর কিছুই নহে।

দেশের যে সকল লোক নানা বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি ভাবিতেছেন জানিবার যদি সুযোগ পাওয়া যায়, তবে মনে ঔৎসুক্য না জন্মিয়া থাকিতে পারে না।

আমাদের দেশে তাহা জানিবার ভালরকম সুবিধা নাই। তাহার মূল কারণ, ভাবনাচিন্তার তরঙ্গ

তেমন প্রবল নয়। প্রবল হইতেই পারে না ; কারণ, কাজের সঙ্গে ভাবনার যোগ যেখানে নাই সেখানে কেবলমাত্র সৌখীন ভাবনার তেমন তেজ থাকে না।

আমাদের দেশে কলেজ হইতে যিনি যত বড় পণ্ডিত হইয়াই বাহির হইয়াছেন, তাঁহার প্রধান ভাবনার বিষয় নিজের ব্যবসায় বা চাকুরি ; কেহ কেহ এই ভাবনার এক অংশকে সাধারণের কাজেও খাটাইতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু আমাদের এই সাধারণের কাজের মধ্যে কাজের ভাগ এতই অল্প যে, তাহাতে আমাদের দেশের মনকে তেমন করিয়া জাগাইয়া রাখিতে পারে না। কেবল ফুঁ দিলেই ত আগুন টেঁকে না, কাঠও চাই।

যে সব দেশে যথার্থই নানা কাজ চলিতেছে, সেখানে নানাভাবনা নানাকথা ঘরে বাহিরে কেমন করিয়া যে পাক খাইয়া বেড়ায়, দেশের সকল লোকের মনকে কেমন করিয়া যে নানাভাবে চেতাইয়া তোলে, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

মন আপনার শক্তিকে এমনি করিয়া নানাদিক হইতে অনুভব করিতে চায় ; যেখানে তাহার অভাব আছে সেখানে জড়তা এবং নিরানন্দ। আমাদের সমাজই তাহার প্রমাণ।

কবে যে ঠিকমত সেই অবস্থার প্রতিকার হইবে তাহা বলিতে পারি না ; কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের এই মানসিক উপবাস ঘুচাইবার চেষ্টা, যার যতটা সাধ্য করিতে হয়।

প্রকাশকের মুখে যখন জানিতে পারিলাম, আমাদের এই কাগজটাতে একটা মানসিক সামাজিকতা স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, তখন কৌতুহলে আমার মন আকৃষ্ট হইল।

এ কথা উঠিতে পারে যে, দেশে বড় বড় কাগজ পত্রের ত অভাব নাই, সে সব কাগজে নানা প্রবন্ধ বাহির হয়, নানাকথার আলোচনা হইয়া থাকে।

তাহা সত্য। কিন্তু সে সকল যেন একলার কথা। কোনটা বা সখের লেখা, কোনটা বা অনুরোধে পড়িয়া লেখা। আমি অনেক সম্পাদকি করিয়াছি, আমাকে এ কথা কবুল করিতে হইবে যে, আমাদের দেশে বড় বড় কাগজে বড় বড় প্রবন্ধ অধিকাংশই বানাইয়া লিখিতে হয়। সে সকল লেখার তাগিদ অন্তরের মধ্যে নাই। সম্পাদকের তাগিদ যে কিরূপ, তাহা আমাদের দেশের লেখকমাত্রেই জানেন।

যেখানে কথা শুনিবার জন্য লোকে ব্যস্ত সেখানে কথা বলিবার জন্যও ব্যস্ততা জন্মে, অন্য তাগিদের বড় দরকার হয় না।

যখন সমাজের মধ্যে লেখায় প্রবৃত্ত করিরার স্বাভাবিক তাগিদ তেমন প্রবল নহে, তখন দেশের শিক্ষিত লোকদের কাছে অনেক যত্নের—অনেক পরিশ্রমের বড় বড় লেখা যথেষ্ট পরিমাণে প্রত্যাশা করা যায় না।

বিশেষত বাংলা লেখা সহজ ব্যাপার নহে। এক ত শিশুকাল হইতে বিদেশিভাষার চর্চা করিয়া বাংলা লেখার অভ্যাস জন্মে না। দ্বিতীয়ত, বাংলায় গদ্যসাহিত্য নূতন হওয়াতে ইহাতে প্রচুর পরিমাণে বাঁধিবোলের সৃষ্টি এখনো হয় নাই। একটা সামান্য বিষয় লিখিতে হইলেও তাহার প্রত্যেক লাইনটির সমস্ত কথাই সচেষ্ট-ভাবনার দ্বারা তৈরি করিতে হয়। বাংলায় একটা সাদা চিঠি লিখিতে হইলেও অনেকে এই সংকট অনুভব করিয়া থাকেন।

২

এমন অবস্থায়, দেশের যে সকল লোকের কাছে শুনিবার যোগ্য কথার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, তাঁহাদের কাছে অতিরিক্ত দাবি করিয়া বসিলে সম্পূর্ণ নিরাশ হইবার সম্ভাবনা।

এস্থলে শাস্ত্রে বলে 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।' অর্ধ কেন বারো আনাও ত্যাগ করা যাইতে পারে।

ভাণ্ডারের প্রকাশক শাস্ত্রোল্লিখিত উক্ত পণ্ডিতের পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি মুষ্টিভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। অতিবড় পাষাণ-হৃদয় লোকও তাঁহাকে নিরাশ করিতে পারিবেন না। মাঝে হইতে পাঁচ দ্বারে কুড়াইয়া এমন একটি সঞ্চয় দাঁড়াইতে পারে, যাহাতে দেশের পুষ্টি সাধনের কাজ সহজে চলিয়া যায়।

মনে করিয়াছিলাম এই কথা বলিব যে, আমাদের দেশে বড় লেখা লিখিবার ও বড় লেখা পড়িবার সময় অল্প, এইজন্যই আমরা লেখক ও পাঠকের সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ছোট লেখার কাগজ ফাঁদিয়াছি। কিন্তু কথাটা সত্য হইত না। আমাদের দেশে অবসর যথেষ্ট আছে।

অবসর কাটানো যায় কি করিয়া এ প্রশ্নের জবাব ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। উপদেশ দিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে অবসরের সময়টা কাজে লাগাও।

কিন্তু এ কথা বলা বাহুল্য যে, উপদেশ জিনিষটা পৃথিবীতে অধিকাংশ স্থলেই ব্যর্থ হয়। কাজের সময়টা ত কাজে লাগিবেই, আবার অবসরের সময়টাকেও কাজে লাগাইতে হইবে, এই উপদেশ অনেকেই মানিবেন না বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি।

আমাদের এই কাগজখানি যাহাতে অধিকাংশ লোকের অবসরের উপযোগী হয়, ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ভাণ্ডারের কর্মকর্তা নানা ছোট লেখা সংগ্রহের আয়োজন করিতেছেন।

সেই সঙ্গে যদি দেশের লোকের উপকার হয় সে ত ভালই। কারণ, শাস্ত্রে বলে—

'যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী।' যাহাতে মানুষের ইহকাল পরকাল দুইই রক্ষা হয়, সেই চাতুরীই চাতুরী।

ভাণ্ডার ১৩১২ বৈশাখ

মুকুন্দরামের গ্রামত্যাগ ও কাব্যরচনা -প্রসঙ্গ

ক্ষুদিরাম দাস

১

কিছুকাল পূর্বে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে ব্যবহৃত তদ্‌ভব ও বিদেশী শব্দসমূহের সঞ্চয়নে ও টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যেখানে কবি স্বগ্রামত্যাগের কারণ বর্ণনা করিতেছেন সেখানে রহিয়াছে "উজীর হল্য রায়জাদা"। 'উজীর' শব্দের যথাযথ অভিধা জানিবার জন্যও বটে, আবার এইসব অংশ ছাত্রদের পড়াইতে হয় বলিয়াও বটে, উজীর পদের নির্দিষ্ট কর্তব্য কী ছিল তাহা বুঝিবার জন্য এবং উক্তবাক্যে 'উজীর' ও 'রায়জাদা' এ দুইটি শব্দের মধ্যে কোন্‌টি উদ্দেশ্য কোন্‌টিই বা বিধেয় তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য হই। বলা বাহুল্য, মুকুন্দরাম সম্বন্ধে প্রচলিত সাহিত্যের ইতিহাস বা আলোচনা -গ্রন্থে এসকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না। চণ্ডীকাব্য যখন ছাত্রজীবনে আমাদের পাঠ্য ছিল তখন কবির আত্মবিবরণীর এসকল অংশ সম্বন্ধে জোড়াতালি দেওয়া একটা আইডিয়া মনের মধ্যে শিথিলভাবে গাঁথা ছিল। এখন ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করিতেই দৃষ্টি খুলিয়া গেল। বুঝিলাম ঐ অংশের অর্থ হইবে, রায়জাদা অর্থাৎ রায়ের পুত্র উজীর পদে নিযুক্ত হইলেন। তখন মনে সংশয় উপস্থিত হইল, সুবার প্রধান রাজকর্মচারী ও অর্থসচিব যিনি, সুবাদারের নিম্নেই যাঁহার স্থান, তিনি যদি হিন্দু হন, স্বয়ং সুবাদার মানসিংহ যদি হিন্দু হন তাহা হইলে আকবরের মতো উচ্চ-প্রশংসিত উদারনীতিক সম্রাটের শাসন সময়ে 'বিধর্মী'র অত্যাচারে কবি নির্যাতিত ও বিতাড়িত হইলেন কি ভাবে? অথচ সাহিত্যের ইতিহাসের পথিকৃৎ ড. দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই একবাক্যে এরূপ আভাস দিয়াছেন যে বাংলাদেশে অরাজকতা এবং মাৎস্যন্যায়ের মধ্যে বিধর্মী রাজা ও রাজকর্মচারীরা লোকনির্যাতন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া মুকুন্দরামকে গৃহ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মুকুন্দরামের গৃহত্যাগ যে অত্যাচারের জন্যই হইয়াছিল, আর এই অত্যাচার যে মুসলমান রাজার ও কর্মচারীর হিন্দুর প্রতি অত্যাচার, এই অনুমানের সমর্থন কল্পে ড. দীনেশচন্দ্র সেন, যিনি তাঁহার স্মরণীয় সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে মধ্যযুগীয় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বিষয় ভাবাকুলচিত্তে পুনঃপুনঃ বর্ণনা করিরাছেন, তিনি এক জার্মান পর্যটকের লোকমুখে শ্রুত বিবরণকে আকবরের শাসনকালে হিন্দুর উপর অত্যাচারের নজির হিসাবে উপস্থাপিত করিতে দ্বিধা করেন নাই। আবার, এইরূপ অত্যাচার কল্পনা করিয়া এবং গৃহত্যাগের ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া অপর একজন সাহিত্যের ইতিবৃত্তকার কবির কয়েক-মাসের দুঃখ-দুর্বিপাককে অতিরঞ্জিত করিয়া বলিয়াছেন—"মুকুন্দরামকে জীবনে অনেক দুঃখভোগ করিতে হইয়াছিল।" ইহার পর কবির কাব্যবস্তু সম্পর্কে আলোচনায় দুঃখবাদ নৈরাশ্যবাদ প্রভৃতি তত্ত্বকথার বহু কোলাহল উত্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু কবির আত্মপরিচয়ের ঐ অংশ পাঠ করিয়া, ঘটনাসমূহের একেবারে অন্তস্তলে প্রবেশ না করিয়াও সাহিত্যের ইতিবৃত্তকারদের চিত্তে অত্যাচার উৎপীড়ন অনুমান বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া উচিত ছিল। কেবল আকবর ও তাঁহার প্রতিনিধি মানসিংহের সম্ভাব্য সুশাসনের দিক হইতেই নহে, উজীর হইতে একেবারে নিম্নপদস্থ কর্মচারী ডিহিদার পর্যন্ত সংঘবদ্ধভাবে এবং

শৃঙ্খলার সহিত প্রজা নিপীড়ন করিবেন ইহাই অবিশ্বাস্য। কিন্তু সন্দেহ-সংশয় যে একেবারে ঘটে নাই এমনও নহে। ইহার সমাধানের জন্য ইতিবৃত্তকারগণ বিবিধ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আত্ম-পরিচয়ে মানসিংহের উল্লেখের কোনও মর্যাদা না দিয়া অথবা ইহা কবির পূর্বাপর অসংলগ্ন ভাষণ এরূপ ধারণার প্রশ্রয় দিয়া তাঁহারা এই কল্পিত বিশৃঙ্খলার সময় বিন্যাস করিতে চাহিয়াছেন মোগল-অধিকারের একেবারে প্রারম্ভকালে ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, অথবা এমনতর পশ্চাতে যে একেবারে সুরবংশের পতনের সময়ে ১৫৬৩-৬৪ অব্দে। কয়েকটি ক্ষেত্রে 'ডিহিদার' শব্দের অর্থ ও সামর্থ্যের বোধে বিঘ্ন হওয়ায় "রাজা হৈল মহম্মদ শরিফ" এরূপ বিকৃত পাঠের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 'মহম্মদ শরিফ' নামক কোনও এক ব্যক্তিকে ইতিহাসে কোথায় পাওয়া যায় তাহা সন্ধান করিয়া মুকুন্দরামের গ্রামত্যাগ ও কবিত্বপ্রাপ্তির কালকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে স্থাপন করিতেও সাহিত্যের ইতিবৃত্তকারদের কোনও অসামঞ্জস্য অনুভূত হয় নাই।

ইতিবৃত্তকারগণের এইরূপ কল্পনার উত্তাপে ইন্ধন যোগাইয়াছে মুকুন্দরামের কবিত্বপ্রাপ্তির কালজ্ঞাপক একটি প্রচলিত পয়ার। উহা হইল—"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা। কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥" ইহা ১৫৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দকেই নির্দেশ করে। এই সময়েই আফগান কর্‌রানি বংশের শেষ ও মোগল-অধিকারের সূচনা। সন্ধিক্ষণ হিসাবে বেশ কল্পনা করা যাইতে পারে যে গৌড়ে বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। ঐ কালজ্ঞাপক পয়ারটি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াও কোনো কোনো ইতিবৃত্তকার বিশৃঙ্খলা-কল্পনার সঙ্গে মিলাইয়া অবশেষে উহাকে মান্যই করিয়াছেন। লক্ষণীয় এই যে ঐ কালজ্ঞাপক পুষ্পিকাটি মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের মাত্র প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থেই (১৮২৪ খ্রী.) পাওয়া গিয়াছিল, আর কোনো পুঁথিতেই এই কালনির্দেশ দেখা যায় নাই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় এরূপ কালজ্ঞাপকতার মূল্য যে কী তাহা কিন্তু সাহিত্যের ইতিবৃত্তকারেরা ভালো করিয়াই জানেন। অন্যবিধ সুদৃঢ় প্রমাণের সহিত না মিলিলে ঐরূপ নির্দেশ নির্ভরযোগ্য নহে। তবু যে মুকুন্দরামের ক্ষেত্রে উহার বহুমান করা হইয়াছে তাহার কারণ, ইতিবৃত্তকারগণের চিন্তায় কবি-বর্ণিত বিশৃঙ্খলা আর কখনই বা হইতে পারে? কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়ের ব্যাপার আছে। বর্ধমান জেলার গেজেটিয়ারে ইতিবৃত্ত অংশে মুকুন্দরামের কাব্যরচনার সময় '*circa* 1600' ধরা হইয়াছে অথচ ইতিবৃত্তকার স্বচ্ছন্দে বলিয়াছেন যে শাসন-শৃঙ্খলার অভাবে কবি অত্যাচারীর হস্তে নিপীড়িত হইয়াছিলেন। ইতিহাস অনুসরণ করিলে দেখা যায় ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে আফগান জায়গীরদারদের সঙ্গে মোগল সৈন্যের ইতস্ততঃ সংঘর্ষ হইতে থাকিলেও ঐরূপ কর্মচারী-প্রজা সংঘর্ষ কখনই হয় নাই। ঐরূপ সুবিন্যস্ত অফিসারশ্রেণী ছিল না। বিশৃঙ্খলার সময় উজীর বা ডিহিদারের নবনিয়োগের ব্যাপারও ঘটিতে পারে না। ১৫৯০এর মধ্যে মান্দারণ সরকারে (বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলে) মোগল সৈন্যের সঙ্গে আফগান সরদারদের সংঘর্ষে কত্‌লু খাঁ নিহত হইলে রাঢ় সহ গৌড়ে কলহ স্তব্ধ হয়। অতঃপর মানসিংহ উড়িষ্যার জায়গীরদারদের বশীভূত করিয়া সেখানে মোগল আধিপত্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করেন ১৫৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার পর আসে বঙ্গ বা পূর্ববঙ্গের পালা। মানসিংহ পাকাপাকিভাবে বাংলা-উড়িষ্যার সিপাহ্‌-সালার নিযুক্ত হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই (১৫৯৪ খ্রী.) বঙ্গে মোগল-বিজয় সমাপ্ত করিতে অগ্রসর হন এবং ১৫৯৫এ ইশা খাঁর বশ্যতা স্বীকারের পর অনেকটা সফলকামও হন। মুকুন্দরামের প্রশস্তি অনুসারে এই সময়কার মানসিংহকেই যথার্থভাবে "গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-মহীপ"

বলা যায়। ইতিহাস বলে, মুজাফ্‌ফর খাঁর কর্তৃত্বের সময় (১৫৭৭-৭৮ খ্রী.) গৌড় ও বিহারে মোগলদের অধীনস্থ সেনাধ্যক্ষ এবং জায়গীরদারদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়াছিল, কিন্তু তোড়রমলের হস্তক্ষেপে ও শাসনকৌশলে এ বিদ্রোহ প্রশমিত হইতে বিলম্ব হয় নাই এবং ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই আভ্যন্তরীণ বিপ্লব প্রশমিত হয়। এ বিপ্লবের ফলে প্রজাদের কোনও অসুবিধা হইয়াছিল এমন কথা আকবর-নামা গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ইহার পূর্বে কর্‌রানি বংশের শাসনকালে তো বাংলায় সুখসমৃদ্ধিরই অবস্থা। সুলেমান কর্‌রানি সুযোগ্য শাসক ছিলেন এবং দাযুদ ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা হঠকারী হইলেও প্রজাপক্ষে নির্দয় ছিলেন না। শের শাহের সময় যে উন্নত শাসনব্যবস্থা, মুদ্রামান এবং ভূমিরাজস্ব নির্দিষ্ট হইয়াছিল কর্‌রানি বংশ পর্যন্ত তাহা একটানা চলিয়া আসিয়াছিল। তোড়রমল ইহারই উপর সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কিছু সংস্কার সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই অবসরে কর্মচারীদের সর্বেসর্বা হইয়া প্রজাপীড়ন করার কোনো সুযোগই ছিল না। ড. কালিকারঞ্জন কানুনগো তাঁর 'শের শাহ্' গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে শের শাহের শাসন জায়গীরদার তালুকদারদের প্রতিকূল ছিল, কিন্তু সর্বথা প্রজাকল্যাণের অভিমুখী ছিল। আকবর-তোড়রমল কর্তৃক নির্দিষ্ট এবং মানসিংহ কর্তৃক সার্থকভাবে অনুসৃত নীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল রাষ্ট্রের সহিত প্রজার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। ইহারই জন্য শাসনব্যবস্থা ও রাজস্ব সংগ্রহের যন্ত্রটিকে ঢালিয়া সাজাইবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। শের শাহ ও তৎপুত্র ইসলাম শাহ অসাধু জায়গীরদারদের প্রবল প্রতাপ কতকটা খর্ব করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু প্রজার সহিত রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সংযোগ গঠন করিতে পারেন নাই। ইহার জন্য সুযোগ্য শাসক, সুদক্ষ কর্মচারী-বূ্যহ এবং সম্ভবতঃ অর্থেরও প্রয়োজন ছিল। কাবুল-কাশ্মীর হইতে গৌড় এলাকা পর্যন্ত সমস্ত উত্তর-ভারত মোগল-মুদ্রা প্রচলন ও খুত্‌বা পাঠের দ্বারা বশীকৃত করার পর আকবর মোটামুটি ঐক্যমূলক প্রশাসন পদ্ধতি ও নির্দ্বন্দ্ব রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে মনোযোগী হন। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে তোড়রমলকে বাংলা-বিহার হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আকবর সাম্রাজ্যের প্রধান উজীর পদে নিযুক্ত করেন। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত সুবায় সমমর্যাদার নূতন অফিসারশ্রেণী নিয়োগের খসড়া ব্যবস্থা হয়। ইহার ফলে গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া পরগনা, সরকার, সুবা কেন্দ্রের সহিত একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া যায়। প্রজাদের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায়, প্রশাসন, সুবিচার-ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্তই এই নূতন সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হয়। কেন্দ্রীয় প্রধান কর্মচারীবর্গের সহায়তায় আকবর নূতন শাসনতন্ত্র এমনভাবে রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে ঐ তিনটি অংশ শিথিলভাবে সংলগ্ন না হয়। বিশেষ প্রয়োজনে হয়তো রাজস্ব-সমাহরণ এবং প্রশাসনের ভার একই পদে ন্যস্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু সমাহর্তা ও প্রশাসক ভিন্ন হইলেও পারস্পরিক সহযোগিতার দায়িত্বে আবদ্ধ ছিলেন। আকবর-নামায় এই নবনিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দের নিম্নলিখিতরূপ আখ্যা দেখা যায় :

১. সিপাহ্-সালার বা সুবাদার ২. উজীর (শেরশাহের আমলের দেওয়ান স্থলে, বোধহয় অল্পস্বল্প অধিকার ও মর্যাদার পরিবর্তন করিয়া) ৩. বক্‌শী (অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেল পদের তুল্য) ৪. সদর (বিচারক) ৫. আমল গুজার (রাজস্ব সমাহর্তা) ৬. কোতোয়াল (নগররক্ষী) ৭. ফৌজদার (সরকার-এলাকার ক্রিমিনাল ম্যাজিস্ট্রেট) ৮. কাজি (সরকার বিভাগের বিচারক) ৯. শিকদার (পরগনার ক্রিমিনাল ম্যাজিস্ট্রেট) ১০. পোতদার (মুদ্রা ও ধাতু বিষয়ে অভিজ্ঞ খাজাঞ্চী) এবং কানুনগো, পাটোয়ার, সরকার এবং গ্রাম-প্রধান ডিহিদার। ঐ পদের অনেকগুলিই যদ্যপি শের শাহের

সময় হইতে বিদ্যমান ছিল, এখন শাসনকার্যের সুবিধার জন্য অধিকার ও মর্যাদার কিছু অদল বদল করা হইল। 'ডিহিদার' পদের বিষয় আকবর-নামায় উল্লিখিত নাই, সর্বনিম্ন পদ বলিয়াই বোধহয় নাই। 'ডিহ্' শব্দের ফারসীতে মূল অর্থ গ্রাম। ডিহিদার হইল গ্রাম-প্রধান। শের শাহের সময়কার 'মকদ্দম' ইহার তুল্য পদ। একটু পার্থক্যও হয়তো করা হইয়াছিল। ছোট বড় দুই চারিটি গ্রাম যুক্ত করিয়া এক একটি ক্ষুদ্রতম রাজস্ব-অঞ্চল গঠনের সঙ্গে তাহার প্রধানকেও এই নূতন 'ডিহিদার' আখ্যা দেওয়া হইতে পারে। বৈশিষ্ট্য এই যে মোগল-শাসনে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত রাজকর্মচারীই বেতনভোগী হইলেন।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে কবি যে রাষ্ট্রিকতার ছবি তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা এই নববিধানের। উহাতে তিনি সুবেদার, উজীর, পোত্দার, সরকার এবং ডিহিদারের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রজারা এরূপ নূতন ব্যবস্থার এবং কর্মচারীদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সহিত পূর্বে পরিচিত ছিলেন না। তাঁহারা ভূমির জন্য প্রদেয় খাজনা তালুকদারদের নিকট জমা দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন। তালুকদারেরা জায়গীরদারের নিকট এবং জায়গীরদারেরা সদরে দেওয়ানের নিকট রাজস্ব জমা দিয়া নির্বিবাদে সম্পত্তি ও অর্থ ভোগ করিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাই ছিল প্রথা। মোগল-শাসনের এই নূতন ব্যবস্থায় রাজসরকারে প্রজাদের সরাসরি খাজনা জমা দেওয়ার নির্দেশে কিন্তু প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন ভূম্যধিকারীরা। প্রজাগণ সাময়িকভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হইলেন মাত্র। তবু প্রজাদের দুর্ভোগ কম হয় নাই। জমির পুরাতন মাপের স্থানে নূতন মাপের ও নূতন পড়্চার প্রবর্তন, মুদ্রা-বিনিময়ে বাট্টার জন্য ক্ষতি, পুরাতন মুদ্রা জমা দেওয়ার তারিখ পার হইলে প্রতিদিনের জন্য জরিমানা এবং সর্বোপরি কড়া হুকুম প্রজাগণকে সাময়িকভাবে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। সাম্রাজ্যের প্রধান উজীর নিযুক্ত হইয়া তোড়রমল রাজকার্যের যাবতীয় রেকর্ড ফারসীতে লিখিত হইবার নির্দেশ ঘোষণা করেন। ইহাও প্রজাদের গুরুতর অসুবিধার কারণ হইয়া থাকিবে। আমাদের কবি এই পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হইয়াছিলেন। উহা ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে হইতে পারে না। সুশৃঙ্খল বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে আকবরের নির্দেশনামা ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত হইলেও সুবাগুলিতে অন্তত বাংলায় তখনই এই ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তোড়রমলের মৃত্যুর পর কুলিজ খাঁ সাম্রাজ্যের প্রধান উজীর নিযুক্ত হইলে তিনি অতিরিক্ত কার্যভারের কারণে সুবাগুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের জন্য এক একজন সহায়ক প্রধান উজীর নিয়োগের প্রার্থনা করেন। এইভাবে উজীর-পদের কয়েকটিতে অদল-বদল হয়। বাংলার শাসনকর্তা সৈয়দ খাঁ নববিধান প্রবর্তনের উপযুক্ত সুদক্ষ শাসক ছিলেন না। এই সময় মানসিংহ বিহারের সুবাদার, এবং উড়িষ্যা অধিকারের জন্য সংগ্রামও পরিচালনা করিতেছেন। তিনি উড়িষ্যার জায়গীরদারদের বশীভূত করিয়া দিল্লী গেলে সেখান হইতে বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হইয়া আসেন ১৫৯৪এর মধ্যভাগে। তিনি যেমন দেশজয়ে তেমনি সংগঠনে সুদক্ষ ছিলেন। বাংলা-উড়িষ্যায় এই দুই কার্যেরই প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য সুবেদাররূপে মানসিংহ নির্বাচিত হইলেন এবং সৈয়দ খাঁ তাঁহার স্থানে বিহারে প্রেরিত হইলেন। আকবর-নামা গ্রন্থে দেখিতেছি, দিল্লীতে— The collectors of khalsa, the field-holders and the asseyers of the mint were summoned and a proper test and just weights were assigned to the coins. On the 27th April 1594 the charge of this work

was given to Khwaja Shamsuddin. His disinterestedness and laboriousness remedied in course of two months the old disease of gold and silver.···On 15th of May 1594 Raja Mansingh was sent to Bengal with weighty counsels in order that he might carry out the royal regulations.

সুবাগুলিতে নূতন উজীর নিয়োগের ব্যাপারও ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ঘটে নাই। এ সম্বন্ধে আকবর-নামা—

On 11th July 1595 Twelve Diwans were appointed. Though the viziership was prosperously conducted by the truthfulness and industry of Khwaja Shamsuddin Khafi, yet on account of excess of business and of farsightedness a vizier was appointed to every province and former wishes became fact. Hussain Beg was appointed to Allahabad, Bharti Chand to Azmere, Rai Ram Das to Ahmedabad, Kahun to Oudh, Kishu Das to Bengal, Ram Rai to Delhi··· An order was given that every one should report his proceedings to His Majesty in accordance with the advice of the Khwoja. বাংলায় নূতন উজীরের কার্যে যোগদান করিতে এবং অন্যান্য কিছু কিছু নূতন কর্মচারী নিয়োগের পর জমি পরীক্ষা, মুদ্রা বিনিময়, রাজস্ব ও কর নির্ধারণ প্রভৃতিতে ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দও অতীত হইবার কথা। ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গে মানসিংহের অধিকার বিস্তারও সুসম্পন্ন হয়।

আকবর-মানসিংহের সময় বাংলায় এই শাসন-সংস্কার কীভাবে প্রারব্ধ হয়, 'আইন' অথবা 'আকবর-নামা'য় তাহার কোনও বিবরণ নাই, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে মঙ্গলকাব্যের এই খ্যাতনামা কবি স্বল্প পরিসরে এই প্রশাসন ও ভূমি সংস্কারের পদ্ধতিটি উজ্জ্বলভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহা তাঁহার ও অন্যান্য গ্রামীণ প্রজাদের নিকট দুর্বিপাকরূপেই দেখা দিয়াছিল, কিন্তু নূতনের আগমনে এইরূপই হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে, কবি দামিন্যা গ্রাম ত্যাগ করিয়া মাত্র ত্রিশ চল্লিশ মাইল দূরবর্তী ঘাটালের নিকটবর্তী ব্রহ্মণ্যভূমি বা আরড়ায় গিয়া কিরূপে পরিত্রাণ লাভ করিলেন? ইহারও উত্তর ইতিহাস দিতেছে। এখন যাহা মেদিনীপুর জেলা তাহার উত্তর-পশ্চিমের কিয়দংশ মান্দারণ সরকার অর্থাৎ গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল (মধ্যে কতলু-খাঁ কিছুদিনের জন্য মান্দারণ সরকারকেও উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলেন)। মেদিনীপুরের সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল ছিল উড়িষ্যার জলেশ্বর সরকারের মধ্যে। ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ উড়িষ্যার জায়গীরদারদের মোগলের আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু তিনি আরও অগ্রসর হইয়া শাসন সংস্কারের দ্বারা তত্রত্য আফগান ও হিন্দু 'রাজা'দের অধিকারসমূহ খর্ব করিতে চাহিলে খুরদা-রাজ রামচন্দ্র প্রমুখ প্রধান ভূস্বামিগণ আকবরের নিকট আবেদন করেন এবং আকবর মানসিংহকে ঐ বিষয়ে নিরস্ত হইতে বলেন। ফলতঃ উড়িষ্যায় পূর্বতন জায়গীরদারি শাসনপদ্ধতি কিছুকালের জন্য অটুট থাকে। উড়িষ্যায় সেই পুরাতন ভূমিব্যবস্থা, সেই স্বর্ণমুদ্রা-রৌপ্যমুদ্রা-দাম-কৌড়ির মুদ্রামান শুধু আকবর বাদশাহের নামসহ চলিতে লাগিল। গৃহত্যাগের সময় কবি পুরাতন মুদ্রা যাহা ছিল সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। পুরাতন ব্যবস্থায় লালিত এবং হিন্দু তালুকদারের অধীনে অভ্যস্ত

কবি এখানে তাঁহার মনোমত পুরাতন আশ্রয় পাইয়া চরিতার্থ হন। মুকুন্দরাম যাঁহার আশ্রয় লাভ করেন তিনি বিখ্যাত কোনো রাজা বা জায়গীরদার নন, সাধারণ ভূস্বামী মাত্র। তাঁহার নাম বাঁকুড়া রায়। তিনি সপরিবার-কবিকে অভ্যর্থনা করিলেন (বোধহয় মুকুন্দরামের কবিখ্যাতির বিষয় তিনি পূর্বাহ্লেই অবগত ছিলেন।), সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ আড়া অর্থাৎ প্রায় দশ মণ ধান্য দিলেন এবং তাঁহার পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিলেন ("সুত-পাছে কৈল নিয়োজিত")। মুকুন্দরাম এই রঘুনাথ রায়ের ভূস্বামিত্বের কালেই তাঁহার চণ্ডীকাব্যের রচনা আরম্ভ করেন ও পরিসমাপ্ত করেন। কিন্তু ইঁহাদের পরিচয় বা ভূস্বামিত্বের কাল সম্পর্কে ইতিহাস কোনও সাক্ষ্য দেয় না।[১]

মুকুন্দরাম তাঁর গৃহত্যাগের কারণস্বরূপ যে চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা অত্যাচার বা মাৎস্যন্যায়ের নহে, কবিও ব্যক্তিগতভাবে বিতাড়িত হন নাই। তাঁহার তালুকদার 'প্রভু গোপীনাথ নন্দী' কারারুদ্ধ হওয়ার পর তাঁহার নিজের ভূসম্পত্তি সম্বন্ধেও খানিকটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, নূতন জরীপের ফলে হয়তো জমির আয়তন ও অধিকার সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান হইয়া পড়েন, তাহার পর বিনিময়-মানে আফগান শাসনের পুরাতন মুদ্রা নিহিত ধাতব মূল্যে গৃহীত হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির মধ্যেও পড়িয়াছিলেন। অতএব কেহ কেহ যেরূপ পলাইতেছে, সেইরূপ লুকাইয়া চলিয়া যাওয়াই সাব্যস্ত করিলেন। আত্মপরিচয়ে তিনি যে পথনির্দেশ দিয়াছেন তাহা সদর পথ নহে। তিনি আত্মগোপন করিয়া পলাইয়াছিলেন বলিয়া পথের কষ্ট তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মুকুন্দরামের আত্মপরিচয় অংশটি সামগ্রিক বিচারে এবং খুচরা ব্যাখ্যায় ঠিকভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় নাই বলিয়াই তাঁহার গ্রামত্যাগের মূল কারণ মুসলমান কর্মচারীর অত্যাচার বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার সাময়িক দুঃখকে ব্যাপক করিয়া কল্পনা করিয়া তাঁহার কাব্যে ঐ দুঃখের প্রতিক্ষেপ ঘটিয়াছে কিনা তাহা লইয়া বিতর্কের সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমরা এখানে মুকুন্দরামের আত্মবিবরণের অংশটুকু বিচার করিয়া আমাদের ধারণার যথার্থতা প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইতেছি।

বলা বাহুল্য, কবির আত্মপরিচয়ের বা কবিত্বলাভের বিবরণের এই অংশটি "শহর সেলিমাবাজ তাহাতে সজ্জনরাজ" ইত্যাদি পালাগায়কদের কৃত নগণ্য পাঠভেদসহ সকল মুদ্রিত গ্রন্থে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের পুঁথিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত বলার অবকাশ নাই। কবির আত্মপরিচয়ের আর-একটি অংশও ("ধন্য ধন্য কলিকালে রত্নানু নদের কূলে" ইত্যাদি) কয়েকটি গ্রন্থে প্রচলিত আছে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে ড. দীনেশচন্দ্র সেন দামিন্যায় প্রাপ্ত পুঁথি অনুযায়ী ঐ দ্বিতীয় অংশটিকে প্রাধান্য দিয়া অগ্রে স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ অংশে পরবর্তী অংশের বক্তব্যের কোনও খণ্ডন নাই, নূতন কোনও ঐতিহাসিক বা সামাজিক তথ্যও নাই। উহাতে দামিন্যা ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের এবং শেষে কবির আত্মগৌরব ঘোষণা করা হইয়াছে। আমরা এই অংশটিকে দামিন্যা-দক্ষিণপাড়া গ্রামের কোনও পালাগায়কের যোজিত আংশিক প্রক্ষেপ বলিয়া মনে করি। কিন্তু এই

---

১ ঊনবিংশ-শতকের সাহিত্যের ইতিবৃত্তকার রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন তৎকালীন মেদিনীপুরের এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নাকি অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে রঘুনাথ রায় ১৫৭৫-১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজা অর্থাৎ ভূস্বামী ছিলেন। তিনি কোথা হইতে কীভাবে উহা পাইলেন জানা যায় না। ঐ তারিখ আকবরের বাংলা অধিকার ও মৃত্যুর সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে। আমাদের ধারণায় রঘুনাথ রায় ১৫৯৬এর পূর্বে রাজা বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন না।

প্রবন্ধে প্রক্ষিপ্ত বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া এ সম্বন্ধে বাগ্ বিস্তার না করিয়া মূল আত্মপরিচয় অংশের ইতিহাসানুগ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছি। এই আলোচনায় আমাদের অবলম্বিত পাঠের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রিত ও বর্তমানে প্রচলিত গ্রন্থের পাঠের গুরুতর কোনও প্রভেদ নাই বলিয়া পাঠকদের ঐ অংশ স্মৃতিতে বা সম্মুখে রাখিতে অনুরোধ জানাই। প্রয়োজনীয় অংশগুলি মাত্র ব্যাখ্যাত হইতেছে।

'শহর সেলিমাবাজ' ॥ সেলিমাবাদ হইল সুলেমানাবাদ নামক সরকারের হেডকোয়ার্টার। ফারসী উষ্ম উচ্চারণের দ=বাংলা দ বা জ। সুলেমান কর্‌রানির নামানুসারে সুলেমানাবাদ, উহা হইতে সেলিমাবাদ। রেনেলের মানচিত্রে 'সেলিমাবাদ'। উহা বর্ধমান হইতে প্রায় ১৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে দামোদরের নিকটে। সেলিমাবাদ হইতে দামিন্যা আট মাইলের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমে, 'গোটান'এর উত্তরে। সেলিমাবাদ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে সোজা কুড়ি মাইলের মধ্যে জাহানাবাদ (বর্তমান আরামবাগ) এবং আরামবাগ হইতে রূপনারায়ণ ধরিয়া কুড়ি মাইল দক্ষিণে শিলাই ও রূপনারায়ণের সংযোগস্থলের নিকটে 'ব্রহ্মণ্যভূমি' বা আরড়া (রেনেলের মানচিত্রে বমন্যপুরী [ভুঁই ?])। দামিন্যা হইতে আরড়া সোজা পথে (বাদশাহী সড়কে) ও রূপনারায়ণ বাহিয়া আন্দাজ ৩৫ মাইলের মধ্যে।

'ধন্য রাজা মানসিংহ' ইত্যাদি ॥ কবি আকবর বাদশাহের উল্লেখ করেন নাই, কারণ অধীশ্বর হিসাবে মানসিংহই প্রত্যক্ষ এবং সর্বেসর্বা। মানসিংহের পরিচয় ঐ অঞ্চলের সাধারণ প্রজারাও জানিতেন, কারণ, সুবাদার হওয়ার পূর্ব হইতে বাংলা ও উড়িষ্যায় আফগান প্রতিরোধ দূর করিবার জন্য সৈন্যসহ এবং সপরিবারে মানসিংহ কখনও বর্ধমানে কখনও সুলেমানাবাদে, কখনও বা জাহানাবাদে যাপন করিতেন (আকবর-নামা দ্রষ্টব্য)। মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ দুর্জনসিংহ প্রভৃতিও অন্তত নামতঃ সকলের পরিচিত ছিলেন। 'বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ' বলার নিকটতম কারণ এই যে ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ উড়িষ্যা বিজয় করিয়া সপরিবারে জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ ও প্রার্থনায় কয়েকদিন অতিবাহিত করেন। "গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-মহীপ" বলায় বুঝা যাইতেছে ইহা মানসিংহের 'উড়িষ্যা' এবং 'বঙ্গ' বিজয়ের পরে লিখিত, অর্থাৎ ১৫৯৫এর পূর্বে নহে। এমন বীর ও মহৎ রাজার সময়েও যে মামুদ শরিফের মতো নিষ্ঠুর ব্যক্তি ডিহিদার নিযুক্ত হয়, ইহা প্রজাদের পূর্বপাপেরই ফল বলিতে হইবে, কবি এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

'ডিহিদার মামুদ শরিফ' ॥ ডিহিদার অর্থে গ্রাম-প্রধান। রাষ্ট্রতন্ত্রের নিম্নতম কর্মচারী। শের শাহের সময়ে ইহারই আখ্যা ছিল 'মকদ্দম'। আকবরের সময় নূতন নামকরণের মধ্যে নূতন পদাধিকারের ইঙ্গিত রহিয়াছে। গ্রাম-প্রধান বলিয়া প্রজাগণের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। পদ ক্ষুদ্র হইলেও ডিহিদার বা মকদ্দমের দায়িত্ব কম ছিল না। গ্রামের রাজস্ব আদায় হইতে ছোটখাট প্রশাসন-ব্যবস্থা ইহারই উপর ন্যস্ত থাকিত। গ্রামাঞ্চলে চুরি-ডাকাতি খুন-খারাপী হইলে এবং অপরাধীর সন্ধান না মিলিলে ইহাকেই কৈফিয়ত দিতে হইত। ড. কানুনগো তাঁর 'শের শাহ্' গ্রন্থে মকদ্দম-পদের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোকপাত করিয়াছেন। অপর একজন ঐতিহাসিক বলিতেছেন— The Mughal and the earlier Muslim rulers used the headman of the old village community as not only an agent for revenue realisation, but also held him

officially responsible for policing of the rural areas.[২] আবার ইনি গ্রামের সর্বেসর্বা হওয়ায় ইহার প্রতাপও কম ছিল না। মুকুন্দরামের বর্ণনায় দেখা যায় প্রজারা যাহাতে না পালায় তাহার জন্য ডিহিদার সন্দেহের ক্ষেত্রে পেয়াদা লাগাইতেছেন। প্রজা চলিয়া গেলে রাষ্ট্রের ক্ষতি। তখন ডিহিদারকেই শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। তার উপর নূতন শাসন প্রবর্তনের সময়। উপরওয়ালারা কড়া হওয়ায় ডিহিদারকেও কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ব্যক্তিবিশেষের উপর তাহার রোষ বা পক্ষপাতের কথা মুকুন্দরাম বলেন নাই, বরং প্রকারান্তরে তাহার গুণকীর্তনই করিয়াছেন —"ডিহিদার অবোধ খোজ, কড়ি দিলে নাহি রোজ" ইত্যাদি রূপ বর্ণনা করিয়া। টাকা হাতে দিয়া যাহার কঠোরতা প্রশমন করা যায় না এমন কর্মচারী সমাজের গৌরব বলিতে হইবে।

'উজীর হল্য রায়জাদা'॥ অংশটি এতাবৎ ভুলভাবে ব্যাখাত হইয়াছে। এখানে রায়জাদা উদ্দেশ্য এবং উজীর বিধেয়। 'রায়পুত্র উজীর পদে নিযুক্ত হইলেন' এইরূপ অর্থ হইবে। সুবাদারের পর উজীরই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্মচারী, যাবতীয় আয়ব্যয়ের অধিকর্তা এবং সম্ভবত প্রশাসনেরও আংশিক দায়িত্বসম্পন্ন। উজীর এবং দেওয়ান সমার্থবহ শব্দ। শের শাহের সময়ে এবং আকবরের সময়েও এতকাল দেওয়ান শব্দ প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ কিছু নূতন মর্যাদা আরোপিত হইলে 'উজীর' শব্দটি নির্বাচিত হয়। কবি বলিতেছেন, তিনি ব্যবসায়ীদের উপর খড়্গহস্ত হইলেন এবং ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব অর্থাৎ সজ্জনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। নূতন মাপ, নূতন ওজন এবং দ্রব্যশুল্কের হার লইয়া ব্যবসায়ীদের সাময়িক বিপন্নতা স্বাভাবিক। কিন্তু কে এই রায়পুত্র? 'আকবর-নামা'য় দেখা যায়, পত্রদাস নামক এক ব্যক্তি রায়-রাঁয়া খেতাব পাইয়া ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার যুগ্ম দেওয়ানের একজন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্ভবত ইনি পশ্চিম হইতে তোড়রমলের সঙ্গে এদেশে আসিয়া গৌড় বিজয়ে মোগলের সহায়তা করেন এবং তারপর হইতে এখানেই বসবাস করিতে থাকেন। ঐ সময় মুজাফ্ফর খাঁ গৌড়ের শাসনকর্তা। বাংলায় কিছুদিন দেওয়ানের কাজ করার পর ১৫৮৫ অব্দে রায় পত্রদাস বিহারের দেওয়ান নিযুক্ত হন। ১৫৮৭ অব্দে মানসিংহ বিহারের সুবাদার নিযুক্ত হইলে পত্রদাস তাঁর সঙ্গে অন্তত ১৫৮৯ পর্যন্ত কাজ করেন। ১৫৮৯ অব্দে সাম্রাজ্যের প্রধান দেওয়ান তোড়রমলের মৃত্যু হইলে পর তৎপদে নিযুক্ত কুলিজ খাঁর সহকারী দেওয়ান হিসাবে তিনি দিল্লী চলিয়া যান। ঐ সময়ে কেন্দ্রে বাংলা-বিহারের প্রতিনিধি দেওয়ান ছিলেন রায় রামদাস (সম্ভবত রাজা ভগবান দাসের পুত্র)। ইহা হইল ১৫৯০-৯১এর কথা। আবার দেখা যায়, মানসিংহ ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পত্রদাসকে বাংলায় ফিরাইয়া আনিয়া উড়িষ্যার বাঙ্কু দুর্গজয়ে প্রেরণ করিতেছেন। মনে হয়, পত্রদাসকে বাংলাতেই রাখিয়া মানসিংহ এই সময়ে দিল্লী চলিয়া যান এবং ১৫৯৪এ বাংলা-উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হইয়া আসেন। ইহার পর হইতে পত্রদাসের কোনো খোঁজ মিলিতেছে না। ১৫৯৫এ দেখিতেছি নূতন শাসন-সংস্কারে 'কিসুদাস' বাংলার উজীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই 'কিসুদাস' পত্রদাসেরই পুত্র কিনা সে বিষয়ে আকবর-নামায় কিছু পাওয়া যায় না। মুকুন্দরামও কোনো নাম করেন নাই। আমাদের অনুমান এই কিসুদাস (কেসুদাস নয়, তিনি ভিন্ন ব্যক্তি) পত্রদাসেরই পুত্র রায়জাদা। অযোগ্যতা প্রতিপন্ন না হইলে সরকারি

২ P. Saran, *Provincial Govt. of the Mughals,*

কাজকর্মে বংশক্রম রক্ষার একটা রীতি তখন ছিল। ইহাতে কাজের সুবিধাও হইত। যুবক উজীর, পূর্ব পরিচিত রায়জাদা, অতি উৎসাহ সহকারে সংস্কারকার্যে ব্রতী হইয়া ব্যবসায়ী ও সজ্জনবর্গের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

'মাপে কোণে দিয়া দড়া' ॥ কোনাকুনি দড়ি দিয়া মাপিলে কাহার কী সুবিধা তাহা বুঝা যায় না। আয়তক্ষেত্র নয় এমন ভূমির কালি বাহির করিতে গেলে ঐরূপ মাপের প্রয়োজন হইতে পারে। উজীরের নির্দেশে জমি-জরীপ খুব সূক্ষ্ম ভাবেই করা হইতেছিল। এরূপ সূক্ষ্ম মাপে প্রজাগণ অভ্যস্ত ছিল না। এখনও দেখা যায়, নূতন Settlement বসিলে জমির মালিক অনেকেই অসুবিধা বোধ করেন।

'পনের কাঠায় কুড়া' ॥ নূতন মাপে জমির পরিমাণ কমিয়া যাইতে লাগিল। ইহার কারণ ছিল। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরণের মাপ প্রচলিত থাকায় অসাধু ব্যক্তি অন্যকে ঠকাইত। আকবর সর্বত্র এক প্রকার মাপ চালাইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। বিঘার মাপ ছিল ৬০ গজ × ৬০ গজ, কিন্তু আকবরের ইলাহি গজের দৈর্ঘ্য পূর্ব প্রচলিত ইস্কিন্দারি গজ হইতে দেড় আঙুলের মতো কম হওয়ায় বিঘার পরিমাণ কিছু কমিয়া গেল। এ সম্বন্ধে 'আইন'—"Akbar in his wisdom seeing that the variety of measures was a source of inconvenience to his subjects, and regarding it as subservient only to the dishonest, abolished them all and brought a *medium gaz* of 41 digits into general use."

'সরকার হইল কাল, খিল ভূমি লিখে লাল' ॥ অর্থাৎ অনাবাদী জমিকে আবাদী বলিয়া গণ্য করা। ইহাতে দৃশ্যত রাজার লাভ, ঐগুলিতে উর্বর জমির সমান রাজস্ব প্রাপ্তি। কিন্তু ভিন্ন কারণে এরূপ করিতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। রাজ্যে যাহাতে সুবৃষ্টি হয়, ভালো ফসল হয় এবং কর্ষণযোগ্য সমস্ত ভূমিতেই ফসল ফলানো হয় এ বিষয়ে যে আকবরের সতত উৎকণ্ঠা ছিল তাহা আকবর-নামা হইতে জানা যায়। অথচ নানা কারণে কৃষকেরা আবাদ না করিয়া জমি ফেলিয়া রাখিত (এরূপ ব্যাপার সেদিনও আমরা দেখিয়াছি)। এজন্য উজীর এবং রাজস্ব-সমাহর্তাদের নিকট আকবরের নির্দেশ ছিল—"No such lands should be suffered to fall waste."—কর্ষণযোগ্য অথচ পতিত রাখা হইয়াছে, এরূপ জমিতে কৃষক যাহাতে ফসল ফলায় সেজন্যই বোধ হয় ঐরূপ উদ্যম। 'সরকার' বলিতে বুঝায় জমি জমার আয়তন পড়চা, নম্বর প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মচারী।

'বিনা উপকারে খায় ধুতি' ॥ ডিহিদার, সরকার, প্রভৃতি কর্মচারীরা আঞ্চলিক লোক ছিল বলিয়া তাহাদের ঘুষ দিয়া কার্য উদ্ধার করার রীতি ছিল। এ ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ করিয়াও 'সরকার' যে উপকার করিতে পারেন নাই ইহাতে উপরওয়ালাদের জাগ্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বিষয় জানায়।

'পোতদার হইল যম, টাকায় আড়াই আনা কম' ইত্যাদি ॥ পোতদার = ফোতদার। ধাতব মান বিষয়ে অভিজ্ঞ খাজনাখানার কর্মচারী। পুরাতন হইতে নূতন মুদ্রার ধাতব মানাধিক্যই পুরাতনের মূল্য কম হইবার কারণ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভবত সকল কৃষক প্রজাকে খাজনাখানায় টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। সময় অতীত হইলে যাঁহারা মুদ্রা-বিনিময়ের জন্য আসিবেন তাঁহাদের উপর 'দিন প্রতি' এক পাই করিয়া জরিমানাও ধার্য করা হইয়াছিল। পূর্বেকার আফগান সামন্ততন্ত্রের বিভিন্ন আকৃতির ও মানের মুদ্রা অনেকের নিকটেই ছিল। তাঁহাদের টাকা-প্রতি কিছু করিয়া ক্ষতি

স্বীকার করিতে হইয়াছিল, কারণ ভিন্ন রাজত্বের মুদ্রাগুলি উহাদের নিহিত ধাতব মূল্যেই গৃহীত হওয়ার নির্দেশ ছিল। এ সম্পর্কে সমাহর্তার নিকট এবং পোতদারের নিকট নিম্নলিখিতরূপ নির্দেশ দেওয়া ছিল—

১) Let him (=the collector) see that the treasurer does not demand any special kind of coin, but take what is standard weight and proof and receive the equivalent of the deficiency at the value of current coin and accord the difference in the voucher.

২) He (=the treasurer) should receive from the cultivator any kind of mohurs, rupees or copper that he may bring and not demand any particular coin. He shall require no rebate on the august coinage of the realm, but take merely the equivalent of the deficiency in coin-weight. Coinage of former reigns he shall accept as bullions.

—আইন-ই-অকবরী

অতএব, টাকায় আড়াই আনা এবং দিন প্রতি পাই লভ্য পোতদারের প্রাপ্য ছিল না। ইহা ফোতদারি করও নহে। কারণ ফোতদারি, দারোগানা প্রভৃতি যে সকল আবোয়াব পূর্বে প্রচলিত ছিল আকবর তাহা নিষিদ্ধ করেন ('আইন' দ্রষ্টব্য)। অরাজকতার কল্পনা করিলেও একজন পোতদার এইভাবে নিত্য নিয়ম করিয়া প্রভূত রোজগার করিতে থাকিবে ইহা অসম্ভব।

'ডিহিদার অবোধ খোজ, কড়ি দিলে নাহি রোজ'॥ মকদ্দম বা ডিহিদার গ্রামবাসীদের নিকট প্রত্যক্ষ দেবতা, সদাজাগ্রত। তাহাকে প্রসন্ন না রাখিলে সমূহ বিপদে পড়িতে হইত। কিন্তু মামুদ শরিফকে উৎকোচের দ্বারা প্রসন্ন করা দুরূহ ছিল। ইহার কারণ অবশ্য তাহার ব্যক্তিগত উন্নত চারিত্র্য না হইতেও পারে। মানসিংহের তত্ত্বাবধানে নূতন সংগঠনের কাজকে যুদ্ধকালীন কর্তব্যের ন্যায় গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকিবে। কর্মচারী-বূ্যহের এই অভিযানে কাহারও অসংগত কিছু করার অবকাশ ছিল না। সেইজন্য না-সরকার, না-ডিহিদার কেহই প্রজাগণের অভিলষিত উপকারে আসে নাই।

'পেয়াদা সবার কাছে, প্রজারা পালায় পাছে'॥ বিশৃঙ্খলার সময় এরূপ কখনই ঘটিতে পারিত না। ইহাতে কোনও একটা নিয়মপদ্ধতির অনুসরণই লক্ষ্য করা যায়। প্রজারা পালাইলে ফসল রাজস্ব প্রভৃতির অসুবিধায় রাষ্ট্রের ক্ষতি। কোনও প্রজা পালাইলে মকদ্দম বা ডিহিদারকে জাবাবদিহি করিতে হইত। সেজন্য ডিহিদার পেয়াদার সাহায্যে পলায়ন-নিবারণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকর্মচারীদের এই নূতন উদ্যমে প্রজারা যেরূপ সন্ত্রস্ত হইয়াছিল উহাতে তাহাদের দিক হইতে পলায়ন ছাড়া পথও ছিল না।

'প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী'॥ নিশ্চয়ই জমি-জমা বা রাজস্বগত গুরুতর কোনও স্খলনের জন্য তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া থাকিবেন। কবি বলিতেছেন—'হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে'— অর্থাৎ এমন জট পাকাইয়াছিলেন যে উদ্ধারের উপায় ছিল না। ইঁহার অধীনস্থ চাষী হিসাবে মুকুন্দরামও নিজেকে আশ্রয়হীন ভাবিয়া গ্রামত্যাগে উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন।

এইভাবে মুকুন্দরামের গ্রামত্যাগ ও গ্রন্থরচনার উপক্রম অংশটি ইতিহাসের সঙ্গে মিলাইয়া এবং ইতিহাসকে আত্মপরিচয়ের বর্ণনা দ্বারা পরিস্ফুটভাবে অনুধাবন করিয়া আমরা দেখিলাম যে—

১. মুকুন্দরাম বিধর্মী শাসকের অত্যাচারে বিতাড়িত হন নাই। কিন্তু কেন্দ্র হইতে নির্দিষ্ট সামগ্রিক পরিবর্তনমূলক নূতন ভূমি ও শাসন-ব্যবস্থায় নানা অসুবিধা অনুভূত হওয়ায় গোপনে পলাইয়াছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবেও নিপীড়িত হন নাই।

২. তিনি যে আরড়া গেলেন তার কারণ, উহাই সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান যেখানে পুরাতন মুদ্রামান বজায় ছিল এবং পুরাতন জমিদারি অধিকারের আশ্রয়ে সাময়িক নিশ্চিন্ততা বর্তমান ছিল।

৩. তাঁহাকে দুর্বিপাক ভোগ করিতে হইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু তাহা বেশি দিনের জন্য নহে। পথযাত্রার কষ্ট ১০।১৫ দিনের হইতে পারে।

৪. তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনায় হস্তক্ষেপ ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কখনই হইতে পারে না।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, যে-মোগল শাসনে বাংলার মানুষ দেড় শত বৎসরের অধিককাল শৃঙ্খলা ও শান্তিতে অতিবাহিত করিয়াছিল, তাহার প্রারম্ভে কৃষক প্রজাগণ বিবিধ সংস্কারমূলক ঐ শাসনকে কীভাবে গ্রহণ করিয়াছিল তাহার একটি কৌতুককর দলিল আমরা মুকুন্দরামের স্বগ্রামত্যাগের বিবরণে পাইতেছি।

সাহিত্য : সাময়িক ও শাশ্বত

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

পরিণতির প্রান্তে উপনীত হবার পরেও রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছিল—

আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

দার্শনিক বলতে পারেন যে দেশ ও কালের বিচ্ছিন্ন বিন্দুতে অবস্থিত কোনো কিছুই সর্বত্রগামী হতে পারে না। তা ঠিকই, তবু সেই সর্বত্রগামিতার নিরন্তর আয়াসের মধ্যেই হয়তো কবিতার বীজ নিহিত।

সময়ের অস্থির স্রোতে তাড়িত জীবন, নানা খণ্ড অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্যহীন সমবায় বলেই মনে হয়, অথচ কোনো কোনো দুর্লভ উপলব্ধির মুহূর্তে সেইসব অসংলগ্ন অভিজ্ঞতার আপাতবিরুদ্ধতা থেকেই এক একটি সম্পূর্ণ কবিতার জন্ম হয়। জীবনের টুকরো টুকরো অংশগুলি নিজের অতীত একটা অর্থ পায় এবং সবকিছু নিয়ে জীবনের এমন এক নিজস্ব অর্থসঙ্গতি ফুটে ওঠে, যা তার আগে দেখা যায় নি। এ যেন পাতা দেখা দিয়েছিল, ফুল চোখে পড়েছিল, শাখা কি তাও অজানা ছিল না, তবু সব সমেত একটা সবুজ সোন্নত গাছ যখন চোখে পড়ল তখন হৃদয় বিস্মিত না হয়ে পারল না। আগে যা দেখেছিল, মন সে-সব কিছুর গভীরতর তাৎপর্য বুঝল— একটা ব্যাপক খুশির পরিপ্রেক্ষিতে টুকরো টুকরো প্রয়োজনের গভীরে নিহিত বিষাদ ও আনন্দকে জানতে পারল সে। জীবনের খণ্ডবিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ অবয়বের গভীরে তার অন্তরসঙ্গতির আকস্মিক উপলব্ধিকেই জীবনসংযোজন বলব। কোনো আকস্মিক উপলব্ধির মুহূর্ত এসে এই জীবন-সংযোজন সম্ভব করে, না, সংযোজনের ব্যাপক আকাঙ্ক্ষা জীবনে উপলব্ধির মুহূর্তকে সম্ভব করে তোলে, তা জানি না, প্রেরণাবাদীরা হয়তো বলবেন, উপলব্ধির মুহূর্ত কোনো প্রয়াসের ফল নয়। সেই হেতু কোনো আকাঙ্ক্ষার ফলও নয় সে, হয়তো একেবারে অস্বীকার করা যায় না ; তবু স্মরণে রাখা দরকার যে, জীবনসংযোজনের তাগিদ জীবনে না থাকলে কোনো মানুষের জীবনেই উপলব্ধির আনন্দবিস্ময়ঘন মুহূর্ত অকস্মাৎ এসে দেখা দিত না। খণ্ডবিচ্ছিন্ন জীবনের নানা অংশকে পরিপূর্ণ করে দেখার, তার সামগ্রিক ঐক্যকে উপলব্ধি করার একটা আন্তরিক বেগ কবির অন্তঃপ্রকৃতিতে কাজ করে আর তাই প্রেরণার বীজ বাতাসে উড়ে ভেসে এসে কবিমানসে ফলবান বৃক্ষ হয়ে ওঠে। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর কাব্যে সর্বত্র-গামিতার অভাব লক্ষ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তখন সংপাঠকের কাছে যেটা সবচেয়ে বড়ো হয়ে প্রকাশ পায় সে তাঁর জীবনসংযোজনের ব্যাপক আকাঙ্ক্ষা— তা ছাড়া কিছু নয়।

ইতিহাসের এক-একটা পর্বে জীবনের এক-একটা দিক মানুষের সামনে বড়ো হয়ে দেখা দেয়। কেন, তার কারণ ইতিহাস-জিজ্ঞাসু বিচার করেন বা করবেন বলে আমরা আশা করি। আপাতত জীবনের দিকে তাকিয়ে এ কথা বলা যায় যে, রাষ্ট্রিক সামাজিক ও আর্থিক, নানান স্রোতের সংযোগ ও সংক্ষোভের ফলে, মিলন ও দ্বন্দ্বের ধারায় আমাদের জীবনে এক-এক সময়ে এক-একটা সমস্যার আবর্ত জেগে ওঠে। এক-একটা প্রশ্ন জীবনে এত অত্যন্ত হয়ে পড়ে যে, আমরা তাকে সমস্যা না বলে পারি না সাহিত্যিক যদি তখন জীবনকে, তার তাৎপর্যকে বুঝতে ও পূর্ণতা উপলব্ধি করতে চান, সাহিত্যে জীবনঘনিষ্ঠতা সত্য করতে

চান তখন তাঁকে জীবনের সেই আবর্তসঙ্কুল দিকটিকে অঙ্গীকার ও প্রকাশ করতে হয়। প্রকাশ করতে হয় অন্য সব কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে এবং অন্যনিরপেক্ষ ভাবে তার স্বাধীন স্বরূপে— নচেৎ জীবনবোধ অপূর্ণ থাকে।

২

মনে হয় এই জাতীয় প্রয়োজনবোধ থেকেই সাহিত্যে এক-এক সময়ে এক-একটি মতবাদ অথবা শিল্পরীতি অথবা শিল্পরীতি সম্পর্কিত মতবাদ কয়েকজন রচয়িতার মনে প্রবল হয়ে ক্রমশ একটি আন্দোলনের আকার নেয়। স্মরণীয় যে সাহিত্যে মত ও রীতি এবং রীতি সম্পর্কিত মত, প্রকাশে একই। আমরা দেখি যে, কয়েকজন রচয়িতা সাহিত্যের বিষয় অথবা আঙ্গিক অথবা যা আরো সত্য, উভয়কে মিলিত করে নতুন এক প্রয়োজনবোধ অনুভব করছেন এবং সেই প্রয়োজনবোধের তাড়নায়— নিছক প্রেরণায় নয়— সেই নতুন বোধেরই নিরিখে সাহিত্যের বিদ্যমান রীতি বা উপস্থিত বিষয় সন্নিবেশকে বিচার করে নতুন উপলব্ধিকে স্পষ্ট ও প্রসারিত করতে চাইছেন। উপস্থিত করছেন নতুন বিষয় বা বক্তব্য, এবং সাহিত্যে যা অনিবার্য, নতুন বক্তব্যের প্রয়োজনে প্রকাশরীতিকেই নতুন রূপ দিতে হচ্ছে। অথবা নতুন রীতিকে গ্রহণ করার ফলে পুরনো বক্তব্য অতিক্রান্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বক্তব্য ও আঙ্গিকের বিষয়ে প্রাচীন বিতর্কের পুনরুত্থান অনিবার্য যদিও, তবু সে কথা শ্রুতিতে রেখেই স্মরণ করিয়ে দেব যে, সাহিত্যকৃতিতে আঙ্গিকের বিষয়ে নতুন কথা এবং বক্তব্য বিষয়েও নতুন কথা প্রকাশে এক এবং কার্যত অভিন্ন। একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি তো বটেই। ভাব ও রূপ ধারণায় বিচ্ছিন্ন হলেও অভিজ্ঞতায় তা নয়। একটি সংগীত বা কবিতাকে যদি একটি ঘটনা হিসেবে দেখি তা হলে ভাব ও রূপের ভেদরেখা টানা চলে না, উভয়েই একাকার হয়ে ওঠে। সুতরাং বিষয় অথবা আঙ্গিক যাকে কেন্দ্র করেই নতুন প্রয়োজনবোধ উপস্থিত হোক-না কেন, তা আঙ্গিক ও বিষয় উভয়কেই প্রভাবিত করবে, নতুন পথে নিয়ে যাবেই, যে আন্দোলন আঙ্গিকের পরিবর্তন-সূচক তার বিষয়-সংযোগ সম্বন্ধে হয়তো আমরা অনেকেই অবহিত নই। হয়তো আন্দোলনের ধারকদের ব্যাখ্যা গুণেই আমাদের ধারণা অস্পষ্ট থাকে। তবু বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, উপেক্ষণীয় নয় আদৌ। যখন মনে হয়, যে ভাবে বলা হয়, হয়ে চলেছে, সে ভাবে যা বিশেষত বলার তা বলা হয় নি, বলা যায় না, তখন সেই অভাববোধ থেকেই, সেই অভাববোধ উত্তীর্ণ হবার প্রয়োজনেই নতুন আঙ্গিকের দাবি ওঠে এবং তার অস্তিত্ব সমর্থিত হয়। এ ক্ষেত্রে নতুন কিছু বলার প্রয়োজন থাকে বলেই নতুন ভাবে বলার প্রয়োজন ঘটে। অথবা অন্যদিক থেকে দেখলে বলা চলে নতুন ভাবে বলতে গেলেই বক্তব্যটা নতুন হয়ে ওঠে, নতুন কিছু বলতে হয়।

এ পর্যন্ত যখন বলা হল তখন সজ্ঞানে সিংহাবলোকন প্রয়োজন মনে করি। সাহিত্য জীবন-বিচ্ছিন্ন কোনো সামগ্রী নয়। জীবনের রূপ ও দাবি নানা কারণের ঘাত-প্রতিঘাতে পরিবর্তনশীল। সাহিত্যে তাই জীবনঘনিষ্ঠ হবার তাগিদেই বারংবার নতুন বিষয় সন্নিবেশ ও আঙ্গিকের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। একাধিক কারণে অনিবার্য আর বিষয় ও আঙ্গিক অভিজ্ঞতায় এক। নতুন আধারে প্রাচীন পানীয় পরিবেশন জীবনের মতোই সাহিত্যে ক্লান্তিকর। তাই জীবনের নিহিত প্রয়োজনবোধে, জীবনঘনিষ্ঠতার তাগিদে যখন বক্তব্য ও আঙ্গিক নতুন পথের সন্ধান করে তখন আমরা যা পাই তা-ই একটি নতুন সাহিত্য আন্দোলন।

৩

জীবনের পরিবর্তিত প্রয়োজন ও প্রয়োজনবোধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগবশতই নতুনত্বের দাবি নিয়ে যখন কোনো সাহিত্য আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে তখন তাকে শুধুমাত্র সাময়িক সাহিত্য এই বিশেষণে লাঞ্ছিত করে অবজ্ঞা করা গুরুতর ভুল হবে। অবশ্য পূর্বেই যা বলেছি, আন্দোলনের ব্যাখ্যাতাদের স্ব-কৃত ব্যাখ্যাই সাহিত্যধারা সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে ব্যাহত করে। এ ক্ষেত্রে যেটি মূল্যবান, এমনকি প্রাথমিক, তা হল জীবনবিন্যাসের পরিবর্তন যা আমাদের সামগ্রিক চিন্তা ও সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকের পরিবর্তন দাবি করে এবং ক্রমে অনিবার্য করে তোলে। অথচ সচরাচর যা ঘটে, তাতে ইতিহাসের স্রোতে বাহিত সমাজবিন্যাসের যে রূপান্তর তার মৌল তাৎপর্যই অনুচ্চারিত থাকে। তার পরিবর্তে সময় একটি বিমূর্ত ভাবশক্তিরূপে কল্পিত হয়, যে-নাকি পুরাকথিত ঈশ্বরের মতোই আপন অনিয়ন্ত্রিত খেয়ালে আমাদের রুচি বুদ্ধি -সমেত সমস্ত বিশ্বব্যাপার তথা সচেতন মানুষের সমাজ-ব্যবস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে, দেখতে পাই ভক্তিবাদের নবরূপান্তর, ঈশ্বরের আসনে বিমূর্ত সময়ের প্রতিষ্ঠা। নিষ্ঠাবানের কর্তব্য হিসেবে নির্দিষ্ট হয় এই সময় দেবতাকে তুষ্ট রাখা, অথবা তাঁর স্বয়ংবৃত পুরোহিতদের, যাতে আমরা সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলার ছাড়পত্র পেতে পারি। যেন মানুষের স্বাধীন বিবেক, বিচারবুদ্ধি বা চিৎপ্রকর্ষ, কতকগুলি শূন্যগর্ভ শব্দ মাত্র, যেন বিচারশীল মানুষকে সময়ের বিন্দুতে দাঁড়িয়ে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে বারংবার নানা বিরোধীভাব, আদর্শ ও প্রয়োজনের দ্বন্দ্বে চয়নবর্জনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না! এই নিরাকার নির্বিকল্প সময় যদি কোথাও থাকেও তবে, মানুষের জীবনে সে নেই তা নিশ্চিত। জীবিত মানুষের চেতনায় সময়ের কোনো নির্বিশেষ অখণ্ড রূপ নেই, অস্তিত্বের খণ্ডাংশও কোনো সময়ে স্ববিরোধিতার অভিশাপমুক্ত নয়, আর তাই মানুষের বিবেক ও বিচারবুদ্ধির উর্ধ্বে ঘড়ির কাঁটার কোনো মহত্তর মর্যাদা নেই। হাস্যকর এই বিভ্রম যে, একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণারূপে গৃহীত এমনকি প্রচারিত হতে পারে, তাই বিস্ময়কর। সন্দেহ নেই যে, বহুর অজ্ঞতা এবং সীমিতবুদ্ধির উচ্চাভিলাষ এই ধরণের অস্পষ্ট ভাব-কুয়াশাকে জনপ্রিয় করে তোলে। আরো সহজ কারণ এই যে, যা রাসেল্ উল্লেখ করেছেন তাঁর *Unpopular Essays* গ্রন্থে ON BEING MODERN MINDED শীর্ষক প্রবন্ধে।

এই কাল-গড্ডালিকা স্রোতে অঙ্গ-ভাসানো লোকপ্রিয় কর্ম, কারণ এতে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজনীয়তা তথা দায়িত্ব পরিত্যক্ত হয়। আমরা যে কোনো ভাবেই হোক এবং প্রায় অক্লেশে, অনায়াসে আরামে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর হয়ে আছি এই অনুভব, নিষ্ক্রিয় বিলাসীচিত্তের পথে কী সুখদ, কী আত্ম-সন্তোষ সংবাহী!

তাই সাহিত্যে নতুন কোনো ভাবাদর্শ বা কৃতিগত আন্দোলনকে বিচার করতে হলে তার কালগত উৎপত্তির সংবাদ বিস্মৃত না হয়েও অধিকতর মূল্য দেওয়া উচিত তার অন্তর্নিহিত নৈতিক প্রেরণা বা জীবনগত প্রয়োজন বোধের উপর। গভীর কোনো প্রয়োজনবোধ থেকে যদি নতুন কোনো আন্দোলনের উদ্ভব হয়, যদি তা জীবনসত্যকে অঙ্গীকার করে, তবে, সমাজজীবনের পরিবর্তনের স্রোতে বর্তমান প্রয়োজন একদিন অতীতের সামগ্রী হয়ে গেলেও জীবনসত্যের প্রসাদে, জীবনঘনিষ্ঠতার গুণে সেই সাহিত্যকৃতি প্রাণময় থেকে যাবে। চেখভ যে সমাজের ছবি এঁকে গেছেন সেই সমাজ আজ কোথায়? তবু তাঁর চরিত্র-চিত্রশালা জীবন্ত, সম্পূর্ণ প্রাণময়। আর এইখানেই সাময়িকের সঙ্গে শাশ্বতের নাড়ির যোগ। সময়ের

কোনো একটি বিন্দুতেও যা মানুষের সত্যকে প্রকাশ করেছিল, স্পর্শ করেছিল, সেই কৃতি, সেই সত্যের আপন শক্তিতেই, মানবিকতার প্রসাদে সময়কে উত্তীর্ণ হতে পারে। তা হলে, জীবনবিচ্ছিন্ন, কোনো কল্পিত শাশ্বতের অস্পষ্ট ভাসাভাসা ধারণা সামনে রেখে, কোনো তীব্র অনুভূত তাগিদের সম্পর্কবর্জিত যে কৃতি, তার একাল ওকাল কোনো কালই থাকে না। শাশ্বতকাল কোনো বিশেষ কালনিরপেক্ষ নয়, তা সমগ্র কালপ্রবাহের কল্পিত সমাহার মাত্র। আর তা অদৃষ্ট, বাস্তবে অপ্রাপ্য, ধারণায় অসম্পূর্ণ, মানুষের জীবনে, জীবনবোধে একমাত্র জীবন প্রবাহই শাশ্বত। সময়ের একটি অস্থির বিন্দুতেও যে জীবনের অনুভূত কোনো সত্যকে সাহিত্যে স্পর্শ ও প্রকাশ করেছে সেই শাশ্বত সাহিত্যের নাগাল পেয়েছে। মৃত্যুর পথেই মৃত্যুকে উত্তরণ করা যায়, মৃত্যুকে এড়াতে চাইলেই মৃত্যু নিশ্চিত। সময়ের কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে, আপন জীবনের আয়তনে স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার ভূমিতে, আমরা জীবনসত্যকে যতটুকু জেনেছি, যতটা গভীরভাবে জেনেছি এবং যতটা প্রকাশ করতে পেরেছি শক্তি ও আন্তরিকতার সঙ্গে, ততটুকুই শুধু আমরা এগিয়েছি শাশ্বত কৃতির দিকে। আপন অভিজ্ঞতায় অর্জিত জীবনের দিকে মুখ ফিরিয়ে, শ্রুত ধারণার সীমাস্বর্গে শাশ্বতের কল্পিত মূর্তি ধ্যান করলে আর যাই হোক শাশ্বতকে পাওয়া যাবে না, এমনকি, সাময়িকতারও প্রসাদবঞ্চিত হতে হবে। অংশকে সমগ্রভাবে গোচর করলে, সমগ্র অগোচরে থাকে না। সত্য ও সৃষ্টির paradox এইখানেই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির মূলপাঠ ও তোলাপাঠ

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

১

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির সম্পাদনা সম্পর্কে বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন,[১] "যে পাঠক মূল পুঁথি বা উহার আলোকচিত্রানুলিপি দেখিবার সুযোগ পাইবেন না তিনিও মূল পুঁথির পাঠ সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারিবেন।" এ মন্তব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম সংস্করণ সম্বন্ধে আংশিক সত্য। প্রথম সংস্করণের শেষে 'পাঠ-বিবৃতি' নামে ছোট একটি পরিশিষ্টে সম্পাদক পুঁথি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য বিবৃত করেছেন— লিপিকরের ভুল, তোলাপাঠের সংশোধন, মুদ্রিত সংস্কৃত শ্লোকের পুঁথিতে প্রাপ্ত অশুদ্ধ মূলপাঠ ইত্যাদি। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে এই তথ্যগুলির সামান্য অংশই পাদটীকায় পাওয়া যায়। সংস্কৃত শ্লোকগুলির সংশোধিত পাঠই পরবর্তী সংস্করণগুলিতে মুদ্রিত হয়েছে, মূল পুঁথির পাঠ পরিত্যক্ত হয়েছে। সুতরাং মূলে কি ছিল তা জানবার উপায় নেই, এমনকি অধিকাংশ সংস্কৃত শ্লোক যে মূলে অশুদ্ধ সে সংবাদও পাওয়া যায় না। পুঁথির বিরাম-চিহ্নগুলি মুদ্রিত সংস্করণে সম্পাদকের নিজের রীতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছে ; লিপিকরেরও একটা রীতি ছিল, সেটা কী রীতি মুদ্রিত সংস্করণ থেকে তা জানা যায় না। পুঁথির বহু বানানও মুদ্রিত সংস্করণে পরিবর্তিত অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে, মূলে কি বানান ছিল সবক্ষেত্রে জানান হয় নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রেফ-যুক্ত ব্যঞ্জন পুঁথিতে প্রায়ই দ্বিত্ব হয়, কিন্তু সর্বদাই দ্বিত্ব হয় না ; যথা— পূর্ব্বে ৪।১।২, নির্ম্মিত ৫।১।২, নির্জরান ৩।১।২, আর্জুন ৪।২।৬ ইত্যাদি। মুদ্রিত সংস্করণে কিন্তু রেফ-যুক্ত ব্যঞ্জন সর্বত্রই দ্বিত্ব। পুঁথির মূলপাঠে যে কাটাকুটি এবং তোলাপাঠে যে সংশোধনগুলি করা হয়েছে তার নিখুঁত বিবরণ পরবর্তী সংস্করণগুলিতে পাওয়া যায় না। পুঁথি সম্বন্ধে এবং লিপিকরের প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পুঁথি-সম্পাদকের দায়িত্ব নয় এবং সেজন্য সম্পাদককে অভিযুক্ত করাও অনুচিত। তবে এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির লিপি, লিপিকর, বানান, তোলাপাঠের সংশোধন, মূলপাঠের কাটাকুটি এবং মূলপাঠ অর্থাৎ পুঁথি সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য মুদ্রিত সংস্করণগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, পুঁথির যে বিবরণ পরবর্তী মুদ্রিত সংস্করণগুলিতে দেওয়া হয়েছে তা অপর্যাপ্ত ও অসম্পূর্ণ। মূল পুঁথির বিবরণ সম্পূর্ণ নয় বলে দু-একটি ক্ষেত্রে পাঠ বিচারে কিছু গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। একটি উদাহরণ দিলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চতুর্থ সংস্করণে দানখণ্ডের 'আন ডাক দিআঁ বড়ায়ি' পদটির প্রথম চারটি লাইন এই—

> আন ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো।
> কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো॥
> শ্রীফল যোড় বড়ায়ি মোর দুই তন।
> যা দেখিআঁ কাহ্নাঞি করন্তি যতন॥

তৃতীয় লাইনটির 'শ্রীফল যোড়'র পরে পাদটীকায় সম্পাদকের মন্তব্যে বলা হয়েছে, "পুঁথিতে কানড়ী

খোঁপা"। এতে জানা গেল, পুঁথিতে লাইনটির পাঠ ছিল 'কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মোর তুঙ্গ তন'। এই পাঠ সম্পাদকের বিবেচনায় ভুল, তাই 'কানড়ী খোঁপা'র পরিবর্তে 'শ্রীফল যোড়' বসিয়ে তিনি পাঠ সংশোধন করেছেন। বিজনবাবু সম্পাদকের সংশোধন সঙ্গত মনে করেছেন এবং লিপিকর কেন ভুল লিখেছিলেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নিঃসংশয়ে বলেছেন, "স্পষ্টই দেখা যাইতেছে দ্বিতীয় ছত্রে যে 'কানড়ী খোঁপা' লেখা হয়েছিল তাহারই স্মৃতি-প্রভাবে অস্থানে উহা দ্বিতীয়বার লিখিত হইয়াছে। লিপিকর পরেও তাহা সংশোধন করেন নাই।" (দ্রঃ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা', পৃ. ৩৮)। আসলে ব্যাপারটি ঠিক এত স্পষ্ট নয়। এখানে পুঁথিতে কি ঘটেছে সম্পাদক তার পূর্ণ বিবরণ পাদটীকায় দেন নি, বিজনবাবুও পুঁথির সাহায্যে সম্পাদকের অসম্পূর্ণ বিবরণ পূর্ণ করেন নি। পুঁথিতে ছিল—

আন ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো।
কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো॥
কা-ড়-ড়ি খোঁপা বড়ায়ি মোর তুঙ্গ তন।
যা দেখিআঁ কাহ্নাঞি করন্তি যতন॥

তোলাপাঠে 'মো'-র উপরে দুই-দাঁড়ির বিরাম-চিহ্ন বসান হয়েছে এবং 'কা-ড়-ড়ি'-র 'ড়' অক্ষরটির উপর 'ন' লেখা হয়েছে। এই সংশোধনের ফলে মূলপাঠের 'কা-ড়-ড়ি' বা 'কা-উ-ড়ি' বা 'কা-ড-রি' (লিপিতে ড়-উ-ড অভিন্ন) 'কা-ন-ড়ি' হয়েছে। আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। মূলপাঠের সংশোধন করা হয়েছে বটে কিন্তু 'কা-ড়-ড়ি'র 'ড়' অক্ষরটি কাটা হয় নি। এবং তোলাপাঠের 'ন' অক্ষরটির পাশে কোনো সংখ্যা-শব্দ দিয়ে বলা হয় নি 'ন' অক্ষরটি কোন্ ছত্রের কোন্ অশুদ্ধ অক্ষরের সংশোধন। পুঁথির এই পাতায় অপর সংশোধন দুই-দাঁড়ির বিরাম-চিহ্নের পাশেও কোনো সংখ্যা-শব্দ নেই। সুতরাং মনে করা যেতে পারে অশুদ্ধ অক্ষরের একেবারে মাথার উপরে সংশোধনটি লেখা হয়েছে বলে পাশে ছত্র-সংখ্যা লেখার প্রয়োজন হয় নি ; এরকম দৃষ্টান্ত শুধু এই একটিই নয়, পুঁথির আরও কয়েক জায়গায় আছে। এখন প্রশ্ন, 'কা-ড়-ড়ি'কে 'কা-ন-ড়ি' করল কে ? নিঃসংশয় হয়ে বলা না গেলেও অনুমান করা যায় সংশোধনটি লিপিকরের স্বহস্তকৃত নয়। তোলাপাঠের 'ন' এবং মূলপাঠের 'ন' অক্ষর দুটির মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য আছে। সংশোধন লিপিকর স্বয়ং করুন বা অপর কোনো সংশোধকই করুন বর্তমান প্রসঙ্গে সেটা গুরুতর প্রশ্ন নয়। এ ক্ষেত্রে সংশোধন যে হয়েছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে প্রশ্ন— যিনি 'কা-ড়-ড়ি'কে অশুদ্ধ মনে করে 'কা-ন-ড়ি' করলেন তাঁর দৃষ্টি কি এতই অসতর্ক যে, যে-বাক্যাংশের একটি শব্দ তিনি সংশোধন করলেন সেই বাক্যাংশটাই যে ভুল তা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল ? এটুকুও তিনি বুঝতে পারলেন না যে ভুলপাঠের সংশোধন করে তিনি পণ্ডশ্রম করছেন ! সংশোধক শব্দ ধরে ধরে গানগুলি পড়েছেন এবং অর্থের অসঙ্গতি লক্ষ্য করলে অবিলম্বে তা দূর করেছেন। এ ক্ষেত্রে 'কা-ন-ড়ি খোঁপা' দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ছত্রে পর পর লেখা হয়েছে। যদি ভুল করে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সাধারণ এবং সুস্পষ্ট ভুলটি সংশোধকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে এ অনুমান কি বিশ্বাসযোগ্য ? পুঁথিতে সংশোধকের সংশোধনের পরও অনেকগুলি সাধারণ ভুল ছিল, সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় সেগুলি সংশোধন করেছেন। কিন্তু যে লাইনগুলি একবার সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলিতে সংশোধনের পর নূতন অতিরিক্ত কোনো ভুল ধরা পড়ে নি। এই ছত্রটিতেও কারো দৃষ্টি না পড়লে বলা যেত ভুলটি লিপিকর এবং পাঠ-পরীক্ষক উভয়ের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু স্পষ্টই দেখা

যাচ্ছে ছত্রটির উপর সংশোধকের সন্ধানী দৃষ্টি পড়েছে এবং যে ভুল ছিল তা তিনি সংশোধনও করে দিয়েছেন। তথাপি কি আমরা বিশ্বাস করতে পারি না 'কা-ন-ড়ি খোঁপা' পাঠে সংশোধকের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না? এ পাঠ তিনি সঙ্গত এবং যথার্থ মনে করেছিলেন। লিপিকর যে পাঠ নির্ভুল মনে করে লিখেছেন, সংশোধক যে পাঠ অনুমোদন করেছেন সেই মূলপাঠ বিশেষ প্রবল কোনো যুক্তি না থাকলে পরিবর্তন করা অসঙ্গত। এখানে প্রবল বা দুর্বল কোনো যুক্তিই নেই। পাঠ-পরিবর্তনের সপক্ষে যাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁরা ধরেই নিয়েছেন 'কানড়ি খোঁপা বড়ায়ি মোর দুঈ তন' এখানে 'কানড়ি খোঁপা' 'তন'-এর বিশেষণ। 'তন' কি রকম দেখতে? 'কানড়ি খোঁপা'র মত। 'কানড়ি খোঁপা'র মতো 'তন' সত্যই অসঙ্গত। সুতরাং লিপিকর অবশ্যই ভুল করে দুবার 'কানড়ি খোঁপা' লিখেছেন— এই অনুমান অপরিহার্য। কিন্তু 'কানড়ি খোঁপা'কে 'তন'এর বিশেষণ বা বর্ণনা বলে ধরব কেন? 'কানড়ি খোঁপা' [এবং।ও।আর] 'দুঈ তন' এই দুটি বস্তু দেখে কৃষ্ণ 'করন্তি যতন' এ অর্থ কি অসঙ্গত? আধুনিক বাংলায় লিখলে কবি 'কানড়ি খোঁপা'র পর কমা দিতেন অথবা এবং। আর। ও এই তিনটি সংযোজক শব্দের একটি বসিয়ে অর্থ স্পষ্ট করতেন। এখানে এইটিই যে কবির অভিপ্রেত অর্থ তা স্পষ্ট বোঝা যায় ঐ পদেরই ৭ম ৮ম ছত্র দুটি থেকে:

আলকে তিলক বড়ায়ি কাজল নয়নে।
এহা দেখি বেআকুল নান্দের নন্দনে॥

এখানে 'আলকে তিলক' কি 'কাজল নয়নে'র বিশেষণ? 'কানড়ি খোঁপা বড়ায়ি মোর দুঈ তনে' এই লাইনটির সঙ্গে 'আলকে তিলক বড়ায়ি কাজল নয়নে' লাইনটির কোনো পার্থক্য আছে কি? এখানে কি অর্থ ধরছি? 'আলকে তিলক' এবং নয়নে কাজল'—'এই দুটি জিনিস দেখে ('এহা দেখি') নান্দের নন্দন 'বেআকুল'। অনুরূপ অর্থ তৃতীয়-চতুর্থ ছত্রটি সম্বন্ধেও করতে হবে নতুবা কবির অভিপ্রেত অর্থ পাওয়া যাবে না— 'কানড়ি খোঁপা' এবং আমার তন দুটি আমার বৈরী হয়েছে কারণ এই দুটি দেখে কৃষ্ণ 'করন্তি যতন'।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম সংস্করণে বসন্তরঞ্জন রায় পুঁথির পাঠই ছাপিয়েছিলেন (দ্রঃ পৃ. ৮৮) এবং পাঠ-বিবৃতিতে বলে দিয়েছিলেন পুঁথির 'কা-ড়-ড়ি' কেটে তোলাপাঠে 'ন' লেখা হয়েছে (দ্রঃ পৃ. ৮০৬)। বসন্তরঞ্জন রায়ের মনে 'কা-ন-ড়ি খোঁপা বড়ায়ি মোর দুঈ তনে' পাঠ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ অন্তত প্রথম সংস্করণ প্রস্তুতকালে ছিল না। সম্ভবত যে যুক্তিতে আমি পুঁথির পাঠ সমর্থন করেছি সেই যুক্তিতে বসন্তবাবুও পুঁথির পাঠ নির্ভুল মনে করে ছাপিয়েছিলেন। মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সর্বপ্রথম পুঁথির পাঠে সন্দেহ প্রকাশ করেন।[২] পুঁথির সংশোধনের কথা না জেনে কিংবা জেনেও গুরুত্ব না দিয়ে শহীদুল্লাহ্ অসতর্কের মতো বলেছিলেন, "দ্বিতীয় পংক্তিতে প্রথম পংক্তির 'কানড়ি খোঁপা' লিপিকর-প্রমাদে পুনর্লিখিত হইয়াছে। বোধহয় 'শ্রীফল সম' এইরূপ পাঁচ অক্ষরযুক্ত কোন পাঠ ছিল।" (দ্রঃ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি পাঠ বিচার,' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৮ ভাগ, ৪ সংখ্যা, পৃ. ২০৩)। পরবর্তী সংস্করণে শহীদুল্লাহ্-র নির্দেশ মেনে নিয়ে বসন্তবাবু 'কানড়ি খোঁপা'র পরিবর্তে 'শ্রীফল যোড়' বসিয়েছেন এবং প্রথম সংস্করণের পাঠ-বিবৃতিতে পুঁথির এই জায়গার সংশোধনের যে বিবরণ দিয়েছিলেন তাও বর্জন করেছেন। বিজনবাবু সম্ভবত পরবর্তী সংস্করণের মুদ্রিত পাঠ দেখে তৃতীয় ছত্রের 'কানড়ি খোঁপা' যে লিপিকর-প্রমাদ সে সম্বন্ধে

নিঃসংশয় হয়েছেন। প্রথম সংস্করণের মুদ্রিত পাঠ অথবা পাঠ-বিবৃতি অথবা মূল পুঁথি দেখলে বিজনবাবু 'কানড়ি খোঁপা'কে লিপিকর-প্রমাদ মনে করতেন কি না সন্দেহ। যে যুক্তিতে আমি সম্পাদকের পাঠ-পরিবর্তনে আপত্তি করছি ঠিক সেই যুক্তিতে বিজনবাবু নিজেও সম্পাদকের অপর একটি সংশোধনের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন— "তোলাপাঠ যখন দেওয়া হইয়াছে তখনই বোঝা গেল যে ছত্রটির উপর লিপিকরের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তোলাপাঠ যদি লিপিকরের হস্তকৃত না হয় তাহা হইলেও এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে আলোচ্য ছত্রটি কেহ না কেহ বিচারকের দৃষ্টি দিয়া পড়িয়াছেন, হয়তো আদর্শ পুঁথির পাঠের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়াছেন। এ অবস্থায় কেবলমাত্র ছন্দের উৎকর্ষ বিধানের জন্য সংশোধন অনাবশ্যক বোধ করি।" ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা,' পৃ. ৪১)।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরবর্তী সংস্করণগুলির মুদ্রিত পাঠে পুঁথির পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। মুদ্রিত পাঠের সঙ্গে পুঁথির পাঠ মিলিয়ে পড়লে ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য পাওয়া যায়। পাঠ-বিচারে এবং লিপিকরের ও সংশোধকের প্রকৃতি অনুধাবনে এই ক্ষুদ্র এবং আপাততুচ্ছ তথ্যগুলি একেবারে মূল্যহীন নয়।

২

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তোলাপাঠে মূলপাঠের সংশোধন। এই সংশোধনগুলি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন। সংশোধনগুলি কে করেছেন? লিপিকর স্বয়ং অথবা অন্য কেউ? অন্য কেউ করলে তিনি কি লিপিকরের সমকালীন অথবা পরবর্তীকালের? সংশোধনগুলি আদর্শ পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে করা হয়েছে অথবা সংশোধক তাঁর নিজের বুদ্ধি-বিবেচনানুসারে সংশোধন করেছেন? শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাঠ-বিচারে এই প্রশ্নগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে। সম্পাদক এই প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে নিরুত্তর। তোলাপাঠ সম্বন্ধে তিনি কোনো অভিমত প্রকাশ করেন নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিষয় একসময় সকলের চোখ এমন ধাঁধিয়ে দিয়েছিল যে এই ক্ষুদ্র বিষয়গুলির দিকে মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ কারও ছিল না। তোলাপাঠের সংশোধন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা' নামক প্রবন্ধে। বিজনবাবু খুব সতর্কতার সঙ্গে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত দৃষ্টি দিয়ে অনেকগুলি বিষয় আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর কয়েকটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। তোলাপাঠের সংশোধনের কোনোপ্রকার আলোচনায় এই সিদ্ধান্তগুলি বিশেষ মূল্যবান। তাই বিজনবাবুর সিদ্ধান্তের সমালোচনা দিয়েই শুরু করছি। সমালোচনা প্রসঙ্গে এমন কয়েকটি বিষয় উত্থাপিত হবে যেগুলি পরবর্তী আলোচনার পক্ষে প্রয়োজনীয়।

তোলাপাঠের কোনো কোনো সংশোধন যে লিপিকরের স্বহস্তকৃত নয়, পরবর্তীকালের কোনো সংশোধকের, সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়ে বিজনবাবু বলেছেন, "আমাদের মনে হয়, আদর্শ পুঁথিতে 'তোর' ছিল না এবং লিপিকর নিজে এই 'তোর' বসান নাই। পরবর্তীকালের অন্য কোন লোক পুঁথি পড়িতে পড়িতে নিজ জ্ঞান এবং অভিরুচি অনুসারে দুই একটি সংশোধন করিয়া থাকিবেন।... তাহার একটি প্রমাণও দাখিল করিতেছি। তোলাপাঠে 'তোর' শব্দের পাশে ছত্রসংখ্যা-জ্ঞাপক একটি '৩' অঙ্ক আছে। পুঁথির মূলপাঠে তিন সংখ্যাসূচক অঙ্ক সর্বদাই 'ও' রূপে লিখিত।... কিন্তু তোলাপাঠে তিন প্রায় সর্বত্রই আধুনিক '৩'।"

এখানে বিজনবাবু যে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন তা সম্ভবত সত্য। কিন্তু যে প্রমাণ দাখিল করেছেন তা অগ্রাহ্য। এই প্রমাণ প্রথম দাখিল করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি বলেছিলেন, "৩" এই সংখ্যা স্থানে "ঙ" লেখা ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরে আর দেখা যায় নি এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিতে "সকল জায়গাতেই" "৩" সংখ্যার স্থানে "ঙ" আছে। সুতরাং এই পুঁথি ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে বা তার আগে লেখা হয়েছে (দ্র. 'চণ্ডীদাস', হরপ্রসাদ রচনাবলী ১ম সম্ভার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ২৯২)। আর. ডি. বন্দ্য-কে [রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়] সমালোচনা করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন, রাখালদাসবাবু "সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে কৃষ্ণকীর্তনের অক্ষরগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু অঙ্কগুলি পরীক্ষা করেন নাই।" বস্তুত অঙ্কগুলি কেউই পরীক্ষা করেন নি; রাখালদাসবাবু হয়তো করেন নি, শাস্ত্রী নিজেও করেন নি, বিজনবাবুও করেন নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূলপাঠে "সর্বদাই" তিন সংখ্যাটি "ঙ" রূপে লিখিত নয়। তোলাপাঠেও "৩" এবং "ঙ" আছে, মূলপাঠেও "৩" এবং "ঙ" আছে। একটি দুটি জায়গায় প্রক্ষিপ্তরূপে নেই, একাধিক জায়গায় আছে। কোনো একজন লিপিকরের লিপিতে নেই, প্রথম দ্বিতীয় এবং তথাকথিত তৃতীয় লিপিকরের লিপিতেও আছে। তোলাপাঠে কোথায় "৩" এবং "ঙ" আছে এবং মূলপাঠে কোথায় "৩" আছে তার তালিকা নিচে দেওয়া হল। পৃষ্ঠা সংখ্যা পুঁথির।

১২/১ : তোলাপাঠে 'ঙ'; ১৩/১ : মূলপাঠে (দুই-দাঁড়ির বিরাম-চিহ্নের উপর) '৩';
২৮/২ : তোলাপাঠে '৩'; ২৯/২ : মূলপাঠে '৩'; ৩০/২ : তোলাপাঠে '৩';
৪০/১ : তোলাপাঠে '৩'; ৪৪/২ : মূলপাঠে (দুই দাঁড়ির বিরাম-চিহ্নের উপর) '৩';
৪৭/২ : মূলপাঠে '৩'; ৪৮/১ : মূলপাঠে '৩'; ৪৯/২ : তোলাপাঠে '৩'; ৫০/২ : মূলপাঠে '৩';
৫০/২ : তোলাপাঠে '৩'; ৫৩/১ : মূলপাঠে '৩' (লক্ষণীয় পুঁথির পৃষ্ঠা সংখ্যায় 'ঙ'); ৫৪/২ : মূলপাঠে '৩';
৬৩/১ : মূলপাঠে '৩'; ৬৪/১ : মূলপাঠ '৩'; ৬৬/২ : মূলপাঠে '৩'; ৮৩/২ : তোলাপাঠে '৩';
১০২/২ : তোলাপাঠে '৩'; ১১২/২ : তোলাপাঠে '৩'; ১১৭/২ : তোলাপাঠে '৩';
১২৪/১ : মূলপাঠে '৩';
১৩৮/১ : মূলপাঠে '৩' (এই সংখ্যা-শব্দটি লিপিকর লিখতে ভুলে গিয়েছিলেন। পরে সংকীর্ণ জায়গায় ছোটো করে লিখে দিয়েছেন); ১৬৯/১ : তোলাপাঠে '৩'; ২০৮/২ : তোলাপাঠে 'ঙ'।

এগুলি সবই প্রথম ও তথাকথিত তৃতীয় লিপিকরের নকল করা অংশ থেকে নেওয়া। এ ছাড়া, দ্বিতীয় লিপিকরের নকল করা মূলপাঠে সর্বত্রই "৩" সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়েছে, তিনি একটিবারও "ঙ" ব্যবহার করেন নি। সুতরাং দ্বিতীয় লিপিকর "ঙ"-র ব্যবহার জানতেন এমন প্রমাণ নেই। তাহলে কি করে বলা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিতে সর্বদাই "ঙ" লেখা হয়েছে? এখন প্রাচীন-আধুনিকের প্রশ্ন। "ঙ" প্রাচীন এবং "৩" আধুনিক—এটি শাস্ত্রীর সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য তা আমি জানি না। ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের আগে লেখা বাংলাদেশের পুঁথি (নেপালের পুঁথির সাক্ষ্য গ্রাহ্য কিনা তা বিবেচ্য) আমি বেশি দেখি নি, দেখলেও সংখ্যা-শব্দগুলি খুঁটিয়ে দেখি নি। শাস্ত্রী অবশ্যই দেখেছেন। সুতরাং যুক্তিতে না আটকালে শাস্ত্রীর অভিমত মেনে নিতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে শাস্ত্রীর অভিমত অপ্রমাণিত। শাস্ত্রী তাঁর অভিমতের

সমর্থনে কোনো প্রমাণ দেন নি, কোনো একখানি পুঁথিরও নাম করেন নি। এ অবস্থায় শাস্ত্রীর মুখের কথাই একমাত্র প্রমাণ। সে প্রমাণ সর্বজনগ্রাহ্য না হতে পারে। শাস্ত্রীর সব অভিমত যে অভ্রান্ত নয় তার প্রমাণ একটু আগেই পাওয়া গেছে। তা ছাড়া, "৩" সংখ্যাশব্দকে যদি আধুনিকত্বের নিরিখ মনে করা হয় তাহলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেকগুলি পাতা এবং দ্বিতীয় লিপিকরের নকল করা সব কটি পাতা পরবর্তীকালের যোজনা বলতে হয়। তা যে সম্ভব নয় সে কথা বিশদ করে আলোচনার প্রয়োজন নেই (দ্র. যোগেশচন্দ্র রায়, 'চণ্ডীদাস', সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ২৪খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২৩; সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ১৯৬৩, পৃ. ১৩৪)। সুতরাং "ও"-র প্রাচীনত্ব স্বীকার করলেও বলতে হয় যে-কালে "ও" ছিল সে-কালে "৩"-ও ছিল এবং যিনি "ও" লিখেছিলেন তিনি "৩"-ও লিখেছিলেন। তাই কেবলমাত্র "ও"-র প্রমাণে তোলাপাঠের সংশোধনকে আধুনিক বলা যায় না।[৩]

তোলাপাঠের কোন্ সংশোধন লিপিকরের নিজের, কোন্‌টি নিজের নয়, এ সম্বন্ধে বিজনবাবুর যুক্তি এবং সিদ্ধান্ত সব ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। দানখণ্ডের—

ঘৃত দধি দুধেঁ পসার সাজিআঁ
মথুরাক যাসি বিকে।

এই লাইনটির পরে সম্পাদক পাদটীকায় মন্তব্য করেছেন, "'যাসি' তোলাপাঠে; ইহার পর 'যাহা রঙ্গে' লেখা ও কাটা।" এই লাইন দুটির পাঠ ও তোলাপাঠের আলোচনা প্রসঙ্গে বিজনবাবু মন্তব্য করেছেন, মূলে ছিল 'মথুরাক যাহা রঙ্গে'; লিপিকর 'যাহা রঙ্গে' কেটে তারপর 'বিকে' লিখেছেন এবং 'যাহা'র 'যাসি' লিখেছেন তোলাপাঠে। এ বিবরণ ঠিক নয়। পুঁথিতে ঠিক এরকম ঘটে নি। আশঙ্কা হয় এই লাইনটিও বিজনবাবু পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন নি; সম্পাদকের মন্তব্যের উপর নির্ভর করেছেন। সম্পাদকের মন্তব্যে ভুল নেই, তবে মন্তব্যটি অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক। "ইহার পর 'যাহা রঙ্গে' লেখা ও কাটা"— "ইহার পর" অর্থে কার পর? অবশ্যই 'বিকে'র পর, বিজনবাবু বুঝেছেন 'মথুরাক'এর পর। তাই তিনি অনুমান করেছেন মূলে আছে 'মথুরাক যাহা রঙ্গে'। কিন্তু মূলে আছে 'মথুরাক বিকে যাহা রঙ্গে'; 'মথুরাক'-এর পরে ছাড়-চিহ্ন দিয়ে তোলাপাঠে 'যাসি' লেখা হয়েছে এবং 'যাহা রঙ্গে' কেটে দেওয়া হয়েছে। পুঁথির এই জায়গার ঘটনা বিজনবাবুর সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি বলে তিনি এই সংশোধন থেকে যে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন তা হয়তো ঠিক নয়— "পরের ছত্র লিখিবার আগেই যে ভুলটা লিপিকরের নজরে পড়িয়াছে তা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কারণ লিপিকর 'যাহা রঙ্গে' কাটিয়া তাহার পর 'বিকে' লিখিয়াছেন।" লিপিকর প্রকৃতই যদি তা করতেন তা হলে এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করতে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু আগেই বলেছি লিপিকার তা করেন নি। সুতরাং ভুলটি সঙ্গে সঙ্গেই লিপিকরের নজরে আসে নি। আদৌ যে এসেছিল এমন প্রমাণ নেই। তাই তোলাপাঠের সংশোধন লিপিকরের স্বহস্তকৃত এমন মনে করবার কারণ নেই। এখানে বিজনবাবু একটি বিরুদ্ধ উক্তিও করেছেন। অন্যত্র তোলাপাঠের সংশোধনের পাশে "৩" সংখ্যাটি থাকলেই তিনি সেটিকে পরবর্তীকালের বলে মনে করেছেন। "৩" সংখ্যা-শব্দটি বিজনবাবুর কাছে আধুনিকত্বের এবং "ও" প্রাচীনত্বের চিহ্ন। আলোচ্য লাইনটিতে তোলাপাঠের 'যাসি'র পাশে "৩" সংখ্যাটি আছে তথাপি এই সংশোধনটিকে তিনি লিপিকরের হাতের বলে মনে করেছেন। আমার মনে হয়, লিপিকর 'মথুরাক বিকে যাহা রঙ্গে' লিখেছিলেন। ভুল লিখেছিলেন কি

নির্ভুল লিখেছিলেন বলা শক্ত। পরে সংশোধন করবার সময় 'রঙ্গে'র সঙ্গে 'বিকে'র মিল পাঠ-পরীক্ষকের পছন্দ না হওয়ায় তিনি সংশোধনটি করেছেন। সংশোধনটি লিপিকরকৃত নয়। তোলাপাঠের 'যাসি' ভিন্ন কলমে লেখা। অক্ষরের ছাঁদও আলাদা। সম্ভবত কালিও আলাদা।

৩

চারটি[৪] ছাড়া তোলাপাঠের সমস্ত সংশোধন বসন্তবাবু মেনে নিয়েছেন এবং সেই অনুসারে মূলপাঠের সংশোধনও করেছেন। তোলাপাঠের গুরুত্ব সম্বন্ধে বসন্তবাবু কোনো অভিমতও ব্যক্ত করেন নি। তোলাপাঠ মূল পুঁথিতেই পাওয়া গেছে সুতরাং তার গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বোধহয় বসন্তবাবুর মনে সংশয় ছিল না। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি এ সম্বন্ধে আলোচনা বাহুল্য মনে করেছিলেন। কিন্তু মূল পুঁথিতে পাওয়া গেছে বলে তোলাপাঠের সমস্ত সংশোধনই কি নির্বিচারে মেনে নেওয়া সঙ্গত? সম্পাদকের অবলম্বিত রীতিতে দেখতে পাচ্ছি সব সংশোধনকে তিনি নির্বিচারে স্বীকার করেন নি। বিচারে যেটি গ্রহণযোগ্য বলে তাঁর মনে হয়েছে সেটি তিনি গ্রহণ করেছেন। সব সংশোধনকে নির্বিচারে গ্রহণ করতে পারলে সমস্যাই থাকত না। তাহলে সরাসরি বলা যেত মূলপাঠ তোলাপাঠে সংশোধিত হলে মূলপাঠটি ভুল এবং তোলাপাঠের সংশোধনটি নির্ভুল বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু সম্পাদক তা করেন নি; তিনি নির্বাচন করেছেন। নির্বাচন করতে গেলে যুক্তি দিয়ে নির্বাচনের যাথার্থ্য প্রমাণ করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কোন্ যুক্তিতে তোলাপাঠের চারটি সংশোধন বসন্তবাবু অসঙ্গত বিবেচনায় ত্যাগ করেছেন তা তিনি জানান নি। বসন্তবাবুর বিবেচনায় চারটি সংশোধন পরিত্যক্ত হয়েছে, অপর সম্পাদকের বিচারে দশটি পরিত্যক্ত হতে পারে। তাই গ্রহণ-বর্জনের আগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির মূলপাঠ ও তোলাপাঠের গুরুত্বের মাত্রা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন।

তোলাপাঠের সংশোধনের গুরুত্ব নির্ভর করছে দুটি বিষয়ের উপর—এক, সংশোধনগুলি লিপিকরকৃত কিনা; দুই, সংশোধনগুলি আদর্শ পুঁথি বা অপর কোনো পুঁথির সাহায্যে করা হয়েছে কিনা। বলা বাহুল্য, প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয় বিষয়টির গুরুত্ব বেশি। প্রথম বিষয়টি আগে বিবেচনা করে দেখা যাক।

আগেই বলা হয়েছে, বিজনবাবু যে বিচারে অনেকগুলি তোলাপাঠের সংশোধনকে লিপিকরকৃত নয় বলে অনুমান করেছেন সে বিচার নির্ভুল নয়। সুতরাং অন্য পদ্ধতিতে বিচার হওয়া প্রয়োজন। আর একটিমাত্র পদ্ধতিতে বিচার হতে পারে—হস্তাক্ষর বিচার। সে বিচারে বাধা আছে। মূলপাঠের লিপি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করা না হলে সংশোধনের হস্তাক্ষর বিচার অসম্ভব। মূলপাঠের লিপির সঙ্গে তুলনা করে বুঝতে হবে সংশোধনের হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র কিনা। মূলপাঠের লিপি এখনও অনালোচিত। তাই তুলনীয় দুটি বিষয়ের একটি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। অন্য বাধাও আছে। সংশোধনগুলি বিক্ষিপ্ত শব্দ বা শব্দাংশ, কোথাও একটিমাত্র অক্ষর। এই পরিমিত উপাদান থেকে যে সিদ্ধান্তেই পৌছান যাক তাতে অনিশ্চয়তা থেকে যায়। বিক্ষিপ্ত নয় বলে মূলপাঠের লিখনভঙ্গীতে লেখকের স্বকীয়তার ছাপ ফুটে উঠবার সুযোগ আছে। খণ্ড খণ্ড সংশোধনের মধ্যে লেখকের বৈশিষ্ট্য ফুটে না উঠতে পারে। মূলপাঠ লেখায় যে যত্ন ও সতর্কতা নেওয়া হয় তোলাপাঠের সংশোধন লিখতে সে যত্ন ও সতর্কতা নাও নেওয়া হতে পারে। এইসব কারণেও সংশোধন ও মূলপাঠ একই লিপিকরকৃত হওয়া সত্ত্বেও স্বতন্ত্র মনে

হওয়া সম্ভব। এই সম্ভাবনার কথা স্মরণ রেখেও বলা যায় তোলাপাঠের সংশোধন অধিকাংশগুলিই লিপিকরকৃত নয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, এ অভিমত অপ্রমাণিত। প্রমাণের উপাদান যে নেই তা নয় তবে লিপিবিচার এ আলোচনার বিষয় নয়। লিপিবিচার না করেও মূলপাঠের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে সাধারণ চোখেও ধরা পড়বে সংশোধনগুলি অন্য হাতের।

তোলাপাঠের সংশোধনে পাঁচজন লোকের হস্তাক্ষর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়া লিপিকরকৃত সংশোধনও আছে, সেগুলি সংখ্যায় খুবই কম। প্রথম লিপিকরের কয়েকটি সংশোধনকে সংশোধন না বলে লাইনচ্যুত মূলপাঠ বলাই সঙ্গত। অর্থাৎ লাইন মার্জিনের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেও বাক্য শেষ হয় নি, লিপিকর লাইনের নীচে মার্জিনের মধ্যে দুটি অক্ষর বসিয়ে বাক্য শেষ করেছেন। এগুলি তোলাপাঠের এলাকায় পড়লেও সংশোধনের এলাকায় পড়ে না।

প্রথম সংশোধকই অধিকাংশ সংশোধনগুলি করেছেন। এই সংশোধকের অক্ষরগুলি আকারে বৃহৎ এবং তাঁর কলমটি মোটা। অক্ষরগুলির গঠন শিথিল। এই শৈথিল্য দ্রুত বা অযত্ন লিখনের জন্য নয়। অক্ষরের গঠন দেখে মনে হয় লেখক ধীরে ধীরে লিখেছেন, যত্ন নিয়ে গুছিয়ে লিখেছেন কিন্তু কলমকে যেন যথেষ্ট আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারেন নি। তাই অক্ষরগুলি বিশৃঙ্খল এবং আঁকা-বাঁকা। সম্ভবত এই সংশোধক বয়সে প্রবীণ ছিলেন এবং তাঁর হাত কাঁপত। এই সংশোধকের হস্তাক্ষরের সঙ্গে প্রথম লিপিকরের খানিকটা সাদৃশ্য আছে (বৈসাদৃশ্যও অনেক আছে)। এই সাদৃশ্য অনুকরণজাত মনে হয় না। বৃদ্ধ বয়সে অন্যের হস্তাক্ষরের অনুকরণ সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় সংশোধকের হস্তাক্ষর স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ। অক্ষরগুলি সুগঠিত এবং বাহুল্যবর্জিত। এই সংশোধকের হস্তাক্ষর মূলপাঠের প্রথম ও দ্বিতীয় লিপিকরের হস্তাক্ষরের সঙ্গে কোনোই সাদৃশ্য নেই।

তৃতীয় সংশোধক অতি সূক্ষ্ম কলমে প্রায় দুর্লক্ষ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে কয়েকটি জায়গায় সংশোধন করেছেন। এঁর হস্তাক্ষরে উল্লেখযোগ্য কোনো বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে নি তবে এঁর সূক্ষ্ম কলম এবং ক্ষুদ্র অক্ষরের জন্য এঁকে অপর সংশোধকদের লিপি থেকে পৃথক করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই সংশোধক এবং চতুর্থ সংশোধক পাঠের সংশোধন ছাড়াও মূলপাঠের অস্পষ্ট দু-একটা অক্ষরও নূতন করে লিখে দিয়েছেন।

চতুর্থ সংশোধকের কয়েকটি অক্ষরের (সবগুলির নয়) সঙ্গে প্রথম লিপিকরের অক্ষরের সাদৃশ্য আছে। পঞ্চম সংশোধকের লেখা জড়ান। অক্ষরের প্রত্যঙ্গগুলি সুগঠিত নয়। টানা এবং দ্রুত লেখার জন্যই এরকম হয়েছে। এই সংশোধকই ৭৪।১ পৃষ্ঠায় লিখেছিলেন 'শ্রীশ্রী৶ করেন তবে তানে বন্দিব' (পাঠ সংশয় রহিত নয়)। এই হাতের সংশোধন বেশি নয়।

এবার কোন্ সংশোধনটি কোন্ সংশোধকের বলে আমার মনে হয় তার একটা তালিকা দেওয়া প্রয়োজন। নীচের তালিকায় প্রথমে সংশোধনটি দেওয়া হয়েছে, পরে মূলপাঠ উদ্ধৃত হয়েছে; সেখানে তোলাপাঠের সংশোধন বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা পুঁথির।

প্রথম সংশোধক

২৮।২ 'তোহ্মার' : পাজী পুথী [তোহ্মার] চিরিবোঁ বাম হাথে॥

২৯।১ 'র' : তোহ্মে কি না চিহ্ন আহ্মে তাহা[র] রাণী॥

২৯।১ 'আঁ' : এহাক জানীআঁ[আঁ] রাধা পুর মোর আশ।
৩৬।১ 'বে' : এভোঁ সুন্দর কাহ্নাঞি না কর [বে]আজ।
৩৮।২ 'ভালে' : পাপের খণ্ডন বুধী আহ্মে [ভালে] জানী॥
৩৯।১ 'বোল', 'ল' : আপণে সুণল [বোল] রাধা [ল] গোআলী ॥
৪০।১ 'তোর' : আতি কঠিন কুচ [তোর] মাঝা খিনী দেহা।
৪৯।১ 'না' : হেন রূপ যৌবনে [না] পাতসি নেহা॥
৪৯।২ 'বড়' : এবেঁ কাহ্নাঞি ভৈল আতি [বড়] দুরুবার।
৫৬।২ 'রা' : তোলাপাঠের সংশোধন অর্থে মূলপাঠের উপরের ও নীচের মার্জিনে লিখিত সংশোধন।

এই পৃষ্ঠায় 'রা' অক্ষরটি পুঁথির ডানদিকের মার্জিনে পত্রসংখ্যার নীচেয় লেখা। সংশোধনটির পাশে কোন সংখ্যাশব্দ নেই। সুতরাং 'রা' অক্ষরটি মূলপাঠের কোথায় বসবে বোঝা যাচ্ছে না। এই পৃষ্ঠায় কোনো ছত্রে একটি 'রা'-র অভাব আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং সংশোধনের সার্থকতা বোঝা যাচ্ছে না। সম্পাদক এই সংশোধনের উল্লেখ করেন নি এবং 'রা'-কে মূলপাঠের কোথাও গ্রহণ করেন নি।

৬৪।২ : 'র' : ঘৃত দধি লআঁ যাহ মথুরা[র] হাট॥
৬৫।১ : 'খরত' : রাজা [খরত]র পাটে আতি দুরুবার ॥[৫]
৮৩।২ : 'কাহ্নাঞি' : এ বোল সুনিআঁ [কাহ্নাঞি] মনের হরিষে॥
৮৩।২ : 'উপর' : না তুলিহ জলের [উপর] ॥[৬]
৮৩।২ : 'তুঞি' : যে কর সে কর [তুঞি] জলের ভিতর॥
৮৩।২ : 'কাহ্নাঞি ল' : তাহার কারণে কৈলেঁ [কাহ্নাঞি ল] মোর মরণের পথ॥
৮৩।২ : 'কাহ্নাঞি ল' : যত ছিল মনে তোর [কাহ্নাঞি ল] চিরকাল মনোরথ ॥[৭]
৮৯।২ : 'হরিবেক' : ব্রহ্মা [হরিবেক] বেদ ইন্দ্রে হরিব পানী।
৮৯।২ : 'যবেঁ' : সঙ্গে আসিবে [যবেঁ] লঅ দধিভারে।
৯০।১ : 'সু' : ঋষি তপ হরিবেক পণ্ডিত [সু]মতী॥
১৪০।১ : 'ডরে' : তবেঁ নাহিঁ নাহে [ডরে] পানী লআঁ চলে ॥[৮]
১৪০।১ : 'জলে' : এবেঁ মিছা ডর কর [জলে] যমুনার॥
১৪১/২ : 'কলা' : ষোল সহস্র গোপী এ[কলা] দামোদরে।
১৪১/২ : 'কাহ্নাঞি' : ডুবিআঁ মাইলেন্ত [কাহ্নাঞি] জলের ভিতরে॥
১৪১/২ : 'স' : হেন বুলি [স]ব লোকে দুসহ উত্তরে।
১৬০/২ : 'আহ্মে' : কংস মারিবারে [আহ্মে] আবতার কৈল॥
১৭০/২ : 'দেব' : তথাঁ বা কেমনে পাম্বিব [দেব] চক্রপানী॥
১৭১/১ : 'মোর' : আইস ল বড়ায়ি [মোর] রাখহ পরাণ।
১৭১/১ : 'র' : আহ্মা[র] বচন শুন তোহ্মে বড়িমা।

১৭২/১ : 'ৱ' : আপনা চিহ্নিআঁ থাক আইহনে[ৱ] রাণী।
১৭৬/২ : 'বড়াই' : যমুনার তীরে [বড়াই] কদম তরুতলে।
১৯৩/১ : 'খ' : আম্বিস ল বড়ায়ি রা[খ]হ পরাণে ॥
১৯৪/১ : 'কাহ্ন' : বাছা রাখিবারে [কাহ্ন] জাএ সে গোকুলে ॥
১৯৪/১ : 'চাইহ' : বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ [চাইহ] ভালমতে ॥
১৯৫/১ : 'মনে' : যোগী যোগ চিন্তে যেহ্ন [মনে]।[৯]
১৯৫/২ : 'মো' : তা দেখিতেঁ প্রাণ জাএব [মো]রে ॥
১৯৭/২ : 'ন' : এবেঁ তাক চাহি ব[ন] দেশে ॥
১৯৮/১ : 'ফ' : তথাঁ তোর মনোরথ হয়িব স[ফ]ল ॥[১০]
১৯৮/১ : 'রাধা' : তথাঁ গেলে [রাধা] তার পাইব দরশন ॥[১১]
১৯৮/১ : 'সে তো' : ছাড়িতেঁ না পারে [সে তো] কদমের তল ॥
১৯৯/১ : 'মোরে' : সবখন [মোরে] নান্দের নন্দন চুম্বন করে কপোলে।
১৯৯/২ : 'বা' : কি মোর বসতী বাশে।[১২]
২০২/১ : 'তোক' : বারেঁ বারেঁ [তোক] যত বুয়িলোঁ আহঙ্কারে ॥[১৩]
২০৩/২ : 'রূপ' : মোর [রূপ] যৌবনে পড়িলাহা ভোলে।
২০৬/১ : 'আর' : না জাইবোঁ ঘর [আর] তোহ্মাক ছাড়িএঁা ॥
২০৬/১ : 'জবে' : তোহ্মে [জবে] যোগী হৈলা সকল তেজিআঁ।
২০৬/২ : 'মোরে' : পরাণে না মার [মোরে] দেব গদাধরে।
২০৭/২ : 'কৃষ্ণ' : এঁবে [কৃষ্ণ] করহ আদেশ ॥[১৪]
২০৮/১ : 'মোরে' : না বোল [মোরে] নিরাস[১৫]
২১২/২ : 'ক' : এঁবে স্না[ক] বোলসি কাহ্নাঞিঁ আণিবারে
২১৪/১ : 'ৱ' : কি মোর জীবন যৌবন না[ৱ]দ কি মোর এ ধন বাসে ॥

দ্বিতীয় সংশোধক

৪/২ : 'আদি' : কেশি [আদি] আসুর পাঠাইল আনন্তরে।
৭/১ : 'অথবা কানড়া ॥ যতিঃ' : দেশাগ রাগ : ॥ [অথবা কানড়া ॥ যতিঃ] রূপকং ॥[১৬]
৮/২ : 'কৈ' : ঘন ঘন [কৈ]ল আলিঙ্গনে ॥[১৭]
৮/২ : 'বড়ায়ি' : সরূপেঁ কাহিনী [বড়ায়ি] কহ মোর থানে ॥
১৭/২ : 'ঙ' : মোএঁ আপো[ঙ]ষ হৈবোঁ তোহ্মে জাইবেঁ মার ॥
২৩/২ : 'ধানুষী ॥ একতালী'[১৮]
৩০/২ : 'যাসি' : মথুরা'ক [যাসি] বিকে[১৯]
৩১/১ : 'দুধ' : নিতি নিতি যাসি দধি [দুধ] বিকে
৩৪/২ : 'পাহাড়ীআ রাগ: ॥'[২০]
৪৬/১ : 'আভি' : কেহ্নে করহ হেন [আভি]হাসে ॥[২১]

৪৮/১ : 'গুসি' : কাঞ্চুলী ভাঁগসি মোর ছি[গুসি] হার।[২২]
৫০/২ : 'ভুখিল' : সমুখ দীঠে পড়িলে বনত [ভুখিল] বাঘ না খাএ ॥
৬৭/১ : 'ক' : আহ্মাত আধি[ক] কোণ দেহ আছে[২৩]
৭৫/১ : 'পাহাড়ীআ রাগ ॥ ক্রীড়া'[২৪]
৮৬/২ : 'বাছি' : চামড় গাছের [বাছি] কাটিলেক ডাল ॥
৮৬/২ : 'করী' : দুঈ পাশেঁ ছুচ [করী] মাঝেঁ পুষ্ট করী ।
৮৯/২ : কানড়া রাগঃ :[২৫]
৮৯/২ : 'ব্রহ্মা'[২৬]
৮৭/২ : 'অ' : সত্যেঁ আইহন মা[অ] কহিলোঁ তোহ্মাতে
৯০/২ : 'বড়' : ভার গরুঅ নহে গরুঅ [বড়] লাজ
৯২/২ : 'সজাইল' : রূপার ভাণ্ডে [সজাইল] ঘী[২৭]
৯২/২ : 'পাপে' : [পাপে] মজিলা দেবরাজে[২৮]
৯২/২ : 'দুর্গ' : পাঞ্চ [দুর্গ]তি কাহ্ন করিল আহ্মার[২৯]
৯৩/১ : 'মুখ' : আর শির তুলী [মুখ] না দে…
৯৪/১ : 'লি' : হাথ দিতেঁ [লি]হে অণিআঁ[৩০]
১০২/১ : 'ব' : সুন্দরি রাধা ল সরো[ব]রময়ী[৩১]
১১২/২ : 'উপায়' : মনত গুণিআঁ বোল [উপায়] আপনে
১১৩/২ : 'আশো' : তোর রতি [আশো]আশেঁ গেলা আভিসারে
১২১/১ : 'হিঁ' : কে না[হি] উপহাসে
১২১/২ : 'আমিআঁ' : তোমার বদন সংপুন চান্দ আধর [আমিআঁ] লোভে
১৬৪/২ : 'বড়ায়ি' : তোঞেঁ বুয়িলী [বড়ায়ি] রাধা মোরে দিল গালী
১৫৭/২ : 'তোষি' : কেমনে [তোষি]ব আর হেন নারী জনে[৩২]
১৭৩/১ : 'একতালী'[৩৩]
২০২/২ : 'আই' : বড়ার বহুআরী তোহ্মে [আই]হনের রানী[৩৪]
২০৮/২ : 'রাধা' : জুনি সুধি পাএ [রাধা] রাজা কংশাসুর
২২৪/১ : 'র' : আহে[র] রাগ :
১৪৪/২ : 'অথ' : [অথ] যমুনাখণ্ডার্গত হারখণ্ডঃ[৩৪ক]

তৃতীয় সংশোধক

১২/১ : 'ও' : মরোঁ হের রাধার বিরহে ॥ [ও] ॥
১৯/২ : 'ই' : ক[ই]লোঁ খণ্ডব্রত[৩৫]
৮৯/১ : 'হিঁ' : তোরে লআঁ জাইতেঁ না[হিঁ] পারী
৯৪/২ : 'হ' : পুরুব কালের পাতে না রুই[হ] মূলে[৩৬]
১০০/১ : 'রূপকং ॥' : শ্রীরাগ : ॥ [রূপকং ॥]

৭২০
৬৭

ভারতী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুররোড।

৬ই বৈশাখ, ১৩০৫ সাল।

মূল্য ৩৸০ আনা।

'ভারতী' পত্রিকার আখ্যাপত্র

13.৮৭।

সূচী।

যাঁহাদের প্রবন্ধ বাহির হওয়ার কথা ছিল, তাঁহাদের কারণে তাঁহাদের লেখা বেরীতে [illegible] বৈশাখ-সংখ্যায় প্রকাশিত হইতে পারিল না।

'ভাণ্ডার' পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সূচীপত্র

সাধনা।

মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চতুর্থ বর্ষ।

প্রথম ভাগ।

38650

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি।

১৩০১ ১৮৯৪ সাল।

'সাধনা' পত্রিকার আখ্যাপত্র

বৈশাখ, ১ম সংখ্যা।　　　　১৩০৮ সাল।

বঙ্গদর্শন।

43731

(নবপর্য্যায়)

মাসিক পত্র।

সূচী।

নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সূচীপত্র

২৩৮/২ : 'হ' : কি কারণে ঝগড় কর[হ] সবখন
১৩৮/২ : 'মন্দ' : তোহ্মে কি না জান [মন্দ] ভাল সখিগণ
৫৭/১ : 'র' : শোণিতপুর গিআঁ বধিবোঁ বা[র]ণ[৩৭]
১৯৭/১ : 'হো' : কাহ্নাঞি তেজুক তো[হো]র নেহে
৪৫/২ : 'ন' : কা[ন]ড়ি থোঁপা বড়ায়ি মোর দুঈ তন[৩৮]
২০৫/১ : 'মো' : বিরহে না মার [মো]কে ল[৩৯]
২০৫/১ : 'রোঁ' : চরণে ধ[রোঁ] তোরে ল[৪০]
২০৬/১ : 'ঘর' : কেহ্নে [ঘর] জাইতেঁ বোকে বোল গুণনিধি[৪১]
২০৬/২ : 'না' : আনুগতী ভকতী আনাথি আহ্মি [না]রী[৪২]
২০৬/২ : 'র' : সকতি না ভৈল তোর নেহ[া্র] কারণে[৪৩]
২২৫/২ : 'সু' : এ বোলে পাইলোঁ [সু]খ
১১৭/২ : 'হ' : তথাঁক না লইহ সং[হ]তী ॥[৪৪]

চতুর্থ সংশোধক

১০৩/২ : 'র' : আহ্মা ভাণ্ডিবারে কেহ্নে পাত প[র]কার[৪৫]
১৩১/২ : 'ন' : কেহো ঘ[ন] ঘন তার চুম্বিল বদন
১৬২/১ : 'বু' : পরিহাসেঁ [বু]ইলোঁ তোকে প্রাণে মার রাধা[৪৬]
১৬৪/১ : 'তোর' : হেন তিরী বধ কাহ্নাঞি সঙ্গে [তোর] বুলে[৪৭]
১৮৬/২ : 'নে' : কত কান্দ [নে]তেঁ মোছ লোহে
১৮৯/২ : 'ণা' : ইথং কৃষ্ণগত প্রা[ণা][৪৮]
১৯৩/১ : 'খ' : আয়িস ল বড়ায়ি রা[খ] হ পরাণ
২০১/১ : 'দে' : নীল জলদ সম [দে] হা[৪৯]
২০৪/১ : 'র' : আহ্মে ত ভাগিনা তো[র] দেব সমতুলে
২১৫/২ : 'হ্মা' : দগধিনী ভৈলী তো[হ্মা]র শরণে'
২২৪/১ : 'র' : আহে[র] রাগঃ
৮৬/১ : 'চ' : দেখ আইহনের মা রাধার [চ]রিতে

পঞ্চম সংশোধক

৯১/২ : 'কো' : ফুরাআঁ না দেহ তোহ্মে তেসি এ[কো] কাজ[৫০]
১১৭/২ : 'লোক কেহো' : তথাঁক না লইহ [লোক কে হো] সংহতী
১১৯/১ : 'ল' : হের ভাল ফু[ল] হোর ভাল ফল

এবার প্রথম ও দ্বিতীয় লিপিকরের সংশোধন বলে যেগুলি অনুমান করছি সেগুলি তালিকাবদ্ধ করছি।

প্রথম লিপিকর

১৩/২ : 'নে' : তবেসি ম[নে]র মোর দুখ পালাএ[৫১]
৬১/২ : 'সুন্দর' : বাটে দুরুবার কাহ্নাঞি নাহ্মের [সুন্দর]

৮৪/১ : 'থ' : তাত জগন্না[থ] পাইল আধিক পিরীতি

৮৭/২ : 'স্থনি' : সাস্থড়ীর বোল [স্থনী] ভরায়িলী রাহী[৫২]

৮৯/১ : 'ত' : জলধি[ত] সেতু বান্ধি জিনিলো মো লঙ্কা

১২৩/২ : 'ল' : জত অপরাধ কৈ[ল] জানহ আপনে

১৩২/২ 'গজ' : হেন বুলি রাধা কলসী লঞাঁ জাএ [গজ]গড়ি ছান্দে

১৫৪/২ : 'ক্রীড়া' : পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ [ক্রীড়া]

১৫৫/২ : 'স্থ' : সব তরুগণ বিকাস কু[স্থ]ম ভ্রমর কাঢ়এ রাএ

১৫৭/২ : 'বাসলী গণে' : গাইল বড়ু চণ্ডীদাস [বাসলী গণে][৫৩]

১৬৫/২ : 'ণিকে' : মা[ণিকে] খঞ্চিল তুঈ পাশে[৫৪]

দ্বিতীয় লিপিকর

৮০/২ : 'আ' : দধির পসার নাএ চড়াহ [আ]সিঞাঁ

১১৩/২ : 'তা' : প্রণাম করিঞাঁ বুইল [তা] সন্ধার পাএ

লিপিকর দু জনকে বাদ দিলে পাঁচ জন সংশোধক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির মূলপাঠ সংশোধন করেছেন। গোটা পুঁথিকে পাঁচটি অংশে ভাগ করে এক-একজন সংশোধকের উপর অংশবিশেষের সংশোধনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল বলে মনে হয় না। পাঁচ জনের সংশোধন পুঁথির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছড়ান, কোনো কোনো পৃষ্ঠায় একাধিক সংশোধকের সংশোধনও দেখা যাচ্ছে। তাই মনে হয় পাঁচ জনে পর্যায়ক্রমে সম্ভবত বিভিন্ন সময়ে পুঁথির গোড়া হতে শেষ পর্যন্ত সংশোধন করেছিলেন। সংশোধনের উদ্দেশ্য পাঁচ জনেরই এক— ১. অর্থসঙ্গতির জন্য যেগুলি নিঃসন্দেহে লিপিকর-প্রমাদ সেগুলি সংশোধন করা, ২. লিপিকরের ছাড় পূরণ করা, ৩. ছন্দের মাত্রা পূরণের জন্য এক বা একাধিক অক্ষর যোজনা করা। প্রথম প্রকারের সংশোধন সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম এবং সেগুলি সম্বন্ধে কোনো সমস্যাও নেই। 'বড়ার বহুআরী তোহ্মে হনের রনী' দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় লিপিকর 'আইহনের রানী' লিখতে গিয়ে 'হনের রানী' লিখেছেন। লিপিকরের এই রকম ভুলগুলি সংশোধকেরা সংশোধন না করলেও সম্পাদক অবশ্যই সংশোধন করে দিতেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার সংশোধনগুলিকে সব ক্ষেত্রে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। মূলপাঠ 'দেখ আইহনের মা রাধার রীতে'। তোলাপাঠে 'চ' বসান হয়েছে। তোলাপাঠের নির্দেশে 'রীতে' হল 'চরীতে'। এখন 'চ' অক্ষরটি লিপিকরের ছাড় না ছন্দের দাবীতে সংশোধকের যোজনা, বলা শক্ত। যা কিছু সমস্যা তা এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার সংশোধন নিয়ে।

এখন পূর্বে উত্থাপিত দ্বিতীয় প্রসঙ্গটির আলোচনা করা যেতে পারে। সংশোধকেরা কি আদর্শ পুঁথি বা অপর কোনো পুঁথির সাহায্যে সংশোধনগুলি করেছেন? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই সংশোধনের গুরুত্ব প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে। সংশোধনগুলি লিপিকরকৃত না হলেও ক্ষতি নেই। পুঁথির সাহায্য নিয়ে যদি অন্য কেউ সংশোধনগুলি করে থাকেন তা হলেও সংশোধনের গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাঠ একখানি পুঁথির আধারে গঠিত। যদি জানা যায় এই একখানি পুঁথির পাঠ একাধিক পুঁথির সাহায্যে সংশোধিত কিংবা পাঁচ জন সংশোধকের পাঁচ জোড়া সতর্ক চোখ গোটা পুঁথির পাঠ আদর্শ পুঁথির পাঠের

সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলিয়ে সংশোধন করে দিয়েছে তা হলেও বর্তমান পুঁথির পাঠের মূল্য বেড়ে যায়। সুতরাং সংশোধকেরা কোনো পুঁথি ব্যবহার করেছিলেন কি না তা সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

তোলাপাঠে কোনো পাঠান্তর পাওয়া যাচ্ছে না! অবশ্য পাঠান্তর না পাওয়ার পক্ষেও যুক্তি আছে। সংশোধকেরা যদি আদর্শ পুঁথি ব্যবহার করে থাকেন তা হলে পাঠান্তর না থাকাই স্বাভাবিক। এই যুক্তি স্বীকার করলে একথাও স্বীকার করতে হয় যে সংশোধকদের কাছে যদি কোনো পুঁথি থেকে থাকে তা হলে তা আদর্শ পুঁথি। আদর্শ পুঁথি ছাড়া অন্য কোনো পুঁথি থাকলে এতগুলি পদের কোনো একটি লাইনেও কিছু পাঠান্তর পাওয়া যেত। দুখানি পুঁথির পাঠ অবিকল একরকম হওয়া অসম্ভব। সুতরাং এ অনুমান অপরিহার্য যে সংশোধকদের কাছে আদর্শ পুঁথি ছাড়া অপর কোনো পুঁথি ছিল না। আদর্শ পুঁথিও যে ছিল না তার কিছু কিছু প্রমাণ সংশোধনগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়।

'শোণিতপুর গিআঁ বধিবোঁ বাণ'— মূলপাঠের এই লাইনটিতে অর্থের কিছুমাত্র অসঙ্গতি নেই। তথাপি সংশোধক 'বাণ'-কে 'বারণ' করেছেন। লাইনটির মধ্যে যে পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ আছে সংশোধক সেটি ধরতে পারেন নি, কিংবা ছন্দের একমাত্রা এদিক ওদিক করবার জন্য তিনি এমনই নিবিষ্ট ছিলেন যে 'বাণ'-কে তিনি অর্থহীন 'বারণ'-তে পরিবর্তিত করেছেন। এখানে মূলপাঠের 'বাণ' যে শুদ্ধ এবং তোলাপাঠের 'বারণ' যে অশুদ্ধ সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তা হলে প্রশ্ন— সংশোধক 'বাণ'-কে 'বারণ' করলেন কেন? কবির অভিপ্রেত শব্দ 'বাণ,' লিপিকরও 'বাণ' লিখেছেন সুতরাং অনুমান করতে বাধা নেই আদর্শ পুঁথিতে 'বাণ'-ই ছিল। সংশোধকের কাছে যদি আদর্শ পুঁথি থাকত তা হলে তিনি এই অসতর্ক ভুল কি করতেন? সুতরাং এই সংশোধনটি যে সংশোধকের নিজস্ব সে সম্বন্ধে সংশয় নেই। আদর্শ পুঁথির সাহায্যে সংশোধন করা হলে 'বাণ' সংশোধিত হতো না। অন্তত এই একটি জায়গায় নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে সংশোধক আদর্শ পুঁথি দেখে সংশোধন করেন নি, সংশোধনগুলি সংশোধকের নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনা-প্রসূত।

এই বিশেষ সংশোধনটি তৃতীয় সংশোধকের। তৃতীয় সংশোধকের কাছে পুঁথি না থাকলেও অন্যদের কাছে থাকতে পারে। সুতরাং আরো কয়েকটি সংশোধন বিচার করা প্রয়োজন। তবে সব ক্ষেত্রে নিঃসংশয় হওয়ার মতো প্রমাণ হয়তো পাওয়া যাবে না। কিন্তু সংশোধনের প্রকৃতি দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে কোনো সংশোধকের কাছেই পুঁথি ছিল না।

'আইস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ।
সহিতে না পারোঁ মদন পাঁচ বাণ॥' ১৭১।১

প্রথম সংশোধক 'বড়ায়ি'র পর 'মোর' বসাবার নির্দেশ দিয়েছেন তোলাপাঠে। 'মোর' ছন্দের দাবিতে বা লিপিকরের ছাড়-পূরণের উদ্দেশ্যে বসবে বলা কঠিন। এই ছত্র দুটির সঙ্গে তুলনীয় আর দুটি ছত্র—

'আইস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ।
সহিতেঁ নারোঁ মনমথ বাণ॥' ১৯৩।১

এই ছত্র দুটি আর আগের ছত্র দুটি প্রায় হুবহু এক। অন্তত প্রথম দুটি লাইন দু-জায়গায়ই এক। একটিতে সংশোধনের প্রয়োজন হল, আর একটিতে প্রয়োজন হল না। এখন প্রশ্ন প্রথম সংশোধকের প্রস্তাবিত

'মোর' কি আদর্শ পুঁথিতে ছিল এবং লিপিকর ছেড়ে গিয়েছিলেন? অথবা, ছন্দের দাবিতে প্রস্তাবটি সংশোধকের নিজকৃত? ছন্দের জন্য 'মোর' প্রয়োজনীয় কি অপ্রয়োজনীয় সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। এখানে একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তর পাওয়া প্রয়োজন—'মোর' আদর্শ পুঁথির অথবা সংশোধকের যোজনা। তর্কের খাতিরে এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর হওয়া সম্ভব। তবে তর্কের সূত্র ধরে সব সময় সত্যে পৌঁছান সম্ভব নাও হতে পারে। দুটি হুবহু এক লাইনের একটিতে 'মোর' আছে, অপরটিতে নেই এর কি কারণ অনুমান করা যেতে পারে দেখা যাক।

এক. ১৭১।১ পৃষ্ঠার লাইনটি আদর্শ পুঁথির পাঠে 'মোর' ছিল। লিপিকর 'মোর' ছেড়ে গিয়েছিলেন, প্রথম সংশোধক আদর্শ পুঁথি দেখে সেটি বসিয়ে দিয়েছেন। ১৯৩।১ পৃষ্ঠায় আদর্শ পুঁথিতে 'মোর' ছিল না।

দুই. দু-জায়গায়ই আদর্শ পুঁথিতে 'মোর' ছিল। দু-জায়গায়ই লিপিকর ছেড়ে গিয়েছেন। ১৭১।১ পৃষ্ঠায় প্রথম সংশোধক তোলাপাঠে 'মোর' বসিয়েছেন। অন্য জায়গায় ১৯৩।১ পৃষ্ঠায় বসাতে তিনিও ভুলে গেছেন।

তিন. আদর্শ পুঁথিতে কোনো জায়গায়ই 'মোর' ছিল না। ১৭১।১ পৃষ্ঠায় 'মোর' সংশোধনটি সংশোধকের নিজস্ব।

দ্বিতীয় অনুমানের বিরুদ্ধে বলা যায় ১৯৩।১ পৃষ্ঠার লাইনটি প্রথম সংশোধকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও চতুর্থ সংশোধকের দৃষ্টি এড়ায় নি। মূলপাঠে ছিল 'আইস ল বড়ায়ি রাহ পরাণ'; চতুর্থ সংশোধক সঙ্গতভাবেই 'রাহ'-কে 'রাখহ' করেছেন তোলাপাঠে 'খ' বসিয়ে। এই লাইনে আদর্শ পুঁথিতে যদি 'মোর' থাকত, চতুর্থ সংশোধক অবশ্যই তোলাপাঠে 'মোর' লিখতেন। সুতরাং ১৯৩।১ পৃষ্ঠার লাইনে 'মোর' আদর্শ পুঁথিতে ছিল না এ কথা স্বীকার করতে হবে। প্রথম অনুমান সম্পর্কে বলা যায় আদর্শ পুঁথিতে এক জায়গায় 'মোর' থাকবে, অন্য জায়গায় থাকবে না এ অনুমান অসঙ্গত। অর্থের জন্য 'মোর' একান্ত প্রয়োজনীয় নয়। প্রয়োজন হলে দু-জায়গায়ই বসত। দু-জায়গায় যে আদর্শ পুঁথিতে 'মোর' ছিল না তা প্রমাণিত হয়েছে। তার চেয়েও বড় প্রমাণ দু-জায়গায়ই লিপিকর 'আইস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ' লিখেছেন। সুতরাং আদর্শ পুঁথিতে তিনি এই পাঠই পেয়েছিলেন এ সম্বন্ধে সংশয় করবার কোনো কারণ নেই। তা হলে স্বীকার করতে হয় 'মোর' আদর্শ পুঁথিতে ছিল না—এটি প্রথম সংশোধকের নিজস্ব যোজনা। এই সঙ্গে এ অনুমানও অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে 'মোর', 'তোর', 'বড়', 'তোক', 'আর', 'সব', 'মোরে', 'দেব', 'রাধা', 'ডরে' ইত্যাদি দুই বা ততোধিক সিলেব্‌ল্ দিয়ে ছন্দের মাত্রা বাড়াবার জন্য প্রত্যেক সংশোধকই যে সংশোধনগুলি করেছেন তার কোনোটিই আদর্শ পুঁথিতে ছিল না।[৫৫] এগুলি সবই সংশোধকদের নিজস্ব যোজনা। তাই অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে কোনো সংশোধকই আদর্শ পুঁথি বা অপর কোনো পুঁথির সাহায্যে সংশোধনগুলি করেন নি।

আরও কয়েকটি সংশোধন পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

৪০।১ পৃষ্ঠায় 'অতি কঠিন কুচ মাঝা খিণী দেহা'[৫৬] লাইনটি আছে। সংশোধক 'কুচ'-র পরে ছাড়-চিহ্ন দিয়ে 'তোর' লিখেছেন। অর্থ বা ছন্দের জন্য 'তোর' অপ্রয়োজনীয়। তথাপি সংশোধক তোলাপাঠে 'তোর' বসালেন কেন? আমার অনুমান সংশোধক সাধারণ বুদ্ধিতে 'তোর'

বসিয়েছেন। গোটা পদটি পড়ে তিনি দেখলেন রাধার রূপবর্ণনার প্রত্যেকটি লাইনেই 'তোর' বা 'তোহ্মার' আছে।

'অণআ সদৃশ রাধা তোহ্মার গাঅ।'
'আমিআঁ বরিষে তোর নয়ন বিশাল॥'
'খোঁপাতে লুলয়ে তোর দোলঙ্গের মাল।
'বিম্বফল জিনী তোর আধরের কান্তী।'
'মুকুতা সদৃশ তোর দশজনের যুতী॥'

'আতি কঠিন কুচ মাঝা খিনী দেহা' রূপবর্ণনার এই একটি মাত্র লাইনেই 'তোর' নেই। তাই সংশোধক বোধহয় মনে করলেন এই লাইনে 'তোর' কবির অভিপ্রেত ছিল। ছন্দের পক্ষে দুর্বহ হওয়া সত্ত্বেও তাই তিনি 'তোর' বসিয়েছেন। সংশোধকেরা ছন্দ সংশোধনের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখছি ছন্দের দাবি উপেক্ষা করে অন্য উদ্দেশ্যে সংশোধন করা হয়েছে। রূপবর্ণনার প্রত্যেক লাইনেই 'তোর' আছে এইটি যদি সংশোধকের একমাত্র যুক্তি হয় তা হলে এ কথাও তিনি ভাবতে পারতেন যে রূপ-বর্ণনার সব লাইনে সঙ্গতি রাখাই কবির অভিপ্রায় ছিল না, ছন্দে সঙ্গতি রাখাই তাঁর অভিপ্রায় ছিল। এবং সেই জন্যই তিনি এই লাইনে 'তোর' বসান নি। স্বতরাং এই সংশোধনের সার্থকতা কি? ছন্দ অর্থে সুসঙ্গত একটি ছত্র সংশোধনের ফলে বিকৃত হয়েছে।

১৫৭।১ পৃষ্ঠায় 'কেমনে সহিব আর হেন নারী জনে'। 'সহিব' শব্দটির 'সহি-'র উপর ৪টি বিন্দুর বর্জন-চিহ্ন এবং 'স'-র উপর ছাড়-চিহ্ন বসিয়ে তোলাপাঠে 'তোষি' লিখেছেন দ্বিতীয় সংশোধক। বিজনবাবু মনে করেছেন 'সহিব'-র 'সহি' পর্যন্ত লিখে লিপিকর ভুল লিখেছেন বুঝতে পারেন এবং তখনই 'সহি' কেটে তোলাপাঠে 'তোষি' লিখেছেন। এ অনুমানের পক্ষে যুক্তি নেই। 'প্রথমত, 'সহি' পর্যন্ত লিখে ভুল ধরা পড়লে তোলাপাঠের প্রয়োজন হতো না। 'সহি' কেটে নূতন করে লেখা চলত, অনেক জায়গায় লিপিকর তা করেছেন। দ্বিতীয়ত, 'তোষি' লিপিকরের হাতে লেখা নয়।

'সহিব' স্থলে 'তোষিব' সংশোধনের সার্থকতা কি? বলা দরকার এটি বাণখণ্ডের পদ, এবং বড়াই-র মুখে রাধার প্রতি কৃষ্ণের বিতৃষ্ণার কথাই এখানে বিবৃত হয়েছে। সেই কারণে 'সহিব' কি এখানে অর্থ এবং প্রসঙ্গানুসারে অসঙ্গত? পদটি বৃন্দাবনখণ্ডের পূর্ববর্তী কোনো খণ্ডে পাওয়া গেলে 'তোষি' সংশোধনের তাৎপর্য বোঝা যেত। হারখণ্ডের পর কৃষ্ণের মুখে রাধা প্রসঙ্গে 'তোষিব' ব্যবহার অসঙ্গত বোধ হয়। তা ছাড়া, লাইনটিতে রাধার প্রতি কৃষ্ণের যে বিতৃষ্ণার ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য 'সহিব'-ই যেন অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তাই 'কেমনে সহিব আর হেন নারী জনে' মূল পুঁথির এই পাঠই ছন্দ-অর্থ-প্রসঙ্গ কোনো দিক দিয়েই বেমানান নয়, পরন্তু 'তোষিব'-র চেয়ে বেশি সঙ্গত। এ ক্ষেত্রে সংশোধন করা হল কেন? সংশোধকের কাছে আদর্শ পুঁথি ছিল এ কথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হলে মনে করা যেত 'তোষিব' আদর্শ পুঁথিতে ছিল বলে সংশোধন করা হয়েছে। কিন্তু সংশোধকের কাছে আদর্শ পুঁথি ছিল এমন প্রমাণ নেই; স্বতরাং স্বীকার করতে হবে 'তোষিব' সংশোধকের কল্পিত পাঠ। মূল পাঠে স্পষ্ট ভুল থাকলে সংশোধকের কল্পিত পাঠ দিয়ে মূলপাঠের সংশোধন একেবারে অযৌক্তিক নাও হতে

পারে। কিন্তু মূলপাঠ যেখানে যথার্থ এবং সংশোধিত পাঠের চেয়ে অধিকতর সঙ্গত সেখানে সংশোধকের কল্পিত পাঠ দিয়ে মূলপাঠ সংশোধনের যাথার্থ্য সম্বন্ধে অবশ্যই সন্দেহ করা যেতে পারে।

১৪১।২ পৃষ্ঠায় মূলপাঠে ছিল 'হেন বুলিবে লোকেঁ তুসহ উত্তরে'। অর্থ ও প্রসঙ্গানুসারে মূলপাঠে কিছুমাত্র গোলমাল নেই। তথাপি সংশোধক 'বুলিবে'-র '-একার' কেটে তার উপর ছাড়-চিহ্ন দিয়ে তোলাপাঠে 'স' লিখেছেন। সংশোধকের উদ্দেশ্য ছিল 'সব' শব্দটি যুক্ত করা। কিন্তু সংশোধনের পর যে পাঠ গঠিত হল —'হেন বুলি সব লোকেঁ তুসহ উত্তরে'— তা অবশ্যই সংশোধকের অভিপ্রেত ছিল না। সংশোধকের নির্দেশ মানতে গিয়ে বসন্তবাবুকে 'বুলি'-র জায়গায় 'বুলি[ব]' পাঠপুনর্গঠিত করতে হয়েছে। কিন্তু সংশোধক-সম্পাদকের সংশোধন-সংযোজন ছাড়া লিপিকরের মূলপাঠ কি গ্রহণযোগ্য ছিল না? একটি মাত্রা হয়তো কম ছিল এবং সংশোধক এদিক ওদিক বিচার না করে সেই মাত্রাটি পূরণ করে দিলেন। সম্পাদক মাত্রাপূরণ ছাড়া অর্থ ও ব্যাকরণের দিকে তাকিয়ে আর একটি অক্ষর যুক্ত করে দিলেন। এইভাবে লিপিকরের পাঠের উপর দু-তরফা রং-রিপু হওয়ার ফলে লাইনটির পাঠ যে মূল থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে সেদিকে আমরা লক্ষ করছি না। যে ভাবেই হোক সংশোধকের নির্দেশ মানতেই হবে। তিনি ভুল নির্দেশ দিলেও মূলপাঠ পরিবর্তন করে সংশোধকের ভুলের সংশোধন করতে হবে এটাই যেন আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু আমরা একবারও ভাবি নি কোন্ যুক্তিতে তোলাপাঠের সংশোধনের গুরুত্ব মূলপাঠের চেয়ে বেশি? অন্তত আলোচ্য ছত্রটির মূলপাঠ 'হেন বুলিবে লোঁকে তুসহ উত্তরে' যে রং-রিপু করা সংশোধিত পাঠ 'হেন বুলি[ব সব] লোঁকে তুসহ উত্তরে' অপেক্ষা উন্নত এবং মূলের কাছাকাছি এবং সম্ভবত কবির কাছাকাছি সে সম্বন্ধে সন্দেহ কি? মূলপাঠে যদি এক মাত্রা কম থাকে, সংশোধিত পাঠে এক মাত্রা বেশি আছে।

৮৬/২ পৃষ্ঠায় মূলপাঠ ছিল 'চামড় গাছের কাটিলেক ডাল'। ছন্দের জন্য লাইনটিতে তুটি মাত্রার প্রয়োজন। দ্বিতীয় সংশোধক সেই তুটি মাত্রা পূরণ করে দিয়েছেন 'গাছের' পর ছাড়-চিহ্ন দিয়ে এবং তোলাপাঠে 'বাছি' লিখে। সংশোধনের পর পাঠ দাঁড়াল 'চামড় গাছের বাছি কাটিলেক ডাল'। সংশোধনে মাত্রা পূরণ হল কিন্তু ভাষা বিবৃত হল। 'গাছের বাছি' প্রয়োগ বাংলা ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। ষষ্ঠীর 'র-' বিভক্তি যুক্ত 'গাছের' পর অসমাপিকা ক্রিয়া 'বাছি'র ব্যবহার বাংলা ভাষায় সচরাচর হয় না। কাব্যের ভাষায় শব্দের পারম্পর্য স্বতই লঙ্ঘিত হয় ঠিকই। তথাপি অনিয়মের মধ্যেও একটা নিয়ম থাকে। শব্দগুলি বাক্যের যত্রতত্র বসে না। নিয়মের বাঁধন, অন্তত কাব্যের ভাষায়, শিথিল বটে। কিন্তু নিয়মের শৈথিল্য মানে অনিয়ম নয়। র-বিভক্তি যুক্ত নামশব্দের পর অসমাপিকা ক্রিয়া প্রয়োগ অনিয়মের মধ্যে পড়ে। এরকম প্রয়োগ বড়ু চণ্ডীদাস করেন নি, করতেন না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'জল যমুনার' এরকম প্রয়োগ আছে। 'যমুনার জল' কাব্যের ভাষায় 'জল যমুনার' হয়েছে। কিন্তু 'গাছের বাছি কাটিলেক ডাল' প্রয়োগ অসঙ্গত। 'গাছের' এবং 'ডাল'এর মধ্যে একটি অসমাপিকা ক্রিয়ার অবস্থান ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সুতরাং 'বাছি' বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষা নয়, আদর্শ পুঁথিতে শব্দটি ছিল না। এই পদের অন্য লাইনে মূলপাঠ ছিল 'তুঈ পাশে ছুচ মাঝে পুষ্ট করী'। সঙ্গত পাঠই ছিল। সংশোধক 'ছুচ'-র পর ছাড়-চিহ্ন দিয়ে তোলাপাঠে আর একটি 'করী' বসিয়েছেন। একই লাইনে পর পর তুটি 'করী'-র ব্যবহার করবেন এমন ভাষা-দৈন্য কি চণ্ডীদাসের? মূলপাঠে

কবির ভাষার মিতব্যয়িতার পরিচয়। সংশোধক মাত্রার প্রয়োজনে কবির ভাষাকে বিকৃত করেছেন।

১৪১/২ পৃষ্ঠায় মূলপাঠ ছিল— 'ষোল সহস্র গোপীএঁ দামোদরে।
ডুবিআঁ মাইলেন্ত জলের ভিতরে ॥'
সংশোধকের নির্দেশে গঠিত পাঠ দাঁড়াল— 'ষোল সহস্র গোপী একলা দামোদরে।
ডুবাআঁ মাইলেন্ত কাহ্নাঞি জলের ভিতরে ॥'[৫৭]
বসন্তবাবু মনে করেছেন 'গোপীএঁ'-র উপরে যে চন্দ্রবিন্দু আছে সেটি ছাড়-চিহ্ন। পুঁথির এই পৃষ্ঠায় আরও দুটি ছাড়-চিহ্ন আছে। সে দুটির সঙ্গে তুলনা করলে 'এঁ'-র চন্দ্রবিন্দুকে কিছুতেই ছাড়-চিহ্ন বলে মনে হয় না। ওটি চন্দ্রবিন্দু। অবশ্য 'এঁ'-র উপর তোলাপাঠে 'কলা' লিখে সংশোধক যে 'একলা' পাঠ নিষ্পন্ন করতে চেয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে স্মরণ রাখতে হবে মূলপাঠে 'এঁ' আছে, 'এ' নেই। তাই আদর্শ পুঁথিতে 'গোপীএঁ'-ই ছিল। 'এঁ' পরে 'কলা' যোগ করলে 'এঁকলা' হয়, আদর্শ পুঁথিতে 'এঁকলা' থাকতে পারে না। সুতরাং 'কলা' লিপিকরের ছাড় নয়, সংশোধকের নিজস্ব যোজনা। কিন্তু মূলপাঠে আপত্তি কিসের? 'দেবাসুরেঁ মহোদধি মথিল তোহ্মারে', 'কালি তোর মুখে দিল যশোদাএঁ তনে', 'বিধিএঁ গঢ়িল রাধা তোর দুঈ তনে' ইত্যাদি প্রয়োগের সাক্ষ্যে 'গোপীএঁ দামোদরে ডুবিআঁ মাইলেন্ত' প্রয়োগ অস্বাভাবিক নয়। মূলপাঠ গ্রহণ করলে প্রথম ছত্রটিতে ছন্দের সামান্য ত্রুটি থেকে যায়, সংশোধকের নির্দেশ মানলে দ্বিতীয় ছত্রের ছন্দ ঠিক থাকে না। সংশোধন করলেও ত্রুটি না করলেও ত্রুটি। তা ছাড়া, দ্বিতীয় লাইনে 'কাহ্নাঞি' শব্দটিকে সংশোধক নিতান্ত জোর করে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ছন্দ-অর্থ সব দিক দিয়েই শব্দটি বাহুল্য।

৮৯/২ পৃষ্ঠায় মূলপাঠ ছিল 'ব্রাহ্মণে বেদ ইন্দ্রে হরিব পানী।' পাঠে কিছুমাত্র গোলমাল নেই, অর্থও স্পষ্ট— 'ব্রাহ্মণে বেদ [এবং] ইন্দ্রে হরিব পানী'। ছন্দের সামান্য ত্রুটি আছে বটে কিন্তু তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু এই সুস্পষ্ট ছত্রটি প্রথম সংশোধকের পছন্দ হল না। তাঁর মনে হল 'বেদ'-এর পর একটি 'হরিবেক'-র অভাব আছে। এই অভাব তিনি পূরণ করে দিলেন তোলাপাঠে 'হরিবেক' বসিয়ে। প্রথম সংশোধক আর একটু সতর্ক হলে দেখতে পেতেন এই পদের প্রায় প্রত্যেকটি ছত্রে একটি 'হরিব'-ই ব্যবহৃত হয়েছে। যথা, 'কপিলা হরিব ক্ষীর সস্য বসুমতী'। অর্থাৎ কপিলা ক্ষীর হরিব, বসুমতী সস্য হরিব ; 'ঋষি তপ হরিবেক পণ্ডিত মতী'। অর্থাৎ ঋষি তপ হরিবেক, পণ্ডিত মতী হরিবেক ; 'পুত্রেঁ বাপ লংঘিব শিষ্য গুরুজনে' অর্থাৎ পুত্রেঁ বাপ লংঘিব, শিষ্য গুরুজনে লংঘিব ; 'সেবকেঁ লংঘিব প্রভু নারী নিজ পতী' অর্থাৎ সেবকেঁ প্রভু লংঘিব, নারী নিজ পতি লংঘিব। এই ছত্রগুলিতে সংশোধকের আপত্তি হল না, আপত্তি হল একটি ছত্রে। সংশোধক কবির প্রয়োগবিধি সতর্কতার সঙ্গে অনুধাবন না করেই নিজের যা মনে হয়েছে সেই অনুসারে সংশোধন করেছেন। তাঁর নির্দেশে পাঠ দাঁড়াল 'ব্রাহ্মণে বেদ হরিবেক ইন্দ্রে হরিব পানী'। বলা বাহুল্য, সংশোধনের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। যদি অসতর্কতাবশত সংশোধনটি করা হয়ে থাকে, গোটা পদটি পড়বার পরে সংশোধনটি কেটে দেওয়া উচিত ছিল। দ্বিতীয় সংশোধক যখন ছত্রটি পড়লেন তখন প্রথম সংশোধকের চাপান ভার কিছু হাল্কা করবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করলেন। 'ব্রাহ্মণে' শব্দটি দ্বিতীয় সংশোধকের পছন্দ হল না, শব্দটিকে তিনি

ঘসে তুলে ফেললেন[৩৮] এবং তোলাপাঠে লিখলেন 'ব্রহ্মা'। মূলের উপর প্রচণ্ড রকম হস্তক্ষেপ যাতে না হয় তাই মূলপাঠের 'ব্রাহ্মণে'-র ধ্বনিসাম্যে 'ব্রহ্মা' শব্দটি তাঁর মনে এল। দুজন সংশোধকের সংযোজন-পরিবর্জনের পরে পাঠ দাঁড়াল 'ব্রহ্মা বেদ হরিবেক ইন্দ্রে হরিব পানী'। কিন্তু 'ব্রহ্মা বেদ হরিবেক' অর্থ কি? সম্পাদক কোনো অর্থ দেন নি। 'হরিব' এই পদে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থ অনুমান করা শক্ত নয়। এই পদে 'হরিব' অর্থে 'হারাবে'। 'কপিলা হরিব ক্ষীর' অর্থে কপিলা গরু দুধ হারাবে অর্থাৎ কপিলা গাইতে দুধ থাকবে না; 'বসুমতী' শস্য হারাবে, ঋষি তপ হারাবে, পণ্ডিত 'মতী' হারাবে। অর্থাৎ বস্তু তার স্বভাব হারাবে। 'ব্রাহ্মণে বেদ হরিব' সেই অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছিল। দুগ্ধদান যেমন কপিলার স্বভাব, শস্য ফলান যেমন 'বসুমতী'র স্বভাব, তপস্যা যেমন ঋষির স্বভাব, 'মতী' যেমন পণ্ডিতের স্বভাব তেমনি বেদপাঠ ব্রাহ্মণের স্বভাব। কৃষ্ণ ভার বইলে ব্রাহ্মণে স্বভাব হারাবে অর্থাৎ বেদপাঠ বন্ধ করবে। বেদপাঠ যে ব্রাহ্মণের স্বভাব তা পুরাণ-সম্মত। মূলপাঠে এই অর্থ মনে রেখেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। সংশোধক অত তলিয়ে দেখলেন না। 'ব্রহ্মা' 'ব্রাহ্মণে'রই কাছাকাছি ভেবে তিনি সংশোধনটি করলেন। কিংবা, চতুরানন ব্রহ্মা থেকে চতুর্বেদের উৎপত্তি এই পৌরাণিক উপাখ্যানের কথা মনে রেখে হয়তো তিনি সংশোধনটি করেছিলেন। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বেদের উৎপত্তি বর্ণনা কবির অভিপ্রেত নয়। ব্রাহ্মণ স্বভাব হারাবে এইটিই কবির অভিপ্রেত। সমগ্র পদটির মধ্যে বিভিন্ন ছত্রে এই স্বভাব হারাবার কথাটির উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। সমগ্র পদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে গেলে 'ব্রাহ্মণে' পাঠই স্বীকার করতে হয়। 'ব্রহ্মা বেদ হরিবেক' পাঠ ধরলে যে অর্থ হয় না তা নয়, তাতে 'অঘটন' বা 'অলোকিক ক্রিয়া'র উপর জোর পড়ে। কবির তা অভিপ্রেত নয়। কবি স্বভাববিরুদ্ধতার উপর জোর দিয়েছেন, অলৌকিকত্বের উপর নয়। তাই মূলপাঠই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

বেশি দৃষ্টান্তের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। যে কয়েকটি সংশোধন পরীক্ষা করা হয়েছে আশা করি তাতেই মূল বক্তব্য স্পষ্ট হয়েছে। বিজনবাবু তাঁর প্রবন্ধেও অনেকগুলি সংশোধনের যাথার্থ্যে সংশয় প্রকাশ করেছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর মনে হয়েছে সংশোধক মূলের উপর কলম চালিয়েছেন। একটি জায়গায় সংশোধক যে কবির ছন্দের ছকটা ধরতে পারেন নি তাও বিজনবাবুর আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে (দ্র. পৃ. ২৩-২৪)।

৪

এখন মূল প্রশ্নে ফিরে যাওয়া যেতে পারে। তার আগে আলোচনা থেকে লব্ধ বিভিন্ন সূত্রগুলি একত্র করা প্রয়োজন। তোলাপাঠের সংশোধনগুলি লিপিকরের নয়। পাঁচ জন সংশোধক স্বাধীনভাবে গোটা পুঁথির পাঠ সংশোধন করেছেন। সংশোধনের সাহায্যে মূলপাঠের কয়েকটি নিঃসন্দিগ্ধ লিপিকর-প্রমাদ সংশোধিত হয়েছে। তবে লিপিকর-প্রমাদগুলি এমন স্পষ্ট যে তোলাপাঠে সংশোধন না করা হলেও বসন্তবাবু অনায়াসে সেগুলি সংশোধন করতে পারতেন। সংশোধকদের চোখ এড়িয়ে যে লিপিকর-প্রমাদগুলি মূলপাঠে রয়ে গিয়েছিল সেগুলি সংশোধন করতে বসন্তবাবুর বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। সংশোধনের ফলে মূলপাঠের ছন্দ অনেক জায়গায় উন্নত হয়েছে এ কথা যেমন সত্য তেমনি মূলপাঠ

বিকৃতও হয়েছে এবং ছন্দের অবনতিও হয়েছে। মূলপাঠের যেখানে লিপিকর-প্রমাদ নেই, ছন্দের ত্রুটি নেই, অর্থের ইতরবিশেষ নেই সেখানেও সংশোধকেরা মূলের উপর হস্তক্ষেপ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ৮/২ পৃষ্ঠায় 'দিল আলিঙ্গনে' কেটে 'কৈল আলিঙ্গনে'। ছন্দ ব্যাপারে সংশোধকদের নিজেদের মধ্যেও যে মতের মিল ছিল না তাও লক্ষ্য করা গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, সংশোধকদের কারও কাছে যে আদর্শ পুঁথি বা অপর কোনো পুঁথি ছিল এমন প্রমাণ নেই। সুতরাং তোলাপাঠের সমস্ত পাঠই সংশোধকদের অনুমিত পাঠ। এই অনুমিত পাঠের মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হবে ?

যেগুলি নিঃসন্দেহে লিপিকর-প্রমাদ-সংশোধন সেগুলি সম্বন্ধে কোনো সমস্যা নেই। সেগুলি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। যেখানে সংশোধনের ফলে মূলপাঠে ছন্দের উন্নতি বা অনিচ্ছাকৃত অবনতি ঘটেছে সেখানে কি কর্তব্য সেটাই সমস্যা। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিম্নরূপ।

সংশোধকদের সংশোধন সত্ত্বেও বহু ছন্দোদুষ্ট ছত্র পুঁথির মধ্যে রয়ে গেছে। তোলাপাঠের অনুমিত পাঠ দিয়ে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি ছত্রের ছন্দ সংশোধিত হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য আদর্শ পুঁথির পাঠ উদ্ধার করা। সেই পাঠে যদি ছন্দোদুষ্ট লাইন থাকে তা হলে সেই ছন্দোদুষ্ট লাইনটি আমাদের কাছে বেশি মূল্যবান এবং তার তুলনায় সংশোধকের অনুমিত পাঠের নির্দেশে গঠিত ছন্দ-অর্থে সুসঙ্গত লাইন মূল্যহীন। আমরা ধরে নিয়েছি বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায় ছন্দের ত্রুটি থাকতে পারে না; সুতরাং যেখানেই ছন্দের ত্রুটি পাচ্ছি এবং তোলাপাঠের সংশোধন পাচ্ছি সেখানেই লিপিকর-প্রমাদ অনুমান করে মূলপাঠের চেয়ে তোলাপাঠের গুরুত্ব স্বীকার করছি। এই স্বীকৃতির মূলে আছে চণ্ডীদাসের কাব্যখানিকে ছন্দঃসুসঙ্গত দেখবার প্রচ্ছন্ন প্রত্যাশা। কিন্তু চণ্ডীদাসের কাব্যে সঙ্গতি কোথায় ? বিষয়ে সঙ্গতি নেই, শ্লোকের সঙ্গে পদের সঙ্গতি নেই, ভাষায় সঙ্গতি নেই। এত রকমের অসঙ্গতির মধ্যে শুধুমাত্র ছন্দে সঙ্গতি থাকলেই কাব্যের অকৃত্রিমতায় সংশয় জাগত। সংশোধকদের এত চেষ্টা সত্ত্বেও কাব্যের মধ্যে ছন্দের যে ত্রুটি রয়ে গেছে আমরা সেগুলি সংশোধন করে দিচ্ছি না কেন ? কারণ, সে অধিকার আমাদের নেই। আমরা বড় জোর পাদটীকায় বলতে পারি আমাদের বিবেচনায় মূলপাঠ কি হওয়া উচিত। সংশোধকেরাও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথি সম্পাদনা করেছেন। তোলাপাঠ সেই প্রাচীন সম্পাদকদের পাদটীকা। তাঁরাও বলেছেন এখানে পাঠ এইরকম হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা তাঁদের পাদটীকাকে মূলপাঠের উপর মর্যাদা দিয়েছি। আমরা ধরে নিয়েছি তাঁরা বলেছেন পাঠ এই রকম ছিল। 'এই রকম ছিল' আর 'এই রকম হওয়া বাঞ্ছনীয়' কথা দুটির পার্থক্যের উপর আমরা গুরুত্ব দিই নি।

পুঁথি সম্পাদনার উদ্দেশ্য কবির মূল রচনার নিকটবর্তী হওয়া। ছন্দ-অর্থ-ভাব-ভাষায় সুসমঞ্জস একখানি কাব্য গড়ে তোলা সম্পাদনার উদ্দেশ্য অবশ্যই নয়। মূলপাঠে যখন দেখা যাচ্ছে ছন্দের গোলমাল যত্রতত্র তখন স্বীকার করতেই হবে যে-কারণেই হোক ছন্দের অসঙ্গতি এই পুঁথির (কাব্যের নয়) বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য স্বীকার করলে কবির ছন্দোনৈপুণ্যকে অস্বীকার করা হয় না, কারণ বর্তমান পুঁথি কবির স্বহস্তে লিখিত নয়। মূল কবির কাব্য আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছয় নি। পৌঁচেছে বর্তমান পুঁথি। এই পুঁথির সূত্র ধরে আদর্শ পুঁথিতে পৌঁছান আমাদের উদ্দেশ্য। মূল কাব্যে পৌঁছান অসম্ভব বলেই পরিত্যাজ্য। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তোলাপাঠের সংশোধন আদর্শ পুঁথিতে পৌঁছাবার অন্তরায়। ছন্দ-সংশোধনের নামে পাঁচ জন অজ্ঞাতনামা লোকের শতাধিক কাল্পনিক পাঠ মূলপাঠের সঙ্গে মিশে আদর্শ

পুঁথি থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। সংশোধকেরা একটা বিরাট ভুল করেছেন। তাঁরা সংশোধন করেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামক পঠনীয় কাব্যের, কবি লিখেছিলেন গেয় কাব্য। অবৃত্তি করতে গিয়ে এঁদের কানে যা ছন্দের ত্রুটি হয়ে লাগছে, কবির কাছে তা হয়তো ত্রুটি ছিল না। আমরাও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবৃত্তি করে পড়তে গিয়ে সংশোধকদের সমর্থন করে বলছি যথার্থই ছত্রটিতে ছন্দের ত্রুটি আছে। এ কথা ভাবছি না যে সংশোধকদের দশটি কানে এবং আমাদের সহস্র কানে যা ত্রুটি হয়ে বাজছে তা কবির কানে বাজে নি কেন? নিশ্চই কোথাও একটা ভুল ঘটে গেছে। আমরা নিজেদের ভুল এবং সংশোধকদের ভুল ধরতে না পেরে সমস্ত ভুলের বোঝা চাপাচ্ছি লিপিকরের উপর।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির তোলাপাঠের সংশোধন মূল্যহীন অবশ্যই নয়, তবে সেগুলির যথার্থ স্থান পাদটীকায়, মূলপাঠে নয়। ত্রুটি সংশোধনের অজুহাতে সংশোধকদের কাল্পনিক পাঠগুলি মূলপাঠের সঙ্গে মেশালে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের অনেকখানি আচ্ছন্ন করে ফেলা হয়।

---

১ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা', বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭০, পৃ. ২

২ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি পাঠ বিচার', সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকা, ৪৮ ভাগ, ৪ সংখ্যা, পৃ ২৩ শহীদুল্লাহ কয়েকটি জায়গায় বসন্তবাবুর পাঠের সমালোচনা করে যথার্থ পাঠ-উদ্ধারের সহায়তা করার পরিবর্তে বসন্তবাবুকে ভুলপথে পরিচালিত করেছেন। শহীদুল্লাহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি সযত্নে পড়েছিলেন কিনা জানি না, পড়লেও পুঁথির লিপি-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে তাঁর ধারণা ছিল না তার প্রমাণ একাধিক জায়গায় পাওয়া যায়। সবচেয়ে বিরক্তিকর এবং দুঃখকর ব্যাপার এই যে বসন্তবাবু ধীরে ধীরে ভুল-ভ্রান্তি কাটিয়ে বিশুদ্ধ পাঠ গড়ে তুলছেন এমন সময় শহীদুল্লাহ নির্দেশ করলেন বসন্তবাবুর পাঠ ঠিক নয়। বসন্তবাবুর বোধ হয় বিদেশী পাণ্ডিত্যের উপর মোহ ছিল তাই তিনি নিজের বিশুদ্ধ পাঠ পরিত্যাগ করে শহীদুল্লাহর বিকৃত পাঠ গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ *The Bengali Text Śrīkṛṣṇakīrtana: Palaeographic and Textual Problems*, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. xxxi, pt. 2. pp. 315-29

৩ বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক হলেও "৩" ও "ও"-র প্রশ্নটি ধরে আর-একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাই। সাময়িকভাবে ধরে নেওয়া যাক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির মূলপাঠ লিখেছেন দুজন লিপিকর। বসন্তবাবু অবশ্য বলেছেন লিপিকর তিনজন। কিন্তু তৃতীয় লিপিকরের অস্তিত্ব এখনও অপ্রমাণিত। তৃতীয় লিপিকর যে দুটি পাতা লিখেছেন বলে অনুমান করা হয়েছে লিপিগত বা লিখনগত কোন্ বৈশিষ্ট্যে এই পাতা দুটি অন্য পাতাগুলি থেকে স্বতন্ত্র তা কেউ স্পষ্ট করে বলেন নি। সুতরাং তৃতীয় লিপিকরের প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া যাক এবং আপাতত মনে করা যাক লিপিকর দুজন। এই দুইজন লিপিকরের একজন সর্বত্র "৩" লিখেছেন। অপরজন সম্বন্ধে যদি বলি তিনি "৩" ও "ও" দুইই ব্যবহার করেছেন তা হলে সত্য বলা হল বটে কিন্তু সব বলা হল না। সেই সঙ্গে এ কথাও বলা কর্তব্য যে প্রথম লিপিকর অধিকাংশ ক্ষেত্রে "ও" লিখেছেন, "৩" লিখেছেন মাত্র ১৩টি জায়গায়। এই ১৩টি জায়গার দুটি জায়গায় সংখ্যা-শব্দটি লেখা হয়েছে দুই-দাঁড়ির বিরাম-চিহ্নের উপর। সুতরাং এ-দুটি সংশোধকের সংযোজন হতে বাধা নেই। তোলাপাঠে "৩" সংখ্যা-শব্দ লিখবার প্রয়োজন ঘটেছে ১৪টি জায়গায়; তার মধ্যে দুটি জায়গায় "ও", বাকী "৩"। এই তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান বোধ হয় অন্যায় হবে না যে প্রথম লিপিকর স্বভাবত "ও" লিখেছেন, দ্বিতীয় লিপিকর স্বভাবত "৩" লিখেছেন, সংশোধক (এক বা একাধিক) স্বভাবত "৩" লিখেছেন।

এখন অনুসন্ধানে যদি প্রমাণ হয় "ও" প্রকৃতই প্রাচীন এবং "৩" আধুনিক তা হলে সেই প্রমাণের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির লিপিকাল সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। "ও"-র সংখ্যা গরিষ্ঠতাই একটি প্রমাণ যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথি "ও"-যুগ এবং "৩" যুগের সন্ধিক্ষণে লিখিত। এই সন্ধিক্ষণে "ও"-ও সম্পূর্ণ অপ্রচলিত হয় নি, প্রাচীনপন্থীরা "ও" লিখেছেন; আবার "৩"-র প্রতিষ্ঠাও সম্পূর্ণ হয় নি। তবে এই যুক্তি-সিদ্ধান্তের সমস্তটাই নির্ভর করছে "ও"-র ব্যবহারের ইতিহাসের উপর। "ও"-র ব্যবহারকে নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে ধরতে পারলেই তবেই এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য।

৪ ৫৭।১ পৃষ্ঠায় 'বাণ'-র সংশোধিত রূপ 'বারণ', ৭২।২ পৃষ্ঠায় 'ভাবে'-র সংশোধিত রূপ 'পাপে', ১০২।১ পৃষ্ঠায় 'সরোঅরময়ী'-র

সংশোধিত রূপ 'সরোবরময়ী'। সম্পাদক এই তিনটি ক্ষেত্রে সংশোধিত পাঠ পরিত্যাগ করে মূলপাঠ গ্রহণ করেছেন। ৫৬/২ পৃষ্ঠায় পুঁথির ডানদিকে মার্জিনে 'রা' লেখা হয়েছে। সম্পাদক সেটিও পরিত্যাগ করেছেন।

৫ মূলপাঠ 'রাজা তুরুবার পাটে আতি তুরুবার'

৬ মূলপাঠ 'না তুলিহ জলের ভিতর'

৭ এই পৃষ্ঠায় 'হোর সব সখিজন দেখে তাক মোর ডর' ছত্রটির 'সখিজন'-র পরে ছাড় চিহ্ন আছে কিন্তু তোলাপাঠে কোনো সংশোধন নেই। সম্ভবত সংশোধক এই স্থানেও 'কাহাঞিঁ ল' সংযোজন করতে চেয়েছিলেন। বসন্তবাবু [কাহাঞিঁ ল] বসিয়ে দিয়েছেন।

৮ তোলাপাঠে 'ডরে' লেখা আছে কিন্তু ছত্রটির ঠিক কোন্ জায়গায় সংশোধনটি বসবে তার নির্দেশ নেই। বসন্তবাবু 'নাহে'-র পর বসিয়েছেন। কিন্তু শব্দটি সংশোধকের নির্দেশে এখানে বসে নি, সম্পাদকের নির্দেশ বসেছে।

৯ মূলপাঠ 'যোগী যোগ চিন্তে বেহ্নে'

১০ মূলপাঠ 'তথা তোর মনোরথ হুয়িব সকল'; এটিকে ঠিক সংশোধন বলা যায় না। 'সফল' লিখতে গিয়ে লিপিকর 'সকল' লিখে ফেলেছিলেন। ভুল করেই লিখেছিলেন। তাই 'ক' অক্ষরটিকে তিনি 'ফ' করবার চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টার ফল আশানুরূপ না হওয়ায় মনে হয় তোলাপাঠে 'ফ' লেখা হয়েছে। এই 'ফ'টি খুব সম্ভব লিপিকরের নিজের হাতের লেখা। মূলপাঠে 'সকল'-র 'ক' অক্ষরটি খুবই অস্পষ্ট, অক্ষরটিকে অন্য অক্ষরে রূপান্তরিত করবার চেষ্টার ফলেই এই অস্পষ্টতা এসেছে। সংশোধক মূলপাঠের কোনো অক্ষরকে পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয় না। তিনি অক্ষর বর্জন করে মূলপাঠে সংশোধন লিখেছেন। 'ফ' অক্ষরটি দেখে বলা শক্ত অক্ষরটি লিপিকরের বা সংশোধকের। তবে অক্ষরটি যদি সংশোধকের লেখা হয়ে থাকে তা হলে তা প্রথম সংশোধকের। সেই কারণে এটি এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে অক্ষরটি সম্বন্ধে যে অনিশ্চয়তা আছে তা স্মরণ রাখা দরকার।

১১ সংশোধক সম্ভবত 'বোলো' লিখেছিলেন, পরে দুটি 'ে-কার' কেটে দিয়ে শব্দটিকে 'রাধা'-য় রূপান্তরিত করেছেন। এই একটিমাত্র জায়গায় সংশোধনের সংশোধন পাওয়া যাচ্ছে।

১২ মূল পাঠ 'কি মোর বসতী আশে'

১৩ 'তোক' ছত্রটির কোন্ শব্দের পরে বসবে সে সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ দেওয়া নেই। সম্পাদক 'বারেঁ'-র পর শব্দটির স্থান করে দিয়েছেন।

১৪ মূলপাঠ 'এবেঁ সরস করহ আদেশ'

১৫ মূলপাঠ 'না বোল···নিরাস'; এখানে মূলপাঠে 'না বো'-র পরে এবং 'নিরাস'-র আগে পাঁচ অক্ষরের এক বা একাধিক শব্দ ছিল। শব্দটি বা শব্দ কটি ঘসে তুলে ফেলবার চেষ্টা করা হয়েছে, তার ফলে 'বোল'-র 'ল' অক্ষরটিও লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরে অক্ষরটির উপর চার-পাঁচ বার কলম বুলিয়ে পুনর্লিখিত হয়েছে। 'বোল' এবং নিরাস'-র মধ্যে খানিকটা জায়গা মসীলিপ্ত হয়ে আছে।

১৬ 'দেশাগ রাগঃ'-র পর ছাড় চিহ্ন!

১৭ মূলপাঠ 'ঘন ঘন দিল আলিঙ্গনে'

১৮ মূলপাঠে রাগ-তালের উল্লেখ নেই।

১৯ মূলপাঠ 'মথুরাক বিকে যাহা রঙ্গে'। 'মথুরাক'-র পর ছাড়-চিহ্ন বসিয়ে তোলাপাঠে 'যাসি' লেখা হয়েছে এবং 'যাহা রঙ্গে' কেটে দেওয়া হয়েছে।

২০ মূলপাঠে রাগের উল্লেখ নেই

২১ মূলপাঠ 'কেহ্নে করহ হেন পড়িহাসে'

২২ মূলপাঠ 'সাঙ্কুলী ভাঁগসি মোর ছিণ্ডিবোঁ হার'

২৩ মূলপাঠ 'আঙ্কোত আধি কোণ দেহ আছে'

২৪ মূলপাঠে রাগ-তালের উল্লেখ নেই।

২৫ রাগটি কোথায় বসবে বলা হয় নি। পুঁথির এই পাতায় 'মল্লার রাগঃ' ও 'বরাড়ী রাগ'-র উল্লেখ আছে। সম্ভবত সংশোধক 'বরাড়ী রাগঃ'-র পরিবর্তে 'কানড়া রাগঃ'-র ব্যবহার দেখতে চান।

২৬ মূলপাঠের শব্দটি ঘসে তুলে ফেলা হয়েছে। লুপ্তাংশ দেখে সহজেই বোঝা যায় মূলে 'ব্রাহ্মণ' ছিল।

২৭ মূলপাঠ 'রূপার ভাণ্ডত খাঁ'; 'ভাণ্ডত'-র 'ত' কেটে 'ণ্ড'-তে 'ে-কার' যোগ করা হয়েছে।

২৮ মূলপাঠ 'ভাবে মজিলা দেবরাজ'; 'ভাবে' কাটা হয় নি। তবে 'ভাবে'-র উপরেই 'পাশে' লেখা হয়েছে।

২৯ মূলপাঠ 'পাঙ্ক সঙ্গতি কাহ্ন করিল আহ্বার'

৩০ মূলপাঠ 'হাথ দিতেঁ নিহে কণিআঁ'। বসন্তবাবু পাঠ ধরেছেন 'হাথ দিতেঁ লিহে কলিআঁ'। এখানে 'লি' নেই 'ণি' আছে। বসন্তবাবু আরও অনেকগুলি জায়গায় ণি/লি-র গোলমাল করেছেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে আমার পূর্ব-উল্লিখিত প্রবন্ধে।

৩১ মূলপাঠে 'সুন্দরী রাধা ল সারোঅরময়ী'

৩২ মূলপাঠ 'কেমনে সহিব আর হেন নারী জনে'

৩৩ মূলপাঠে তাল অনুল্লিখিত।

৩৪ মূলপাঠে 'বড়ার বহুআরী তোহ্মে'-র পর পুঁথির পাতা শেষ হয়েছে (পৃ ২০২।২) 'হনের রাণী' নূতন পাতায় লেখা হয়েছে। (২০৩।১)। পুঁথির পাতা পরিবর্তনের জন্যই বোধ করি লিপিকর 'আইহনের'-র 'আই-' ছেড়ে গিয়েছিলেন।

৩৪ক মূলপাঠ 'ইতি যমুনান্তর্গত হারখণ্ডঃ'

৩৫ মূলপাঠ 'করিলোঁ খণ্ডব্রত'

৩৬ মূলপাঠ 'পুরুব কালের পাতে না রুই মুলে'। তবে মূলপাঠে 'রুই' ছিল কি 'রুহ' ছিল বলা শক্ত। 'রুহ'-র 'হ'-র উপর চৈতনটি সংশোধনের যোজনা হতে পারে। তা হলে মূলপাঠ ছিল 'রুহ', সংশোধক 'হ'-কে 'ই' করেছেন এবং 'হ' লিখেছেন তোলাপাঠে। তার ফলে পাঠ দাঁড়িয়েছে 'রুইহ'।

৩৭ মূলপাঠ 'শোণিতপুর গিআঁ বধিবোঁ বাণ'; তোলাপাঠের সংশোধন 'ব' বা 'র' সে সম্বন্ধে পুঁথির ছবি দেখে নিঃসংশয় হতে পারি নি। এই সংশোধক অন্যত্র 'র' লিখেছেন, তাদের সঙ্গে তুলনায় বর্তমান সংশোধনটিকে 'ব'-ই বলতে হয়। এবং শব্দটি 'বারণ' না হয়ে 'বাবণ' হয়। সম্পাদক অবশ্য 'র'-ই পড়েছেন।

৩৮ মূলপাঠ 'কাড়ড়ি খোঁপা বড়ায়ি মোর দুঈ তন'

৩৯ মূলপাঠে 'মো' অক্ষরটি কোনো কারণে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে তোলাপাঠে স্পষ্ট করে আবার লেখা হয়েছে।

৪০ মূলপাঠ 'চরণে ধর তোরে ল'

৪১ অর্থসঙ্গতির জন্য এই সংশোধনটি 'ঘর' পড়তে হয়। বসন্তবাবু প্রথমে 'সর' পড়েছিলেন। তিনি কিছুই অন্যায় করেন নি। 'সর' পড়াই স্বাভাবিক। অর্থের ও ব্যাকরণের মুখ চেয়ে 'ঘর' পড়তে হয়। প্রসঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে না পড়লে আমার দৃঢ় ধারণা প্রত্যেকেই অক্ষরটি 'স' পড়বেন। এই সংশোধক অন্যত্র 'স' বা 'ঘ' লেখেন নি। সুতরাং তাঁর কলমে অক্ষর দুটির পার্থক্য কিভাবে ফুটে ওঠে তা তুলনা করে দেখবার উপায় নেই। প্রসঙ্গানুসারে 'ঘ' হলে ভালো হয়, লিপির দিক থেকে 'স' পড়াই সঙ্গত। দ্র. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা', পৃ ৪২।

৪২ 'নারী'-র 'না' অক্ষরটি অস্পষ্ট হওয়ার জন্য তোলাপাঠে লেখা হয়েছে। এই সংশোধক অস্পষ্ট অক্ষরকেও স্পষ্ট করেছেন।

৪৩ 'নেহার' 'া-কার' এবং 'র' তোলাপাঠে নয়, মূলপাঠে দুটি লাইনের ফাঁকের মধ্যে লেখা হয়েছে।

৪৪ মূলপাঠ 'তথাক না লইহ সংকতী'

৪৫ মূলপাঠ 'আহ্মা ভাণ্ডিবারে কেহ্নে পাত উপকার'

৪৬ মূলপাঠ 'পরিহাসেঁ মাইলোঁ তোকে প্রাণে মার রাধা'

৪৭ সংশোধনের পাশে ছত্রসংখ্যা দেওয়া আছে ১; কিন্তু সংশোধনটি বসেছে পুঁথির তৃতীয় ছত্রে, ছাড়-চিহ্নও তৃতীয় ছত্রে।

৪৮ মূলপাঠ 'ইত্থং কৃষ্ণগতপ্রাণা'

৪৯ মূলপাঠে 'নীল জলদ সম নেহা' লেখা হয়েছিল, পরে 'নেহা'-র 'ন'-কে 'দ' করবার চেষ্টা হয়েছিল। তার ফলে মূলে 'দ' ও 'ন' মিলে একটা গোলোযোগ পাকিয়ে গেছে। তাই তোলাপাঠে 'দ'। এই বিবরণ থেকে মনে হতে পারে তোলাপাঠের সংশোধন লিপিকরকৃত। কারণ মূলপাঠের অক্ষর পরিবর্তন কেবলমাত্র লিপিকরই করেছেন। আর লিপিকর কি শুধু অক্ষরের গোল পাকিয়েই রেখে দেবেন, তোলাপাঠে স্পষ্ট করে লিখবেন না? সে বিচারে তোলাপাঠের 'দ' লিপিকরের লেখা মনে হতে পারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় লিপিকর বিবিধ প্রকার 'দ' লিখেছেন কিন্তু কোনোটিরই তোলাপাঠের এই 'দ'-র সঙ্গে মিল নেই। চতুর্থ সংশোধক লিখিত অন্যান্য অক্ষরের গানের সঙ্গে 'দ'-মিল আছে।

৫০ মূলপাঠ 'ফুরাঁআ না দেহ তোহ্মে তেসি এখো কাজ'

৫১ মূলপাঠে 'তবেসি ম'-র পরে পুঁথির পাতা শেষ হয়েছে, নূতন পাতায় 'র মোর দুখ পালাএ' দিয়ে শুরু হয়েছে। পুঁথির পাতা পরিবর্তনের ফলে 'ন' লিখতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। পরে তোলাপাঠে লিখে দেওয়া হয়েছে।

৫২ মূলপাঠ 'সাহুড়ীর বোলে ডরায়িলী রাহী'। তোলাপাঠের 'হু' এবং মূলপাঠের 'হু' সম্পূর্ণ এক নয় বটে, কিন্তু তোলাপাঠের 'হু' মূলপাঠে যে লেখা হয় নি তা নয়। তা ছাড়া 'হুনি'-র অন্য অক্ষরগুলির সঙ্গে মূলপাঠের অক্ষরের হুবহু মিল।

৫৩ মূলপাঠে 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে'

৫৪ মূলপাঠে 'মা···' লেখা হলে পুঁথির পাতা শেষ হয়েছে। শব্দটি সম্পূর্ণ করবার জন্য 'ণিকেঁ' তোলাপাঠে লেখা হয়েছে।

৫৫ এ প্রসঙ্গে আর-একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। প্রথম সংশোধকের বিবেচনায় ১৭১।১ পৃষ্ঠার 'আইস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ' লাইনটির ছন্দ নির্দোষ নয়, তাই তোলাপাঠে 'মোর' বসাবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেছেন। ঠিক এই লাইনটি ১৯৩।১ পৃষ্ঠায় চতুর্থ সংশোধক পড়লেন, কিন্তু লাইনটিতে ছন্দের কোনো ত্রুটি তিনি লক্ষ্য করলেন না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ছন্দ সম্পর্কে সংশোধকদের নিজেদের মধ্যে মতের মিল নেই। অর্থাৎ ছন্দ-সংশোধনের অনিবার্য প্রয়োজনে সংশোধনগুলি করা হয়েছে এমন নয়। সংশোধকদের নিজস্ব মতামতানুযায়ীই সংশোধনগুলি হয়েছে।

৫৬ পুঁথিতে 'আতি কঠিনী কুচ মাঝা মাঝা থিনী দেহা' ছিল। 'কঠিনী' সম্ভবত 'থিনী'-র প্রভাবে লেখা হয়েছিল। দুটি 'মাঝা'-র প্রথমটি লিপিকর নিজেই কেটে দিয়েছিলেন। একটি 'মাঝা' কেন কাটা হয়েছে তার কারণ দেখিয়ে বিজনবাবু বলেছেন "মনে হয়, লিপিকর যে আদর্শ পুঁথি দেখিয়া নকল করিয়াছিলেন তাহার পাঠে 'মাঝা' শব্দটি একবারই ছিল। ছন্দের বিচারে তাহাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। অর্থের দিক দিয়াও দুটি 'মাঝা'-কে সমর্থন করা যায় না।" একটি 'মাঝা' কেটে দেওয়ার কারণ অনুসন্ধানে আদর্শ পুঁথি, ছন্দ ও অর্থের প্রসঙ্গ উত্থাপনের কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ অতিশয় স্পষ্ট। পুথির মাঝখানে চতুষ্কোণ খানিকটা জায়গা ফাঁক রাখা হয়। এই ফাঁকা জায়গাটির মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র-পথে দড়ি ঢুকিয়ে পুঁথির পাতাগুলি বাঁধবার রীতি। প্রথম 'মাঝা'টি ভুল করে এই ফাঁকা জায়গায় লেখা হয়ে গিয়েছিল তাই এটি কেটে দিয়ে পরিমিত ফাঁক রেখে পরে দ্বিতীয়বার লেখা হয়েছে।

৫৭ মূলপাঠের 'ডুবিআঁ'-কে 'ডুবাআঁ' করেছেন বসন্তবাবু। 'ডুবাআঁ' সম্পর্কে সংশোধকের কোনো আপত্তি ছিল না।

৫৮ শব্দটি মূলপাঠ থেকে ঘসে ঘসে তুলে ফেলবার চেষ্টা করা হলেও মূলে যে 'ব্রাহ্মণে' ছিল তা সহজেই পড়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্র

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

১

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদক-জীবনের ইতিহাস ব্যাপ্তির দিক থেকে যেমন দীর্ঘ গুরুত্বের দিক থেকেও তেমনি মূল্যবান। সাধনা ভারতী নবপর্যায়-বঙ্গদর্শন ভাণ্ডার ও তত্ত্ববোধিনী— মুখ্যতঃ এই পত্রিকা পাঁচটি তিনি সম্পাদন করেছিলেন। এ ছাড়া কোনো কোনো পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে নাম না থাকলেও সম্পাদন-কর্মে তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল। এই শ্রেণীর পত্রিকাগুলির কথা ধরলে তাঁর সম্পাদক-জীবনের ইতিহাস দীর্ঘতর হবে।

বর্তমান নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত সাময়িকপত্রের বিস্তৃত বিবরণ দানের চেষ্টা করা হয়েছে। এই বিবরণের মধ্যে থেকে নিম্নোক্ত উপাদান ও তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায়।

ক. রবীন্দ্রনাথ-স্বাক্ষরিত বহু রচনার সন্ধান পাওয়া যাবে যা রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে নেই। এই শ্রেণীর রচনাগুলি ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ হয়ে আসছে, কারণ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পুরাতন পত্রিকার যে খণ্ড-খণ্ড ফাইল আছে সেগুলির অবস্থা নিতান্ত জীর্ণ এবং খণ্ডিত। অনেক পত্রিকার কভার নামপত্র সূচীপত্র শেষ পৃষ্ঠা ইত্যাদি বিনষ্ট হয়েছে।—

$ক_১$ সম্পাদকীয় মন্তব্য বা প্রবন্ধ।

$ক_২$ সাময়িকসাহিত্য সমালোচনামূলক নিবন্ধ।

$ক_৩$ প্রসঙ্গকথা বা সমকালীন সমাজনীতি রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ। এই পর্যায়ের অনেকগুলি রচনা বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম খণ্ডের পরিশিষ্টে সংগৃহীত হয়েছে।

খ. সম্পাদিত পত্রিকায় গ্রন্থ-সমালোচকরূপে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন কোন্ কোন্ গ্রন্থ সমালোচনা করেন।

গ. সাময়িকসাহিত্য সমালোচন বিভাগে সমকালীন কোন্ কোন্ পত্রিকার কোন্ কোন্ সংখ্যা আলোচনা করেন।

ঘ. সম্পাদকের লেখা কি কি রচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ঙ. পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনার প্রকাশকাল।

চ. পত্রিকার পাঠের সঙ্গে গ্রন্থ ভুক্ত পাঠের তুলনা।

ছ. কোনো কোনো রচনা সম্পাদক কেন লিখেছেন তার কিছু সমসাময়িক ইতিহাস।

জ. রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত তাঁর পত্রিকায় অপর লেখক কারা ছিলেন (যাঁদের নাম পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা যায়)।

ঝ. তাঁদের কি ধরনের লেখা প্রকাশিত হত।

ঞ. ভাণ্ডার পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় সম্পাদক যে প্রশ্নগুলি প্রকাশ করতেন সেগুলির মধ্যে থেকে রবীন্দ্রনাথ সে সময় কত বিবিধ বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন— তার সন্ধান।

ট. সমকালীন পত্রপত্রিকার দৃষ্টিতে রবীন্দ্র-সম্পাদিত পত্রিকা।

ঠ. রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকার বৈশিষ্ট্য।

ড. পত্রিকা-সম্পাদনে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট রীতি ও প্রবণতা।

এতদ্‌ব্যতীত প্রাসঙ্গিক আরো কিছু কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

২

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ও কৈশোরে অনেক পত্রপত্রিকা পাঠ করেছিলেন— কোনোটি প্রকাশ্যে কোনোটি বা অভিভাবকদের অলক্ষ্যে। বালকবয়সে পত্রপত্রিকা-পাঠে আগ্রহ পরবর্তীকালে পত্রপত্রিকা-সম্পাদনে তাঁকে অবশ্যই কোনো না কোনো ভাবে প্রভাবিত করে থাকবে। বাল্যকালে পঠিত পত্রিকাগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্যের মধ্যে কয়েকটি তাঁর রচনাবলী থেকে এখানে সংকলন করা গেল। স্বসম্পাদিত পত্রিকা সম্পর্কেও কিছু মন্তব্য সংগৃহীত হল :

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ-সংগ্রহ বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো একভাগ মেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমিমৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।

এই ধরনের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন। একদিকে বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান পুরাতত্ত্ব, অন্যদিকে প্রচুর গল্প কবিতা ও তুচ্ছ ভ্রমণকাহিনী দিয়া এখনকার কাগজ ভরতি করা হয়। সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না। বিলাতে চেম্বার্স জার্নাল, কাস্‌ল্‌স্‌ ম্যাগাজিন, স্ট্রাণ্ড্‌ ম্যাগাজিন প্রভৃতি অধিকসংখ্যক পত্রই সর্বসাধারণের সেবায় নিযুক্ত। তাহারা জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সমস্ত দেশকে নিয়মিত মোটা ভাত মোটা কাপড় জোগাইতেছে। এই মোটা ভাত মোটা কাপড়ই বেশির ভাগ লোকের বেশি মাত্রায় কাজে লাগে।

বাল্যকালে আর-একটি ছোটো কাগজের পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম। তাহার নাম অবোধবন্ধু। ইহার আবাঁধা খণ্ডগুলি বড়দাদার আলমারি হইতে বাহির করিয়া তাঁহারই দক্ষিণদিকের ঘরে খোলা দরজার কাছে বসিয়া বসিয়া কতদিন পড়িয়াছি।...

অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরও বেশি দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, এখন যে-খুশি সেই অনায়াসে একেবারে এক গ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া— তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর-কেহ পাইবে না।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ সে-সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড়ো করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত।

—জীবনস্মৃতি, ঘরের পড়া

বঙ্গদর্শন প্রকাশ হইবার বহু পূর্বে কিছুকাল ধরিয়া অবোধবন্ধু-নামক একটি মাসিকপত্র বাহির হইত। তখন বর্তমান লেখক বালক-বয়স-প্রযুক্ত নিতান্ত অবোধ ছিল। কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্তি-সহকারে যখন বোধোদয় হইল তখন উক্ত কাগজ বন্ধ হইয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে পত্রগুলি কতক বাঁধানো কতক বা খণ্ড আকারে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আলমারির মধ্যে রক্ষিত ছিল। অনেক মূল্যবান গ্রন্থাদি থাকাতে সে আলমারিতে চপলপ্রকৃতি বালকদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ ছিল। এক্ষণে নির্ভয়ে স্বীকার করিতে পারি, অবোধবন্ধুর বন্ধুত্ব-প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সে নিষেধ লঙ্ঘন করিয়াছিলাম। এই গোপন দুষ্কর্মের জন্য কোনোরূপ শাস্তি পাওয়া দূরে থাক্, বহুকাল ধরিয়া যে আনন্দলাভ করিয়াছিলাম তাহা এখনো বিস্মৃত হই নাই।···

এই ক্ষুদ্র পত্রে যে-সকল গদ্যপ্রবন্ধ বাহির হইত, তাহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব ছিল। তখনকার বাংলা গদ্যে সাধুভাষার অভাব ছিল না, কিন্তু ভাষার চেহারা ফোটে নাই। তখন যাঁহারা মাসিকপত্রে লিখিতেন তাঁহারা গুরু সাজিয়া লিখিতেন— এইজন্য তাঁহারা পাঠকদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন নাই এবং এইজন্যই তাঁহাদের লেখার যেন একটা স্বরূপ ছিল না। যখন অবোধবন্ধু পাঠ করিতাম তখন তাহাকে ইস্কুলে পড়ার অনুবৃত্তি বলিয়া মনে হইত না। বাংলা ভাষায় বোধকরি সেই প্রথম মাসিকপত্র বাহির হইয়াছিল যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদ-বৈচিত্র্য পাওয়া যাইত। বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রাণসঞ্চারের ইতিহাস যাঁহারা পর্যালোচনা করিবেন তাঁহারা অবোধবন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের প্রভাতসূর্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।

—আধুনিক সাহিত্য, বিহারীলাল

তখন 'বঙ্গদর্শন'এর ধুম লেগেছে— সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মতো আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল, কী হবে, দেশসুদ্ধ সবার এই ভাবনা।

'বঙ্গদর্শন' এলে পাড়ায় দুপুরবেলায় কারও ঘুম থাকত না। আমার সুবিধে ছিল, কাড়াকাড়ি করবার দরকার হত না— কেননা, আমার একটা গুণ ছিল— আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম; আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বউঠাকরুণ ভালোবাসতেন।

—ছেলেবেলা

এবার ষোলো বছর বয়সের হিসাব দিতে হচ্ছে। তার আরম্ভের মুখেই দেখা দিয়েছে 'ভারতী'। আজকাল দেশে চার দিকেই ফুটে ফুটে উঠছে কাগজ বের করবার টগ্‌বগানি। বুঝতে পারি সে নেশার জোর, যখন ফিরে তাকাই সেদিনকার খ্যাপামির দিকে। আমার মতো ছেলে যার না ছিল বিদ্যে, না ছিল সাধ্যি, সেও সেই বৈঠকে জায়গা জুড়ে বসল, অথচ সেটা কারও নজরে পড়ল না— এর থেকে

জানা যায়, চার দিকে ছেলেমানুষি হাওয়ার যেন ঘুর লেগেছিল। দেশে একমাত্র পাকা হাতের কাগজ তখন দেখা দিয়েছিল 'বঙ্গদর্শন'।

—ছেলেবেলা

এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। এই আর-একটা আমাদের পরম উত্তেজনার বিষয় হইল। আমার বয়স তখন ঠিক ষোলো। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না।

—জীবনস্মৃতি, ভারতী

ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমল-এর মাঝখানে বালক নামক একখানি মাসিকপত্র এক বৎসরের ওষধির মতো ফসল ফলাইয়া লীলাসম্বরণ করিল।

বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করিবার জন্য মেজবউঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু, শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় কাগজ চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।

—জীবনস্মৃতি, বালক

আমাদের হিতবাদী বলে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরোচ্চে।··· কৃষ্ণকমলবাবুকে প্রধান সম্পাদক, আমাকে সাহিত্যবিভাগের সম্পাদক এবং মোহিনীকে রাজনৈতিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে। বঙ্কিম, রমেশ দত্ত প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল লোক লেখায় যোগ দিতে রাজি হয়েচেন।

—বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ শ্রাবণ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত পত্র

সোনার তরী কবিতাগুলি প্রায় সাধনা পত্রিকাতেই লিখিত হইয়াছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ তিন বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন— চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূর্ণ ভার আমাকে লইতে হইয়াছিল। সাধনা পত্রিকায় অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণে ছিল।···

সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। যাঁহারা ইহার জন্মদাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকমলবাবু, সুরেন্দ্রবাবু, নবীনচন্দ্র বড়ালই প্রধান ছিল। কৃষ্ণকমলবাবুও সম্পাদক ছিলেন। সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটগল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত ওইখানেই, ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।

সাধনা চারি বৎসর চলিয়াছিল। বন্ধ হওয়ার কিছুদিন পরে এক বৎসর ভারতীর সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষেও গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ কতকগুলি লিখিতে হয়।

আমার পরলোকগত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বিশেষ অনুরোধে বঙ্গদর্শন পত্র পুনরুজ্জীবিত করিয়া তাহার সম্পাদনভার গ্রহণ করি। এই উপলক্ষে বড় উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হই।···

বঙ্গদর্শন পাঁচ বৎসর চালাইয়া তাহার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়াছি।

—আত্মপরিচয় পরিশিষ্ট, পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্র

৩

১২৮৪ সালে (ইং ১৮৭৭) রবীন্দ্রনাথের ষোল বৎসর বয়সের সময় ঠাকুর-পরিবার থেকে প্রথম মাসিক পত্র ভারতী প্রকাশিত হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায়। রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকে জানা যায় তিনি এই পত্রিকার জন্মকাল থেকেই এর সম্পাদকচক্রের বাইরে ছিলেন না।[১] ১২৯২এ (ইং ১৮৮৫) প্রকাশিত জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত বালক নামক মাসিক পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথকে অনেক রচনার ভার গ্রহণ করতে হয়েছিল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সম্পাদিত সাপ্তাহিক হিতবাদী (১২৯৮ সাল, ইং ১৮৯১) পত্রের সাহিত্য অংশ রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন সম্পাদন করেছিলেন বলে তাঁর লেখা থেকে জানা যাচ্ছে। মাসিকপত্রিকা সাধনা প্রকাশিত হয় ১২৯৮এর অগ্রহায়ণে (ইং ১৮৯১), সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই মুখ্যতঃ পত্রিকাটির পরিচালনভার গ্রহণ করেন। শুধু গল্প কবিতা প্রবন্ধ নয়, পত্রিকার নিয়মিত বিভাগগুলিও তাঁর রচনাতেই পূর্ণ থাকত। পত্রিকার সূচীতে এই সকল রচনার পাশে রবীন্দ্রনাথের নাম মুদ্রিত আছে। ১৩০১এর অগ্রহায়ণে রবীন্দ্রনাথ সাধনার সম্পাদক হন। রবীন্দ্র-সম্পাদিত সাধনা পত্রিকায় লেখকগণের নাম অপ্রকাশিত রাখা হয়। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অপর লেখকের খুব কম রচনা এ বছরের সাধনায় প্রকাশিত হয়েছে। অনেকগুলি সংখ্যা শুধু রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই পূর্ণ থাকত বলা চলে। সূচীপত্রে বা পত্রিকার মধ্যে লেখক হিসেবে সম্পাদকের নাম পুনঃপুনঃ মুদ্রিত করতে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ কুণ্ঠা বোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে যে তাঁর সম্পাদিত সাধনায় অধিকাংশ লেখা লিখতে হত এবং অন্য লেখকদের রচনা যে বহুল পরিমাণে সংশোধন করতে হত— তা তাঁর উক্তি থেকেই আমরা জেনেছি। এখানে রবীন্দ্র-সম্পাদিত সাধনা পত্রিকার প্রতি সংখ্যার বিবরণ প্রথমে দেওয়া হল :

অগ্রহায়ণ ১৩০১। সাধনা (কবিতা), প্রায়শ্চিত্ত (গল্প), পঞ্জিকার ভ্রম (প্রবন্ধ), সুবিচারের অধিকার (সাময়িক প্রবন্ধ), স্বরলিপি [তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ], বোম্বায়ের রাজপথ (বর্ণনাধর্মী প্রবন্ধ), কাব্যের তাৎপর্য (প্রবন্ধ), কেরাণী (কবিতা), ফুলজানি (শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত ফুলজানি গ্রন্থের সমালোচনা), বুদ্ধের সিদ্ধিলাভ (প্রবন্ধ), আর্য-গাথা (দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত আর্যগাথা ২য় ভাগ গ্রন্থের সমালোচনা), গ্রন্থ সমালোচনা (ক. ভক্তচরিতামৃত— অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, খ. রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত— অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, গ. চরিত রত্নাবলী ১ম ভাগ— কালীচন্দ্র ঘোষাল, ঘ. অর্থই অনর্থ— প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ঙ. ঠগী কাহিনী— প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়)

পৌষ ১৩০১। বিচারক (গল্প), আগ্রা (D ans L' Inde নামক ফরাসী ভ্রমণপুস্তকের অনুবাদ), নূতন অবতার (গল্প), কৌতুকহাস্য : পাঞ্চভৌতিক সভা (প্রবন্ধ), সঙ্গীতের গঠনরীতি এবং আনুষঙ্গিক আলোচনা (প্রবন্ধ), মহারাষ্ট্রীয় ভাষা (ভাষাতত্ত্ব), সঞ্জীবচন্দ্র : পালামৌ (প্রবন্ধ), দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি : প্রাচীন হিন্দুমতে (প্রবন্ধ), দেবোত্তর বিষয় (প্রবন্ধ), সমালোচনা (ক. উপনিষদঃ— 'শ্রীসীতানাথ দত্ত কৃত শঙ্কর-কৃপা নাম্নী টীকা প্রবোধক নামক বঙ্গানুবাদ সহিত। শ্রীযুক্ত

---

১ রবীন্দ্রনাথ যে-সকল পত্রিকা নিজে সম্পাদনা করেন নি কিন্তু সম্পাদনা কার্যে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন, সেই পত্রিকাগুলির পরিচয় দিয়েছেন পুলিনবিহারী সেন ১৩৬৯ সালের দেশ রবীন্দ্রশতবর্ষ-পূর্তি সংখ্যায়।

সত্যব্রত সামশ্রমী কর্তৃক সংশোধিত।', খ. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা— ১ম ভাগ ২য় সংখ্যা), গার্গী (কবিতা)

মাঘ ১৩০১। নিশীথে (গল্প), সন্ধ্যা (কবিতা), জ্যোতিষ্কগণের দূরত্ব নির্ধারণ: প্রাচীন মতে (প্রবন্ধ), সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ (প্রবন্ধ), আবদারের আইন (প্রবন্ধ), পৌষ সংক্রান্তি (বর্ণনা), কৃষ্ণচরিত্র (প্রবন্ধ), নীতির ধর্ম: বুদ্ধচরিত (প্রবন্ধ), ক্ষাত্রধর্ম (প্রবন্ধ), গান: অনুবাদ [ঐ শুন সখি স্বর্গতোরণে চাতক তুলেছে মধুতান], সমালোচনা (ক. হাসি ও খেলা— যোগীন্দ্রনাথ সরকার, খ. সাধন সপ্তকম্— লেখকের নাম নেই, গ. নীতিশতক বা সরল পদ্যানুবাদ সহ চাণক্য শ্লোক— অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়), রাণী (কবিতা)

ফাল্গুন ১৩০১। য়ুরোপীয় সঙ্গীত (প্রবন্ধ), স্বরলিপি [বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও], ধর্মচক্র প্রবর্তন: বুদ্ধচরিত (প্রবন্ধ), আপদ (গল্প), ইন্দ্রপূজা (প্রবন্ধ), কৃষ্ণচরিত্র (প্রবন্ধ), দেবোত্তর বিষয়ে পূর্বের আলোচনা (প্রবন্ধ), কৌতুকহাস্যের মাত্রা (প্রবন্ধ), ব্রাহ্মণ (কবিতা), আলোচনা (ক. পলিটিক্স্, খ. কনগ্রেসে বিদ্রোহ, গ. ভারত কৌন্সিলের স্বাধীনতা, ঘ. পুলিস রেগুলেশন বিল, ঙ. ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি, চ ধর্মপ্রচার), গ্রন্থ সমালোচনা (ক. দেওয়ান গোবিন্দরাম বা দুর্গোৎসব — যোগেন্দ্রনাথ সাধু কর্তৃক প্রকাশিত, খ. মনোরমা— কুমারকৃষ্ণ মিত্র)

চৈত্র ১৩০১। মুক্তির পথ (প্রবন্ধ), দিদি (গল্প), পুরাতন ভৃত্য (কবিতা), নৃত্যকলা (প্রবন্ধ), সরলতা (প্রবন্ধ), স্বরলিপি [চল রে সবে ভারত-সন্তান], মেয়েলি ব্রত (প্রবন্ধ), যুগান্তর (শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত যুগান্তর উপন্যাসের সমালোচনা), আলোচনা (ক. ইণ্ডিয়ান্ রিলীফ্ সোসাইটি, খ. উদ্দেশ্য সংক্ষেপ ও কর্তব্য বিস্তার, গ. হিন্দু ও মুসলমান, ঘ. কনগ্রেসে বিদ্রোহ, ঙ. রাষ্ট্রীয় ব্যাপার), ভালবাসা (কবিতা), গ্রন্থ সমালোচনা (ক. নূরজাহান— বিপিনবিহারী ঘোষ, খ. শুভপরিণয়ে— লেখকের নাম নেই)

বৈশাখ ১৩০২। মানভঞ্জন (গল্প), লোরিকের গান (প্রবন্ধ), মারাঠী ও বাঙ্গলা (প্রবন্ধ), চড়ক সংক্রান্তি (প্রবন্ধ), বাঙ্গলা জাতীয় সাহিত্য (প্রবন্ধ), আলোচনা (ক. ফেরোজশা মেটা, খ. বেয়াদব, গ. কথামালার একটি গল্প), প্রেম-পঞ্জিকা Charles kent-রচিত Love's Calendar কবিতার অনুকরণে), গ্রন্থ সমালোচনা (ক. রঘুবংশ ২য় ভাগ— নবীনচন্দ্র দাস, খ. ফুলের তোড়া— অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, গ. নীহারবিন্দু— নিতাইসুন্দর সরকার)

জ্যৈষ্ঠ ১৩০২। ঝাঁশির মহারাণী শ্রীমতী লক্ষ্মীবাই (প্রবন্ধ), নাম কৌতুক (প্রবন্ধ), গুজরাটে গরবা (প্রবন্ধ), মেয়েলি ব্রত (প্রবন্ধ), ঠাকুর্দা (গল্প), উপায় (প্রবন্ধ), ছবি (কবিতা), গুপ্ত রত্নোদ্ধার (কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত গুপ্তরত্নোদ্ধারের বা প্রাচীন কবিসঙ্গীত সংগ্রহ সমালোচনা), জ্যোৎস্নারাত্রে (কবিতা), বসন্তরোগ (প্রবন্ধ), আলোচনা (ক. চাবুক পরিপাক, খ. জাতীয় আদর্শ, গ. অপূর্ব দেশহিতৈষিতা, ঘ. কুকুরের প্রতি মুগুর), গ্রন্থ সমালোচনা (নির্ঝরিণী—মৃণালিণী প্রণীত)

আষাঢ় ১৩০২। বৈরাগ্য (প্রবন্ধ), ভাষা-তত্ত্ব: মহারাষ্ট্রীয় ও বাঙ্গলা (ভাষাতত্ত্ব), বারতলার মেলা (বিবরণ) মেয়েলি ব্রত (প্রবন্ধ), প্রতিহিংসা (গল্প), দুই বিঘা জমি (কবিতা), অপূর্ব

রামায়ণ : পাঞ্চভৌতিক সভা (প্রবন্ধ), ঝাঁশির রাণী লক্ষ্মীবাই (প্রবন্ধ), এসেছিল গিয়েছে চলিয়া : অনুবাদ (কবিতা) [As a twig trembles &c J. R. Lowell], আলোচনা (ক. ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে সমকালীন সিবিল সার্বিস পরীক্ষা, খ. মতের আশ্চর্য ঐক্য, গ. ইংরাজি ভাষা শিক্ষা, ঘ. জাতীয় সাহিত্য), চকোর (কবিতা)— বরদাচরণ মিত্র, গ্রন্থ সমালোচনা (বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিম— হারাণচন্দ্র রক্ষিত), কৃষ্ণবিহারী সেন (প্রবন্ধ)

শ্রাবণ ১৩০২। ভদ্রতার আদর্শ : পাঞ্চভৌতিক সভা (প্রবন্ধ), মেয়েলি ব্রত (প্রবন্ধ), ক্ষুধিত পাষাণ (গল্প) শীতে ও বসন্তে (কবিতা), ব্যাকরণ তুলনা (প্রবন্ধ), ঝাঁশির রাণী লক্ষ্মীবাই (প্রবন্ধ), পল্লীগ্রামে রথযাত্রা (বিবরণ), নূতন শব্দ সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় সমালোচনা (প্রবন্ধ) , আলোচনা (ভ্রম স্বীকার)

ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক ১৩০২। বিদ্যাসাগর চরিত (প্রবন্ধ) [১৩ই শ্রাবণ অপরাহ্ণে বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থসভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনে এমারল্ড থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে পঠিত], তুকারামের অভঙ্গ (প্রথমে ভূমিকা পরে তুকারামের কবিতার অনুবাদ), বৈদিক উপাখ্যান (প্রবন্ধ), অ্যাংলো-বাৎসল্য (প্রবন্ধ), সম্পদ-ব্রত (প্রবন্ধ), ঝাঁশির রাণী লক্ষ্মীবাই (প্রবন্ধ), সিরাজদ্দৌলা (প্রবন্ধ), নিবেদন (কবিতা), অতিথি (গল্প), অপূর্ব কলাবিদ্যা (প্রবন্ধ), বৈজ্ঞানিক কৌতূহল : পাঞ্চভৌতিক সভা (প্রবন্ধ), নন্দোৎসব (প্রবন্ধ), উপাসনার প্রকারভেদ (প্রবন্ধ), ছাত্র-বৃত্তির পাঠ্যপুস্তক (প্রবন্ধ), আমরা ও তোমরা (কবিতা), ধারা স্নান (ভ্রমণকাহিনী), বহুপত্যাত্মক বিবাহ (প্রবন্ধ), আলোচনা (ক. নূতন সংস্করণ, খ. জাতিভেদ, গ. বিবাহে পণগ্রহণ, ঘ. ইংরাজের কাপুরুষতা), নগর-সংগীত (কবিতা), জড়বাদ অসিদ্ধ (প্রবন্ধ), গ্রন্থ সমালোচনা (ক. কবি বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিবৃন্দের জীবনী— ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য, খ. প্রসঙ্গ মালা— হরনাথ বসু, গ. মনোহর পাঠ— হরনাথ বসু, ঘ. ন্যায়-দর্শন : গৌতম সূত্র— কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ি কর্তৃক প্রকাশিত, ঙ. কাতন্ত্রব্যাকরণম্/ভাবসেনত্রৈবিদ্য-বিরচিতরূপমালাপ্রক্রিয়াসহিতম্)

এইটিই সাধনা পত্রিকার শেষ সংখ্যা। এর পর আর কারও সম্পাদনায় সাধনা প্রকাশিত হয় নি।

৪

সাধনার পর রবীন্দ্রনাথ ১৩০৫এর বৈশাখে ভারতী পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। ভারতী প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৪র শ্রাবণে। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সম্পাদকের দ্বারা এই পত্রিকা সম্পাদিত হয়। সম্পাদকদের নাম ও তাঁদের কার্যকাল দেওয়া হল : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৮৪-১২৯০, স্বর্ণকুমারী দেবী ১২৯১-১৩০১, হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী ১৩০২-১৩০৪, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০৫, সরলা দেবী ১৩০৬-১৩১৪, স্বর্ণকুমারী দেবী ১৩১৫-১৩২১, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সরলা দেবী ১৩২২-১৩৩০, সরলা দেবী ১৩৩১-১৩৩৩ আশ্বিন। রবীন্দ্র-সম্পাদিত ভারতী পত্রিকার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল :

বৈশাখ ১৩০৫। দুঃসময় (কবিতা)— সম্পাদক, দুরাশা (গল্প)— সম্পাদক, কণ্ঠরোধ (প্রবন্ধ)— সম্পাদক, বৃটিশ গায়েনা (ভ্রমণ)— ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, কবিতা হরিণী (কবিতা) —প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দিল্লীর চিত্রশালিকা (চিত্র সমালোচনা)— বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শুনঃশেপের

বিলাপ (প্রবন্ধ)— সরলা দেবী, ঐতিহাসিক ম্যালিসন্ (প্রবন্ধ)— অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বঙ্গভাষা (দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থ অবলম্বনে সমালোচনা)— সম্পাদক, ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ (প্রবন্ধ)— অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রসঙ্গকথা— সম্পাদক (ক. "অল্পকাল হইল বাংলাদেশের তৎসাময়িক শাসনকর্তা ম্যাকেঞ্জি সাহেবকে সভাপতির আসনে বসাইয়া মান্যবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত সায়াস্ অ্যাসোসিয়েশনের দুরবস্থা উপলক্ষে নিজের সম্বন্ধে, স্বদেশ সম্বন্ধে আক্ষেপ এবং স্বদেশীয়ের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।"— প্রথম আলোচনা এই বিষয়ে; খ. 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ' সম্বন্ধে আলোচনা)

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫। পুত্রযজ্ঞ (গল্প)— সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর[২], জুতা-আবিষ্কার (কবিতা)— সম্পাদক, শিক্ষা-প্রণালী (প্রবন্ধ)— রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বেনো জল (প্রবন্ধ)— বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের সৌন্দর্য (প্রবন্ধ)— রচয়িতার নাম নেই, স্বরলিপি [মন আজি নাহি কাজে], সিরাজদ্দৌলা (অক্ষয়কুমার মৈত্র প্রণীত সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থের সমালোচনা)— সম্পাদক, ত্রিবাঙ্কুর (ভ্রমণকারীর নোট) — গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, বাঙ্গলা বহুবচন (ভাষাতত্ত্ব)— সম্পাদক, ঢাকা (প্রবন্ধ)— অক্ষয়কুমার মৈত্র, প্রসঙ্গ কথা— সম্পাদক (ভারতবাসী সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের মনোভাবের ব্যাখ্যা), গ্রন্থ সমালোচনা— সম্পাদক (ক. সাহিত্য চিন্তা—পূর্ণচন্দ্র বসু, খ. ভারতবর্ষের ইতিহাস— হেমলতা দেবী, গ. বামাসুন্দরী বা আদর্শ নারী— চন্দ্রকান্ত সেন, ঘ. শুশ্রূষা ১ম ভাগ— শ্যামাচরণ দে, ঙ. বাসনা— বিনোদিনী দাসী, চ. পুষ্পাঞ্জলি— রসময় লাহা), সাময়িক সাহিত্য— সম্পাদক (ক. প্রদীপ — বৈশাখ, খ. উৎসাহ— ফাল্গুন চৈত্র ১৩০৪)

আষাঢ় ১৩০৫ । ডিটেক্‌টিভ্ (গল্প)— সম্পাদক, বর্ষামঙ্গল (কবিতা)— সম্পাদক, আমার ছাত্রাবস্থা (স্মৃতিচিত্র)— রাজনারায়ণ বসু, পট্টবস্ত্র (প্রবন্ধ)— অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, লাপ্লাটার প্রাণীতত্ত্ববিৎ (প্রবন্ধ)— প্রিয়ম্বদা দেবী, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ (কবিতা)— সম্পাদক, ব্রিটিশ গায়েনার কুলি (প্রবন্ধ), স্বরলিপি [অনুরাগ তুমি হে অন্তরে], প্রাদেশিক সভার উদ্বোধন ("ঢাকায় বিগত বঙ্গীয় প্রাদেশিক জনসভার যে অধিবেশন বসিয়াছিল তাহার সভাপতি ছিলেন মান্যবর শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার উদ্বোধনের সারমর্ম নিম্নে বাঙ্গালায় প্রকাশ করিলাম। ইহাতে মূল বক্তৃতার অসামান্য গাম্ভীর্য নৈপুণ্য ও তেজ, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করিবার দুরাশা পরিত্যাগ করিয়াছি। কেবল তাঁহার প্রধান বক্তব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে,— আশা করি পাঠকগণ ইহা হইতে সংক্ষেপে আমাদের বর্তমান রাজনীতির অবস্থা ও আমাদের রাজনৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবেন··· ।— সম্পাদক"), সেকালের প্রতি (কবিতা)— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রসঙ্গ কথা

২ পুত্রযজ্ঞ গল্পটি সম্বন্ধে সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের উক্তি, "পুত্রযজ্ঞ গল্পটি রবীন্দ্রনাথের লিখিত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমি কেবলমাত্র উহার আখ্যান বস্তুটি আমার কাঁচা ভাষায় লিখিয়া 'খামখেয়ালি' সভায় পাঠের জন্য তাঁহাকে দেখাইয়াছিলাম, তিনি উহা দেখিয়া তাহার আমূল সংশোধন করিয়া ও নিজের অতুলনীয় ভাষায় লিখিয়া সেই সভায় আমার লিখিত বলিয়া পাঠ করেন; বোধ হয় সেই কারণে গল্পটি আমার লিখিত বলিয়া সেই সময় উক্ত মুদ্রণ প্রমাদ ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, পরে পুনর্মুদ্রণের সময় গল্পগুচ্ছে সে ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে শুনিয়া আশ্বস্ত ও সুখী হইলাম। ২১ ফাল্গুন, ১৩৫১"। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১শ খণ্ড গ্রন্থপরিচয়।

—সম্পাদক ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (সম্পাদক লিখিত প্রসঙ্গ— বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভা), সাময়িক সাহিত্য— সম্পাদক (ক. নব্যভারত— বৈশাখ, খ. প্রদীপ—জ্যৈষ্ঠ, গ. উৎসাহ— বৈশাখ, ঘ. নির্মাল্য— জ্যৈষ্ঠ)

শ্রাবণ ১৩০৫। দেবী প্রতিমা (প্রবন্ধ)— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হতভাগ্যের গান : বিভাস একতালা— সম্পাদক, ভাষা বিচ্ছেদ (প্রবন্ধ)— সম্পাদক, মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস (আবদুল করিম প্রণীত ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত ১ম খণ্ড গ্রন্থের সমালোচনা)— সম্পাদক, সম্বন্ধে কার (শব্দ তত্ত্ব)— সম্পাদক, আচারে যুক্তি (প্রবন্ধ)— রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ভারত-গায়নীয় (প্রবন্ধ)— ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বস্ত্ররঞ্জন বিদ্যা (প্রবন্ধ)— অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রসঙ্গ কথা— সম্পাদক (ক. "য়ুরোপে জাতিগত উপাদানে রাজনৈতিক ঐক্যই সর্বপ্রধান। হিন্দুদের মধ্যে সেটা কোনকালেই ছিল না বলিয়া যে হিন্দুরা জাতিবদ্ধ নহে সে কথা ঠিক নহে।...", খ. "শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের সিরাজদ্দৌলা পাঠ করিয়া কোন আংলোইণ্ডিয়ান্‌ পত্রে ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন।..." তারই প্রত্যুত্তর), সাময়িক সাহিত্য— সম্পাদক (ক. নব্যভারত— জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, খ. সাহিত্য— মাঘ ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩০৪, গ. পূর্ণিমা— শ্রাবণ, ঘ. প্রদীপ— আষাঢ়, ঙ. অঞ্জলি— জ্যৈষ্ঠ), গ্রন্থ সমালোচনা— সম্পাদক (ক. মুর্শিদাবাদ কাহিনী— নিখিলনাথ রায়, খ. চিন্তা লহরী— চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, গ. ভূমিকম্প— বিপিনবিহারী ঘটক)

ভাদ্র ১৩০৫। অধ্যাপক (গল্প)— সম্পাদক, ভাষা ও ছন্দ (কবিতা)— সম্পাদক, বায়েলিদ (প্রবন্ধ)— অপূর্বচন্দ্র দত্ত, মুখুয্যে বনাম বাঁড়ুয্যে (প্রবন্ধ)— সম্পাদক, গান [আমারো আঁখি ভাসে নয়ন জলে!]— স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রাচ্য প্রসাধন কলা (প্রবন্ধ)— বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চতুষ্পাঠী (প্রবন্ধ)— শিবধন বিদ্যার্ণব, বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ— জগদানন্দ রায়, প্রসঙ্গ কথা— সম্পাদক (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামক ঐতিহাসিক পত্রের আলোচনা), মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং মন্দির পথে (বার্ষিক সূচীতে এই কবিতা দুটি সম্পর্কে সম্পাদক জানাচ্ছেন যে দুর্ভাগ্যক্রমে লেখকের নাম হারিয়ে গেছে), সাময়িক সাহিত্য— সম্পাদক (ক. সাহিত্য—বৈশাখ, খ. প্রদীপ— শ্রাবণ, গ. অঞ্জলি— আষাঢ়)

আশ্বিন ১৩০৫। রাজটীকা (গল্প)—সম্পাদক, মদনভস্মের পূর্বে (কবিতা)— সম্পাদক, মদনভস্মের পর (কবিতা)— সম্পাদক, কোট বা চাপকান (প্রবন্ধ)— সম্পাদক, ঐতিহাসিক উপন্যাস (প্রবন্ধ)— সম্পাদক, ষষ্ঠীব্রতের কথা (প্রবন্ধ)— অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাকার ও নিরাকার (যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত সাকার ও নিরাকারতত্ত্ব গ্রন্থের সমালোচনা)— সম্পাদক, সমুদ্রতীরে (নিবন্ধ)— লেখকের নাম নেই, অপরপক্ষের কথা (প্রবন্ধ) —সম্পাদক, রুড়কী কলেজ (প্রবন্ধ)— লেখকের নাম নেই, তরণী-গীতি (কবিতা)— লেখকের নাম নেই, প্রবাদ প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)— শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, প্রসঙ্গ কথা— সম্পাদক (ম্যাকেঞ্জি সাহেব প্রসঙ্গ), সাময়িক সাহিত্য— সম্পাদক (ক. সাহিত্য— জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, খ. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, গ. প্রদীপ— ভাদ্র, ঘ. উৎসাহ— জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ঙ. অঞ্জলি— শ্রাবণ)

কার্তিক ১৩০৫। দেবতার গ্রাস (কবিতা)— সম্পাদক, ভারত-আবিষ্কার (প্রবন্ধ)— গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, প্রবাস স্মৃতি (স্মৃতি চিত্রণ)— লেখকের নাম নেই, কলিকাতার ছাত্রাবাস (প্রবন্ধ)— শরৎচন্দ্র রাহা, 'বামুরে বুদ্ধি' (প্রবন্ধ)— শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, ব্রত কথা (প্রবন্ধ)— লেখকের নাম নেই, সাইবীরিয়া (প্রবন্ধ)— প্রিয়ম্বদা দেবী, লঘুক্রিয়া (গল্প)— প্রবোধচন্দ্র মজুমদার, চাঞ্চল্য (কবিতা) —প্রিয়ম্বদা দেবী, ম্লানিমা (কবিতা)— প্রিয়ম্বদা দেবী, দেশান্তরিত ফরাসী (প্রবন্ধ)— প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রেম-কোজাগর (কবিতা)— প্রিয়ম্বদা দেবী, আল্‌ট্রা-কন্সার্ভেটিভ্ (প্রবন্ধ)— সম্পাদক, সুও রাণীর সোহাগ (কবিতা)— সম্পাদক, প্রসঙ্গ কথা— সম্পাদক (ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরাজের সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনা), অজ্ঞাতে (কবিতা)— প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রত্যাগমন (কবিতা)— প্রিয়ম্বদা দেবী।

অগ্রহায়ণ ১৩০৫। মণিহারা (গল্প)— সম্পাদক, শুভ উৎসব (প্রবন্ধ)— বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বাধীন ভক্তি (প্রবন্ধ)— সম্পাদক, এণ্ডি (প্রবন্ধ)— অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রাচীন নাট্য শাস্ত্র (প্রবন্ধ)— শিবধন বিদ্যার্ণব, বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ)— সম্পাদক, 'আষাঢ়ে' (গ্রন্থ সমালোচনা)— সম্পাদক, সাময়িক সাহিত্য— সম্পাদক, (ক. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা— ৫ম ভাগ ৩য় সংখ্যা, খ. প্রদীপ— আশ্বিন কার্তিক), প্রসঙ্গ কথা— সম্পাদক (কন্‌গ্রেস্ সম্পর্কিত আলোচনা), গ্রন্থ সমালোচনা— সম্পাদক (শ্রীমদ্ভগবদগীতা: সমন্বয় ভাষ্য: সংস্কৃতের অনুবাদ— গৌরচন্দ্র রায়)

পৌষ ও মাঘ ১৩০৫। ষ্টুডেণ্ট মেস (প্রবন্ধ)— দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, দৃষ্টিদান (গল্প)—সম্পাদক, বীম্‌সের বাঙ্গলা ব্যাকরণ: উচ্চারণ পর্যায় (শব্দতত্ত্ব)—সম্পাদক, উল্কাস্রোত (প্রবন্ধ)—অপূর্বচন্দ্র দত্ত, প্রাচীন নাট্য শাস্ত্র (প্রবন্ধ)— শিবধন বিদ্যার্ণব, চন্দ্রের আক্ষেপ (কবিতা)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, একটি সামাজিক চিত্র: সত্য ঘটনা—লেখকের নাম নেই, স্বয়ম্বর গীতি (গান ও স্বরলিপি)— সরলা দেবী, নিরাকার উপাসনা (প্রবন্ধ)— সম্পাদক, ভারতচন্দ্র ও কবিকঙ্কণ (প্রবন্ধ)— অতুলচন্দ্র ঘোষ, ছবি জন্ম (কবিতা)— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, গৃহকোণ (প্রবন্ধ)— বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বপ্ন (কবিতা)— সম্পাদক, বুদ্ধগয়ায় হিন্দু মোহান্ত (প্রবন্ধ)— লেখকের নাম নেই।

ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩০৫। লক্ষ্মীর পরীক্ষা (নাট্যকাব্য)— সম্পাদক, নিমন্ত্রণ সভা (প্রবন্ধ)— বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৈজ্ঞানিক পিশাচ (প্রবন্ধ)— রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, গ্রাম্য সাহিত্য (প্রবন্ধ)— সম্পাদক, ডেলি প্যাসেঞ্জার (প্রবন্ধ)— দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, মহারাষ্ট্র-কথা (প্রবন্ধ)— লেখকের নাম নেই, হিন্দু ধর্মের অভিব্যক্তি (প্রবন্ধ)— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্য ঘটনা (বর্ণনা)— লেখকের নাম নেই, বিদায় কাল (কবিতা)— সম্পাদক, বর্ষশেষ (কবিতা)— সম্পাদক, সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ— সম্পাদক[৩]।

৫

বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে। ১২৭৯-৮২ এই চার বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র পত্রিকা সম্পাদন করেন। ১২৮৩তে বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বন্ধ থাকে। ১২৮৪তে সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদক হয়ে বঙ্গদর্শন পুনরায় প্রকাশ করেন। সঞ্জীবচন্দ্র ১২৮৯এর চৈত্র মাস পর্যন্ত এই পত্রিকা সম্পাদন

৩ বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত 'রবীন্দ্রনাথের দুইটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ' দ্রষ্টব্য।

করেন। তবে ১২৮৬তে এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ থাকে এবং ১২৮৮র কার্তিক থেকে চৈত্র— এই ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয় নি। ১২৮৯এ বারো মাসে বারোটি সংখ্যা প্রকাশ করে সঞ্জীবচন্দ্র পত্রিকার সম্পাদকত্ব ত্যাগ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র এই পত্রিকা প্রকাশের ভার শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে দেন। তাঁর সম্পাদনায় ১২৯০এ বঙ্গদর্শনের মাত্র চারটি সংখ্যা (কার্তিক-মাঘ) প্রকাশিত হয় এবং তার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত নবপর্যায় বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রথম সংখ্যার নিবেদনে লিখলেন, "বঙ্গদর্শন পুনর্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান সাময়িকপত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম। ইহার পুনঃ প্রতিষ্ঠায় এতদিনে আমি সাহিত্য-সংসারে একটি ঋণমুক্ত হইলাম। সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি।" ১৩০৮ থেকে ১৩১২ এই পাঁচ বৎসর রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম বড় উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হন। উপন্যাসের সঙ্গে অন্যান্য রচনাও পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হতে থাকে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সকল রচনা তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাধনা বা ভারতী পত্রিকার নিয়মিত বিভাগগুলিতে (প্রসঙ্গ কথা, গ্রন্থ সমালোচনা, সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা) রবীন্দ্রনাথ একমাত্র লেখক ছিলেন। বঙ্গদর্শনে গ্রন্থ সমালোচনা ছাড়া অন্য কোনো নিয়মিত বিভাগ থাকত না। এই বিভাগটির দায়িত্ব ছিল চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের ওপর। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের এমন কোনো রচনা চোখে পড়ে না যা তাঁর গ্রন্থ-বহির্ভূত রয়েছে। বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে লেখকদের নাম গোপন রাখা হয়, রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে তাঁর সকল লেখকের নাম প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য, বিভিন্ন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির আগ্রহ ও যত্নের ফলে রবীন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন আজ দুষ্প্রাপ্য তালিকার অন্তর্গত হয় নি। এই সকল কারণে বঙ্গদর্শনের প্রতি সংখ্যার বিবরণ দানের বিশেষ কোনো আবশ্যকতা বর্তমান প্রসঙ্গে অনুভব করছি না।

৬

রবীন্দ্র-সম্পাদিত সাময়িকপত্রের মধ্যে ভাণ্ডার পত্রিকার সঙ্গে এ কালের রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী পাঠকবর্গের পরিচয় সবচেয়ে কম বলে মনে হয়। ভাণ্ডার ছিল রাজনৈতিক পত্রিকা, রবীন্দ্রনাথের সম্পাদন-কালে এতে স্বদেশ সম্পর্কে আলোচনা রাজনৈতিক প্রবন্ধ মতামত মন্তব্য এবং কিছু দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা ছাড়া কোনো রকম গল্প উপন্যাস বা লঘু রচনা প্রকাশিত হয় নি। মাসিকপত্রিকা ভাণ্ডারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩১২র বৈশাখ মাসে। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন কেদারনাথ দাশগুপ্ত। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রকাশক প্রথম সংখ্যায় লিখেছেন, "আমাদের চিন্তনীয় বিষয় সম্বন্ধে দেশের যোগ্য লোকের মত ভাণ্ডারে ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশিত হইবে।" 'সূত্রধারের কথা' শিরোনাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাণ্ডার প্রকাশের উদ্দেশ্য বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন।[৪] 'লেখকগণের প্রতি' সম্পাদকের নিবেদন, "কোনও ব্যক্তিবিশেষ, সম্প্রদায়বিশেষ বা সম্পাদকের মত প্রচারের উদ্দেশে ভাণ্ডার প্রকাশ করা হইতেছে না। পত্রে দেশের মনস্বী ও কৃতী ব্যক্তিদের মত সম্পূর্ণ অপক্ষপাতের সহিত বাহির করা হইবে; দেশের লোককে সকল মতের

সকল দিক বিচার করিবার অবকাশ দেওয়াই ভাণ্ডার প্রকাশের উদ্দেশ্য, এই কথা মনে রাখিয়া লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া অসঙ্কোচে নিজের মত লিপিবদ্ধ করিবেন। সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" নিম্নে রবীন্দ্র-সম্পাদিত ভাণ্ডার পত্রের বিবরণ দেওয়া হল :

বৈশাখ ১৩১২। সূত্রধারের কথা— সম্পাদক,[৪] লোকশিক্ষার উপায়— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কোন্ পথে যাইব— নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রকাশের পূর্বে— সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বঙ্গ ভাষায় মুসলমান রাজত্বের প্রভাব— দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাইমারি শিক্ষা, ধর্মপদ— সতীশচন্দ্র মিত্র, রাজধর্ম— বিপিনচন্দ্র পাল ; প্রস্তাব / ক. সৌখিন ফটোগ্রাফি— মহিমচন্দ্র দেববর্মা, খ. স্মৃতিরক্ষা— সম্পাদক ; বিদেশে ব্যবসায় শিক্ষা— কেদারনাথ দাশগুপ্ত ; প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন— সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ("আজকালকার পব্লিক উদ্‌যোগগুলির সঙ্গে প্রাকৃত সাধারণের যোগরক্ষার উপায় কি ?") ; উত্তর— নগেন্দ্রনাথ ঘোষ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আশুতোষ চৌধুরী যোগেশচন্দ্র চৌধুরী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পৃথ্বীশচন্দ্র রায় বিপিনচন্দ্র পাল ; সঞ্চয় / ক. যুগল ভাব, খ. ইটনের ছাত্র, গ. বর্তমান অসন্তোষের কারণগুলি সম্বন্ধে চিন্তা, ঘ. মনস্তত্ত্বমূলক ইতিহাস, ঙ. রেডিয়াম্, চ. জ্যোতিঃশাস্ত্র, ছ. বিনা তারে টেলিগ্রাফ।

জ্যৈষ্ঠ ১৩১২। অনুরুদ্ধ থের— সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বাঙ্গালার ইতিহাস চর্চা— নগেন্দ্রনাথ বসু, জলকষ্ট—শ্রীমতী কনিষ্ঠা, আরংজেবের দৈনন্দিন কার্যপ্রণালী— নিখিলনাথ রায়, মিলনক্ষেত্রের লক্ষণ— মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, সমাজ তাপস—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি— সম্পাদক ("বৈশাখের ভাণ্ডারে যে প্রশ্ন তোলা হইয়াছিল অর্থাৎ আমাদের দেশের পব্লিক উদ্‌যোগগুলির সঙ্গে দেশের প্রাকৃত সাধারণের যোগরক্ষার উপায় কি— দেশের নানা বিশিষ্টলোকের কাছ হইতে তাহার উত্তর পাওয়া গেছে।… আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, দেশকে ভাল করিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত, এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত না হইয়া শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, দেশের হিতৈষিগণ ভাণ্ডারে তাহারই আলোচনা উপস্থিত করুন।") প্রাচীন গুরুশিষ্য—সুবোধচন্দ্র মজুমদার ; প্রস্তাব/বিজ্ঞানসভা-সম্পাদক, আমাদের ভলান্টিয়ারদল—বিপিনচন্দ্র পাল ; প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন (ক. "গবর্মেণ্ট শিল্পবিদ্যালয়ে যে সকল বিলাতি ছবি সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা সম্প্রতি নিলামে বিক্রয় হইয়া গেছে এবং সেখানে দেশীয় চিত্রশিল্পাদি শিখাইবার আয়োজন হইতেছে— ইহাতে আমাদের লাভ হইবে কি ক্ষতি হইবে ?") ; উত্তর— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপেন্দ্রকিশোর রায় ; প্রশ্ন (খ. "আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ এখনকার অপেক্ষা দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা ভাল কি মন্দ ?") ; উত্তর— রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী হেরম্বচন্দ্র মৈত্র জগদীশচন্দ্র বসু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মোহিতচন্দ্র সেন ; প্রশ্ন— রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নকর্তা মোট নয়টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন) ; সঞ্চয় / ক. বিলাতের ছাত্র, খ. প্রকৃতিতে নীতি, গ. প্রজাতন্ত্রতা ও তাহার প্রতিক্রিয়া, ঘ. জ্যোতিঃশাস্ত্র, ঙ. এন্-তেজ (N-Rays), চ. কুয়াসা নিবারণের উপায়, ছ. লুয়ীজ মিশেল ; বিচার্য প্রশ্ন— প্রকাশক ("নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর সংগ্রহ করা হইবে। ক. বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নানারূপ মিলনের সুযোগ আছে— কলিকাতায় তাহার অভাব লক্ষিত হয়— কি উপায়ে এই অভাব দূর হইতে পারে ? খ. নূতন পঞ্চায়েৎবিধি সম্বন্ধে আমাদের ভাবিবার ও করিবার কিছু আছে কি না ? গ. আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার কোনরূপ পরিবর্তন আবশ্যক কি না ?

---

৪ বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত 'রবীন্দ্রনাথের দুইটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ' দ্রষ্টব্য।

ঘ. ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র মেস উঠাইয়া দিয়া কলেজের অধীনে ছাত্রাবাসস্থাপনের যে প্রস্তাব হইতেছে, তাহাতে ছাত্রদের সুবিধা কি অসুবিধা?")

আষাঢ় ১৩১২। জাপানের প্রতি—সম্পাদক, স্বাধীন শিক্ষা—সম্পাদক, অহেতুক জলকষ্ট—শ্রীমতী মধ্যমা, বহুরাজকতা—সম্পাদক, স্বর্গগত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, আশীষ—বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, ঘুঁটার ছাই—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; প্রস্তাব / ক. ইতিহাস কথা—সম্পাদক; খ. শিক্ষা প্রচারক —সম্পাদক; প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন (জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশক-প্রদত্ত ক প্রশ্ন দ্রঃ); উত্তর—মৌলবী সিরাজল ইসলাম খাঁ নরেন্দ্রনাথ সেন ব্যোমকেশ মুস্তাফী রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী; প্রশ্ন (জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশক-প্রদত্ত ঘ প্রশ্ন দ্রঃ); উত্তর—সুবোধচন্দ্র রায়; সঞ্চয় / ক. সার, খ. 'বৈয়ামিক' স্ত্রীলোক, গ. সৌরকলঙ্কের কার্য, ঘ. জাপানীদের প্রতিভা, ঙ. হিমোগ্লোবিন, চ. জাপানী কবিতা।

শ্রাবণ ১৩১২। হিন্দু সমাজে ভক্ষ্যাভক্ষ্য-ব্যবস্থা—শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, উপর নীচের মিলনকথা— চন্দ্রনাথ বসু, ভারতবর্ষের ইতিহাস— রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিবাহে কন্যা পরীক্ষা— বিধুশেখর শর্ম্মা, প্রস্তাব / ক. স্ত্রীশিক্ষা— মোক্ষদাকুমার বসু, খ. প্রাচীন মুদ্রা— জীবেন্দ্রকুমার দত্ত; প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন (জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশক-প্রদত্ত গ প্রশ্ন দ্রঃ); উত্তর—জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত শরৎকুমারী; প্রশ্ন (জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রামেন্দ্রসুন্দর প্রদত্ত প্রশ্ন দ্রঃ); উত্তর (উক্ত প্রশ্নের কয়েকটির উত্তর)— বিজয়চন্দ্র মজুমদার কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়; সঞ্চয় / ক. জীবের উৎপত্তি, খ. জ্যোতিঃশাস্ত্র, গ. চাষে বিদ্যুৎ (সঞ্চয় অংশ জগদানন্দ রায় লিখিত)

ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩১২। বান (গান)— সম্পাদক [এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে], একা (গান)— সম্পাদক [যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে], বঙ্গব্যবচ্ছেদ—সম্পাদক, শোকচিহ্ন— সম্পাদক, পার্টিশানের শিক্ষা— সম্পাদক, স্বদেশসত্তানুভূতি— অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, মাতৃমূর্তি (গান)— সম্পাদক [আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে], প্রয়াস (গান)— সম্পাদক [তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে], বিলাপী (গান)— সম্পাদক [ছি ছি, চোখের জলে ভেজাস্ নে আর মাটি], করতালি— সম্পাদক, হাতের তাঁত— ই বি হেভেল, বাউল (গান)— সম্পাদক [ক. যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, খ. যে তোরে পাগল বলে, গ. ওরে তোরা নেইবা কথা বললি, ঘ. যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না, ঙ. আপনি অবশ হলি, চ. জোনাকি কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ]; প্রস্তাব / ক. বীজ নির্বাচন— দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, খ. দেশীয় নাম— সম্পাদক ("কলিকাতা সহরে বাঙালির দ্বারা পরিচালিত যে কয়টি নাট্যশালা আছে সকলগুলিরই নাম ইংরেজী। যথা:— ষ্টার থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার, য়ুনীক থিয়েটার। যেখানে নটনটী বাঙালী, দর্শক বাঙালী, অভিনয়ের বিষয় সমস্তই বাংলা, সেখানে বিলাতি নাম ব্যবহারের মধ্যে কি কোনো সঙ্কোচের বিষয় নাই?···আমাদের প্রস্তাব এই যে পূজার আনন্দ-অবকাশে একদিন বিশেষ উৎসব করিয়া দেশীয় নাট্যশালাগুলি মাতৃভূমির আশীর্বাদের সহিত নূতন দেশীয় নাম গ্রহণ করুন— ইহাতে তাঁহাদের মঙ্গল হইবে।"); স্বদেশী ভিক্ষুসম্প্রদায়— সম্পাদক।

কার্তিক ১৩১২। গান— সম্পাদক [ওরে ভাই মিথ্যা ভেব না], উপর নীচের মিলন কথা— চন্দ্রনাথ বসু, একখানি পুরাতন চিঠি— নলিনীকান্ত সেন; প্রস্তাব / প্রকৃতিদর্শন ও গ্রাম্য পাঠশালা

—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন— সম্পাদক (ক. "মফস্বল স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষের প্রতি গভর্ণমেণ্ট যে পরোয়ানা জারি করিতেছেন তৎসম্বন্ধে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ছাত্র ও ছাত্রগণের অভিভাবকদের কি কর্তব্য ?", খ. "জাতীয় ধন-ভাণ্ডারে যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে কিরূপে তাহার ব্যবহার করা কর্তব্য ?") ; উত্তর— যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রাখালচন্দ্র সেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কামিনী কুমার চন্দ অশ্বিনীকুমার দত্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার বিপ্রদাস পাল চৌধুরী প্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

অগ্রহায়ণ ১৩১২। প্রকাশকের নিবেদন— "শিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা দেশে আজ যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তিকায় প্রদত্ত হইল। কার্লাইল সার্কুলার প্রকাশিত হইবার পর হইতে গতকল্য (২৫শে অগ্রহায়ণ) পর্যন্ত বর্তমান শিক্ষা-সমস্যা সম্বন্ধে যে সকল সভাসমিতি হইয়াছে প্রথম অংশে তাহার একটি ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা গেল। দ্বিতীয় অংশে মিঃ রসুল, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এবং শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত প্রভৃতির এক একটি বক্তৃতা সন্নিবিষ্ট হইল।…" এই সংখ্যার জন্য দীর্ঘ ভূমিকা লেখেন সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ নিজেই।

পৌষ ১৩১২। স্বদেশী আন্দোলনের কথা—চিত্তরঞ্জন দাস, বাংলার মাটি—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; প্রস্তাব / জাতীয় ধনভাণ্ডারের অর্থ— কামিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন— সম্পাদক (কার্তিক সংখ্যায় সম্পাদক-প্রদত্ত প্রশ্ন দ্রঃ) ; উত্তর— গোপালচন্দ্র লাহিড়ী বরদাচন্দ্র তালুকদার প্যারীশঙ্কর দাশগুপ্ত ভুবনমোহন মৈত্রেয় রজনীকান্ত দাস ত্রৈলোক্যনাথ মৌলিক বেণীভূষণ রায় ললিতচন্দ্র সেন উমেশচন্দ্র গুপ্ত যাত্রামোহন সেন বামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্র রায় ; সঞ্চয় / ক. ড্র্যাগন, খ. নূতন বৈদ্যুতিক দীপ, গ. এরিয়ান টারপিডো, ঘ. মৌচাকে ডিম ফোটান, ঙ. শ্বেত বিভীষিকা।

মাঘ ১৩১২। জাপানে বাণিজ্য ক্ষেত্র— সুবোধচন্দ্র মজুমদার, বিলাসের ফাঁস— সম্পাদক ; প্রস্তাব / সামাজিক দান— জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ; প্রশ্নোত্তর (জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে প্রশ্নগুলি করেন তার কয়েকটির উত্তর) ; উত্তর— সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মন্মথমোহন বসু ; সঞ্চয় / ক. পাট— নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, খ. ইক্ষু, গ. সর্ষপ, ঘ. কার্পাস, ঙ. রেশমকার্য ; প্রশ্ন— সম্পাদক ("কংগ্রেসের প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে কিনা— যদি হইয়া থাকে তবে কিরূপে তাহা সাধন করিতে হইবে ?") ; রাজভক্তি— সম্পাদক।

ফাল্গুন ১৩১২। স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন— সম্পাদক, কার্পাস— নিত্য-গোপাল মুখোপাধ্যায়, বায়ুর নাইট্রোজেন— জগদানন্দ রায় ; প্রস্তাব / ক. স্বদেশী মিউজিয়ম্— কেদারনাথ দাশগুপ্ত, খ. ইতিহাসের উপাদান— বিজয়চন্দ্র মজুমদার ; প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন— সম্পাদক (মাঘ সংখ্যায় সম্পাদক-প্রদত্ত প্রশ্ন দ্রঃ) ; উত্তর— প্রমথনাথ রায়চৌধুরী অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গরমণী ; সঞ্চয় / বারাণসী শিল্প সমিতি— রমেশচন্দ্র দত্ত ; পূজার লগ্ন (গান)— সম্পাদক [এখন আর দেরী নয়, ধরগো তোরা হাতে হাতে ধরগো]

চৈত্র ১৩১২। স্বদেশী বসন— নলিনীকান্ত সেন, মায়ার পথ ও মুক্তির পথ— বিপিনচন্দ্র পাল, কাসাভা বা সিমুল আলুর চাষ— নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি— শ্রী রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ; প্রস্তাব / শিল্প সমিতি— হিরন্ময়ী দেবী ; প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন— সম্পাদক (মাঘ সংখ্যায়

সম্পাদক-প্রদত্ত প্রশ্ন দ্রঃ); উত্তর— বিপিনচন্দ্র পাল অশ্বিনীকুমার দত্ত; সঞ্চয় / চন্দ্রনাথ— নবীনচন্দ্র সেন, দুইটি ধূমকেতু— জগদানন্দ রায়, সূর্যের আকার পরিবর্তন— জগদানন্দ রায়।

বৈশাখ ১৩১৩। বেদনা ও বাসনা (কবিতা)— ৺নলিনীকান্ত সেন, ওকাকুরার জাপানের জাগরণ— অজিতকুমার চক্রবর্তী, কাসাভা বা সিমুল আলুর চাষ— নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, মূল পদার্থ— জগদানন্দ রায়, প্রস্তাব / কৃষির উন্নতি— দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন—সম্পাদক ("বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির কর্তব্য ও কার্যাবলী সম্বন্ধে কোন সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছে কিনা?") উত্তর— ত্রৈলোক্যনাথ মৌলিক বিপ্রদাস পালচৌধুরী কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত কামিনীকুমার চন্দ নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত শশধর রায় প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য প্যারিশঙ্কর দাসগুপ্ত রামচন্দ্র রায় মহিমচন্দ্র রায় মহেশ্বর ভট্টাচার্য ব্রজসুন্দর সান্যাল মৌলবী মহম্মদ ইমাদুদ্দিন হরচন্দ্র রায় ভুবনমোহন মৈত্রেয় কিশোরীমোহন চৌধুরী মহিমচন্দ্র মহিন্তা কেরামতুল্লা মুন্সী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়; দেশনায়ক— সম্পাদক, স্বদেশী আন্দোলন— "ডন সোসাইটির ছাত্রগণের প্রতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশের মর্ম।"

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩[৫]। বন্দী (কবিতা)— সম্পাদক, কাসাভা বা সিমুল আলুর চাষ— নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, অনুনয় (কবিতা)— নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শিক্ষা সমস্যা— সম্পাদক; প্রস্তাব / কো-অপারেটিভ কর্জা-তহবিল— অম্বিকাচরণ উকিল, প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন ("বাংলার বর্তমান অবস্থায় দেশের লোকের পক্ষে অবৈতনিকভাবে রাজকার্যে লিপ্ত থাকা সঙ্গত কিনা?"); উত্তর— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বরদাকান্ত তালুকদার নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত বিপ্রদাস পালচৌধুরী অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; সঞ্চয় / স্বদেশী আন্দোলন— "ডন সোসাইটির ছাত্রগণের প্রতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় বক্তৃতার সারাংশ।"

আষাঢ় ১৩১৩। কোকিল (কবিতা)— সম্পাদক, আগে সাধন পরে সিদ্ধি— তরুণ ফুকন, শাপে বর (কবিতা)— যতীন্দ্রমোহন বাগচি, শিক্ষা সংস্কার— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা সমস্যার অপরাংশ— জীবেন্দ্রকুমার দত্ত; প্রস্তাব / স্বদেশী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়— জীবেন্দ্রকুমার দত্ত; প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন ("হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যাপারে কোন স্বার্থবিরোধ আছে কি না?"); উত্তর— যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিপ্রদাস পালচৌধুরী নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার; সঞ্চয় / ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের আদর না অনাদর— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩১৩। 'সব পেয়েছি'র দেশ (কবিতা)— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমাদের গৃহলক্ষ্মী— ভূতনাথ ভাদুড়ী, জাতীয় শিক্ষা— শশাঙ্কমোহন সেন; প্রস্তাব / ক. চট্টগ্রামে তুলার চাষ— আনন্দমোহন লাহিড়ী, খ. একটি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর; প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন ("হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা বর্তমান যুগে জাতীয় সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক উন্নতির সহায় কি প্রতিবন্ধক?…"); উত্তর— নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ললিতচন্দ্র সেন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত; সঞ্চয় / প্রাচীন সামাজিক চিত্র—বিধুশেখর শাস্ত্রী।

---

৫ এই সংখ্যা থেকে 'শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী এম্. এ., বার-এট্-ল' সহকারী সম্পাদক হিসেবে তাওয়ায়ে যোগ দেন।

আশ্বিন ১৩১৩। জাতীয় বিদ্যালয়— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারত পতাকা— বিজয়চন্দ্র মজুমদার; প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন (গত সংখ্যার প্রশ্ন দ্রঃ); উত্তর— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্যারিশঙ্কর দাশগুপ্ত বিপ্রদাস পালচৌধুরী কুলচন্দ্র রায় ব্রজসুন্দর স্যান্নাল বিজয়চন্দ্র মজুমদার; সঞ্চয় / প্রাচীন সামাজিক চিত্র— বিধুশেখর শাস্ত্রী।

কার্তিক ১৩১৩। জাতিভেদ প্রথা— কাশীচন্দ্র নাথ, বঙ্গের আশা—সতীশচন্দ্র মিত্র, আগামী কংগ্রেসের প্রধান সমস্যা— বিপিনচন্দ্র পাল, কংগ্রেসের সমস্যা— প্রমথনাথ চৌধুরী; প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন ("ভবিষ্যতে কংগ্রেস কিরূপে গঠিত হওয়া উচিত?") উত্তর— কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্রদাস পালচৌধুরী ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়; সঞ্চয় / "ডন সোসাইটিতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা"।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩১৩। রাষ্ট্রতন্ত্রে সংহতির অভিব্যক্তি— যামিনীকান্ত সেন; প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন ("শিল্প প্রদর্শনী বা মেলার দ্বারা আমাদের কিরূপ উপকার সাধিত হয় এবং উহাদ্বারা আমরা কি শিক্ষা লাভ করিতে পারি?"); উত্তর—ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়; সঞ্চয় / ক. প্রাচীন সামাজিক চিত্র— বিধুশেখর শাস্ত্রী, খ. দেশলাইয়ের কাঠি— নিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

মাঘ ১৩১৩। সাহিত্য সম্মিলন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য সম্মিলন— সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, একতার মূল— জীবেন্দ্রকুমার দত্ত; প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন (গত সংখ্যার প্রশ্ন দ্রঃ); উত্তর— যামিনীকান্ত সেন; সঞ্চয় / উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের পোষণ শক্তি— নিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

ফাল্গুন ১৩১৩। বৈদিক ঋষিগণ— ৺নলিনীকান্ত সেন, অঙ্গচ্ছেদের শিক্ষা— কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়; প্রস্তাব / লোকশিক্ষায় বিধবা নারী— যামিনীকান্ত সেন; প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন ("দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী কর্তৃক প্রস্তাবিত 'স্বরাজ' এবং সর্বসাধারণে যাহাকে 'স্বায়ত্ত শাসন' বলিয়া থাকে, তাহা আমরা পাইবার উপযুক্ত কি না?"); উত্তর—নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়; সঞ্চয় / বিশ্বসাহিত্য— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (জাতীয় শিক্ষাপরিষদে গঠিত)

চৈত্র ১৩১৩। কলিকাতা প্রদর্শনী— নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, ভারতীয় শিল্পের অবনতির কারণ— কাশীচন্দ্র নাথ; প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন (গত সংখ্যার প্রশ্ন দ্রঃ); উত্তর— কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত; সঞ্চয় / সাহিত্য পরিষদ্— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৈশাখ ১৩১৪। নববর্ষ (কবিতা), লঙ্কা— দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র— অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সৌন্দর্যবিতরণ (কবিতা); প্রস্তাব / রঙ্গমঞ্চ— অজিতকুমার চক্রবর্তী; প্রশ্নোত্তর / প্রশ্ন ("সম্প্রতি দেশে হিন্দুমুসলমানে যে সংঘাত উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রতিকারের উপায় কি?"); উত্তর— মৌলবী সিরাজুল ইসলাম অনাথবন্ধু গুহ; শিল্পবাণিজ্য / প্রদর্শনীর সার্থকতা— নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, জীবনী: শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী— কেদারনাথ দাশগুপ্ত, আবুপাহাড় ও দেলবারা মন্দির— হেমেন্দ্রলাল কর; সঞ্চয় / সৌন্দর্য ও সাহিত্য— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩১৪। দেশের বর্তমান অবস্থায় আমাদের কি করা কর্তব্য?— অম্বিকাচরণ মজুমদার নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর; শ্বেতদিগের পীতাতঙ্ক, কণ্ঠহার, জাতি

ভেদ ও জাতীয়তা, শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ— দীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চাক্‌মাজাতির উপজীব্য— সতীশচন্দ্র ঘোষ, পিতৃভূমি এবং মাতৃভূমি, প্রাচীন সামাজিক চিত্র— বিধুশেখর শাস্ত্রী।

৭

রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন করেন ১৮৩৩ শকের বৈশাখ থেকে ১৮৩৬ শকের চৈত্র পর্যন্ত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত বাংলা সাময়িক-পত্র গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনকাল জানিয়েছেন, 'এপ্রিল ১৯১০-এপ্রিল ১৯১৫'। অন্যান্য গ্রন্থে সম্ভবত ব্রজেন্দ্রনাথের অনুসরণে একই কালের উল্লেখও দেখেছি। এসকল গ্রন্থে ইংরেজী তারিখ ব্যবহৃত হয়েছে, শক বা বাংলা বছরের হিসেব নেই। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী শকাব্দের হিসেবেই প্রকাশ করা হত, পত্রিকার কোনো সংখ্যায় ইংরেজী তারিখ নেই। যাই হোক, হিসেব করলে দেখা যাবে, উল্লিখিত গ্রন্থাদিতে যে ক্ষেত্রে ইং ১৯১০ সালের উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকৃত পক্ষে তা ইং ১৯১১ সাল হবে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঁচ বৎসর নয়, চার বৎসর (ইং ১৯১১ এপ্রিল-১৯১৫ এপ্রিল, বাং ১৩১৮-১৩২১, শক ১৮৩৩-১৮৩৬) সম্পাদন করেছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৬৫ শকের ১ ভাদ্র (ইং ১৮৪৩)। প্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত। ইনি বারো বৎসর পত্রিকা সম্পাদন করেন। তার পর সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে এই পত্রিকা সম্পাদন করেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনীর প্রতি সংখ্যার সূচীতে রচনার নাম ও লেখকের নাম প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার মধ্যে দুই একটি ক্ষেত্র ছাড়া সকল রচনারই নীচে লেখকের নাম মুদ্রিত আছে। পত্রিকার বার্ষিক সূচীটিও বর্তমান প্রসঙ্গে মূল্যবান। সেই সূচীতে পত্রিকায় প্রকাশিত সকল রচনার নাম বর্ণানুক্রমিকভাবে সজ্জিত এবং প্রত্যেক রচনার নামের পাশে লেখকের নাম ও পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রদত্ত হয়েছে।

৮

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত পত্রিকাগুলির বহু সংখ্যা সমালোচনা করেছিলেন।[৬] বর্তমান প্রবন্ধ থেকেই লক্ষ্য করা গেছে রবীন্দ্রনাথ নিজে সম্পাদক হয়ে সমকালীন কতগুলি পত্রপত্রিকা সমালোচনা করেন।[৭] অপরপক্ষে সমকালীন পত্রিকায় রবীন্দ্র-সম্পাদিত পত্রের কিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তাও লক্ষ্য করা আবশ্যক। রবীন্দ্র-সম্পাদিত সাধনা পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে 'সাহিত্য' পত্রিকার 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' বিভাগে

৬ 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' পত্রিকার ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যা ও পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায় এই সমালোচনাগুলি সংকলিত হয়।

৭ এই শ্রেণীর কিছু সমালোচনা 'রবীন্দ্রনাথের বিস্মৃতপ্রায় রচনা' শিরোনামায় 'শারদায় অমৃতে' (১৩৭৫) লেখক কর্তৃক সংকলিত হয়। লেখকের 'সাময়িকপত্র সমালোচক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ (অমৃত ১৫ কার্তিক ১৩৭৫) এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

(৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ১৩০২ কার্তিক) কি মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, সমকালীন সমালোচনার একটি নিদর্শন হিসাবে এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

সাধনা।— ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক— একত্র। পাঠকগণ বিজ্ঞাপনে দেখিবেন, সাধনা অতঃপর আর প্রকাশিত হইবে না। সাহিত্যসংসারে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদক হইয়া সাধনাকে সিদ্ধির পথে আনিয়াছিলেন। তাহার পর সাধনা ত্রৈমাসিক হইতেছে শুনিয়া, আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব পূর্ণ হইবে। কিন্তু সহসা সাধনার বিলোপ হইল দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। সাধনা বিলুপ্ত হইল কেন, তাহার কোন কারণ সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। তথাপি মনে হয়, বাঙ্গালী পাঠকের সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাইলে সাধনা বিলুপ্ত হইত না। যে দেশে সাধনার মত উচ্চশ্রেণীর মাসিকও বিলুপ্ত হইবার অবসর পায়, সে দেশ নিশ্চয়ই অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।

রবীন্দ্র-শব্দকোষ : Tagore Concordance

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

সাম্প্রতিককালে রবীন্দ্রচর্চার নতুন ধারার সূচনা হয়েছে। অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এখনো অনেক শ্রম ও সময় -সাধ্য কাজ করার আছে। এগুলির অন্যতম হল রবীন্দ্রনাথের একখানি কনকর্ড্যান্স প্রস্তুত।

কনকর্ড্যান্স আমাদের সাহিত্যে নেই। সংস্কৃতে Vedic concordance আছে। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যে প্রচলিত কনকর্ড্যান্সগুলির সঙ্গে তার তফাত আছে। Vedic concordanceএ শ্লোকাংশসূচী আছে; অপর পক্ষে ইংরেজি সাহিত্যের কনকর্ড্যান্স-সমূহে ছত্র বা ছত্রাংশের অন্তর্ভূত শব্দের সূচী থাকে। রবীন্দ্রনাথের কনকর্ড্যান্স আমরা ইংরেজি আদর্শেই চাই।

*The Shorter Oxford Dictionary*তে কনকর্ড্যান্স শব্দটির এরূপ অর্থনির্দেশ আছে :

1. A citation of parallel passages in a book, *esp.* in the Bible.

2. An alphabetical arrangement of the principal words contained in a book (*orig.* in the Bible), with citations of the passages in which they occur.

ইংরেজি সাহিত্যকারদের যেসব কনকর্ড্যান্স রচিত হয়েছে সেগুলি ঐ দ্বিতীয় সংজ্ঞার আওতায় পড়ে। প্রচলিত ইংরেজি কনকর্ড্যান্সগুলির মধ্যে আমি দেখেছি John Bartlett রচিত *A Complete Concordance to Shakespeare*; *A Concordance to the Poems of Matthew Arnold* by Stephen Maxfield Parrish ; *A Concordance to the Poetical and Dramatical Works of Alfred Tennyson* by Arther E. Baker ; *A Concordance to the Poems of William Wordsworth* by Prof. Lame Cooper of Connwall ও *A Concordance to the Complete Works of G. Chaucer and to the Romaunt of the Rose* by John S. P. Tatlock. এগুলির মধ্যে আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হল Shakespeare-এর কনকর্ড্যান্সখানি। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯১০। সংকলক এটিকে 'প্রায় পূর্ণাঙ্গ' বলে বিজ্ঞাপিত করেছেন। তার কারণ কনকর্ড্যান্সে নির্বিচারে অতি-সাধারণ ও তাৎপর্যহীন সমস্ত শব্দের নিঃশেষিত নির্ঘণ্ট প্রস্তুতের প্রয়োজন নেই। তাতে অনাবশ্যকরূপে আকার বাড়বে মাত্র। তাই দেখা যায় সকল কনকর্ড্যান্সকারকই কিছু কিছু শব্দ অতিসাধারণজ্ঞানে বাদ দিয়েছেন। সেইসব বর্জিত শব্দের তালিকাও প্রস্তুত করেছেন। অনেক সময় অতিসাধারণ ও বৈশিষ্ট্যহীন বর্জিত শব্দের মধ্যে বিশিষ্ট ও তাৎপর্যময় প্রয়োগজ্ঞানে তা কনকর্ড্যান্সভুক্ত হয়েছে।

অবসর সময়ে সংকলনে Bartlettএর সময় লেগেছে ১৮ বৎসর; Bakerএর লেগেছে ৮ বৎসর। রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ কনকর্ড্যান্স করতে সময় লাগবে অনেকগুণ বেশি। সমস্ত রচনাবলীর কনকর্ড্যান্স রচনাবলীর ১০ বা ২০ গুণও হতে পারে। যন্ত্রের সাহায্যে এ কাজ এমন-কিছু দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু electronic computerএর সহায়তায় এই কনকর্ড্যান্স রচনার সম্ভাবনা এ দেশে আপাতত নেই। অথচ মানুষের সাহায্যে এটা আশু হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য কোনো-একজন ব্যক্তির পক্ষে এই কাজে

হাত দেওয়া কতটা সমীচীন? প্রকাশই বা করছেন কে? এই-সকল প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে ওঠে যে-কোনো উদ্যোগীর মনে। তবে বিচ্ছিন্নভাবে 'কবিতা ও গান', 'নাটক ও প্রহসন', 'উপন্যাস ও গল্প', 'প্রবন্ধ ও অন্যান্য'— এই চার ভাগে স্বতন্ত্র কনকর্ড্যান্স করা চলে। এককভাবে এগুলিরও আকার কম হবে না। দীর্ঘসময়সাধ্য তো বটেই। কী পরিমাণ সময় ও পরিশ্রম লাগতে পারে তার একটা ধারণা সহজেই করা যায় নীচের বিবরণ থেকে।

'সন্ধ্যাসংগীত' (১ম খণ্ড, রচনাবলী— বিশ্বভারতী সংস্করণ) কাব্যের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৬। মোট ছত্রসংখ্যা ১১৭৯। প্রতিটি শব্দের (এ, ও স্বতন্ত্র শব্দ গণ্য করে এবং দু-একটি সমাসের উত্তরপদকে স্বতন্ত্র শব্দ ধরে) শব্দসূচীর ফলে ছত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৮৬৭। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র ছত্রগুলি দীর্ঘ নয়। একটি ছত্র স্লিপে টুকতে এক মিনিট সময় ধরলে ৮১ ঘণ্টা লাগে ৪৮৬৭ স্লিপ লিখতে। তার পর বর্ণানুক্রমে স্লিপ সাজিয়ে খাতায় লিখতে আরো ৮১ ঘণ্টা লাগে। এই ১৬২ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ছত্রসংখ্যাযুক্ত করতে গড়ে পৃষ্ঠা-প্রতি ১ মিনিট সময় লাগে। একজন লোক অবসর সময়ে ৪ ঘণ্টা খাটলে ৪০ দিনে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র ছত্রসহ সমস্ত শব্দসূচী প্রস্তুত সম্ভব হতে পারে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২৯ খণ্ডের (অচলিত সংগ্রহ খণ্ডদ্বয়সহ) 'কবিতা ও গান', 'নাটক ও প্রহসন' (কেবল পদ্য) এবং 'গীতবিতান' খণ্ডত্রয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৮০৯। প্রতি পৃষ্ঠায় সাধারণত ৩০ ছত্র থাকে। তা হলে মোট ছত্রসংখ্যা দাঁড়ায় আনুমানিক ৬০০০ পৃ × ৩০ ছত্র = ১৮০০০০ ছত্র। প্রতি ছত্রে গড়ে ৮টি শব্দের সূচী নির্মাণ করলে কনকর্ড্যান্সের ছত্রসংখ্যা হবে—১৮০০০০ × ৮ = ১৪৪০০০০। তা হলে রচনাবলীর আকারের কনকর্ড্যান্সের পৃষ্ঠাসংখ্যা হবে ১৪৪০০০০ ÷ ৩০ = ৪৮০০০ পৃষ্ঠা। স্লিপ তৈরি করতে সময় লাগবে ৩০০০ ঘণ্টা; আর কনকর্ড্যান্সের ছত্রগুলি লিখতে সময় নেবে ২৪০০০ ঘণ্টা। দৈনিক ৫ ঘণ্টা করে খাটলে ১৫ বছর মতো লাগতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের কোনো বিদগ্ধ পাঠকের পক্ষেই কোনো বিষয়ের প্রসঙ্গ বা উল্লেখের সন্ধান অনায়াস-সাধ্য নয়। বিশেষত বিস্মৃতির কবলিত হলে তো কথাই নেই। কনকর্ড্যান্স বিস্মৃতির কবল থেকেও আমাদের উদ্ধার করবে। যেমন ধরা যাক—'টলমল মেঘের মাঝার/এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর/তোর তরে কবিতা আমার!' এই ছত্রগুলি হয়তো সম্পূর্ণ মনে আসছে না, অথবা মাত্র দু-একটি শব্দই মনে আসছে অথবা আকরগ্রন্থের নামও মনে নেই, তখন কনকর্ড্যান্স আমাদের মুশকিল আশান করবে। টলমল, মেঘের, মাঝার, এইখানে, বাঁধিয়াছি, ঘর, তোর, তরে, কবিতা, আমার— এই শব্দগুলির যে-কোনোটি বার করলেই ছত্রগুলি পাওয়া যাবে। কনকর্ড্যান্সে এই তিন ছত্রের নির্বিচার শব্দসূচী এইরকম হবে:

আমার	তোর তরে কবিতা আমার	স-সং ১।৩।২৪
এইখানে	এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর	স-সং ১।৩।২৩
কবিতা	তোর তরে কবিতা আমার	স-সং ১।৩।২৪
ঘর	এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর	স-সং ১।৩।২৩
টলমল	টলমল মেঘের মাঝার	স-সং ১।৩।২২
তরে	তোর তরে কবিতা আমার	স-সং ১।৩।২৪
তোর	তোর তরে কবিতা আমার	স-সং ১।৩।২৪

বাঁধিয়াছি	এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর	স-সং ১।৩।২৩
মাঝার	টলমল মেঘের মাঝার	স-সং ১।৩।২২
মেঘের	টলমল মেঘের মাঝার	স-সং ১।৩।২২

কনকর্ডান্সের এই মুখ্য উপযোগিতা। এতে রবীন্দ্ররচনার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যবাচক শব্দের, প্রতিমানের, সাহিত্য-দর্শন-নন্দনতত্ত্ব-বিষয়ক ভাবনার, ব্যাকরণঘটিত শব্দেরও নির্ঘণ্ট একত্র সমাবিষ্ট থাকবে। আনন্দ, খেলা, ছুটি, বীণা, ভুবন ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যসূচক শব্দ গণ্য করলে গবেষক বা উৎসাহী পাঠক কনকর্ডান্সে এগুলি একত্র পাবেন। এইরকম প্রেম, মৃত্যু, বর্ষা, প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের ধারণা ও ভাবনা জানতে কনকর্ডান্স থেকে অভ্রান্ত ও পূর্ণ সাহায্য মিলবে।

'কবিতা ও গানে'র কনকর্ডান্সে keywordগুলি নিতে হবে, একান্ত পদ্যের ভাষা নিতে হবে, বিশিষ্ট প্রয়োগ নিতে হবে, বানান-ব্যকরণ-ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ শব্দও নিতে হবে। একেবারে সাধারণ শব্দের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও তাৎপর্য বিচার করতে হবে; যে ক্ষেত্রে মাত্র দুটি কি একটিই শব্দ আছে সে স্থলেও সংখ্যাল্পতাগুণে অনেক সময় সাধারণ শব্দও গ্রহণযোগ্য। কবিতা ও গানের প্রতি ছত্রের প্রথম শব্দটি গ্রহণীয়। এক-এক কাব্যে নির্বাচন এক-এক রকম হতে পারে। যে-যে শব্দ কোনো বিশেষ এক কাব্যে বর্জনীয় বলে মনে হবে অপর কোনো বা কোনো কোনো কাব্যে তা হয়তো গ্রহণ করতে হবে।

'সন্ধ্যাসংগীতে'র কনকর্ডান্সে গৃহীত শব্দাবলী: **সাধারণ শব্দ** (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়াবিশেষণ)— অঙ্কিত, অঙ্গ, অঙ্গার, অঙ্গুলি, অক্ষর, অচল, অচেতন, অতল, অতিদূর, অতিথি, অতীত, অতুল, অতৃপ্ত, অদৃষ্ট (ভাগ্য অর্থে), অধর (-পুট), অধিরাজ, অনন্ত, অনল, অনাথ, অনিবার, অনুক্ষণ, অনুগ্রহ (-বিন্দু,-হাসি), অন্তঃপুর, অন্তর্যামী, অন্ধকার, অপমান, অপযশ, অবকাশ, অবশ, অবশেষে, অবসর, অবসান (-কাল), অবহেলা, অবাক (হ), অবিরল, অবিরাম, অবিশ্বাস, অবিশ্রাম, অভাগা, অমন (নি), অমানিশি, অমৃত, অগ্নি, অরণ্য, অরুণ (-কিরণ, -দোলা), অলক, অলস, অশান্তি, অশোক, অশ্রু (-জল, -টি, -ধার, -বারি, -বিন্দু, -ভার), অসংখ্য, অসীম, অস্ফুট, আকার, আকাশ (-গরাসী, -তল), আকুল, আগে, আত্ম (-ঘাতী, -হারা), আদর, আঁধার, আধফোটা, আধো, আনন্দ, আবর্ত, আবাস, -আয়ু, আরবার, আলয়, আলিঙ্গন, আলো, আলোক, আশা, আশ্রয়হারা, আশ্বাস (-বচন), আসন, -আসার, আহত, ইচ্ছা, ইন্দ্রধনু, ঈষৎ, উচ্চস্বর, উজ্জ্বল, উৎসব, উত্তরবায়ু, উদার, উদাসী, উধাও, উন্মাদ, উন্মাদিনী, উপকূল, উপছায়া, উপহার, উপহাস, উপেক্ষা, উর্বর, উল্লাস, ঊষা (-মেয়েটি), ঋণপাশ, একতিল, একা (কিনী), এলানো, এলোথেলো, কঙ্কাল, কটাক্ষ, কঠিন, কঠোর (-তা), কণা, কণ্ঠস্বর, কত-না, কথা (-টিও, -গুলি), কপোল, কবি (তা), করুণ, করুণা (-র, -রে) কর্ম, কলঙ্ক, কলেবর, কল্পনা, কষ্ট, কাজ, কাঁটা, কাতর, কান (ন), কায় (য়া), কারা (-গার), কাল (সময়' অর্থে), কিরণ, কুজ্ঝটি, কুটির, কুঁড়ি, কুবলয়, কুসুম (-আসার), কুসুমিত, কৃপা, কৃপণ, কেমনে, কেশ (-পাশ), কোমল (তা, -মন), কোল, কোলাকুলি, কোলাহল, কৌতুক, ক্রম (শ), ক্লেশ, ক্ষত, ক্ষতি, ক্ষমতা, ক্ষীণ-আয়ু, ক্ষুদ্র, খেলেনা, গগন, গতি, গভীর, গর্ব, গর্বিত, গলিত, গান (গুলি), গিরি, গীত (-উচ্ছ্বাস), গীতি, গুরু, গৃহ, গোধূলি, গোপন, গোলাপ, গ্রন্থ, গ্রহ, গ্রাস, গ্রীষ্ম, ঘটনা, ঘন, ঘর, ঘুঘু, ঘুম (-ঘোর, -ভাঙা), ঘৃণা, ঘোমটা, ঘোর, চন্দ্র, চপলা, চম্পক, চরণ, চরাচর, চাঁদ, চিতা, চুম্বন, চেতনা, চোখ, চৌদিকে, ছত্র, ছবি,

ছায়া (-গুলি, -ময়), ছারখার, ছিন্ন, ছুরি, ছেলে (-খেলা, -বেলা), জগৎ (ত), জন (নী), জন্ম, জয়, জয়ী, জর্জর, জল (দ), জাগর (ণ), জাহ্নবী, জীবন (দায়িনী), জুঁই, জোছনা, জ্ঞান, জ্যোতি (-র্ময়, -হীন), জ্যোৎস্নাময়, জ্বলন্ত, জ্বালা, ঝটিকা, টলমল, টুকটুকে, ঠাঁই, ঢেউ, তট, তটিনী, তন্ত্রী, তপন, তরুণ, তরুশাখা, তান, তারকা (রাশি), তারা (-পূর্ণ, -হীন), তীব্র, তীর, তুষার, তুহিন, তৈলহীন, ত্রাস, দগ্ধ, দয়ালু, দল, দাগ, দান, দারুণ, দাসত্ব, দিন (-মান, -রাত, -রাতি), দিবস, দিবা (-নিশি), দিশা, দীন (-বেশ, -হীন), দীপ, দীর্ঘশ্বাস, দুখ (-হীন), দুঃখ (-ক্লেশ, -জ্বালা), দু'নয়ান, দুয়ার, দুরন্ত, দুর্গ, দুর্বল, দূর, দূরন্ত, দেব (-তা), দেশ, দেহ (-খানি), দৈত্যবালা, দোলা, দ্বার, দ্বিপ্রহর, ধন, ধরা, ধার (ণ), ধারা, ধূলা, ধূলি (ময়), -ধ্বংস, ধ্বনি, নক্ষত্র, নত, নদী (-তীর), নন্দন নভস্তল, নয়ন (-জল,-সলিলধার), নয়ান, নানাশব্দময়, নাম, নিঃশব্দে, নিকেতন, নিখিল, নিতান্ত, নিদারুণ, নিবাসী, নিভৃতে, নিমেষ, নিরবধি, নিরাময়, নিরাশা, নিরাশ্রয়, নিরিবিলি, নির্ঝর, -নির্বাপিত, নিশি, নিশীথ, নিশ্বাস, নিষ্ঠুর, নীচ, নীড়, নীরব (তা), নীহারজাল, নূতন, পঙ্কিল, পট, পণ্ডিত, পত্র, পথ, পথিক, পদ (-চিহ্ন, -তল), পবন, পরবাসী, পরলোক, পরাজয়, পরাজিত, পরিণত, পরিশ্রান্ত, পর্বতসমান, পশ্চিম, পাখা, পাখি, পাগল, পাত, পাতা, পান (শোষণ ও অভিমুখ অর্থে), পা (চরণ অর্থে), পার (উত্তরণ অর্থে), পারাবার, পাষাণ, পীড়ন, পুন, পূরবী, পুরাতন, পুরানো, পুলক, পূজা, পূর্ণ, পৃথিবী, পোষণ, প্রকৃতি (-মাতা), প্রক্ষালন, প্রজাপতি, প্রণয়, প্রণয়ী, প্রণয়িনী, প্রতারণা, প্রতি (-মন, -দিন, -ধ্বনি, -নিশি, -বেশী, -মা), প্রদেশ, প্রবাস, প্রবাসী, প্রবাহিত, প্রবেশ, প্রভাত, প্রমাদ, প্রয়াসী, প্রশান্ত, প্রশ্বাস, -প্রাণ (-পণ, -ফাটা, -ভরা), প্রাণী, প্রান্তে, প্রেম, প্রেমিক, ফণা, ফুল (-ময়), বকুল, বক্ষ, -বচন, বজ্র, বদন, বঁধু, বধূ (টি), বন (ভূম), বন্দী, বন্ধন, বন্যা, বর্ষা, বেশ, বসন, বসন্ত, বহন, বহু, বাগ (দিক অর্থে), বাজ (বজ্র অর্থে), বাণী, বাতায়ন, বাতাস, বাহু, বাঁধ, বাধা, বাম, বায়ু, বারতা, -বারি, -বালিকা, বাঁশরি, -বাঁশি, বাতাস, বাষ্পজাল, বাহু, বিকশিত, বিকৃত, বিগত, বিচ্ছিন্ন, বিজন, বিজয়, বিজয়ী, বিদায়, বিদেশ, বিদ্যুৎ, বিদ্রোহী, বিধাতা, বিনয়, বিনাশ, বিন্দু, বিমল, বিরল, বিরাজ, বিরাম (-ময়), বিলাস, বিলাসী, বিশীর্ণ, বিশ্বচরাচর, বিশ্বাস, বিষণ্ণ, বিষম, বিষাদ, বিস্মৃতি, বিহঙ্গ, বীণা, বুক (-ফাটা), বৃক্ষশাখা, বৃষ্টি, বেগ, বেলা, ব্যয়, ব্যাকুল, ভক্তি, ভগ্ন, ভয়, ভরসা, -ভরে, -ভস্ম, ভস্মশেষ, -ভাতি, ভাব (-হীন), ভার, ভালো (বাস্, লাগ্), ভাষ, ভাষা, ভিক্ষা, ভিক্ষুক, ভিখারি, ভিত (র), ভীরু, ভীষণ, ভুজঙ্গ, ভুল, ভূতল, ভূমি, ভূষা, ভোর, মতন, মধুর, মন, মনোদুঃখ, মন্ত্র, মন্থন, মন্দির, মমতা, মরণ, মরুভূমি, মর্ম, মলয়, মলিন, মহা (ন), মা, মাতাল, মাথা, মান, মায়া, মার্জনা, মালা, -মালিকা, মিছা, মুখ (-খানি, -পানে, -বাগে), মুমূর্ষু, মুহূর্ত, মৃত (দেহ, -প্রায়, -শয্যা), মৃত্তিকা, মৃত্যুহীন, মৃদু (ল), মেঘ, -মেয়ে, মেলা, মোহন, ম্রিয়মাণ, ম্লান, যথা, যন্ত্রণা, যশ, যাতনা, যামিনী, যুগান্ত, যৌবন, রক্ত, রক্ষা, রজনী, রণ, রতি, -রত্ন, রবি, রসহীন, রাগ, রাগিনী, রাজ, রাজা, রাজ্য (-হারা), রাত, রাত্রি, রাত্রে, রানী, রাশি, রাহু, রূপ, রেখা রেণু, লতা, ললিত, ললাট, লহরী, লাজুক, লুকানো, লোহা, লৌহ, শত, শব্দ, শয়ন, শয়ান, শরৎ, শরম, শশী, শাখা, শান্ত, শান্তিময়, শিকল, শিখর, শিখা, শিথিল, শির, শিরা, শিশির, শিশু, শীতকাল, শীর্ণ, শুকতারা, শুকানো, শুধু, শুভ্র, শুষ্ক, শূন্য (তা), শৃঙ্খল, শেল, শেষ, শৈশব, শোণিত, শোষণ, শ্মশান, শ্যামল, শ্রান্ত, শ্বাস, সংগীত, সংগোপনে, সংগ্রাম, সংসার, সকরুণ, সখা, সখী, সঙ্গী, সচেতন, সতত, সতেজে, সদা (-ই), সন্তর্পণে, সন্ধ্যা (-বাতাস,

-বেলা), সবে (-মাত্র), সবলে, সভয়ে, সম (-স্বরে), সমর্পণ, সমাধি, সমীর (-ণ), সমুখে (-তে), সমুদয়, সমুদ্র, সম্পদ, সযতনে, সর্ব, সলিল, সহচর, সহসা, সাক্ষী, সাগর, সাঙ্গ, সাজ, সাড়া, সাথি, সাথে, সাধ (না), সান্ত্বনা, সায়াহ্ন, সারা (-দিন), সিক্ত, সিঁদুর, সিন্ধু, সীমন্ত, সীমাহারা, সুকুমার, সুকোমল, সুখ (-আশ্বাস), সুদূর, সুধা, সুধীরে, সুন্দর, সুবাস, সুবিশাল, সুমধুর, সুর (-গুলি), সূর্য, সৃজন, সেদিন, সোনা, সোহাগ, সৌন্দর্য, সৌরভ, স্তব্ধ (-তা), -স্থলে, স্নেহ (-ধারা, -ময়, -ময়ী), স্পন্দন, স্ফটিক, স্ফীত, স্মরণ, স্মৃতি, স্রোত, স্বদেশ, স্বপ্ন, স্বপন (-মালিকা), স্বর, স্বর্ণ, স্বাধীন, স্বামী, হলাহল, হসিত, হাত, -হারা, হারানো, হাস, হাসি, -হিল্লোলময়, হীনবল, হুলুধ্বনি, হৃদয় (-জুড়ানো, -নাশা, -নিভৃত, -পানে, -বাঁশি, -মাঝারে, -শাসন, -হীন), হেন, হেলাহেলি॥ **পদ্যের ভাষা**—আঁখি, আজি, আধেক, একেলা, কভু, গরব, -গরাসী, চিতে, জনম, তরাস, তিয়াষ, তৃষা, তৃষিত, নয়ান, পয়ান, পরশ, পরান, পিয়াস, পুরব, বয়ন, বরষ, বরষা, বায়, মগন, মরম (-তে, -রে, -স্থলে), মাঝার (-রে), রাতি, সজনি, সনে, হরষ, হিয়া, হৃদি। **ধাতুরূপ**— আইনু, আঁকড়িয়া, আছিল, আসিনু, আসিবারে, উপাড়িয়া, করিনু, করিবারে, চলিনু, নারিনু, নিরখে, নিহারি, ভায়, মাগিত, মাগিবারে, মুদিতে, মুদিয়া, যুঝিবারে, যুঝিলিনি, হানো, হেরি (লে)। **সর্বনাম**— আপনা (-রে), আমারে, কাহারে, কেহ, কোথা, তব, তায়, তারে, তাহারে, তাহে, তোমায়, তোমারে, তোরে, মম, মোর, মোরা, মোরে, যাহারে, যেথা (-য়), সবে (সকলে অর্থে), সবারেই, সেথা (-য়), সেদিন, হেথা (-য়), হোথায়। **অব্যয়**— অয়ি, কেবল, তরে, প্রতি, যথা, যবে, শুধু, সনে, সবে (কাল অর্থে), সম।

সাধারণভাবে প্রচলিত ধাতু ও ধাতুরূপ বর্জন করা হবে। তবে বিশিষ্ট ও বিরল রূপ নেওয়া হবে। যেমন— আঁকড়িয়া, উপাড়িয়া; পদ্যে ব্যবহৃত অসমাপিকা রূপ আসি, খুলি ইত্যাদি; আইনু, আসিনু, আসিবারে, উঠিবেক, করিছে, কাঁপায়ে ইত্যাদি বিশিষ্ট রূপ। এ ছাড়াও বিরল ও অপ্রচলিত (archaic) উথলা, এলা, কহ্ (চলতি ক), খেলা (ধাতু), ঠেকা, ভরা, দহ্, বহ্, বিছা, রট্, রহ্ (চলতি র), পলা, সহ্ ধাতু ব্যতীত কাড়্, কাঁদ্, ঘুমা, ছা, ছিনা, জাগ্, জুড়া, ডাক্, ডুব্, ঢাক্, ঢাল্, ঢুল্, নিবা, পোহা, ফুরা, মিটা, লুকা, শুকা, হাস্ প্রভৃতি তাৎপর্যময় ধাতুও নেওয়া হয়েছে। খেলা ধাতু বর্তমান খেল্ স্থলে রবীন্দ্র-কাব্যে দেখা যায়। প্রায় অপ্রচলিত শুধা ধাতুও গৃহীত। নামধাতু মাত্রই নেওয়া হবে।— আরম্ভিছে, উচ্ছ্বাসিবে, উজলিয়া, উদিবে, গ্রাসিছে, চমকি, চুমিয়া, চূর্ণিয়া, জনমি (-য়া), জন্মেছি, ঝংকারিয়া, তেয়াগি (-ল), ত্যজি, ধ্বসিয়া, নিবারে, নিবারিয়া, নিমীলিয়া, পশিয়া, পশে, পসারিয়া, প্রবেশিবে, প্রবেশিয়া, বরষিবে, বিপ্লাবিয়া, বেষ্টিয়া, ব্যাপি, ভ্রমি (-তেছে,-য়া), মুকুলিয়া, মুচকিয়া, মুরছি, রচিয়াছি, রচিস্, রচে, রচেছি, শিহরি (-য়া), শোভে, সঞ্চারে।

'সন্ধ্যাসংগীতে'র কনকর্ড্যান্সে বর্জিত শব্দাবলী (বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ধাতু)— অতি, অথবা, অধিক, আছ্ [আছিল], আছাড়্ [আছাড়িয়া], আজ [আজি], আন্ [আনিছে], আপন [আপনা], আপনার [আপনারে], আবার, আমরা, আমাদের, আমার [আমারে], আমারি, আমি, আর (-বার), আরো, আস্ [আসি, আসিনু, আসিবারে], উঠ্ [উঠিবেক], উড়্, উধাও, উপরে, এ, এই (-খানে,-বেলা,-যে,-রূপে), এও, এক (-ই,-টি,-টু,-জন,-তিল,-দিন,-দৃষ্টি,-ফোঁটা,-বার, -মাত্র), একে (একে,-কটি,-বারে), এখন (নো), এত (-দিন), এমন (নি), ঐ, ও (-ই, -খানে,-যে,-গো,-রে),

কখন (নো), কত (-খানি,-দিন,-না), ক'দিন, কবে, কর্ [করিছে (ন), করিনু, করিবারে], কাছ (ছে), কাট্ ধাতু, কাটা ধাতু, কাঁদ [কাঁদিবারে], কাঁপা [কাঁপায়ে], কারো, কাল (কল্য অর্থে), কি (অব্যয়), কিছু (-ই), কিন্তু, কিসের, কে [কেহ], কেন, কেবল (-লি), কোথায় [কোথা], কোনো, খণ্ড, খস্, খুঁজ্ ধাতু, খুল্ [অসমাপিকা খুলি], খেল্ [ভাববিশেষ্য খেলা, খেলাখেলি ও অপ্রচলিত ধাতুজাত খেলাইত, খেলাতে, খেলাবার, খেলায়], গা [ধাতুরূপ গাব, গাবে], যা ধাতু, গো, ঘট্ ধাতু, ঘা (আঘাত অর্থে), ঘির্ ধাতু, ঘের্ ধাতু, ঘুচ্ [ঘুচায়ে], ঘুমা [ঘুমায়ে], ঘুর্ ধাতু, চল্ [চলিনু], চা ধাতু, চাপ্ [অসমাপিকা চাপি], চারি (-দিক, -ধার, -পাশ), চিন্ ধাতু, চির (-কাল, -টি, -দিন), ছাড়্ ধাতু, ছিঁড়্ [অসমাপিকা ছিঁড়ি], ছুট্ ধাতু, জড়া [জড়ায়ে], জান্ ধাতু, জুড়া ধাতু, ঝন্ঝন্, ঝর্ঝর্, ঝর্ [ঝরিছে], ঝাঁপ [ঝাঁপায়ে], টান্ [অসমাপিকা টানি], টুট্ [অসমাপিকা টুটি], টুকটুকে, ডাক্ ধাতু, ডুব্ ধাতু, ঢাক্ ধাতু, ঢুল্ ধাতু, তখন (-নি), তত (-ই,-বার), তবু, তবে, তল (লে), তা (-ই,-ইতে,-ও), তাদের, তার (-রি), তারা (সর্বনাম), তাঁরা, তাহা (-রে,-রি), তুই, তুমি (-ও), তুল্ [অসমাপিকা তুলি], তেমনি, তো, তোমরা, তোমাদের, তোমার [তোমারে], তোরা, তোরি, থাক্ ধাতু, থাম্ [থামায়ে], থেকে থেকে, দা [দেছেন], দাঁড়া [দাঁড়ায়ে], দিক, দুই (-জন,-দিন), দু' (-দিন), দুল্ [অসমাপিকা দুলি], দেখ্ [দেখিবারে], ধর্ ধাতু, নড়্ [নড়িছে], নহ্ [নহিলে], না (-ই,-কো), নাম্ [নামায়ে, অসমাপিকা নামি], নাহি, নিজে (-রে), নে ধাতু, পড়্ [অসমাপিকা পড়ি, পড়িছে, পড়িবেক], পর [অপর ও পশ্চাৎ অর্থে], 'পরে, পা [পাইনু], পাড়া ধাতু, পাত্ ধাতু, পার্ ধাতু (সক্ষম হ অর্থে), পাশ (পার্শ্ব), পুড়া ধাতু, পুরা ধাতু, ফির [অসমাপিকা ফিরি], ফিরা [ফিরানু], ফুট্ [অসমাপিকা ফুটি], ফুটা ধাতু, ফাট্ ধাতু, ফেল্ [ফেলহ, অসমাপিকা ফেলি], ফোঁটা, ব ধাতু, বল্ ধাতু (কওয়া অর্থে), বস [অসমাপিকা বসি], বা (অব্যয়), বাঁচ্ ধাতু, বাছ্ ধাতু, বাজ্ [বাজায়ে, বাজিছে], বাড়্ ধাতু, বাঁধ্ [বাঁধিবারে], বার, বাস্ [ভালো বাস্], বিঁধ্ [অসমাপিকা বিঁধি], বুঝ্ ধাতু, বুঝি (অব্যয়), বেড়া ধাতু (ভ্রমণ কর্ অর্থে), ভর্ ধাতু, ভাঙ্ ধাতু, ভাব্ ধাতু, ভালো, ভাস্ ধাতু, ভুল্ [অসমাপিকা ভুলি], মত (তো), মর্ [মরিবারে], মর্মর, মাঝ (ঝে), মাঝে মাঝে, মিলা [অসমাপিকা মিলি, মিলিছে], মিশা ধাতু, মুছা ধাতু, মেলা [অসমাপিকা মেলি], যখন (-নি), যত (-দিন,-বার), যদি, যা (সর্বনাম), যা ধাতু, যার, যাহা (রা), যে (সর্বনাম), যেখানে, যেন, যেমন (-নি), র ধাতু [ধাতুরূপ রব, রবে], রাখ্ ধাতু, রে (অব্যয়), ল ধাতু [লয়ে, লয়েছে], লাগ [অসমাপিকা লাগি, লাগিছে], লুটা (লুণ্ঠিত হ), শিখা [শিখায়েছ, শিখায়েছিলে], শুন্ [অসমাপিকা শুনি, শুনিছে], শু ধাতু, সকল (-লি), সকলে (-ই), সব (-ই) সবাই, সমস্ত, সম্মুখে (-তে), সর্ ধাতু, সরা ধাতু, সে (-ই,-ও), সেই (-খানে), হ ধাতু, হইতে (অব্যয়), হা (য়), হারা [হারায়ে], হাহা, হুহু, হে।

উল্লিখিত বর্জিত ধাতুগুলির পার্শ্বস্থ তৃতীয় বন্ধনীভুক্ত রূপগুলি কনকর্ড্যান্সে গৃহীত। পদ্যে ব্যবহৃত অসমাপিকা ক্রিয়ার অসম্পূর্ণ ও বিশেষ-রূপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন— নামি (নামিয়া স্থলে), নামায়ে (নামিয়ে ও নামাইয়া এ দুই রূপের বিকল্পরূপ)। এ ছাড়া আনিছে (ঘটমান চলতি ছে ও সাধু ইতেছে এ দুয়ের বিকল্প), আইনু, আছাড়িয়া (আছড়ে ও আছড়াইয়া এ দুয়ের বিকল্প), আসিবারে, উঠিবেক, দেছেন, ফেলহ প্রভৃতি প্রাচীন ও অপ্রচলিত বা কেবল পদ্যে ব্যবহৃত ধাতুরূপগুলিও নেওয়া হয়েছে।

কনকর্ড্যান্সের নমুনা। 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত', 'ছবি ও গান', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' ও 'শেষ লেখা' কাব্য থেকে এই নমুনা কনকর্ড্যান্সে সংকলিত। সংকেত—স-সং = সন্ধ্যাসংগীত ; প্র-সং = প্রভাতসংগীত ; ছ-গা = ছবি ও গান। পরবর্তী সংখ্যাগুলি যথাক্রমে রচনাবলী খণ্ড, পৃষ্ঠা ও ছত্র -জ্ঞাপক। রচনাবলী বলতে বিশ্বভারতী সংস্করণ বুঝতে হবে।

অধর বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া স-সং ১।১৫।১৫
অতুল অধর দুটি ঈষৎ টুটিয়ে বুঝি ছ-গা ১।১৩৬।২৩
অধরে বসিয়া কেঁদে চায়, স-সং ১।৪২।৪
অধরে প্রাণের মলিন ছায়া, ছ-গা ১।১২০।১
অধরেতে পড়িবেক লুটিয়া। স-সং ১।৪।৮
জগতের অধরেতে হাসির জোছনা ফুটে, স-সং ১।২১।১৯
আধ-খোলা অধরেতে তার ছ-গা ১।১১৮।২৩
অধরেতে স্খলিতচরণা ছ-গা ১।১২১।২৩
অধরেতে হাসির মাঝারে, ছ-গা ১।১২২।৪
অধরের কোণে হাসিটি ছ-গা ১।১০৬।২২
হাসিহীন দুঅধর, জ্যোতিহীন দুনয়ন ! স-সং ১।২১।২৩
অমনি হাসিটি জাগে মলিন অধরপুটে, স-সং ১।২১।৬
সুকোমল অধর-শয়নে। স-সং ১।৩৯।১৪

অনন্ত অনন্ত আকাশতলেতে বসি একাকিনী স-সং ১।১।২
অনন্ত এ আকাশের কোলে স-সং ১।৩।২১
আছে যেথা অনন্ত পিয়াস, স-সং ১।২০।১০
এ অনন্ত আকাশ সাগরে প্র-সং ১।৬৯।২৪
আমাদের অনন্ত মরণ, প্র-সং ১।৭০।২
মরণের অনন্ত উৎসব। প্র-সং ১।৭০।১০
চারি দিকে অনন্ত আকাশ, প্র-সং ১।৭৪।২৪
অনন্ত জীবনপথে খুঁজিয়া চলিব তোরে, প্র-সং ১।৮০।৩
অনন্ত প্রাণের পথে বরষিবি গীতধারা, প্র-সং ১।৮০।৭
পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন, প্র-সং ১।৮০।১৯
অনন্ত হৃদয়ে তাঁর ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান প্র-সং ১।৮২।১৯
নিস্তরঙ্গ রহিয়াছে অনন্ত আনন্দ পারাবার— প্র-সং ১।৮২।২৩
অনন্ত ভাবের দল, হৃদয়-মাঝারে তাঁর প্র-সং ১।৮৩।২৭
যে প্রাণ অনন্ত যুগ রবে প্র-সং ১।৮৪।২৭
আনন্দে অনন্ত প্রাণ যেন প্র-সং ১।৮৪।২৯
অনন্ত আকাশে দাঁড়াইয়া প্র-সং ১।৮৫।২১
অনন্ত এ আকাশ-মাঝারে। প্র-সং ১।৯০।১৪
আকাশের অনন্ত হৃদয়— প্র-সং ১।৯১।১২
অনন্ত আকাশগ্রাসী অনলসমুদ্রমাঝে প্র-সং ১।৯১।২৫
শিরোপরি অনন্ত আকাশ, ছ-গা ১।১২৩।২
অনন্ত সে পারাবার ডুবাইছে চারিধার, ছ-গা ১।১২৩।১৯
এ অনন্ত অন্ধকারে কে রে সে, খুঁজিছে কারে, ছ-গা ১।১৩০।১১
অনন্ত আকাশ-'পরি ছুটিস রে হাহা করি, ছ-গা ১।১৩০।১৭
ধ্বনিয়া অনন্ত অন্ধকারে। ছ-গা ১।১৩১।৪
এ পাষাণ প্রাণ অনন্ত শৃঙ্খল ছ-গা ১।১৪০।১৪
অনন্তকালের সঙ্গী আমি তোর ছ-গা ১।১৪১।১
অনন্ত সে বিভাবরী। ছ-গা ১।১৪২।১৪

অনন্ত এ ক্ষুধা অনন্ত এ তৃষা ছ-গা ১।১৪৩।১৯
অনন্ত দিবস নিশি ছ-গা ১।১৪৮।১০
অনন্ত রজনী শুধু ছ-গা ১।১৪৯।২২
রোগীর দেহের মাঝে অনন্ত শিশুরে
দেখেছে কি। আরোগ্য ২৫।৫৮।১০
অনন্ত তারে অন্তসীমায় জানায় আবির্ভাব।
জন্মদিনে ২৫।৮০।১০
একে একে সুরগুলি ; অনন্তে হারায়ে যায়
স-সং ১।৪৫।১৯
দুজনে অনন্তে ডুবি নিশিদিন ছ-গা ১।১৪২।২৩
দেখি আজি এ অনন্তে ছ-গা ১।১৪৮।২২
অনন্তের সুদূর সুদূরে। ছ-গা ১।১৪৯।২৭
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ
বিরাজে। আরোগ্য ২৫।৪১।১৮
দিগন্তের নীলিমায় চোখে পড়ে অনন্তের
ভাষা। আরোগ্য ২৫।৪৮।১২
অনন্ত-জীবন মহাদেশ, প্র-সং ১।৬৮।১
মিশিবি সে সিন্ধুজলে অনন্তসাগরতলে,
প্র-সং ১।৬৮।৭

আকাশ আকাশ পুরিয়া গীতোচ্ছ্বাসে।
স-সং ১।২৩।২৫
আকাশ ধরিয়া হাতে নক্ষত্র-অক্ষর দেখি
স-সং ১।৪৩।১৯
ভোরের আকাশ ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া
প্র-সং ১।৫৪।১১
জগত-অতীত আকাশ হইতে প্র-সং ১।৫৪।১৩
অতিদূর দূর আকাশ হইতে প্র-সং ১।৫৬।৯
আকাশ, এস এস, ডাকিছ বুঝি ভাই—
প্র-সং ১।৬৪।৫
আকাশ পুরিয়া যাবে শেষ, প্র-সং ১।৬৬।৮
উঠিবে জীবন মোর কত-না আকাশ ছেয়ে,
প্র-সং ১।৬৯।১৪
অনন্ত আকাশ নীল, প্র-সং ১।৭৩।২০
আকাশ পুরেছে কলস্বরে। প্র-সং ১।৭৪।২০
চারি দিকে অনন্ত আকাশ, প্র-সং ১।৭৪।২৪
অবশেষে আকাশ ব্যাপিয়া প্র-সং ১।৮৫।১
অসীম স্নেহে আকাশ হতে প্র-সং ১।৯৭।২২
আকাশ যেন আমারি তরে প্র-সং ১।৯৮।২৩
শিরোপরি অনন্ত আকাশ, ছ-গা ১।১২৩।২
আকাশ বলে 'এসো এসো' কানন বলে
'বোসো বোসো' ছ-গা ১।১২৫।২৩
তন্ন তন্ন আকাশ গহ্বর। ছ-গা ১।১৩০।১২
সে বিলাপ কেঁপে কেঁপে বেড়াবে আকাশ
ব্যেপে ছ-গা ১।১৩১।৩
কাঁপিছে আকাশ। ছ-গা ১।১৫৫।১২
আকাশ করিয়া পূর্ণ স্বপ্ন করে আনাগোনা
ছ-গা ১।১৫৮।১৭
আকাশ করিবে পূর্ণ। রোগশয্যায় ২৫।৩১।২১
আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
রোগশয্যায় ২৫।৩৫।১৪
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।
রোগশয্যায় ২৫।৩৫।১৭
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ
করতালি। জন্মদিনে ২৫।৮৩।২৪
সমুচ্চ আকাশ হতে ধুলায় পড়িবে অঙ্গহীন—
জন্মদিনে ২৫।৯৫।৭
অতল আকাশে। স-সং ১।৭।১৭
ওই অতল আকাশে। স-সং ১।৭।২২
আকাশে তারকা রাশি রাশি, স-সং ১।১২।১৩
ওই-যে আকাশে শোভে চন্দ্রসূর্যগ্রহ,
স-সং ১।২২।৬
আকাশে হাসিয়া ফুটে রয়, স-সং ১।২২।২১
আকাশে হেরিলে শশী আনন্দে উথলি উঠি
স-সং ১।২৩।১৯
আকাশে উঠিতে চায় প্রাণ—
স-সং ১।২৩।২৭

আকাশে তুলে আঁখি বাতায়নে বসে থাকি
স-সং ১।২৭।৪
আকাশে হাসিবে তরুণ তপন,
প্র-সং ১।৫৩।১৩
আকাশে আকাশে উথলিবে শুধু
প্র-সং ১।৫৩।২৩
যত গান উঠিতেছে ধরার আকাশে
প্র-সং ১।৬৬।৬
বসুন্ধরা ফুটিছে আকাশে, প্র-সং ১।৬৮।১১
পলে পলে উঠিবে আকাশে প্র-সং ১।৬৯।৮
আকাশে অসীম নীরবতা— প্র-সং ১।৭৭।২২
ফুলের সৌরভগুলি আকাশে খেলাতে এসে—
প্র-সং ১।৭৭।২৫
অনন্ত আকাশে দাঁড়াইয়া প্র-সং ১।৮৫।২১
আকাশে পুরিল পরিমল। প্র-সং ১।৮৮।৮
নিবিড় রাতে আকাশে উঠে প্র-সং ১।৯৯।২৯
হৃদয় মোর আকাশে উঠে প্র-সং ১।১০০।২৯
আজ একেলা বসিয়া, আকাশে চাহিয়া,
ছ-গা ১।১০৭।১৩
সোনার রবি-আলো আকাশে মিলাইল।
ছ-গা ১।১১১।১১
সহসা সে ঋষিবর আকাশে তুলিয়া কর
ছ-গা ১।১২৪।১৭
কেশপাশ আকাশে ছড়ায়ে। ছ-গা ১।১৩০।৩০
দেখিব পাখি আকাশে ওড়ে, প্র-সং ১।৯৪।২১
তাহারি মতো আকাশে উঠে, প্র-সং ১।৯৫।৫
হাসির ধ্বনি উঠেছে আকাশে।
ছ-গা ১।১১৮।৩
চেয়ে তাই সুনীল আকাশে ছ-গা ১।১২২।২৭
যে দিকে চাহিবি আকাশে আমার
ছ-গা ১।১৪১।১৪
আকাশে অগণ্য গ্রহতারা
রোগশয্যায় ২৫।১২।২

অনাদি আকাশে। রোগশয্যায় ২৫।১৩।৫
আমার রোগীর ঘরে আবদ্ধ আকাশে
রোগশয্যায় ২৫।১৭।৮
লক্ষ কোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
রোগশয্যায় ২৫।২৪।৪
ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি
মেলিয়া রোগশয্যায় ২৫।২৪।৮
শুনি এই আকাশে বাতাসে ;
রোগশয্যায় ২৫।২৮।১৭
এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
রোগশয্যায় ২৫।২৯।৭
আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে
আরোগ্য ২৫।৪৯।২
সুপ্ত রাত্রে বিশ্বের আকাশে
আরোগ্য ২৫।৫৮।২২
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে
সমীরণে জন্মদিনে ২৫।৭৩।২৩
আকাশে বাতাসে। জন্মদিনে ২৫।৮৫।১৬
আকাশে আকাশে যেন বাজে,
জন্মদিনে ২৫।৯২।১৭
বিরাট আকাশে, জন্মদিনে ২৫।৯৭।১৮
মাঝে মাঝে একদিন আকাশেতে নাই আলো,
প্র-সং ১।৫৭।২৩
শুনিতে শুনিতে যাই আকাশে তুলে আঁখি—
প্র-সং ১।৭৩।১২
আকাশেতে ভাসে মেঘ, আকাশেতে ওড়ে
পাখি। প্র-সং ১।৭৩।১৩
অনাদি কাল চলে স্রোত অসীম আকাশেতে,
প্র-সং ১।৯২।৫
অসীম কাল ভেসে যাব অসীম আকাশেতে,
প্র-সং ১।৯২।১৩
আকাশেতে চেয়ে দেখে,
ছ-গা ১।১১১।১৯

নীল আকাশেতে নারিকেল-তরু,
ছ-গা ১।১১৩।১৩
আকাশেতে পাখিটি ওড়ে না।
ছ-গা ১।১১৭।২৫
আকাশেতে তারা অনিমিখ ; ছ-গা ১।১১৯।১৯
আকাশেতে হাসবে বিধু, ছ-গা ১।১২৭।২২
আকাশেতে উঠিয়াছে আধখানি চাঁদ,
ছ-গা ১।১৫০।৯
অনন্ত এ আকাশের কোলে স-সং ১।৩।২১
স্নেহ করি আকাশের প্রায়। স-সং ১।২৩।৭
নিশীথের অন্ধকার আকাশের পটে
স-সং ১।৩৩।১৩
আকাশের দৈত্যবালা উন্মাদিনী চপলারে
স-সং ১।৪৩।১৭
আকাশের পানে চাই, সেই সুরে গান গাই,
স-সং ১।৪৫।১৭
আকাশের পানে উঠিতে চায়। প্র-সং ১।৫৯।৬
আকাশের সাগরসীমায়! প্র-সং ১।৬৬।৩
উঠিব সে আকাশের পথে, প্র-সং ১।৬৯।১৯
উঠিতেছে ডুবিতেছে রাত্রিদিন
আকাশের তলে। প্র-সং ১।৮০।২৬
আকাশের মহাক্ষেত্রে শৈশব-উচ্ছ্বাস বেগে
প্র-সং ১।৮৪।৯
আকাশের অনন্ত হৃদয়— প্র-সং ১।৯১।১২
আকাশের মাঝে হয় হারা।
প্র-সং ১।১১১।২৩
আকাশের ধারে ধারে ঘিরে ছ-গা ১।১১৬।২০
আকাশের এক ধার থেকে ছ-গা ১।১১৭।১৭
চেয়ে আছে আকাশের পানে ছ-গা ১।১২১।৫
আকাশের পানে চাই— চন্দ্র নাই, তারা নাই,
ছ-গা ১।১৩৩।৫
আকাশের পানে চেয়ে জাগিয়া রয়েছি বসি,
ছ-গা ১।১৫৮।১৩

আকাশের পার হতে, আঁধার ফেলিছে ভরি।
ছ-গা ১।১৫৮।২১
এ উহারে ডাকিতেছে আকাশের পানে
চেয়ে— ছ-গা ১।১৫৯।২
আকাশের ভালে। রোগশয্যায় ২৫।১২।১৩
আকাশের বক্ষতল করি অবারিত
রোগশয্যায় ২৫।৩৪।৮
আকাশের হৃৎস্পন্দন আরোগ্য ২৫।৪২।৫
যূথভ্রষ্ট শুভ্র মেঘ পড়ে থাকে আকাশের কোণে।
আরোগ্য ২৫।৪৩।৭
শূন্য আকাশের নীচে শূন্যতার ভাষ্য করে যেন।
আরোগ্য ২৫।৪৫।২৬
অতি দূরে আকাশের সুকুমার পাণ্ডুর নীলিমা।
আরোগ্য ২৫।৪৭।১৩
আকাশের যেন কোন দূর কেন্দ্র হতে
আরোগ্য ২৫।৪৮।৬
তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্তল
জন্মদিনে ২৫।৭২।২২
আকাশের অনিমেষ দৃষ্টির ডাকে দিত সাড়া,
জন্মদিনে ২৫।৮৮।২২
আকাশেরে যেন ফেলিতে ছিঁড়িয়া
প্র-সং ১।৫৮।২৮
আঁকড়ি ধরিতে চাহি উৎকণ্ঠায় শূন্য আকাশেরে
রোগশয্যায় ২৫।৩৬।১৬
আকাশগরাসী তার কান্না। স-সং ১।৩৫।৬
অনন্ত আকাশগ্রাসী অনলসমুদ্রমাঝে
প্র-সং ১।৯১।২৫
অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী স-সং ১।১।২
সুদূর আকাশতলে, ছ-গা ১।১০৮।৬
পাশের গলির চিক-ঢাকা ঐ ঝাপসা
আকাশতলে জন্মদিনে ২৫।৯৬।১৫
নীরব চন্দ্রমা-তারা, নীরব আকাশ-ধরা—
ছ-গা ১।১৬১।১৬

মিশেছে আকাশ নীলিমায়।
ছ-গা ১।১৪৪।১৩
অনন্ত আকাশ-'পরি ছুটিস রে হাহা করি,
ছ-গা ১।১৩৩।১৭
ও দিকে আকাশ-'পরে মাঝে মাঝে থেকে থেকে ছ-গা ১।১৫৫।৯
আকাশপানে চাই কী জানি কারে দেখি!
প্র-সং ১।৬২।২৪
আকাশপানে মগন-মনা, প্র-সং ১।৯৭।৪
আকাশপানে চাহিয়া থাকে প্র-সং ১।৯৮।১
আকাশপানে চাহিলে পরে প্র-সং ১।৯৮।৭
আকাশপানে তুলিলে মুখ। প্র-সং ১।৯৮।৮
আকাশপানে ফুটিতে চায়। প্র-সং ১।৯৯।২৮
আকাশ-পারে কে যেন ব'সে, প্র-সং ১।৯৭।৭
আকাশ-পারাবার বুঝি হে পার হবে—
প্র-সং ১।৬৪।১১
ভাসিতে গেছে সাধ আকাশ-পারাবারে।
প্র-সং ১।৬৪।৪
আকাশবাণীর সাথে প্রাণের বাণীর
রোগশয্যায় ২৫।৩২।১১
আকাশভরা প্রাণ, প্র-সং ১।৯৮।২৬
হৃদয় মোর আকাশ মাঝে প্র-সং ১।৯৯।২৫
আকাশ-মাঝে ভাসিতে চায়—
প্র-সং ১।১০০।৫,১৫
আকাশ-মাঝে মাথাটি থুয়ে—
প্র-সং ১।১০০।১২
আঁধার আকাশ-মাঝে আঁখি চারি দিকে চায়। ছ-গা ১।১৫৮।১৯
অনন্ত এ আকাশ-মাঝারে। প্র-সং ১।৯০।১৪
আকাশ-সমুদ্র-তলে গোপনে গোপনে
প্র-সং ১।৬৬।৪
আকাশ-সমুদ্রে-ঘেরা স্বর্ণ দ্বীপের পারা
ছ-গা ১।১৪৪।২৬

এ অনন্ত আকাশসাগরে, প্র-সং ১।৬৯।২৪
পশ্চিমের আকাশসীমায় ছ-গা ১।১২০।২৭
শব্দশূন্য নিশীথ-আকাশে
আরোগ্য ২৫।৪৫।১৭
প্রভাত-আলোয় মগ্ন ঐ নীলাকাশ
আরোগ্য ২৫।২৫।১৩
নীলাকাশ করো অবারিত;
রোগশয্যায় ২৫।২৮।৬
পুরব-আকাশ হতে উঠিবে উচ্ছ্বাস,
প্র-সং ১।৬৫।৭
পুরব-আকাশ-সীমা হতে। ছ-গা ১।১২৪।২
মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন-আকাশে। আরোগ্য ২৫।৪৩।২৬
নক্ষত্র-খচিত মহাকাশে জন্মদিনে ২৫।৭৫।৪
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে। শেষ লেখা ২৬।৪৩।১৬
বিষ্ণু আসি মহাকাশে লেখনী ধরিয়া করে
প্র-সং ১।৮৬।৭
সাঁঝের সোনা-আকাশে, ছ-গা ১।১১৭।৮

আঁখি মুখে তার আঁখি দুটি রাখ্,
স-সং ১।১৬।২৭
মুখ দিয়া আঁখি দিয়া বাহিরিতে চায় হিয়া,
স-সং ১।১৯।৮
কভু ঢুলে-পড়া আঁখি কভু অশ্রুভারে নত।
স-সং ১।২১।১৫
শুষ্ক আঁখি করিয়া মন্থন। স-সং ১।২৫।৮
আকাশে তুলে আঁখি বাতায়নে বসে থাকি
স-সং ১।২৭।৪
সদাই করুণ আঁখি মেলি স-সং ১।২৭।২১
করুণা সে জননীর আঁখি স-সং ১।৩০।১
আঁখি হতে সব কিছু পড়িতেছে ঢাকা।
স-সং ১।৩৭।২২
স্নেহময় ছায়াময় সন্ধ্যাসম আঁখি মেলি
স-সং ১।৪৫।৩

ওই আঁখি দুটি— স-সং ১।৪৫।৬
আঁখিপানে দুটি আঁখি তুলি। স-সং ১।৪৬।১৪
ডাকিছে 'ভাই ভাই' আঁখিতে আঁখি তুলি। প্র-সং ১।৬২।৮
যে দিকে আঁখি চায়, সে দিকে চেয়ে থাকে, প্র-সং ১।৬৩।৯
শুনিতে শুনিতে যাই আকাশেতে তুলে
আঁখি— প্র-সং ১।৭৩।১২
শুনিব রে আঁখি মুদি বিশ্বের সংগীত প্র-সং ১।৭৭।১১
আঁখি দিয়া অশ্রুবারি ঝরে— প্র-সং ১।৭৭।১৪
আঁখি যেন কার তরে পথপানে চেয়ে আছে প্র-সং ১।৭৮।৬
স্নেহেতে ভরা করুণ আঁখি— প্র-সং ১।৯৫।২৭
দুইটি আঁখি দিয়ে। প্র-সং ১।৯৬।১৬
করুণ আঁখি করিছে প্রাণে প্র-সং ১।৯৮।২৯
মুদিয়া যেন এসেছে আঁখি, প্র-সং ১।১০০।১১
ধরার পানে মেলিয়া আঁখি প্র-সং ১।১০০।১৬
বসন্ত বাতাসে আঁখি মুদে আসে ছ-গা ১।১০৭।১৭
দেখে রবির আঁখি ভোলে রে। ছ-গা ১।১১০।৯
আঁখি দুটি নৃত্য করে, ছ-গা ১।১১৭।১০
আলোতে ছেলেতে ফুলে
একসাথে আঁখি খুলে ছ-গা ১।১১৯।১৪
শূন্য আঁখি চেয়ে আছে, উদার বুকের কাছে ছ-গা ১।১২৩।৭
আঁখি তার দেখে কি দেখে না। ছ-গা ১।১২৫।৪
সুমুখে আঁখি রেখে ছ-গা ১।১২৫।১২
চাঁদের কিরণ পান করে ওর ঢুলুঢুলু দুটি আঁখি ছ-গা ১।১২৬।২০
আঁধারেতে আঁখি ফুটে ঝটিকার 'পরে ছুটে ছ-গা ১।১৩০।২৭
আঁখি যেন ডুবে গিয়ে কূল পায় না। ছ-গা ১।১৩৫।১৮
অমিয়-মাধুরী মাখি চেয়ে আছে দুটি আঁখি ছ-গা ১।১৩৮।১৩
আঁখি হতে স্নেহ কুড়াইছে। ছ-গা ১।১৩৮।১৬
আঁখি দিয়ে পরান উথলে— ছ-গা ১।১৩৮।১৮
এই অনিমেষ তৃষাতুর আঁখি ছ-গা ১।১৪৩।৭
আঁখি দুটি মুদে আমি ছ-গা ১।১৪৮।১৬
দুঃস্বপ্ন ভাঙিয়া যেন শিহরি মেলিছে আঁখি ছ-গা ১।১৫৩।৩
প্রাণ যেন কেঁদে ওঠে, অশ্রুজলে ভাসে আঁখি ছ-গা ১।১৫৭।১৭
নিদ্রাহীন আঁখি মেলি পুরব-আকাশ-পানে ছ-গা ১।১৫৮।১
আঁধার আকাশ-মাঝে আঁখি
চারি দিকে চায়। ছ-গা ১।১৫৮।১৯
ঘুম ঘুম আঁখি মেলি তোমরা স্বপনবালা, ছ-গা ১।১৫৯।২৩
অবিশ্রাম লুকাচুরি— আঁখি না সন্ধান পায়। ছ-গা ১।১৬০।৭
উদয়দিগন্ত-পানে মেলিলাম আঁখি, জন্মদিনে ২৫।৬৯।৩
আঁখি যার কয়েছিল কথা, শেষলেখা ২৬।৪৩।২
আঁখিটি ফুটি ফুটি। প্র-সং ১।৯৯।৮
আজকে তবে আঁখিটি তোর খোল্, ছ-গা ১।১১৬।১১
আঁখিতে ডুবিয়া থাক্ আঁখি। ছ-গা ১।১৩৩।২০
কুবলয়-আঁখির মাঝারে স-সং ১।৩১।৯
মনে হল আঁখির কোণে ছ-গা ১।১০৫।১৫
আধেক মুদি আঁখির পাতা, ছ-গা ১।১২৭।৪
আঁখির আলোকছায়া আঁখিরে রয়েছে ঘিরে, ছ-গা ১।১৩৬।১৩

নিমেষহারা আঁখির পাতা দুটি
ছ-গা ১।১৫১।২০
আঁখির পাতার 'পরে কেহ বা দুলিছে বসি।
ছ-গা ১।১৫৯।৯
রয়েছি চকিত হয়ে আঁখির নিমেষ ভুলি—
ছ-গা ১।১৫৯।১৪
ঘুমন্ত আঁখির কোণে দেখা দিবে আঁখিজল,
ছ-গা ১।১৬১।৫
ঘুম এনে দেয় আঁখিপাতে, ছ-গা ১।১১৮।১৫
তার করস্পর্শ, তার বিনিদ্র ব্যাকুল
আঁখিপাতে। রোগশয্যায় ২৫।২১।১১
ঈষৎ মেলিয়া আঁখিপাতা স-সং ১।৪।৫
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
আরোগ্য ২৫।৫১।৫
নয়ন ডুবে যায় শিশির-আঁখি-ধারে,
প্র-সং ১।৬৩।১৯
আনমনে শূন্য-আঁখি। ছ-গা ১।১৩৪।১৪
আঁখিয়া আধমুকুলিত আঁখিয়া।
ছ-গা ১।১০৬।২৫
আছিল এই-যে জ্যোতির বিন্দু আছিল
তাদের মাঝে স-সং ১।৬।৬
যেমন আছিল আগে তেমনি রয়েছে
জ্যোতি। স-সং ১।৭।১০
(এত গর্ব আছিল কি তার) স-সং ১।৭।১২
আছিল অনাদি অন্ধকার, প্র-সং ১।৯১।২২
আছিল যে আপনার সে বুঝি রে নাই আর,
ছ-গা ১।১৩১।২৪
যে প্রাণ আছিল তোরি তাহারি দুয়ার ধরি
ছ-গা ১।১৩২।৫
তবু জানি, অজানার পরিচয় আছিল নিহিত
জন্মদিনে ২৫।৮০।১৮
যাহা কিছু আছিল দিবার,
শেষ লেখা ২৬।৪৮।২

আনন্দ অসীম আনন্দ-উপহার
স-সং ১।২৩।২১
তেমনি সমুদ্র-ভরা আনন্দ তাহারে দিই
স-সং ১।২৩।২২
জগতের আনন্দ যে তোরা, প্র-সং ১।৬৫।৯
কেন এ আনন্দ চারি ধারে। প্র-সং ১।৭৫।১০
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ
বিরাজে। আরোগ্য ২৫।৪১।৮
নির্মম আনন্দ এই উৎসবের বাজাইবে বাঁশি
জন্মদিনে ২৫।৭২।১৪
আনন্দে গাহিছে প্রাণ খুলি, প্র-সং ১।৬৭।৬
আনন্দে পুরেছে প্রাণ, হেরিতেছে এ জগতে
প্র-সং ১।৭০।৯
আনন্দে হতেছে কভু লীন—
প্র-সং ১।৭০।২২
আনন্দে করিছে খেলা প্র-সং ১।৭৩।২৩
ভাবের আনন্দে ভোর, গীতিকবি চারি মুখে
প্র-সং ১।৮৩।১৯
আনন্দে ভাঙিয়া যেতে চায়।
প্র-সং ১।৮৪।২৬
আনন্দে অনন্ত প্রাণ যেন। প্র-সং ১।৮৪।২৯
চন্দ্র হাসে আনন্দে গলিয়া। প্র-সং ১।৮৭।১৪
আনন্দে হল রে আপন-হারা।
ছ-গা ১।১১৬।১৫
মিলে মিশে স্নেহে প্রেমে আনন্দে উল্লাসে
ছ-গা ১।১৫০।২৩
কবে রে প্রভাত হবে আনন্দে বিহঙ্গগুলি
ছ-গা ১।১৫৮।৩
আনন্দে আলোকসভা মাতে
রোগশয্যায় ২৫।৩১।১৩
আনন্দে আনন্দময় আরোগ্য ২৫।৫২।১৭
দেখেছে আনন্দে যারে প্রাণ দেওয়া যায়,
আরোগ্য ২৫।৫৪।৫

আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ, জন্মদিনে ২৫।৮৩।২৫
গান গাই আনন্দের ভরে। প্র-সং ১।৬৫।৪
চাহিয়া ধরণীর পানে নব আনন্দের গানে প্র-সং ১।৭০।২৩
আনন্দের সমুদ্রের তীরে। প্র-সং ১।৭৪।১৪
একী হেরি আনন্দের মেলা! প্র-সং ১।৭৫।৪
আনন্দের আন্দোলনে ঘন ঘন বহে শ্বাস, প্র-সং ১।৮৩।২১
আনন্দের বিচ্ছুরিত আলো আরোগ্য ২৫।৫২।১৩
গূঢ় আনন্দের যত ভাষাহীন বিচিত্র সংকেতে জন্মদিনে ২৫।৮৪।১৯
আনন্দের অন্ত নাহি পায়। প্র-সং ১।৮৮।২২
চেয়ে আছ আনন্দের ভরে। ছ-গা ১।১৩৯।৬
আনন্দের স্পর্শ দিয়ে সত্যের প্রত্যয় দেয় এনে। রোগশয্যায় ২৫।১৬।১৯
উচ্ছ্বসিল আনন্দের নিশ্বাস নিখিলে। রোগশয্যায় ২৫।৩৩।২৬
বাষ্পের সে শিল্প কাজ যেন আনন্দের অবহেলা আরোগ্য ২৫।৬২।১৫
আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই, আরোগ্য ২৫।৬৬।১
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে। আরোগ্য ২৫।৬৬।১০
আনন্দের বাঁধ দিল খুলে। জন্মদিনে ২৫।৭১।১৩
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোজ, জন্মদিনে ২৫।৭৭।২৬
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে জন্মদিনে ২৫।৭৮।২৫
শান্ত আনন্দের আমন্ত্রণে শেষ লেখা ২৬।৪৫।১৫

আনন্দ-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ রোগশয্যায় ২৫।২৭।৩
আনন্দ-অমৃতরূপে— রোগশয্যায় ২৫।২৯।৮
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ আরোগ্য ২৫।৬৬।১৬
ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দ-কোলাহল প্র-সং ১।৯১।৫
আত্মার আনন্দক্ষেত্রে তার আত্মীয়তা জন্মদিনে ২৫।৭১।২০
নিস্তরঙ্গ রহিয়াছে অনন্ত আনন্দপারাবার— প্র-সং ১।৮২।২৩
আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি রোগশয্যায় ২৫।৩৫।১৪
সর্বাঙ্গে তরঙ্গি উঠে আনন্দপ্রবাহ। আরোগ্য ২৫।৫৩।২৩
আনন্দ-মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে প্র-সং ১।৭০।২১
পলাশ আনন্দমূর্তি জীবনের ফাল্গুন দিনের, আরোগ্য ২৫।৫১।১৭
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি, আরোগ্য ২৫।৪১।১৩
পৃথিবীতে উঠিয়াছে আনন্দলহরী প্র-সং ১।৬৫।১২
সহসা আনন্দসিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া, প্র-সং ১।৮৩।২
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি জন্মদিনে ২৫।৭৯।৫
লেগেছে ভাবের ঘোর, মহানন্দে পূর্ণ তাঁর প্রাণ প্র-সং ১।৮২।২১
আনন্দিত আপনার আনন্দিত রবে। রোগশয্যায় ২৫।৩১।২২
বলে, আমি আনন্দিত— ছন্দ যায় থামি— আরোগ্য ২৫।৪৭।১১

আমারে আমারে ডাকিবে একবার—
স-সং ১।১৯।২২
আমারে যে করেছ সৃজন, স-সং ১।২২।৯
মুছে তুমি ফেলহ আমারে— স-সং ১।২৩।২
তারাও আমারে ভালোবাসে—
স-সং ১।২৬।১১
দুই বাহু প্রসারিয়া আমারে বুকেতে নিয়া
স-সং ১।২৭।১
সবাই আমারে ভালোবাসে স-সং ১।২৭।২৪
আমারে করনি তবে দান ? স-সং ১।৩৬।২৬
হারায়েছি আমার আমারে, স-সং ১।৪১।২০
আমারে বাসিস কেন পর ? ছ-গা ১।১১৩।৮
দাও আমারে আনি—
রোগশয্যায় ২৫।১১।১৮
আমারে লয় ডাকি, রোগশয্যায় ২৫।১১।২০
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও ;
রোগশয্যায় ২৫।২৮।১১
আমারেই ফেলে গেল গো।
স-সং ১।১১।১১
উৎসব উৎসব ফুরায়ে গেলে ছিন্ন শুষ্কমালা
স-সং ১।১০।৫
মরণের অনন্ত উৎসব প্র-সং ১।৭০।১০
স্বরলোকে নৃত্যের উৎসবে
রোগশয্যায় ২৫।৫।১
অস্খলিত ছন্দসূত্রে অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে।
রোগশয্যায় ২৫।২৯।১২
তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে
শেষ লেখা ২৬।৪৯।১
উৎসবের প্রাঙ্গণ-বাহিরে
আরোগ্য ২৫।৫১।২১
উৎসবের পথ আরোগ্য ২৫।৫২।১৯
আরবার ফিরে এল উৎসবের দিন
জন্মদিনে ২৫।৭২।১
নির্মম আনন্দ এই উৎসবের বাজাইবে বাঁশি
জন্মদিনে ২৫।৭২।১৪
উৎসব-আলোর পায় একটুকু খণ্ডিত আভাস,
রোগশয্যায় ২৫।২৩।২
যে ধ্বনির কলোৎসব অরণ্যের পল্লবে পল্লবে,
জন্মদিনে ২৫।৯১।১৮
উদার উদার অলক দুলাইয়া স-সং ১।৪।১১
মেটাবার আছে তার অক্ষুণ্ণ উদার অবসর,
আরোগ্য ২৫।৫৯।১৯
পশ্চিমে ডুবেছে ইন্দু, সম্মুখে উদার সিন্ধু,
ছ-গা ১।১২৩।১
শূন্যে আঁখি চেয়ে আছে, উদার বুকের কাছে
ছ-গা ১।১২৩।৭
গগনের উদার ললাট—
ছ-গা ১।১২৪।১৬
অসীম উদার শূন্যে ছ-গা ১।১৪৮।২০
কপোল কোমল কপোল দিয়া কপোল
চুম্বন করি স-সং ১।২৭।১৭
স্তব্ধতা কপোলে হাত দিয়ে স-সং ১।৩।১৩
শ্রান্ত কপোলেতে তোর করিবে বাতাস
স-সং ১।১৬।৫
কপোলেতে হাত দিয়ে দেখে
রোগশয্যায় ২৫।১৭।১৩
রাঙা ওই কপোলখানিতে ছ-গা ১।১৫২।৭
করিবারে সে চাহে উজ্জ্বল করিবারে
স-সং ১।২৪।১৭
সে চাহে উর্বর করিবারে স-সং ১।২৪।১৮
ব্যাপ্ত করিবারে ছোটে প্রচণ্ড আবেগে।
রোগশয্যায় ২৫।৮।২৩
কালের অসীম শূন্য পূর্ণ করিবারে
রোগশয্যায় ২৫।৩০।১৪
কারো কাছে করিবারে লাভ,
আরোগ্য ২৫।৫৬।১৩

সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
শেষলেখা ২৬।৪৮।২১

জড়ায়ে আপনার জালে জড়ায়ে পড়িয়া
প্র-সং ১।৫১।৮

তাই বুঝি তুই হাতে জড়ায়ে লয়েছ বুকে,
প্র-সং ১।৭৫।১৩

মায়ের বুক জড়ায়ে শিশু প্র-সং ১।৯৬।১১

মেঘেতে হাসি জড়ায়ে যায়, প্র-সং ১।১০০।২৫

চরণ জড়ায়ে ধ'রে। ছ-গা ১।১৪০।১৫

রয়েছি জড়ায়ে তোর বাহুখানি,
ছ-গা ১।১৪২।১৮

স্মৃতিরে জড়ায়ে ছ-গা ১।১৫৫।২

স্তব্ধ বাদুড়ের মতো জড়ায়ে অযুত শাখা
ছ-গা ১।১৫৮।৯

জড়াইয়ে বজ্র-আলিঙ্গন দিয়ে বুকে তোরে জড়াইয়ে ছ-গা ১।১৩১।৭

তব কব তব কানে কানে রানী।
স-সং ১।১৯।২৫

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তব অনুগ্রহ? স-সং ১।২২।৭

ওকি তব অতি শুভ্র ভালোবাসা নয়?
স-সং ১।২২।১৮

ও কি তব ভালোবাসা নয়? স-সং ১।২২।২২

ও কি তব অনুগ্রহ হাসি স-সং ১।২২।২৩

হানো তব হাসিময় বাজ স-সং ১।২২।২৭

মহা অনুগ্রহ হতে তব স-সং ১।২৩।১

হাসি তব আলোকের প্রায় স-সং ১।৩১।১১

কেবল রয়েছে তব পাষাণ-আকার তার।
স-সং ১।৩১।২২

রচিলে যে আলো দিয়ে তব বিশ্বতল
রোগশয্যায় ২৫।৭।২৪

যেথা তব রথ রোগশয্যায় ২৫।৮।৭

শান্তির পথে কাঁটা তব পদপাতে
রোগশয্যায় ২৫।১৫।১১

তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে
শেষলেখা ২৬।৪৯।১

নয়ান মুদিয়া নয়ান স-সং ১।২।২৭

মুদিয়া আসিবে তোর শ্রান্ত দু-নয়ান।
প্র-সং ১।১৬।৩

মুদিত নয়ান, পরান বিভল, প্র-সং ১।৫৪।২৫

গান শুনে মুদিছে নয়ান। প্র-সং ১।৭৯।১৮

আদিদেব খুলিলা নয়ান; প্র-সং ১।৮৩।৩

তারকার রক্তিম নয়ান, প্র-সং ১।৮৯।১০

সেই দিকে আমি ফিরাব নয়ান,
ছ-গা ১।১৪১।১৩

তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান। ছ-গা ১।১৪৯।২১

চারি দিকে নিরখে নয়ানে। স-সং ১।৪১।২৪

মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান প্র-সং ১।৯১।২৬

আনত দু'নয়ানে চাহিয়া মুখপানে
প্র-সং ১।৬২।১৫

স্নেহমাখা নত দু'নয়ান, প্র-সং ১।৬৬।১৯

স্নিগ্ধ ওই দু'নয়ানে চাহিলে মুখের পানে
ছ-গা ১।১৩৮।১

পড়িছে জোছনা পড়িছে খসিয়া। স-সং ১।১২।২

মাথায় পড়িছে পাতা, পড়িছে শুকানো ফুল,
স-সং ১।১৩।২০

পড়িছে শিশির কণা পড়িছে রবির কর,
স-সং ১।১৩।২২

পড়িছে বরষা জল ঝরঝর ঝরঝর,
স-সং ১।১৩।২৩

আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহারজাল,
স-সং ১।৩২।১

এখনো ঝরিছে পাতা, পড়িছে তুহিন।
স-সং ১।৩২।১০

নয়নে পড়িছে তার রেণু, স-সং ১।৪০।১৩

ভালো করে মনে পড়িছে না।
স-সং ১।৪২।১২

শ্রান্ত দেহ হীনবল, নয়নে পড়িছে জল,
স-সং ১।৪৪।১০
আঁধারের ভারে যেন নুইয়া পড়িছে মাথা
ছ-গা ১।১৫৩।২৩
পড়িছে গড়ায়ে। ছ-গা ১।১৫৫।৪
ভ্রমি আজি আমি ভ্রমি অন্ধকারে।
স-সং ১।৪১।২১
ভ্রমি আমি যেন সুদূর কাননে ছ-গা ১।১০৮।৫
হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে ভ্রমি মোরা সারা নিশি
ছ-গা ১।১৬০।২১
ভ্রমিছে সখীরা হাতে হাতে ভ্রমিছে সাথে সাথে, প্র-সং ১।৬২।১১
ডাকিনীর মতো রজনী ভ্রমিছে ছ-গা ১।১৪৪।৩
ভ্রমিতেছে ভ্রমিতেছে ফুল হতে ফুলে--
স-সং ১।৩৬।৮
ভ্রমিতেছে আনমনে। ছ-গা ১।১০৯।১০
ভ্রমিতেছে আজিও সে বাণী, প্র-সং ১।৮৩।১৭
ভ্রমিতাম কত বেশ ধরিতাম, কত দেশ ভ্রমিতাম, ছ-গা ১।১৬১।১৪
আমি শুধু চুপি চুপি ভ্রমিতাম বিশ্বময়।
ছ-গা ১।১৬১।১৭
প্রাণে তোর ভ্রমিতাম, প্রাণে তোর গাহিতাম, ছ-গা ১।১৬১।২৬
ভ্রমিব দগ্ধ-ধ্বংস-ভস্ম-'পরি ভ্রমিব কি হাহা করি স-সং ১।৩৮।৪
ভ্রমিবি ভ্রমিবি বনে বনে, যাইবি দিশে দিশে,
প্র-সং ১।৬৩।১৫
ভ্রমিয়া আঁধার গুহায় ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
প্র-সং ১।৫৬।১৩
ভ্রমিলাম ভ্রমিলাম দূরে দূরে— কে জানিত বল্ দেখি প্র-সং ১।৭৫।১৮
ভ্রমে ভ্রমে কেন হেথায় হোথায়—
প্র-সং ১।৭৮।৪
ভ্রমে সবে নিজ নিজ পথে, প্র-সং ১।৮৬।২৭
চক্রপথে ভ্রমে গ্রহতারা, প্র-সং ১।৮৭।১
চক্রপথে রবি শশী ভ্রমে, প্র-সং ১।৮৭।২
ভ্রমে যেন ভ্রমরের পারা। ছ-গা ১।১২২।৩০
মুদি শুনিব রে আঁখি মুদি বিশ্বের সংগীত
প্র-সং ১।৭৭।১১
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান প্র-সং ১।৯১।২৬
আধেক মুদি আঁখির পাতা ছ-গা ১।১২৭।৪
মুদিছে গান শুনে মুদিছে নয়ান।
প্র-সং ১।৭৯।১৮
মুদিত মুদিত নয়ান, পরান বিভল,
প্র-সং ১।৫৪।২৫
মুদিতে হৃদয় কাতর হয়ে নয়ন মুদিতে চায়,
স-সং ১।৩০।১৬
মুদিয়া মুদিয়া নয়ান। স-সং ১।২।২৭
মুদিয়া আসিবে তোর শ্রান্ত দু-নয়ান।
স-সং ১।১৬।৩
পুরানো কালের গীতি নয়ন মুদিয়া
স-সং ১।১৮।৮
জগৎ যে তোর মুদিয়া আসিল, প্র-সং ১।৫১।১৪
আকুল পরানে নয়ান মুদিয়া প্র-সং ১।৫৩।২৮
মুদিয়া যেন এসেছে আঁখি প্র-সং ১।১০০।১১
ধ্যান করে মুদিয়া নয়ন। ছ-গা ১।১২৩।২৪
তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান। ছ-গা ১।১৪৯।২১
আঁধারে অরণ্যভূমি নয়ন মুদিয়া ছ-গা ১।১৫৩।৫
দলে দলে অন্ধকার ঘুমায় মুদিয়া পাখা।
ছ-গা ১।১৫৮।১০
মুদে নয়ন আমার মুদে এল, ছ-গা ১।১০৬।৮
বসন্তবাতাসে আঁখি মুদে আসে,
ছ-গা ১।১০৭।১৭
আঁখি দুটি মুদে আমি ছ-গা ১।১৪৮।১৬
চক্ষু তার মুদে আসে, এসেছে সময়
আরোগ্য ২৫।৬৫।৯

নলিনী

রবীন্দ্রসদন-পাণ্ডুলিপি ৯৩এ

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী এই পাণ্ডুলিপিখানি বিশ্বভারতীকে দান করেন। পাণ্ডুলিপিখানি খণ্ডিত, নাটকের প্রথমাংশ এবং শেষাংশ মিলাইয়া কেবল ৫খানি পাতা (১০ পৃষ্ঠা); প্রত্যেক পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে যে পরিমাণ লেখা আছে তাহার হিসাবে মনে হয়— নাটকের যে অংশ পাওয়া যাইতেছে না তাহা পাণ্ডুলিপির হারানো ৪খানি পাতায় (৮ পৃষ্ঠায়) লিখিত ছিল। মেট্রিক শতাংশে সংরক্ষিত পাতাগুলির মোটামুটি মাপ ১৬·৮ × ১০·৪ ধরা যাইতে পারে; প্রত্যেক পাতার চারিধার পরিচ্ছন্নভাবে কাটা না থাকায়, কোনো কোনো পাতায় সামান্য ইতরবিশেষ আছে। রুল-টানা নয় এই অর্থে পাতাগুলি সাদা। পাণ্ডুলিপিখানি রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে আসিবার পরে সংরক্ষণের উদ্দেশে নূতনভাবে বাঁধাই করা হয় ও প্রত্যেক বিজোড় পৃষ্ঠার দক্ষিণোর্ধ্ব কোণে যথাক্রমে 1, 3, 5, 7, 9 এই কয়টি সংখ্যা বসানো হয়; জোড়পৃষ্ঠার যথোচিত অঙ্ক উহ্য থাকে— অনুমানে বুঝিতে হইবে। বর্তমানে পাতাগুলির অবস্থা এইরূপ :

1-2 বহুস্থানে জীর্ণ বা সছিদ্র।

3-4 তুলনায় ইহার জীর্ণতা অল্প।

9-10 শেষ পাতাখানির বাহিরের দিকে (সেলাইয়ের বিপরীত দিকে) তথা নিম্নভাগে খানিকটা ছিঁড়িয়া যাওয়ায় পূর্বপৃষ্ঠার পর পর ৩টি ছত্রের শেষে কয়েকটি কথা নষ্ট হইলেও পরবর্তী (ওই পৃষ্ঠার সর্বশেষ) ছত্রটি সম্পূর্ণই আছে। ইহারই উল্টা পিঠে, অর্থাৎ শেষ পৃষ্ঠার শেষ দুটি ছত্রের সূচনায়, কয়েকটি শব্দ লুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা অহেতু না হইলেও, বস্তুতঃ দেখা যায় মুদ্রিত পুস্তকের এই শেষাংশের পাঠ পাণ্ডুলিপিতেও অক্ষুণ্ণ। পাণ্ডুলিপির সংরক্ষিত কয়েকখানি পাতা কোনো সময় পিন দিয়া গাঁথা ছিল এরূপ চিহ্ন দেখা যায়। বর্তমানে সবগুলি পাতা, দুইপিঠ আস্বচ্ছ কাগজে ঢাকার পরে গ্রন্থাকারে বাঁধাইয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে এই পাণ্ডুলিপির অভিজ্ঞান-সংখ্যা : ৯৩এ।

আলোচ্য পাণ্ডুলিপির একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার (1-6) তিনখানি পাতা পুরাপুরি লিখিয়া পুরাপুরি কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে (1-2) দুই পৃষ্ঠার কিয়দংশে যে ভিন্ন হাতের লেখা দৃষ্ট হয় তাহা অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের হওয়াই সম্ভবপর। পরবর্তী আর-এক পৃষ্ঠায় (4) আর-কোনো হাতের লেখা দুইটি অনুচ্ছেদে দৃষ্টিগোচর। উহা রবীন্দ্রনাথ বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর বলিয়া মনে হয় না; অ ছ ি এই কয়টি স্বর ব্যঞ্জন ও ব্যঞ্জনাশ্রিত স্বরচিহ্ন লিখিবার ভঙ্গী যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি প্রায়-বিশ্লিষ্টভাবে-লেখা ছোটো ছোটো হরপগুলির ছাঁদও বিশেষভাবেই ঋজু— প্রথম দৃষ্টিতেই মেয়েলি হাতের লেখা মনে হয়। এই লেখার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় সত্যেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী, রবীন্দ্রনাথের মেজো বৌঠান, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর হাতের লেখায়। নলিনীর পাণ্ডুলিপি ১২৯০ সনের শেষ ভাগে প্রস্তুত হয় আর ইন্দিরা দেবীকে লেখা তাঁহার মায়ের যে চিঠি আমরা রবীন্দ্রসদনে দেখিয়াছি তাহা লেখা হয়

১৩১৭ সনে (জুলাই ১৯১০), এজন্য ২৭ বছরের ব্যবধানে কিছু পার্থক্য দেখা গেলেও মূল বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষুণ্ণ আছে এরূপ আমাদের মনে হয়। লিপিবিদ্ আরও নিশ্চিতভাবে বলিতে পারিবেন। পাণ্ডুলিপিতে ও মুদ্রিত গ্রন্থে পাঠভেদ প্রত্যাশিত সন্দেহ নাই। প্রথমাংশে অন্যের লেখা থাকায় এবং সমস্তটা বর্জন-চিহ্নিত হওয়ায় (আসলে সমস্তই বর্জিত হয় নাই) পাঠভেদ অবশ্যই সমধিক ; সংরক্ষিত শেষাংশে তেমন নয়।

বর্তমান খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির তৃতীয় পাতার পরে ও চতুর্থ পাতার পূর্বে (6 ও 7'এর মধ্যে) রচনার যে অংশ পাওয়া যায় নাই তাহাতে গ্রন্থে মুদ্রিত— 'নীরদ। আমি ত নবীনের মত এ রকম ক'রে কথা কইতে পারি নে! আর' (রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত ১, পৃ ৪০৭, প্রথম ছত্র)[১] হইতে 'তা হ'লে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব?' (তদেব, পৃ ৪১৫, ছ ১৭ বা ১৮)[১] অবধি রচনাংশ— প্রথম দৃশ্যের শেষ ভাগ হইতে তৃতীয় দৃশ্যের প্রায় সবটাই— লিখিত ছিল মনে করা যাইতে পারে।

প্রথমে বর্জনচিহ্নিত রচনাংশের পাঠ কিরূপ ছিল তাহাই দ্রষ্টব্য ; পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ (রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত ১, পৃ ৩৯৯-৪২১) পরস্পর তুলনীয়।

1 প্র[থম] অঙ্ক। / প্রথম গর্ভাঙ্ক। / সন্ধ্যা। / কানন। / সূচনায় চারিটি ছত্রে এইভাবে নাট্য-ব্যাপারের স্থান-কালের নির্দেশ। তৎপরিবর্তে মুদ্রিত নাটকে (১২৯১ বৈশাখ) পাওয়া যায়: নলিনী। / প্রথম দৃশ্য। / অপরাহ্ণ। / কানন। / নীরদ। /

বলা উচিত, পাণ্ডুলিপির শেষাংশে অঙ্ক গর্ভাঙ্কের নির্দেশ নাই ; তৎপরিবর্তে পাই:

7 চতুর্থ দৃশ্য। / দেশ। / নীরদ নীরজা। /

8 পঞ্চম দৃশ্য। / নলিনীর উদ্যানে বসন্ত উৎসব। / নীরদ নীরজা। /

10 ষষ্ঠ দৃশ্য। মুমূর্ষু নীরজা। পার্শ্বে নীরদ। / নবীন। / উল্লিখিত তিন ক্ষেত্রেই (তিনটি দৃশ্যে) পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত গ্রন্থের আদর্শ-স্বরূপ।

পাণ্ডুলিপির প্রথমোক্ত পাত্রের মাধব নাম কাটিয়া নীরদ করা হইয়াছে। সুর-তালের-উল্লেখ-হীন 'হা কে বলে দেবে' গানের প্রথম ছত্রের উল্লেখ: হা কে [ব]লে দিবে ইত্যাদি। / অতঃপর:

[২]নলিনী ও ফুলির প্রবেশ

নীরদ। (স্বগত)— এরকম সংশয়ে ত [আ]র থাকা যায় না। আর কতদিন এমন করে কা[টিবে! কখন]

---

১ বৈশাখ ১৩৬৯ সনে মুদ্রিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত প্রথম খণ্ডের প্রথম মুদ্রণ: আশ্বিন ১৩৪৭। উভয় মুদ্রণে ছত্র সাজানোয় কদাচিৎ সামান্য পার্থক্য দেখা যাইবে ; এজন্যই ছ ১৭ (১৩৪৭) পরে ছ ১৮ (১৩৬৯) হইয়াছে।

২ পাণ্ডুলিপির পৃ ১-৬ আদ্যন্ত সাধারণভাবে বর্জনচিহ্নিত, পূর্বে বলা হইয়াছে। এরূপ চিহ্নিত করিবার পূর্বে ঐ কয় পৃষ্ঠার পাঠে নানারূপ যোগ বিয়োগ করা হয়।

বর্তমান আলোচনায় উদ্ধৃত অংশগুলির কোনো অংশে (×) ঢেরা-চিহ্ন সংযুক্তভাবে থাকিলে পরবর্তী শব্দ বর্জনচিহ্নিত (উপস্থিত, সাধারণভাবে বর্জিত হইবার পূর্বেই বিশেষভাবে বর্জনচিহ্নিত) এবং অসংযুক্তভাবে আগে পরে থাকিলে অন্তর্বর্তী শব্দ অথবা বাক্য -গুলি বর্জনচিহ্নিত— এরূপ বুঝিতে হইবে। জীর্ণ বা কীটদষ্ট বা অন্যভাবে নষ্ট হওয়ায় যে অংশের পাঠ লুপ্ত, তাহার আনুমানিক পাঠ [ ] এরূপ বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত।

পৃ=পৃষ্ঠা। ছ=ছত্র। ছ ২ ও ছ ৫ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও পঞ্চম ছত্র হইলেও, ছ <u>২</u> ও ছ <u>৫</u> যথাক্রমে নীচে হইতে দ্বিতীয় ও পঞ্চম ছত্র।

আলোয় কখ[ন] অন্ধকারে— আজ যা হয় [এক]টা স্থির করে জান্‌তে হবে। আজ হয় আমার দুঃখের অবসান, নয় আমার সুখের শেষ যা হয় হবে—। একবার কাছে যাই। একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি।— যদি বলে— না। সে কি বজ্রাঘাত হবে। আচ্ছা তাই হোক্! নলিনি—

নলিনী। আয় ফুলি আমরা ঐ দিকে ×যাই গিয়ে ঐ গোলাপ ফুলটা তুলে [ি] নয়ে আসি — আর দেখ্ তুই ওই ফুলটা তোলা হলে আমার খোঁপায় পি[র] য়ে দিস্

× আমার মাথায় ফুলের বাহা[রি ে] দখ[লে]

নবীন একেবারে ভাবে গোলে [য]ায়

— আজ নবীন আসে ত মজাই হয়×

আজ এখনো নবীন এলো না কে[ন] ফুলি ?

উদ্ধৃতাংশে নীরদের উক্তি বহুশঃ পরিবর্তিত। হস্তলিপি দেখিয়া বলিতে হয় শেষ বাক্যটি বাদে নলিনীর উক্তি সবটাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা ও মুদ্রিত নাটকে বর্জিত। উল্লিখিত শেষ বাক্যটি হইতে রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ কলম ধরিয়াছেন। পর পর ফুলি ও নীরদের উক্তি শেষ হইলে, পুনশ্চ নলিনীর নিম্নলিখিত উক্তি পাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথেব হাতের লেখায় :

নলিনী। ফুলি কাল এই বে[লি ফু]লের গাছগুলোতে মেলাই কুড়ি দেখেছিলুম, আজ ত আর একটীও [ ]×ছ চল দেখি ঐদিকে যদি ফুল পা[ই] তুলে নিয়ে আসি। (অন্তরালে) দেখ্ নীরদ আজ ভারি বিষণ্ণ হ'য়ে ব'সে আছেন, তুই ওঁর কাছে গিয়ে ওঁকে একটু গান টান গেয়ে শোনাবে ×গে না [।] আমি এই ফুল তুলে নিয়ে যাচ্ছি।

দেখা যাইবে সামান্য পাঠান্তরে উদ্ধৃতাংশ সবটাই গ্রন্থে (দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী ; অ ১, পৃ ৪০২, ছ ৯-১৩) সংকলিত। ইহার অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় :

ফুলি (নীরদের কাছে আসিয়া) কাকা, তোমার কি হয়েচে ? তুমি অমন ক[ে]র আছ কেন ?

নীরদ (ঈষদ্[হা]স্যে) একটা গোলাপ ফুলের কাঁটা ফুটেচে।

ফুলি [(তাড়াত]াড়ি) কোথায় কাকা ?

নী [। (স ে]স্নহে বুকে টানিয়া) এই বুকের কাছে ফুলি।

ফু [।] আমাকে বল্লে না কেন কাকা আমি ফুল তুলে দিতুম।

নী। তুই ফুল তুলে দিবি ? তা, হয়ত তুই পারিস্।

ফু [।] নলিনী ওইখেনে ফুল তুল্‌চে, ওই দিকে ঢের ×ফুল ফুটেচে, ওইখেনে চল, আমি তোমাকে ×ফুল তুলে দিচ্চি।

দেখা যাইবে গ্রন্থে ফুলির প্রথম উক্তিটিকে দ্বিধাভিন্ন করা হইয়াছে এবং গোলাপের কাঁটা বেঁধা'র দ্ব্যর্থ প্রসঙ্গ বর্জিত। উপরের উদ্ধৃতির পরবর্তী অংশে পাণ্ডুলিপি মোটের উপর গ্রন্থের আদর্শস্বরূপ, কিছুদূর পর্যন্ত।

পরে পুনশ্চ প্রভেদ দেখি পাণ্ডুলিপিতে ও গ্রন্থে। সেগুলি সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য আমরা পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলন করিব ; সেই সঙ্গে গ্রন্থের, অর্থাৎ রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত প্রথম খণ্ডের দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠাঙ্ক, প্রয়োজন হইলে ছত্র, উল্লেখ করিব।

3/৪০৩ ফু। এই নাও কাকা, এই দেখ, এতে কাঁটা নেই।
নী (চুম্বন করিয়া) তুই যে ফুল দিয়েছিস্ তাতে কি আর কাঁটা থাকে বাছা ?
নলি (দূর হইতে) তুই আবার কোথায় গেলি ফুলি ? শীগ্‌গির আয়— এখনি অন্ধকার আস্‌বে, আর তার মা ফিরে আস্‌বে !
ফু। এই যাই। (ছুটিয়া যাওন)

গ্রন্থে প্রথম বাক্যের দ্বিতীয় অংশ যে কারণে বর্জিত, সেই কারণেই নীরদের প্রত্যুত্তর নূতনভাবে লিখিত। নলিনীর উক্তি সংক্ষেপীকৃত। অতঃপর পাণ্ডুলিপির বর্তমান পৃষ্ঠায় কিছু কিছু পাঠভেদ বা ভাষান্তর থাকিলেও যথার্থ ভাবান্তর নাই বলা চলে। কেবল পৃষ্ঠার শেষে ফুলির উক্তিতে 'দেখ'সে, দেখ'সে, আর একটা পাখীর বাসা দেখ্‌তে পেয়েছি।' গ্রন্থে রূপান্তরিত : দেখ'সে, নেবুগাছে একটা মৌচাক দেখতে পেয়েছি ! (পৃ ৪০৩, নীচে হইতে ছ ৩-২)

পরবর্তী পৃষ্ঠায় আগন্তুক নবীনের প্রথম উক্তিটুকু গ্রন্থে বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে উহার পরেই আছে :

4/৪০৪ নলি। তুমি বুঝি লোককে কেবল বিরক্ত কর্‌তে, কষ্ট দিতেই ভালবাস। আমি আরও কত মনে কর্‌ছিলুম তুমি বেশ সকাল আস্‌বে, আমরা সবাই মিলে ফুল তুল্‌ব, মালা গাঁথব কত গল্প কর্‌ব, তুমি কিনা একেবারে সন্ধ্যা করে এলে।
নবীন। বিরক্ত কর্‌বার কষ্ট দেবার ক্ষমতা কি সকলের আছে ভাই ? আমি যে এত ভাগ্যবান্ তা যদি জান্‌তুম, তা হলে কি আর দেরি করে আসি ? আমি জান্‌তুম দেরী করে এলে আমারই যা ক্ষতি, তোমার তাতে কি আসে যায় ?
নলি। বিরক্ত করবার কষ্ট দেবার ক্ষমতা সকলের আছে কিনা তা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু এ আমি বেশ জানি যে যাঁদের ও ক্ষমতাটি আছে তাঁরা তা কাজে খাটাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না। যাক্ আর মিছে বকাবকিতে সময় নষ্ট করে কি হবে, তোমার দেরি করে আস্‌বার দোষটা আমার উপর চাপিয়েই যদি তোমার খুব আনন্দ বোধ হয় ভাল তাই সই, আমার তো আর তাতে কোন ক্ষতি হচ্ছে না

উল্লিখিত অনুচ্ছেদ-ত্রয় গ্রন্থে সম্পূর্ণ বর্জিত, তৎপরিবর্তে নবীনের প্রবেশের পর প্রথম উক্তি যেটি (পাণ্ডুলিপিতে ও গ্রন্থে প্রায় অভিন্ন) তাহার অনুবৃত্তিরূপে গণ্য হইয়াছে পাণ্ডুলিপির অব্যবহিত পরের অংশ : বটে ! তিরস্কারের সুখটা একবার ইত্যাদি। উপরের ঐ গ্রন্থবহির্ভূত রচনা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, নলিনীর দুটি উক্তিই সম্ভবতঃ জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর হাতের লেখা, রবীন্দ্রনাথের অথবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নয়। উভয়ের অন্তর্বর্তী নবীনের উক্তি রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে।

গ্রন্থে সংকলিত নবীনের পরের উক্তি 'ও যন্ত্রণাটা ভাই' (পৃ ৪০৪/ছ ৯) ইত্যাদি প্রায় পাণ্ডুলিপির অনুরূপ।[৩] নবীনের এই উক্তির উত্তরে পাণ্ডুলিপির (4) যে পাঠ তাহা বহুশঃ ভিন্ন দেখা যাইবে :

নলিনী। ও আবার কি রকম কথা হচ্চে? তোমাদের একটা কথার ভিতর যে দুটো × কথা করে মানে থাকে! আমরা × নির্ব্বুদ্ধি জাত, × অত বুঝে উঠ্‌তে পারি নে। ফুলি ওকে সেই গানটা শুনিয়ে দে ত!

অতঃপর পাণ্ডুলিপির তুলনায় গ্রন্থে পাঠান্তর পাওয়া গেলেও রূপান্তর অথবা ভাবান্তর নাই। কেবল নলিনীর প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশের পর নীরদ যখন বলে (6) 'নলিনী, আমাকে মার্জনা কর।' তখন নবীন বলে :

নবীন × নলিনী। (তাড়াতাড়ি) আবার ওসব কথা কেন? বড় বড় হৃদয়ের কথা বলে বালিকার মনে ভার চাপাবার আবশ্যক কি? ওসব কথা যদি ওর মনের মধ্যে প্রবেশ করে তবে × সম আজ সমস্ত সন্ধ্যাটা ওর মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে। (নলিনীর প্রতি) নলিনী আজ বিদায় হবার আগে একটি ফুল চাই!

নবীনের পরবর্তী একটি উক্তিতে 'ঘাড় ধ'রে' ছিল, গ্রন্থে 'জোর করে' (রবীন্দ্র-রচনাবলী, অ ১, পৃ ৪০৬, ছ ৪) হইয়াছে এবং নলিনীর প্রত্যুক্তিও বহুশঃ পরিবর্তিত তাহা নিম্ন-সংকলন হইতে বুঝা যাইবে :

নলিনী। (হাসিয়া) এখন যে তুমি হেঁয়ালি ছাড়া আর কথা কও না! যে সব কথা "পণ্ডিতে বুঝিতে নারে চল্লিশ বৎসরে" আমরা মূর্খরা তার[৪] কি বুঝব।

এইখানেই প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির ষষ্ঠ পৃষ্ঠা তথা প্রথমাংশ শেষ হইলে, মাঝের আনুমানিক ৪ পাতা পাওয়া যায় না এবং পাণ্ডুলিপির অপরাংশ শুরু হয় চতুর্থ দৃশ্যের কিছুটা পূর্ব হইতে :

নীরজা। না না— আমি কি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি? ইত্যাদি

নীরজার পরবর্তী উক্তি পাণ্ডুলিপিতে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত ভাবে আছে, গ্রন্থের সহিত তুলনীয় :

নীরজা। নীরদ দেখি তোমার হাতখানি, তোমাকে একবার স্পর্শ করে দেখি, " তুমি আছ কি না আছ একবার ভাল ক'রে জানি— তুমি কখন্ থাক না থাক, কিছু যেন ঠিক নেই— তোমাকে একবার "— ভাল করে ধ'রে রাখি, কেউ যেন ছিঁড়ে না নেয়।

"—" চিহ্নিত অংশ (চিহ্ন আমাদের) মুদ্রণ কালে বর্জিত অথবা ভ্রষ্ট। পরবর্তী নীরদের উক্তিতে 'এই লও' স্থলে গ্রন্থে 'এই নাও' ছাপা হইয়াছে।

চতুর্থ দৃশ্যে নীরজার প্রথম উক্তিতে 'এত ফুল, এত পাখী, এত শোভা' হইতে প্রথম দুটি পদ হয়তো অনবধানেই গ্রন্থে বাদ পড়িয়াছে।

পাণ্ডুলিপির অষ্টম পৃষ্ঠার প্রতিচ্ছবি এস্থলে এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীতে মুদ্রিত (সম্মুখীন পৃ ৪১৬)।

---

৩ ইহাতে একটি ছাপার ভুল : ওপড়ায় নি। পাণ্ডুলিপি বা প্রথম সংস্করণে : ওপ ড়াইনি।

৪ র অক্ষরটির শেষে এরূপ টান আছে যে 'রা' মনে হইতে পারে, অথচ বস্তুতঃ তাহা নয়। শব্দের শেষ অক্ষরের শেষে অনুরূপ একটি টান আছে ভগ্নহৃদয়-পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠায় (দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত ১, লিপিচিত্র, সম্মুখীন পৃ ১৫২),— উহা না বুঝিলে 'ছাপাইবেন' কথাটি 'ছাপাইবে না' এই নিরর্থ রূপ লইতে পারে।

পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ উভয়ের তুলনায় দেখা যাইবে পঞ্চম দৃশ্যে নীরদের উক্তিতে 'এয়েছি' এবং 'ওপর' (রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম ও তৃতীয় ছত্রে) 'এসেছি' এবং 'উপর' হইয়াছে। ওই দৃশ্যের মুদ্রিত অষ্টম ছত্রে 'সে' ঠাঁই-বদল করিয়াছে, পরবর্তী দ্বাদশছত্রে 'খেলা করে বেড়াক' ও চতুর্দশ ছত্রে 'যতটুকু মধুর যতটুকু সুন্দর' উভয় ক্ষেত্রেই সূচনার ত্রুটি করিয়া পদ বাদ পড়িয়াছে— অন্তত শেষোক্ত স্থলে 'ছাড়' বা মুদ্রণপ্রমাদ ঘটা বিচিত্র নয়। প্রতিচ্ছবিতে দেখা যাইবে নিম্ন হইতে পঞ্চম ছত্রে সাময়িক অনবধানে 'তোমার কাছে' শব্দ দুটির পর 'বল্‌ত' লেখা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপির পরবর্তী নবম পৃষ্ঠায় নীরদ 'একটা গান গাই।— ' (রবীন্দ্র-রচনাবলী, অ ১, পৃ ৪১৮, ছ ৬) বলার পর 'দেখে যা দেখে যা ইত্যাদি।' গানের নির্দেশ ছিল, ইহাও কি অনবধানে গ্রন্থে বাদ পড়িয়াছে? পাণ্ডুলিপিতে গান তো ছিল না, গানের নির্দেশ মাত্র ছিল।

পাণ্ডুলিপির দশম বা সর্বশেষ পৃষ্ঠায় পঞ্চম দৃশ্যের প্রায় শেষে নীরজার উক্তিতে 'করিয়া' ছিল, গ্রন্থে 'করিয়ে' হইয়াছে— ইহা ছাড়া এই অংশে মুদ্রিত গ্রন্থ প্রায় সর্বথা পাণ্ডুলিপির অনুরূপ ইহা বলা চলিবে।

২

নলিনী 'নাট্য'খানি ১২৯১ বঙ্গাব্দের বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ১০ মে ১৮৮৪ তারিখে ইহা বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থতালিকাভুক্ত হয়। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন :

[রবীন্দ্রনাথের বিবাহের পরে ১২৯০ সনের শেষ দিকে জোড়াসাঁকো-ঠাকুর-] পরিবারের সকলেই কলিকাতায়··· আনন্দ উল্লাসকে সম্পূর্ণভাবে সম্ভোগ করিবার জন্য একটি অভিনয় করিবার প্রস্তাব হইল; কিন্তু স্থির হইল এই নাটকের রচয়িতা হইবেন অভিনেতারা স্বয়ং। সেইজন্য মোটামুটিভাবে একটা প্লট খাড়া করিয়া অভিনয়ের অংশ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল— একজন নিজ অংশ লিখিয়া দিলে অপরজন তাঁহার অংশ লিখিবেন, এইরূপে··· একটা জিনিস খাড়া হইল বটে, তবে তাহাকে সাহিত্য নাম দেওয়া যায় না।··· শেষকালে রবীন্দ্রনাথকেই সেই খসড়াকে ছাঁটিয়া কাটিয়া একটা চলনসই নাটক খাড়া করিতে হইল। নাটকখানির নাম ··· 'নলিনী' ··· ইহাই তাঁহার প্রথম গদ্য নাটক।

— রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড (১৩৬৭), পৃ ১৭৭

যতখানি যৌথভাবে লিখিবার কথা উল্লিখিত বিবরণে পাওয়া যায়, আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে সেরূপ কিছু দেখা যায় না ইহা সত্য। নলিনীর আর কোনো খসড়া ইতিপূর্বে লেখা হইয়া থাকিলে তাহা পাওয়া যায় নাই, কাজেই তাহাতে কয় হাতের রচনা ছিল বলা যায় না। বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দুইবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতের লেখা আছে, উভয়ই নায়িকা নলিনীর উক্তি-রূপে উপস্থাপিত। ইহাতে এ কথাও মনে হয়, যিনি যে ভূমিকায় কিছু বলিবেন তিনি সেই অংশ লিখিতে উদ্যম করেন হয়তো ইহাও আংশিক সত্য। পাণ্ডুলিপির চতুর্থ পৃষ্ঠায় পুনশ্চ নলিনীর জন্য উদ্দিষ্ট দুইটি অংশে সম্ভবতঃ মেজোবৌঠান জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর হাতের লেখাই দেখা যায়, ইহা তেমন অপ্রত্যাশিত নয়। শেষ পর্যন্ত আদ্যন্ত নাটকখানি রবীন্দ্রনাথ লেখেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বল্প রচনারও অতি অল্প অংশই গৃহীত হয়— খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির প্রমাণে এ বিষয়ে সংশয় থাকে না।

'নলিনী' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা

যৌথ রচনার চেষ্টা সফল হয় নাই; একা রবীন্দ্রনাথ নাটকটি লিখিয়া দিলে (সম্ভবতঃ ছাপাও হইলে), অল্পকালের মধ্যে পারিবারিক মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনার জন্য ইহার অভিনয়-চেষ্টাও বন্ধ হইয়া যায়। কয়েক বৎসর পরে সখিসমিতির আগ্রহাতিশয্যে একখানি গীতিনাট্য লিখিয়া দিবার প্রয়োজন হইলে যৎসামান্য গল্পাংশ আহৃত হয় 'নলিনী' হইতে, তাহা 'মায়ার খেলা'র প্রথম সংস্করণে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিতে বলিয়া দিয়াছেন: আমার পূর্ব্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য নাটিকার সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারি সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।

—বিজ্ঞাপন, মায়ার খেলা (অগ্রহায়ণ ১২৯৫)

অথচ 'মায়ার খেলা'কে নলিনীর সংশোধন ঠিক বলা যায় না, যে হিসাবে নলিনীকেও ভগ্নহৃদয়ের সংশোধন বলিলে অত্যুক্তি হইবে। তবে ভগ্নহৃদয় নলিনী ও মায়ার খেলা প্রত্যেকটি রচনায় নলিনী চরিত্রটি আছে (মায়ার খেলায় তাহার নাম প্রমদা), একটি কবি-চরিত্র আছে (নলিনীতে নীরদ ও মায়ার খেলায় অমর), কবিগতপ্রাণা একটি নারীচরিত্র আছে (ভগ্নহৃদয়ে মুরলা/নলিনীতে নীরজা/মায়ার খেলায় শান্তা) এবং পরিণামে 'ত্রিকোণ' প্রণয়ব্যাপারের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিফলতাও প্রায় একরূপ। ইহার অধিক সাদৃশ্য নাই বা সম্ভবপর ছিল না। কেননা প্রকার-প্রকরণের দিক দিয়াই বিশেষ পার্থক্য আছে—প্রথমটি 'গীতিকাব্য', দ্বিতীয় 'গদ্যনাট্য' এবং তৃতীয়টি 'গীতিনাট্য'। প্রথম ও তৃতীয় উভয়েই পাত্রপাত্রীর সংখ্যা অধিক, দ্বিতীয়ে অতি অল্প।

যথাকালে নলিনীর অভিনয় হইতে পারে নাই। পরবর্তী কোনো সময়ে ইহার অভিনয়ের সংকল্প অথবা কল্পনা কোনো কারণে নূতন করিয়া জাগিয়া থাকিবে, তাহারই সাক্ষ্যবাহী এক প্রতি মুদ্রিত নলিনী বর্তমানে কলিকাতায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে রহিয়াছে।[৫] এই মুদ্রিত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে বহু সংযোজন করিয়াছেন, এজন্য অংশত ইহাকে পাণ্ডুলিপিই বলা যায়। নলিনী নাট্যের 'সংশোধন স্বরূপে' এগুলি অবশ্যই গ্রাহ্য হইতে পারে, এজন্য ইহাদের আনুপূর্বিক বিবরণ এ স্থলে দেওয়া যাইতেছে—'অচলিত' রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ড মিলাইয়া বুঝিতে হইবে। বইখানিতে আখ্যাপত্রের পূর্বে পেন্সিলে কাঁচা হাতের লেখায় ও অশুদ্ধ বানানে পাই শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর নাম। পেন্সিলে লেখা R. Tagore নামটিও আছে।

কবির হাতের লেখায় দুইটি গানের নির্দেশ সংযোজিত প্রথম দৃশ্যের শেষ দিকে। ঐ দৃশ্যে নীরদের দীর্ঘ উক্তির শেষে 'আমিই স্বার্থপর। কিন্তু আর নয়।' (পৃ ৪০৭/ছ ৪) ইহার পরে:

কেন রে চাস ফিরে ২—

অতঃপর নীরদের প্রস্থানের পূর্বে এবং 'নলিনীর সঙ্গে তুই বাড়ি যা!' (পৃ ৪০৮/ছ ৯) ইহার পরে:

গেল গো, ফিরিল না—

৫ রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তির কালে শ্রীবসন্তবিহারী চন্দ্র এম. এ. (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক) 'রবীন্দ্র-স্মৃতিভবন'এ বইখানি উপহার দেন। বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহ-ভুক্ত। তাঁহাদের সৌজন্যে ইহার সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীসুকুমার সেন তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ড: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৬৮) গ্রন্থে এই বিশেষ পুস্তিকাখানির উল্লেখ করিয়াছেন ও প্রতিচিত্র দিয়াছেন।

নীরজা। আজ আমার কি সুখের দিন! আজ আমি নিজহাতে তোমাদের মিলন করে দিলুম — পৃথিবীর মধ্যে দুজনকে আমি সুখী করতে পারলুম।

নবীন। আর তোমার নিজের সুখ দেখলে না!

নীরজা। সেইতো আমার সুখ — প্রদীপ দগ্ধ হয়ে আলো দেয় তা না হলে তার আর আবশ্যক কি আছে!

নবীন। আহা!

বলে এলিয়ে! ইত্যাদি!

নীরজ। তুমি আমাকে নলিনীর হাতে সমর্পণ করলে, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় কি তাকে দিতে পারবে? তোমাকে যা দিয়েছি তা তুমি ফেরাতে পারবে না। আমাদের মিলনের মধ্যে তুমিই চিরদিন অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে জেগে থাকবে। আমাদের দুজনের এই মিলিত হৃদয়ের সমুদয় সুখ দুঃখ হাসি অশ্রুজল তোমারি উদ্দেশে উৎসর্গ করে রেখে দিলুম। চিরকাল তোমারি পূজার জন্যে আজ আমাদের এই দুজনের জীবনের মিলনমন্দির প্রতিষ্ঠিত হল।

নলিনী গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-কৃত সংযোজন

দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথমেই নবীনের উক্তির শেষে 'আবার কবে সে হাসবে?' (পৃ ৪০৯) ইহার পরে :

কেহ কারো মন বোঝে না

তৃতীয় দৃশ্যের প্রথমে নীরদের দ্বিতীয় উক্তির শেষে 'এস, আমরা দুজনে মিলে গান গাই।' (পৃ ৪১২) ইহার পরে :

দেখে যা

নীরদের পরবর্তী উক্তির শেষে 'আমি চুপ ক'রে তোমার ঐ মধুর করুণা উপভোগ করি।' (পৃ ৪১৩) ইহার পরে :

ধীরে ধীরে প্রাণে আমার

এই দৃশ্যেই প্রায় শেষ দিকে নীরদের উক্তিতে 'আমাদের ভয় কিসের!' (পৃ ৪১৫/ছ ৫ বা ৬) ইহার পরে :

দুখের মিলন

পঞ্চম দৃশ্যে 'দূরে নলিনীর প্রবেশ' ঘটিকার কিছু পূর্বে 'নীরদ। হাঁ চল। একটা গান গাই। (পৃ ৪১৮/ছ ৬) ইহার পরে :

ঐ বুঝি

পঞ্চম দৃশ্যের একেবারে শেষে (পৃ ৪২০) :

কিছুই ত হল না

ষষ্ঠ দৃশ্যে (পৃ ৪২১) নাটক যেখানে শেষ হইয়াছিল তাহার পরেই এই নূতন উপসংহারটুকু পাওয়া যায় কালীতে— রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় :

নীরজা। আজ আমার কি সুখের দিন! আজ আমি ×নিজের নিজহাতে তোমাদের মিলন করে দিলুম— পৃথিবীর মধ্যে দুজনকে আমি সুখী করতে পারলুম।

নবীন। আর তোমার নিজের সুখ দেখ্‌লে না!

নীরজা। সেইত আমার সুখ— প্রদীপ দগ্ধ হয়ে আলো দেয় তা না হলে তার আবশ্যক কি আছে!

নবীন। তা বটে!

কেন এলি রে! ইত্যাদি!

নীরদ। তুমি আমাকে নলিনীর হাতে সমর্পণ করলে, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় কি তাকে দিতে পারবে? তোমাকে যা দিয়েছি তা তুমি ফেরাতে পারবে না। আমাদের মিলনের মধ্যে তুমিই চিরদিন অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে জেগে থাকবে। আমাদের দুজনের এই মিলিত হৃদয়ের সমুদয় সুখ দুঃখ হাসি অশ্রুজল তোমারি উদ্দেশে উৎসর্গ করে রেখে দিলুম। চিরকাল তোমারি পূজার জন্যে আজ আমাদের এই ×মিল দুজনের জীবনের মিলনমন্দির প্রতিষ্ঠিত হল।

গানগুলি নূতন রচনা নয়, পূর্বরচিত বা প্রচারিত বলিয়া কেবল প্রথম ছত্র বা প্রথম ছত্রের সূচনাংশ উল্লেখ করা হইয়াছে। (প্রচলিত গীতবিতানের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডে গানগুলি পাওয়া যাইবে।) ইহাদের পূর্বসূত্রানুসন্ধানে দেখা যায় সংযোজিত নয়টি গানের মধ্যে সাতটি পাওয়া যাইবে ১২৯২ বৈশাখের রবিচ্ছায়া গ্রন্থে :

১. কেন রে চাস্ ফিরে ফিরে
২. গেল গো— ফিরিল না
৩. কেহ কারো মন বুঝে না
৪. দেখে যা— দেখে যা— দেখে যা লো তোরা
৫. ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এস হে
৬. কিছুই ত হোল না !
৭. কেন এলি রে, ভাল বাসিলি, ভালবাসা পেলিনে !

অবশিষ্ট গানের মধ্যে একটি ('দুখের মিলন টুটিবার নয়') মায়ার খেলায় (১২৯৫ অগ্রহায়ণ) আর অন্যটি ('ঐ বুঝি বাঁশি বাজে') রাজা ও রানীতে (১২৯৬ শ্রাবণ) প্রথম প্রচারিত হইলেও কয়েক বৎসর পূর্বের রচনা নয় নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এমন-কি রবিচ্ছায়ায় যেগুলির প্রথম সংকলন, তন্মধ্যে কয়েকটি কম-বেশি আরও কত পুরাতন রচনা তাহা অন্য পাণ্ডুলিপিতে ও গ্রন্থে দেখা যায়। তালিকায় উল্লিখিত ষষ্ঠ গানটি ভগ্নহৃদয় কাব্যের একাদশ সর্গে অনিলের উক্তির নির্যাস ও রূপান্তর। তালিকার প্রথম তৃতীয় ও সপ্তম গান কয়টি সম্ভবতঃ ১২৯১ সনের বৈশাখে বা প্রথম দিকে রচিত ইহা 'পুষ্পাঞ্জলি' পাণ্ডুলিপির আলোচনাসূত্রে জানা গিয়াছে। চতুর্থ গানটি সম্পর্কে লক্ষণীয় এই যে, এটি মুদ্রিত গ্রন্থে না থাকিলেও 'নলিনী'র রবীন্দ্রসদন-পাণ্ডুলিপিতে পূর্বেই লেখা ছিল ; তবে তাহার নির্দেশিত স্থান তৃতীয় দৃশ্যের প্রথম দিকে না হইয়া পঞ্চম দৃশ্যের প্রথমে, যে স্থানে 'নব নলিনী'র পরিকল্পনায়, রবীন্দ্রভারতীর গ্রন্থে, 'ঐ বুঝি বাঁশি বাজে' গানটি বসিয়াছে।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রভারতী সংগ্রহের গ্রন্থে যেমন সংযোজিত গানগুলির ইঙ্গিতমাত্র আছে, রবীন্দ্রসদনের পাণ্ডুলিপিতেও শুধু প্রথম দৃশ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গানের পূর্ণ পাঠ পাওয়া যায়।

কানাই সামন্ত

মেঘদূত-পরিচয়। পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য। জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলিকাতা ৯। ছয় টাকা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য্যের 'মেঘদূত-পরিচয়' একখানি অসাধারণ পুস্তক, এবং এখানি পাঠ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় একজন অধ্যাপক যে এখনও শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্য চর্চার এই ভীষণ দুর্দিনে এইরূপ একখানি বই লিখিতে পারিয়াছেন, ইহাতে আমি বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি এবং গর্ব অনুভব করিতেছি। অন্তত দেড় হাজার বৎসর পূর্বে 'মেঘদূত'-খণ্ডকাব্যখানি রচিত হয়, এবং ভারতের বিদ্বৎসমাজে তাহার পরিচয় ও প্রচার ঘটে। এই দেড় হাজার বছরের অধিক কাল ধরিয়া এই কাব্যরত্নের লোক-প্রিয়তার হানি হয় নাই, উত্তরোত্তর এই লোক-প্রিয়তা বাড়িয়াই চলিয়াছে। বিদেশের সহৃদয় সাহিত্য-রসিকগণ এই বইকে আদর করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন— বিভিন্ন ইউরোপীয় ও অন্য ভাষায় ইহার অনুবাদ ও ইহার প্রশস্তি তাহার প্রমাণ। ছোট বই, সব শুদ্ধ ১৩০টীর বেশী শ্লোক ইহাতে নাই, কিন্তু সাহিত্য-গগনে ১৩০ শ্লোকের এই নক্ষত্রমালা তাহার অভিনব সৌন্দর্য্যে রসবিদ্‌গণের হৃদয়কে আকুল করিয়া রাখিয়াছে। 'গীতা' ছাড়া বোধ হয় আর কোনও সংস্কৃত বইয়ের এত টীকা লেখা হয় নি। বড় বড় কবি, কি স্বদেশে কি বিদেশে, ইহার প্রশস্তি করিয়া গিয়াছেন, নানা-ভাবে ইহার উদার শ্লোক-মালার ভাব-সম্পুট ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বকবিও ইহার রসধারায় স্বীয় চিত্তকে নিষিক্ত করিয়া অপূর্ব আনন্দ লাভ করিয়াছেন, এবং সেই আনন্দের অংশ তাঁহার পাঠকদের কাছেও আনিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। মেঘদূতের বাহ্যরূপ ও ইহার আত্মা, ইহার ভাষা ও কাব্যময় প্রকাশ এবং ইহার ভাব— এই দুইটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত— ইহার ভাষার সুললিত স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষময় ঝঙ্কারকে বাদ দিলে অনেকটাই বাদ দিতে হয়। এইজন্য রাজশেখর বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন, মেঘদূতের পুরা অনুবাদ হয় না, মুলই পাঠযোগ্য।— এই হেতু বাঙ্গালী পাঠকের শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে, সংস্কৃত ভাষার যে একটা গভীর এবং অনপনেয় মর্য্যাদাপূর্ণ স্থান আছে তাহা স্মরণ করিয়া, তিনি মুল মেঘদূতের আস্বাদনে সহায়তা করিবার অন্যতম উদ্দেশ্য লইয়া, মূল সংস্কৃতের সঙ্গে তাঁহার মেঘদূত গ্রন্থের সটীক সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্য এবং পদ্য উভয় প্রকার রচনা হইতেও আমরা মেঘদূতের সৌন্দর্য্যের কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারি। ইদানীন্তন কালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, রসজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ ও তথ্যজ্ঞ পণ্ডিতের সর্বঙ্কষ দৃষ্টি লইয়া, বাঙ্গালা মেঘদূতের যে একটী ব্যাখ্যামূলক টীকানুবাদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অপূর্ব। মেঘদূতের কতগুলি বাঙ্গলা অনুবাদ হইয়াছে জানি না— ২০।২২ খানির কম নহে বলিয়া মনে হয়। প্রায় সব অনুবাদকই মেঘদূতের গুণগ্রাহী ভক্ত— মাক্ষিকী-বৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা মেঘদূতের আলোচনায় বা অনুবাদে অবতীর্ণ হন নাই। কিন্তু দুই একখানি অজ্ঞ ও দম্ভপূর্ণ, রসজ্ঞান-বর্জিত ও অক্ষম তথাকথিত "আধুনিক" আলোচনার ব্যর্থতায়, মন যে বিরক্তিতে ও বিষাদে পূর্ণ হয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণের বই পড়িয়া মন হইতে সেই বিরক্তি ও বিষাদের সম্পূর্ণ অপনোদন হয়, এবং লেখককে ভূরিভূরি সাধুবাদ ও আশীর্বাদ দিবার প্রবৃত্তি হয়।

এই বইখানি অধিকারী পণ্ডিতের লেখা, এবং ইহাতে মেঘদূতের সৌন্দর্য্যের যে অপরূপ সুন্দর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা আছে, তাহা বাঙ্গলাভাষার ও বাঙ্গালীর সংস্কৃত চর্চার পক্ষে গৌরবের বস্তু বলিয়া মনে করি। লেখক যে কেবল বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত পূর্ণ পরিচয় রাখেন তাহা নহে, তদতিরিক্ত ইংরেজী

ও ফারসী সাহিত্যের হাওয়া তাঁহার মনের মধ্যে বহিতেছে। তিনি নিয়মিত ফারসী-ভাষার অধ্যয়নও করিয়াছেন।— এই চারিটি ভাষার তুলনা-মূলক সাহিত্যাবলোকন তাঁহার আলোচনাকে মহত্ত্ব-যুক্ত করিয়াছে। বইখানির ৬৮ পৃষ্ঠব্যাপী সুদীর্ঘ ভূমিকা নানা তথ্যে পূর্ণ, ইহার তথ্য-সম্ভার তথা কবিজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গী এই ভূমিকাকে বিশেষ উপভোগ্য ও কার্য্যকর করিয়াছে। মেঘদূতের মধ্যে গৃহীত ১১৮টী শ্লোকের প্রত্যেকটীর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষ করিয়াছেন— প্রথম— 'অবতরণিকা', এই অংশে অন্বয়-মুখে মূলের বঙ্গানুবাদ, যাহাতে সঙ্গে-সঙ্গে মূলের পাঠ ও ইহার ভাষার ঝঙ্কার বিনা আয়াসে আয়ত্ত করা যায়; পরে আছে 'প্রবেশক'— এই অংশে শ্লোকটীর ভিতরের ও বাহিরের বিষয়-বস্তুর ব্যাখ্যা; এবং পরে অপূর্ব কবিত্বময় 'পরিচয়'— এইখানেই বলিব, লেখকের মৌলিকতার বিশেষ পরিচয় আছে। ভাষা, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, পৌরাণিক ও অন্য প্রসঙ্গ— কোনও-কিছু বাদ যায় নাই— চারিদিক হইতে আলোক-সম্পাত করিয়া মেঘদূতের প্রত্যেকটী শ্লোকরত্নের জ্যোতির পূর্ণ বিকিরণে এই মেঘদূত-পরিচয়ের দ্বারা সহায়তা করা হইয়াছে। পার্বতীচরণ পূর্বাচার্য্যদের উপেক্ষা করেন নাই, শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের সহিত সর্বত্রই তাঁহাদের বিচার-বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করিয়াছেন; এবং এতদ্‌ভিন্ন, হরপ্রসাদের চরণ-চারণকে পার্বতীচরণ প্রশস্ত রাজমার্গে পরিণত করিয়াছেন। Sanskrit Culture বলিলে যাহা বুঝি, তাহার এরূপ সর্বাঙ্গ-সুন্দর প্রকাশ খুব কমই দেখা যায়। আমার আশা ও কামনা, বইখানি নিজগুণে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক, এবং লেখককে নব-নব পথে অনুরূপ সাহিত্য-সর্জনায় প্রণোদিত করিয়া, বঙ্গভারতী ও বিশ্বভারতীর সম্প্রসারণে ও পরিবর্ধনে সার্থক প্রযত্নে নিয়োজিত করুক।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ঈশানুসরণ। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব স্বামী সচ্চিদানন্দ কর্তৃক অনূদিত। প্রকাশক শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মঠ, কলিকাতা ৩। মূল্য যথাক্রমে পাঁচ টাকা ও আট টাকা।

টমাস্ এ. কেম্পিসের ভাব ও ভক্তি -রসস্নিগ্ধ 'দি ইমিটেশন্ অফ ক্রাইস্ট' নামক চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ অপূর্ব গ্রন্থটির স্বামী সচ্চিদানন্দ কৃত প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। প্রকাশকের নিবেদনে দেখি যে এক খণ্ডে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব দ্বিতীয় খণ্ডে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম পর্বে ধর্মজীবনের প্রয়োজনীয় নীতিসমূহ পঁচিশটি অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ; বারোটি অধ্যায়ে দ্বিতীয় পর্বের আলোচ্য বিষয় 'অন্তর্মুখী জীবন'। তৃতীয় পর্বের আলোচনার বস্তু 'অন্তরের শান্তি'। চতুর্থ পর্বের নামকরণ হইয়াছে 'মহাভিষেকের বিষয়সমূহ'।

ইউরোপীয় মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক দিনে ভগবদ্ভক্ত সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত খ্রীষ্টীয় শ্রমণ কর্তৃক প্রায় সাড়ে ছয় শত বৎসর পূর্বে এই পুস্তকটি লাতিন ভাষায় লিখিত হইলেও ইহার মধ্যে এমন এক শাশ্বত সত্যানুভূতির স্পর্শ আছে যার আবেদন ধর্ম কাল রীতিনীতি সমাজ শাসন নিরপেক্ষ। এঁদের সংঘের নাম লক্ষণীয়— Brothers of Common Life: জনসাধারণের ভ্রাতৃসম্প্রদায়। এই পুস্তকটি শুধু বিশ্বখ্যাতিই লাভ করে নি, পৃথিবীর নানা ভাষায় টীকা-টিপ্পনীসহ অনূদিত হইয়াছে এবং আজও যে হইতেছে তাহার প্রমাণ, স্বামী সচ্চিদানন্দের সভাষ্য অনুবাদ।

শতাব্দীর পর শতাব্দী জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝার দুঃখের বিপদের ঘন তামসীক্ষণে, বহু অশান্ত নিশীথ রাত্রে এই

পুস্তকটি 'বহুজনহিতায়' বহু আর্ত মানবমানবীকে শান্তির দিশা দেখাইয়াছে, অমৃতের পথ নির্দেশ করিয়াছে। স্বামী সচ্চিদানন্দের মূলানুগ এই অনুবাদ শুধু সাবলীল নয়, ভাষার মাধুর্যে ও রচনার বৈদগ্ধ্যে রসাশ্রয়ীই নয়, আমাদের নিজেদের শাস্ত্রচেতনা ও সাধুসন্ত-বাণীর উদ্ধৃতিতে সমৃদ্ধ। খ্রীষ্টকে প্রতীক করিয়া সব দেশের সব মানবের, সব সাধনার সমন্বয়বাণী এই পুস্তকের প্রতিটি ছত্রে প্রতিফলিত। উপনিষদে, গীতায়, চণ্ডীতে, বুদ্ধ শঙ্কর তুলসীদাস কবীর নানক প্রভৃতি সাধুসন্তের বাণীতে, আজকের যুগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতে বা বিবেকানন্দের উক্তিতে, রবীন্দ্রনাথের গানে বা টেনিসনের ডি প্রফাণ্ডিসে অনেক সময় ঈশানুসরণের অনুরূপ ভাবসাধনার ইঙ্গিত দেখি।

স্বামী বিবেকানন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি বহু মনীষী এই পুস্তকটির বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখের একটি চিঠিতে মিস্ ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লিখিতেছেন যে টমাস্ এ. কেম্পিসের এই বইটি স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি বলিতেন, পৃথিবীর সব দেশের সব-কিছু ভালো তাঁর জন্য তোলা আছে।··· তাঁর বয়স যখন তেরো, তখন তিনি টমাস্ কেম্পিসের এক খণ্ড বই পান যার ভূমিকায় সন্ন্যাসী মঠ ও সংগঠনের বিষয় ছিল। বইয়ের সেই অংশটির আকর্ষণ তাঁর কাছে ছিল অফুরন্ত যদিও তিনি ভাবেন নি যে ঐ ধরণের কাজ ভবিষ্যতে তাঁকেই একদিন করতে হবে। তিনি আরও বলিতেন, "টমাস্ এ. কেম্পিসকে আমি ভালবাসি— সেটি এবং গীতা সবটুকু আমার কণ্ঠস্থ— আমার দুটি প্রিয় পুস্তক··· তত্ত্বকথা নয়, মানুষটাই আসল— মানুষটা বেরিয়ে এল··· মানুষের অভীপ্সার রূপ।" তিনি ১২৯৬ সালে অধুনালুপ্ত সাহিত্যকল্পদ্রুম নামক মাসিক পত্রে ঈশা-অনুসরণ নাম দিয়া এই পুস্তকটির অনুবাদ শুরু করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে ইহার প্রতিটি অক্ষর ঈশ্বরপ্রেমে সর্বত্যাগী মহাত্মার হৃদয়শোণিত-বিন্দুতে মুদ্রিত। বইটিতে তিনি শুধু দীনতা-আর্ত ও দাস্যভক্তির বা জলন্ত বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখেন নি, গীতার প্রতিধ্বনি শুনেছিলেন।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা'র গান

দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে জন্মে যে প্রেম
দীপ্ত সে হেম,
নিত্য সে নিঃসংশয়,
গৌরব তার অক্ষয়।
দুরাকাঙ্ক্ষার পরপারে   বিরহতীর্থে করে বাস
যেথা জ্বলে ক্ষুব্ধ হোমাগ্নিশিখায়   চিরনৈরাশ—
তৃষ্ণাদাহনমুক্ত   অনুদিন অমলিন রয়।
গৌরব তার অক্ষয়।
অশ্রু-উৎস-জল-স্নানে   তাপস জ্যোতির্ময়
আপনারে আহুতি-দানে   হল সে মৃত্যুঞ্জয়।
গৌরব তার অক্ষয়॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II র্সা -া র্সা র্সা । না -া না না I ধা ধা ধা ধা । পা -া -া -া I
দুঃ ০ খে র য ০ জ্ঞ অ ন ল জ্ব ল নে ০ ০ ০

I ধা -া পা গা । র্সা -া -া -া I ধা -পা পা পা । র্সা -া -া -া I
জ ন্ মে যে প্রে ০ ০ ম্ দী প্ ত সে হে ০ ০ ম্

I ধা -া ধা পা । গা -া রা -া I সা -া -া -া । -া -া -া -া I
নি ০ ত্য সে নিঃ ০ স ঙ্ শ ০ ০ ০ ০ ০ য় ০

I র্গা -া র্গা র্গা । র্রা -া র্সা -া I র্মা -া -া -া । -া -া -া -া I
গৌ ০ র ব তা র্ অ ০ ক্ষ ০ ০ ০ ০ ০ য় ০

I র্সা র্সা র্সা -া । র্সা -া র্সা র্সা I র্সনা -র্রা র্রা -া । -া -া -পা -া I
দু রা কা ঙ্ ক্ষা র্ প র পা০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I ধা র্সা র্সা র্সা । -না র্রা র্রা র্রা I র্সা -া -া -া । -া -া -া -া I
বি র হ তী র্ থে ক রে বা ০ ০ ০ ০ ০ স্ ০

I র্সা র্গা র্গা র্গা । [র্]র্গা -া র্গা র্গা I র্রা -া [র্]র্সা র্সা । ধা -র্সা -া -া I
যে থা জ লে ক্ষু ব্ ধ হো মা গ্ নি শি খা ০ ০ য়্

I ধা ধা পা -া । গা -া -া -া I পা -া গা -া । পা -া গা গা I
চি র নৈ ০ রা ০ ০ শ্ তৃ ষ্ ণা ০ দা ০ হ ন

I পা -া গা -া । -া -া -া -া I সা রা গা মা । পা পা ধা না I
মু ক্ ত ০ ০ ০ ০ ০ অ নু দি ন অ ম লি ন

I র্সা -া -া -া । -া -া -া -া I র্গা -া র্গা র্গা । র্রা -া র্সা -া I
র ০ ০ ০ ০ ০ য়্ ০ গৌ ০ র তা তা র্ অ ০

I র্মা -া -া -া । -া -া -া -া I র্সা -া র্সা র্সা । -া র্সা র্সা র্সা I
ক্ষ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ ০ অ ০ শ্রু উ ৎ স জ ল

I র্সনা -র্রা র্সা -া । -া -া -পা -ধা I ধর্সা -া র্সা র্সা । না -া র্রা -া I
স্না০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ তা০ ০ প স জ্যো ০ তি র্

I র্সা -া -া -া । -া -া -া -া I র্গা র্গা র্গা র্গা । [র্]র্গা -া র্রা র্রা I
ম ০ ০ ০ ০ ০ য় ০ আ প না রে আ ০ হু তি

I র্সা -া ধা -া । -া -া -া -া I ধর্সা র্সা ধা -া । পা -া গা -া I
দা ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ হ্ ল সে ০ ম্ন ০ ত্যু ন্

I রসা -া -া -া । -া -া -া -া I র্গা -া র্গা র্গা । র্রা -া র্সা -া I
জ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ ০ গৌ ০ র ব তা র্ অ ০

I র্মা -া -া -া । -া -া -া -া II II
ক্ষ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ ০

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায় বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৩ মাঘ-চৈত্র ১৩৭৫

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৭৫ · ১৮৯০-৯১ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী পরপৃষ্ঠায়

মূল্য দেড় টাকা

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৭৫ · ১৮৯০-৯১ শক

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রতিমা দেবীকে লিখিত

ওঁ

পতিসর
আত্রাই

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমরা কাল রাত্রে পতিসর পৌঁচেছি। এখানে এসেই তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম।

আমি যে ঠিক কাজের তাগিদে এসেছি সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। লোকজনের মধ্যে যখন জড়িয়ে থাকি তখন ছোট বড় নানা বন্ধন চারদিকে ফাঁস লাগায়— নানা আবর্জ্জনা জমে ওঠে— দৃষ্টি আবৃত এবং বোধশক্তি অসাড় হয়ে পড়ে— তখন কোথাও পালিয়ে যাবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যিনি অপাপবিদ্ধ নির্ম্মল পুরুষ, যিনি চির জীবনের প্রিয়তম, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ আপনাকে সমর্পণ করে দেবার জন্যে মনের মধ্যে এমন কান্না ওঠে যে ইচ্ছা করে বহু দূরে বহু দীর্ঘকালের জন্যে কোথাও চলে যাই। যতই নানাদিকে নানা কথায় নানা কাজে মন বিক্ষিপ্ত হয় ততই গভীর বেদনার সঙ্গে সুস্পষ্ট বুঝতে পারি তিনি ছাড়া আর কিছুতেই আমার স্থিতি নেই তৃপ্তি নেই— তাঁকে ছাড়া আমার একেবারেই চল্‌বে না। কবে তিনি আমার বাসনা পূর্ণ করবেন জানিনে— কিন্তু জোড় হাত করে কোনো প্রশান্ত পবিত্র নির্জ্জন স্থানে তাঁর দিকে তাকিয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে— কেবল বলি— মা মা হিংসীঃ— আমাকে আর আঘাত কোরো না— আর মেরো না, আর মেরো না— ভাল মন্দর দ্বন্দ্বের মাঝখানে রেখে আমাকে কেবলি চারদিক থেকে এমন ধাক্কা খেতে দিয়ো না। জীবন যখন দ্বিধাবর্জ্জিত বাসনামুক্ত পবিত্র হয়ে উঠ্‌বে— তখন লোকালয়েই থাকি আর নির্জ্জনেই থাকি, সর্ব্বত্রই সেই পবিত্রতার সাগরের মধ্যে সেই প্রেমের অতলস্পর্শ সমুদ্রের মধ্যেই নিমগ্ন হয়ে থাকৃতে পারব। দুঃস্বপ্নজালজড়িত এই অন্ধকার রাত্রির অবসানে সেই জ্যোতির্ম্ময় প্রভাতের জন্যে মন অহরহ অপেক্ষা করচে— সকল সুখদুঃখ, সকল গোলমাল, সকল আত্মবিস্মৃতির মধ্যেও তার সেই একটিমাত্র সত্য আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু চিরদিনই জীবনকে এত মায়ায় এত মিথ্যায় জড়াতে দিয়েছি যে, তার জাল কাটাতে আজ প্রাণ বেরিয়ে যাচ্চে। তা হোক্, তবু কাটাতেই হবে— সংসারের, বিষয়ের, বাসনার সমস্ত গ্রন্থি একটি একটি করে খুলে তবে যেন আমার এই জীবনের ব্রত সাঙ্গ হয়-- স্নান করে ধৌত হয়ে নির্ম্মল বসন পরে শুচি ও সুন্দর হয়ে যেন

এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে তাঁর কাছে যেতে পারি— ঈশ্বর সেই দয়া করুন— আর সমস্ত চাওয়া যেন একেবারে নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়। তোমাদের মধ্যেও আমার সংসারের মধ্যেও সেই পবিত্র পরম পুরুষের আবির্ভাব বাধামুক্ত হয়ে প্রকাশ পাক্ এই আমার অন্তরের একান্ত কামনা। তোমার মনের মধ্যে সেই অমল সৌন্দর্য্যটি আছে— যখন তাঁর জ্যোতি সেখানে জ্বলে উঠ্‌বে— তখন তোমার প্রকৃতির স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে থেকে সেই আলো খুব উজ্জ্বল ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবে আমার তাতে সন্দেহ নেই— তুমিই আমার ঘরে তোমার নির্ম্মল হস্তে পুণ্যপ্রদীপটি জ্বালাবার জন্যে এসেছ— আমার সংসারকে তুমি তোমার পবিত্র জীবনের দ্বারা দেবমন্দির করে তুল্‌বে এই আশা প্রতিদিনই আমার মনে প্রবল হয়ে উঠ্‌চে। ঈশ্বর তোমার ঘরকে তাঁরই ঘর করুন এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ৭ই ভাদ্র ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তুমি আমার নববর্ষের অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। যিনি সকলের বড় তাঁকে তুমি সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাও এই আমার একান্ত মনের কামনা। মানব জীবনকে খুব মহৎ করে জান— নিজের সুখস্বার্থ সাধন কখনই তার লক্ষ্য নয় এ কথা সমস্ত ভোগসুখের মধ্যে মনে রেখো— সংসারকেই বড় আশ্রয় বলে জেনো না এবং কঠিন দুঃখ বিপদেও ভক্তির সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে শেখ— প্রতিদিনের সুখদুঃখে তাঁকে প্রণাম করার অভ্যাস রেখো— প্রত্যহই যদি তাঁর কাছে যাবার পথ সহজ করে না রাখ তাহলে প্রয়োজনের সময়ে সেখানে যেতে পারবে না। প্রভাতে ঘুম থেকে উঠেই যেন তোমার মনে পড়ে যে তিনিই আছেন তোমার চিরজীবনের সহায় সুহৃদ্ পিতামাতা— তাঁরি কর্ম্ম বলে সংসারের কর্ম্ম করবে— এবং এ জীবনে যাদের সঙ্গে তোমার স্নেহ প্রেমের সম্বন্ধ হয়েছে তাদের সেই সম্বন্ধ তাঁরই প্রেম উৎসের সুধারসে মধুর ও সুন্দর হয়ে রয়েছে এই কথাটি খুব গভীর করে মনের মধ্যে স্মরণ করবে। তাঁর নাম স্মরণের মধ্যে তোমার মন প্রতিদিন স্নান করুক— সেই সত্যময় জ্ঞানময় আনন্দময় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের চিন্তার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে মনকে ডুবিয়ে প্রতিদিনের সমস্ত ধূলা ও দাহ থেকে আপনাকে নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ করে তোলো। তিনি তোমার মনে আছেন, বাইরে আছেন, দিনরাত্রি তিনি তোমাকে স্পর্শ করে আছেন— তিনি যেমন নিবিড়ভাবে অহরহ তোমার কাছে আছেন এমন আর কেউ না— খুব করে সেই কথাটি মনে জেনে তাঁকে প্রণাম করে সকলের এবং নিজের মঙ্গল তাঁর কাছে প্রার্থনা কোরো।

আমাদের এখানে কাল পূর্ণিমা রাত্রে মাঠের মধ্যে বর্ষশেষের এবং আজ খুব ভোর রাত্রে মন্দিরে নববর্ষের উপাসনা শেষ হয়ে গেল— সকলেই আমরা গভীর আনন্দ পেয়েছি।

তোমরা আবার শিলাইদহে কবে ফিরে যাবে? বড়দাদাকে নিয়ে হেমলতা বৌমা বোধ হয় পশু কলকাতা হয়ে পুরীতে চলে যাবেন। ইতি ১লা বৈশাখ ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মা, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকে মিলিয়ে না দেখ্‌লে সত্যকে দেখা হয় না। আমরা প্রতিদিন জীবনকে যখন উপলব্ধি করি তখন মৃত্যুকে তার অঙ্গ বলে উপলব্ধি করিনে বলে আমাদের প্রবৃত্তি দিয়ে সংসারটাকে আঁকড়ে থাকি। আমাদের বাসনা আমাদের ভয়ানক বন্ধন হয়ে ওঠে। মৃত্যুর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখলে তবেই সংসারের ভার হাল্কা হয়ে যায়। আবার আমরা মৃত্যুকে যখন দেখি তখন জীবনকে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখিনে বলেই শোকের জ্বালা এত প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। মৃত্যু জীবনকেই বহন করে, জীবন মৃত্যুর প্রবাহেই এগিয়ে চল্‌চে এই কথাটিকে ভাল করে বুঝে দেখলে সত্যের মধ্যে আমাদের মন মুক্ত হয়। পূর্ণ সত্যের মধ্যে বিরোধ নেই। জীবন ও মৃত্যুকে একান্ত বিরুদ্ধ বলে জান্‌লেই আমাদের মোহ জন্মায়। সেই মোহ আমাদের বাঁধে, সেই মোহ আমাদের কাঁদায়। যত পাপ যত ভয় যত শোক ঐখানেই।

শুভানুধ্যায়ী
[১৯১১] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আচ্ছা বেশ— তোমরাও যদি ছুটিতে সিঙ্গাপুরে যাও তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে ঘুরে আস্‌ব। দিনুও যাবার জন্যে ক্ষেপেছে— তাকেও সঙ্গে নিতে হবে।...

এখন Cycloneএর সময় কি নয়? যদি সমুদ্রের মাঝখানে ঝড়ের দর্শন পাওয়া যায় তাহলে সমুদ্রটাকে খুব মনোরম বলে মনে হবে না।

যদি East Coast Railway দিয়ে কলম্বো যাতায়াত করতে ইচ্ছা কর সে একটা মন্দ trip হয় না। পূজোর সময় concession পাওয়া যায়। সেখানে Candy শুনেছি চমৎকার জায়গা।

যাই হোক সিঙাপুরই যদি তোমাদের পছন্দ হয় আমার তাতে আপত্তি নেই। পাছে জলপথে সেই একই রাস্তা দিয়ে ফেরবার সময় তোমাদের বিরক্ত ধরে এই একটা আশঙ্কা আছে।

যেখানেই যাও রথীকে বোলো Cookদের সঙ্গে সমস্ত হোটেল খরচপত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে যেন পরামর্শ করে রাখে।

মীরা ভাল আছে তাই আর কলকাতায় গেলুম না। যেতে হলে আমার কষ্ট হত। শরীর ত তেমন ভাল নেই— এখানকার রেলে যাত্রার সময়টাও বড় বিশ্রী।

বড়দিদির বেশ ভাল লাগ্‌চে শুনে খুসি হলুম। তোমার পড়াশুনো এখন কি রকম চলচে? নগেন অনেকদিন অনুপস্থিত বলে বোধ হয় তোমার ক্লাস বন্ধ। সেই Astronomyর বই কি এখন রথী তোমাকে পড়ে শোনায়? জাহাজে যাবার সময় তোমাকে অনেক বই পড়ে শোনানো যাবে। ইতি

[১৯১১] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমি তোমাদের সকলকে অনেক দুঃখ দিয়েছি এবং দুঃখ পেয়েছি। আমার মনের মধ্যে কোথা থেকে একটা ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। কিন্তু সেটা থাকবে না। তোমরা যখন ফিরে আস্‌বে তখন দেখ্‌তে পাবে আমি নিজের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছি। আমার সেই স্থানটি হচ্চে বিশ্বের বাতায়নে, সংসারের গুহার মধ্যে নয়। তোমাদের সংসারকে তোমরা নিজের জীবন দিয়ে এবং পূজা দিয়ে গড়ে তুল্‌বে— আমি সন্ধ্যার আলোকে নিজের নির্জ্জন বাতায়নে বসে তোমাদের আশীর্ব্বাদ করব।

আমাকে তোমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকবে না— ঈশ্বর তার থেকে আমাকে মুক্তি দেবেন। সংসার যাত্রার যা কিছু উপকরণ সে আমি সমস্ত তোমাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমার সঙ্গে তোমাদের বিনা প্রয়োজনের সম্বন্ধ— সেই সম্বন্ধের টানে তোমরা আমার কাছে যখন আসবে তখন হয় ত আমি তোমাদের কাজে লাগ্‌ব।

তোমাদের পরস্পরের জীবন যাতে সম্পূর্ণ এক হয়ে ওঠে সেদিকে বিশেষ চেষ্টা রেখো। মানুষের হৃদয়ের যথার্থ পবিত্র মিলন, সে কোনোদিন শেষ হয় না— প্রতিদিন তার নিত্য নূতন সাধনা। ঈশ্বর তোমাদের চিত্তে সেই পবিত্র সাধনাকে সজীব করে জাগ্রত করে রেখে দিন এই আমি কামনা করি।

তোমাদের সংসারটাকে সুধাপাত্রের মত করে মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি একবার গৃহস্থধর্ম্মের অমৃতরস পান করে যাই এই আমার মনের লোভ এক একবার মনকে চেপে ধরে। কিন্তু লোভকে যেমন করে হোক্ ত্যাগ করতেই হবে। এখন আর ফল আকাঙ্ক্ষা করবার দিন নেই— সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে তোমাদের কল্যাণ কামনা করব— সেই কল্যাণে আমার কোনো অংশ থাকবে একথা মনেও করতে নেই; এবং আমার রাস্তা দিয়ে যে তোমাদের জীবনের পথে তোমরা চলবে একথা মনে করা অন্যায় এবং এ সম্বন্ধে জোর করা দৌরাত্ম্য। তোমাদের সমস্যা তোমাদের, তোমাদের প্রকৃতি তোমাদের, তোমাদের পথ তোমাদের— তোমাদের সম্বন্ধে আমার স্নেহ এবং আমার শুভ আশীর্ব্বাদ ছাড়া আর কিছু আমার নয়। সেই স্নেহকেও নির্লিপ্ত হতে হবে— সে যাতে তোমাদের প্রতি লেশমাত্র ভার স্বরূপ না হয় আমাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতেই হবে— তোমাদের ঈশ্বরকে তোমাদের আপনার জীবনের আলোকে তোমাদের আপনাদের সুখদুঃখ ও ভালমন্দের সংঘাতের ভিতর দিয়ে একদিন পাবে আমাকে সে জন্য উদ্বিগ্ন হতে হবে না— সে জন্যে আমি তাকিয়ে থাকব না। তোমাদের কল্যাণ হোক।

চিরশুভানুধ্যায়ী

[১৯১৫-১৯১৮] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমাকে বেলার খবর দিতে বলেছিলুম। কিন্তু দরকার নেই। আমি দুর্ব্বলভাবে এ রকম করে চারদিকে আশ্রয় হাৎড়ে বেড়াব না— বেলা নিশ্চয় ভালই আছে ভালই থাকবে— আমার উদ্বেগের উপর তার ভালমন্দ কিছুই নির্ভর করচে না।

প্রতিমা দেবীকে লিখিত এই চিঠিগুলি চিঠিপত্র তৃতীয় খণ্ড থেকে পুনর্মুদ্রিত

পয়ারের উৎস-সন্ধানে

প্রবোধচন্দ্র সেন

পয়ারের স্বরূপ নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে বহু আলোচনা হয়েছে। বর্তমান লেখকের 'ছন্দপরিক্রমা' গ্রন্থের (১৯৬৫ মে) দ্বিতীয় অধ্যায়ে পয়ারের বন্ধ ও রীতি-গত বৈচিত্র্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেবার প্রয়াস করা হয়েছে। এ বিষয়ে অধিকতর আলোচনার অবকাশ বোধ করি আর খুব বেশি নেই। কিন্তু পয়ারের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস নিয়ে আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ এখনও রয়েছে বলে মনে করি। এ প্রবন্ধে সে বিষয়ে কিছু নূতন আলোকপাতের প্রয়াস করা যাবে।

যতদূর জানি পয়ারের জয়যাত্রার ইতিহাস রচনার প্রথম সূত্রপাত হয় রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে (১৮৭২)। এই গ্রন্থে তিনি বলেন, যাঁরা মনে করেন পয়ারের উদ্ভবের মূলে আছে পারসি বয়েতের প্রভাব তাঁদের অভিমত স্বীকার্য নয়। তাঁর মতে "সংস্কৃত যে ছন্দের সহিত পয়ারের কতক সাদৃশ্য আছে তাহাকেই উহার মূল বলা সঙ্গত"। এই সাদৃশ্যের সন্ধানে তিনি জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের দ্বারস্থ হন। তিনি বলেন, "গীতগোবিন্দের স্থানে স্থানে যে কতকগুলি গীত আছে সেসকলের সহিত পয়ারের কতক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়"। তার পরে

সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্॥

ইত্যাদি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেন— "এক্ষণে ইহা বলা যাইতে পারে যে, উপরিউক্তবিধ গীতময় বৃত্ত হইতেই পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে।"

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরে কেউ কেউ অক্ষরসংখ্যার সাদৃশ্যে 'বসন্ততিলক' প্রভৃতি চতুর্দশাক্ষর সংস্কৃত ছন্দকে পয়ারের উৎসভূমি বলে অনুমান করেন। কিন্তু তাঁদের অভিমত সুধীসমাজে স্বীকৃত হয় নি।

আলোচ্যমান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় (১৩১১ সাল, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ ১৪৮-৬০) প্রকাশিত রমেশচন্দ্র বসুর 'পয়ার ছন্দের উৎপত্তি' -নামক প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে রমেশচন্দ্র 'পয়ার' নাম এবং পয়ার ছন্দ উভয়েরই উৎপত্তির বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে 'পয়ার শব্দের উৎপত্তিস্থান যে প্রাকৃত ভাষা তাহাতে আর সন্দেহ নাই'। আর 'পয়ার ছন্দ যে প্রাকৃতমূলক' তারও প্রমাণ দিতে তিনি চেষ্টিত হয়েছেন। তাঁর এই দুই সিদ্ধান্তই যে সমীচীন সে বিষয়ে আজকাল আর কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি যেসব যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপিত করেছিলেন তা সর্বথা বিচারসহ নয়। তাঁর মতে প্রাকৃতের 'চৌপৈয়া' শব্দের 'পৈয়া' অংশে অস্ত্যর্থে 'র' প্রত্যয় দ্বারা প্রাকৃত পৈয়ার ও বাংলা পয়ার শব্দ নিষ্পন্ন করা যায়। অর্থাৎ 'পদ আছে যার' এই অর্থে 'র' প্রত্যয়-যোগে পয়ার শব্দ সাধিত হয়েছে। কিন্তু এরকম পরোক্ষ ব্যুৎপত্তি নিষ্প্রয়োজন। ভাষাতত্ত্বের বিচারে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সংস্কৃত 'পদকার' বা 'পদাকার' শব্দ বিবর্তিত হয়ে পয়ার শব্দে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ পদকারের ছন্দই পয়ার ছন্দ অথবা পদাকার রচনার ছন্দই পয়ার ছন্দ। প্রাচীন কালে রচনামাত্রকেই 'প্রবন্ধ' বলা হত। গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রথম সর্গের

দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে 'এতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্'। তার পরের শ্লোকেই আছে— 'মধুর-কোমলকান্তপদাবলীং শৃণু'। সুতরাং গীতগোবিন্দ কাব্যের গীতগুলিকে যে 'পদাকার প্রবন্ধ' বলা যায় তাতে সন্দেহ নেই। পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যে 'পয়ারপ্রবন্ধ' কথাটি সুপ্রচলিত ছিল। এই কথাটিকে 'পদাকার প্রবন্ধ' কথার বিবর্তিতরূপ বলে সহজেই গ্রহণ করা যায়। পয়ার শব্দের আদিরূপ পদকার বা পদাকার যা-ই হক, এখানে স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন মনে জাগে। পদকারদের রচনায় অথবা পদাকার রচনায় তো ত্রিপদী প্রভৃতি নানা ছন্দই দেখা যায়, তবে চোদ্দো মাত্রার একটি বিশেষ ছন্দকেই কেন পয়ার (পদকার বা পদাকার) বলা হত? তার উত্তর এই যে, আদিকালে এই বিশেষ ছন্দটিই ছিল পদকারদের অথবা পদাকার রচনার একমাত্র বা প্রধানতম অবলম্বন। তাই একমাত্র এই বিশেষ ছন্দটিই 'পয়ার' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। অর্থাৎ এটিই ছিল পদকারদের ছন্দ *par excellence*। বলা প্রয়োজন যে, এই ব্যাখ্যার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় রমেশচন্দ্রের পূর্বোক্ত 'পয়ার ছন্দের উৎপত্তি' প্রবন্ধটিতেই (পৃ ১৫৮)। এই হিসাবেও প্রবন্ধটি স্মরণীয়।

পয়ার একটি রূঢ়ার্থক পরোক্ষ নাম, ত্রিপদী চৌপদীর মতো পারিভাষিক নাম নয়। ছন্দের বিচারে পয়ারের পারিভাষিক নাম হবে 'দ্বিপদী'। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে।—

'নদীতীরে বৃন্দাবনে
সনাতন একমনে
জপিছেন নাম।'

এটা তো স্পষ্টতঃই আট-আট-ছয় মাত্রার ত্রিপদী। এর তিন পদের এক পদ বাদ দিলে বাকি অংশটা হবে দ্বিপদী, এই গাণিতিক তথ্য নিয়ে তর্ক করা চলবে না। প্রথম পদটা বাদ দিলে যা দাঁড়াবে তা হল এই।—

সনাতন একমনে | জপিছেন নাম।

গাণিতিক হিসাবে এটা আট-ছয় মাত্রার দ্বিপদী। আর আট-ছয় মাত্রায় যে পয়ার হয় তা তো সকলেই জানে। অতএব পয়ার যে আসলে দ্বিপদী, এটা একটা তর্কাতীত সত্য বলেই স্বীকার্য। অবশ্য দ্বিপদীমাত্রই পয়ার নয়। দ্বিপদী বহু প্রকারের হতে পারে।

এবার পয়ারের জন্মকথার প্রসঙ্গে আসা যাক। পয়ার যে মূলতঃ প্রাকৃত ছন্দ, এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে রমেশচন্দ্র প্রথমে ভুবনমোহন রায়চৌধুরীর 'ছন্দঃকুসুম' গ্রন্থ (১২৭০ ফাল্গুন) থেকে একটি উক্তি উদ্ধৃত করেন। তাঁর নিজের ভাষা এই।—

"ছন্দঃকুসুম-নামক ছন্দোবিষয়ক পুস্তকে 'পয়ার' শব্দ (ছন্দ) 'প্রাকৃত' বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে। যথা—

পাঁচালী নাম বিখ্যাতা সাধারণ-মনোরমা।
পয়ার ত্রিপদী আদি প্রাকৃতে হয় চালনা॥
দ্বিপাদে শ্লোক সংপূর্ণ তুল্যসংখ্যার অক্ষরে।
পাঠে দুই পদে মাত্র শেষাক্ষর সদা মিলে॥"

—সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১১ তৃতীয় সংখ্যা, পৃ ১৫৬

উদ্ধৃত পদ্যাংশটিতে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল। 'ছন্দঃকুসুম' গ্রন্থের মূলপাঠের সঙ্গে মিলিয়ে এখানে তা ঠিক করে দেওয়া গেল। বলা প্রয়োজন যে, এই পদ্যাংশটি সংস্কৃত অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত এবং সংস্কৃত উচ্চারণের ভঙ্গিতে পঠিতব্য।

বলা বাহুল্য, এখানে 'প্রাকৃত' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ জনসাধারণের কথিত ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষা, রূঢ়ার্থক প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা নয়। প্রাচীন প্রাকৃতে পাঁচালী-জাতীয় কোনো সাহিত্য ছিল না, আর ত্রিপদী ছন্দও ছিল না। ফলে পয়ার যে মূলতঃ প্রাকৃত ছন্দ, এই উদ্ধৃতির বলে তা প্রমাণ হয় না।

'ছন্দঃকুসুম আধুনিক গ্রন্থ; সুতরাং উহাকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।'—এই যুক্তিতে রমেশচন্দ্রও ছন্দঃকুসুমের প্রমাণের উপরে নির্ভর করতে পারেন নি। অতঃপর তিনি একখানি পুঁথির—

"সপ্তদশ পর্ব কথা সংস্কৃত বন্দ
মূর্খ বুঝাবারে কৈল পরাকৃত ছন্দ।"

এই উক্তির আশ্রয় নিয়ে সিদ্ধান্ত করেন—"ইহার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই··· পরাকৃত ছন্দ সম্ভবতঃ প্রাকৃত ছন্দ অর্থাৎ পয়ারকেই বুঝাইতেছে। কেননা পয়ার তখনকার বঙ্গদেশের সর্বজনবোধ্য ভাষা।" এখানে 'পরাকৃত ছন্দ' মানে পয়ার, তা সহজেই মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু ছন্দঃকুসুমের মতো এখানেও 'পরাকৃত' বা প্রাকৃত শব্দের দ্বারা প্রচলিত বাংলা ভাষাকেই বোঝাচ্ছে, প্রাচীন প্রাকৃত ভাষাকে নয়। পুঁথির উক্তি থেকে এটুকু মাত্র বোঝা যায় যে, যেহেতু পুঁথিখানি অশিক্ষিত ('মূর্খ') জনসাধারণের জন্য লেখা সেজন্য বাংলা ('পরাকৃত') ছন্দেই রচিত হল, সংস্কৃত ছন্দে নয়। বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে রূঢ়ার্থক প্রাকৃত ভাষাও সাধারণের বোধগম্য ছিল না। সুতরাং এই পুঁথির সাক্ষ্যেও প্রমাণ হল না, বাংলা পয়ার ছন্দ কোনো প্রাচীন প্রাকৃত ছন্দ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

পয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের শেষ অভিমতটি কিন্তু অধিকতর প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, যে সময়ে প্রাচীন প্রাকৃতের আবরণ ভেদ করে বাংলার প্রাদেশিক প্রাকৃত বা 'গৌড়ীয় প্রাকৃত' ভাষা আবির্ভূত হল সেই সময়ে—

"কেন্দুবিল্বের অমর কবি শ্রীজয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দ কাব্যে 'পয়ার' ছন্দের ডিম্ব হইতে পক্ষী-শাবকের উৎপত্তির ন্যায়, অস্ফুটধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল।··· তাঁহার অমর গীতিকাব্য গীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গে পয়ার ছন্দের জন্মগ্রহণের সংবাদ পাই। ছন্দটি এই।—

সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্॥
শ্বসিতপবনমনুপমপরিণাহং।
মদনদহনমিব বহতি সদাহম্॥

এইরূপ ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম এবং একাদশ সর্গেও পয়ার দৃষ্ট হয়।··· সকল স্থলেই দুই চরণ ও শেষে মিলন এবং প্রতি চরণের মধ্যেই যতি অর্থাৎ বাঙ্গালা পয়ার ছন্দের সহিত সর্বাংশেই সমান।"

—সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১১ তৃতীয় সংখ্যা, পৃ ১৫৯

দেখা যাচ্ছে এ বিষয়ে রামগতি ও রমেশচন্দ্রের মধ্যে মতপার্থক্য নেই। জয়দেবের এই ছন্দ ও বাংলা পয়ারের মধ্যে এত মিল থাকলেও কোনো কোনো বিষয়ে যে কিছু অমিলও আছে, সে সম্বন্ধেও উভয়েই

অবহিত ছিলেন। পয়ারের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে থাকে চোদ্দো 'অক্ষরমাত্রা'। কিন্তু জয়দেবের ছন্দে পঙ্‌ক্তিগুলি 'কোনোটি তেরো, কোনোটি বা চোদ্দো অথবা পনেরো অক্ষরমাত্রায় আবদ্ধ'। বস্তুতঃ জয়দেবের এই ছন্দের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে থাকে ষোলো 'কলামাত্রা' (moric unit)। কারণ এর 'পদগুলি লঘুগুরু-ভেদাত্মক'। বাংলা পয়ারের মতো 'অক্ষরমাত্রা' গণনা এ ছন্দের রীতি নয়। তাই অক্ষরমাত্রার হিসাবে এর পঙ্‌ক্তিগুলিতে কিছু অসমতা দেখা যায়। বাংলা পয়ার ও জয়দেবের ছন্দের মধ্যে এই যে পার্থক্য দেখা যায়, 'ইহার কারণ গীতগোবিন্দের ভাষা সংস্কৃতাভিসারিণী'। রমেশচন্দ্রের এই মতও রামগতির মতের সঙ্গে অভিন্ন।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, জয়দেবের 'সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্' ইত্যাদি রচনার ছন্দকে রমেশচন্দ্র সোজাসুজি পয়ার নামেই অভিহিত করেছেন। আমরাও প্রয়োজনমতো 'জয়দেবী পয়ার' নামে এ ছন্দের পরিচয় দেব। আশা করি তাতে বক্তব্য বিষয়টা পরিস্ফুট করা সহজ হবে। এই জয়দেবী পয়ার কিভাবে ও কিসের প্রভাবে কালক্রমে বাংলা পয়ারে পরিণত হল সে বিষয়ে রামগতি প্রায় কিছুই বলেন নি। কিন্তু রমেশচন্দ্র কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেন—

"জয়দেবের পরবর্তী কবিগণের কাব্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তখনকার ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রভাব কিঞ্চিন্মাত্র থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা তখন প্রাকৃতরূপিণী ধাত্রীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এ কারণ তাঁহাদের কবিতার ভাষা 'সংস্কৃতাপসারিণী', অর্থাৎ তখনকার ভাষার গতি প্রাকৃতের (গৌড়ীয় প্রাকৃতের) দিকে যত অধিক সংস্কৃতের দিকে তত নহে।"

—সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১১ তৃতীয় সংখ্যা, পৃ ১৫৯

রমেশচন্দ্রের এই উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। এখানেই রামগতির চেয়ে রমেশচন্দ্রের অভিমতের অগ্রগতি দেখা যায়। মনে রাখতে হবে, তাঁর এই অভিমত ব্যক্ত হয়েছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সম্পাদিত 'বৌদ্ধগান ও দোহা' প্রকাশের (১৩২৩ শ্রাবণ) বারো বৎসর পূর্বে। এখন আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, রমেশচন্দ্রের এই উক্তি জয়দেবের পূর্ববর্তী ও সমকালীন চর্যাপদকারদের সম্বন্ধেই সর্বতোভাবে প্রযোজ্য, পরবর্তী চণ্ডীদাস-কৃত্তিবাসের সম্বন্ধে নয়। কিন্তু তাঁর পক্ষে তখন এ কথা জানা সম্ভব ছিল না।

জয়দেবী পয়ার ও বাংলা পয়ারের যা-কিছু পার্থক্য, রমেশচন্দ্রের মতে তার মূলে আছে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার গতিপ্রকৃতির স্বাভাবিক পার্থক্য। জয়দেবের ভাষা 'সংস্কৃতাভিসারিণী', পক্ষান্তরে তাঁর পরবর্তী কৃত্তিবাসাদি কবিদের ভাষা 'সংস্কৃতাপসারিণী' এবং 'প্রাকৃতাভিসারিণী'। পয়ারের উৎপত্তির ইতিহাস বুঝতে হলে তার ভাষার প্রাকৃতাভিমুখী গতির বিশিষ্টতা কি তা জানা চাই। রমেশচন্দ্র বাংলা ভাষার এই গতিপ্রকৃতির বিশদ পরিচয় দেন নি বটে, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে যে ইঙ্গিতটুকু দিয়েছেন তার মূল্যও কম নয়। তিনি বলেন 'গৌড়ীয় প্রাকৃত'ই কালক্রমে বর্তমান বঙ্গভাষায় পরিণত হয়েছে। এই প্রাকৃতজ বঙ্গভাষা কিভাবে জয়দেবী পয়ারকে বাংলা পয়ারে পরিণত করেছে সে সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র যে আভাস দিয়েছেন তা তাঁর নিজের ভাষাতেই বলা ভালো।—

"প্রাকৃত ভাষার এই বঙ্গদেশাভিমুখী স্রোত দেশপ্রচলিত খাঁটি চলিত কথোপকথনের ভাষায় চলিত। কৃত্তিবাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ তৎকালীন দেশপ্রচলিত এই চলিত কথা অবলম্বনে 'ভাষাকাব্য' রচনা করেন। এই ধারার প্রথমাবস্থায় বঙ্গভাষা মেয়েলী ছড়া, মেয়েলী ব্রত, ডাকের কথা, খনার বচন এবং

প্রাচীন প্রবাদমূলক ছড়া প্রভৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছিল।... আমাদের বোধ হয় যতদিন হইতে বঙ্গীয় নরনারী একত্র সমাজবদ্ধ হইয়া বসবাস করিতেছে ততদিন হইতেই এসকল বর্তমান। কেননা এইসকল শ্লোকাত্মক পদসমূহ চলিত কথোপকথনের ভাষায় পরিপূর্ণ এবং সমাজশাসনীশক্তিমূলক। বঙ্গসাহিত্যে এইসকল 'বচন' ও 'ছড়া'র প্রচলনে পয়ার ছন্দ গঠনের পক্ষে কিছু-না-কিছু সাহায্য হইয়াছিল।... ইহারা যে বঙ্গীয় প্রাচীন কবিগণকে ছন্দ রচনায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

—সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১১ তৃতীয় সংখ্যা, পৃ ১৬০

রমেশচন্দ্রের এই উক্তির সত্যতা অবশ্য স্বীকার্য। বাংলা ছন্দচিন্তার ইতিহাসে তাঁর এই অভিমত স্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য। কিন্তু চলতি ভাষার ছড়া, বচন, প্রবাদবাক্য প্রভৃতি পয়ার ছন্দ রচনায় কৃত্তিবাস-প্রমুখ প্রাচীন কবিগণকে কিভাবে সাহায্য করেছিল, সে বিষয়ে তিনি আভাসমাত্রও দেন নি। সে সম্বন্ধে কিছু আলোকপাতের চেষ্টা করাই বর্তমান প্রবন্ধের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বে জয়দেবী পয়ারের আসল প্রকৃতি কি সে বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন।

২

সরসমসৃণমপি | মলয়জপঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব | বপুষি সশঙ্কম্॥
শ্বসিতপবনমনু | -পমপরিণাহং।
মদনদহনমিব | বহতি সদাহম্॥

—গীতগোবিন্দ, গীত ৯

সংস্কৃত ছন্দের রীতিতে এই অংশটির প্রতি পঙ্‌ক্তিতেই আছে ষোলো মাত্রা। হিসাবের সুবিধার জন্য অষ্টম মাত্রার পরে একটি করে ছেদচিহ্ন দিয়ে পঙ্‌ক্তিগুলিকে দ্বিধা বিভক্ত করা হল। এখন দেখা যাক সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের বিচারে এ ছন্দের পরিচয় অর্থাৎ নাম ও রূপ কি।

যে ছন্দের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে থাকে ষোলো মাত্রা, শেষ দুই মাত্রার স্থলে থাকে একটি গুরুধ্বনি, নবম মাত্রা লঘু এবং যার দ্বিতীয় চতুর্থ প্রভৃতি জোড়-সংখ্যক ধ্বনি পরবর্তী বিজোড়-সংখ্যক ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গুরু অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক হয় না (যেমন— পিপাসু, অনীশ, সমুদ্র, রবীন্দ্র, অনন্ত), ছান্দসিক পিঙ্গলাচার্যের মতে তার নাম 'মাত্রাসমক'। একটু মন দিলেই বোঝা যাবে যে, জয়দেবী পয়ারের যে অংশটুকু উপরে উদ্ধৃত হয়েছে তার আসল পরিচয় হল মাত্রাসমক। কিন্তু 'মাত্রাসমক' একটি শ্রেণীগত নাম। আরও কয়েকটি বিশেষ ছন্দও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যেমন, যে মাত্রাসমকের দ্বাদশ-সংখ্যক মাত্রাটি লঘু তার নাম 'বানবাসিকা'। আবার যে মাত্রাসমকের পঞ্চম এবং অষ্টম মাত্রাটি লঘু তার নাম 'চিত্রা'। এবার উপরের দৃষ্টান্তটির প্রতি একটু মনঃক্ষেপ করলেই বোঝা যাবে যে, এটিকে শুধু মাত্রাসমক বলাই যথেষ্ট নয়, এটিকে বানবাসিকা এবং চিত্রাও বলা যায়। এইজাতীয় ষোলো মাত্রার কোনো ছন্দে যদি শেষ দুই মাত্রার স্থলে একটি গুরু (অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক) ধ্বনি থাকে এবং পঞ্চম ও অষ্টম মাত্রা লঘু হয় তবে তার নাম হয় 'বিশ্লোক'। বিশ্লোকের নবম মাত্রা লঘু হবেই এমন কোনো বিধান নেই, সে হিসাবে তা 'শুদ্ধমাত্রাসমক' নাও হতে পারে। উপরের দৃষ্টান্তটির প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতেই পঞ্চম ও অষ্টম মাত্রা লঘু। সুতরাং এটিকে 'বিশ্লোক' বলতেও বাধা নেই। আবার যদি

ষোলো মাত্রার কোনো ছন্দে শেষার্ধের প্রথম দুটি ও শেষ দুটি মাত্রার স্থলে একটি করে গুরু ধ্বনি থাকে তবে তাকে বলা হয় 'উপচিত্রা'। মাত্রাসমকের নবম মাত্রা অর্থাৎ শেষার্ধের প্রথম মাত্রাটি লঘু হওয়া চাই। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় উপচিত্রাকে মাত্রাসমকাদি বর্গের ছন্দ বলা গেলেও এটিকে 'শুদ্ধমাত্রাসমক' ছন্দ বলা যায় না। পক্ষান্তরে বিশ্লোকের সঙ্গে উপচিত্রার কোনো বিরোধ নেই, অর্থাৎ একই ছন্দে বিশ্লোক ও উপচিত্রার লক্ষণ বর্তমান থাকতে পারে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

সজলনলিনদল | -শীলিতশয়নে।
হরিমবলোকয় | সফলয় নয়নে॥
জনয়সি মনসি কি | -মিতি গুরুখেদম্।
শৃণু মম বচনম | -নীহিতভেদম্॥

—গীতগোবিন্দ, গীত ১৮

এর প্রথম ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তি 'উপচিত্রা' ছন্দে রচিত। কিন্তু এ দুটিতে বিশ্লোকের লক্ষণও (পঞ্চম ও অষ্টম লঘু) আছে। এর দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির ছন্দ শুদ্ধমাত্রাসমক তো বটেই, তবে এটিকে বানবাসিকা বলাই অধিকতর সংগত। কেননা, এটিতে অধিকতর লক্ষণ বিদ্যমান। আর তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটিতে শুদ্ধমাত্রা-সমকের তো বটেই বানবাসিকা, বিশ্লোক এবং চিত্রার লক্ষণও আছে। কোনো রচনায় এক সঙ্গে একাধিক ছন্দের লক্ষণ থাকলে তাকে কোন্ নাম দেওয়া উচিত সে বিষয়ে সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্র নীরব। সে দিক্ থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে, ওসব ছন্দের লক্ষণনিরূপণে ও নামকরণে যথেষ্ট দুর্বলতা আছে। এসব ক্ষেত্রে পরস্পর-প্রতিষেধক লক্ষণ নির্দেশ অসম্ভব নয়।

আমাদের পক্ষে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উপরের দৃষ্টান্তটি আগাগোড়া একই ছন্দে রচিত নয়। এর বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে বিভিন্ন ছন্দ অনুসৃত হয়েছে। যদি কোনো শ্লোকের বিভিন্ন অংশ মাত্রাসমকবর্গীয় বিভিন্ন ছন্দে রচিত হয় তবে সেই ছন্দসমবায়কে বলা হয় 'পাদাকুলক'। সুতরাং এই দ্বিতীয় উদ্‌ধৃতিটি 'পাদাকুলক' ছন্দে রচিত, এ কথা অবশ্যই বলা চলে। কিন্তু প্রথম উদ্‌ধৃতিটি কোন্ ছন্দে রচিত, পাদাকুলক ছন্দে কিনা তা বিচার্য বিষয়। এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে 'পাদাকুলক' সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলা দরকার।

কেদারভট্টের 'বৃত্তরত্নাকর' গ্রন্থের (ত্রয়োদশ শতকের পূর্বকালীন) একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে প্রত্যেক ছন্দের পরিচায়ক সূত্রটিও সেই ছন্দেই রচিত। এই রীতিতে যথাক্রমে মাত্রাসমক, উপচিত্রা, বিশ্লোক, বানবাসিকা ও চিত্রা ছন্দের পরিচয় দিয়ে তার পরেই দেওয়া হয়েছে পাদাকুলকের পরিচয়। বলা বাহুল্য, এর পরিচায়ক সূত্রটিও পাদাকুলক ছন্দেই রচিত। সেটি এই।—

যদতীতকৃতবি | -বিধলক্ষ্মযুতৈর্
মাত্রাসমাদি | -পাদৈঃ কলিতম্।
অনিয়তবৃত্তপ | -রিমাণসহিতং
প্রথিতং জগৎসু | পাদাকুলকম্॥

—বৃত্তরত্নাকর ২।৩৮

অর্থাৎ—পূর্বোক্ত বিবিধ লক্ষণযুক্ত মাত্রাসমকাদি বিভিন্ন পাদ (পঙ্‌ক্তি) নিয়ে অনিয়ত (অনির্দিষ্ট) প্রণালীতে গঠিত যে ছন্দ, তাই জগৎপ্রসিদ্ধ 'পাদাকুলক'।

এই শ্লোকবদ্ধ সূত্রটির প্রথম পঙ্‌ক্তি রচিত 'চিত্রা' ছন্দে (পঞ্চম-অষ্টম-নবম লঘু), দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পঙ্‌ক্তির ছন্দ 'বিশ্লোক' (পঞ্চম-অষ্টম লঘু) বা 'উপচিত্রা' (শেষার্ধের প্রথম ধ্বনি গুরু) এবং তৃতীয় পঙ্‌ক্তির ছন্দ 'বানবাসিকা' (নবম-দ্বাদশ গুরু)। পিঙ্গলের সঙ্গে কেদারভট্টের একটা পার্থক্যও দেখা যায়। পিঙ্গলের মতে মাত্রাসমকবর্গের কোনো ছন্দেই জোড়-বিজোড় মাত্রা যুক্ত হতে পারে না, কিন্তু কেদারভট্টের মতে বিশ্লোক ছন্দে ষষ্ঠ-সপ্তম মাত্রা যুক্ত হতে বাধা নেই (যেমন— 'সমাদি' এবং 'জগৎস্থ'), আর বানবাসিকাতে দশম-একাদশ মাত্রার সংযোগও নিষিদ্ধ নয় (যেমন— 'রিমাণ')। আর কোনো ছান্দসিকই বোধ করি এ বিষয়ে কেদারভট্টের সঙ্গে একমত নন। আর সাহিত্যেও তাঁর মতের সমর্থক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

যা হক, পাদাকুলক ছন্দের কেদারভট্টপ্রদত্ত সংজ্ঞাসূত্রটি সম্বন্ধে দুটি বিষয় লক্ষ করা প্রয়োজন। এক, এ ছন্দে অনিয়ত বৃত্তসমন্বয়ের কথা। আর দুই, ওই সংজ্ঞাশ্লোকে পঙ্‌ক্তিপ্রান্তিক মিলের অভাব। এবার একে একে এ দুটি বিষয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যাক।

৩

শুদ্ধমাত্রাসমক, বানবাসিকা, চিত্রা, বিশ্লোক এবং উপচিত্রা, এই পাঁচটি বৃত্তের অর্থাৎ ছন্দের মধ্যে যে-কোনো দুটি, তিনটি বা চারটির অনিয়ত সমন্বয়ে গঠিত ছন্দকে বলা হয় পাদাকুলক। অনিয়ত মানে অনির্দিষ্ট অর্থাৎ যথেচ্ছ। ফলে পাদাকুলক ছন্দ রচয়িতার স্বাধীনতা প্রায় সম্পূর্ণ অবারিত। একে তো মাত্রাসমক বর্গের যে-কোনো ছন্দ রচনাতেই লঘুগুরু ধ্বনি বিন্যাসের স্বাধীনতা প্রচুর, তাতে এই ছন্দগুলিকে অবাধে সমন্বিত করবার নির্দেশ থাকায় সে স্বাধীনতার সীমা আরও অনেকখানি বেড়ে যায়। মাত্রাসমক বর্গের উক্ত পাঁচটি ছন্দের মধ্যে প্রথম চারটি পরস্পরের বাধক নয়; একমাত্র উপচিত্রা প্রথম তিনটির বাধক, কিন্তু চতুর্থটির নয়। সুতরাং পাদাকুলক রচনায় এগুলিকে যদৃচ্ছাক্রমে সমন্বিত করার অধিকার থাকায় লঘুগুরু ধ্বনি বিন্যাসের প্রায় সব বাধাই অপসারিত হয়। কেবল দুটিমাত্র নিয়ম মেনে চলার দায়িত্ব অবশিষ্ট থাকে। প্রথমতঃ, প্রতি পঙ্‌ক্তির শেষ ধ্বনিটি গুরু হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ, জোড়সংখ্যক মাত্রাগুলি পরবর্তী মাত্রার সঙ্গে যুক্ত না হওয়া চাই।

মাত্রাসমক বর্গের ছন্দগুলির পরিচয়সূত্র থেকে আরও দুটি বিষয় স্পষ্ট বোঝা যায়। এক, এই ছন্দগুলির প্রতি পঙ্‌ক্তি আট মাত্রা করে দুটি বড় বিভাগে বিভক্ত, এবং দ্বিতীয় বিভাগের প্রথম ধ্বনিটি লঘু না গুরু সেটাই ছন্দের স্বরূপ নির্ণয়ের পক্ষে প্রধান বিচার্য বিষয়— যদি সেটি লঘু হয় তবে ছন্দ শুদ্ধমাত্রাসমক, বানবাসিকা বা চিত্রা পর্যায়ভুক্ত হবে; যদি গুরু হয় তবে সে ছন্দ হবে উপচিত্রা, অবশ্য বিশ্লোক হতেও বাধা নেই। আর দুই, এই বড় বিভাগগুলি আবার চার-চার মাত্রার দুটি উপবিভাগে বিভক্ত। সেইজন্য প্রথম বিভাগের পঞ্চম ও অষ্টম এবং দ্বিতীয় বিভাগের প্রথম ও চতুর্থ মাত্রার লঘুত্ব বিচারে ছন্দের নামকরণ করতে হয়েছে। চার-চার মাত্রার এই উপবিভাগগুলিকে প্রাচীন পরিভাষায় বলা যায় 'গণ', আধুনিক পরিভাষায় 'পর্ব'। চার মাত্রার এই পর্বগুলি আবার দুই মাত্রার দুটি উপপর্বে বিভাজ্য। প্রত্যেক পর্বেই যে দ্বিতীয় মাত্রাকে তৃতীয়ের সঙ্গে যুক্ত করা নিষিদ্ধ হয়েছে তার উদ্দেশ্যই এই উপপর্ব বিভাগ। আর আট মাত্রার বিভাগগুলিকে আধুনিক পরিভাষায় বলা যায় 'পদ'। অর্থাৎ পাদাকুলকের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আট মাত্রার দুই

পদ, প্রতি পদে চার মাত্রার দুই পর্ব এবং প্রতি পর্বে দুই মাত্রার দুটি উপপর্ব থাকে। এসব বিভাগ ঠিক রাখাই পাদাকুলকের আসল বিধান, তা ছাড়া শেষ ধ্বনিটাও গুরু হওয়া চাই। অন্যত্র লঘুগুরু ধ্বনি-বিন্যাস সম্বন্ধে কোনো নিয়ম মেনে চলার দায় নেই।

এর থেকে সহজেই এ ধারণা হতে পারে যে, পাদাকুলক ছন্দ রচনায় কোনো নিয়মই মানবার দরকার নেই। এই ধারণা থেকেই দেখা দিল প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ গ্রন্থের (সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতক) সংজ্ঞাসূত্র।—

লহু গুরু এক্ক ণিঅম ণহি জেহা
পঅ পঅ লেক্খউ উত্তম রেহা।
সুকই ফণিংদহ কংঠহ বলঅং
সোলহ-মত্তং পাআউলঅং॥

—প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ ১।১২৯

বলা বাহুল্য, এই সংজ্ঞাশ্লোকটিও পাদাকুলক ছন্দেই রচিত। ছন্দ এবং অর্থ বাঁচিয়ে এটিকে বাংলায় ভাষান্তরিত করলে দাঁড়াবে এরকম।—

লঘু গুরু বর্ণের কোনো বিধি নাহি তায়,
পদগুলি লিখে যাও উত্তম মাত্রায়।
সুকবি ফণীন্দ্রের কণ্ঠবলয়, ভাই,
ষোলো মাত্রার পাদাকুলকের ছাঁদটাই॥

একটু মন দিলেই বোঝা যাবে পূর্বে পদ, পর্ব ও উপপর্ব বিভাগ এবং গুরুমাত্রা বিন্যাসের যেসব নিয়মের কথা বলা হয়েছে, প্রাকৃত শ্লোকে এবং তার বাংলা অনুবাদে সে সবগুলিই যথাযথরূপে পালিত হয়েছে। সে নিয়মগুলি স্পষ্ট ভাষায় বলা না হলেও সেগুলি রক্ষার বরাত দেওয়া হয়েছে লেখকের শ্রুতিরুচির উপরে। সেজন্যই 'উত্তম মাত্রা'য় লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেরকম মাত্রাবিন্যাস শুনতে ভালো, তাই 'উত্তম'। আসলে উপরে পর্ববিভাগ ও মাত্রাবিন্যাস সম্বন্ধে যে নিয়মগুলি উল্লিখিত হয়েছে সেগুলি মেনে চললেই ছন্দ শুনতে উত্তম হয়, আর না মানলেই কানে খটকা লাগে। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা বোঝা যাবে। পিঙ্গলাচার্য পিঙ্গলনাগ নামেও পরিচিত। পাদাকুলক-সূত্রের ফণীন্দ্র মানে এই পিঙ্গলনাগ। উদ্ধৃত প্রাকৃত শ্লোকটিতে 'সুকই ফণিংদহ' না লিখে 'সুকই পিংগলহ' লেখা যেত এবং তাতে মোট মাত্রাসংখ্যাও ঠিক থাকত। কিন্তু তাতে 'উত্তম রেহা' হত না, অর্থাৎ শুনতে ভালো লাগত না। কারণ তাতে পর্ববিভাগ ও গুরুধ্বনি স্থাপন সম্বন্ধে পূর্বোক্ত নিয়ম ক্ষুণ্ণ হয়। বাংলা অনুবাদের শেষ দুই পঙ্‌ক্তি বিশ্লেষণ করে দেখালেই তা আরও স্পষ্ট হবে।—

সুকবি ফ | -ণীন্দ্রের | কণ্ঠব | -লয়, ভাই,
ষোলো মাত্‌ | -রার পাদা | -কুলকের | ছাঁদটাই॥

এখানে বিজোড় মাত্রাই জোড়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, কোথাও জোড় মাত্রা বিজোড়ের সঙ্গে মিলিত হয় নি। তাই এই অংশটিতে প্রতি পঙ্‌ক্তির ষোলো মাত্রাকে অনায়াসেই চার মাত্রার চার পর্বে বিভক্ত করা গেল। এবার ওই দুটি ছত্রকেই একটু নূতন কায়দায় সাজানো যাক।—

স্বকবি পিঙ্গলের | মধুর কণ্ঠ, ভাই,
ষোড়শ-মাত্রা পাদা | -কুলক ছন্দে পাই।

এখানে চার পদের কোনোটাই আর দুই পর্বে বিভাজ্য নয়। কারণ চারটিতেই চতুর্থ মাত্রা পঞ্চমের সঙ্গে অর্থাৎ জোড় মাত্রা বিজোড়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে পর্বযতি লুপ্ত হয়ে এক-একটি অবিভাজ্য যুক্তপর্বিক পদ গড়ে উঠেছে। কোনো রচনায় যদি মাঝে মাঝে এবকম অবিভাজ্য যুক্তপর্বিক পদ দেখা যায় তবে স্বভাবতঃই রচনার অন্যান্য অংশের সঙ্গে ধ্বনিগত সমতা ব্যাহত হয় এবং ফলে কানেও একটু খটকা লাগে। এইজন্যই সংস্কৃত পাদাকুলক ছন্দে জোড়-বিজোড় মাত্রার সংযোগ এবং তার ফলস্বরূপ যতিলোপ ও অবিভাজ্য যুক্তপর্বিক পদের উদ্ভব নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু প্রাকৃত পাদাকুলকে এমন কোনো নিষেধ নেই। এইজন্যই বলা হয়েছে 'লহু গুরু এক্ক ণিঅম ণহি জেহা'। অথচ আমরা দেখেছি পাদাকুলকের স্বত্রশ্লোকটিতে ও তার বাংলা প্রতিরূপটিতে সংস্কৃত পাদাকুলকের নিয়মগুলি পুরোপুরিই মেনে চলা হয়েছে। কিন্তু মেনে চলা যে অত্যাবশ্যক নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ গ্রন্থে প্রদত্ত পাদাকুলকের দৃষ্টান্তশ্লোকটিতেই। সেটি এই।—

'সের এক্ক জই' পাবউ ঘিত্তা
মংডা বীস পকাবউ ণিত্তা।
'টংকু এক্ক জউ' সেংধব পাআ
জো হউ রংকো সো হউ রাআ॥

—প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ ১।১৩০

অনুরূপ ছন্দে এর বাংলা রূপ হবে এরকম।—

'মাত্র একটি সের' ঘৃত পেলে, নিত্য
বিশটি মণ্ডা বেঁধে খাব ভরি' চিত্ত।
'একটি টঙ্কা-ভর' নুন যদি পাওয়া যায়,
ভিখারী যে, তারও তবে রাজ-হাওয়া লাগে গায়॥

প্রাকৃত শ্লোক এবং তার বাংলা রূপ, উভয়ত্রই উদ্ধৃতিচিহ্ন-নির্দিষ্ট দুটি পদে যতিলোপজাত অবিভাজ্যতা ঘটেছে। সংস্কৃত নিয়মে এরকম অবিভাজ্যতা নিষিদ্ধ, কিন্তু প্রাকৃত নিয়মে অনুমোদিত। পূর্বে বলেছি এরকম ব্যতিক্রমের ফলে রচনার সর্বাংশে ধ্বনিগতির অসমতা ঘটে। কিন্তু এরকম অসমতাকে ত্রুটি বলে গণ্য করা সংগত নয়। কারণ ধ্বনি যদি সর্বত্র সমানভাবে চলে তবে স্বভাবতঃই একরকম একঘেয়েমি অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু মাঝে মাঝে যতিলোপজাত অসমতা ঘটলে ধ্বনিগতিতে বৈচিত্র্য দেখা দেয়। কান তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে এই বৈচিত্র্য উপভোগ্যই হয়। অর্থাৎ তাতে ছন্দের রসহানি না হয়ে তার সৌষ্ঠববৃদ্ধিই হয়। সুতরাং তাতে পদে পদে 'উত্তম রেহা' স্থাপনের বিধান অব্যাহতই থাকে।

এখানে লক্ষ করার মতো আর-একটি বিষয় এই যে, উক্তপ্রকার অবিভাজ্য যুক্তপর্বগুলি চার মাত্রার দুই পর্বের বদলে যথাক্রমে তিন-তিন-দুই মাত্রার তিনটি উপপর্বে বিভক্ত। এটাই যুক্তপর্বের স্বাভাবিক

ভঙ্গি। প্রাকৃত দৃষ্টান্তটিতে যুক্তপর্ব আছে দুটি। বাংলা প্রতিরূপে সে-দুটির স্থলবর্তী দুটি যুক্তপর্ব তো আছেই, একটি অতিরিক্ত যুক্তপর্বও আছে—'বিশটি মণ্ডা রেঁধে'।

৪

এবার আধুনিক বাংলা সাহিত্য থেকে পাদাকুলকের তিনটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তিনটিই সত্যেন্দ্রনাথের রচনা।—

১ মোরা উঠি পল্লবি' বিদ্যুৎ-লতিকায় ;
নীহারিকা ছায়াছবি, মোরা নাচি ঘিরি' তায়।…
শুক্ল শারদ রাতে জোছনার সিন্ধু,
'মেঘের পদ্মপাতে' মোরা মণিবিন্দু।··
চিরযুবা শূরবীর বিজয়ীর কুঞ্জে
আমাদের মঞ্জীর মদালসে গুঞ্জে।··
ফুটে উঠি হাসি-সম খড়্গের ঝলকে,
মোরা করি মনোরম মৃত্যুরে পলকে॥

—'তুলির লিখন' (১৩২১ শ্রাবণ), বিদ্যুৎপর্ণা

২ হিল্লোলে হেথা দোলে 'লাবণ্য' পান্নার !
বিভূতির বিভা ছায় সারা গায় হোথা কার !…
ললিতগমনা কে গো, 'তরঙ্গ'-ভঙ্গা !
জয়তু যমুনা জয়, জয় জয় গঙ্গা।··
অপরূপ, অপরূপ, 'আনন্দ'-মল্লী।
অপরাজিতার হারে পারিজাত-বল্লী !…
অঞ্জন-ধারা সাথে চলে অকলঙ্কা !
জয়তু যমুনা জয়, জয় জয় গঙ্গা॥

—'বেলাশেষের গান,' যুক্তবেণী (১৩২৭ মাঘ)

৩ মঞ্জুল ও-হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা, তোর পথ হল ছাওয়া যে !
মোতিয়া মতির কুঁড়ি মুরছে ও-অলকে,
মেখলায়, মরি মরি, রামধনু ঝলকে।
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা !
ঝর্ণা !

—'বিদায়-আরতি,' ঝর্ণা (১৩২৯ আষাঢ়),

বাংলা পাদাকুলকের ধ্বনিবিশিষ্টতাকে যথোচিতরূপে পরিস্ফুট করার অভিপ্রায়ে দৃষ্টান্তগুলি কিছু বেশি পরিমাণেই উদ্‌ধৃত হল। অনেক স্থলেই পঙ্‌ক্তির শেষ পর্বে (যেমন—সিন্ধু, কুঞ্জে, ঝলকে) দৃশ্যতঃ আছে তিন মাত্রা। কিন্তু আসলে এসব স্থলে শেষ ধ্বনিটি পূর্ণযতির অবকাশহেতু গুরু অর্থাৎ দ্বিমাত্রক রূপেই

উচ্চারিত হয়। সুতরাং ওসব পর্বে চার মাত্রাই ধরতে হবে। এটা সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ছন্দেরও একটি স্বীকৃত নিয়ম।

বিদ্যুৎপর্ণা, যুক্তবেণী ও ঝর্ণা, এই তিনটি কবিতা সমগ্রভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এগুলিতে সংস্কৃত পাদাকুলকের পদ, পর্ব ও উপপর্ব বিভাগের তথা গুরুধ্বনি স্থাপনের নীতিগুলি প্রায় সর্বত্রই অব্যাহত আছে। প্রাকৃত ধরনের ব্যতিক্রম অতি বিরল। পর্বযতি লোপের ফলে উৎপন্ন যুক্তপর্বিক অবিভাজ্য পদ ওই তিনটি কবিতায় আছে মাত্র একটি—'মেঘের পদ্মপাতে' (বিদ্যুৎপর্ণা)। প্রাচীন এবং আধুনিক উভয়বিধ পাদাকুলকেই আর-এক রকম যুক্তপর্বিক পদ আছে যা আমাদের উচ্চারণে বিভক্ত হয় না, অথচ যাকে ছন্দের প্রয়োজনে পর্বে পর্বে বিভক্ত করা যায়। যেমন— শুক্ল শারদ রাতে, ললিতগমনা কে গো, জয়তু যমুনা জয়, মোতিয়া মতির কুঁড়ি। এগুলি 'বিভাজ্য যুক্তপর্বিক পদ'। আর যেসব পদকে পর্বে পর্বে বিভক্ত করা সম্ভবই নয় (যেমন—বিশটি মণ্ডা রেঁধে, মেঘের পদ্মপাতে) সেগুলিকে বলা যায় 'অবিভাজ্য যুক্তপর্বিক পদ'। প্রাচীন ও আধুনিক পাদাকুলব ছন্দের রচনায় বিভাজ্য যুক্তপর্বিক পদ যথেষ্টই দেখা যায়, অবিভাজ্য পদ অপেক্ষাকৃত বিরল। যুক্তপর্বিক পদের প্রয়োগে ছন্দের নৃত্যভঙ্গিতে একঘেয়েমির বদলে বৈচিত্র্য দেখা দেয়। এখানে বলে রাখা ভালো যে, তিন-তিন-দুই মাত্রা নিয়ে গঠিত বিভাজ্য ও অবিভাজ্য যুক্তপর্বিক পদ বাংলা পয়ারেরও একটা বিশিষ্ট লক্ষণ এবং বৈচিত্র্যসৃষ্টির সহায়ক।

'যুক্তবেণী' কবিতাটি থেকে যে অংশটুকু উপরে উদ্ধৃত হয়েছে তার লাবণ্য, তরঙ্গ ও আনন্দ এই তিনটি পর্বের মাত্রাযোজনাপদ্ধতিও লক্ষণীয়। এই তিন পর্বেই দ্বিতীয় মাত্রাটি তৃতীয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ জোড় মিলিত হয়েছে বিজোড়ের সঙ্গে। পূর্বেই বলা হয়েছে এরকম জোড়-বিজোড়ের মিলন সংস্কৃত মতে নিষিদ্ধ, প্রাকৃত মতে অনুমোদিত। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রেও বাংলা ছন্দ প্রাকৃত মতেরই অনুবর্তী, সংস্কৃত মতের নয়। এরকম মাত্রাযোজনার ফলে এই পর্বগুলিকে দুটি করে দুই মাত্রার উপপর্বে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। হিল্-লোলে, পান্-নার, বিভূ-তির, এই পর্বগুলি দুটি করে উপপর্বে বিভক্ত, প্রতি উপপর্বে দুই মাত্রা। কিন্তু লাবণ্য, তরঙ্গ, আনন্দ, এই পর্বগুলির উপপর্ববিভাগ সম্ভব নয়। এরকম পর্বকে বলা যায় অখণ্ড বা অবিভাজ্য পর্ব। তার কারণ জোড়-বিজোড়ের মিলন এবং তার ফলে উপযতিলোপ। এরকম উপযতিলোপজাত অবিভাজ্য পর্ব প্রাকৃতেও বিরল, কিন্তু নিষিদ্ধ নয়। বাংলাতেও তাই। কিন্তু এ ধরনের অবিভাজ্যতাও সংস্কৃত শাস্ত্রসম্মত নয়, ব্যতিক্রম বৃত্তরত্নাকর।

৫

বৃত্তরত্নাকর গ্রন্থে কেদারভট্টকৃত পাদাকুলকের সূত্রশ্লোকটির প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। পাদাকুলক ছন্দে রচিত ওই শ্লোকটিতে পঙ্‌ক্তিপ্রান্তে কোনো মিল রাখা হয় নি। অর্থাৎ কেদারভট্টের মতে পাদাকুলক ছন্দে মিল রাখা অত্যাবশ্যক নয়। পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রেও মিলের প্রয়োজনীয়তার কথা নেই। ছন্দঃসূত্রের টীকাকার হলায়ুধও (ইনি সম্ভবতঃ দশম শতকের লোক, লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত নন) প্রকারান্তরে এই মতই সমর্থন করেন। তিনি শুদ্ধমাত্রাসমক, বানবাসিকা, বিশ্লোক, চিত্রা ও উপচিত্রার যেসব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তার কোনোটিতেই মিল নেই। তৎপরে বলা হয়েছে এসব ছন্দের সমবায়ে যে ছন্দ গঠিত হয় তারই নাম 'পাদাকুলক'। এর থেকে এই অনুমান করাই স্বাভাবিক যে, মিল রাখা পাদাকুলকের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়। তবে তিনি পাদাকুলকের যে-কয়টি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সেগুলিতে কিন্তু মিল আছে।

অথচ মূল ছন্দঃসূত্রে ও তার টীকা, কোথাও এরকম মিলের বিধান নেই। পণ্ডিতেরা মনে করেন মিল বস্তুটাই এসেছে প্রাকৃত রীতির প্রভাবে।

সংস্কৃত সাহিত্যে এমন আর-একটি ছন্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যা সর্বতোভাবেই পাদাকুলকের লক্ষণাক্রান্ত, অথচ যাতে ছন্দশাস্ত্রের বিধান অনুসারে পঙ্‌ক্তিপ্রান্তিক মিল থাকা অত্যাবশ্যক। এ ছন্দটির নাম 'পজ্‌ঝটিকা'। ছান্দসিক গঙ্গাদাসের মতে এ ছন্দের লক্ষণ এই।—

প্রতিপদযমকিত | -ষোড়শমাত্রা।
নবমগুরুত্ববি | -ভূষিতগাত্রা॥
পজ্‌ঝটিকা পুন | -রত্রবিবেকঃ।
ক্বাপি ন মধ্যগু | -রুর্গণ একঃ॥

—ছন্দোমঞ্জরী ৬৷১৫

অর্থাৎ, পজ্‌ঝটিকা ছন্দের চারটি লক্ষণ যথাক্রমে এই।—

(১) প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ষোলো মাত্রা, (২) পঙ্‌ক্তিপ্রান্তে মিল, (৩) নবম মাত্রা গুরু, এবং (৪) মধ্য-গুরু গণের অভাব।

মধ্যগুরু গণ মানে লঘু-গুরু-লঘু (⏑—⏑) ক্রমে বিন্যস্ত চার মাত্রার পর্ব। তার থেকে বোঝা যাচ্ছে প্রতি পঙ্‌ক্তির ষোলো মাত্রা চারটি চতুর্মাত্রক গণে অর্থাৎ পর্বে বিভক্ত, আর কোনো পর্বই মধ্যগুরু হয় না, ফলে কোনো পর্বেই দ্বিতীয় মাত্রা তৃতীয়ের সঙ্গে অর্থাৎ জোড় মাত্রা বিজোড়ের সঙ্গে যুক্ত হয় না। পূর্বে দেখেছি এগুলিই হল পাদাকুলকের, মানে শুদ্ধমাত্রাসমক, বানবাসিকা, চিত্রা, বিশ্লোক ও উপচিত্রার, সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু নবমগুরুত্ব যদি পজ্‌ঝটিকার অত্যাজ্য লক্ষণ বলে গণ্য হয় তা হলে একমাত্র উপচিত্রা ছাড়া মাত্রাসমকাদি বাকি চারটি ছন্দ এর এলাকা থেকে বাদ পড়ে, আর শুধু পঙ্‌ক্তিপ্রান্তিক মিল ছাড়া উপচিত্রার সঙ্গে পজ্‌ঝটিকার কোনো পার্থক্যই থাকে না। অর্থাৎ গঙ্গাদাসের সূত্রানুসারে সমিল উপচিত্রারই নাম পজ্‌ঝটিকা। এজন্য আধুনিক ছান্দসিক চন্দ্রমোহন ঘোষ তাঁর 'ছন্দঃসারসংগ্রহঃ' গ্রন্থে (১৮৯৩) পজ্‌ঝটিকা ছন্দের প্রসঙ্গে বলেছেন, "উপচিত্রাসদৃশী এষা, যমকেনৈব বিশেষিতা" (পৃ ২২)। কিন্তু গঙ্গাদাস নিজেই বলেছেন, 'নবমগুরুত্বং ব্যভিচরতি চ'। অর্থাৎ তাঁর মতেও নবমগুরুত্বের বিধান অলঙ্ঘনীয় নয়; তবে নবম মাত্রা গুরু হলে (মানে দশমের সঙ্গে যুক্ত হলে) ভালো হয়, তাতে ছন্দের শ্রুতিমাধুর্য বাড়ে। এই-জন্যই এ ছন্দের লক্ষণনির্দেশেও বলা হয়েছে, 'নবমগুরুত্ববিভূষিতগাত্রা'। এ কথার তাৎপর্য এই যে, নবমগুরুত্ব পজ্‌ঝটিকার ভূষণমাত্র, তার অঙ্গস্বরূপ (অর্থাৎ অত্যাজ্য লক্ষণ) নয়। সাহিত্যিক প্রয়োগ থেকেও এ সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ হয়। পজ্‌ঝটিকা ছন্দের উজ্জ্বলতম নিদর্শন পাওয়া যায় শঙ্করাচার্যের (জীবনকাল সম্ভবতঃ ৭৮৮-৮২০) 'মোহমুদ্‌গর' রচনাটিতে। তার থেকে কিছু অংশ উদ্‌ধৃত করছি।—

মূঢ় জহীহি ধ | -নাগমতৃষ্ণাং,
কুরু তনুবুদ্ধে | মনসি বিতৃষ্ণাম্।

কস্ত্বং কো বা | কুত আয়তস্
তত্ত্বং চিন্তয় | তদিদং ভ্রাতঃ।

মায়াময়মিদ | -মখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবি | -শাশু বিদিত্বা।
নলিনীদলগত | -জলমতিতরলং,
তদ্‌বজ্জীবন | -মতিশয়চপলম্‌।
ক্ষণমিহ সজ্জন | -সংগতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব | -তরণে নৌকা॥

এই দশ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সাতটিতেই দ্বিতীয় বিভাগের প্রথম ধ্বনিটি লঘু, অর্থাৎ এসব স্থলে নবমগুরুত্বের নীতি স্বীকৃত হয় নি। অথচ এগুলি যে পজ্‌ঝটিকা ছন্দে রচিত সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। 'নবমগুরুত্বং ব্যভিচরতি চ', গঙ্গাদাসের এই উক্তির সার্থকতা এখানেই। শঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত বিখ্যাত 'গঙ্গাস্তোত্র'টিতেও অনুরূপ নিদর্শন আছে যথেষ্ট। প্রমাণস্বরূপ তার প্রথম শ্লোকটিই উদ্‌ধৃত করা যায়।—

দেবি সুরেশ্বরি | ভগবতি গঙ্গে,
ত্রিভুবনতারিণি | তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিবি | -হারিণি বিমলে,
মম মতিরাস্তাং | তব পদকমলে॥

চার পঙ্‌ক্তির মধ্যে তিনটিতেই নবমগুরুত্বের ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। অথচ এটি যে পজ্‌ঝটিকা ছন্দেই রচিত, তার প্রমাণ আছে ওই স্তোত্রের শেষাংশেই।—

যেষাং হৃদয়ে | গঙ্গাভক্তিস্‌
তেষাং ভবতি স | -দা সুখমুক্তিঃ।
কান্তমধুরপদ | -পজ্‌ঝটিকাভিঃ
পরমানন্দক | -লিতললিতাভিঃ॥
শঙ্করসেবক | -শঙ্কররচিতং
স্তোত্রমিদং নৃষ্‌ | দদদভিলষিতম্‌।
পঠতি তু বিষয়ী | ন ভবতি তপ্তঃ;
শ্রীগঙ্গাস্তব | ইতি চ সমাপ্তঃ॥

এখানেও আট পঙ্‌ক্তিতে চারটি ব্যতিক্রম। এর থেকে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয় যে, নবমগুরুত্ব পজ্‌ঝটিকার সৌষ্ঠববৃদ্ধির সহায়ক হলেও তা ওই ছন্দের অবর্জনীয় সহচর নয়। কিন্তু মিল থাকতেই হবে। অর্থাৎ যমকান্ততা পজ্‌ঝটিকার অবর্জনীয় বৈশিষ্ট্য। তা হলে পজ্‌ঝটিকাকে সমিল উপচিত্রা না বলে সমিল পাদাকুলক বলাই সংগত।

গঙ্গাদাসের লক্ষণনির্দেশ মেনে নিলে স্বীকার করতে হবে যে, হলায়ুধপ্রদত্ত পাদাকুলকের চারটি দৃষ্টান্তই আসলে পজ্‌ঝটিকা, কেননা এই সবগুলিই যমকান্ত অর্থাৎ সমিল, কেদারভট্টের পাদাকুলক-শ্লোকটির মতো অমিল নয়। পক্ষান্তরে হলায়ুধের দেওয়া শুদ্ধমাত্রাসমক, বানবাসিকা, বিশ্লোক ও চিত্রার দৃষ্টান্তগুলি অমিল, সুতরাং গঙ্গাদাসের মতে এগুলি পজ্‌ঝটিকা বলে স্বীকার্য নয়। হলায়ুধদত্ত উপচিত্রার দৃষ্টান্তটিতে নবমগুরুত্ব আছে, কিন্তু যমকান্ততা নেই। সুতরাং এটিকেও পজ্‌ঝটিকা বলা যায় না।

৬

হলায়ুধপ্রদত্ত সমিল পাদাকুলকের দৃষ্টান্তগুলি যদি পজ্ঝটিকা বলে স্বীকার্য হয়, তা হলে গীতগোবিন্দ কাব্যের অনুরূপ ছন্দকেও (যেমন, সজলনলিনদল-শীলিতশয়নে ইত্যাদি) পজ্ঝটিকা বলে অভিহিত না করার কোনো কারণ থাকে না। বস্তুতঃ ওই কাব্যের নবম ('স্তনবিনিহিতহারম্' ইত্যাদি), দ্বাদশ ('পশ্যতি দিশি দিশি' ইত্যাদি), চতুর্দশ ('স্মরসমরোচিত' ইত্যাদি) এবং অষ্টাদশ ('হরিরভিসরতি' ইত্যাদি), এই চারটি গীতও পজ্ঝটিকা ছন্দে রচিত বলে মনে করা সংগত। কেননা, এই গীতগুলির প্রত্যেক শ্লোকেই পাদাকুলকের লক্ষণ (মাত্রাসমকাদি বিভিন্ন ছন্দের সমবায়) ঘটেছে এমন কথা বলা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্বোদ্ধৃত 'সরসমসৃণমপি' ইত্যাদি শ্লোকটির কথাই উল্লেখ করা যায়। অথচ গঙ্গাদাসপ্রদত্ত পজ্ঝটিকার লক্ষণগুলি এসব রচনায় আছে পুরো মাত্রাতেই। অবশ্য নবমগুরুত্বের অভাব দেখা যায় অনেক স্থলেই। বস্তুতঃ উক্ত চারটি গীতের চৌষট্টি পঙ্‌ক্তির মধ্যে মাত্র চব্বিশটিতে নবমগুরুত্ব দেখা যায়। পূর্বে দেখেছি শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর এবং গঙ্গাস্তব, এই দুটি রচনাতেও বহু স্থানেই নবম-লঘুত্ব দেখা যায়। অথচ এ দুটি যে পজ্ঝটিকা ছন্দে রচিত সে কথা বলা আছে রচনা-দুটির শেষ ভাগে। বস্তুতঃ 'নবমগুরুত্বং ব্যভিচরতি চ', গঙ্গাদাসের এই নির্দেশের প্রয়োগক্ষেত্র খুব সংকীর্ণ নয়।

শঙ্করাচার্যের গঙ্গাস্তোত্র ও মোহমুদ্গরের সঙ্গে যোলো মাত্রার জয়দেবী গীতগুলির ধ্বনিগত (এমন কি, ভাষাগত) সাদৃশ্যও উপেক্ষণীয় নয়। গঙ্গাস্তবের 'মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে' আর জয়দেবী গীতের (১৮-সংখ্যক) 'হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে' অথবা মোহমুদ্গরের 'তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্' আর জয়দেবী গীতের (১৮-সংখ্যক) 'মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরম্', এ দুটি দৃষ্টান্ত থেকেই উভয়ের সাদৃশ্য প্রতিপন্ন হবে। অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের রচনা-দুটি এবং জয়দেবের গীত-চারটি যে একই ছন্দে (পজ্ঝটিকা বা সমিল পাদাকুলক) রচিত তাতে সন্দেহ থাকে না।

এ প্রসঙ্গে শঙ্কর ও জয়দেবের রচনার আরও একটা সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গঙ্গাস্তবটির শেষেই আছে যে, এটি রচিত হয়েছে—

কান্তমধুরপদ-পজ্‌টিকাভিঃ
পরমানন্দ-কলিতললিতাভিঃ।

এর থেকে অনিবার্যভাবেই মনে পড়ে 'মধুরকোমলকান্তপদাবলীম্' (প্রথম সর্গ ৩) এবং 'কলিতললিত-বনমাল' (গীত ২), জয়দেবের এই দুটি উক্তি। এই সাদৃশ্য আকস্মিক হতে পারে, তা হলেও বিস্ময়জনক সন্দেহ নেই। যা হক, জয়দেবের উক্ত চারটি গীতও যে পরমানন্দকলিতললিত কান্তমধুরপদ পজ্ঝটিকা ছন্দেই রচিত হয়েছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

আমরা দেখেছি পাদাকুলক ও পজ্ঝটিকা আসলে একই ছন্দ, পার্থক্য শুধু নামের। একই সংস্কৃত ছন্দের বিভিন্ন নাম থাকার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এইজন্যই পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রে ও কেদারভট্টের বৃত্তরত্নাকরে পাদাকুলকের নাম আছে, পজ্ঝটিকার নয়। পক্ষান্তরে গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরীতে পজ্ঝটিকার পরিচয় আছে, পাদাকুলকের নয়। প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ গ্রন্থে অবশ্য পাদাকুলক ও পজ্ঝটিকা দুই ছন্দেরই পরিচয় আছে। গঙ্গাদাসের পজ্ঝটিকা ও প্রাকৃতপৈঙ্গলের পাদাকুলক একই ছন্দ। কিন্তু প্রাকৃতপৈঙ্গলের পজ্ঝটিকা ও গঙ্গাদাসের পজ্ঝটিকা এক ছন্দ নয়। গঙ্গাদাসের মতে পজ্ঝটিকা ছন্দে কোথাও 'মধ্যগুরু গণ' অর্থাৎ

লঘু-গুরু-লঘু (⏑—⏑) ক্রমে বিন্যস্ত ধ্বনিপর্ব থাকে না। কিন্তু প্রাকৃতপৈঙ্গলের (১।১২৫) মতে পজ্ঝটিকা ছন্দে প্রতি পঙ্‌ক্তির শেষ পর্বটি মধ্যগুরুই হওয়া চাই। বৃত্তরত্নাকরের টীকাকার নারায়ণভট্টও (খ্রী ১৫৪৫) এ বিষয়ে প্রাকৃতপৈঙ্গলের অনুবর্তী। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি এই।—

"প্রতিপাদং চত্বারশ্চতুষ্কলা গণাস্তত্রান্তিমোজগণ এব, এবং চতুর্ভিঃ পাদৈশ্চতুঃষষ্টিমাত্রং পজ্ঝটিকাচ্ছন্দঃ।" অর্থাৎ, প্রতি পাদে চারটি করে চতুষ্কল গণ (চতুর্মাত্রক পর্ব), আর প্রতি পাদের শেষ গণটি জ-গণ (মধ্যগুরু পর্ব), এরকম চার পাদে চৌষট্টি মাত্রা নিয়ে গঠিত ছন্দকে বলা হয় পজ্ঝটিকা।

কিন্তু নারায়ণভট্ট তাঁর স্বীকৃত পজ্ঝটিকার কোনো সংস্কৃত দৃষ্টান্ত দেন নি। দিয়েছেন একটি প্রাকৃত দৃষ্টান্ত। আর সে দৃষ্টান্তটি প্রাকৃতপৈঙ্গলের দেওয়া দৃষ্টান্তটির (১।১২৬) সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন, যদিও উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু পাঠভেদ দেখা যায়। বোঝা গেল প্রাকৃতপৈঙ্গল তথা নারায়ণভট্ট-স্বীকৃত পজ্ঝটিকা আর গঙ্গাদাসের পজ্ঝটিকা দুটি পৃথক্ ছন্দ। এটা হল দুই ভিন্ন ছন্দের এক নামের নিদর্শন। যা হক, পিঙ্গলাদি ছান্দসিকদের স্বীকৃত পাদাকুলক ও গঙ্গাদাসের পজ্ঝটিকা যে আসলে একই ছন্দ, প্রখ্যাত মরাঠি ছান্দসিক ডক্টর মাধবরাও পট্‌বর্ধনও তা লক্ষ করেছেন।— দ্রষ্টব্য : তাঁর 'ছন্দোরচনা' গ্রন্থ (১৯৩৭), ষষ্ঠ অধ্যায়, পাদাকুলক-প্রসঙ্গ, পৃ ৩৯১।

৭

একই ছন্দের এই দুই নামের কারণ কি, তাও ভেবে দেখা যেতে পারে। তার থেকে এই ছন্দের আসল প্রকৃতি সম্বন্ধেও একটা ধারণা করা যাবে। হলায়ুধ পাদাকুলক ছন্দের যে দৃষ্টান্তগুলি দিয়েছেন তার প্রতি একটু মনোনিবেশ করা যাক। প্রথম দৃষ্টান্তে আছে যে, বসন্তসমাগমে—

স্মৃত্বা কান্তাং পরিহৃতসার্থঃ
পাদাকুলকং ধাবতি পান্থঃ।

কান্তার স্মৃতিতে চঞ্চল হয়ে পান্থ আকুলপদে অর্থাৎ দ্রুতপদে ('পাদাকুলকং') ছুটে চলেছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিও বসন্তকালের বর্ণনা। তাতে আছে—

মধুসময়েঽস্মিন্ কৃতবিশ্লোকঃ
পাদাকুলকং নৃত্যতি লোকঃ।

বসন্তকালে সমস্ত লোক সব শোকতাপ ভুলে গিয়ে চঞ্চলপদে ('পাদাকুলকং') নৃত্য করছে।

তৃতীয় দৃষ্টান্তটি মোহমুদ্গর-জাতীয়। তাতে আছে—

চিত্তং ভ্রাম্যত্যনবস্থানং
পাদাকুলকশ্লোকসমানম্।
কায়ঃ কায়তি শায়তি শক্তিস্
তদপি ন মম পরলোকে ভক্তিঃ॥

অর্থাৎ, আমার চিত্ত পাদাকুলক-শ্লোকের মতো অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়ায় (মানে বিভ্রান্ত হয়), শরীর শীর্ণ এবং শক্তিও ক্ষীণ হচ্ছে, তবু আমার পরলোকে ভক্তি নেই।

হলায়ুধস্তের এই দৃষ্টা প্রসঙ্গে একটু টীকা দিয়েছেন— "যথা পাদাকুলকনাম্নঃ শ্লোকস্য পাদৈঘস্থিরতা

তথেত্যর্থঃ।" এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, পাদাকুলক ছন্দের ধ্বনিগতি খুব চঞ্চল। প্রথম দুই দৃষ্টান্ত থেকেও বোঝা যায় 'পাদাকুলক' নামটাই পদচাঞ্চল্যসূচক। অর্থাৎ এটা হচ্ছে আসলে নাচের ছন্দ, নাচের সঙ্গে গেয় রচনার উপযোগী ছন্দ।

গঙ্গাদাস পজ্ঝটিকার যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাতে মনে হয় এ ছন্দটাও নাচের ছন্দ। দৃষ্টান্তটি এই।—

তরলবতংসাশ্লিষ্টস্কন্ধশ্
চলতরপজ্ঝটিকাকটিবন্ধঃ।
মৌলিচপলশিখিচন্দ্রকবৃন্দঃ
কালিয়শিরসি ননর্ত মুকুন্দঃ॥

পজ্ঝটিকা ছন্দ বাঁচিয়ে এটিকে বাংলায় রূপান্তরিত করলে দাঁড়াবে এরকম।—

কর্ণের কুণ্ডল দোলে ছুঁয়ে স্কন্ধে,
চঞ্চল ঘুন্টিকা বাজে কটিবন্ধে।
ঘনঘন দোলে শিরে কলাপের বৃন্দ,
কালিয় নাগের শিরে নাচিছে মুকুন্দ॥

বলা বাহুল্য, এখানে নবমগুরুত্বের বিধান মানা হয় নি। যা হক, এর থেকে অনুমান করা যায় যে, পজ্ঝটিকাও নাচের ছন্দ। বস্তুতঃ পজ্ঝটিকা মানেই 'ক্ষুদ্র ঘন্টিকা'। নাচবার সময়ে কটিসূত্রে যে ঘুন্টি বেঁধে নেওয়া হত তারই নাম পজ্ঝটিকা। বোধ হয় এই ঘুন্টির ধ্বনি ও তালের কথা মনে রেখেই এ ছন্দের নাম দেওয়া হয়েছে 'পজ্ঝটিকা'। আর, নাচবার সময়ে পায়ের চাঞ্চল্যের কথা মনে রেখে ওই ছন্দেরই নাম করা হয়েছে 'পাদাকুলক'।

হলায়ুধের দেওয়া পাদাকুলকের যে দৃষ্টান্তটি উপরে সমগ্রভাবে উদ্ধৃত হয়েছে তার সঙ্গে গঙ্গাদাসরচিত পজ্ঝটিকার দৃষ্টান্তটি মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, এই দুটির মধ্যে ধ্বনিবিন্যাসগত কোনো পার্থক্য নেই— একমাত্র নবমগুরুত্বের বিষয় ছাড়া। তা ছাড়া শঙ্করাচার্যের গঙ্গাস্তব ও মোহমুদ্গর এবং জয়দেবের ষোলো মাত্রার গীত-চারটির সঙ্গেও এ দুটির কোনো পার্থক্য নেই। সবগুলিই এক ছন্দে রচিত।

ছন্দ এক হলেও নামে পৃথক্। আর শুধু নামে নয়, ছন্দশাস্ত্রীদের দেওয়া বিধানেও পার্থক্য আছে। বস্তুতঃ তাঁদের সকলের বিধানেই কিছু ফাঁক রয়ে গেছে। পিঙ্গলের তথা কেদারভট্টের সূত্রে যমকান্ততার বিধান নেই। অথচ হলায়ুধের দেওয়া পাদাকুলকের সবগুলি দৃষ্টান্তই যমকান্ত। আর সাহিত্যেও এ ছন্দের যত রচনা দেখা যায় সবই যমকান্ত। প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ গ্রন্থের সূত্রশ্লোক এবং দৃষ্টান্ত, দুটিই যমকান্ত, যদিও সূত্রে যমকের উল্লেখ নেই। আর পাদাকুলকের মতো গীতছন্দের রচনায় মিল থাকাই যে প্রত্যাশিত তা বলা বাহুল্য। সুতরাং স্বীকার করতে হবে যে, কেদারভট্টরচিত মিলহীন সূত্রশ্লোকটি পাদাকুলকের আদর্শ বলে স্বীকার্য নয়। এ বিষয়ে গঙ্গাদাসের বিধানই স্বীকার্য। পিঙ্গল এবং কেদার-ভট্টের মতে মাত্রাসমকাদি কয়েকটি ছন্দের সমবেত রূপকেই বলা হয় পাদাকুলক। সাহিত্যে এই নীতি সর্বত্র অনুসৃত হয় না। জয়দেবের 'সরসমসৃণমপি' ইত্যাদি শ্লোকটির প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই তা দেখেছি। বস্তুতঃ পাদাকুলকের লক্ষণনির্দেশে এরকম বিধান সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। এইজন্যই প্রাকৃতপৈঙ্গলে তথা ছন্দোমঞ্জরীতে মাত্রাসমকাদি ছন্দের সমবায়ের উল্লেখমাত্রও নেই। এমন কি, মাত্রাসমক, বানবাসিকা

প্রভৃতি ছন্দের নামও নেই। সাহিত্যেও এসব ছন্দের প্রয়োগ আছে কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ আমার জানা নেই। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, গঙ্গাদাস শুধু 'ব্যবহারোচিত' ছন্দসমূহেরই লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, অব্যবহার্য ছন্দের নয় (ছন্দোমঞ্জরী ৭।৬)। মাত্রাসমকাদি ছন্দ সাহিত্যে প্রচলিত থাকলে তিনি সেগুলি বাদ দিতেন না।

গঙ্গাদাসের লক্ষণনির্দেশও ত্রুটিহীন নয়। পজ্ঝটিকার শেষ ধ্বনিটি যে গুরু হওয়া অত্যাবশ্যক, সে কথা ছন্দোমঞ্জরীর সূত্রে নেই। অথচ সাহিত্যিক প্রয়োগে এই গুরুত্ব সার্বত্রিক, কোথাও ব্যতিক্রম দেখা যায় না। প্রাকৃতপৈঙ্গলেও এই গুরুত্ব পাদাকুলকের লক্ষণ বলে উল্লিখিত হয় নি। শুধু 'পঅ পঅ লেক্খউ উত্তম রেহা' বলেই কাজ সারা হয়েছে। তা ছাড়া আমরা দেখেছি যে, গঙ্গাদাসকথিত নবমগুরুত্বের বিধান সাহিত্যিক প্রয়োগসিদ্ধ নয়। এ দিক্ থেকে পিঙ্গলাচার্য ও কেদারভট্টের ছন্দঃসূত্রকেই প্রামাণিকতর বলে স্বীকার করতে হবে। কেননা, এঁরা দুজনেই অন্তিমগুরুত্বের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন এবং নবমগুরুত্বের বিধান দেন নি।

৮

গঙ্গাদাস হয়তো অনবধানতাবশতঃই অন্তিমগুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন নি, যদিও তাঁর রচিত সূত্র ও দৃষ্টান্ত উভয়ত্রই এই অন্তিমগুরুত্ব অব্যাহত আছে। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে— তিনি যে সময়ের লোক তাতে তাঁর পক্ষে শঙ্করাচার্যের গঙ্গাস্তব ও মোহমুদ্গর এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দে নবমলঘুত্বের বাহুল্য অজানা থাকবার কথা নয়, তবু তিনি নবমগুরুত্বের কথা এত জোরের সঙ্গে উল্লেখ করলেন কেন? পিঙ্গল এবং কেদারভট্ট যে পাদাকুলকে নবম মাত্রাকে ওরকম প্রাধান্য দেন নি তাও তিনি জানতেন। বস্তুতঃ তাঁর ছন্দোমঞ্জরী অনেকাংশে বৃত্তরত্নাকরের অনুসরণেই লেখা; এমন কি, বৃত্তরত্নাকর-পরিশিষ্টও নানাস্থানে অনুসৃত হয়েছে। আর কেদারভট্ট যে পিঙ্গলাদি পূর্বাচার্যদের অনুবর্তী সে কথা তিনি তাঁর গ্রন্থের প্রথমেই উল্লেখ করেছেন (প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ শ্লোক)। তা সত্ত্বেও গঙ্গাদাস কেন এ বিষয়ে স্বতন্ত্র পথ ধরলেন এবং পাদাকুলক নামটা বর্জন করে পজ্ঝটিকা নামই পছন্দ করলেন? এই প্রশ্নের তর্কাতীত উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবু একটু চেষ্টা করা যেতে পারে।

শঙ্করাচার্য (নবম শতকের প্রথমার্ধ) যে গঙ্গাদাসের পূর্ববর্তী তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর গঙ্গাস্তব ও মোহমুদ্গর যে পজ্ঝটিকা ছন্দে রচিত তা ওই রচনা-দুটির শেষেই উল্লিখিত আছে। সুতরাং পজ্ঝটিকা নামটা তারও পূর্ববর্তী, তাতে সন্দেহ নেই। পিঙ্গলসূত্রের টীকাকার হলায়ুধও দশম শতকের লোক। তিনি কেন পজ্ঝটিকার নামও উল্লেখ করলেন না বলা কঠিন। হয়তো একই ছন্দ স্থানভেদে বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। গঙ্গাদাসের পূর্বগামী কোনো ছন্দশাস্ত্রী পজ্ঝটিকার লক্ষণ নির্দেশ করেছেন কিনা জানি না। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা আছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে গঙ্গাদাস কোনো পূর্বাচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন কিনা বলতে পারি না।

মাত্রাসমকাদি ছন্দে বিভিন্ন মাত্রার লঘুত্ব বা গুরুত্ব নির্দেশ করতে গিয়ে পিঙ্গল (তথা কেদারভট্ট) প্রথমেই বেছে নিয়েছেন নবম মাত্রাটিকে। তাতেই বোঝা যায় এসব ছন্দের প্রধান ভাগ দুটি, প্রতি ভাগে আট মাত্রা। আট মাত্রার পরে ছেদ বা যতি অনুমেয়। তার পরে আছে দ্বাদশ মাত্রার বিধান। তাতে

বোঝা যায় দ্বিতীয় ভাগটি আবার চার মাত্রার দুটি উপবিভাগে বিভাজ্য, এই দুই ভাগের মধ্যে একটি লঘু-যতি অনুমেয়। অতঃপর পঞ্চম মাত্রার লক্ষণ নির্দেশ। সুতরাং প্রথম ভাগটিও যে একটি লঘুযতির মধ্যবর্তিতায় দুটি উপবিভাগে বিভাজ্য তাও সহজেই অনুমান করা যায়। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

দেবি সু | -রেশ্বরি | ভগবতি | গঙ্গে।
ত্রিভুবন | -তারিণি | তরল ত | -রঙ্গে ॥

পিঙ্গলের সূত্র অনুসারে এই দুটি পঙ্‌ক্তি এভাবেই বিভাজ্য। দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতেই চারটি করে উপবিভাগ। এরকম উপবিভাগকে প্রাচীন পরিভাষায় বলা হয় 'গণ', আধুনিক পরিভাষায় 'পর্ব'। আবৃত্তিকালে এই পর্ববিভাগকে স্পষ্ট করে তোলা দরকার। নতুবা তাল রক্ষা করা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ পাদাকুলক ওরফে পজ্‌ঝটিকা নাচের ছন্দ বলে এই তালরক্ষার প্রয়োজন আরও বেশি। যা হক, এই তালরক্ষার জন্যই প্রত্যেক পর্বের শেষে একটু ফাঁক এবং পরবর্তী পর্বের প্রথমে একটু ঝোঁক দেওয়া চাই। ছন্দের পরিভাষায় ওই ফাঁকের নাম 'যতি' আর ঝোঁকের নাম 'প্রস্বর'। আগেই বলা হয়েছে যে, এ ছন্দের প্রধান ভাগ দুটি, আট-আট মাত্রা নিয়ে গঠিত। এই বৃহত্তর ভাগ-দুটির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য উভয়ের মধ্যবর্তী যতিটি এবং তার পরবর্তী প্রস্বরটিও স্পষ্টতর হওয়া চাই। এই স্পষ্টতর যতি ও প্রস্বরটিকে ছন্দের পরিভাষায় বলা যায় যথাক্রমে 'অর্ধযতি' ও 'অধিপ্রস্বর'। আর লঘুতর যতি ও প্রস্বরকে বলা যায় 'লঘুযতি' ও 'লঘুপ্রস্বর'। বলা বাহুল্য, এই লঘুযতি ও লঘুপ্রস্বরের দ্বারাই পর্ববিভাগ সূচিত হয়। তাই এ দুটিকে যথাক্রমে 'পর্বযতি' ও 'পর্বপ্রস্বর' নামেও অভিহিত করা চলে। আর, পূর্বোক্ত আট মাত্রার বড় ভাগ-দুটিকে ছন্দের পরিভাষায় বলি 'পদ'। তাই পদবিভাগসূচক অর্ধযতি ও অধিপ্রস্বরকে যথাক্রমে 'পদযতি' ও 'পদপ্রস্বর' নামও দেওয়া যায়। আর দুই-দুই মাত্রা নিয়ে গঠিত উপপর্বগুলির নিয়ামক যতি ও প্রস্বরকে যথাক্রমে বলা যাবে 'উপযতি' ও 'উপপ্রস্বর'।

সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রীদের লক্ষণনির্দেশপ্রণালী থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, পাদাকুলক ওরফে পজ্‌ঝটিকার এই বিভাগ-উপবিভাগগুলি নিঃসন্দেহেই তাঁদের অনুভূতিতে ধরা দিয়েছিল। আর, আট মাত্রার বড় ভাগগুলিই যে বেশি অনুভূত হয়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু পরিভাষা সহযোগে এসব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেবার প্রয়োজনীয়তাবোধ তাঁদের হয় নি। কিন্তু এখানে গঙ্গাদাসের কৃতিত্বপ্রকাশের সুযোগ ঘটেছে। 'ক্বাপি ন মধ্যগুরুর্গণ একঃ' অর্থাৎ এ ছন্দের কোথাও একটিও মধ্যগুরু গণ (মানে পর্ব) থাকে না, তাঁর এই উক্তি থেকে সহজেই প্রতীত হয় যে, পজ্‌ঝটিকার প্রতি পঙ্‌ক্তি চারটি চতুর্মাত্রক পর্বে বিভাজ্য। আর 'নবমগুরুত্ববিভূষিতগাত্রা' অর্থাৎ নবম মাত্রার গুরুত্ব এ ছন্দের ভূষণস্বরূপ, এই উক্তির দ্বারা সূচিত হয় যে, এ ছন্দ দুটি অষ্টমাত্রক পদে বিভাজ্য। 'নবমগুরুত্বং ব্যভিচরতি চ', এই উক্তির অর্থ এই যে, নবমগুরুত্ব অলঙ্ঘনীয় বিধান নয়। তবে তাতে ছন্দের সৌষ্ঠববৃদ্ধির সহায়তা হয়, এ কথা বলাই গঙ্গাদাসের অভিপ্রায়। কেমন করে সহায়তা হয় দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাচ্ছি।—

নলিনীদলগত | -জলমতিতরলম্।
তদ্বজ্জীবন | -মতিশয়চপলম্ ॥

এখানে পর্ববিভাগ দেখানো হল না, শুধু পদবিভাগই দেখানো হল। আবৃত্তিকালে দুই পঙ্‌ক্তিতেই দ্বিতীয় পদের প্রথম ধ্বনিটির (জ, ম) উপরে অধিপ্রস্বর স্থাপন করতে হয়, নতুবা ছন্দের পদবিভাগ

কানে ধরা পড়ে না। প্রস্বরস্থাপনের দ্বারা এই পদবিভাগ দেখাবার দায় আবৃত্তিকারের। তার কণ্ঠস্বরের উপরেই তা নির্ভর করছে। পক্ষান্তরে—

মা কুরু ধনজন | -যৌবনগর্বং।
হরতি নিমেষাৎ | কালঃ সর্বম্‌॥

এখানে আবৃত্তিকারের কণ্ঠস্বরের উপরে একান্তভাবে নির্ভর করতে হচ্ছে না। কেননা রচয়িতা নিজেই নবমগুরুত্বের (যৌ, কা) ব্যবস্থা করে পদবিভাগের সহায়তা করেছেন। দ্বিতীয় বিভাগের প্রথম ধ্বনিটি স্বাভাবিকভাবেই প্রস্বরিত হয়। সেই স্বাভাবিক প্রস্বরের সঙ্গে কবিদত্ত ধ্বনির গুরুত্ব যুক্ত হওয়াতে ছন্দের সৌষ্ঠব অনেকখানি বেড়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। এ বিষয়টা যে গঙ্গাদাসের অনুশীলিত শ্রুতিতে ধরা পড়েছিল সেটাই তাঁর কৃতিত্ব।

'দেবি সুরেশ্বরি' ইত্যাদি রচনাটির ছন্দোবিশ্লেষণপ্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, ষোলো মাত্রার পজ্‌ঝটিকা ওরফে পাদাকুলক ছন্দের প্রতি পঙ্‌ক্তি চারটি চতুর্মাত্রক পর্বে বিভক্ত এবং প্রতি পর্বের আদিধ্বনিটি প্রস্বরিত (accented)। এরকম চতুর্বিভক্ত ষোলো মাত্রার ছন্দকে গানের পরিভাষায় বলা হয় 'কাওয়ালি তাল'। আর কাওয়ালি তাল যে দ্রুত লয়ের তাল তা সুবিদিত। বিলম্বিত লয়ের তালের মাধুর্য অপরিশীলিত বা স্বল্পশীলিত কানে ধরা পড়ে না। দ্রুত লয়ের তালই অদীক্ষিত জনসাধারণের কানকে সহজে উত্তেজিত করে। তাই কাওয়ালি তালটা অন্যতম সর্বাধিক জনপ্রিয় তাল বলে গণ্য হয়েছে। আর পাদাকুলক ওরফে পজ্‌ঝটিকা ছন্দটাও এই কাওয়ালির ছাঁচে গড়া দ্রুত লয়ের নাচের ছন্দ। আমরা পূর্বেই দেখেছি পাদাকুলক তথা পজ্‌ঝটিকা নামের মধ্যেই দ্রুততাল নৃত্যের ব্যঞ্জনা রয়েছে। সুতরাং এ ছন্দ যে জনপ্রিয় হয়েছিল তা কিছুই বিচিত্র নয়। কেদারভট্টের 'প্রথিতং জগৎসু পাদাকুলকম্‌' এবং প্রাকৃত-পৈঙ্গলের 'সুকই ফণিংদহ কংঠহ বলঅং সোলহ-মত্তং পাআউলঅং', এই দুটি উক্তির মধ্যেই এ ছন্দের প্রবল জনপ্রিয়তার দ্যোতনা রয়েছে। বস্তুতঃ উচ্চাঙ্গ সংস্কৃতসাহিত্যে অনুষ্টুপ্‌ ছন্দের যে স্থান, সংস্কৃত তথা প্রাকৃত লোকসাহিত্যে এই পাদাকুলক-পজ্‌ঝটিকারও সেই স্থান। শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর ও গঙ্গাস্তব এবং জয়দেবের উক্ত গীতগুলি লোকপ্রিয় সাহিত্য হিসাবেই রচিত, তাই সেগুলিতে এই সরল ও চপল ছন্দ অনুসৃত হয়েছে, এই অনুমান বোধ করি অসংগত নয়। সুতরাং প্রাকৃত সাহিত্য থেকে উদ্‌ভূত প্রাচীন প্রাদেশিক বাংলা ছন্দে যে এ ছন্দের প্রভাব পড়বে তা অসম্ভাবিত নয়। অতঃপর আমরা সে প্রসঙ্গের অবতারণা করছি।

৯

বাংলা রচনাব আদিতম নিদর্শন চর্যাপদেই (দশম-একাদশ শতক[১]) এই পাদাকুলক-পজ্‌ঝটিকার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যেমন—

কাআ | তরুবর | পঞ্চ বি | ডাল-।
চঞ্চল | চীএ | পইঠো | কাল-॥

—লুইপাদ, চর্যা ১

১ রমেশচন্দ্র মজুমদার -প্রণীত 'বাংলাদেশের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, (চতুর্থ সংস্করণ ১৩৭৩), পৃ ১৩৭।

এর সঙ্গে গঙ্গাস্তবের দুটি পঙ্‌ক্তির তুলনা করা যাক।—

নাহং | জানে | তব মহি | -মানং।
পাহি কৃ | -পাময়ি | মাম- | জ্ঞানম্‌॥

এই দুটি যে একই পজ্‌ঝটিকা ছন্দে রচিত তা বাঙালিমাত্রের কানেই ধরা পড়বে।

এ ছন্দের প্রতি পঙ্‌ক্তির প্রথম তিনটি যতির মধ্যে দ্বিতীয়টিই মুখ্য, বাকি দুটি গৌণ। তার প্রমাণ এই যে, প্রথম ও তৃতীয় যতিটি ছন্দের প্রয়োজনে স্বীকৃত হলেও স্বাভাবিক উচ্চারণে অনেক সময়ই লুপ্ত হয়। বিভাজ্য যুক্তপর্বিক পদ (যথা 'শুক্ল শারদ রাতে') এবং অবিভাজ্য যুক্তপর্বিক পদের (যেমন 'মেঘের পদ্মপাতে') প্রসঙ্গে তা পূর্বেই বলা হয়েছে। এরকম যতিলোপ প্রাকৃতেই বেশি দেখা যায়। এ হিসাবে বাংলাও প্রাকৃতেরই অনুবর্তী। তাও পূর্বেই বলা হয়েছে। চর্যাপদাবলী থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। দৃষ্টান্তের পার্শ্ববর্তী অঙ্কগুলি চর্যাপদের সংখ্যাসূচক।—

১ সহজ নলিনীবন | পইসি নিবিতা। ৯
২ নগর বাহিরে ডোম্বি | তোহোরি কুড়িআ। ১০
৩ নাড়ি শক্তি দিট | ধরিঅ খট্টে। ১১
৪ উদক চান্দ জিম | সাচ ন মিচ্ছা। ২৯
৫ কমল কুলিশ মাঝে | ভই ম মিঅলী। ৪৭
৬ আজি ভুসুকু বঙ্ | -গালী ভইলী। ৪৯

এই ছয়টি দৃষ্টান্তেরই প্রথমার্ধে পর্বযতি লুপ্ত হয়েছে। ফলে এই ছয়টি অংশেই এক-একটি যুক্তপর্বিক পদ উৎপন্ন হয়েছে। তার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ পদ-দুটি অবিভাজ্য, অর্থাৎ এ-দুটিকে পর্বে পর্বে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা এই দুটি পদে চতুর্থ মাত্রা পঞ্চমের সঙ্গে (মানে জোড় বিজোড়ের সঙ্গে) যুক্ত হয়েছে। পূর্বে দেখেছি এরকম যতিলোপ ও যুক্তপর্বিকতা সংস্কৃতরীতিসম্মত নয়, কিন্তু প্রাকৃত মতে অনুমোদিত। বিভাজ্যই হক আর অবিভাজ্যই হক, এ রকম যুক্তপর্বিক অর্থাৎ অখণ্ড পদের প্রয়োগ যে প্রাকৃত রীতিরই পরিচায়ক তাতে সন্দেহ নেই।

গৌণ যতি অর্থাৎ পর্বযতির বিলোপ সহজসাধ্য, কিন্তু পদযতিলোপের দৃষ্টান্ত বিরল। সুতরাং পাদাকুলক বা পজ্‌ঝটিকায় পর্ববিভাগের চেয়ে পদবিভাগের গুরুত্বই বেশি। অর্থাৎ এ ছন্দের প্রতি পঙ্‌ক্তির আট মাত্রার পদবিভাগটাই প্রধান, চার মাত্রার পর্ববিভাগ গৌণ। মরাঠি ছন্দোবিৎ মাধবরাও পটবর্ধন এজন্যই পাদাকুলক-পজ্‌ঝটিকার এই আট মাত্রার বিভাগটাকেই এ ছন্দের পরিচায়ক লক্ষণ বলে মেনে নিয়েছেন।— দ্রষ্টব্য: তাঁর 'ছন্দোরচনা' গ্রন্থ (১৯৩৭), ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ ৩৯০-৯১। কিন্তু আবৃত্তিকালে প্রথম পদের শেষ ও দ্বিতীয় পদের আরম্ভকে শ্রোতার কানে স্পষ্ট করে তোলবার জন্য দ্বিতীয় পদের প্রথমেই যে একটি প্রবল প্রস্বর (ছন্দপরিভাষায় 'অধিপ্রস্বর' বা 'পদপ্রস্বর') থাকা চাই, মরাঠি ছান্দসিক পটবর্ধন তা লক্ষ করেন নি। বাঙালি ছান্দসিক গঙ্গাদাসের কানে কিন্তু তা ধরা পড়েছিল। তাই তিনি পজ্‌ঝটিকার নবমগুরুত্বকে এমন প্রাধান্য দিয়েছিলেন। হিন্দি ছান্দসিক ডক্‌টর পুত্তুলাল শুক্লও পজ্‌ঝটিকার এই আট মাত্রার ভাগ ও নবমগুরুত্বের কথা স্পষ্টভাষাতেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষাই উদ্ধৃত করছি।—

"য়হ ১৬ মাত্রাওঁ কা ছন্দ হৈ। ইসকে পহলে অষ্টক মেঁ কোই বিচার নহীঁ হোতা, পর লয়-নিপাত মেঁ য়হ ধ্যান রখা জাতা হৈ কি দূসরা অষ্টক গুরু সে প্রারম্ভ হো ঔর গুরু সে হী সমাপ্ত হো।··· ইসকে বীচ মেঁ এক লয় উদ্‌ভূত হোতী হৈ, জো উর্ধ্বমুখী হোকর পুনঃ নিপতিত হোতী হৈ। ইসসে তরঙ্গ মেঁ চপলতা আ জাতী হৈ।"

—'আধুনিক হিন্দী-কাব্য মেঁ ছন্দ-যোজনা', তৃতীয় অধ্যায়, পৃ ২৬০

ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। ছান্দসিক ডক্‌টর শুক্ল পজ্‌ঝটিকার আট মাত্রার ভাগ, চপল তরঙ্গগতি ও নবমগুরুত্বের কথা বলেছেন। কিন্তু নবমগুরুত্বের ব্যতিক্রমের কথা বলেন নি। অথচ সাহিত্যে নবম-গুরুত্বের ব্যতিক্রম প্রচুর। গঙ্গাদাস তা লক্ষ করেছেন।

চর্যাপদাবলী থেকে যে দৃষ্টান্তগুলি উদ্ধৃত হয়েছে তাতেও এই ব্যতিক্রমের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাবে। কিন্তু একটু মন দিলেই দেখা যাবে যে, সবগুলিতেই দ্বিতীয় পদের প্রথম ধ্বনিটি গুরু না হলেও তার প্রবল প্রস্বরটি সুস্পষ্ট। এই প্রারম্ভিক প্রস্বর বাংলা ভাষা ও ছন্দের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। চর্যাপদের কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত তা সমভাবে চলে আসছে। যেমন—

১ সোণে ভরিলী | করুণা নাবী।
রূপা থোই- | নাহি কে ঠাবী॥···
খুন্টি উপাড়ী | মেলিলি কাচ্ছি।
বাহ তু কামলি | সদ্‌গুরু পুচ্ছি॥

—কামলি, চর্যা ৮

২ এবেঁ 'আকুল' কৈলে মোরে | নান্দের নন্দনে।
'গাইল' বড়ু চণ্ডীদাসে | বা-সলীগণে॥

—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বংশীখণ্ড, পা ১৭৫।১

মে-ঘ আন্ধারী অতি | ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো- | 'কদম' তলে বসী॥···
মোঞেঁ ভালেঁ জাণোঁ তোক | 'নিঠুর' ভৈল কাহ্নু।
এ জরমে 'নাই সে' আর | তো-হ্মার থান॥

—পূর্বোক্ত, রাধাবিরহ, পা ১৯৯।২ এবং ২১২।২

৩ বঙ্গদেশে 'প্রমাদ' হৈল | সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা | 'আইলা' গঙ্গাতীর॥···
রঘু 'বংশের' কীর্তি কেবা | বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত | 'সরস্বতীর' বরে॥

—কৃত্তিবাস, আত্মবিবরণ

৪ জন্মেছি যে মর্ত্যকোলে | ঘৃণা করি' তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর | মুক্তি খুঁজিবারে।

—রবীন্দ্রনাথ, 'সোনার তরী', আত্মসমর্পণ

আবৃত্তিকালে একটু মন দিয়ে শুনলেই বোঝা যাবে যে, আমাদের উচ্চারণে এসব দৃষ্টান্তের সর্বত্রই দ্বিতীয় পদের প্রথম ধ্বনিটির উপরে বেশ একটু ঝোঁক পড়ে এবং ওই ধ্বনিটি গুরু হলে ঝোঁকটা স্পষ্টতর হয়। বাংলা উচ্চারণের এই স্বাভাবিক ঝোঁকটা বাঙালি ছান্দসিক গঙ্গাদাসের কানে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।" বৈদ্যবংশজাত বাঙালি কবিছান্দসিক গঙ্গাদাস চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের লোক বলে অনুমান করা যায়। কবিছান্দসিক নরহরি চক্রবর্তীর (অষ্টাদশ শতক) 'ছন্দঃসমুদ্র' গ্রন্থে তাঁর 'ছন্দোমঞ্জরী' অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হয়েছে। অপর দিকে গঙ্গাদাসের গ্রন্থে বৃত্তরত্নাকরের, এমন কি তার 'পরিশিষ্ট' গ্রন্থেরও সূত্রাবলী নানা স্থানে অনুসৃত হয়েছে, তা ছাড়া তাতে অপভ্রংশ 'দোহড়িকা' অর্থাৎ দোহা ছন্দেরও পরিচয় আছে। তাই তাঁকে মধ্যযুগে স্থাপন করাই সমীচীন মনে হয়। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় বাংলা পয়ারের দ্বিতীয় পদের আদিম ঝোঁক বা প্রস্বরটি তাঁর কানে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। আর পয়ার ও পজ্ঝটিকার সাদৃশ্যটাও তাঁর অনুভূতিগত হয়েছিল। ফলে পজ্ঝটিকার দ্বিতীয় পদের প্রাথমিক সুস্পষ্ট ঝোঁকটাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। অথচ আধুনিক কালের মতো ঝোঁক ওরফে প্রস্বরের ধারণা করা তখনকার দিনে সম্ভব ছিল না। তাই তাঁকে এক বার নবমগুরুত্বের বিষয় বলে আবার তার ব্যতিক্রমের কথাও বলতে হয়েছিল।

বাংলা উচ্চারণের এই স্বাভাবিক ঝোঁক প্রতি বাক্‌পর্বের প্রথমেই স্থাপিত হয় এবং বাংলা ছন্দও তার দ্বারা অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রিত হয়। চর্যাপদাবলীর ছন্দেই এই প্রভাবের প্রথম নিদর্শন দেখা যায়। ছন্দোবদ্ধ রচনায় প্রতি পর্বের প্রথমে প্রস্বর থাকলেও প্রতি পদের প্রথমে তা প্রবলতর হয়। চর্যাপদের উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতেই তা স্পষ্ট ধরা পড়ে। সে কথা আগেই বলা হয়েছে। আর লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে, বড়ু চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসের রচনায় পর্ব ও পদের প্রাথমিক ঝোঁকটা আরও প্রবল এবং ছন্দের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে তার প্রভাব আরও সক্রিয় হয়েছে। এই প্রস্বরের প্রভাবেই গুরুধ্বনি বাংলায় তার গুরুত্ব হারিয়েছে। অর্থাৎ এই প্রাস্বরিকতাই বাংলায় দীর্ঘ ধ্বনির মর্যাদাহরণ করেছে এবং অনেকাংশে তার স্থানও দখল করেছে। যেমন—

'নগর বাহিরে ডোম্বি | তোহোরি কুড়িআ।' —কাহ্নু, চর্যা ১০

এখানে প্রথম পদের সবক'টি গুরুধ্বনিই (বা, রে, ডোম্) গুরুত্ব হারিয়েছে। সুতরাং এ পদে আটটি লঘুধ্বনিতে আট মাত্রা গণনীয়। দ্বিতীয় পদের তো এবং আ এ দুটি ধ্বনিকে গুরু বলে মেনে নিলে এ পদেও আট মাত্রাই পাওয়া যায়, কিন্তু হো লঘু। এভাবে দুই পদেই আট মাত্রা ধরা হলে মানতে হবে যে, এই পঙ্‌ক্তিটি পজ্ঝটিকার ছাঁচে গড়া। অর্থাৎ এই ছয়টি গুরুধ্বনির মধ্যে চারটিকেই লঘুত্বের পর্যায়ে নামানো হয়েছে। যে শক্তির প্রভাবে এটা ঘটেছে, বাকি দুটির ক্ষেত্রে কি তা নিষ্ক্রিয়? যদি তা না হয় তবে স্বীকার করতে হবে যে, এই দ্বিতীয় পদের আট মাত্রা সংকুচিত হয়ে ছয় মাত্রায় পরিণত হয়েছে। তা হলে আরও স্বীকার করতে হয় আট-আট মাত্রার পাদাকুলক বা পজ্ঝটিকাই রূপান্তরিত বা জন্মান্তরিত হয়ে আট-ছয় মাত্রার পয়ার রূপে আবির্ভূত হয়েছে। চর্যাপদাবলীর আরও অনেক পঙ্‌ক্তি ধরেই পাদাকুলক-পজ্ঝটিকার পয়াররূপে জন্মান্তরলাভের ইতিহাস রচনা করা যেতে পারে।

'সুকবি ফণীন্দ্রের কণ্ঠবলয়'-স্বরূপ 'জগৎপ্রথিত' পাদাকুলকের উত্তরাধিকারী পয়ারও যে বাংলা সাহিত্যে অনুরূপ মর্যাদা লাভ করেছে তা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। পয়ার নামের মধ্যেই এই মর্যাদার দ্যোতনা

রয়েছে। পূর্বেই বলেছি পদকারদের মুখ্যতম ছন্দ বলেই এ ছন্দের নাম হয়েছে 'পয়ার'। পয়ারের এই জয়যাত্রার সূচনা হয় চর্যা রচনার আদিযুগ থেকেই। চর্যাপদাবলীতে যে 'কাআ তরুবর' ইত্যাদি-জাতীয় ছন্দের প্রাধান্য দেখা যায় তা তাৎপর্যহীন নয়। এজাতীয় ছন্দ এক দিকে পাদাকুলক ও অপর দিকে পয়ার, এই দুএর মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত। তাই এ ছন্দে পাদাকুলকের অপকর্ষ ও পয়ারের পূর্বাভাস, দুই-ই দেখা যায় অল্পাধিক পরিমাণে। সুতরাং একে 'অপকৃষ্ট পাদাকুলক' বা 'আদিম পয়ার' বলে অভিহিত করা যায়।

১০

সংস্কৃত-প্রাকৃত পাদাকুলক-পজ্ঝটিকা বাংলা দেশের বাইরে আর কোথাও কেন পয়ারে পরিণত হল না? শুধু বাংলা দেশেই কেন তার এই পরিণতি ঘটল? তার মূলকারণ বাংলা ভাষার উচ্চারণস্বাতন্ত্র্য, আর সে স্বাতন্ত্র্যের প্রধান লক্ষণ তার প্রস্বরপদ্ধতি। চর্যাপদ থেকে প্রস্বরপ্রভাবের আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

সাঙ্কমত | চড়িলে- | দাহিণ্ বাম্ মা | হোহী।

—চাটিল, চর্যা ৫

এখানে 'চড়িলে' শব্দের 'লে' ধ্বনির গুরুত্ব আবশ্যিক; কিন্তু 'হোহী' শব্দের ধ্বনি-দুটি গুরু কিনা নিশ্চয় করে বলা যায় না। পক্ষান্তরে দা ও মা ধ্বনির লঘুত্ব নিশ্চিত। প্রস্বর পড়ে শব্দের প্রথমেই। সুতরাং শব্দের আদিস্থিত রুদ্ধদলের (closed syllable) সংকোচন অধিকতর স্বাভাবিক। তাই 'সাঙ্কমত' শব্দের সাঙ্ রুদ্ধদলটির সংকোচন অর্থাৎ একমাত্রকতা অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু শব্দের অনাদ্য বা অন্তিম রুদ্ধদল (যেমন 'দাহিণ্' শব্দের 'হিণ্') যখন সংকুচিত হয় তখন বুঝতে হবে যে, ভাষার উপরে প্রস্বরের প্রভাব আরও অগ্রসর হয়েছে। 'দাহিণ্' ও 'বাম্' শব্দের মাত্রাসংকোচ প্রস্বরপ্রভাবের এই অগ্রগতিরই পরিচায়ক। সংস্কৃত তথা প্রাকৃত উচ্চারণের ক্রমবর্ধমান অপকর্ষের বিচারে, অর্থাৎ নিত্যসক্রিয় প্রস্বরপ্রভাবের ফলে দীর্ঘস্বর ও রুদ্ধদলের মাত্রাসংকোচগত ক্রমবৃদ্ধির হিসাবে, চর্যারচনাগুলির পৌর্বাপর্য নিরূপণ অসাধ্য নয় বলেই আমার বিশ্বাস। কোনো উৎসাহী গবেষক যদি এ কাজে হাত দেন তা হলে বাংলা চর্যাসাহিত্যের ইতিহাস রচনার কাজে কিছু সহায়তা হতে পারে।

চর্যাপদাবলীতে শব্দের আদিস্থ সংকুচিত রুদ্ধদলের নিদর্শন অপেক্ষাকৃত বেশি। শব্দান্তস্থ সংকুচিত রুদ্ধদলের দৃষ্টান্ত বিরল। বড়ু চণ্ডীদাসের ও কৃত্তিবাসের রচনায় প্রস্বরপ্রভাবজাত এরকম সংকোচনের দৃষ্টান্ত এত বিরল নয়। পূর্বোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতেই তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যাবে। আকুল, কদম, নিঠুর, প্রমাদ, বংশের ও সরস্বতীর, এই ছয়টি শব্দের অন্তিম রুদ্ধদলগুলি (কুল, দম, ঠুর প্রভৃতি) সবই সংকুচিত অর্থাৎ একমাত্রক। তার দ্বারাই বাংলা ভাষার উপরে প্রস্বরপ্রভাবের ক্রমিক অগ্রগতি সূচিত হয়। ষোড়শ শতকের কাছাকাছি সময়ে এই প্রভাব পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় লোচনদাসের ধামালি রচনাগুলিতে।

পাদাকুলক-পজ্ঝটিকা থেকে উদ্ভূত পয়ারের ক্রমপরিণতির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে আমার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ' প্রবন্ধে।—সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, বর্ষ ৭০, সংখ্যা ১-৪, পৃ ১-৪৪। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

তবে এখানে প্রসঙ্গক্রমে আর-একটি বিষয় উল্লেখ করা অসংগত হবে না। শঙ্করাচার্যের গঙ্গাস্তব ও মোহমুদ্গর এবং জয়দেবের যে চারটি গীত (নবম, দ্বাদশ, চতুর্দশ ও অষ্টাদশ) এই পজ্ঝটিকা ছন্দে

রচিত সে সবগুলিতেই সংস্কৃত ও প্রাকৃত আদর্শে চার পঙ্‌ক্তির শ্লোকবন্ধ রচনার রীতি অনুসৃত হয়েছে। উক্ত গঙ্গাস্তবে আছে চার-চার পঙ্‌ক্তির বারোটি শ্লোক। আর মোহমুদ্গরে আছে ষোলোটি শ্লোক, এ কথা ওই রচনাটির শেষে স্পষ্ট ভাষাতেই উল্লিখিত আছে।—

ষোড়শপজ্‌ঝটিকাভিরশেষঃ
শিষ্যাণাং কথিতোহভ্যুপদেশঃ।

গীতগোবিন্দের উক্ত চারটি গীতের প্রত্যেকটিতেই চারটি করে শ্লোক, মোট ষোলোটি। প্রাকৃতপৈঙ্গলে এবং গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরীতেও এই চতুষ্পদী শ্লোকবন্ধের আদর্শই অব্যাহত আছে। কিন্তু পজ্‌ঝটিকা ছন্দে প্রতি দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যে মিল থাকা অত্যাবশ্যক ('প্রতিপদযমকিত')। ফলে ওই দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যে স্বভাবতঃই একটা ভাবগত সম্পূর্ণতা থাকে। তাই এ ক্ষেত্রে চার পঙ্‌ক্তির শ্লোক রচনার আবশ্যকতাও অনুভূত হয় না। সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রথা ও নিয়মের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভের এই প্রশস্ত পথটি বাংলার আদি ছন্দকৃৎদের কাছে উপেক্ষিত হয় নি। তার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় চর্যাপদাবলীতে। চর্যাকারদের রচনায় চতুষ্পঙ্‌ক্তিক শ্লোকবন্ধের আদর্শ অনুসরণের কোনো প্রয়াসই দেখা যায় না। তৎকালীন অপকৃষ্ট পজ্‌ঝটিকা ছন্দে রচিত চর্যাপদগুলির পঙ্‌ক্তিসংখ্যা চারের গুণিতক নয়। অর্থাৎ এগুলিকে চতুষ্পঙ্‌ক্তিক শ্লোকের আকারে সাজানো সম্ভব নয়। যেমন, 'কাআ তরুবর' ইত্যাদি প্রথম রচনাটিতেই আছে মোট দশ পঙ্‌ক্তি। সুতরাং এটিতে যে চতুষ্পঙ্‌ক্তিক শ্লোক অর্থাৎ 'চতুষ্ক' (quadruplet) রচনার আদর্শ অনুসৃত হয় নি তা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ চর্যাগুলিতেই চতুষ্কের পরিবর্তে 'যুগ্মক' (couplet) অর্থাৎ দ্বিপঙ্‌ক্তিক শ্লোক রচনার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই সময় থেকেই যুগ্মক রচনার আদর্শ বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর, এটা যে সমস্ত বাংলা ছন্দেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যের অন্যতম মুখ্য লক্ষণ, তাতে সন্দেহ নেই। এজন্যই সংস্কৃত ছন্দের একান্ত ভক্ত ভুবনমোহন রায়চৌধুরী বাংলা ছন্দের এই দ্বিপঙ্‌ক্তিক আদর্শের প্রতি কটাক্ষ করে অভিযোগের সুরে বলেছেন—

"দ্বিপাদে শ্লোক সংপূর্ণ, তুল্য সংখ্যার অক্ষরে।
পাঠে দুই পদে মাত্র, শেষাক্ষর সদা মিলে॥"

— 'ছন্দঃকুসুম' (১২৭০ ফাল্গুন), ভূমিকা-৩।৩

কিন্তু এই অভিযোগ সত্ত্বেও বাংলা ছন্দে সংস্কৃত তথা প্রাকৃত প্রথামত চতুষ্ক রচনার আদর্শের দিকে ফিরে যাবার কোনো লক্ষণই আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

চর্যাগীতির অপকৃষ্ট পাদকুলক বা পজ্‌ঝটিকা এবং তৎসম্ভূত উত্তরকালীন পয়ার শ্লোক দ্বিপঙ্‌ক্তিক হলেও তার প্রতি পঙ্‌ক্তি দুটি করে প্রধান ভাগে বিভক্ত। পূর্বে বলেছি বাংলা ছন্দপরিভাষায় এরকম প্রধান ভাগকে বলা হয় 'পদ'। এই হিসাবে চর্যাগীতির অপকৃষ্ট পজ্‌ঝটিকা ও উত্তরকালীন পয়ার শ্লোকের দুই পঙ্‌ক্তিতে থাকে মোট চার পদ। আর এই পদগুলি যে মূলতঃ অষ্টমাত্রক তাতেও সন্দেহ নেই। এভাবে বাংলা পয়ার প্রকারান্তরে সংস্কৃত অনুষ্টুপ্‌ ছন্দের চতুষ্পদী রূপের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য লাভ করেছে। এজন্যই এক সময়ে কেউ কেউ পয়ারকে সংস্কৃত অনুষ্টুপ্‌ ছন্দ থেকে উদ্‌ভূত বলে অনুমান করতে প্রণোদিত হয়েছিলেন। কিন্তু এ অনুমান যে তথ্যসম্মত বা যুক্তিসংগত নয়, আশা করি এ বিষয়ে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই।

এবার আলোচ্য বিষয়ে অর্থাৎ বাংলা প্রস্বরস্বাতন্ত্র্যের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। প্রশ্ন হতে পারে— বাংলা ভাষার এই যে উচ্চারণস্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ প্রস্বরপদ্ধতি ও মাত্রাসংকোচপ্রবণতা যা তাকে হিন্দি মরাঠি প্রভৃতি অন্যান্য প্রাকৃতসম্ভূত ভাষা থেকে পৃথক্ করে রেখেছে, তার উৎস কোথায়? তার একমাত্র সদুত্তর এই হতে পারে যে, সংস্কৃত-প্রাকৃত আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা দেশে যে ভাষা বা ভাষা-গোষ্ঠী প্রচলিত ছিল তার উচ্চারণবৈশিষ্ট্যই প্রাকৃতজ বঙ্গীয় ভাষার উচ্চারণকে প্রভাবিত করে হিন্দি প্রভৃতি অন্যান্য প্রাকৃতজ ভাষা থেকে পৃথক্ করেছে। আধুনিক কালে ইংরেজি বা হিন্দি ভাষার উচ্চারণ বাঙালির মুখে যেভাবে বিকৃত ও রূপান্তরিত হয়, প্রাচীন কালে বহিরাগত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার উচ্চারণ বাংলাদেশে সেভাবেই নূতন রূপ গ্রহণ করেছিল। এই পর্যন্তই বলা যেতে পারে। বাংলা দেশের আদিম ভাষা বা ভাষাগোষ্ঠীর স্বরূপ কি, কারা সে ভাষা বলত, সে তত্ত্ব 'নিহিতং গুহায়াম্'। সে রহস্য উদ্‌ঘাটনের অধিকার বা ক্ষমতা আমার নেই। তবে এটুকু বলতে পারি যে, বাংলার সেই আদিম ভাষার প্রভাব স্বভাবতঃই প্রথম দেখা দেয় লোকের মুখের কথায়, জনপ্রবাদে, মেয়েলি ছড়ায়, লোকসাহিত্যে। তার পরে সে প্রভাব লোকসাহিত্য থেকে সাধুসাহিত্যে সংক্রামিত হয়। কিন্তু সে প্রভাবের ক্রিয়া চলে অতি মন্থর গতিতে। তাই সাধুসাহিত্যের উপরে লৌকিক উচ্চারণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক সময় লেগেছে। কেননা সাধু-সাহিত্যের ঐতিহ্যগত সংস্কারের বাধা অতিক্রম করা সহজসাধ্য বা স্বল্পকালসাপেক্ষ নয়। এ প্রসঙ্গের আলোচনাও দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ' প্রবন্ধে।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন— "এইসকল বচন ও ছড়ার প্রচলনে পয়ার ছন্দ গঠনে কিছু-না-কিছু সাহায্য হইয়াছিল।... ইহারা যে বঙ্গীয় প্রাচীন কবিগণকে ছন্দ রচনায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"— দীর্ঘকালের ব্যবধানেও রমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের এই উক্তির (১৯০৪) সত্যতা আজও কিছুমাত্র মলিন হয় নি।

১৫ আগস্ট ১৯৬৮। ৩০ শ্রাবণ ১৩৭৫

গোরা : রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

১

হেমন্তবালা দেবীর নিকট লিখিত একটি পত্রে 'গোরা'র মূল উৎস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—

"গোরা ও নৌকাডুবির কল্পনা সম্পূর্ণই আমার মাথার থেকে বেরিয়েচে। এমন ঘটনা ঘটেচে বলে জানি নে কিন্তু ঘটলে কী হতে পারত সেইটে ইনিয়ে বিনিয়ে লিখেচি।"[১]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গল্পসৃষ্টি সম্পর্কে যে কয়েকটি কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাও উদ্ধারযোগ্য—

"একটা কথা মনে রেখো, গল্প ফোটোগ্রাফ নয়। যা দেখেছি যা জেনেছি তা যতক্ষণ না মরে গিয়ে ভূত হয়, একটার সঙ্গে আরেকটা মিশে গিয়ে পাঁচটায় মিলে দ্বিতীয়বার পঞ্চত্ব পায় ততক্ষণ গল্পে তাদের স্থান হয় না।"[২]

রবীন্দ্রনাথের নিজের এই সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও সমসাময়িক সাহিত্যরসিক ও সমালোচকবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক রবীন্দ্রসাহিত্য-জিজ্ঞাসুগণ সকলেই তাঁহার 'গোরা' উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের মধ্যে তদানীন্তন বঙ্গসমাজের প্রখ্যাত কয়েকজন নেতৃস্থানীয় পুরুষের প্রতিচ্ছবি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।[৩] কিন্তু কে সেই দেশনায়ক ?—বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, না উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ?

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘ জীবনে বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন— ধর্মীয় ও সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনের পুরোভাগে যেমন তাঁহার স্থান ছিল, সেইরূপ রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত তাঁহার সম্পর্কও নিতান্ত শিথিল বা পরোক্ষ ছিল না। আর, সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাবের পর তিনিই তো কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলাভাষা বা সাহিত্যের প্রগতি সংক্রান্ত যাহা-কিছু উদ্‌যোগ-আয়োজন রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় দেখা গিয়াছে, হয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সে-সকলের অগ্রণী, নতুবা রবীন্দ্রনাথকে বিপক্ষরূপে স্থাপন করিয়া সেইসকল সাহিত্যবিপ্লব আবর্তিত হইয়াছে। কোনও দেশের সাহিত্যরথীর ভাগ্যে স্বদেশ ও সমাজের বিচিত্রমুখী চিন্তা, ভাব ও কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ করিবার এই জাতীয় দুর্লভ অবকাশ কদাচিৎ সংঘটিত হইতে দেখা যায়। অথচ রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি, ভাষাশিল্পী— ধর্মের স্বরূপ -ব্যাখ্যায় তাঁহার দান যতই গভীর ও বৈপ্লবিক হউক-না কেন, তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তা যতই স্বচ্ছ, যতই দেশ ও কালের পরিধির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হউক-না কেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্র হইতে তাঁহার জীবনের এই মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে উক্তি এই স্থলে উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

"...আমার আছে বলবার ক্ষমতা, তাই বিধাতা আমাকে দিয়ে নানা কথাই বলিয়ে নেন— কোনো একটি বাণীতে আমার সকল বাণী সংহত করে সাধনার মন্দিরে আলো জ্বালাবার কাজে আমার তলব পড়ে নি। আমি গুরু না, রাষ্ট্রনেতা না— আমি কবি, সৃষ্টির বিচিত্র খেলায় নানা ছন্দে গড়া খেলনা জোগাব, এই আমার কাজ।..."[৪]

"আমার প্রধান সার্থকতা সব কিছু প্রকাশ করা— বাণীর দ্বারা করেচি, কর্মের দ্বারাও করেছি।..."[৫]

"আমি কথার যাচনদার, কথা যেখানে অকৃত্রিম ও সুন্দর সেখানে আমি মত বিচার করি নে —সেখানে আমি প্রকাশের রূপটিকে রসটিকে সম্ভোগ করতে জানি।"[৬]

কিন্তু মূলতঃ কবি হইয়াও তাঁহাকে আজীবন স্বদেশ ও সমাজের বিচিত্র কর্মধারার খরস্রোতে বারংবার ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের এই স্ববিরোধ বা দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। হেমন্তবালা দেবীর নিকট লিখিত একটি পত্রে তিনি বলিতেছেন—

"আমার অবস্থাটা ব্যস্ত, আমার স্বভাবটা কুঁড়ে— কেবলি দ্বন্দ্ব বাধে কিন্তু অবস্থারই জিৎ হয়। ছেলেবেলা থেকে আমি স্বভাবতই কুণো অথচ আমি যত দেশে-বিদেশে মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে বেড়িয়েছি এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি আর সমস্ত পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ।"[৭]

আবার—

"স্বভাবতই আমি কুণো অথচ বিরাট বহিঃসংসারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘটিয়েছে আমার ভাগ্য। আমার অন্তরের বিরুদ্ধে বাহিরের এই প্রতিবাদ নিয়তই চলেছে।"[৮]

অন্তর ও বাহিরের এই সংঘাত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনে যতই বেদনাকর হউক-না কেন— কবির চিত্তমন্থনসঞ্জাত অমৃতরসের স্পর্শে বাংলাসাহিত্য বারবার নবীন প্রেরণা লাভ করিয়া সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে, সাহিত্যের নব নব দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, বাংলা ভাষা নূতন রূপ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। 'কল্লোল'গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তাহাদেরই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া 'শেষের কবিতা' রচনা করিলেন— বাংলা গদ্যশিল্পে নূতন প্রাণসঞ্চার হইল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া বাংলা তথা ভারতীয় রাজনীতি গুপ্ত সহিংস সংগ্রামের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল— কবি রবীন্দ্রনাথের চিত্ত তাহাতে সায় দিল না। তিনি নীরবে সেই রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু সেই পূর্বস্মৃতি কবিচিত্তে দীর্ঘকাল সঞ্চিত থাকিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় এলা ও অন্তর অপূর্ব প্রণয়লীলা রূপে আত্মপ্রকাশ করিল— বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে নূতন প্রাণবেগ সঞ্চারিত হইল। অনুরূপভাবে 'গোরা' উপন্যাসটিও অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্ব হইতেই উদ্‌ভূত। সমসাময়িক ব্রাহ্ম ও হিন্দু-সমাজের নেতৃস্থানীয় পুরুষগণের মধ্যে মতবিরোধ এবং ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে নব্য হিন্দুগণের বিষোদ্‌গার এবং সর্ববিষয়ে স্বাদেশিকতার জয়ঘোষণা— এই মহৎ উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমি রচনা করিয়াছে— তাহারই উপর এক দিকে আইরিশ সন্তান গোরার সহিত সুচরিতার, অপর দিকে হিন্দুসমাজের বিনয়ের সহিত ব্রাহ্মকন্যা ললিতার দ্বৈত প্রণয়লীলা স্নিগ্ধ বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

২

রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাবকাল হইতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের তিরোভাবকাল (১৮৮৪) পর্যন্ত —এমন কি বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত— প্রায় সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীই বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মূলতঃ ধর্মীয় আন্দোলনের ইতিহাস বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারা যায়। এক দিকে যেমন ভারতবর্ষের প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্ম বা সনাতন হিন্দুধর্মের সহিত পশ্চিম মহাদেশ হইতে নবাগত খ্রীষ্টধর্মের সংঘাতে এই আন্দোলনের সূত্রপাত— অপর দিকে সেই সংঘাতের ফলেই যে ঔপনিষদ ব্রহ্মবাদমূলক ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি হইল, সেই ব্রাহ্মধর্মের সহিত সনাতন হিন্দুধর্ম ও পাশ্চাত্য খৃষ্টধর্মের নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়— এই

শতাব্দীব্যাপী ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্যে বৈচিত্র্য সঞ্চার করিয়া বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সুসমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করিয়াছে। কিন্তু এই আন্দোলন শুধুই দ্বন্দ্ব এবং বিরোধমূলকই নহে— বিভিন্ন মহাপুরুষের কণ্ঠে সর্বধর্ম সমন্বয়ের উদাত্ত বাণীও সমস্ত বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে উপেক্ষা করিয়া এক অখণ্ড মহামানবতার ভিত্তিতে সকলকে সমবেত করিবার জন্য ঘোষিত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং তদীয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ— এই মহাপুরুষত্রয়ের পুণ্য নাম এই ধর্ম-সমন্বয়ের ইতিহাসরচনায় সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সকলেই এই চিরন্তন সত্য অবিকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি কোনও একটি বিশিষ্ট ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারাই কেবল সম্ভব নহে— বিভিন্ন পথ সেই একই মহৎ লক্ষ্যের দিকে অধ্যাত্মসাধনার সকল পথিককেই অগ্রসর করিয়া লইয়া চলে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর এই ধর্মান্দোলনের ইতিহাস কোনও বিশেষ একটি সরলরেখা ধরিয়া অগ্রসর হয় নাই। রাজনৈতিক ও সামাজিক নানাবিধ সংস্কার আন্দোলনের সহিত জড়িত হওয়ার ফলে ইহার বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল বারংবার কলুষিত হইয়াছে, ইহার সর্বকালীন ও সার্বদেশিক নৈতিক ভিত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া ভারতবর্ষের বিশেষ একটি কালের বা বিশেষ একটি জাতির বা বিশেষ একটি ধর্মসম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠানকে অধ্যাত্ম-সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ মার্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাই যে ভারতীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভেরও প্রকৃষ্টতম পন্থা, তাহা প্রতিপাদন করিবার উদগ্র আগ্রহের বশীভূত হইয়া বহু দেশপ্রেমিক মনীষী স্বস্ব জীবন বিসর্জন করেন। এইভাবে হিন্দুধর্মকে ভারতীয় ধর্মসাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশরূপে প্রতিপাদন করিয়া পাশ্চাত্য খ্রীষ্টীয় ধর্মসাধনা হইতেও তাহা যে উন্নততর, এবং হিন্দুত্বকে সর্বান্তঃকরণে বরণ করিয়াই যে ভারতবর্ষীয়গণের পক্ষে শুধুই আধ্যাত্মিক নয়, এমন কি রাজনৈতিক মুক্তিও সম্ভব— এই আদর্শের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হইয়া যে-সকল ভারতীয় দেশনায়ক এবং মনীষী উনবিংশ শতাব্দীতে আত্মোৎসর্গে ব্রতী হন, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম, এবং সর্বাপেক্ষা চরমপন্থী—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ খুবই অল্প।

নব্যহিন্দুগণের এই আপোষহীন বৈপ্লবিকতা যে বহুলাংশে বিদেশীয় শাসকগণের নির্লজ্জ আত্মশ্লাঘা এবং ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণের আচার এবং ধর্মমতের প্রতি উন্নাসিক বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ধর্মমতের ক্রমবিবর্তন আলোচনাবসরে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে তাহা উদ্ধারযোগ্য বলিয়া মনে করি। তিনি বলিতেছেন—

"The ground for this mediaeval Hindu interpretation of the life and realisations of Bijaya Krishna had already been prepared by the movement of so-called Hindu Revival that followed, particularly in Bengal, the keen political conflict provoked during Lord Ripon's Viceroyalty by the Ilbert Bill. The reckless attacks on Hindu religious and social institutions made by representatives of the European community in the country to prove the moral disability of Hindu or Indian Magistartes to try criminal cases against Europeans, led to a counter-movement which on the one hand commenced to defend these Hindu institutions and on the other sought to expose with equal recklessness the moral defects of the European domestic and social life. The

Brahmo Samaj and every other reform movement in the country suffered very seriously in consequence of this new revival and reaction. About the time when Bijaya Krishna attained his *siddhi* this wave of Hindu reaction was passing over Bengal upsetting all our progressive and rational, ethical and spiritual values. The movement of religious and social freedom represented by the Brahmo Samaj from the days of Raja Ram Mohan Ray lost the hold that it had on the mind and life of our educated intelligentsia…"[৯]

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের আবির্ভাব এই নব্যহিন্দু আন্দোলনের পটভূমিতে বিচার্য। তাঁহার জীবনে স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যবোধের সহিত হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে অবিচল আস্থা ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব উভয়েই সমানবয়স্ক, ১৮৬১ সালে উভয়েরই জন্ম। 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা কালে রবীন্দ্রনাথের সহিত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের হিন্দুধর্ম ও সমাজসংস্কার বিষয়ক বিবিধ আলোচনার মধ্য দিয়া পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। ১৯০১ সালের আগস্ট মাসে ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্রনাথের সদ্যঃ প্রকাশিত 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের যে অনবদ্য সমালোচনা বাহির করেন, তাহাতে ব্রহ্মবান্ধবের সূক্ষ্ম রসগ্রাহিতাই যে ব্যক্ত হইয়াছে তাহা নহে, কবির তৎকালীন ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ ও আদর্শবিষয়ে ধারণার সহিত ব্রহ্মবান্ধবের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় মতবাদের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যও অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত ব্রহ্মবান্ধবের 'হিন্দুর একনিষ্ঠতা' (বঙ্গদর্শন ১৩০৮ বৈশাখ) এবং রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ' (বঙ্গদর্শন ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ) 'নেশন কি' (বঙ্গদর্শন ১৩০৮ শ্রাবণ), 'হিন্দুত্ব' (বঙ্গদর্শন ১৩০৮ শ্রাবণ), এবং 'নকলের নাকাল' (বঙ্গদর্শন ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ) প্রভৃতি প্রবন্ধ উভয়ের সমসাময়িক চিন্তাধারার মধ্যে গভীর আত্মীয়তার পরিচয়বাহী।[১০] একই আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য নিবন্ধন এই উভয় মনীষীর কর্মক্ষেত্রেও মিলন ঘটিয়াছিল— যাহার ফলস্বরূপ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে এবং উপাধ্যায়ের উপর সেই বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব সমর্পিত হয়। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে উপাধ্যায়ের আবির্ভাব এবং ছাত্রসমাজের সহিত তাঁহার অবাধ মেলামেশার একটি অন্তরঙ্গ রেখাচিত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁহার 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন—

"একদিন একটি পাঞ্জাবি পালোয়ান কি করে হঠাৎ শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হল। কুস্তি শেখবার জন্য আমরা একটি আখড়া তৈরি করেছিলুম। সেই দেখে পালোয়ানটির মহা উৎসাহ, পোশাক ছেড়ে সেখানে দাঁড়িয়ে তাল ঠুকতে লাগল। তার বিপুল বলিষ্ঠ দেহ দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে রইলুম, কারও সাহসে কুলোল না তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তার সঙ্গে লড়াইতে নেমে যায়। সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ দেখি উপাধ্যায় মহাশয় কৌপীন পরে সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি তাল ঠুকে পালোয়ানকে লড়াই করতে আহ্বান করলেন। বাঙালি সন্ন্যাসীর কাছেই শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবি পালোয়ানকে হার মানতে হল। আমাদের তখন কী আনন্দ।"[১১]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহিত উপাধ্যায়ের মতপার্থক্য ক্রমশঃ প্রকট হইয়া উঠিতে থাকে— ফলে ব্রহ্মচর্য

আশ্রম ত্যাগ করিয়া উপাধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের অসমাপ্ত কার্য সমাধা করিবার প্রেরণায় বিলাতযাত্রা করেন। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ব্রহ্মবান্ধব রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তাল আবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং 'সন্ধ্যা' এবং 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলীতে বাঙালী জাতিকে 'আত্মস্থ' হইবার জন্য উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করিতে থাকেন। ব্রহ্মবান্ধবের এই উগ্র স্বাদেশিকতা এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও শিক্ষার বিরুদ্ধে অবিরাম বিষোদ্‌গার সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে ব্যথিত করিয়াছিল। তাই, যে ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহকর্মী ছিলেন, প্রাচীন ভারতের গৌরবময় আদর্শ যাঁহাদের একই স্বপ্নে বিভোর করিয়া রাখিত— তাঁহারাই ক্রমশঃ একে অপরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে একসময়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত ব্রহ্মবান্ধবের কচিৎ সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে, কবির বিভিন্ন আত্মপরিচিতিমূলক গ্রন্থেও ব্রহ্মবান্ধবের কোনও উল্লেখ দুর্লভ।[১২] এই মৌনভাব রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাব-সুলভ— বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবসরে ইহা তাঁহার জীবনে বহুবার লক্ষ করা গিয়াছে। যে আদর্শের প্রতি তাঁহার অন্তরের সায় থাকিত না, যাহাকে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেন না, তাহার প্রতি অবিচ্ছিন্ন মৌনভাব অবলম্বনের[১৩] দ্বারাই তাঁহার অন্তরের কুণ্ঠা ও বিরাগ আত্মপ্রকাশ করিত। ১৩৪১ সালে প্রকাশিত 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের ভূমিকার 'আভাস' রূপে কবি উপাধ্যায় সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত স্মৃতিকথা নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বর্তমান প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—

"একদা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যখন Twentieth Century মাসিকপত্রের সম্পাদনায় নিযুক্ত তখন সেই পত্রে তিনি আমার নূতন-প্রকাশিত নৈবেদ্য গ্রন্থের এক সমালোচনা লেখেন। তৎপূর্বে আমার কোনো কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখি নি। সেই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

"তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপর পক্ষে বৈদান্তিক, তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।

"শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রথম সহযোগী পাই। এই উপলক্ষে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে-সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।

"এমন সময়ে লর্ড কর্জন বঙ্গবিচ্ছেদ-ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হলেন। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দু-মুসলমান-বিচ্ছেদের রক্তবর্ণ রেখাপাত হল। এই বিচ্ছেদ ক্রমশঃ আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবে, সমস্ত বাঙালিজাতকে কৃশ করে দেবে এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্‌বেগে আলোড়িত করে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড মর্লি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠ্‌ল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র-ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে।[১৪] এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলা দেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকাপন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এতবড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।

"এই সময়ে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। মনে করেছিলুম হয়তো আমার সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্র-আন্দোলন প্রণালীর প্রভেদ অনুভব করে আমার প্রতি তিনি বিমুখ হয়েছিলেন অবজ্ঞাবশতই।"

রথীন্দ্রনাথও তাঁহার 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে 'সন্ধ্যা' পত্রিকা সম্পাদন কালে উপাধ্যায়ের উগ্র স্বাদেশিকতা ও তাঁহার লেখনীতে বাংলা ভাষার তীব্র শাণিত 'অসংযত' রূপের উল্লেখ প্রসঙ্গে কবির উদ্‌ধৃত মন্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

"...যখন শান্তিনিকেতনে এলেন তখনো তিনি খ্রীষ্টানধর্ম বাহ্যত ত্যাগ করেন নি, কিন্তু সনাতনী হিন্দুধর্মের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা তাঁর জন্মেছে। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শে গুরুকুল গড়ে তোলার সুযোগ পেয়ে তিনি খুব উৎসাহ বোধ করলেন। ভারতবর্ষীয় বর্ণাশ্রমধর্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বাবার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। একাধারে হিন্দুধর্মে নিষ্ঠা ও প্রকট ধরণের স্বাদেশিকতা তাঁর মধ্যে দেখা দিল। বাবার সঙ্গে ক্রমশ মতবিরোধ বাধতে লাগল। ব্রহ্মবান্ধব শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে 'সন্ধ্যা' কাগজ প্রকাশ করলেন। তিনি ক্যাথলিক থাকতে *Sophia* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তাতে তিনি ইংরেজিতে যা লিখতেন তার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল ও পরিমার্জিত তেমন সংযত ও যুক্তিসিদ্ধ। 'সন্ধ্যা' কাগজের ভাষা একেবারে বিপরীত— অসংযত, উত্তেজক, তীব্র, ধারালো রকমের বাংলা ভাষায় এক অভিনব রূপ দিলেন। *Sophia*-র ব্রহ্মবান্ধবই যে 'সন্ধ্যা'র লেখক, বাহ্যত আত্মবিরোধী মনে হয়, কিন্তু তিনি বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় কোনো একটি ধর্মবিশ্বাসে বেশিদিন তিনি আস্থা রাখতে পারতেন না।"[১৫]

রবীন্দ্রনাথের সহিত ব্রহ্মবান্ধবের পরিচয় সময়ের ব্যাপ্তির দিক্ দিয়া খুব দীর্ঘস্থায়ী নয়— ১৯০১ সাল হইতে ১৯০৭ সাল এই উভয় সীমার মধ্যে ইহা আবদ্ধ। কিন্তু এই স্বল্পস্থায়ী পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে চিরস্থায়ী রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর কারাবাসে উপাধ্যায়ের জীবনাবসান ঘটে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের রচনাও ১৯০৭ সালেই শুরু হয়।[১৬] উভয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম কার্যকারণভাব রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় না কি? যদিও ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের হিন্দুধর্ম ও রাজনৈতিক আদর্শ বিষয়ে মতবাদ বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছিল, তথাপি উপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং হিন্দুর সামাজিক, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক আদর্শসমূহের উৎকর্ষ বিষয়ে তাঁহার অবিচলিত ধারণা রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে যে বিশেষভাবে আলোড়িত করিয়াছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। ইহার উপর ছিল ব্রহ্মবান্ধবের নিজের জীবনের দ্বন্দ্বসঞ্জাত নাটকীয় বৈচিত্র্য— ব্রাহ্মণবংশে জন্ম, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মেলামেশা, প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ এবং ত্যাগ, রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসিরূপে পুনরাবির্ভাব, পূর্ববিদ্বিষ্ট বৈদান্তিক দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ, বৈদান্তিক রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীর বিলাত যাত্রা এবং অক্‌স্‌ফোর্ড এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বসংস্থাপনে অবিরাম প্রয়াস, বিলাতফেরত সন্ন্যাসীর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরিত্যক্ত উপবীতের পুনর্গ্রহণ, মস্তকমুণ্ডন ও শিখাধারণ, 'সন্ধ্যা' পত্রিকা সম্পাদনার দ্বারা তামসনিদ্রাভিভূত বাঙালী জাতিকে আত্মসচেতন করিয়া তুলিবার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কারাবরণ এবং শেষপর্যন্ত বন্দিদশায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ— গতানুগতিক নিস্তরঙ্গ বাঙালী জীবনে ইহার অপেক্ষা অধিক কি বৈচিত্র্য বা বিস্ময়ের সমাবেশ কল্পনা করা সম্ভব? আন্তর ও বহির্জীবনের

এই বিচিত্র ঘটনা সংঘাত উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের অন্তিম উক্তিটিকে যেন আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়— "Wonderful have been the vicissitudes of my life; wonderful has been my faith." সুতরাং নব্যবাংলার সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়া যে বিচিত্রকর্মা পুরুষ অনতিকাল পূর্বে আপন বলিষ্ঠ পৌরুষদৃপ্ত স্বাজাত্যগৌরবে মহনীয় ব্যক্তিত্বপ্রভাবে সমস্ত দেশবাসীকে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছিলেন তাঁহার লোকান্তর গমনের পর বাংলার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা যে সেই বিচিত্র চরিত্রকে আপন উপন্যাসের নায়করূপে কল্পনা করিবেন— তাহা তো স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।[১৭]

ব্রহ্মবান্ধবের বহির্জীবন, তাঁহার আকৃতি, তাঁহার বেশভূষা, তাঁহার ধর্মান্তর গ্রহণ, প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান প্রভৃতি বাহ্য আচার ব্যবহার যে সকল লোকচক্ষুর সম্মুখে অনাবৃত ছিল, রবীন্দ্রনাথ কিভাবে গোরার রূপ কল্পনায় সেগুলিকে গ্রহণ করিয়াছেন, কিভাবেই বা তাহাদের প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন, প্রথমতঃ তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

৩

গোরার আকৃতি উপন্যাসের নানা স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। কয়েকটি বর্ণনা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

"যে ছিল সভাপতি তাহার নাম গৌরমোহন; তাহাকে আত্মীয়বন্ধুরা গোরা বলিয়া ডাকে। সে চারি দিকের সকলকে যেন খাপছাড়া রকমে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে তাহার কালেজের পণ্ডিত মহাশয় রজতগিরি বলিয়া ডাকিতেন। তাহার গায়ের রংটা কিছু উগ্ররকমের সাদা— হলদের আভা তাহাকে একটুও স্নিগ্ধ করিয়া আনে নাই। মাথায় সে প্রায় ছয়ফুট লম্বা, হাড় চাওড়া, দুই হাতের মুঠা যেন বাঘের থাবার মতো বড়ো— গলার আওয়াজ এমনি মোটা ও গম্ভীর যে হঠাৎ শুনিলে 'কে রে' বলিয়া চমকিয়া উঠিতে হয়। তাহার মুখের গড়নও অনাবশ্যক রকমের বড়ো এবং অতিরিক্ত রকমের মজবুত; চোয়াল এবং চিবুকের হাড় যেন দুর্গদ্বারের দৃঢ় অর্গলের মতো; চোখের উপর ভ্রূরেখা নাই বলিলেই হয় এবং সেখানকার কপালটা কানের দিকে চওড়া হইয়া গেছে। ওষ্ঠাধর পাতলা এবং চাপা; তাহার উপরে নাকটা খাঁড়ার মতো ঝুঁকিয়া আছে। দুই চোখ ছোটো কিন্তু তীক্ষ্ণ; তাহার দৃষ্টি যেন তীরের ফলাটার মতো অতিদূর অদৃশ্যের দিকে লক্ষ ঠিক করিয়া আছে অথচ এক মুহূর্তের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া কাছের জিনিসকেও বিদ্যুতের মতো আঘাত করিতে পারে। গৌরকে দেখিতে ঠিক সুশ্রী বলা যায় না, কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া থাকিবার জো নাই। সে সকলের মধ্যে চোখে পড়িবেই।"[১৮]

আবার—

"গোরার কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, পরনে মোটা ধুতির উপর ফিতা বাঁধা জামা ও মোটা চাদর, পায়ে শুঁড়তোলা কটকি জুতা। সে যেন বর্তমান কালের বিরুদ্ধে এক মূর্তিমান বিদ্রোহের মতো আসিয়া উপস্থিত হইল।..."[১৯]

অপি চ—

"লোকটাকে দেখিয়া সাহেব কিছু বিস্মিত হইয়া গেলেন। এমন ছয় ফুটের চেয়ে লম্বা, হাড়-মোটা, মজবুত মানুষ তিনি বাংলা দেশে পূর্বে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। ইহার

দেহের বর্ণও সাধারণ বাঙালির মতো নহে। গায়ে একখানা খাকি রঙের পাঞ্জাবি জামা, ধুতি মোটা ও মলিন। হাতে একগাছা বাঁশের লাঠি, চাদরখানাকে মাথায় পাগড়ির মতো বাঁধিয়াছে।"[২০]

উপাধ্যায়ের আকৃতির বলিষ্ঠতা সম্বন্ধে কিছুটা আভাস আমরা ইতিপূর্বে রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে পাইয়াছি। উপাধ্যায়ের অন্যতম প্রিয় শিষ্য গুরুর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"কলিকাতা তখন ভাল করিয়া চিনি না। জানিতাম সন্ধ্যা অফিস ১৯৩ নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট।... কম্পিত অন্তরে ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিলাম। অবশেষে ত্রিতল। উপাধ্যায় মহাশয় সেখানে অবস্থান করেন।

"সম্মুখে পূর্বদিকে বিস্তৃত ছাদ। তাহারই পশ্চিমে পূর্বাভিমুখী ঘর। উপরে উঠিয়া দেখিলাম একজন গৌরকান্তি সন্ন্যাসী সম্মুখে বাক্স রাখিয়া লিখিতেছিলেন।..."[২১]

আর একস্থলে তিনি বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মবান্ধবের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় রবীন্দ্রসাহিত্যে তথা বাঙলা সাহিত্যে একটা বিশিষ্টতার সৃষ্টি করিয়াছিল। 'নৈবেদ্যে'র কবিতায় যে উপাধ্যায়ের মনীষার প্রভাব বিদ্যমান উহা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করিতেন না এবং সেই প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা'য় পর্যন্ত দেখা যায়। গোরা যে তাহাকে হিন্দু এবং ভারতবর্ষীয় ইহা বিশেষ করিয়া ঘোষণা করিবার প্রয়াসে গরদের জোড় পরিয়া ও ললাটে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক আঁকিয়া আনন্দময়ীর নিকট উপস্থিত হইল, উহা স্বদেশীযুগের বাঙলার একটি উজ্জ্বল ছবি। এই যুগের স্বদেশপ্রীতি ভারতবর্ষকে পাইবার একটা শ্রদ্ধালু সাধনায় আত্মবিকাশ করিয়াছিল।"[২২]

গোরা দেশের যথার্থ অবস্থা জানিবার জন্য, নিম্নশ্রেণীর দেশবাসীদের সহিত একাত্মতা অনুভবের জন্য প্রায়শই পল্লীগ্রামে ভ্রমণে বাহির হইত কয়েকজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ লইয়া। এইরূপ একটি বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"গোরা যখন ভ্রমণে বাহির হইল তখন তাহার সঙ্গে অবিনাশ, মতিলাল, বসন্ত এবং রমাপতি এই চার জন সঙ্গী ছিল। কিন্তু গোরার নির্দয় উৎসাহের সঙ্গে তাহারা তাল রাখিতে পারিল না। অবিনাশ এবং বসন্ত অসুস্থ শরীরের ছুতা করিয়া চার পাঁচ দিনের মধ্যেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। নিতান্তই গোরার প্রতি ভক্তিবশত মতিলাল ও রমাপতি তাহাকে একলা ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারিল না। কিন্তু তাহাদের কষ্টের সীমা ছিল না ; কারণ গোরা চলিয়াও শ্রান্ত হয় না। আবার কোথাও স্থির হইয়া বাস করিতেও তাহার বিরক্তি নাই। গ্রামের যে-কোনো গৃহস্থ গোরাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভক্তি করিয়া ঘরে রাখিয়াছে তাহার বাড়িতে আহার ব্যবহারের যতই অসুবিধা হউক, দিনের পর দিন সে কাটাইয়াছে। তাহার আলাপ শুনিবার জন্য সমস্ত গ্রামের লোক তাহার চারি দিকে সমাগত হইত। তাহাকে ছাড়িতে চাহিত না।"[২৩]

উপাধ্যায়ের পল্লীভ্রমণের সহিত তুলনা করিলে উভয়ের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। 'সন্ধ্যা' ও 'স্বরাজ' পত্রিকা সম্পাদন কালে বাংলার লোকশিল্পের ও লোক-জীবনযাত্রার বিবরণের

উপাদান সংগ্রহার্থে কতিপয় সঙ্গিপরিবৃত অবস্থায় রিক্তপদে বৈশাখের মধ্যাহ্নরৌদ্রের উত্তাপ উপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মবান্ধবের পল্লীভ্রমণের একটি অন্তরঙ্গ চিত্র এই স্থানে উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

"উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' ও 'স্বরাজ' পত্র ভগীরথের মত শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে জাতীয় ভাবধারাকে তাহার স্ব-পদে পরিচালিত করিতে লাগিল। 'স্বরাজ' পত্র সম্পাদনের জন্য উপাধ্যায় কলিকাতার পাষাণ বেষ্টনী ছাড়িয়া পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়াছিলেন। এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া খাঁটি বাংলার নিজস্ব ঐশ্বর্যই আহরণ করিয়াছিলেন। 'স্বরাজ' পত্রে লর্ড কর্জনের স্বেচ্ছাচার, ফুলারের অত্যাচার, কাজী কিংফর্দের অবিচার এ সবের আলোচনা ছিল না, ছিল বংশবাটির হংসেশ্বরীর মন্দিরের ইতিকথা, বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক কাহিনী প্রভৃতি।…

"এই উপাদানগুলি সংগ্রহ করিতে ব্রহ্মবান্ধবকে আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি পল্লীর মহিমা কাহিনী অনুসন্ধানে বৈশাখী রৌদ্রে রিক্তপদে শূন্য মস্তকে বাংলার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। চৈত্রের দ্বিপ্রহর রৌদ্রের উত্তাপে মাটি আগুনের মত তপ্ত হইয়াছে, নাটাগোড়ের বনমালী কর্মকারের বাড়ি যাইতে হইবে। উপাধ্যায়ের সঙ্গী যুবকগণ গলদ্‌ঘর্ম হইতেছেন—উপাধ্যায় কিন্তু মহা উৎসাহে চলিতেছেন। রৌদ্রে গ্রীষ্মে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। জাতীয় চিত্তে বিপ্লবের বীজ বপন করিতে তিনি এমনি করিয়া উন্মাদ হইয়াছিলেন।"[২৪]

উপাধ্যায়ের সঙ্গে গোরার চরিত্রের বাহ্যতঃ সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য হইতেছে উভয়ের ধর্মমতের নাটকীয় বিবর্তনের দিক দিয়া। উভয়েই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজের এককালে উৎসাহী সভ্য এবং হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজব্যবস্থার তীব্র সমালোচক ছিলেন এবং পরবর্তী কালে উভয়েই সেই সমাজ হইতে বাহিরে চলিয়া আসিয়া হিন্দুয়ানির একনিষ্ঠ সমর্থক হইয়া দাঁড়ান। গোরা ও বিনয় প্রায় প্রতি রবিবারেই ব্রাহ্মসমাজে কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিবার জন্য যাতায়াত করিত— ইহা উপন্যাসের নানা স্থলেই উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়—

"এদিকে কেশববাবুর বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া গোরা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল ;…"[২৫]

উপাধ্যায়ের ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়ার কথাও অবিদিত নহে। ৺ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার সম্পর্কে লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"…শুনিয়াছি তিনি অল্প বয়সে কেশব সেনের অনুরাগী হয়ে ব্রাহ্ম হন। ইনি যে ব্রাহ্ম হয়েছিলেন তা লেখককে পূর্বে বলেছিলেন।"[২৬]

পরে অবশ্য উপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ করতঃ প্রথমে প্রোটেস্টাণ্ট ও তারও পরে ক্যাথলিক খ্রীষ্টান হন। সেই অবস্থায় করাচীতে থাকাকালীন তিনি *Sophia* নামে একটি ইংরাজী পত্রিকা সম্পাদন করেন। ভূপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন— "শুনিয়াছি তিনি ঐ পত্রিকায় হিন্দুধর্ম ও বেদান্তকে আক্রমণ করতেন এবং কতিপয় হিন্দু যুবককেও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তার মধ্যে রেবাচাঁদ (সিন্ধি) অন্যতম।…" এমন কি উপাধ্যায় *Sophia* পত্রিকায় 'Vedanta is dirty nasty thing' মন্তব্য করিয়া এককালে বেদান্ত দর্শনের প্রতি তাঁহার বিরূপ মনোভাবও প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে তাঁহার কি ঘোরতর পরিবর্তনই না ঘটিয়াছিল। বেদান্তদর্শনকে তিনি হিন্দুর দার্শনিক মনীষার

সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশরূপে প্রতিপাদন করিবার জন্য অক্সফোর্ডের বিভিন্ন সভায় কিরূপ উদগ্র উৎসাহই না প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'বিলাত-প্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠিতে' তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"মাইণ্ড (অর্থাৎ মনঃ) নামক একটি দার্শনিক পত্র আছে। যত বড় বড় ইংরেজ দার্শনিক—তাঁরা সকলেই উহাতে লিখেন। হিন্দু ব্রহ্মজ্ঞান-নামক আমার বক্তৃতাটি প্রবন্ধাকারে লিখে মাইণ্ডের সম্পাদকের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি প্রথমে প্রবন্ধটি গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না—কেননা তাঁহার মাসিক পত্রের জন্য এক বৎসরের কপি জমে পড়ে আছে। কিন্তু আমার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। বেদান্তের কথা শুনে হেসে বলিলেন—খুব একটা ব্যাপার বটে, কিন্তু এখনকার কালে ওসব চক্ষুবুজুনি দর্শন আর চলিবে না। কথা চলিতে লাগিল। কিছু আকৃষ্ট হোলেন। আমায় আর একদিন কথাবার্তার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। আমার প্রবন্ধটা রেখে এলাম। তার পরে যেদিন গেলাম সেদিন তিনি বলিলেন—প্রবন্ধতে নূতন কথা আছে—যেরকম ব্যাখ্যা করা হোয়েছে তাতে বোধ হয় বেদান্ত পাশ্চাত্য দর্শনের অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত—আমি এ প্রবন্ধ প্রকাশ করিব। আমার প্রবন্ধে জীব ও জগৎ যে মিথ্যা ও মায়ার রাজ্যে যে কোন স্বাধীনতা নাই তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর পাশ্চাত্ত্য দর্শনে যে মায়িক অলীকতার প্রতিবাদ আছে তাহারও খণ্ডন করা হইয়াছে। যাহা হুউক আনন্দের বিষয় যে, আমার প্রবন্ধ মাইণ্ডের মতন সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় বাহির হইবে। আরও আরও অনেক বিদ্বান্ এখানে আছেন যাঁরা দেশের মাথা—কিন্তু ভারতের দর্শন-জ্ঞান তাঁদের কাছে কোন পুরানো কালের বৃহৎ জন্তুর (ম্যামথের) মত—মিউজিয়ামে রেখে দিবার জিনিস। মোক্ষমূলর অনেক দিন ঐ ব্যাপারে পরিশ্রম করিয়াছেন বটে কিন্তু তার ফল দাঁড়িয়েছে যে বেদ অল্প-অল্প সভ্য কৃষকদের গান—উপনিষদ্‌সকল প্রাণের উচ্চ আকাঙ্ক্ষামাত্র—বর্ণাশ্রমধর্ম ব্রাহ্মণদের অত্যাচার—যা কিছু ভারতবর্ষের সার তা বৌদ্ধধর্ম, আর জগৎ অলীক—এটা খুব সাহসের কথা বটে তবে প্রলাপ। বেদান্তের মহাবাক্য—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মও যেমন রজ্জু ভ্রমবশত সর্পরূপে প্রতিভাত হয় তেমনই ব্রহ্মই অবিদ্যাপ্রভাবে দ্বৈত-প্রপঞ্চরূপে প্রতিভাত—এই সার কথা কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বুঝিয়াছেন কিনা—সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ। যে সন্ন্যাস পারম্পর্য ধরিয়া এই অদ্বৈতজ্ঞান চলিয়া আসিতেছে, তাহার সঙ্গ না করিলে বেদান্ত-বোধ সুদুর্লভ।"[২৭]

আর-এক চিঠিতে তিনি লিখিতেছেন—

"...মায়া কথাটা শুনিলে ইংরেজ চমকিত ও স্তম্ভিত হয়। আমরা দীন হীন জাতি—আমাদের বাঁচা-মরা শালগ্রামের শোয়া-বসার মতন দুই সমান। জগৎকে মায়াময় মিথ্যা বলিতে আমরা কুণ্ঠিত নহি কিন্তু ইংরেজের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। তাই জগৎ মিথ্যা—ইহা একেবারেই মিথ্যা কথা মনে হয়। অনেক মারপেঁচ কোরে বুঝাতে হয়। সহজে তারা ঘাড় পাতে না। কিন্তু অবশেষে ঘাড় পাতিতেই হবে। আমাদিগকে পরাজয় কোরে তারা সম্রাট হয়েছে। ঐ সাম্রাজ্য মায়ার ফাঁকি আর কিছুই নয়—এই স্বীকার কোরে একদিন তাহাদিগকে হিন্দুস্থানের পদানত হোতে হবে ও জ্ঞানের জয় ও বলের পরাজয় ঘোষণা করতে হবে। ইংলণ্ডে অল্প-স্বল্প বেদান্তের কথা রটেছে কিন্তু যাঁরা রটান তাঁরা মায়ার বাঁধে এমনি আটকেছেন যে, মায়াবাদে আর পঁহুছিতে পারেন না। পুরুষেরা অবিদ্যাকে

সদ্বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আর অবিদ্যারা পুরুষকে তুচ্ছ করিয়া মাথায় চড়িয়া বসিয়াছেন। কাজেই একটা কিম্ভূতকিমাকার গাউন পরানো বেদান্ত দাঁড়িয়ে উঠেছে। তবে রক্ষে যে বিলাতি-মার্কা মায়াবাদের বা মায়া-সাধের প্রাদুর্ভাব অতি কম।"[২৮]

অপি চ—

"কিসে এখানকার বিদ্বানেরা বেদান্তদর্শনের আস্বাদন পায় তার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টিত হওয়া উচিত।

"…অল্পদিন হোল কেমব্রিজে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। ত্রিনীতি কালেজে তিনটি বক্তৃতা করি। বিষয়—(১) হিন্দুর নির্গুণ ব্রহ্ম (২) হিন্দুর ধর্মনীতি, (৩) হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব। প্রসিদ্ধ দার্শনিক Dr. Metaggarp সভাপতি ছিলেন। নিজের সুখ্যাতি করতে নেই, বক্তৃতা তিনটি খুব জমেছিল। অনেক অধ্যাপক ও ছাত্র উপস্থিত ছিল। বক্তৃতার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, অধ্যাপকেরা পরামর্শ করছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সঙ্গে বেদান্তদর্শন শিক্ষা দেওয়া যাবে কিনা। যদি সুপরামর্শ হয় তা হলেই মঙ্গল নইলে আবার উঠে পড়ে লাগতে হবে। এক দিনের কর্ম নয়, এক জনেরও কর্ম নয়। ইংরেজের ছেলেরা বেদান্ত পড়লে য়ুরোপেরও মঙ্গল ও ভারতের মঙ্গল। এঁরাই ত গিয়ে আমাদের অধ্যাপক ও হাকিম হন।"[২৯]

অক্‌স্‌ফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্তদর্শন ও অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতামালার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্পর্কে 'বিলাত-ফেরত সন্ন্যাসীর চিঠি'তে ব্রহ্মবান্ধব লিখিতেছেন—

"ভারত যে এখনও জগতের গুরুস্থানীয় তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে ভারতের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে, তাই আজ অর্ধ শিক্ষিত ইংরেজ ভারতবাসীদিগকে কাউপার (Cowper) ও পোপ (Pope) মুখস্থ করাইয়া সাহিত্য শিখাইতেছে ও মারটিনোর (Martineau) ব্যাখ্যা করিয়া দর্শন উপদেশ দিতেছে। ইহা অপেক্ষা লজ্জাকর বিষয় আর কি আছে। এই আত্মবিস্মৃতি কিসে যায়? আমি ভাবিলাম আমাদের শাস্ত্রচিন্তা শিখিতে ইংরেজের যদি আগ্রহ হয় তাহা হইলে ভারতের আত্মবিস্মৃতি দূর হইবে ও ইংরেজেরও মঙ্গল হইবে। তজ্জন্য বিলাতযাত্রা করিয়াছিলাম। গিয়া দেখি মোক্ষমূলর প্রভৃতি সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের প্রয়াসে ভারতের কিছু সম্মান বাড়িয়াছে বটে— কিন্তু সে সম্মান না হওয়া ভাল ছিল। ইংরেজের ধারণা জন্মিয়াছে যে হিন্দুজাতি এক সময়ে বড় ছিল, কিন্তু এখন মরিয়া গিয়াছে। কেবল তাহার ঠাটমাত্র বজায় আছে।…আমি এই সংস্কার দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমি দেখাইয়াছি যে হিন্দু জাতি এখনও জীবন্ত। সহস্র সহস্র বৎসর হইয়া গিয়াছে তথাপি কালের প্রভাবে হিন্দু বিনাশ-প্রাপ্ত হয় নাই। কত সভ্য জাতি ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে কিন্তু হিন্দু জাতি মরণকে অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। কত উৎপাত কত শোষণ কত বিপ্লব ভারতকে বিতাড়িত ও বিক্ষুব্ধ করিয়াছে। অন্য কোন দেশ ভারতের ন্যায় প্রপীড়িত ও দলিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ, তবুও হিন্দু সপ্রাণ ও সতেজ। ইহার কারণ কি? বেদান্তপ্রতিপাদিত অদ্বৈতজ্ঞান হিন্দুর একমাত্র অবলম্বন ও চিরসহায়। হিন্দুর যোগ-দর্শন স্মৃতি-সাহিত্য বিধি-ব্যবস্থা আচার-ব্যবহার-সংস্কার অদ্বৈতামৃতরসে পরিপুষ্ট। অদ্বৈতমুখীন নিষ্কাম ধর্মপালনে হিন্দু রক্ষিত ও

বর্ধিত হইয়াছে। আমার এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া কেমব্রিজ (Cambridge) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা প্রীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন।..."[৩০]

গোরার হিন্দুর 'মূঢ়' আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ চিত্ত ক্রমশঃ হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দুর সামাজিক বিধান সমূহের প্রতি শ্রদ্ধালু হইয়া উঠিল, তাহার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ উপন্যাসের নিম্নোদ্ধৃত অংশে আমরা পাই—

"বাপের কাছে যে-সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হইতে লাগিল গোরা জো পাইলেই তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক বাধাইয়া দিত। সে তো তর্ক নয়, প্রায় ঘুষি বলিলেই হয়। তাঁহাদের অনেকেরই পাণ্ডিত্য অতি যৎসামান্য এবং অর্থলোভ অপরিমিত ছিল; গোরাকে তাঁহারা পারিয়া উঠিতেন না, তাহাকে বাঘের মতো ভয় করিতেন। ইহাদের মধ্যে কেবল হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রতি গোরার শ্রদ্ধা জন্মিল।

"বেদান্তচর্চা করিবার জন্য বিদ্যাবাগীশকে কৃষ্ণদয়াল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গোরা প্রথমেই ইহার সঙ্গে উদ্ধতভাবে লড়াই করিতে গিয়া দেখিল লড়াই চলে না। লোকটি যে কেবল পণ্ডিত তাহা নয়, তাঁহার মতের ঔদার্য অতি আশ্চর্য। কেবল সংস্কৃত পড়িয়া এমন তীক্ষ্ণ অথচ প্রশস্ত বুদ্ধি যে হইতে পারে গোরা তাহা কল্পনাও করিতে পারিত না। বিদ্যাবাগীশের চরিত্রে ক্ষমা ও শান্তিতে পূর্ণ এমন একটি অবিচলিত ধৈর্য ও গভীরতা ছিল যে তাঁহার কাছে নিজেকে সংযত না করা গোরার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। হরচন্দ্রের কাছে গোরা বেদান্তদর্শন পড়িতে আরম্ভ করিল। গোরা কোনো কাজ আধা-আধি-রকম করিতে পারে না, সুতরাং দর্শন-আলোচনার মধ্যে সে একেবারে তলাইয়া গেল।"[৩১]

শুধু তাহাই নয়, গোরা হিন্দুধর্মের উপর মিশনারীদের হীন আক্রমণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল, সংবাদপত্রে পত্র ছাপাইতে লাগিল এবং হিন্দুধর্মের সমর্থনে ইংরেজিতে গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইল—

"কিন্তু গোরার তখন রোখ চড়িয়া গেছে। সে 'হিণ্ডুয়িজম' নাম দিয়া ইংরেজিতে এক বই লিখিতে লাগিল—তাহাতে তাহার সাধ্যমত সমস্ত যুক্তি ও শাস্ত্র ঘাঁটিয়া হিন্দুধর্ম ও সমাজের অনিন্দনীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে বসিয়া গেল।"[৩২]

উপাধ্যায় হিন্দুর আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিক আদর্শের উৎকর্ষ প্রমাণ করিবার জন্য, হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা, তাহার লৌকিক আচার অনুষ্ঠান, তাহার তথাকথিত কুসংস্কারগুলিকেও সগর্বে মানিয়া চলিতেন, কেননা এ সমস্তই তাঁহার দেশপ্রেমের, ভারত-ধর্মের অঙ্গ ছিল। হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান, তাহার পূজাপার্বণ, তাহার বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা, তাহার সাকার উপাসনা প্রভৃতিকে অন্তর দিয়া স্বীকার করিতে পারিব না অথচ আমি দেশসেবক বলিয়া নিজের পরিচয় দিব, ভারত উদ্ধারের স্বপ্ন দেখিব— ইহা ব্রহ্মবান্ধবের নিকট অসহ্য ছিল। এই জাতীয় স্বদেশপ্রেমকে ব্রহ্মবান্ধব 'নিরাকার ফিরিঙ্গিয়ানা ভালবাসা' এই বিদ্রূপ-পূর্ণ আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন।

"ইঁহারা স্বদেশকে ভালবাসেন।...কিন্তু ইহা খাঁটি ভালবাসা নয়। ভালবাসা রসবস্তু। কিন্তু এ নিরাকার ফিরিঙ্গিয়ানা ভালবাসায় রসসম্পর্ক নাই। এ ভালবাসার আসক্তিলিপ্সা নাই, মমতাবোধ নাই, বিরহের জ্বালা নাই, মিলনের উচ্ছ্বাস নাই; ইহার রসের কোন অবলম্বন নাই;

সাধনার কোন অনুষ্ঠান নাই ; আছে কেবল শুদ্ধ একটা নিরাকার ভাব, আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা কঠোর কর্তব্য বোধ।...

"এ স্বদেশী খাঁটি স্বদেশী নয়।...ইহা দায়ে পড়িয়া স্বদেশী।...ভারতবর্ষটা এঁদের স্বদেশ যদি না হইত, তবে এঁদের কোন দুঃখ থাকিত না।"[৩৩]

এই 'দায়ে পড়িয়া স্বদেশী'র পরিবর্তে যথার্থ দেশপ্রেম জাগাইয়া তুলিবার জন্য উপাধ্যায় তাঁহার বিভ্রান্ত দেশবাসীদিগকে সমস্ত বিচারবুদ্ধি বর্জনপূর্বক দেশকে ভালবাসার জন্য উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করিয়াছিলেন—

"সখের স্বদেশী চলিবে না। ফিরিঙ্গীর শিখানো বিদেশীতেও আমাদের মুক্তি আসিবে না। প্রাণের টানে স্বদেশী গ্রহণ করা চাই। আমার দেশপ্রীতি বিচারবুদ্ধিবিরহিত। ভালবাসি বলিয়াই বাসি, আমার সবকিছুকেই বাসি। ফিরিঙ্গীর বিশ্লেষছুরিকায় চিরিয়া চিরিয়া আমার স্বদেশকে আমি দেখিব না, দেখিব আমারই দরদ দিয়া।"[৩৪]

'দরদী ও দরদ' প্রবন্ধে তিনি তাই লিখিয়াছিলেন—

"জানি মা আমার তিলোত্তমা নহেন ; তিল তিল করিয়া চুনিয়া চুনিয়া তাঁহার সৌন্দর্য অনুপম নহে। ইহা জানি, তবু তিনি আমার মা। আর কাহারও মা অনুপম হইতে পারেন, কিন্তু তিনি আমার মা নহেন।"[৩৫]

"এতখানি ভালবাসা দেশের প্রতি যেদিন জন্মিবে, সেদিন আর ফিরিঙ্গীর দুয়ারে হাসেন হোসেন করিয়া কাঁদিয়া ককাইয়া হে ফিরিঙ্গী আমাদের উদ্ধার কর বলিয়া বেড়াইতে হইবে না। সেদিন কালু ডোমের হাতের লাঠি আবার আস্ফালন করিবে, লক্ষ্মী ডোমনীকে রণচণ্ডী মূর্তিতে দেখা যাইবে।"[৩৬]

গোরাও যখনই দেশকে ভালবাসিবার কথা বলিয়াছে, তখনই দেশের সমস্ত কিছুই যে ভাল— তাহা জাতিভেদই হউক, সাকার পূজাই হউক, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি নানাবিধ কুসংস্কারই হউক, তাহার প্রাত্যহিক আচার-অনুষ্ঠানের যুক্তিহীনতাই হউক, এসব স্বীকার করিয়া লইয়াই যে দেশকে ভালবাসিতে হইবে, বাছবিচার করিলে চলিবে না, খ্রীষ্টান মিশনারীদের অনুকরণে শুধু দেশের দোষগুলি দেখাইয়া হিন্দুধর্মের দোষগুলির প্রতি কটাক্ষ করিয়া, সমবেদনাহীন সমালোচকের দৃষ্টিতে শুধু সংশোধনের উদ্দেশ্যে সর্বদা হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখিলে যে দেশকে শ্রদ্ধা করা যায় না, প্রকৃত দেশপ্রেমের আস্বাদন সম্ভব হয় না এবং এই জাতীয় সংশোধন প্রয়াসের দ্বারা যে দেশ এবং জাতির কোনও প্রকার অভ্যুদয় বা সংস্কার অসম্ভব— এই দৃঢ় বিশ্বাস গোরার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। তাই গোরার এই অন্ধ হিন্দুয়ানির আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"এমনি করিয়া মিশনারির সঙ্গে ঝগড়া করিতে গিয়া গোরা আস্তে আস্তে নিজের ওকালতির কাছে নিজে হার মানিল। গোরা বলিল, 'আমার আপন দেশকে বিদেশীর আদালতে আসামীর মতো খাড়া করিয়া বিদেশীর আইন মতে তাহার বিচার করিতে আমরা দিবই না। বিলাতের আদর্শের সঙ্গে খুঁটিয়া খুঁটিয়া মিল করিয়া আমরা লজ্জাও পাইব না, গৌরবও বোধ করিব না। যে দেশে জন্মিয়াছি সে দেশের আচার, বিশ্বাস, শাস্ত্র ও সমাজের জন্য পরের ও নিজের কাছে কিছুমাত্র সংকুচিত হইয়া থাকিব না। দেশের যাহা-কিছু আছে তাহার সমস্তই সবলে ও সগর্বে মাথায় করিয়া লইয়া দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা করিব।'"[৩৭]

কোনও তর্কের দ্বারাই গোরার এই উদ্ধত 'হিন্দুয়ানি'কে প্রশমিত করা সম্ভব ছিল না, কেননা দেশের প্রতি এই সর্বাঙ্গীণ মমত্ববোধ সমস্ত তর্কের অতীত। বিনয় যখন ব্রাহ্মকন্যাকে বিবাহের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল তখন গোরা অসহিষ্ণু হইয়া তাহাকে এই বলিয়া উত্তর দিল—

"না, বিনয়, তুমি বৃথা আমার সঙ্গে তর্ক করছ। সমস্ত পৃথিবী যে ভারতবর্ষকে ত্যাগ করছে, যাকে অপমান করছে, আমি তারই সঙ্গে এক অপমানের আসনে স্থান নিতে চাই— আমার এই জাতিভেদের ভারতবর্ষ, আমার এই কুসংস্কারের ভারতবর্ষ, আমার এই পৌত্তলিক ভারতবর্ষ। তুমি এর সঙ্গে যদি ভিন্ন হতে চাও তবে আমার সঙ্গেও ভিন্ন হবে।"[৩৮]

হারানবাবুর সহিত তর্কের সময় গোরা গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—

"সংশোধন! সংশোধন ঢের পরের কথা। সংশোধনের চেয়েও বড়ো কথা ভালোবাসা শ্রদ্ধা। আগে আমরা এক হব তাহলেই সংশোধন ভিতর থেকে আপনিই হবে। আপনারা যে পৃথক হয়ে দেশকে খণ্ড খণ্ড করতে চান— আপনারা বলেন দেশের কুসংস্কার আছে অতএব আমরা সুসংস্কারীর দল আলাদা হয়ে থাকব। আমি এই কথা বলি, আমি কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে কারও থেকে পৃথক হব না এই আমার সকলের চেয়ে বড়ো আকাঙ্ক্ষা— তার পর এক হলে কোন্ সংস্কার থাকবে কোন্ সংস্কার যাবে তা আমার দেশই জানে, এবং দেশের যিনি বিধাতা তিনিই জানেন।··· আমি আপনাকে বলছি সংশোধন করতে যদি আসেন তো আমরা সহ্য করব না, তা আপনারাই হোন বা মিশনারিই হোন।"[৩৯]

ব্রাহ্মগৃহে চা-পানের জন্য গোরা যখন বিনয়কে তীব্র বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষ করিতে লাগিল, এবং বিনয় অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"তবে সত্য কথা বলি ভাই গোরা। এক পেয়ালা চা খেলে সমস্ত দেশকে যদি আঘাত করা হয় তবে সে আঘাতে দেশের উপকার হবে। তার থেকে বাঁচিয়ে চললে দেশটাকে অত্যন্ত দুর্বল, বাবু করে তোলা হবে"— তখন গোরা আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় কণ্ঠে এই বলিয়া প্রত্যুত্তর করিয়াছিল—

"ওগো মশায়, ও-সমস্ত যুক্তি আমি জানি— আমি যে একেবারে অবুঝ তা মনে কোরো না। কিন্তু এ-সমস্ত এখনকার কথা নয়। রুগি ছেলে যখন ওষুধ খেতে চায় না মা তখন সুস্থ শরীরেও নিজে ওষুধ খেয়ে তাকে জানাতে চায় যে তোমার সঙ্গে আমার এক দশা— এটা তো যুক্তির কথা নয়, এটা ভালোবাসার কথা। এই ভালোবাসা না থাকলে যতই যুক্তি থাক্-না ছেলের সঙ্গে মায়ের যোগ নষ্ট হয়। তা হলে কাজও নষ্ট হয়। আমিও চায়ের পেয়ালা নিয়ে তর্ক করি না— কিন্তু দেশের সঙ্গে বিচ্ছেদ আমি সহ্য করতে পারি না— চা না খাওয়া তার চেয়ে ঢের সহজ, পরেশবাবুর মেয়ের মনে কষ্ট দেওয়া তার চেয়ে ঢের ছোটো। সমস্ত দেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মেলাই আমাদের এখনকার অবস্থায় সকলের চেয়ে প্রধান কাজ— যখন মিলন হয়ে যাবে তখন চা খাবে কি না খাবে দু-কথায় সে-তর্কের মীমাংসা হয়ে যাবে।"[৪০]

দেশকে ভালোবাসিবার জন্য দেশবাসীর সহিত একাত্ম হইবার জন্য গোরা যখন আবেগপূর্ণস্বরে সুচরিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—"···আপনার প্রতি আমার এই অনুরোধ, আপনি ভারতবর্ষের ভিতরে আসুন, এর সমস্ত ভালোমন্দের মাঝখানেই নেমে দাঁড়ান,— যদি বিকৃতি থাকে, তবে

ভিতর থেকে সংশোধন করে তুলুন, কিন্তু একে দেখুন, বুঝুন, ভাবুন, এর দিকে মুখ ফেরান, এর সঙ্গে এক হোন— এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, বাইরে থেকে, খ্রীষ্টানি সংস্কারে বাল্যকাল হতে অস্থিমজ্জায় দীক্ষিত হয়ে, একে আপনি বুঝতেই পারবেন না, একে কেবলই আঘাত করতেই থাকবেন, এর কোনো কাজেই লাগবেন না।"[৪১]— তখন তার দেশপ্রেম যে কী গভীর তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

প্রাচীন স্বদেশীয় সভ্যতা, আচার ব্যবহার, শাস্ত্র ও নৈতিক আদর্শের প্রতি দেশবাসীর বিলুপ্ত শ্রদ্ধা পুনরায় উজ্জীবিত করিয়া তুলিবার জন্য ব্রহ্মবান্ধব যেমন একান্ত অধ্যবসায়ে 'সন্ধ্যা' ও 'স্বরাজ' পত্রিকায় স্বদেশের গরিমার বার্তা প্রচার করিতেন, দেশীয় প্রথাসমূহের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচিত করিয়া দিতেন এবং সিংহগর্জনে তাহাদের উদ্দেশে আহ্বান করিয়া বলিতেন—"আর চিন্তাটাকে ছড়িয়ে রেখো না— আত্মস্থ হও! তোমার শত বিক্ষিপ্ত মনটাকে ফিরিয়ে একবার আত্মপ্রতিষ্ঠ হও দেখি, তোমার অমিত বিক্রমে জগৎ কেঁপে উঠবে!"—অনুরূপভাবে গোরাও দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল— 'আত্মানং বিদ্ধি'—আপনাকে জানো, স্বপ্রতিষ্ঠ হও।[৪২] ঐ আত্মোপলব্ধির প্রেরণাবশেই ব্রহ্মবান্ধব দেশের জনসাধারণের মূর্তিপূজা ও সাকার উপাসনার মধ্যে তাহাদের গভীর ভক্তিভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যিনি এককালে ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সভ্য ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে যিনি প্রোটেস্টাণ্ট এবং রোমান ক্যাথলিক— খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের দুইটি প্রধান ধারার সহিত অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি যে সাকার উপাসনার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান যুক্তিগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না, ইহা ধরিয়া লওয়া চলে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বদেশপ্রেমের অনির্বাণ শিখা তাঁহার হৃদয়ে প্রদীপ্ত ছিল বলিয়া হিন্দুর ভক্তিতত্ত্বকে তিনি উপহাসের সামগ্রী রূপে দেখিতে পারেন নাই; তিনি হিন্দুর দেবদেবীর মূর্তিগুলির মধ্যে সৌন্দর্যের সহিত মাধুর্য ও কল্যাণবোধের অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রোমের প্রসিদ্ধ Sistine Chapelএ Madonna বা মাতৃমূর্তি দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে ভারতীয় শিল্পিগণের নির্মিত দেবপ্রতিমার স্মৃতি উদিত হইয়াছে— প্রতিমা নির্মাণে উভয় ধারার তুলনা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন—

> "জগতে যত চিত্র আছে তন্মধ্যে রাফায়েল নামক এক দৈবশক্তিসম্পন্ন চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত মাতৃমূর্তি নাকি সৌন্দর্যে ও ভাবুকতায় শ্রেষ্ঠ। কাথলিক (Catholic) খ্রীষ্টানেরা মাতৃমূর্তির বড় ভক্ত। মাতা মেরী (Mary) বালক যীশুকে কোলে করিয়া দণ্ডায়মানা। ইহাকেই মাতৃমূর্তি (Madonna) বলে।
>
> "চিত্রকর মায়ের বুকে এক অপূর্ব করুণরস ঢালিয়া দিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে বলে যে, মা আগেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্র অকালে নিহত হইবেন। তাই সুতস্পর্শজনিত আনন্দ বিচ্ছেদ-বিষাদে সংমিশ্রিত। মিলনানন্দের ভাগীরথী যেন ভাবী বিরহশোকের কালিন্দীর সহিত মিলিয়া মায়ের চোখের আর্দ্র করুণভাব গড়িয়াছে। এমন মঙ্গলময়ী মূর্তি অতি বিরল। আজকাল য়ুরোপের ছবি আঁকার ঢং বদলাইয়া গেছে। মঙ্গলভাবের লেশমাত্র নাই, কেবল রূপের ছটা ঘটা। উপাস্য মূর্তি সকলেরই এইরূপ দশা ঘটিয়াছে। অধিক সৌন্দর্যবিন্যাসে প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। তজ্জন্য প্রতিমার সৌন্দর্য একটু মঙ্গলভাবের দ্বারা চাপিয়া রাখিতে হয়। আমাদের দেশে এই ভক্তিতত্ত্ব বেশ জানা আছে। এখনও য়ুরোপে অনেক দেবালয়ে প্রতিমাসকল একেবারেই সুশ্রী নয়।

আর ভক্ত বিশ্বাসী কাথলিক খ্রীস্টানেরা প্রাণ গেলেও এই সকল কুরূপ প্রতিমাগুলির পরিবর্তে স্বরূপ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় না…"[৪৩]

সুচরিতার 'আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি পৌত্তলিকতাকেও শ্রদ্ধা করতে পারি? আপনি কি এ-সমস্ত সত্য বলেই বিশ্বাস করেন?'— এই প্রশ্নের উত্তরে গোরা যাহা বলিয়াছিল, তাহাতে প্রতিমা উপাসনা সম্পর্কে ব্রহ্মবান্ধবের উদ্ধৃত মতবাদের সহিত তাহার গভীর সাজাত্য পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। গোরা বলিয়াছিল—

"আমি তোমাকে ঠিক সত্য কথাটা বলবার চেষ্টা করব। আমি গোড়াতেই এগুলিকে সত্য বলে ধরে নিয়েছি। য়ুরোপীয় সংস্কারের সঙ্গে এদের বিরোধ আছে বলেই এবং এদের বিরুদ্ধে কতকগুলি অত্যন্ত সস্তা যুক্তি প্রয়োগ করা যায় বলেই আমি তাড়াতাড়ি এদের জবাব দিয়ে বসি নি। ধর্মসম্বন্ধে আমার নিজের কোনো বিশেষ সাধনা নেই, কিন্তু সাকার পূজা এবং পৌত্তলিকতা যে একই, মূর্তিপূজাতেই যে ভক্তিতত্ত্বের একটি চরম পরিণতি নেই, এ কথা আমি নিতান্ত অভ্যস্তবচনের মতো চোখ বুজে আওড়াতে পারব না। শিল্পে সাহিত্যে, এমন-কি, বিজ্ঞানে ইতিহাসেও মানুষের কল্পনাবৃত্তির স্থান আছে, একমাত্র ধর্মের মধ্যে তার কোনো কাজ নেই এ কথা আমি স্বীকার করব না। ধর্মের মধ্যেই মানুষের সকল বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ। আমাদের দেশের মূর্তিপূজায় জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে কল্পনার সম্মিলন হবার যে চেষ্টা হয়েছে সেটাতে করেই আমাদের দেশের ধর্ম কি মানুষের কাছে অন্য দেশের চেয়ে সম্পূর্ণতর সত্য হয়ে ওঠে নি?"[৪৪]

সুচরিতা যখন পাল্‌টা প্রশ্ন করিয়া বলিল, 'গ্রীসে রোমেও তো মূর্তিপূজা ছিল'— তখন গোরা বলিয়া উঠিল—

"সেখানকার মূর্তিতে মানুষের কল্পনা সৌন্দর্যবোধকে যতটা আশ্রয় করেছিল জ্ঞানভক্তিকে ততটা নয়। আমাদের দেশে কল্পনা, জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে গভীররূপে জড়িত। আমাদের কৃষ্ণরাধাই বল, হরপার্বতীই বল, কেবলমাত্র ঐতিহাসিক পূজার বিষয় নয়, তার মধ্যে মানুষের চিরন্তন তত্ত্বজ্ঞানের রূপ রয়েছে। সেইজন্যেই রামপ্রসাদের, চৈতন্যদেবের ভক্তি এই সমস্ত মূর্তিকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়েছে। ভক্তির এমন একান্ত প্রকাশ গ্রীস-রোমের ইতিহাসে কবে দেখা দিয়েছে?"[৪৫]

স্বদেশের প্রচলিত আচার-ব্যবহার উপাসনা পদ্ধতি প্রভৃতির মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব এই গরিমা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি 'জামাই-ষষ্ঠী', 'রথ-যাত্রা', 'শিব-চতুর্দশী', 'দোল-লীলা', 'স্নান-যাত্রা', প্রভৃতি উৎসবের নিগূঢ় ভাব ও মাহাত্ম্য দেশের জনসাধারণের নিকট অপরূপ আবেগমণ্ডিত ভাষায় ব্যাখ্যা করিবার জন্য তৎপর হইয়াছিলেন। বাংলার সমস্ত পাল-পার্বণের মধ্যেই তিনি অভেদবোধ ফল্গুধারার ন্যায় প্রবহমান দেখিতে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। 'রথ-যাত্রা' প্রবন্ধের উপসংহারে তাই তিনি বলিতেছেন—

"এস আজ রথ দেখিতে যাই। আমাদের ছোট মন, ছোট বুদ্ধি। এস ঐ ছোট রথে বিশ্বরথ আরোপ করি, আর ঐ ছোট জগন্নাথটিকে দেখিয়া বিশ্বনাথের ধ্যান করি। ছোট রথের ঘর্ঘর শব্দ শুনিয়া একবার সংসার-রথ ও কর্মচক্রের কথা ভাবি। এই রথ দেখিয়া যেন বুঝিতে পারি যে যিনি

বিশ্বনিয়ন্তা তিনি এই বিশ্বরথের চালক। প্রেমের চোখে রথ দেখ ও জগন্নাথদেবের দর্শন কর, আর বল—

স্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"[৪৬]

হিন্দুধর্মের পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন সংস্কারকগণকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"হে সংস্কারক— একবার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে হিন্দুর আচার-ব্যবহারগুলি দেখ। অনেক আবর্জনা আছে সত্য— আর আবর্জনা কোথায় বা নাই— কিন্তু দেখিবে হিন্দু আসলে খাঁটি সোনা।"[৪৭]

'স্নান-যাত্রা' প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি সখেদে বলিয়া উঠিয়াছেন—

"হায় বঙ্গদেশ—তোমার স্মৃতিবিভ্রম ঘটিয়াছে। তুমি আজ অভেদ মন্ত্র ভুলিয়া ভেদবাদের খুঁটিনাটিতে মজিয়া গিয়াছে। আজ স্নান-যাত্রার দিনে দেবাদিদেব জগন্নাথের অভেদলীলাবিলাস দেখিয়া তোমার প্রাণ যেন প্রেমে মাতিয়া উঠে।"[৪৮]

যে ব্রহ্মবান্ধব একদিন হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া খ্রীষ্টান হইয়া রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি যে কি কারণে জীবনের প্রান্তদেশে আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিলেন, শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেন, তাহা আজও অনেকের নিকট দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলিয়া বোধ হইলেও, দেশপ্রেমই যে তাঁহাকে এই সংকল্প গ্রহণে প্ররোচিত করিয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ কোথায়? দেশবাসীরা বিধর্মী খ্রীষ্টোপাসকের নিকট স্বধর্মের রহস্য ব্যাখ্যান শুনিতে চায় না, তাঁহাকে Jesuit বলিয়া ব্যঙ্গ করে। তাঁহার দেশপ্রেমকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে—সুতরাং সেই অপবাদ ক্ষালনের জন্য তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিতেও প্রস্তুত। স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত উপাধ্যায়ের প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"…উপাধ্যায়জীর প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে নানা বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। তাঁহার ধর্মান্তর গ্রহণ সংবাদ শুনে রেবাচাঁদ কলকাতায় আসেন। যে রেবাচাঁদকে তিনিই খ্রীষ্টান করেছেন সেই তিনিই পুনরায় হিন্দু হলেন। এ বিষয়ে তাঁর লিখিত উপাধ্যায়ের জীবনী দ্রষ্টব্য। রেবাচাঁদ কলকাতায় মোক্ষদা সামধ্যায়ীকে জিজ্ঞাসা করেন—কোন্ মতে প্রায়শ্চিত্ত হলো। সামধ্যায়ী বলেন—মিতাক্ষরা মতে। এই মতে প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে প্রবেশ করা যায়। রঘুনন্দন মতে তাহা সম্ভব নহে। ৺পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁকে গঙ্গাতীরে মন্ত্র পাঠ করান। উপাধ্যায় মন্ত্র পাঠ করেন—'স্বধর্ম ত্যাগম্।' ইহার পর আমি উপাধ্যায়কে বিডন স্কোয়ারে বক্তৃতা দিতে শুনিয়াছি— 'আমি আবার জন্মাব আবার এই দেশে ফিরবো এবং আবার দেশের কাজ করবো।'… সত্যই তিনি দেশপ্রেমে পাগল হয়েছিলেন।… এক্ষণে কথা হইতেছে তিনি কেন প্রায়শ্চিত্ত করলেন। অনেকেই তাঁর নূতন পরিবর্তনে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর বিষয়ে অনেকে অনেক কথাই বলতেন। বেলুড়মঠের স্বামী ত্রিগুণাতীত আমায় বলেছিলেন— উপাধ্যায় করাচী থাকাকালে ওঁর 'সোফিয়া' কাগজে Vedanta is ditry nasty thing বলেছিলেন। একবার আমার এক পরিচিত ব্যারিস্টার চন্দ্রশেখর সেন পশ্চিম থেকে কলিকাতায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য যুগান্তর অফিসে আসেন।

তিনি বলেছিলেন— দীনেন্দ্র রায় বলেন উপাধ্যায় একটি jesuit, আর ঐ ছোঁড়াগুলো তাঁর তালে তালে নাচছে।

"উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 'সন্ধ্যা'র ম্যানেজার সারদা সেনের মামলার সময় তাঁর উকিল নাকি বলেন: উপাধ্যায় একজন jesuit ছিলেন। আমার বোধ হয় এই সব কারণে তাঁকে প্রায়শ্চিত্তের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তিনি ঘোর জাতীয়তাবাদী ছিলেন।

"দেশের জন্য প্রায়শ্চিত্তে প্রস্তুত। অথচ কেউ কেউ তাঁকে সন্দেহ করে। এই সন্দেহ আমাদের কোন বৈপ্লবিক নেতার মুখেও শুনিয়াছি।..."[৪৯]

'গোরা'-উপন্যাস রচনাকালে উপাধ্যায়ের প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে আবর্তের সৃষ্টি হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে তাহা সুস্পষ্টভাবেই জাগরূক ছিল। তাই কারাবাস হইতে নির্গত গোরার প্রায়শ্চিত্তের সংকল্পে তাহারই প্রতিচ্ছবি যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। গঙ্গার ধারে কাশিপুরের বাগানে গোরার প্রায়শ্চিত্তসভার আয়োজনের বর্ণনা নিম্নরূপ—

"এদিকে প্রায়শ্চিত্তসভার আয়োজন চলিতেছে। এই আয়োজনে গোরা একটু বিশেষ উৎসাহ বোধ করিয়াছে। এই প্রায়শ্চিত্ত কেবল জেলখানার অশুচিতার প্রায়শ্চিত্ত নহে, এই প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সকল দিকেই সম্পূর্ণ নির্মল হইয়া আবার একবার যেন নূতন দেহ লইয়া সে আপনার কর্মক্ষেত্রে নবজন্ম লাভ করিতে চায়। প্রায়শ্চিত্তের বিধান লওয়া হইয়াছে, দিনস্থিরও হইয়া গেছে, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে বিখ্যাত অধ্যাপক পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণপত্র দিবার উদ্‌যোগ চলিতেছে। গোরার দলে ধনী যাহারা ছিল তাহারা টাকাও সংগ্রহ করিয়া তুলিয়াছে, দলের লোকে সকলেই মনে করিতেছে দেশে অনেকদিন পরে একটা কাজের মতো কাজ হইতেছে। অবিনাশ গোপনে আপন সম্প্রদায়ের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছে, সেইদিন সভায় সমস্ত পণ্ডিত দিগকে দিয়া গোরাকে ধান্যদূর্বা ফুলচন্দন প্রভৃতি বিবিধ উপচারে 'হিন্দুধর্ম প্রদীপ' উপাধি দেওয়া হইবে। এই সম্বন্ধে সংস্কৃত কয়েকটি শ্লোক লিখিয়া, তাহার নিম্নে সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নামস্বাক্ষর করাইয়া, সোনার জলের কালিতে ছাপাইয়া, চন্দন-কাষ্ঠের বাক্সের মধ্যে রাখিয়া তাহাকে উপহার দিতে হইবে। সেই সঙ্গে ম্যাক্‌স্‌মূলারের দ্বারা প্রকাশিত একখণ্ড ঋগ্‌বেদ গ্রন্থ বহুমূল্য মরক্কো চামড়ায় বাঁধাইয়া সকলের চেয়ে প্রাচীন ও মান্য অধ্যাপকের হাত দিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষের আশীর্বাদী স্বরূপ দান করা হইবে—ইহাতে আধুনিক ধর্মভ্রষ্টতার দিনে গোরাই যে সনাতন বেদবিহিত ধর্মের যথার্থ রক্ষাকর্তা এই ভাবটি অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইবে।"[৫০]

কিন্তু উপাধ্যায়ের অন্তরের কি বেদনা, স্বদেশপ্রেমের কি সুতীব্র উন্মাদনা যে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের দ্বারা স্বধর্ম-ত্যাগের গ্লানি তাঁহার হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য তাঁহাকে প্রেরণা জোগাইয়াছিল— তাহার সংবাদ কয়জন রাখিত? খ্রীষ্টান মিশনারিরা যেমন একদিকে তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিতে লাগিল, অপরদিকে দেশের সনাতন হিন্দুধর্মের পতাকাবাহীর দল তাঁহার এই প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানকে হিন্দুধর্মের অক্ষয় প্রাণশক্তির নিদর্শনরূপে কল্পনা করিয়া আপন সম্প্রদায়ের জয়পতাকা উড়াইতে লাগিল। কিন্তু যিনি অন্তর্যামী তিনিই শুধু ব্রহ্মবান্ধবের মর্মবেদনা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। গোরাকেও কি তাহার অবিনাশ প্রভৃতি পার্ষদবৃন্দ বুঝিয়াছিল? অবিনাশের দল গোরার প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের সংকল্পের নিজের মনের মত ব্যাখ্যা দাঁড় করাইয়াছে—

"আপনারা কি বুঝতে পারছেন এটা কত বড়ো একটা ব্যাপার হচ্ছে? নইলে গৌরমোহনবাবু কি এমন একটা অনাবশ্যক প্রস্তাব করতেন? এখনকার দিনে হিন্দু সমাজকে নিজের জোর প্রকাশ করতে হবে। এই গৌরমোহনবাবুর প্রায়শ্চিত্তে দেশের লোকের মনে কি একটা কম অন্দোলন হবে? আমরা দেশ বিদেশ থেকে বড়ো বড়ো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সবাইকে নিমন্ত্রণ করে আনব। এতে সমস্ত হিন্দু সমাজের উপরে খুব একটা কাজ হবে। লোকে বুঝতে পারবে এখনো আমরা বেঁচে আছি। বুঝতে পারবে হিন্দু সমাজ মরবার নয়।"[৫১]

কিন্তু গোরার মনের গূঢ় বেদনার কথা কেহ বুঝিল না; গোরার অবসন্নচিত্তে শুধু বারংবার একই প্রশ্ন জাগিতে লাগিল—

"হায়, আমার দেশ কোথায়! দেশ কি কেবল আমার একলার কাছে!···যাহাদিগকে সকলে আমার দলের লোক বলে, এতদিন তাহাদিগকে এত বুঝানোর পরও তাহারা আজ এই স্থির করিল যে আমি কেবল হিঁদুয়ানি উদ্ধার করিবার জন্য অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি! আমি কেবল মূর্তিমান শাস্ত্রের বচন! আর ভারতবর্ষ কোনোখানে স্থান পাইল না! ষড়্‌ঋতু! ভারতবর্ষের ষড়্‌ঋতু আছে! সেই ষড়্‌ঋতুর ষড়যন্ত্রে যদি অবিনাশের মতো এমন ফল ফলিয়া থাকে তবে দুই-চারিটা ঋতু কম থাকিলে ক্ষতি ছিল না।"[৫২]

এইভাবে তুলনা করিয়া দেখিলে গোরার চরিত্র এবং উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ধরা পড়িবে। কিন্তু এই সাদৃশ্যের অন্তস্তলেই রহিয়াছে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য—সেই পার্থক্যের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে ব্রহ্মবান্ধব ও রবীন্দ্রনাথের পরস্পরের মতবাদ ও আদর্শগত পার্থক্য অনুধাবনের চেষ্টা করা প্রয়োজন।

৪

গোরার সহিত বাগ্‌যুদ্ধ প্রসঙ্গে উপন্যাসের একস্থলে বিনয় অসহিষ্ণু ভাবে বলিয়া উঠিয়াছে—

"গোরা, তোমার এবং আমার প্রকৃতির মধ্যে একটা মূলগত প্রভেদ আছে। সেটা এতদিন কোনোমতে চাপা ছিল—যখনই মাথা তুলতে চেয়েছে আমিই তাকে নত করেছি, কেননা আমি জানতুম যেখানে তুমি কোনো পার্থক্য দেখ সেখানে তুমি সন্ধি করতে জান না, একেবারে তলোয়ার হাতে ছুটতে থাক। তাই তোমার বন্ধুত্বকে রক্ষা করতে গিয়ে আমি চিরদিনই নিজের প্রকৃতিকে খর্ব করে এসেছি। আজ বুঝতে পারছি এতে মঙ্গল হয় নি এবং মঙ্গল হতে পারে না।"[৫৩]

এ যেন রবীন্দ্রনাথ বিনয়ের জবানিতে তাঁহার এককালের অতি অন্তরঙ্গ সুহৃদ ব্রহ্মবান্ধবের সহিত তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক প্রভেদই ঘোষণা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়।[৫৪] আমরা দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মবান্ধব উভয়েই একসময়ে সমানভাবে প্রাচীন ভারতের মহিমা কীর্তনে মুখর ছিলেন। ব্রহ্মবান্ধবের মতই রবীন্দ্রনাথও প্রাচীন ভারতের জাতিভেদ প্রথা, বর্ণাশ্রমধর্ম, সাকার উপাসনা প্রভৃতি সব কিছুই স্বীকার করিয়া লইয়া আপাতপ্রতীয়মান অসংখ্য বিভেদের মধ্যেই একটি মৌলিক সুগভীর ঐক্য আবিষ্কারের সাধনায় রত ছিলেন। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থখানির জন্ম রবীন্দ্রনাথের এই মানসিক অবস্থা হইতেই। কিন্তু অতীতের প্রতি তাঁহার এই স্বপ্নালু মনোভাব, হিন্দুভারতের গৌরবকীর্তনের প্রতি এই অতিমাত্রায় প্রবণতা, বাস্তবের সহিত সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিল, ততই লঘু হইতে লাগিল। হারানবাবুর মত ব্রাহ্মসমাজের

উৎসাহী সদস্যগণ প্রাচীনের প্রতি যে মোহকে লক্ষ্য করিয়া 'সেকেলে বায়ুগ্রস্ত' বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেন,[৫৫] রবীন্দ্রনাথের মনেও ক্রমশঃ সেইজাতীয় মোহের প্রতি একটা আন্তরিক বিমুখতার সঞ্চার উত্তরোত্তর স্পষ্ট হইয়া উঠিতে দেখা যায়। এই মোহভঙ্গ ত্বরান্বিত হইয়াছিল যে কয়টি কারণে, তন্মধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে অন্যতম মুখ্য বলিয়া নির্দেশ করা হইলে, নিতান্ত ভুল হইবে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বহু প্রবন্ধ এবং পত্রাবলীতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কিভাবে তাঁহার চিরলালিত প্রাচীন হিন্দুভারতের গৌরবস্বপ্নকে নির্দয় আঘাতে ভাঙিয়া দিয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

"...একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া নিজেরা চুপচাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুব খুশি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানি মাথা তুলিয়া উঠিল। সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিলিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।"[৫৬]

'হিন্দুমুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন—

"যখন বঙ্গবিভাগের সাংঘাতিক প্রস্তাব নিয়ে বাঙালির চিত্ত বিক্ষুব্ধ তখন বাঙালি অগত্যা বয়কট-নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছিল।...বাঙালি মুসলমান সেদিন আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। সেই যুগেই বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানে লজ্জাজনক কুৎসিত কাণ্ডের সূত্রপাত হল।..."[৫৭]

তৎকালীন বাঙালী স্বদেশপ্রেমিকগণের স্বাদেশিকতা যে একটি অবাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, হিন্দুর সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক সাধনার শ্রেষ্ঠত্বখ্যাপনের দ্বারাই যে ভারতবর্ষের লুপ্ত গরিমার পুনরুদ্ধার সম্ভব নয় বা ধর্মমতনির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে জন্মভূমির স্বাধীনতা-কামনায় উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, ইহা রবীন্দ্রনাথের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল। ব্রহ্মবান্ধবের পক্ষেও হিন্দুমুসলমানের এই অনাশংকিতপূর্ব অসহযোগিতার নগ্ন আত্মপ্রকাশ কি অনুরূপ মোহভঙ্গের কারণ হইয়াছিল? মনে তো হয় না। গোরার পল্লীভ্রমণ কিন্তু তাহাকে ভাবলোক হইতে মর্তের মাটিতে টানিয়া নামাইয়া আনিল —সে দেখিতে পাইল হিন্দু সমাজের বাহিরে আর-একটি বৃহৎ সমাজ বর্তমান—তাহা মুসলমান সমাজ এবং একই দেশের মাটিতে বাস করিয়াও যে ইহাদের মধ্যে পরস্পর হৃদয়ের কোনও যোগ নাই—এ কথাও তাহার নিকট অস্পষ্ট রহিল না। শিক্ষিত সমাজের সহিত তর্ক-বিতর্কে হিন্দুসাধনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য সর্ববিধ কুসংস্কারকেও গোরা এক অপরূপ আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করিয়া মহিমান্বিতরূপে উপস্থাপন করিবার জন্য সতত উদ্যোগী ছিল; কিন্তু পল্লীর অশিক্ষিত হিন্দুদের সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়া সে বুঝিতে পারিল হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান কিরূপ নির্জীব; কিভাবে অন্ধ কুসংস্কার হিন্দুর সামাজিক জীবনকে বিনাশের মুখে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। গোরার এই স্বরচিত সুখস্বর্গ হইতে বিদায়ের বর্ণনা অতি করুণ—

"কিন্তু পল্লীর মধ্যে যেখানে বাহিরের শক্তিসংঘাত তেমন করিয়া কাজ করিতেছে না, সেখানকার নিশ্চেষ্টতার মধ্যে গোরা স্বদেশের গভীরতর দুর্বলতার যে-মূর্তি তাহাই একেবারে অনাবৃত দেখিতে পাইল। যে ধর্ম সেবারূপে, প্রেমরূপে, করুণারূপে, আত্মত্যাগরূপে এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধারূপে সকলকে শক্তি দেয়, প্রাণ দেয়, কল্যাণ দেয়, কোথাও তাহাকে দেখা যায় না। যে আচার

কেবল রেখা টানে, ভাগ করে, পীড়া দেয়, যাহা বুদ্ধিকেও কোথাও আমল দিতে চায় না, যাহা প্রীতিকেও দূরে খেদাইয়া রাখে, তাহাই সকলকে চলিতে-ফিরিতে উঠিতে-বসিতে সকল বিষয়েই কেবল বাধা দিতে থাকে। পল্লীর মধ্যে এই মূঢ় বাধ্যতার অনিষ্টকর কুফল এত স্পষ্ট করিয়া এত নানারকমে গোরার চোখে পড়িতে লাগিল, তাহা মানুষের স্বাস্থ্যকে জ্ঞানকে ধর্মবুদ্ধিকে কর্মকে এত দিকে এত প্রকারে আক্রমণ করিয়াছে দেখিতে পাইল যে নিজেকে ভাবুকতার ইন্দ্রজালে ভুলাইয়া রাখা গোরার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।"[৫৮]

এইভাবে একদিকে হিন্দুসমাজের দুর্বলতা ও হীনতা যেমন তাহার নিকট প্রকট হইয়া উঠিল, অন্যদিকে অবহেলিত মুসলমান সমাজের সজীবতা ও মুসলমানধর্মের প্রাণশক্তির রহস্যও তাহার নিকট ঢাকা রহিল না—

"পল্লীর মধ্যে বিচরণ করিয়া গোরা ইহাও দেখিয়াছে, মুসলমানদের মধ্যে সেই জিনিসটি আছে যাহা অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে এক করিয়া দাঁড় করানো যায়। গোরা লক্ষ করিয়া দেখিয়াছে গ্রামে কোনো আপদ বিপদ হইলে মুসলমানেরা যেমন নিবিড়ভাবে পরস্পরের পার্শ্বে আসিয়া সমবেত হয় হিন্দুরা এমন হয় না। গোরা বারবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে এই দুই নিকটতম প্রতিবেশী সমাজের মধ্যে এত বড়ো প্রভেদ কেন হইল। যে উত্তরটি তাহার মনে উদিত হয় সে উত্তরটি কিছুতেই তাহার মানিতে ইচ্ছা হয় না। এ কথা স্বীকার করিতে তাহার সমস্ত হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিতে লাগিল যে, ধর্মের দ্বারা মুসলমান এক, কেবল আচারের দ্বারা নহে।"[৫৯]

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের পুরোধাগণের— যাঁহাদের মধ্যে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব শীর্ষস্থানীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না— স্বদেশ সাধনায় এই অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের নিকট সহজেই ধরা পড়িয়া গেল। তাই গোরার চরিত্রেও তাহার প্রতিফলন যে ঘটিয়াছে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

রবীন্দ্রনাথের সহিত ব্রহ্মবান্ধবের মতবৈষম্যের আর-একটি প্রধান কারণ মনে হয় বাংলা তথা ভারতের সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সংস্কার সাধনে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা বিষয়ে তাঁহাদের বিপরীত মনোভাব। ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার প্রথম জীবনে যে ব্রাহ্মসমাজের একজন উৎসাহী সদস্য ও কেশবচন্দ্রের অনুরাগী শিষ্য ছিলেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার চিত্ত যে বিমুখ হইয়া উঠিল ইহার কারণ তৎকালীন ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দের অত্যধিক পাশ্চাত্ত্যপ্রীতি— উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব যাহাকে 'খ্রীষ্টানি' বা 'ফিরিঙ্গিয়ানা' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। গোরাও সুচরিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—

"আমি কেবল বলি আপনাকে এই কথাটা বুঝে দেখতে হবে যে হিন্দুধর্ম মায়ের মতো নানা ভাবের নানা মতের লোককে কোল দেবার চেষ্টা করেছে; অর্থাৎ কেবল হিন্দুধর্মই জগতে মানুষকে মানুষ বলেই স্বীকার করেছে, দলের লোক বলে গণ্য করে নি। হিন্দুধর্ম মূঢ়কেও মানে, জ্ঞানীকেও মানে; এবং কেবলমাত্র জ্ঞানের এক মূর্তিকেই মানে না, জ্ঞানের বহু প্রকার বিকাশকে মানে। খ্রীষ্টানরা বৈচিত্র্যকে স্বীকার করতে চায় না; তারা বলে একপারে খ্রীষ্টানধর্ম আর একপারে অনন্ত বিনাশ। এর মাঝখানে কোনো বিচিত্রতা নেই। আমরা সেই খ্রীষ্টানের কাছ থেকেই পাঠ নিয়েছি। তাই হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্যের জন্যে লজ্জা পাই। এই বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই হিন্দুধর্ম যে একেকে দেখবার সাধনা করছে সেটা আমরা দেখতে পাই নে। এই খ্রীষ্টানি শিক্ষার পাক মনের চারি দিক

থেকে খুলে ফেলে মুক্তিলাভ না করলে আমরা হিন্দুধর্মের সত্য পরিচয় পেয়ে গৌরবের অধিকারী হব না।"[৬০]

তখনকার দিনে অধিকাংশ ব্রাহ্ম পরিবারেই যে রামায়ণ-মহাভারত-ভগবদ্গীতা অপেক্ষা বাইব্‌ল্-এর সমাদর বেশি ছিল উপন্যাসের মধ্যেই এ বিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য আছে— এবং তাহা রবীন্দ্রনাথের নিজেরই, কোনও পাত্র-পাত্রীর নহে—

"সে সময়ে বাংলাদেশে ইংরেজিশিক্ষিত দলের মধ্যে ভগবদ্গীতা লইয়া আলোচনা ছিল না। কিন্তু পরেশবাবু সুচরিতাকে লইয়া মাঝে মাঝে গীতা পড়িতেন— কালীসিংহের মহাভারতও তিনি প্রায় সমস্তটা সুচরিতাকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। হারানবাবুর কাছে তাহা ভালো লাগে নাই। এ-সমস্ত গ্রন্থ তিনি ব্রাহ্মপরিবার হইতে নির্বাসিত করিবার পক্ষপাতী। তিনি নিজেও এগুলি পড়েন নাই। রামায়ণ-মহাভারত-ভগবদ্গীতাকে তিনি হিন্দুদের সামগ্রী বলিয়া স্বতন্ত্র রাখিতে চাহিতেন। ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বাইব্‌লই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। পরেশবাবু যে তাঁহার শাস্ত্রচর্চা এবং ছোটোখাটো নানা বিষয়ে ব্রাহ্ম-অব্রাহ্মের সীমা রক্ষা করিয়া চলিতেন না, তাহাতে হারানের গায়ে যেন কাঁটা বিঁধিত।..."[৬১]

ইংরেজিশিক্ষিত ব্রাহ্মগণের ধর্মপিপাসা মিটাইত 'খ্রীষ্টের অনুকরণ' *(Imitation of Christ)* বা এমার্সন অথবা থিওডোর পার্কারের রচনাবলী।[৬২] ব্রাহ্মপরিবারের ড্রইংরুমে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ছবির সহিত যিশুখ্রীষ্টের ছবি শোভা পাইত— পরেশবাবুর বসিবার ঘরের বর্ণনায় তাহার প্রমাণ আছে।[৬৩] সুতরাং ব্রহ্মবান্ধব যে কিজন্য ব্রাহ্ম সংস্কারকগণকে 'ফেরঙ্গ ভাবাপন্ন' সর্বনাশী সংস্কারক বলিয়া মনে করিতেন, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ইঁহাদের দ্বারা দেশোদ্ধার বা দেশের লুপ্ত গরিমার পুনরুজ্জীবন অসম্ভব— ইহাই ছিল ব্রহ্মবান্ধবের সুদৃঢ় বিশ্বাস। ব্রাহ্মসংস্কারগণের প্রতি উপাধ্যায়ের তীব্র শ্লেষ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"জানা গিয়াছে যে, আমাদের উদার সমন্বয়বাদী ভ্রাতৃগণ ওঁকার— ববম্‌বম্— বালেলুয়া— আমেন সংমিশ্রিত একটা মন্ত্র প্রস্তুত করিতে ব্রতী হইয়াছেন— যাহার প্রভাবে স্বদেশ-নৌকাটি সহজেই ভবনদী উত্তীর্ণ হইবে। এই মন্ত্র-প্রণেতারাই প্রতিষ্ঠাবিহীন সর্বনাশী সংস্কারক।"[৬৪]

রবীন্দ্রনাথও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াও সমাজের যে সবিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন না, তাহা আমরা জানি। তিনি ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন বিবর্তনকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতে পারেন নাই ; ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ সংকীর্ণতা, কুসংস্কার এবং দলগত স্বার্থের প্রতি অতিরিক্ত পরিমাণে সজাগ দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করিত।[৬৫] তিনি বহু প্রবন্ধে ব্রাহ্মগণের হিন্দুবিদ্বেষ এবং হিন্দুসমাজ হইতে আপন সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার মনোভাবের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন— ইহার জন্য সমাজের নেতৃবর্গের হস্তে তাঁহাকে লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে— রবীন্দ্রজীবনী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সে ইতিহাস অজ্ঞাত নহে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রতি উপাধ্যায়ের বিরূপতা এবং রবীন্দ্রনাথের বিমুখতা একজাতীয় নহে। রবীন্দ্রনাথও যে ব্রাহ্মসমাজের অতিরিক্ত পরিমাণে পাশ্চাত্যপ্রীতি এবং খ্রীষ্টধর্মানুরাগ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, তাহা নহে,[৬৬] কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্রাহ্মআন্দোলনের যে একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে এবং তাহা যে হিন্দুধর্মেরই উদার পরিণতি হিন্দুধর্মের মূল কাণ্ড হইতেই যে তাহা আপন প্রাণরস আহরণ করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং ভবিষ্যতে হিন্দুধর্মের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বন্ধ থাকিয়াই তাহা জাতীয় জীবনে আপন স্থান

কেবল রেখা টানে, ভাগ করে, পীড়া দেয়, যাহা বুদ্ধিকেও কোথাও আমল দিতে চায় না, যাহা প্রীতিকেও দূরে খেদাইয়া রাখে, তাহাই সকলকে চলিতে-ফিরিতে উঠিতে-বসিতে সকল বিষয়েই কেবল বাধা দিতে থাকে। পল্লীর মধ্যে এই মূঢ় বাধ্যতার অনিষ্টকর কুফল এত স্পষ্ট করিয়া এত নানারকমে গোরার চোখে পড়িতে লাগিল, তাহা মানুষের স্বাস্থ্যকে জ্ঞানকে ধর্মবুদ্ধিকে কর্মকে এত দিকে এত প্রকারে আক্রমণ করিয়াছে দেখিতে পাইল যে নিজেকে ভাবুকতার ইন্দ্রজালে ভুলাইয়া রাখা গোরার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।"[৫৮]

এইভাবে একদিকে হিন্দুসমাজের দুর্বলতা ও হীনতা যেমন তাহার নিকট প্রকট হইয়া উঠিল, অন্যদিকে অবহেলিত মুসলমান সমাজের সজীবতা ও মুসলমানধর্মের প্রাণশক্তির রহস্যও তাহার নিকট ঢাকা রহিল না—

"পল্লীর মধ্যে বিচরণ করিয়া গোরা ইহাও দেখিয়াছে, মুসলমানদের মধ্যে সেই জিনিসটি আছে যাহা অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে এক করিয়া দাঁড় করানো যায়। গোরা লক্ষ করিয়া দেখিয়াছে গ্রামে কোনো আপদ বিপদ হইলে মুসলমানেরা যেমন নিবিড়ভাবে পরস্পরের পার্শ্বে আসিয়া সমবেত হয় হিন্দুরা এমন হয় না। গোরা বারবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে এই দুই নিকটতম প্রতিবেশী সমাজের মধ্যে এত বড়ো প্রভেদ কেন হইল। যে উত্তরটি তাহার মনে উদিত হয় সে উত্তরটি কিছুতেই তাহার মানিতে ইচ্ছা হয় না। এ কথা স্বীকার করিতে তাহার সমস্ত হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিতে লাগিল যে, ধর্মের দ্বারা মুসলমান এক, কেবল আচারের দ্বারা নহে।"[৫৯]

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের পুরোধাগণের— যাঁহাদের মধ্যে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব শীর্ষস্থানীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না— স্বদেশ সাধনায় এই অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের নিকট সহজেই ধরা পড়িয়া গেল। তাই গোরার চরিত্রেও তাহার প্রতিফলন যে ঘটিয়াছে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

রবীন্দ্রনাথের সহিত ব্রহ্মবান্ধবের মতবৈষম্যের আর-একটি প্রধান কারণ মনে হয় বাংলা তথা ভারতের সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সংস্কার সাধনে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা বিষয়ে তাঁহাদের বিপরীত মনোভাব। ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার প্রথম জীবনে যে ব্রাহ্মসমাজের একজন উৎসাহী সদস্য ও কেশবচন্দ্রের অনুরাগী শিষ্য ছিলেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার চিত্ত যে বিমুখ হইয়া উঠিল ইহার কারণ তৎকালীন ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দের অত্যধিক পাশ্চাত্ত্যপ্রীতি— উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব যাহাকে 'খ্রীষ্টানি' বা 'ফিরিঙ্গিয়ানা' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। গোরাও সুচরিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—

"আমি কেবল বলি আপনাকে এই কথাটা বুঝে দেখতে হবে যে হিন্দুধর্ম মায়ের মতো নানা ভাবের নানা মতের লোককে কোল দেবার চেষ্টা করেছে; অর্থাৎ কেবল হিন্দুধর্মই জগতে মানুষকে মানুষ বলেই স্বীকার করেছে, দলের লোক বলে গণ্য করে নি। হিন্দুধর্ম মূঢ়কেও মানে, জ্ঞানীকেও মানে; এবং কেবলমাত্র জ্ঞানের এক মূর্তিকেই মানে না, জ্ঞানের বহু প্রকার বিকাশকে মানে। খ্রীষ্টানরা বৈচিত্র্যকে স্বীকার করতে চায় না; তারা বলে একপারে খ্রীষ্টানধর্ম আর একপারে অনন্ত বিনাশ। এর মাঝখানে কোনো বিচিত্রতা নেই। আমরা সেই খ্রীষ্টানের কাছ থেকেই পাঠ নিয়েছি। তাই হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্যের জন্যে লজ্জা পাই। এই বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই হিন্দুধর্ম যে এককে দেখবার সাধনা করছে সেটা আমরা দেখতে পাই নে। এই খ্রীষ্টানি শিক্ষার পাক মনের চারি দিক

থেকে খুলে ফেলে মুক্তিলাভ না করলে আমরা হিন্দুধর্মের সত্য পরিচয় পেয়ে গৌরবের অধিকারী হব না।"[৬০]

তখনকার দিনে অধিকাংশ ব্রাহ্ম পরিবারেই যে রামায়ণ-মহাভারত-ভগবদ্গীতা অপেক্ষা বাইব্‌ল্-এর সমাদর বেশি ছিল উপন্যাসের মধ্যেই এ বিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য আছে— এবং তাহা রবীন্দ্রনাথের নিজেরই, কোনও পাত্র-পাত্রীর নহে—

"সে সময়ে বাংলাদেশে ইংরেজিশিক্ষিত দলের মধ্যে ভগবদ্গীতা লইয়া আলোচনা ছিল না। কিন্তু পরেশবাবু সুচরিতাকে লইয়া মাঝে মাঝে গীতা পড়িতেন— কালীসিংহের মহাভারতও তিনি প্রায় সমস্তটা সুচরিতাকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। হারানবাবুর কাছে তাহা ভালো লাগে নাই। এ-সমস্ত গ্রন্থ তিনি ব্রাহ্মপরিবার হইতে নির্বাসিত করিবার পক্ষপাতী। তিনি নিজেও এগুলি পড়েন নাই। রামায়ণ-মহাভারত-ভগবদ্গীতাকে তিনি হিন্দুদের সামগ্রী বলিয়া স্বতন্ত্র রাখিতে চাহিতেন। ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বাইব্‌লই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। পরেশবাবু যে তাঁহার শাস্ত্রচর্চা এবং ছোটোখাটো নানা বিষয়ে ব্রাহ্ম-অব্রাহ্মের সীমা রক্ষা করিয়া চলিতেন না, তাহাতে হারানের গায়ে যেন কাঁটা বিঁধিত।..."[৬১]

ইংরেজিশিক্ষিত ব্রাহ্মগণের ধর্মপিপাসা মিটাইত 'খ্রীষ্টের অনুকরণ' (*Imitation of Christ*) বা এমার্সন অথবা থিওডোর পার্কারের রচনাবলী।[৬২] ব্রাহ্মপরিবারের ড্রইংরুমে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ছবির সহিত যিশুখ্রীষ্টের ছবি শোভা পাইত— পরেশবাবুর বসিবার ঘরের বর্ণনায় তাহার প্রমাণ আছে।[৬৩] সুতরাং ব্রহ্মবান্ধব যে কিজন্য ব্রাহ্ম সংস্কারকগণকে 'ফেরঙ্গ ভাবাপন্ন' সর্বনাশী সংস্কারক বলিয়া মনে করিতেন, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ইঁহাদের দ্বারা দেশোদ্ধার বা দেশের লুপ্ত গরিমার পুনরুজ্জীবন অসম্ভব— ইহাই ছিল ব্রহ্মবান্ধবের সুদৃঢ় বিশ্বাস। ব্রাহ্মসংস্কারগণের প্রতি উপাধ্যায়ের তীব্র শ্লেষ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"জানা গিয়াছে যে, আমাদের উদার সমন্বয়বাদী ভ্রাতৃগণ ওঁকার— ববম্‌বম্— বালেলুয়া— আমেন সংমিশ্রিত একটা মন্ত্র প্রস্তুত করিতে ব্রতী হইয়াছেন— যাহার প্রভাবে স্বদেশ-নৌকাটি সহজেই ভবনদী উত্তীর্ণ হইবে। এই মন্ত্র-প্রণেতারাই প্রতিষ্ঠাবিহীন সর্বনাশী সংস্কারক।"[৬৪]

রবীন্দ্রনাথও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াও সমাজের যে সবিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন না, তাহা আমরা জানি। তিনি ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন বিবর্তনকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতে পারেন নাই ; ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ সংকীর্ণতা, কুসংস্কার এবং দলগত স্বার্থের প্রতি অতিরিক্ত পরিমাণে সজাগ দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করিত।[৬৫] তিনি বহু প্রবন্ধে ব্রাহ্মগণের হিন্দুবিদ্বেষ এবং হিন্দুসমাজ হইতে আপন সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার মনোভাবের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন— ইহার জন্য সমাজের নেতৃবর্গের হস্তে তাঁহাকে লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে— রবীন্দ্রজীবনী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সে ইতিহাস অজ্ঞাত নহে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রতি উপাধ্যায়ের বিরূপতা এবং রবীন্দ্রনাথের বিমুখতা একজাতীয় নহে। রবীন্দ্রনাথও যে ব্রাহ্মসমাজের অতিরিক্ত পরিমাণে পাশ্চাত্যপ্রীতি এবং খ্রীষ্টধর্মানুরাগ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, তাহা নহে,[৬৬] কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্রাহ্মআন্দোলনের যে একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে এবং তাহা যে হিন্দুধর্মেরই উদার পরিণতি হিন্দুধর্মের মূল কাণ্ড হইতেই যে তাহা আপন প্রাণরস আহরণ করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং ভবিষ্যতে হিন্দুধর্মের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ থাকিয়াই তাহা জাতীয় জীবনে আপন স্থান

চিহ্নিত করিয়া লইতে পারিবে— অন্যথা নহে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু প্রবন্ধে এই মতবাদ অতিস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কোনও আন্তরিক বিদ্বেষভাব ছিল না; ইহা অনেকটা আত্মসমালোচনা—অতএব সমবেদনাপূর্ণ। 'আত্মপরিচয়' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"…ব্রাহ্মধর্ম আপাতত আমার ধর্ম হইতে পারে। কিন্তু কাল আমি প্রটেস্টাণ্ট পরশু রোম্যান ক্যাথলিক এবং তাহার পরদিনে আমি বৈষ্ণব হইতে পারি, তাহাতে কোনো বাধা নাই। অতএব সে পরিচয় আমার সাময়িক পরিচয়,— কিন্তু জাতির দিক দিয়া আমি অতীতের ইতিহাসে এক জায়গায় বাঁধা পড়িয়াছি, সেই সুবৃহৎকালব্যাপী সত্যকে নড়াইতে পারি এমন সাধ্য আমার নাই।"[৬৭]

রবীন্দ্রনাথের মতে 'ব্রাহ্ম' একটি স্বতন্ত্র সমাজ নহে, উহা একটি সম্প্রদায় মাত্র এবং বৃহৎ হিন্দু সমাজেরই উহা একটি শাখা বা অঙ্গ। সুতরাং হিন্দুর সহিত ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের বিচ্ছেদ ঐতিহাসিক দিক্ দিয়া অসম্ভব এবং অবাস্তব—

"না, উহা স্বতন্ত্র সমাজ নহে উহা সম্প্রদায় মাত্র। পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের স্থান সম্প্রদায় জুড়িতে পারে না। আমি হিন্দু সমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি— ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কি করিয়া? সে সমাজের ইতিহাস তো আমার নহে। গাছের ফল এক ঝাঁকা হইতে অন্য ঝাঁকায় যাইতে পারে কিন্তু এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ফলিবে কি করিয়া?"[৬৮]

রবীন্দ্রনাথের মতে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াও হিন্দু থাকায় কোনও বাধা নাই, এমন কি হিন্দুর পক্ষে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াও হিন্দুত্ব বজায় রাখা অসম্ভব নয়। তিনি বলিতেছেন—

"তবে কি মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই। হিন্দুসমাজের লোকেরা কী বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুয্যে মশায় হিন্দু খ্রীষ্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু খ্রীষ্টান ছিলেন, তাঁহারও পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু খ্রীষ্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টান তাঁহাদের রং এবং হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজেদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দু মুসলমান।…"[৬৯]

কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব বর্ণাশ্রম ধর্ম ও জাতিভেদ প্রথার প্রতি যে আনুগত্যকে হিন্দুত্বের প্রধান লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিতেন, রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্বের কল্পনার সহিত তাহার কোনো মিল ছিল না। ক্রমশঃই রবীন্দ্রনাথের চিত্ত মানুষের পরিকল্পিত বিধিনিষেধ, সমাজব্যবস্থা, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতির কৃত্রিম গণ্ডী— যাহা-কিছুই মানুষের পরস্পর মিলনের পথে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, 'মানবধর্ম' হইতে বিচ্যুত করিয়া তাহাকে হীন সংকীর্ণতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করে,— সে-সকলের প্রতিই বিরূপ হইয়া উঠিতেছিল। ব্রাহ্ম-আন্দোলনকে তিনি এই সমস্ত ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন— এবং তিনি নিজেও ক্রমশঃ সর্ববিধ সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া বিশ্বমানবতার সাধনায় নিরত হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিতেছিলেন।

'গোরা' উপন্যাসে আনন্দময়ী ও পরেশবাবুর চরিত্রে সেই সাধনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই আনন্দময়ী যখন বিনয়কে উদ্দেশ করিয়া বলেন—

"বাবা, ব্রাহ্মই বা কে আর হিন্দুই বা কে। মানুষের হৃদয়ের তো কোনো জাত নেই— সেইখানেই ভগবান সকলকে মেশান এবং নিজে এসেও মেশেন।"[৭০]

কিংবা পরেশবাবু যখন ললিতাকে সান্ত্বনা দেন— "ব্রাহ্মসমাজই বা কি আর হিন্দুসমাজই কি। তিনি দেখছেন মানুষকে।"[৭১] —তখন রবীন্দ্রনাথের নিজের অভীপ্সাই তাঁহাদের কণ্ঠে ব্যক্ত হইতেছে, দেখিতে পাই।

বিনয় যখন পরেশবাবুর নিকট ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করিতে গিয়া নিজের অন্তরের দ্বন্দ্ব এইভাবে প্রকাশ করে—

"আপনাকে সত্য কথা বলি, আগে মনে করতুম আমার বুঝি কিছু ধর্মবিশ্বাস আছে; তা নিয়ে অনেক লোকের সঙ্গে অনেক ঝগড়াও করেছি। কিন্তু আজ আমি নিশ্চয় জেনেছি ধর্মবিশ্বাস আমার জীবনের মধ্যে পরিণতি লাভ করে নি। এটুকু যে বুঝেছি সে আপনাকে দেখে। ধর্মে আমার জীবনের কোনো সত্য প্রয়োজন ঘটে নি এবং তার প্রতি আমার সত্যবিশ্বাস জন্মে নি বলেই আমি কল্পনা এবং যুক্তি কৌশল দিয়ে এতদিন আমাদের সমাজের প্রকাশিত ধর্মকে নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাদ্বারা কেবলমাত্র তর্কনৈপুণ্যে পরিণত করেছি। কোন্ ধর্ম যে সত্য তা ভাববার আমার কোনো দরকারই হয় না; যে ধর্মকে সত্য বললে আমার জিত হয় আমি তাকেই সত্য বলে প্রমাণ করে বেড়িয়েছি। যতই প্রমাণ করা শক্ত হয়েছে ততই প্রমাণ করে অহংকার বোধ করেছি। কোনোদিন আমার মনে ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ সত্য ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে কি না তা আজও আমি বলতে পারি নে কিন্তু অনুকূল অবস্থা এবং দৃষ্টান্তের মধ্যে পড়লে সেদিকে আমার অগ্রসর হবার সম্ভাবনা আছে এ কথা নিশ্চিত। অন্তত যে জিনিস ভিতরে ভিতরে আমার বুদ্ধিকে পীড়িত করে চিরজীবন তারই জয়পতাকা বহন করে বেড়াবার হীনতা থেকে উদ্ধার পাব।"

তখন মনুষ্যবুদ্ধি পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মের গণ্ডী হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া বৃহত্তর মানবধর্মে উত্তীর্ণ হইবার জন্য রবীন্দ্রনাথের আপন হৃদয়ের আকুল আবেদনই যেন ধ্বনিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব যে হিন্দুধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার মূলে শুধুই হিন্দুর আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক চিন্তারাজ্যে অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ববোধই নিহিত ছিল না, উহা তাঁহার স্বদেশপ্রীতির এবং স্বদেশের মুক্তিসাধনার প্রধান অঙ্গও ছিল।[৭২] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে ধর্মসম্বন্ধে ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে বিবর্তিত হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের মতে ধর্মের সহিত কোনও সাময়িক প্রয়োজন, কোনও জাতীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রশ্ন— তাহা যতই গুরুতর হউক না কেন, জড়িত থাকিতে পারে না— 'ধর্মেই ধর্মের শেষ'।[৭৩] সুতরাং হিন্দু এবং ব্রাহ্ম— কোনও সমাজই যে রবীন্দ্রনাথকে কিজন্য ঠিক আপনার জন বলিয়া ভাবিতে পারে নাই, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ধর্মের সহিত রাজনৈতিক আন্দোলনকে জড়িত করিবার যে প্রয়াস ব্রহ্মবান্ধব প্রমুখ নেতৃবৃন্দের জীবনে লক্ষিত হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রতিই কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"...দেশের যে আত্মাভিমানে আমাদের শক্তিকে সম্মুখের দিকে ঠেলা দিতেছে তাকে বলি সাধু,

কিন্তু যে আত্মাভিমানে পিছনের দিকের অচল খোঁটায় আমাদের বলির পাঁঠার মতো বাঁধিতে চায় তাকে বলি ধিক! এই আত্মাভিমানে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বলিতেছি, রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্তৃত্ব সভায় আমাদের আসন পাতা চাই; আবার সেই অভিমানেই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁকিয়া বলিতেছি 'খবরদার! ধর্মতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, এমন-কি ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্তার হুকুম ছাড়া এক পা চলিবে না'—ইহাকেই বলি হিন্দুয়ানির পুনরুজ্জীবন। দেশাভিমানের তরফ হইতে আমাদের উপর হুকুম আসিল, আমাদের এক চোখ জাগিবে, আর এক চোখ ঘুমাইবে। এমন হুকুম তামিল করাই দায়।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথের সহিত ব্রহ্মবান্ধবের মতবৈষম্যের আর একটি সম্ভাব্য হেতুর প্রতি ইঙ্গিত করিতে চাই—যদিও গোরার চরিত্র পরিকল্পনায় ইহার সাক্ষাৎ কোনও কার্যকারিতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মবান্ধব প্রথম জীবনে বেদান্ত বা উপনিষৎ প্রতিপাদ্য অদ্বৈতবাদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিতেন বটে, তথাপি উত্তর জীবনে বেদান্ত দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মায়াবাদই যে হিন্দুর দার্শনিক মনীষার চরম বিকাশ—ইহা স্বদেশে এবং বিদেশে নির্ভীকভাবে প্রচার করেন। এই বেদান্তকেও তিনি শুধুই মোক্ষশাস্ত্ররূপে না দেখিয়া স্বরাজলাভের একমাত্র সোপান বলিয়াও মনে করিতেন—

"স্বরাট কথাটা বেদান্তের কথা। বেদান্ত হিন্দুর মুক্তির শাস্ত্র। জীবের মুক্তির অবস্থাকে বেদান্তে স্বরাট বলে। বেদান্তের প্রচার যখন এদেশে হয়, তখন আমাদের স্বরাজ ছিল।

"যে জ্ঞানে ঈশ্বরের সহিত অভেদাত্ম অনুভূতি সিদ্ধ করে, যাহাতে জীবের ক্ষুদ্রত্বকে মহতো মহীয়ান করিবার সামর্থ্য দান করে। তাহাতেই আমাদের ফিরিঙ্গী জয়ের সামর্থ্য দান করিবে।"[১৫]

"বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অদ্বৈতজ্ঞান হিন্দুর একমাত্র অবলম্বন ও চিরসহায়। হিন্দুর যোগদর্শন স্মৃতি-সাহিত্য বিধি-ব্যবস্থা আচার-ব্যবহার সংস্কার অদ্বৈতামৃতরসে পরিপুষ্ট। অদ্বৈতমুখীন নিষ্কামধর্ম-পালনে হিন্দু রক্ষিত ও বর্ধিত হইয়াছে।..."[১৬]

ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন শঙ্কর-প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদেরই সমর্থক—তাঁহার মতে এই ব্যাবহারিক দ্বৈত-প্রপঞ্চ অবিদ্যাকল্পিত রজ্জুসর্প বা শুক্তিকারজতের ন্যায়ই মিথ্যা, ভ্রমমাত্র; এবং এই অদ্বৈতবাদের নিগূঢ় রহস্য শুধু সন্ন্যাস-পরম্পরাক্রমেই প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং সন্ন্যাসীর পক্ষেই অদ্বৈততত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব—

"...বেদান্তের মহাবাক্য—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ও যেমন রজ্জু ভ্রমবশত সর্পরূপে প্রতিভাত হয় তেমনিই ব্রহ্মই অবিদ্যাপ্রভাবে দ্বৈত-প্রপঞ্চরূপে প্রতিভাত—এই সার কথা কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বুঝিয়াছেন কিনা—সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ। যে সন্ন্যাস-পারম্পর্য ধরিয়া এই অদ্বৈতজ্ঞান চলিয়া আসিতেছে তাহার সঙ্গ না করিলে বেদান্ত-বোধ সুদুর্লভ।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথও বেদান্ত বা উপনিষদ্‌কে মানবের মোহমুক্তির অব্যর্থ উপায় বলিয়া মনে করিতেন। তিনিও উপনিষদের অদ্বৈততত্ত্বের মধ্যেই যে সর্বমানবের এবং সর্বদেশের—শুধুই ভারতবর্ষের নহে—মুক্তির রহস্য নিহিত আছে, তাহা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতেন।[১৮] কিন্তু এই অদ্বৈততত্ত্ব শঙ্কর-মতানুগত নহে, ইহা মায়াবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা জগৎকে রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয় না, কিংবা মানুষকে সুখদুঃখ-সমাকীর্ণ সংসারাশ্রম ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাসাশ্রম বরণ করিবার জন্য প্রেরণা দান

করে না। ইহার শিক্ষা বৈরাগ্য নহে, কিন্তু সর্বমানবের মধ্যে আত্মীয়তাবোধের উন্মেষই ইহার লক্ষ্য। কোনও একটি বিশেষ দেশ, বা বিশেষ কোনও একটি জাতি অন্য সমস্ত দেশ বা জাতিকে পদানত করিয়া আপন শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করুক— ঔপনিষদ অদ্বৈতবাদের তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথের মতে এইরূপ নহে। এই প্রসঙ্গে 'শিক্ষার মিলন' নামক প্রবন্ধ হইতে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

"স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা, কালকের দিনের ইতিহাস সর্বজাতির সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে। যে-সকল রিপু, যে-সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচারপদ্ধতি এর প্রতিকূল তা আগামীকালের জন্যে আমাদের অযোগ্য ক'রে তুলবে। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে, সেই বুদ্ধি যেন কখনো আমাকে এ কথা না ভোলায় যে, একদিন আমার দেশের সাধকেরা যে মন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্ছে ভেদবুদ্ধি দূর করার মন্ত্র। শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ওপারে মানুষ আজ আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে, 'আমাদের কোন্ শিক্ষা, কোন্ চিন্তা, কোন্ কর্মের মধ্যে মোহ প্রচ্ছন্ন হয়েছিল, যার জন্যে আমাদের আজ এমন নিদারুণ শোক?' তার উত্তর আমাদের দেশ থেকেই দেশে দেশান্তরে পৌঁছুক যে, মানুষের একত্বকে তোমার সাধনা থেকে দূরে রেখেছিলে, সেইটেই মোহ, এবং তার থেকেই শোক।'

'যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি অত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

আমরা শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ওপারে মানুষ ব্যাকুল হয়ে বলছে, 'শান্তি চাই।' এই কথা তাদের জানাতে হবে, শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, সেখানেই যেখানে ঐক্য। এইজন্য পিতামহেরা বলেছেন: শান্তং শিবমদ্বৈতং। অদ্বৈতই শান্ত, কেননা অদ্বৈতই শিব। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে। সেইজন্য এই সম্ভাবনার কল্পনাতেও আমার লজ্জা হয় যে, অতীত যুগের যে-আবর্জনাভার সরিয়ে ফেলবার জন্যে আজ রুদ্রদেবতার হুকুম এসে পৌঁচেছে এবং পশ্চিমদেশ সেই হুকুমে জাগতে শুরু করেছে, আমরা পাছে স্বদেশে এই আবর্জনার পীঠ স্থাপন ক'রে আজ যুগান্তরের প্রত্যুষেও তামসী পূজাবিধি দ্বারা তার অর্চনা করবার আয়োজন করতে থাকি। যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি সর্বজাতিক মানবের পরমাশ্রয় অদ্বৈত, তাঁরই ধ্যানমন্ত্র কি আমাদের ঘরে নেই? সেই ধ্যানমন্ত্রের সহযোগেই কি নবযুগের প্রথম প্রভাতরশ্মি মানুষের মনে সনাতন সত্যের উদ্‌বোধন এনে দেবে না?"[৭৯]

ব্রহ্মবান্ধবের দৃষ্টিতে যেখানে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা এবং ফিরিঙ্গীজয়ের অমোঘ অস্ত্রস্বরূপ, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সেখানে অদ্বৈতবাদ সার্বজাতিক মানবধর্ম, বিশ্বানুভূতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তিরূপে প্রতিভাত। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী যে সম্পূর্ণ বিপরীত এবং এই দুইএর মধ্যে সমন্বয় স্থাপন যে সর্বথা অসম্ভব— ইহা আর বুঝাইয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না।[৮০]

উভয়ের মধ্যে মতবাদ ও আদর্শগত এই প্রভেদের স্পষ্ট ছাপ 'গোরা' উপন্যাসের চরিত্র পরিকল্পনার উপর পড়িয়াছে। 'গোরা'কে যদিও রবীন্দ্রনাথ উপাধ্যায়ের আদর্শে গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ

করিয়াছিলেন, তথাপি রূঢ় বাস্তব পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে, তাহাকেও ক্রমশঃ আত্মসমালোচনাপ্রবণ হইয়া উঠিতে দেখা যায়।

হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে সে ক্রমশঃ সজাগ হইয়া উঠিতেছে, হিন্দুয়ানির গৌরবস্থাপনে তাহার উৎসাহে ভাঁটা পড়িতেছে, সুচরিতার সহিত পরিচয়ের ফলে জাতীয় জীবনে নারীর আসন বিষয়ে তাহার গোঁড়ামি ক্রমশই শিথিল হইয়া আসিতেছে— অবশেষে নাটকীয় ভাবে তাহার জন্মরহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া তাহাকে অকস্মাৎ ভারতবর্ষের উদার উন্মুক্ত অঙ্কে আশ্রয় দিয়া সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে — যে ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাবলোকে বিরাজমান, যেখানে জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক বিধিনিষেধের কোনও বাধাই তাহার মানবধর্মে উপনীত হইবার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে না। ইহাই রবীন্দ্রনাথের 'মহাভারতবর্ষ'— তিনি ইহারই অধিবাসী। হেমন্তবালা দেবীর নিকট লিখিত পত্রে তিনি বলিতেছেন—

> "…যথার্থ পুরাতন ভারত, যে-ভারত চিরনূতন— যে ভারতের বাণী, আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি—তাকেই আমি চিরদিন ভক্তি করেছি। আমার সব লেখা যদি ভাল করে পড়তে তাহলে বুঝতে আমার চিত্ত মহাভারতের অধিবাসী— এই মহাভারতের ভৌগোলিক সীমানা কোথাও নেই।"[৮১]

পুনরায় আর একখানি পত্রে তিনি বলিতেছেন—

> "তোমাদের হিঁদুয়ানিতে অত্যন্ত বেশি আধুনিক ঝাঁজ— তাতে সাবেক কালের পরিণতির মোলায়েম রঙ লাগেনি। মিশনারিদের মতোই ভঙ্গী তোমাদের। যেন হিঁদুয়ানির মোল্লা মৌলবী। গভীরভাবে আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভারতীয়। যথার্থ ভারতবর্ষ মহাভারতবর্ষ। মনুসংহিতা ও রঘুনন্দনের ছাঁটাকাটা হাড়-বের-করা শুচিবায়ুগ্রস্ত ভারতবর্ষ নয়। যে দেশ কেবলি বিশেষ ছোঁওয়া বাঁচিয়ে নাক তুলে চলে সে রুগ্ন দেশ— আমি সেই বাতে পঙ্গু দেশের মানুষ নই। আমি ভারতবর্ষের মানুষ— সেই ভারতবর্ষ স্বাস্থ্যের প্রাবল্যদ্বারাই চিরশুচি,— সেই আমার মহাকাব্যের চিরন্তন ভারতবর্ষ।…"[৮২]

তাই উপন্যাসের উপসংহারে গোরা একদিকে ব্রাহ্ম পরেশবাবুর নিকট যেমন আকুল প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেছে— "আমাকে শিষ্য করুন। আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই— যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না— যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"— সেইরূপ হিন্দুকন্যা আনন্দময়ীর উদ্দেশে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছে—

> "মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই— শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"

সুতরাং গোরাকে যেন রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধবের হিন্দু ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার নিজের এই মহাভারতবর্ষে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। কিংবা গোরা তাঁহার যেন নিজেরই দোসর। তিনি নিজেই জাতীয়তা, স্বধর্মপ্রীতি, স্বসম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি সংকীর্ণতার বন্ধন হইতে যে মুক্তি খুঁজিতেছিলেন, যাহার

জন্য ব্রহ্মবান্ধবের ন্যায় শ্রদ্ধেয় মনীষী অন্তরঙ্গ সুহৃদের বন্ধুত্ববন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ক্ষতিকেও তিনি নীরবে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, যেন তাহারই অনবদ্য সাহিত্যরূপ 'গোরা' উপন্যাসে লিখিত হইয়া রহিয়াছে।

৫

উপসংহারে আর-একটি বিষয় লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতে চাই। ব্রহ্মবান্ধবকেই বা কিজন্য গোরা-চরিত্রের আদর্শ বলিয়া মনে করিব? বিবেকানন্দ বা নিবেদিতাকে গোরার প্রেরণাস্থল বলিয়া মনে করিতে বাধা কোথায়? ইহা ঠিক যে ভগিনী নিবেদিতার সহিত গোরার চরিত্রের কয়েকটি সাদৃশ্য বর্তমান। সর্বপ্রথম এবং প্রধান— তাহার আইরিশ জন্ম। হয়তো উপন্যাসের ঘটনাসংঘাতে নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্যই রবীন্দ্রনাথকে এই কল্পনা করিতে হইয়াছে— এবং হয়তো ভগিনী নিবেদিতার প্রভাব ইহার উপর আছে। কিন্তু গোরার যে উদ্ধত হিন্দুয়ানি তাহার চরিত্রকে একটি দৃপ্ত মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা ব্রহ্মবান্ধবের আদর্শের দ্বারাই যে উদ্বুদ্ধ ইহাতে সন্দেহের অবকাশ খুবই অল্প। ভগিনী নিবেদিতাও মনে প্রাণে হিন্দুত্বের অন্যতম প্রধান সমর্থক ছিলেন। কিন্তু নিবেদিতার হিন্দুয়ানির আদর্শের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্য ছিল— ইহা রবীন্দ্রনাথ নিজেই ঘোষণা করিয়াছেন। নিবেদিতার হিন্দুপ্রীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"...আমরা বলিতেছি তিনি অন্তরে হিন্দু ছিলেন, অতএব আমরা হিন্দুরা বড়ো কম লোক নই। তাঁহার যে আত্মনিবেদন তাহাতে আমদেরই ধর্ম ও সমাজের মহত্ত্ব। এমনি করিয়া আমরা নিজের দিকের দাবিকেই যত বড়ো করিয়া লইতেছি তাঁহার নিজের দিকের দানকে ততই খর্ব করিতেছি।

"বস্তুত তিনি কী পরিমাণে হিন্দু ছিলেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে নানা জায়গায় বাধা পাইতে হইবে— অর্থাৎ আমরা হিন্দুয়ানির যে ক্ষেত্রে আছি তিনিও ঠিক সেই ক্ষেত্রেই ছিলেন এ কথা সত্য বলিয়া আমি মনে করি না। তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-সমাজকে যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতেন— তাহার শাস্ত্রীয় অপৌরুযেয় অটল বেড়া ভেদ করিয়া যেরূপ সংস্কারমুক্ত চিত্তে তাহাকে নানা পরিবর্তন ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা অনুসরণ করিতেন, আমরা যদি সে পন্থা অবলম্বন করি তবে বর্তমানকালে যাহাকে সর্বসাধারণে হিন্দুয়ানি বলিয়া থাকে তাহার ভিত্তিই ভাঙিয়া যায়। ঐতিহাসিক যুক্তিকে যদি পৌরাণিক উক্তির চেয়ে বড়ো করিয়া তুলি তবে তাহাতে সত্য নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু নির্বিকার বিশ্বাসের পক্ষে তাহা অনুকূল নহে।"[৮৩]

সুতরাং গোরার 'উদ্ধত হিন্দুয়ানি'র সহিত নিবেদিতা অপেক্ষা ব্রহ্মবান্ধবের হিন্দুপ্রীতিরই সাদৃশ্য যে অধিক— এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। গোরার আক্রমণাত্মক ভঙ্গী রবীন্দ্রনাথ যাহাকে নিবেদিতার 'যোদ্ধৃত্ব' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা ব্রহ্মবান্ধবের দৃপ্ত ভঙ্গীরই অনুগামী।[৮৪] তবে পরিণামে গোরার দৃষ্টি যে হিন্দুসমাজের গণ্ডী ডিঙাইয়া মুসলমান সমাজের দিকে সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়, তাহার মধ্যে নিবেদিতার আদর্শের প্রভাব হয়তো কিছুটা পড়িয়া থাকিতে পারে। কেননা রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতা স্মরণে বলিয়াছেন—"তিনি গণ্ডগ্রামের কুটীরবাসিনী একজন সামান্য মুসলমান রমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে— কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি, সে অতি অসাধারণ।"[৮৫] তবে এই সর্বমানবে গভীর প্রীতি বিবেকানন্দের মধ্যে অতি প্রকট। তাঁহার 'যোদ্ধৃত্ব' এবং আক্রমণাত্মক দৃপ্ত ভঙ্গীও সহজেই

লক্ষিত হয়— হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের তিনিই মুখ্য প্রবক্তা— কিন্তু ব্রহ্মবান্ধবের চরিত্রে যে বর্ণাশ্রমধর্ম ও জাতিভেদপ্রথার প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও শ্রদ্ধালু ভাব, তাহার চিহ্ন বিবেকানন্দের চরিত্রে দুর্লভ— যদিও ব্রহ্মবান্ধব বিবেকানন্দের অসম্পূর্ণ কর্ম সমাপ্ত করিবার ব্রতেই নিজেকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া ইহাই মনে হয় উপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বের প্রভাব রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল— তাঁহার স্বদেশপ্রীতি, স্বধর্মের প্রতি আনুগত্য এবং তাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনে তাঁহার অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও মনীষার দীপ্তি তাঁহাকে চমকিত করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার হৃদয় যে আদর্শ ও লক্ষ্যের অভিমুখে ক্রমশ অগ্রসর হইতেছিল, তাহার সহিত উপাধ্যায়ের আদর্শের কোনও সমন্বয় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। এই সংঘাতেরই সাহিত্যরূপ গোরা উপন্যাসে উন্মীলিত হইয়াছে।

উপাধ্যায়ের সাধনার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল দুইটি বিভিন্ন ধারায়— যদিও এই দুইটিরই উৎস এক ও অভিন্ন। প্রথমটি স্বধর্মের প্রতি ভারতবর্ষীয়গণের ক্ষয়োন্মুখ শ্রদ্ধাকে ফিরাইয়া আনা এবং দ্বিতীয়টি রাজনীতিক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদের প্রবর্তনার দ্বারা বিধর্মী ফিরিঙ্গীর অধীনতাপাশ হইতে মাতৃভূমির উদ্ধার সাধন। এই দুইটিই পরস্পরসাপেক্ষ, ভারত-উদ্ধার তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন দেশের হিন্দুয়ানির প্রতি, তাহার আচার-ব্যবহার, বিধি-নিষেধ, কুসংস্কার, জাতিভেদপ্রথা— সব কিছুর প্রতিই দেশবাসিগণের শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিবে। প্রথম ধারার অসঙ্গতি 'গোরা' উপন্যাসে প্রকাশিত হইয়াছে ; 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে দ্বিতীয় ধারার ব্যর্থ পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের 'আভাস' অংশে উপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণায় রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের আভাসে উপাধ্যায়ের পতনের উল্লেখকে কেন্দ্র করিয়া সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় যে বিতর্ক আবর্তিত হইয়া উঠে, তাহার কৈফিয়ত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলিয়াছেন—

> "গল্পের উপক্রমণিকায় উপাধ্যায়ের কথাটা কেন এল এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই জিজ্ঞাস্য। অতীনের চরিত্রে দুটি ট্র্যাজেডি ঘটেছে, এক সে এলাকে পেলে না, আর সে নিজের স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। এই শেষোক্ত ব্যাপারটি স্বভাববিশেষে মনস্তত্ত্ব হিসাবে বাস্তব হতে পারে তারই সাক্ষ্য উপস্থিত করার লোভ সংবরণ করতে পারি নি। ভয় ছিল পাছে কেউ ভাবে যে, এই সম্ভাবনাটি কবি-জাতীয় বিশেষ মত বা মেজাজ দিয়ে গড়া। এর বাস্তবতা সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধ হলে এর বেদনার তীব্রতা পাঠকের মনে প্রবল হতে পারে এই আশা করেছিলুম।···
>
> "একজন মহিলা আমাকে চিঠিতে জানিয়েছেন যে তাঁহার মতে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে উপাধ্যায়ের জীবনের বহিরংশ প্রকাশ পেয়েছে আর অতীন্দ্রের চরিত্রে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর অন্তরতর প্রকৃতি। ঐ-কথাটি প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নেই।"

'গোরা'র প্রকাশকাল ১৩১৪-১৬ ; 'চার অধ্যায়' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪১ সালে। এই দীর্ঘ কাল ব্যবধানেও উপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ চরিত্রের স্মৃতি যে কবিচিত্তে কিরূপ সযত্নে সঞ্চিত ছিল, তাহা উপরিউক্ত উদ্ধৃতি হইতেই প্রমাণিত। বিস্ময়ের কথা এই যে, শুধু 'চার অধ্যায়ে'র আভাসে— তাহাও বর্তমানে পরিবর্জিত— উপাধ্যায় চরিত্রের সংক্ষিপ্ত চিত্রণ ব্যতীত সুবিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিস্তৃত পরিধিতে ব্রহ্মবান্ধব সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। ইহার গূঢ় রহস্য কে উদ্‌ঘাটন করিবে ?[৮৩]

১-২ চিঠিপত্র, ৯ম খণ্ড : পত্রসংখ্যা ৪৫

৩ দ্র. "...এ-কথা স্মর্তব্য যে 'গোরা' স্বদেশি যুগের ভরপুর মৌশুমের সময়ে লেখা, এমন কি গোরা চরিত্রের পরিকল্পনার মূলে সম্ভবত সে-যুগের একজন দেশনায়কের আভাস আছে।..." শ্রীবুদ্ধদেব বসু : 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য', পৃ. ৯১।

৪ চিঠিপত্র, ৭ম খণ্ড, কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত পত্র, পৃ. ১১৮

৫ চিঠিপত্র, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪

৬ চিঠিপত্র, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৯। শেষের কবিতার অমিতও মূলতঃ কবিপ্রকৃতি। তাই অমিত সম্বন্ধে লাবণ্যের ধারণার সহিত রবীন্দ্রনাথের এই আত্মসমীক্ষণের ঘনিষ্ঠ সাজাত্য তুলনীয়— "লাবণ্যর চোখের পাতা ভিজে এল। তবু এ কথা মনে না করে থাকতে পারলে না যে, 'অমিতর মনের গড়নটা সাহিত্যিক, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় ওর মুখে কথার উচ্ছ্বাস তোলে। সেইটে ওর জীবনের ফসল, তাতেই ও পায় আনন্দ। আমাকে ওর প্রয়োজন সেইজন্যেই। যে-সব কথা ওর মনে বরফ হয়ে জমে আছে, ও নিজে যার ভার বোধ করে কিন্তু আওয়াজ পায় না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে হবে।' "— 'শেষের কবিতা' §৭ : ঘটকালি ।

৭ চিঠিপত্র, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯

৮ ঐ, পৃ. ২৭০

৯ দ্র. Bipin Chandra Pal : *Saint Bijayakrishna Goswami*, pp. 67-68 (Bipin Ch. Pal Institute, 1964) এই প্রসঙ্গে Ilbert বিল সম্বন্ধীয় বিবাদকালে লিখিত 'লোকরহস্যে'র অন্তর্গত বঙ্কিমচন্দ্রের *Bransonism* শীর্ষক কৌতুক নক্‌শাটি দ্রষ্টব্য।

১০ তু. "অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রাষ্ট্র ও ধর্ম সম্বন্ধে যে মত পোষণ করিতেন তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের দেশবিষয়ক মতামতের মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ব্রহ্মবান্ধব হিন্দু ন্যাশনালিজম ও হিন্দু সমাজকে ভারতীয় সংস্কৃতি রূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন; তাঁহার কাছে হিন্দুত্ব শব্দের দ্বারা হিন্দু ন্যাশনালিটি ও হিন্দু কালচার উভয়ই সূচিত হইত। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ হইতেছে ব্রহ্মবান্ধবের 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠা'। এই প্রবন্ধের পুরোভাগে তিনি রবীন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত নৈবেদ্য হইতে একটি সনেট উদ্‌ধৃত করেন।" —প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬৮, পৃ. ২০।

১১ পিতৃস্মৃতি, পৃ. ৬৩ (জিজ্ঞাসা, ১৩৭৩)। তু. "এখনকার দিনে অনেকে হয়তো জানেন না যে 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য আশ্রম' আজ বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়েছে, তার গোড়ায় ছিল উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের প্রতিভা, ত্যাগ— শক্তি এবং আদর্শের অংশ।..."—শ্রীবলাই দেবশর্মা : 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়,' পৃ. ১২৬।

১২ রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে ব্রহ্মবান্ধব সম্বন্ধে এই নীরবতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াই যেন স্বর্গত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় তাঁহার 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও স্বামী বিবেকানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন : "স্বামী উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব,...যে সত্যের অন্বেষণে তুমি অনাহারে অনিদ্রায় ছিন্ন কন্থা পরিয়া ধর্ম হইতে ধর্মান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে, পৃথিবীবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ছুটিয়াছ, আজ কি তাহার শেষ হইয়াছে? এই বাঙ্গালী জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি জীবনে যে মহাবীর্যের পরিচয় দিয়াছ, তাহার তুলনা কোথায়? হায়! এই "জীবনস্মৃতি"র বহু আড়ম্বরের দিনেও তুমি বিস্মৃত।..." —আশ্বিন ১৩১৯ 'দেবালয়' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত : 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধসংকলনে পুনর্মুদ্রিত, পৃ. ১৬৫।

১৩ দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মৌনভাবও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর প্রায় নয় বৎসর পরে শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত কবির একটি পত্রাংশ এই স্থলে উদ্ধারযোগ্য— "তার কারণ যার কাছ থেকে কোনো ক্ষোভ পাই তার সম্বন্ধে আমি সর্বপ্রযত্নে আত্মসংবরণ করে থাকি।..." —দ্র. রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৫।

১৪ তু. " 'সন্ধ্যা' নানা রকম গরম গরম ও হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ বাহির করতো। সন্ধ্যা অফিস ও প্রেস উঠে এল হেদুয়ার নিকট কৃপাদত্ত লেনে। ঐখানেই হতো আমাদের আড্ডা— রোজই সকালে যেতাম। ধাপে ধাপে উপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সুর উগ্র হতে লাগলো।...তিনি আমাদের বোঝালেন এবং কাগজে লিখলেন— ইংরাজের প্রতি একটা জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে হবে। ওদের কটা চুল, কটা চোখ ও ফ্যাকাশে রংএর উপর ঘৃণার উদ্রেক কর। আমাদের শারীরিক সৌন্দর্য কিরূপ রমণীয় ইত্যাদি তিনি বলতেন।"—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত শ্রীবলাই দেবশর্মা প্রণীত 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়' শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকা হইতে।

১৫ পিতৃস্মৃতি, পৃ. ৬২-৬৩

১৬ দ্র. "গোরা গল্পের পটভূমি হইতেছে উনবিংশ শতকের শেষ সিক্স। বাংলার শিক্ষিত সমাজের উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব তখন অতি প্রবল; ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন জীবিত, আচার্যের উপদেশ শুনিবার কথা উপন্যাসের মধ্যেই আছে। গোরার বয়স তখন পঁচিশ বৎসর, কারণ সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাহার জন্ম অর্থাৎ ১৮৫৭ সালেই ধরা যাক। সুতরাং গল্পাংশ যেখানে আরম্ভ হইয়াছে, সেটি বাস্তবের দিক হইতে হিসাব করিতে গেলে, লেখকের গ্রন্থরচনার পঁচিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা, কারণ গোরা রচনা শুরু হয় ১৯০৭ সালে। এইসব কাল্পনিক সন-তারিখের হিসাবে গোরার কাহিনীকাল হইতেছে ১৮৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দ বা বাংলা ১২৮৮-৮৯ সাল, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশ-একুশ বৎসরের কলিকাতার ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গল্পের সূচনা হইয়াছে শ্রাবণের কলিকাতার বর্ণনা দিয়া— যে কলিকাতার কর্দমাক্ত পথে যৌবনে কবিকে ভাড়াটিয়া গাড়ি করিয়া প্রায়ই চলাফেরা করিতে হইত।"

—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪।

১৭ তু. "বিবেকানন্দে যে স্বদেশপ্রেমের জন্ম, উপাধ্যায়ে সেই স্বদেশপ্রেমের পূর্ণবিকাশ। আমার মনে হয়, বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা বিবেকানন্দ ও উপাধ্যায়ের স্বদেশপ্রেমকে বঙ্গসাহিত্যে বিশেষতঃ তাঁহার নব-প্রকাশিত উপন্যাসের গোরা চরিত্রে সম্যক্ পরিস্ফুট করিয়াছেন।" — গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে', পৃ. ১৬৫।

১৮ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ. ১১৯-২০।

১৯ ঐ, পৃ. ১৫৫

২০ ঐ, পৃ. ২৮৫।

২১ শ্রীবলাই দেবশর্মা, 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়', পৃ. ২।

২২ ঐ. পৃ. ৩৭-৩৮

২৩ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ. ২৭৬। অপিচ— "গোরার প্রত্যহ সকালবেলায় একটা নিয়মিত কাজ ছিল। সে পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘরে যাতায়াত করিত। তাহাদের উপকার করিবার বা উপদেশ দিবার জন্য নহে— নিতান্তই তাহাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিবার জন্যই যাইত। শিক্ষিত দলের মধ্যে তাহার এরূপ যাতায়াতের সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। গোরাকে ইহারা দাদাঠাকুর বলিত এবং কড়িবাঁধা হুঁকা দিয়া অভ্যর্থনা করিত। কেবলমাত্র ইহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্যই গোরা জোর করিয়া তামাক খাওয়া ধরিয়াছিল।" পৃ. ২০৫-৬।

২৪ শ্রীবলাই দেবশর্মা : ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, পৃ. ৫৯-৬০।

২৫ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ. ১৩৭। আবার— "কিন্তু কখন এক সময় তাহার মনে উঠিল আজ রবিবার, আজ ব্রাহ্মসভায় কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিতে যাই।" ঐ, পৃ. ১৩১। বরদাসুন্দরীর সহিত কথোপকথনকালে গোরা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছে— 'আমিও তো এক সময়ে ব্রাহ্ম ছিলুম।' ঐ, পৃ. ১৫৮।

২৬ শ্রীবলাই দেবশর্মা রচিত 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়' গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২৭ ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা, পৃ. ২৯-৩০

২৮ ঐ, পৃ. ৩২-৩৩।

২৯ ঐ, পৃ. ৫১-৫২।

৩০ দ্র. ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা, পৃ. ৬২-৬৩।

৩১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ. ১৩৭-৩৮। এই প্রসঙ্গে 'শেষের কবিতা'য় যোগমায়ার গুরু দীনশরণ বেদান্তরত্নের হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে মনোভাবের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহার সহিত গোরার উদ্ধৃত অংশটি বিশেষভাবে তুলনীয় :

"…এই মানসিক অবরোধের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন দীনশরণ বেদান্তরত্ন— এঁদের সভাপণ্ডিত। যোগমায়ার স্বাভাবিক স্বচ্ছ বুদ্ধি তাঁকে অত্যন্ত ভালো লেগেছিল। তিনি স্পষ্ট বলতেন, 'মা, এ-সমস্ত ক্রিয়াকর্মের জঞ্জাল তোমার জন্যে নয়। যারা মূঢ় তারা কেবল যে নিজেদেরকে নিজেরাই ঠকায় তা নয়, পৃথিবীসুদ্ধ সমস্ত-কিছুই তাদের ঠকাতে থাকে। তুমি কি মনে কর, আমরা এ-সমস্ত বিশ্বাস করি? দেখ নি কি, বিধান দেবার বেলায় আমরা প্রয়োজন বুঝে শাস্ত্রকে ব্যাকরণের প্যাঁচে উলট-পালট করতে দুঃখ বোধ করি না— তার মানে, মনের মধ্যে আমরা বাঁধন মানি নে, বাইরে আমাদের মূঢ় সাজতে হয় মূঢ়দের খাতিরে। তুমি নিজে

যখন ভুলতে চাও না তখন তোমাকে ভোলাবার কাজ আমার দ্বারা হবে না। যখন ইচ্ছা করবে, মা, আমাকে ডেকে পাঠিয়ো, আমি যা সত্য বলে জানি তাই তোমাকে শাস্ত্র থেকে শুনিয়ে যাব।'

"এক-একদিন তিনি এসে যোগমায়াকে কখনো গীতা কখনো ব্রহ্মভাষ্য থেকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে যেতেন। যোগমায়া তাঁকে এমন বুদ্ধিপূর্বক প্রশ্ন করতেন যে, বেদান্তরত্নমশায় পুলকিত হয়ে উঠতেন। এঁর কাছে আলোচনায় তাঁর উৎসাহের অন্ত থাকত না। বরদা-শংকর তাঁর চারিদিকে ছোটো-বড়ো যে-সব গুরু ও গুরুতরদের জুটিয়ে ছিলেন তাদের প্রতি বেদান্তরত্ন মশায়ের বিপুল অবজ্ঞা ছিল। তিনি যোগমায়াকে বলতেন, 'মা, সমস্ত শহরে একমাত্র এই তোমার ঘরে কথা কয়ে আমি সুখ পাই। তুমি আমাকে আত্মধিক্কার থেকে বাঁচিয়েছ।' "—শেষের কবিতা : §৩: পূর্ব ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের নাম বহুবার শ্রদ্ধা-সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের গৃহে সংস্কৃত-শিক্ষক, এককালে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন উপলক্ষে আচার্যের কার্য সম্পাদন করেন। মনে হয় 'গোরা'র হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এবং 'শেষের কবিতা'র দীনশরণ বেদান্তরত্নের চরিত্রকল্পনায় তাঁহারই স্মৃতি প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করিয়াছে। আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এবং তদীয় শিষ্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য মহর্ষির আত্মজীবনী দ্রষ্টব্য।

৩২ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ. ১৩৮

৩৩ ব্রহ্মবান্ধব : 'সন্ধ্যা,' ১২১ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩১৩ সাল। 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়' গ্রন্থে উদ্‌ধৃত, পৃ. ৫৬।

৩৪ 'স্বদেশী— সথে ও টানে', ঐ, পৃ. ৮২-৮৩

৩৫ ঐ, পৃ. ৮১

৩৬ ঐ, পৃ. ৮৭

৩৭ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ. ১৩৮

৩৮ ঐ. পৃ. ৪২৫

৩৯ ঐ. পৃ. ১৭০

৪০ ঐ. পৃ. ১৭৫-৬

ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় স্বদেশীয়গণের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন—

"আগে হইতে ফিরিঙ্গী সাজিও না। তাহা হইলে বিজেতার অনুকরণস্পৃহায় তোমার মনুষ্যত্ব উন্মেষের পথে বিঘ্ন ঘটিবে। আপনার ভাবে, আপনার কর্মে, আপনার আদর্শে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া স্বরাজ ও স্বাধীনতা লাভের পর ফিরিঙ্গী সাজিব কি নিগ্রো সাজিব সে ভাবনা ভাবিও। তবে ইহা ভুলিও না যে, ফিরিঙ্গী সাজিতে গিয়া মরিয়াছ, আর যখন আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠাবান ছিলে, তখন তোমার সর্বস্বই ছিল।"— 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়' গ্রন্থে উদ্‌ধৃত, পৃ. ৯৫।

দেশের সহিত একাত্মতা উপলব্ধির সাধনা যে ব্রহ্মবান্ধবের পক্ষে কিরূপ তীব্র, আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ ছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ঘটনাটি হইতে বুঝা যাইবে—

"শুনিয়াছি— একদিন মধ্যাহ্নে উপাধ্যায় মহাশয় এক বোঝা মুলা কাঁধে করিয়া 'সন্ধ্যা' কার্যালয়ে ফিরিলেন এবং তাহা পরম আগ্রহে খাইতে লাগিলেন। ইহাকেও ক্ষুধিতের ক্ষুন্নিবৃত্তির আহার বলি না। ইহা নিজস্বতার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার অভিব্যক্তি। যখন 'মদন ছাপা' (উপাধ্যায় মহাশয় মটন চপকে 'মদন ছাপা' বলিতেন), রোষ্ট, টোষ্ট, কেক্, বিস্কুটের আস্বাদ জাতিকে আমোদিত করিতেছিল, সেই দুঃসময়ে দেশের কলা মুলার প্রতি প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিতেই তিনি আধা শুক্‌নো মুলার বোঝা আনিয়া সেই দীপ্ত মধ্যাহ্নে পরম তৃপ্তিতে খাইয়াছিলেন।..." —'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়', পৃ. ৭০-৭১।

গোরা সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন— "যেখানে গোরা একটুমাত্র অবকাশ পায় সেখানেই সে তাহার সমস্ত সংকোচ, সমস্ত পূর্বসংস্কার সবলে পরিত্যাগ করিয়া দেশের সাধারণের সহিত সমান ক্ষেত্রে নামিয়া দাঁড়াইয়া মনের সঙ্গে বলিতে চায়, 'আমি তোমাদের, তোমরা আমার।'"—রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ. ১৪৪।

৪১ ঐ. পৃ. ২৪০।

৪২ দ্র. "দেখুন, শাস্ত্রে বলে, আত্মানং বিদ্ধি— আপনাকে জানো। নইলে মুক্তি কিছুতেই নেই। আমি আপনাকে বলছি, আমার বন্ধু গোরা ভারতবর্ষের সেই আত্মবোধের প্রকাশ-রূপে আবির্ভূত হয়েছে। তাকে আমি সামান্য লোক বলে মনে করতে পারি নে। আমাদের সকলের মন যখন তুচ্ছ আকর্ষণে নূতনের প্রলোভনে বাহিরের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তখন ওই একটিমাত্র

লোক এই সমস্ত বিক্ষিপ্ততার মাঝখানে অটলভাবে দাঁড়িয়ে সিংহগর্জনে সেই পুরাতন মন্ত্র বলছে— আত্মানং বিদ্ধি।"— গোরা সম্পর্কে সুচরিতার প্রতি বিনয়ের উক্তি : রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ. ১৮৩।

৪৩ দ্র. বিলাত-যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি : ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা, পৃ. ৯।

৪৪ তু. "দেখো, আমি তোমাকে সত্য কথা বলব। আমি ঠাকুরকে ভক্তি করি কিনা ঠিক বলতে পারি নে, কিন্তু আমি আমার দেশের 'ভক্তিকে' ভক্তি করি। এতকাল ধরে সমস্ত দেশের পূজা যেখানে পৌঁচেছে আমার কাছে সে পূজনীয়। আমি কোনো-মতেই খৃস্টান মিশনারির মতো সেখানে বিষদৃষ্টিপাত করতে পারি নে।" —সুচরিতার প্রতি গোরার উক্তি : রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ. ৪৭২।

৪৫ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ. ৪৯০-৯১। তুলনীয় : "রূপের দুইটি ভাব— মধুর ও মঙ্গল। মাধুর্য ও কল্যাণের সমাবেশ স্বরূপের ভূমানন্দ। কিন্তু আমরা প্রবৃত্তি-পরায়ণ হইয়া মধুরকে মঙ্গলভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি ও ব্যবহার করি। যাহার আকর্ষণে মাদকতা জন্মে, ইন্দ্রিয় বিলোড়িত হয়— তাহাই মাধুর্য। সম্ভোগের আবর্তে মাধুর্যই জীবকে টানিয়া আনে। ...যতদিন প্রবৃত্তি প্রবল থাকিবে ততদিন রূপের সাধন করিতেই হইবে। অনিত্য রূপকে নিত্যস্বরূপের প্রতিমা বলিয়া গ্রহণ করিলে প্রবৃত্তিপরায়ণ মানবের পক্ষে স্বরূপলাভ অসম্ভব। মাধুর্যশালী বস্তু প্রতীক হইতে পারে না, কেননা তাহা প্রবৃত্তিকে সম্ভোগমুখিনী করে। যাহা মহান্ মঙ্গলময়, যাহা আত্মদান করে, তাহাই সেই শিবরূপের প্রতিমা বলিয়া স্বীকৃত। ...রূপকে এই প্রকার স্বরূপের বিগ্রহ বলিয়া উপাসনা করিতে হয়। রূপকে সাধন-সামগ্রী না করিলে প্রবৃত্তির তাড়না হইতে বাঁচা দায়।

"ইংরেজরা প্রকৃতির রূপকে ভালবাসে, কিন্তু রূপের সাধন জানে না। নব্য সভ্যতায় শাস্ত্রে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে পবিত্রতার বা মঙ্গলভাবের আরোপ নাই। প্রকৃতির মাধুরী লইয়া কত না গীত— কত না গাথা! কিন্তু যে সকল বস্তু আনন্দ ও কল্যাণময়, তাহার আকার নাই। ক্রোটন আর আর্কেরিয়া লইয়াই ব্যস্ত। অশ্বথ বা কদলী বা বিল্ব তরুর কোন সম্মান নাই। প্রকৃতি কেবল সম্ভোগের বিষয় হইয়াছে। তাহার মঙ্গলময় রূপ তিরোহিত হইয়াছে।..."— বিলাত-প্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠি : ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা, পৃ. ৪৫-৪৭।

৪৬ ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা,'বাংলার পাল-পার্বণ', পৃ. ৮০।

৪৭ ঐ, পৃ. ৭৬

৪৮ ঐ, পৃ. ৭৮। আবার—"যা ত ইষু শিবতমা শিবং বভূব তে ধনুঃ। শিবা শরব্যা যা তব তয়া নো রুদ্র মৃড়য়॥' ...এই বেদমন্ত্রের দ্বারা ভোলানাথের পূজা কর। তিনি আশুতোষ, তিনি ঘোর-রূপ ছাড়িয়া শান্তরূপ ধরিবেন, তিনি ভেদবিনাশের ভিতরে অমৃতপথ দেখাইয়া দিবেন— তোমার শিবনিন্দার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।" —ঐ, পৃ. ৮৫ 'শিব-চতুর্দশী'।

৪৯ দ্র. 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়', ভূমিকা, পৃ. ১৮

অপিচ— "ইহার পর যুগান্তর সম্পর্কে আমি পূর্ববঙ্গে যাই। ফিরে এসে দেখি তাঁর মাথায় শিখা। আমি বললাম : এ আপনি কি করলেন! তিনি বললেন : দরকার হে দরকার। শুনলাম তিনি প্রায়শ্চিত্ত করে আবার হিন্দু হয়েছেন।" — ঐ, পৃ. ১৬।

ব্রহ্মবান্ধব মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে বন্ধুবান্ধবদের ডাকিয়া বলিয়াছিলেন— 'কিছু গোবর খাইয়া আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।' 'We must make Prayaschitta, must eat a little cow-dung.' গোরার প্রতি মহিমের বিদ্রূপ উপাধ্যায়ের এই উক্তিকেই স্মরণ করাইয়া দেয় নাকি?—

"ঢের ঢের হিঁদুয়ানি দেখেছি, কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখলুম না। কাশী-ভাটপাড়া ছাড়িয়ে গেলে! তুমি যে দেখি ভবিষ্যৎ দেখে বিধান দাও। কোন দিন বলবে, স্বপ্নে দেখলুম খ্রীষ্টান হয়েছ, গোবর খেয়ে জাতে উঠতে হবে।"

৫০ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ. ৫০৮-৯।

৫১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ. ৪৪৬-৪৭। তু. "হিন্দুধর্ম যে আজও কিরূপ সজীব আছে তাহা গৌরমোহনবাবুর এই প্রায়শ্চিত্তের নিমন্ত্রণে প্রচার হইবে।" —ঐ, পৃ. ৪২৬।

৫২ ঐ, পৃ. ৪২৬।

৫৩ ঐ, পৃ. ৪৮১।

৫৪ বিনয়ের ধর্ম বিষয়ে এই দ্বিধা, সংশয়, অতৃপ্তি এবং আত্মসমীক্ষা অনেকটা রবীন্দ্রনাথের নিজেরই অনুরূপ। ধর্মের স্থূল বহিরাবরণ, তাহার আচার-অনুষ্ঠান বিধি-নিষেধ প্রতি সহস্র বন্ধন— যাহাকে রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মতন্ত্র' বলিয়াছেন, তাহাকে লইয়া সে তৃপ্ত থাকিতে পারিত না। সে চাহিত ধর্মোপলব্ধির মূল রহস্য অনুসন্ধান করিতে। বিনয়কে উদ্দেশ করিয়া আনন্দময়ীর উক্তি

দ্রষ্টব্য— "তোর মন কি সহজ মন! তুই তো মোটামুটি করে কিছুই দেখতে পারিস নে। সব তাতেই একটা-কিছু সূক্ষ্ম কথা ভাবিস। সেইজন্যেই তোর মন থেকে খুঁতখুঁত আর ঘোচে না।" —রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ. ৪৬২।

৫৫ দ্র. "হারানবাবুর সম্পাদিত ইংরেজি কাগজ কিছুকাল ধরিয়া সে পড়ে নাই। আজ সেই কাগজ ছাপা হইবামাত্র তাহা হাতে আসিয়া পড়িল। বোধ করি হারানবাবু বিশেষ করিয়াই পাঠাইয়া দিয়াছেন। ...এই সংখ্যায় 'সেকেলে বায়ুগ্রস্ত'-নামক একটি প্রবন্ধ আছে, তাহাতে বর্তমান কালের মধ্যে বাস করিয়াও যাহারা সেকালের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে তাহাদিগকে আক্রমণ করা হইয়াছে।..." —ঐ, পৃ. ২৭২।

৫৬ পরিচয়: 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়': রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ. ৪৭৫। হিন্দু জাতির বিষয় নিয়ে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের বজ্রনির্ঘোষ উক্তি স্মরণীয়: "The Hindu alone of all the living races has been eminently fitted to preside over the intellectual confederacy of nations... It is fitting that Hindu be the leader of Humanity. He is born with the prerogatives of a preceptor."—'শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে' গ্রন্থে উদ্‌ধৃত।

৫৭ কালান্তর: 'হিন্দু-মুসলমান', পৃ. ৩৩১।

৫৮ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ. ৫৩১।

৫৯ ঐ, পৃ. ৫৩১-৩২।

তু. "আমাদের দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল তখন আমি তার মধ্যে ছিলেম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেয় নি, বিরুদ্ধ ছিল। জননায়কেরা কেউ কেউ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, ওদের একেবারে অস্বীকার করা যাক। জানি, ওরা যোগ দেয় নি। কিন্তু, কেন দেয় নি? তখন বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে এত প্রবল যোগ হয়েছিল যে সে আশ্চর্য। কিন্তু এত বড়ো আবেগ শুধু হিন্দুসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল। মুসলমান-সমাজকে স্পর্শ করল না! সেদিনও আমাদের শিক্ষা হয় নি।" —'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ: কালান্তর, পৃ. ৩২১-২২। রবীন্দ্রনাথ যে হিন্দু মুসলমান সমস্যা লইয়া কী গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং সে বিষয়ে কতদূর বাস্তববোধসম্পন্ন ছিলেন তাহা তাঁহার গোরা উপন্যাসে পরেশের উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়—"সমাজের ক্ষয় বুঝতে সময় লাগে। ইতিপূর্বে হিন্দুসমাজের খিড়কির দরজা খোলা ছিল। তখন এ দেশের অনার্য জাতি হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশ করে একটা গৌরব বোধ করত। এ দিকে মুসলমানের আমলে দেশের প্রায় সর্বত্রই হিন্দু রাজা ও জমিদারের প্রভাব যথেষ্ট ছিল, এইজন্যে সমাজ থেকে কারও সহজে বেরিয়ে যাবার বিরুদ্ধে শাসন ও বাধার সীমা ছিল না। এখন ইংরেজ-অধিকারে সকলকেই আইনের দ্বারা রক্ষা করছে, সে-রকম কৃত্রিম উপায়ে সমাজের দ্বার আগলে থাকবার জো এখন আর তেমন নেই। সেইজন্য কিছুকাল থেকে কেবলই দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে হিন্দু কমছে আর মুসলমান বাড়ছে। এরকম ভাবে চললে ক্রমে এ দেশ মুসলমানপ্রধান হয়ে উঠবে, তখন একে হিন্দুস্থান বলাই অন্যায় হবে।" —রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ.৫১৮।

৬০ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ. ৪৫৬।

৬১ ঐ, পৃ. ২০১।

৬২ দ্র. "সুচরিতা আজ প্রাতঃকাল হইতে নিজের শোবার ঘরে নিভৃতে বসিয়া 'খৃস্টের অনুকরণ'-নামক একটি ইংরেজি ধর্মগ্রন্থ পড়িবার চেষ্টা করিতেছে।"—ঐ, পৃ. ২৫৮। অপিচ— "আজও তাঁহার নির্জন ঘরে পরেশবাবু আলোটি জ্বালাইয়া এমার্সনের গ্রন্থ পড়িতেছিলেন।"— ঐ, পৃ. ৩৬৬। আবার—"কোণে একটি ছোটো আলমারি, তাহার উপরের থাকে থিয়োডোর পার্কারের বই সারি সারি সাজানো রহিয়াছে দেখা যাইতেছে।" —ঐ, পৃ. ১৪৭।

৬৩ দ্র. "... পরেশ বিনয়কে তাঁহার রাস্তার ধারের বসিবার ঘরটাতে লইয়া গিয়া বসাইলেন। ...দেয়ালে একদিকে যীশুখৃস্টের একটি রঙ-করা ছবি এবং অন্যদিকে কেশববাবুর ফটোগ্রাফ।" —ঐ, পৃ. ১৪৭।

৬৪ শ্রীবলাই দেবশর্মা প্রণীত 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়' গ্রন্থে উদ্‌ধৃত: পৃ. ৪৪-৪৫। কেশবচন্দ্র-পরিকল্পিত নববিধানের পতাকার প্রতি লক্ষ করিয়াই কি উপাধ্যায়ের এই শাণিত বিদ্রূপ?

৬৫ দ্র. "আমার কথা ব্রাহ্মসমাজের কথা নয়, কোনো সম্প্রদায়ের কথা নয়, য়ুরোপ থেকে ধার-করা বুলি নয়। য়ুরোপকে আমার কথা শোনাই, বোঝে না; নিজের দেশে আরো কম বোঝে। অতএব আমাকে কোনো সম্প্রদায়ে বা কোনো দেশখণ্ডে বদ্ধ করে দেখো না"— চিঠিপত্র ৯, পৃ. ৫৭।

অপিচ— "কিন্তু আমাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বিশেষ শ্রদ্ধা করেন না— তাঁহারা আমাকে পুরা ব্রাহ্ম বলিয়াই গণ্য করেন না…"— চিঠিপত্র ৭, পৃ. ১৮, কাদম্বিনী দেবীকে লিখিত পত্র।

আবার— "এই সকল নানা কারণে ব্রাহ্মসমাজ আমাকে ঠিক ব্রাহ্ম বলে গ্রহণ করেন নি এবং আমাকে তাঁরা বিশেষ অনুকূল দৃষ্টিতে কোনোদিন দেখেন নি।" —ঐ, পৃ. ২৮।

৬৬ তু. "আমি জানি কোনো কোনো ব্রাহ্ম এখন বলিয়া থাকেন, আমি হিন্দুর কাছে যাহা পাইয়াছি, খ্রীষ্টানের কাছে তাহার চেয়ে কম পাই নাই— এমন কি, হয়তো তাঁহারা মনে করেন তাঁহার চেয়ে বেশি পাইয়াছেন।" —পরিচয়: রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ. ৪৬৯।

৬৭ দ্র. 'পরিচয়': রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ. ৪৫৬
ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ করতঃ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের পরপর প্রোটেস্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ এবং প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বলিয়াই মনে হয়।

৬৮ ঐ, পৃ. ৪৬৪

৬৯ ঐ, পৃ. ৪৬৪। ব্রহ্মবান্ধবও 'An open letter to Mrs. Annie Besant'এ নিজের সম্পর্কে বলিয়াছেন— "I am a Brahmin by birth and a Christian and Catholic by faith." কিন্তু হিন্দু যে ধর্মমতই গ্রহণ করুক না কেন, তাহাকে জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সমাজধর্ম অবশ্যই পালন করিতে হইবে। উপাধ্যায়ের মতে হিন্দুর এই বৈশিষ্ট্য তাহার বর্ণাশ্রমধর্মের মধ্যে নিহিত—"Hindu Society has never enforced uniformity in belief.… A *Vaishnava* may accuse a Vedantist of *Atheism* or *nihilism*, still both of them are Hindu. To be a Hindu one should only be born and observe *Barnasrama Dharma* (Caste distinction)." —'শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১২৭।

৭০ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ. ৩৩৩

৭১ ঐ, পৃ. ৪৬৯

৭২ তু. "আগে হইতে ফিরিঙ্গী সাজিও না। তাহা হইলে বিজেতার অনুকরণ স্পৃহায় তোমার মনুষ্যত্ব উন্মেষের পথে বিঘ্ন ঘটিবে। আপনার ভাবে, আপনার কর্মে, আপনার আদর্শে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া স্বরাজ ও স্বাধীনতা লাভের পর ফিরিঙ্গী সাজিব কি নিগ্রো সাজিব সে ভাবনা ভাবিও। তবে ইহা ভুলিও না যে, ফিরিঙ্গী সাজিতে গিয়া মরিয়াছ, আর যখন আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠাবান ছিলে, তখন তোমার সর্বস্বই ছিল।" — ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, পৃ. ৯৫।

৭৩ তু. "ধর্ম নিজের স্বার্থ এবং দেশের স্বার্থের চেয়েও বড়— য়ুরোপ এই কথা ভোলে বলিয়া যে তাহাদের নকল করিয়া আমাদিগকেও ভুলিতে হইবে এমন দুর্ভাগ্য যেন আমাদের না হয়।"—চিঠিপত্র, ৭, পৃ. ৪৪।

৭৪ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম': কালান্তর, পৃ. ৫৮-৫৯।

৭৫ 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়', পৃ. ৬১

৭৬ 'বিলাতফেরত সন্ন্যাসীর চিঠি': ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা, পৃ. ৬৩।

৭৭ 'বিলাত-প্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠি,: ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা, পৃ. ৩০। এই প্রসঙ্গে উপাধ্যায়ের দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে তাঁহার প্রিয় শিষ্য অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ মহাশয়ের উক্তি স্মরণীয়: "As a philosopher he (Upadhyaya) belonged to the school of Saṅkara."— 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৫৪ (পাদটীকা)।

শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ এবং সন্ন্যাস যে ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণের অনুমোদিত ছিল না— ইহা বিবেকানন্দের রচনার সাক্ষ্য হইতেও জানা যায়। দ্র. "পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর দলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল, কিন্তু সে কেবল সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে। …আমার কাছে সন্ন্যাস সর্বোচ্চ আদর্শ, তাঁর কাছে পাপ। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজীরা সন্ন্যাসী হওয়াকে পাপ বলে মনে তো করবেই!! …আমি এখনও ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার কার্যের প্রতি প্রভূত সহানুভূতিপূর্ণ। কিন্তু ঐ 'অসার' ধর্ম প্রাচীন বেদান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। আমি কি ক'রব? সেটা কি আমার দোষ?…" — অধ্যাপক রাইটকে লিখিত স্বামী বিবেকানন্দের পত্র (২৪মে ১৮৯৪)। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪২৬ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ)। রবীন্দ্রনাথেরও শঙ্করসম্মত অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে আন্তরিক

বিমুখতা সুবিদিত। তু. "…রেলগাড়িতেও দুই মাদ্রাজি আমাকে অর্দ্ধেক পথ অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করে সাংঘাতিক অত্যাচার করেছিল। এখানে আধমরা হয়ে পৌঁচেছি।" — চিঠিপত্র, ৯, পৃ. ৯৯

ব্রহ্মবান্ধব নিজেকে 'ইংরেজি পড়া সন্ন্যাসী' বলিতেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহাকে 'বৈদান্তিক সন্ন্যাসী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সন্নাস আশ্রমের প্রতি উপাধ্যায়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। এই প্রসঙ্গে গোরার স্বগত উক্তিটিও তুলনীয় : "গোরা মনে মনে কহিল, 'বিধাতা আসক্তির রূপটা আমার কাছে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিলেন— …আমি সন্ন্যাসী, আমার সাধনার মধ্যে তাহার স্থান নাই।' " — রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ. ৫৪১।

৭৮ তু. "…তোমরা উপনিষদকে যথেষ্ট পরিমাণ হিন্দু বলে স্বীকার কর কিনা জানি নে, আমি উপনিষদকে সর্বধর্মের ভিত্তি বলে মানি।…" — হেমলতা দেবীর নিকট লিখিত কবির পত্র। দ্র. চিঠিপত্র ৯, পৃ. ১১৬

৭৯ দ্র. কালান্তর, পৃ. ১৮৫-৮৬।

৮০ অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও একসময়ে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের দ্বারা যে ভারতবর্ষ আপনার লুপ্ত বিক্রম ও স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইবে, এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন। দ্র. "যখন উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রাপ্ত হইলাম, এবং জানিলাম যে সেই উপনিষদ এই সমুদায় ভারতবর্ষের প্রামাণ্য শাস্ত্র, তখন এই উপনিষদের প্রচার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা আমার সংকল্প ছিল। ঐ উপনিষদকে বেদান্ত বলিয়া সকল শাস্ত্রকারেরা মান্য করিয়া আসিতেছেন। বেদান্ত, সকল বেদের শিরোভাগ ও সকল বেদের সার। যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্নতা চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রৎ হইবে, এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে— আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল।" — আত্মজীবনী, প. ৬৬। ব্রাহ্ম আন্দোলনে বেদান্ত বিষয়ক বাদানুবাদের ইতিহাস সম্বন্ধে মহর্ষির আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট §৪৫ অংশে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সংকলিত হইয়াছে।

৮১ চিঠিপত্র ৯, পৃ. ৪৭

৮২ ঐ, পৃ. ২০৫

৮৩ পরিচয় : 'ভগিনী নিবেদিতা', রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩ (শতবার্ষিকী সংস্করণ), পৃ. ৯৪।

৮৪ গোরার তর্কে যুক্তি প্রয়োগ অপেক্ষা জোরই যে বেশি দেখা যাইত, তাহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে— "গোরার সঙ্গে খুব তর্ক বাধিয়া গেল। এইরূপ আলোচনায় গোরা প্রায়ই যুক্তিপ্রয়োগের দিকে যায় না— সে খুব জোরের সঙ্গে আপনার মত বলে। তেমন জোর অল্প লোকেরই দেখা যায়।" —রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ. ৪২৩-২৪।

৮৫ 'ভগিনী নিবেদিতা' : 'পরিচয়' রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ. ৪৮৭।

৮৬ বর্তমান প্রবন্ধটি লিখিত হইবার পর বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮ সংখ্যায় প্রকাশিত ফাদার পিয়ের ফালোঁ রচিত 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৮৬১-১৯০৭'-শীর্ষক রচনাটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফাদার ফালোঁও ব্রহ্মবান্ধব ও গোরার চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন— "গোরা-চরিত্রই ইন্দ্রনাথ-চরিত্রের চেয়ে ব্রহ্মবান্ধবের অনেকাংশে সদৃশ। …গোরা-চরিত্র কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি-বিশেষের হুবহু প্রতিচ্ছবি না হলেও কল্পিত গোরা ও বাস্তব ব্রহ্মবান্ধবের অপূর্ব সহধর্মিতা অবশ্য স্বীকার্য বলে বিশ্বাস করি।"

রবীন্দ্রনাট্যকৃতির প্রেরণা

প্রণয়কুমার কুণ্ডু

> "আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক-এক সময় মনে হয় আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে— লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। এক-এক সময় মনে হয়— আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়, সেগুলো ডায়ারি প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ করে রেখে দেওয়া ভালো, বোধ হয় তাতে ফলও আছে আনন্দও আছে।··· মিল করে ছন্দ গেঁথে ছোটো ছোটো কবিতা লেখাটা আমার বেশ আসে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আপনার মনে আপনার কোণে সেই কাজই করা যাক। মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে।··· যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয় এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না। আবার যখন একটা কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই-কি, এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে।··· কী মুশকিলেই পড়েছি!"[১]

১

শুধু কবিই নন, রবীন্দ্র-পাঠককেও রবীন্দ্র-সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে, তার আলোচনায় মুশকিলে পড়তে হয়।

বাস্তবিকপক্ষে, ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথকে তো জানতাম শুধু কবি বলেই। পরে পরিচয় হয় গল্প, গানের সঙ্গে ; তার পর জেনেছি তিনি নাটকও লিখেছেন। আরো পরে জেনেছি নেহাত একখানা দুখানা নয়, কাব্যের ও নাটকের সংখ্যা প্রায় সমান। তখনো রবীন্দ্র-সাহিত্যের দেউড়ির বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ভিতরে উঁকি মেরে দেখবার যখন সুযোগ এল, তখন চোখে পড়ল সংখ্যার দিক থেকেই নয়, বৈচিত্র্যের দিক থেকেও নাটকগুলি বিস্ময়কর। আর, সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, যাঁকে সবাই সাধারণত কবি বলেই জানে, তাঁর পক্ষে এত বিচিত্র নাটক রচনা করা সম্ভব হল কী করে? এবং কোন্‌ প্রেরণা থেকে এই নাট্যকৃতি সম্ভব হয়েছে?

অবশ্য, ভেবে দেখলে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কালিদাস থেকে মধুসূদন, শেক্সপীয়র, গ্যেটে থেকে ইয়েটস্‌, এলিয়ট প্রমুখ লেখকদের দৃষ্টান্ত তো চোখের সামনেই রয়েছে। কারো ক্ষেত্রে কবিসত্তা ও নাট্যকারসত্তা অভিন্ন, যেমন কালিদাস, গ্যেটে, ইয়েটস ; আবার কারো ক্ষেত্রে এ দুই সত্তার পৃথক্‌ অস্তিত্ব

---

১ ছিন্নপত্রাবলী (বৈশাখ ১৩৭০।১৯৬৩), পত্রসংখ্যা ১০৭, পৃষ্ঠা ১৬২-৬৩। পত্রটি সাজাদপুর থেকে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে ৩০ আষাঢ়, ১৩০০ তারিখে লিখিত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এই চিঠিতে কবি বিস্তারিতভাবে নিজের রচনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থের অন্যত্রও অবশ্য এই ধরণের চিঠি রয়েছে।

রয়েছে, যেমন মধুসূদন, এলিয়ট্ প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথও এই গোষ্ঠীর, তবে কালিদাস, ইয়েট্‌সের সঙ্গেই যেন সমমর্মিতা বেশি। আধুনিককালে আইরিশ নাট্যান্দোলনে ইয়েট্‌সের মতো কবিরাই এগিয়ে এসেছিলেন, তার মূলে ছিল একটিই প্রেরণা—প্রচলিত নাট্যধারাকে গদ্যের অচলায়তন থেকে মুক্তি দেওয়া। নাট্যকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এলিয়ট্ এই কথাই বলেছেন যে, কাব্যধর্মের সঙ্গে নাট্যধর্মের বস্তুত কোনো বৈরিতা নেই। বরং মহৎ নাট্যশিল্পের পক্ষে এই কাব্যগুণ অপরিহার্য উপাদান। আসলে নাট্যকারের পক্ষে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সম্পূর্ণ এক নৈর্ব্যক্তিক চেতনা। এ দিক থেকে, প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ এমন একজন নাট্যকার যিনি কিছুতেই নৈর্ব্যক্তিক হতে পারলেন না সম্পূর্ণভাবে। ফলে বাইরে থেকে মনে হয় তাঁর নাটক বুঝি বা কাব্যেরই রূপান্তর। তবে বাহ্যত দেখা যাচ্ছে, কবি নিজে তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কাব্যের মতো নাটককেও একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন।[২] ছেলেবেলা থেকেই তিনি যে শুধু প্রায় প্রতি নাটকেই অভিনয় করেছেন তাই নয়, প্রযোজনা বা নির্দেশনার ব্যাপারেও বরাবরই তাঁর একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

এমন যে হয়েছে তার কারণ কাব্য যেমন তাঁর আত্মপ্রকাশ, জীবনের আত্মদর্শন- জীবনের সঙ্গে অভিন্ন, নাটকও তেমনি। এবং সেইজন্যই তাঁর কাব্যকৃতি ও নাট্যকৃতির মধ্যে মূলত একই সত্তার প্রকাশ লক্ষ্য করি। অর্থাৎ বলা যায়, বাঙ্ময় অনুভূতিকে কবি কাব্যরূপে প্রত্যক্ষ করেই খুশি হতে পারেন নি, তাকে দৃশ্যমান করতে চেয়েছেন।[৩] শিল্প হিসেবে অবশ্য নাট্যকলার এইটেই প্রধান তাৎপর্য। লেখক বা শিল্পী তাঁর শিল্পের ভিতর দিয়ে যে জীবন ও জগৎকে দেখাতে চান, তার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে; একমাত্র

---

২ নাট্যাভিনয় বা নাটক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যে কী গভীর অনুরাগ ছিল তার নিদর্শন কবির নিজের রচনা থেকে উদ্ধৃত করা গেল :

> "বাল্যকাল হইতেই আমার মনের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের শখ ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ কার্যে আমার স্বাভাবিক নিপুণতা আছে। আমার এই বিশ্বাস অমূলক ছিল না, তাহার প্রমাণ হইয়াছে।" (জীবনস্মৃতি। বাল্মীকিপ্রতিভা)

অবনীন্দ্রনাথের লেখাতেও এর সাক্ষ্য রয়েছে :

> "আমাদের বাড়িতে নাটকের প্রথম ইতিহাস হল—নব-নাটকের বেলা অন্য লোকে বই লিখলেন, আমাদের বাড়ির লোক প্লে করলেন। অশ্রুমতীর বেলা আমাদের বাড়ির লোক বই লিখলেন, বাইরের লোকে প্লে করলেন। তার পরে হল রবিকাকার আমলে আমাদের ঘরের লোক লিখলেন, আমরাই ঘরের ছেলেমেয়েরা অভিনয় করলুম।" (ঘরোয়া)

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

> "আমাদের বাড়িতে এত নাটক অভিনয় হত যে বাইরে নাটক দেখতে যাবার রেওয়াজ ছিল না।" (রবীন্দ্রস্মৃতি)

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন :

> "Play-acting had an important place in the social and intellectual life in our family residence at Jorasanko. My father was born in this tradition and started quite early to write dramas and have them performed by members of the family, usually taking the leading part himself." (*On the Edges of Time, P. 95*)

৩ প্রসঙ্গত অবনীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখযোগ্য :

> "কবির ভাষা চলেছে শব্দ চলাচলের পথ কানের রাস্তা ধরে মনের দিকে, ছবির ভাষা অভিনেতার ভাষা এরা চলেছে রূপ চলাচলের পথ আর চোখে দেখা অবলম্বন করে ইঙ্গিত করতে করতে···" (শিল্প ও ভাষা। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃ. ৪৫। রূপা সংস্করণ)

নাটকের ক্ষেত্রে এই পরিসীমা সবচেয়ে বেশি। কেননা উপলব্ধ জীবনকে বাস্তবরূপে রূপায়িত করবার বা দর্শকের কাছে তুলে ধরবার সুযোগ নাটকে যতটা থাকে অন্যত্র তা থাকে না। কারণ, নাটক তো শুধু লেখকের ব্যক্তিগত মর্জির উপর নির্ভর করে না, নাটকের জীবনালেখ্য যদি প্রত্যক্ষগোচর না করা যায় তা হলে নাট্যরচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। অতএব নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষগোচর জীবনালেখ্য রচনা করা। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ যে নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন, তার পিছনেও এই একই উদ্দেশ্য ছিল।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকারসত্তার পিছনে কবিসত্তার প্রভাবের কথা স্বভাবতই মনে হয়। কিন্তু এই কবিসত্তার স্বরূপ কী? নানা লেখায়,[৪] বিশেষত চিঠিপত্রে[৫] কবি নিজেই তা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বারবার এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তিনি কবি। তা ছাড়া, কাব্যকৃতির আলোচনায় তিনি এ কথাও বলেছেন, এটা এমন একটা ব্যাপার যার পিছনে তাঁর কোনো হাত ছিল না।[৬] স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, তিনি প্রকারান্তরে একটি প্রেরণার কথাই বলতে চেয়েছেন, যে-প্রেরণা থেকে তাঁর সমস্ত সৃষ্টি উদ্‌ভূত। এই প্রেরণা এমন এক অন্তর্নিহিত অনুভূতি যা সব সময় যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখানো সম্ভব নয়। কেননা তা নিতান্তই মানসলোকের বিষয়। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে— বাস্তবের বা দৃশ্যমান জগতের ভিত্তিভূমির উপরই তার অস্তিত্ব। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, যেতে নাহি দিব, ছবি প্রভৃতি কবিতা বিশ্লেষণ করলেই তা বোঝা যায়। ভোরবেলায় এক টুক্‌রো রোদ চোখের উপর পড়তেই চোখের সামনে থেকে রহস্যের যবনিকা সরে গেল; কন্যার বিদায়কালীন ব্যাকুলতা থেকে জীবনের এক নিষ্ঠুর সত্য কবির অন্তরকে স্পর্শ করল। প্রিয়জনের ছবি দেখে মনে পড়ে গেল অতীত জীবনের বিস্মৃত এক অধ্যায়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ হয়তো একটিই ফুল দেখলেন, অমনি চোখের সামনে রূপসমুদ্র সহস্র তরঙ্গে তরঙ্গিত হয়ে উঠল। গ্রীসিয়ান আর্ন দেখতে দেখতে কীট্‌সের সামনে এক অতীত রূপলোক মূর্ত হয়ে উঠল, যেমন নাইটিংগেলের গান শুনে মন হারিয়ে গেল বিশ্বচরাচরের অমূর্ত সুরলোকে। এ সবই প্রেরণা, শিল্পীজীবনের এক বিশেষ মুহূর্তের হঠাৎ আলোর ঝলকানি, যে আলোকের ঝর্ণাধারায় অবগাহন করেই শিল্পের জন্ম। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের জীবন এই প্রেরণার মূর্ত দৃষ্টান্ত।

যেমন কাব্যের ক্ষেত্রে তেমনি নাটকের ক্ষেত্রেও আমরা অপরূপ এক প্রেরণার পরিচয় পাই। এই প্রেরণা থেকেই রবীন্দ্র-নাটকের জন্ম। নইলে, মনে রাখতে হবে, তিনি মাইকেল মধুসূদন বা গিরীশচন্দ্রের

---

৪ কবি নিজেই তাঁর কবিসত্তার আলোচনা করেছেন নানা প্রসঙ্গে; তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

> "জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।" (আত্মপরিচয়। ৪ সংখ্যক প্রবন্ধ।)
>
> "My religion is essentially a poet's religion··· I am not, I hope, boasting when I confess to my gift of poesy, an instrument of expression··· responsive to the breath that comes from the depth of feeling. *(Religion of an Artist.)*

৫ নিম্নলিখিত চিঠিগুলির প্রাসঙ্গিক অংশ দ্রষ্টব্য : ক. ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৫১; খ. তদেব, পত্রসংখ্যা ৯৪; গ. চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড, পত্রসংখ্যা ১

৬ "আমার সুদীর্ঘকালের কবিতালেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।" (আত্মপরিচয়, ১ম প্রবন্ধ)

মতো কোনো সংস্কারকের ভূমিকায় নামেন নি। কিংবা, ইয়েটস্‌ বা এলিয়টের মতো কোনো প্রত্যক্ষ আন্দোলনের জন্যও নাটক রচনা করেন নি। বলা বাহুল্য, মূলত আত্মগত প্রেরণাসঞ্জাত বলেই কাব্যের মতো রবীন্দ্রনাটকও তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বারা পরিপুষ্ট।

এই প্রেরণা অবশ্য ঘটনা-পরিপ্রেক্ষিতে বা প্রকৃতি-বিচারে তিন প্রকারের হতে পারে : ১. অন্তঃপ্রেরণা ২. অনুপ্রেরণা ৩. পরিপ্রেরণা।

যে প্রেরণা একান্তভাবে অন্তর থেকে আসছে তাকে বলা যায় অন্তঃপ্রেরণা। উর্বশী, মানসসুন্দরী প্রভৃতি কবিতার প্রেরণা এই জাতীয়। এই প্রেরণার পিছনে বাইরের কোনো উপলক্ষ্যই নেই, পরিবেশও নেই। হয়তো কোথাও ছিল কিন্তু কবির অন্তরে তা সমাবিষ্ট হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, অনুপ্রেরণা বলতে বুঝি— যে প্রেরণ করছে সে জানে না, শিল্পী তা সংগ্রহ করে নিচ্ছেন। কীট্‌সের 'ওড্‌ টু এ গ্রীশীয়ান আর্ন'-এর ব্যাপার বা 'যেতে নাহি দিব'-র প্রেরণা এই জাতীয়। কবি আর-এক প্রেরণা লাভ করতে পারেন। তা হচ্ছে— পরিপ্রেরণা, যেখানে বাহরের তাগিদই মুখ্য উপাদান বা উৎস। একটা কথা বলা দরকার, যদিও সব সময় ঘটনার বিবৃতি বা বিবরণ (শব্দ দুটির অর্থে সূক্ষ্ম ভেদ আছে) থেকে প্রেরণার মৌল প্রকৃতি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না, (external evidenceএর উপরই নির্ভর করা যথেষ্ট নয়, internal evidenceও বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা চাই) তবু বাস্তব ঘটনা বা পরিবেশ— এগুলি উপেক্ষণীয় নয়। সত্য এক, তথ্য আর ; তবু এ দুয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার টানা-পোড়েন থাকেই।

২

রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক, গীতিনাট্য, বাল্মীকিপ্রতিভার আলোচনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

> "আমার বিলাত যাইবার আগে হইতে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জনসমাগম নামে সাহিত্যিকদের সম্মিলন হইত। সেই সম্মিলনে গীতবাদ্য কবিতা-আবৃত্তি ও আহারের আয়োজন থাকিত। আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর একবার এই সম্মিলনী আহূত হইয়াছিল। ইহাই শেষবার। এই সম্মিলনী-উপলক্ষেই বাল্মীকিপ্রতিভা রচিত হয়।"[৭]

ঠাকুর-পরিবারে এই ধরণের গীতিনাট্যের অভিনয় যে প্রথম বা নতুন নয়, তা অনেকেই জানেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্তোৎসব' এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' তার আগেই অভিনীত হয়েছিল। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ মানময়ীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই গীতিনাট্য বাল্মীকিপ্রতিভার ঠিক এক বছর আগে (১৮৮০) লেখা। এবং এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে কবি ফিরে আসেন ইংলণ্ড থেকে। ইংলণ্ডে থাকাকালীন কবির নানা অভিজ্ঞতার কথা 'য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্রধারা' থেকে জানা যায় ; এগুলি ধারাবাহিকভাবে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কবি য়ুরোপীয় সংগীত সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ইংলণ্ডে থাকার সময় তিনি যে শুধু য়ুরোপীয় সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাই নয়, চর্চাও করেছিলেন। এমন-কি তাঁর কণ্ঠস্বর কীভাবে টেনর-ঘেঁষা হয়ে পড়েছিল, সেসব তথ্য জীবনস্মৃতি-পাঠকের অজানা নয়।[৮]

৭ বাল্মীকিপ্রতিভা। জীবনস্মৃতি।

৮ "সকলেই বলিলেন, রবির গলা এমন বদল হইল কেন, কেমন যেন বিদেশী রকমের, মজার রকমের হইয়াছে। এমন-কি তাঁহারা বলিতেন, আমার কথা কহিবার গলারও একটু কেমন সুর বদল হইয়া গিয়াছে।" —বাল্মীকিপ্রতিভা। জীবনস্মৃতি

বস্তুত, এইসব অভিজ্ঞতা নীহারিকারূপে কবির মনে বিরাজ করছিল। নাট্যাভিনয়ের প্রতি কবির আবাল্য আকর্ষণ। অতঃপর 'বিদ্বজ্জনসমাগম' উপলক্ষে যে মুহূর্তে নতুন নাটক রচনার ডাক এল, কবি এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার সম্পূর্ণ সুযোগ পেলেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার, সুরারোপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এবং গানের ভাষার ক্ষেত্রে বিহারীলাল ও অক্ষয় চৌধুরীর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সাহায্য পেয়েছিলেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে বাল্মীকিপ্রতিভার পিছনে তিনটি উপাদান বা প্রভাব বিদ্যমান—

১. নবলব্ধ য়ুরোপীয় সংগীতের অভিজ্ঞতা ও তার প্রয়োগ-প্রয়াস ২. য়ুরোপীয় অপেরার অনুসরণে নাটক রচনার চেষ্টা ৩. বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের চাহিদা মেটাবার প্রয়োজনীয়তা।

বলা বাহুল্য, এই প্রেরণা পরিপ্রেরণা। আমার নিজের বিশ্বাস, পুরোপুরি রবীন্দ্র-সৃষ্টি হিসেবে এই রচনার বিশেষ মূল্য নেই, সাহিত্যমূল্যও যে বিশেষ আছে তা বলতে পারি না। এই গীতিনাট্যের শেষ গানটি সম্পর্কে অনেকেই সোচ্ছ্বাসে দৈব প্রভাবের কথা বলেছেন। আমার মনে হয় ব্যাপারটি আদৌ তা নয়।

পরিপ্রেরণা-সম্ভূত নাট্যকৃতির আর-এক চমৎকার নিদর্শন 'বিসর্জন', ১৮৯০-এ রচিত। 'বালক' পত্রিকার জন্য কবিকে 'রাজর্ষি' রচনা করতে হয়েছিল। বিসর্জন যে এই উপন্যাসটির বিশেষ আখ্যানভাগ অবলম্বনে রচিত, এ কথা সুপরিচিত। এই রচনা সম্পর্কে এমন কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, রাজর্ষি আসলে একটি রচনার খসড়া মাত্র এবং এ বিষয়ে কবির মনে যথেষ্ট অসন্তোষ ছিল। তবু কবি যে রাজর্ষিকে নতুন করে নাটকে ঢেলে সাজাবার কথা ভেবেছিলেন তা নয়। সম্পূর্ণভাবে বাইরের তাগিদে এই নাটকের উদ্‌ভব। অবনীন্দ্রনাথের[৯] রচনা থেকে জানা যায়—

> "তবে 'বিসর্জন' নাটক লেখার ইতিহাসটা বলি শোনো। তখন বর্ষাকাল, রবিকাকা আছেন পরগনায়। দাদা অরুদা আমরা কয়জনে একটা কী নাটক হয়ে গেছে, আর-একটা নাটক করব তার আয়োজন করছি। 'বউঠাকুরানীর হাট'[১০]এর বর্ণনাগুলি বাদ দিয়ে কেবল কথাটুকু নিয়ে খাড়া করে তুলেছি নাটক করব। ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ছে, আমরা সব তাকিয়া বুকে নিয়ে এইসব ঠিক করছি— এমন সময় রবিকাকা কী একটা কাজে ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন, দেখি কী হচ্ছে। খাতাটা নিয়ে নিলেন, দেখে বললেন, না, এ চলবে না— আমি নিয়ে যাচ্ছি খাতাটা, শিলাইদহে বসে লিখে আনব, তোমরা এখন আর-কিছু কোরো না। যাক আমরা নিশ্চিন্ত হলুম। এর কিছুদিন বাদেই রবিকাকা শিলাইদহে গেলেন, আট-দশদিন বাদে ফিরে এলেন, 'বিসর্জন' নাটক তৈরি।"

'বিসর্জন' রচনার এই হচ্ছে 'হেতু' বা উপলক্ষ এবং নাটকটির ভূমিকায় উল্লিখিত "তারি শ' খানেক পাতা"র এই হচ্ছে পশ্চাৎপট।

'বিসর্জন'এর মতোই পরিপ্রেরণার আর-এক নিদর্শন 'চিরকুমার সভা' (১৯০১), 'ভারতী'র (১৩০৭-৮) প্রয়োজনে লিখিত। বঙ্কিমচন্দ্রকে যেমন পাঠকদের কথা ভেবে বঙ্গদর্শনের জন্য অনেক কিছু

৯ ঘরোয়া।

১০ বিশেষভাবে লক্ষণীয়, অবনীন্দ্রনাথ বিসর্জন নাটকের কথা বলতে গিয়ে 'বউঠাকুরানীর হাট'এর কথা উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, তিনি রাজর্ষির কথাই বলতে চেয়েছেন। বস্তুত বিসর্জন নাটকটির আখ্যানভাগ রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথমাংশ থেকে গৃহীত। তবে গুণবতী ও অপর্ণার চরিত্র নতুন সৃষ্টি।

লিখতে হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে সুন্দর ও মনোজ্ঞ এক বিবরণ দিয়েছেন—

"My cousin, Sarala Devi, was then editing the literary journal Bharati.··· Saraladidi had asked father to write a short drama for the journal. He had been putting it off, not feeling in the mood to write a drama. Knowing him as she did, Saraladidi advertised that the first instalment of a light drama by the poet Rabindranath would be published in the next issue of Bharati. After a few days she wrote to father informing him that she had to do this in order to stimulate the flagging interest of the public in the journal, and begged him not to let her down. Father was furious at first ; but the next day he told mother not to disturb him for meals, but to send him occasionally glasses of liquid refreshment, as he would be busy writing. He shut himself up for three days in his room, and wrote without break on a fasting diet. By the end of the third day, he had finished that witty drama Chirakumar Sabha (Bachelors' Club). Not trusting the MS. to the post he himself hurried off to Calcutta with it."[১১]

'চিরকুমার সভা'র জন্মলগ্নে এমনি এক বাইরের তাগিদ রয়েছে। সরলা দেবী নিজেই স্বীকার করেছেন, উদ্‌ধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে, জনসাধারণের চাহিদা মেটাবার জন্যই তাকে ঐ উপায় অবলম্বন করতে হয়েছিল। নইলে এই নাটক রচনায় তাঁর অন্তরের তাগিদ আদৌ ছিল না বললেই হয়। পূর্ববর্তী আলোচিত নাটকগুলির দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখব, সবৈব না হোক, সমকালীন কাব্য বা অন্যান্য রচনার সঙ্গে ঐসব নাটকের কিছুটা যোগসূত্র অন্তত আছে। কিন্তু এই নাটক প্রসঙ্গে তা আদৌ বলা যায় না। এই নাটকের সমকালীন রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নৈবেদ্য, ঔপনিষদ্ ব্রহ্ম, গল্পগুচ্ছ ২য় খণ্ড। কোথায় নৈবেদ্য আর কোথায় চিরকুমার সভা !

'চিরকুমার সভা'র পরবর্তী ইতিহাস[১২] কয়েকটি চিঠিতে কবি নিজেই আলোচনা করেছেন—

"চিরকুমার সভার শেষ দিকটায় একেবারে full steam লাগানো গিয়েছিল— ক্রমাগত তাড়া খেয়ে খেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলুম— যেমন করে হোক্ শেষ করে দিয়ে অঋণী হবার জন্যে মনটা নিতান্তই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তার পরে যখন তোমার কাছে শুনলুম শেষ দিকটা ক্রমেই ঢিলে হয়ে আসচে— তখন কলমের পশ্চাতে খুব একটা কড়া চাবুক লাগিয়ে একদমে শেষ করে দেওয়া

১১ Father's Literary Output : *On the Edges of Time.*

১২ বিশেষভাবে লক্ষণীয়, রথীন্দ্রনাথ বলেছেন 'He shut himself up for three days', অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যেই নাটক রচনা শেষ হয়ে গিয়েছিল। অথচ রবীন্দ্রনাথের নিম্ন-উল্লিখিত পত্রাংশ থেকে বোঝা যায়— দীর্ঘদিন ধরে এই নাটক লেখা চলছিল। স্বভাবতই পাঠকের মনে হয়, পিতা-পুত্রের উক্তির মধ্যে কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে। সম্ভবত রথীন্দ্রনাথ যা বলেছেন— তার অর্থ এই যে, এই নাটকের প্রথম অঙ্ক তিন দিনে লেখা সমাপ্ত হয়েছিল।

গেছে। সকল সময়ে মেজাজ কি ঠিক থাকে?… নিতান্ত অনিচ্ছা এবং নিরুদ্যমের মধ্যে কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞার জোরে ওটা শেষ করেছি— মনের সে অবস্থায় কথনো রস নিঃসারণ হয় না।… যখন বই বেরোবে তখন অনেকটা বদল হয়ে বেরোবে।"[১৩]

এরই সূত্র ধরে কবি আবার লিখেছেন—

"চিরকুমার গরমের সময় আরম্ভ করেছিলুম, ভেবেছিলুম এইভাবেই তোড়ের মুখে লিখে যাব— কিন্তু ক্রমে যখন হেমন্তের হিম এবং শীতের কুয়াশা আমাকে আচ্ছন্ন করে ধরল তখন কল্পনার ডানা প্রতিদিনই জড়িয়ে আস্‌তে লাগল— তখন নিজের উপর এবং লেখার উপর নিতান্তই জুলুম চালাতে হল। ফিবারেই অনিচ্ছা এবং জড়ত্বের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করতে করতে লেখা সারতে হল।"[১৪]

অতঃপর, এই নাটকের পিছনে যে পরিপ্রেরণা বিদ্যমান সে বিষয়ে আর কিছু বলার থাকে না।

এর পাশাপাশি অন্তঃপ্রেরণা বা অনুপ্রেরণা -সম্ভূত নাটকের :উৎস সন্ধান করলে দেখা যাবে, এই নাটকগুলি পূর্বোক্ত অনুরূপ কোনো বাইরের তাগিদ বা প্রয়োজন ছাড়াই অন্তরের গভীর আকুতিতেই রচিত। এই পর্যায়ের নাটকগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪)। কবি সূচনায় বলেছেন, "এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত।"

এবং জীবনস্মৃতিতে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

"আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময়, অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল— এই প্রকৃতির প্রতিশোধও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্য রচনার ইহাও একটা ভূমিকা।"

পুনশ্চ, কবি আলোচনাসূত্রে বলেছেন—

"আমার পনেরো-ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে, ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল।"

বস্তুত, এই নাটক রচনার সময় কবির বয়স ছিল বাইশ। দেখা যাচ্ছে, এই পর্বের কবিজীবনের আর্তিকেই এই নাটকে রূপ দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে লেখা কয়েকটি কবিতার দিকে, যেমন— যোগী, নিশীথচেতনা, নিশীথ জগৎ, দৃষ্টি আকর্ষণ করে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে, এই কবিতাগুলির মধ্যে, বিশেষত নিশীথ জগৎ-এ, প্রকৃতির প্রতিশোধের দূরতর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। লক্ষণীয়, বাল্মীকিপ্রতিভার মতো এখানেও নায়ক সন্ন্যাসী এবং তার অন্তরের যে দ্বন্দ্ব, তাকে ভাষান্তরে বলা যায় সীমা-অসীমেরই দ্বন্দ্ব, যা কবি স্বয়ং আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

---

১৩ চিঠিপত্র, ৮ম খণ্ড। ১৪৮-সংখ্যক পত্র।

১৪ তদেব, ১৫০-সংখ্যক পত্র।

অর্থাৎ বলা যায়, আলোচ্যপর্বে কবির অন্তর্জীবনে যে দ্বন্দ্ব জেগেছিল সেই অন্তঃপ্রেরণা থেকেই এই নাটকের জন্ম। বাস্তবিকপক্ষে, প্রকৃতির প্রতিশোধই প্রথম নাটক যা একান্তভাবেই তাঁর আত্মপ্রকাশ, অন্তর্গূঢ় জীবনাকৃতি; জীবনের মর্মমূলে যার বীজ নিহিত এবং যার পিছনে এই অন্তঃপ্রেরণা ছাড়া বাইরের অন্য কোনো তাগিদই নেই।

প্রশ্ন হতে পারে, এই আত্মপ্রকাশের জন্য তো কবিতাই ছিল এবং কাব্যের ক্ষেত্রেই তো কবির সহজ বিচরণ, তবে কেন নাটকের আশ্রয় গ্রহণ? আগেই বলেছি, এ যেন কতকটা আত্মদর্শন, নিজের মনের জগৎকে নিজে দেখা। কবির মনে যে ভাবজগৎ রয়েছে, তা তখনই পরিপূর্ণ ও সার্থক হয়ে ওঠে যখন তা রূপলোকে রূপান্তরিত হয়। কাজেই, কবি যখন জীবনের সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য ব্যাকুল, মর্ত-জীবনের দিকে তাকিয়ে জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে চাইছেন, তখন স্বভাবতই এই দৃশ্যমান বাস্তব জগৎ রূপ রস নিয়েই কবির সামনে দাঁড়িয়েছে। কেননা, জীবন তো নিছক ভাবজগৎ নয়, রূপজগৎ হিসেবেই তার বেশি আত্মপ্রকাশ। সেখানে প্রকৃতি আছে, মানুষও আছে— এক কথায় বাহ্যজগৎ শারীর রূপে অবতীর্ণ। বলা বাহুল্য, নিছক ভাবজগৎ নয় বলেই জীবনের মানব-সমন্বিত ছবিটিই উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে— যেখানে অসংখ্য নরনারী নানা রূপে, হাসিকান্নায় স্নেহমোয়ায় মূর্ত। এমন এক উপলব্ধিকে নিঃসন্দেহে মূলত ভাবময় কবিতার মধ্যে রূপদান করা সম্ভব হত না, সেই কারণেই কবি নাটকের আশ্রয়ে এই চিত্রটিকে তুলে ধরে তার মধ্যে পরোক্ষভাবে নিজেকে সন্নিবিষ্ট করে নিজের মানসপ্রকৃতির প্রতিবিম্ব খাড়া করেছেন। সন্ন্যাসী হচ্ছে কবিরই একটা প্রতিচ্ছবি, কী বাল্মীকি-প্রতিভায় কী অন্যান্য নাটকে। প্রায় সব নাটকেই এই জাতীয় এক-একটি চরিত্রের অবতারণা রয়েছে। তবে এই নাটকের সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরবর্তীকালের সন্ন্যাসী বা তদনুরূপ চরিত্রের তুলনায় দেখা যাবে যে, সেইসব চরিত্রের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বই নেই। এমন হয়েছে কেন? কারণ, এই পর্বে কবির নিজের মনই যে দ্বন্দ্বমুখর, পরবর্তী পর্বে কবিমনের সেই দ্বন্দ্ব প্রায় নেই। সীমা-অসীমের যে মিলন-সাধনের কথা বলেছেন কবি, এই পর্বেই সেই বিশিষ্ট অনুভূতির সূচনা। কবিমনের এই দ্বন্দ্বই, বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসীর মধ্যে রূপায়িত। তাই বলছি, প্রকৃতির প্রতিশোধের আবির্ভাব কবির আত্মপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং অন্তঃপ্রেরণাই এই নাটকের উৎস।

এদিক থেকে 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'মালিনী' নাটকের আলোচনায় দেখা যাবে— এই নাটক-দুটি অনুপ্রেরণা-সঞ্জাত। দুটি নাটকই বিশেষ অনুপ্রেরণা থেকে উদ্ভূত। কবি নিজেই সেই উৎসটি জানিয়ে দিয়েছেন। 'চিত্রাঙ্গদা'র ভূমিকায় কবি লিখেছেন:

> "অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে; তখন বোধ করি চৈত্র মাস হবে। রেললাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে, আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে··· সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল, সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার আপন স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্‌কার দিতে পারে।··· এই ভাবটাকে নাট্য আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনই

মনে এল, সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল।"

'মালিনী' নাটকের ভূমিকাতেও কবি নাটকটির জন্মলগ্নের ইতিহাসটি তুলে ধরেছেন—

"'মালিনী' নাটিকার উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত।…

"তখন ছিলুম লণ্ডনে। নিমন্ত্রণ ছিল প্রিম্‌রোজ হিলে তারক পালিতের বাসায়।… তাঁর ওখানেই রাত্রিযাপন স্বীকার করে নিলুম।…

"এমন সময় স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল, দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।

"কিন্তু অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেক দিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হল।"

দেখা যাচ্ছে, চিত্রাঙ্গদার ক্ষেত্রে রয়েছে একটি প্রাকৃতিক অনুপ্রেরণা, এটা অবশ্য নতুন নয়, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ থেকে শুরু করে এমন অসংখ্য রচনাই রবীন্দ্রকাব্যে আছে, নতুনত্বের মধ্যে— কবি একটি প্রাকৃতিক অনুভূতিকে কেন্দ্র করে সরাসরি মানবলোকে পদার্পণ করেছেন, বা বলা চলে, এই অনুপ্রেরণা থেকে মানবজীবনের এক সত্যানুভূতি লাভ করেছেন। এখানেও সেই একই ব্যাপার— কবি যেদিকেই তাকান না কেন, যেখান থেকেই উপাদান সংগ্রহ করুন না কেন, বারে বারে ফিরে ফিরে তাঁকে মানবলোকের দ্বারস্থ হতে হয়েছে— 'মানুষের মন চায় মানুষেরই মন।' আমার বিশ্বাস, প্রকৃতিই হোক আর অরূপই হোক অথবা আধ্যাত্মিক কোনো অনুভূতি— সব কিছুকেই কবি বারবার মানবজীবনের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করে তাকে মানবজীবনরসে রসায়িত করতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রকাব্যের এইটেই সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। বস্তুত, এই কারণেই পূর্বোক্ত অনুভূতির রূপায়ণে নাটকের আশ্রয় নিয়েছেন, তার প্রকাশ ঘটেছে নাট্যের আঙ্গিকে। কেননা, শিল্পমাত্রই কোনো একটা আকার বা অবয়ব খোঁজে, তা শুধুমাত্র ভাবের বিষয় নয়। এ ক্ষেত্রে কবি সেইজন্যই নাট্যলোকে অবতীর্ণ। অর্থাৎ দেখা গেল চিত্রাঙ্গদার পিছনে রয়েছে একটা প্রাকৃতিক অনুপ্রেরণা; তার ভূমিকা কিছুটা বিভাবের মতো, যা জারকরসে রসায়িত হয়ে অবশেষে এই নাটকের জন্ম দিয়েছে।

'মালিনী'ও এই অনুপ্রেরণা থেকেই উঠে এসেছে, তবে তার উৎস একটি স্বপ্ন। চিত্রাঙ্গদায় যেমন অনুভূতির রূপান্তর ঘটেছে অর্থাৎ একটি অনুভূতির রূপকে অন্য রূপ দিয়েছেন, এখানে তা হয় নি। এই নাটকে স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাই, যা একটি বিশেষ ঘটনা রূপে উদ্‌ঘাটিত, সরাসরি নাট্যরূপ নিয়েছে। মালিনী

---

১৫ বিলাতে থাকার সময় (১৮৭৮ সেপ্টেম্বর - ১৮৮০ ফেব্রুয়ারি) তারক পালিতের বাসায় কবি যে স্বপ্ন দেখেন, সেই স্বপ্ন অবলম্বনে 'মালিনী' রচনা করেন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধান। কবির অবচেতন মনে যে ছবি বিরাজমান ছিল, তাই নাট্যকারে রূপায়িত হয়েছে। বস্তুত শুধু মালিনীর ক্ষেত্রেই নয়, রবীন্দ্রসাহিত্যে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় জন্মলগ্নের ইতিহাস আলোচনার দিক থেকে রীতিমতো চমকপ্রদ, গুরুত্বপূর্ণও বটে।

নাটকের কাহিনী বা বিষয়বস্তু নিশ্চয়ই দুই বন্ধুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, কিন্তু কবি স্বপ্নে যা দেখেছেন, সেই স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাই যে এই নাটকের কাঠামো রচনা করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কবি সুকৌশলে এই স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাতেই নাটকটির সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে, কালগত ব্যবধান সত্ত্বেও[১৫] স্বপ্নজনিত একটি অনুপ্রেরণা সরাসরি এই নাটকের জন্ম দিয়েছে। গুণগত বা মাত্রাগত বিচারে তা হলে বলতে পারি— এই দুটি নাটক অনুপ্রেরণা থেকে এলেও মালিনীর ক্ষেত্রে এই অনুপ্রেরণা প্রবলতর। দুটি নাটকেই কবি প্রচলিত কাহিনীকে নতুন অনুভূতিতে নব রূপ দিয়েছেন, কবির অন্তরে যে প্রেম ও কল্পনা রূপ নেবার জন্য প্রতীক্ষা করছিল, কবির অন্তরপুরুষ যেন তাতে সাড়া দিয়ে ঐ অনুপ্রেরণা রূপে একটি প্লট পাঠিয়ে দিলেন; এইভাবে কবির অন্তরাকৃতি অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়ে নাটকে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

৩

অন্তঃপ্রেরণা, অনুপ্রেরণা ও পরিপ্রেরণা: গুণগত বিচারে প্রেরণার এই তিনটি স্তরভেদ করা হলেও প্রথম দুটি প্রেরণাকে একই শ্রেণীভুক্ত করা যায়, কেননা এ দুয়ের মধ্যে কবির অন্তরই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে যেটুকু উপলক্ষ রয়েছে আসলে নাটক রচনার ক্ষেত্রে তা হেতু হয়ে দাঁড়ায় নি, তা হেত্বাভাষ মাত্র। শিল্পী নন্দলাল বসু বলতেন, কলসী পূর্ণ হয়ে আছে, হাত ঠেকল কি না-ঠেকল অমনি জল গড়িয়ে পড়ল। কিংবা, উপমা দিয়ে বলতে গেলে, গ্রামোফোনে রেকর্ড লাগানো রয়েছে, একটি শুধু পিনের অপেক্ষা, লাগানো হল, বেজে উঠল। বলা বাহুল্য, পিনটা নিতান্তই উপলক্ষ মাত্র। অনুপ্রেরণার ব্যাপার ঠিক তাই। অতএব, বলা যায়— মূলত অন্তঃপ্রেরণা ও অনুপ্রেরণা অন্তরাশ্রয়ী বা স্বয়ম্ভু প্রেরণা। বহিঃপ্রেরণার বা পরিপ্রেরণার ব্যাপার ঠিক এর বিপরীত, সেখানে প্রত্যক্ষভাবেই একটি ব্যবহারিক দিক রয়েছে বা বাইরের তাগিদে রয়েছে, যে তাগিদে কবি নাটক রচনায় হাত দিয়েছেন। তবে একথাও ঠিক, স্বভাব-কবি বা শিল্পীর রচনায় ভিতরের সাড়া থাকবে না, তা হতে পারে না। কেননা সমস্ত রূপকলাই ভিতর ও বাইরের যোগে। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের মিলন হলে তবেই রূপকলা সৃষ্টি হতে পারে। শুধু মাত্রা নিয়ে প্রশ্ন এবং শিল্পবিচারে দেখতে হয় মূল উৎস কোথায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রেরণার প্রভেদ অনুসারে নাটকগুলির কি রূপভেদ ঘটেছে? অর্থাৎ আঙ্গিকগত কোনো পার্থক্য ঘটেছে কি? বলা বাহুল্য, পার্থক্য না থেকে পারে না। কেননা, কবি যখন একান্ত আত্মগতভাবে নাটক রচনা করেছেন তখন সেখানে অন্তরের বাণীমূর্তি দেওয়াটাই বড়ো হয়ে উঠেছে, আর যেখানে বাইরের প্রয়োজনের কথা ভেবে লিখতে হয়েছে, তখন কখনো তাঁকে অভিনেতা-অভিনেত্রী, দর্শকদের এমন-কি মঞ্চের কথাও ভাবতে হয়েছে। চাইকি পত্রিকার জন্য যখন লিখেছেন, তখন বাইরের পরিবেশের কথা না ভেবে পারেন নি। স্বভাবতই নানা প্রকরণগত দিক মাসিকপত্রে লেখার পদ্ধতির কথাও ভাবতে হয়েছে। অতএব, প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা যায় অন্তঃপ্রেরণা ও অনুপ্রেরণামূলক নাটক-গুলির সঙ্গে পরিপ্রেরণামূলক নাটকগুলির আঙ্গিকগত পার্থক্য রয়েছে। এবং এই পার্থক্য খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রথম শ্রেণীর নাটকগুলির তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটকগুলির অভিনয়যোগ্যতায় বা মঞ্চসাফল্যে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও 'বিসর্জন'এর তুলনা করা যাক্। বিসর্জন নাটকটি শেক্সপীয়রের পঞ্চমাঙ্ক নাট্যকলার আদর্শে রচিত, তখন সেইটেই দস্তুর ছিল। এই নাটকটি রবীন্দ্রনাথের বিরলতম নাটক যা প্রথম থেকেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। নাটকটির প্লট-পরিকল্পনা চরিত্রচিত্রণ, সর্বোপরি ঘাত-প্রতিঘাতের তীব্রতা, ঘাতময়তা— সব মিলিয়ে এক নিখুঁত নাট্যসৃষ্টি।

এর পাশাপাশি, অন্তঃপ্রেরণাজাত 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ কী দেখি? নাটকটির দৃশ্যবিন্যাস আছে বটে, জনতার দৃশ্য আছে, সন্ন্যাসীর অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রও রয়েছে— নাটকটি ষোলোটি দৃশ্যে বিভক্ত। কিন্তু প্লট? চরিত্র? ঘাতপ্রতিঘাত বা নাটকীয়তা? এই নাটকে এসব কোথায়? অল্প বয়সের লেখা, কলাকৌশলের দখল, মানবজীবনের জ্ঞান অভিজ্ঞতা কম ছিল, সন্দেহ নেই। তবু নাট্যধর্ম প্রায় অনুপস্থিত কেন? বস্তুত এ নাটকে যদি কিছু থাকে তবে তা সন্ন্যাসীর আকৃতি, তাও নাটকীয় চরিত্র হিসেবে অসম্পূর্ণ সৃষ্টি। কবি ভূমিকায় বলেছেন, "সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা।" যা একান্তই একলার কথা, যার মধ্যে কেবল নিজের অন্তরের পরিচয় রয়েছে তা কখনো নাট্যীয় বিষয় বা নাটকীয় হতে পারে না। আসলে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নিতান্তই আকৃতিতে নাটক, প্রকৃতিতে নয়।

এই দুটি নাটকের তুলনায় বোঝা গেল, পরিপ্রেরণামূলক নাটকগুলির নাট্যকলার বিচারে সার্থক, যথার্থ নাট্যধর্মী রচনা। বাল্মীকিপ্রতিভা, চিরকুমার সভা প্রভৃতি অন্য সমস্ত পরিপ্রেরণামূলক নাটক সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য। শুধু তাই নয়, অন্তঃপ্রেরণা-অনুপ্রেরণামূলক ও পরিপ্রেরণামূলক নাটকগুলির মধ্যে আর-এক গভীর পার্থক্য রয়েছে। শুধু প্রকৃতির প্রতিশোধই নয়, এই পর্যায়ের নাটকগুলি মূলত কাব্যধর্মী, কাব্যধর্মী বলেই এই নাটকগুলির সঙ্গে সমকালীন কোনো কাব্য বা কবিতার সঙ্গে সাযুজ্য চোখে পড়ে; বস্তুত এইসব নাটকেই কবির যথার্থ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তিনি কাব্যে বা বিশেষ কবিতায় যে কথা বলেছেন, নতুন করে তাকেই যেন নাট্যরূপ দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে গীতাঞ্জলি, রাজা, ডাকঘর এর রূপকল্প, ভাবানুষঙ্গ ও আঙ্গিকগত স্বাধর্ম্য স্মরণযোগ্য। এই পর্যায়ের নাটকের আলোচনায় সমকালীন বা সমধর্মী কাব্য বা কবিতার আলোচনা অপরিহার্য, কেননা তা পরস্পর সম্পূরক। যেমন ডাকঘর এর আলোচনায় গীতাঞ্জলি পর্বের সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ একান্ত প্রয়োজন, তা যদি না করা হয় তা হলে সে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে তো যাবেই, রবীন্দ্রনাথের অন্তরলোকের পরিচয়ও ঠিকমতো পাওয়া যাবে না। সবচেয়ে বড়ো কথা, ডাকঘরের আঙ্গিকের উপর গীতাঞ্জলির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে, ভাবগত সমধর্মিতার কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল। অন্তঃপ্রেরণামূলক নাটকের এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অন্যদিকে পরিপ্রেরণামূলক নাটকের সঙ্গে কোনো সমকালীন বা সমধর্মী রচনার মিল থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এগুলি আদৌ সম্পূরক নয়। অর্থাৎ এই নাটকগুলির স্বতন্ত্র এক সত্তা রয়েছে যা প্রত্যক্ষভাবে অন্য কোনো রচনার উপর নির্ভরশীল নয়।

যদিও, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটকের দিকে তাকিয়ে বলা যায় তাঁর কবিসত্তা ও নাট্যকারসত্তাকে সম্পূর্ণরূপে পৃথকভাবে দেখা সম্ভব নয়, তবু এ কথা স্বীকার করতেই হবে অন্তঃপ্রেরণামূলক নাটকে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা যেমন মূর্ত, পরিপ্রেরণামূলক নাটকে তেমনি তাঁর নাট্যকারসত্তাই প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।
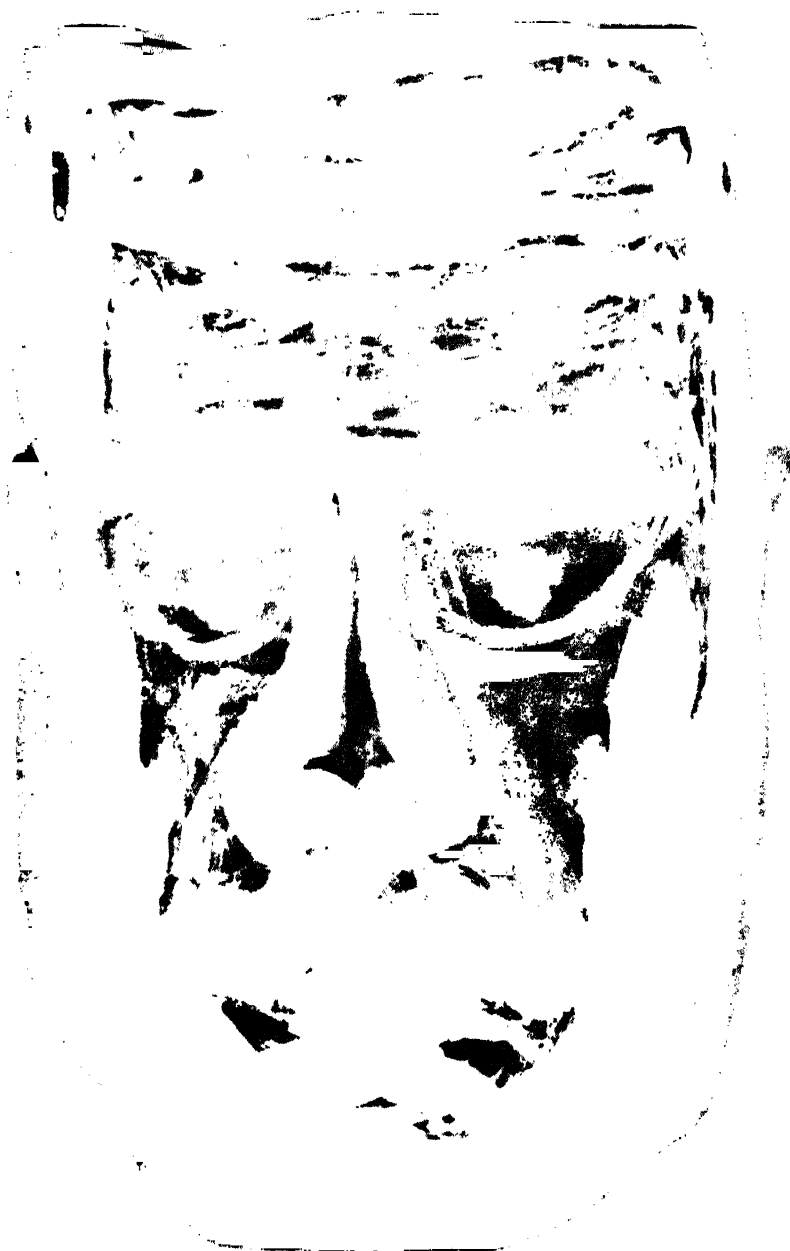
রবীন্দ্রনাথ - অঙ্কিত

রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা

অনুপম গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার সূচনা তাঁর ক্যালিগ্রাফি থেকে। ছন্দবদ্ধ কবিতার চার পাশে অসুন্দর কাটা-কুটিকে তিনি ছন্দে উত্তীর্ণ করতে গিয়ে রূপসৃষ্টি শুরু করলেন। প্রথমে রেখার তরঙ্গে শুধু ছন্দের দ্যোতনা এল, কিন্তু তার প্রকৃতি ছিল একেবারেই নির্বস্তুক। কোনও বাস্তব রূপের আভাস তাতে মেলে না। ক্রমে সেই ছন্দিত কালো কালিতে আঁকা রেখার তরঙ্গে রূপের আভাস এল কোথাও একটা চোখ অথবা কোথাও কোনও কাল্পনিক জন্তুর মাথা বা প্রত্যঙ্গের অস্পষ্ট ইঙ্গিতের মধ্যে। সুতরাং ছবি আঁকার প্রেরণার মূলে একটা অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে ছন্দের দিকে স্বভাবসিদ্ধ ঝোঁকের কথা উল্লেখ করা যায়। ছবির গুণগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও এই রেখায় ও রঙে, রূপের প্রকরণে এবং শিল্পীর তাগিদ অনুযায়ী গঠনের ভাঙাগড়ায় ছন্দবদ্ধ প্রকাশভঙ্গী লক্ষণীয়। ছবির ছন্দ কি— এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র ছবির মধ্যেই খুঁজতে হবে। ছবির ভাষাকে শুধুমাত্র রেখায় ও রঙেই প্রকাশ করা যায়, কথায় তার অনুবাদ চলে না। তবে আলোচনার সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথের কিছু নির্দিষ্টভাবে ছান্দসিক ছবির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যেমন, কালি-কলমে আঁকা রজনীগন্ধা ছবিটি। রজনীগন্ধার পেলব শুভ্রতা, রঙের বুনুনি বা texture তাছাড়া আমাদের ঋতু উৎসব ও মেজাজের সঙ্গে তার সম্পর্ককে রূপ দিতে গিয়ে তিনি রজনীগন্ধার ডাঁটকে তরঙ্গিত রূপ দিলেন। এখানে ডাঁটটির ঋজুগঠনকে আপন খেয়ালে, রূপসৃষ্টির বিশেষ তাগিদে রবীন্দ্রনাথ ভাঙলেন। তার পরিবর্তে এল বিশুদ্ধ ছন্দের দ্যোতনা, যেটা রজনীগন্ধার স্বীয় প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তুলল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের একেবারে শেষ পর্বে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। এর আগে চিত্রকলায় তাঁর অনুশীলনের কোনও খবর আমরা পাই না। জীবনের বিভিন্ন পর্বে যখন কথা ও সুরের বিচিত্র ধারায় অনুভূতির ও উপলব্ধির ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে চলেছেন তখন ছবির জগৎ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে আমরা জানি না। কাজেই অভ্যাসসিদ্ধ দক্ষতা অর্জনের অবকাশ তিনি পান নি তখন। এখানে প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে অন্যান্য সমালোচকদের মতামত অনুধাবনযোগ্য—

> "সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে, অসাধারণ অধিকার ছিল, ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর যে ব্যুৎপত্তি ছিল, চিত্রের ভাষা সম্বন্ধে তাঁর সে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল না। কিন্তু চিত্রের ভাষার মূল সত্যকে তিনি দেখেছিলেন অনায়াসে এবং সেই সহজ জ্ঞানকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন অনায়াসে।"[১]

অতএব কোনও অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য রূপের খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁর সচেতনা ও প্রকাশে দক্ষতা হয়ত ততটা ছিল না। প্রসঙ্গতঃ 'সে' বইটির ছবিগুলির কথা উল্লেখ করা যাক। "তারো, তারো, তারো" অথবা "একি চেহারা তোমার" ইত্যাদি ছবিতে ভুরুর ভঙ্গী কপালের কুঞ্চন বা নাক ও ঠোঁটের পাশে ভাঁজ তুলে তিনি বিশেষ চিত্রগত ভাবটিকে প্রকাশের প্রয়াস পান নি। অথচ এইসব সত্ত্বেও অভিব্যক্তির কি যেন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক সঙ্কেত ধরা পড়েছে, যার ফলে চিত্রগত ভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে ও দর্শকের মনে বিশেষ আবেগটি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে,

---

১ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়: মনোরঞ্জন গুপ্ত লিখিত 'রবীন্দ্র-চিত্রকলা'র সমালোচনা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৮

রবীন্দ্রনাথের ছবির একটা প্রধান গুণ হল তার অভিব্যঞ্জনা। এইজন্য প্রচলিত সমাহিত ভারতীয় রীতির থেকে তাঁর ছবির ধরণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অনেক অস্থির চঞ্চল ও গতিশীল। 'সে' বইটির আর-একটি ছবিতে বাঘ গুড়ি মেরে আসছে, এর মধ্যে বাঘের ক্ষিপ্রতা ও হিংস্রতা অত্যন্ত স্পষ্ট ধরা পড়েছে। পাশাপাশি এই প্রসঙ্গে পশ্চিমের শিল্পী রেমব্রাঁ ও ডমিয়ের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। অথচ যাঁর কাজের পিছনে প্রথাগত অনুশীলনের নজির নেই তিনি এই সঠিক ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা কোথায় পেলেন? এখানে অনুরূপ এক প্রসঙ্গে ইউরোপীয় ভাস্কর জিয়াকমেত্তির উক্তি আমাদের সাহায্য করতে পারে—

"A man far away has no more individuality than a pin if we don't know him. If he's someone we know, we recognize him and he assumes an identity for us. Why? It's the relationship between his masses and quantities. If he's hollow eyed, the shadows on his cheeks are longer. If he has a large, bold nose, there's a stronger patch of light in that spot, and his no longer the anonymous pin. So it's the sculptor's job to make those humps and hollows create an identity by highlighting the essential points that tell us this is one person rather than another."[২]

অভিব্যক্তি প্রকাশের বেলাতেও এক কথা, সেই বিশেষ রেখাগুলিকে, আলোছায়ার ভাবনির্দেশক চিহ্নগুলিকে ধরতে হবে। এখানে রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ বোধশক্তি অনুশীলনে বিকল্প হিসাবে কাজ করল। ফলে অত্যন্ত গতিবেগ সম্পন্ন ভাব ও অভিব্যক্তিতে ছবিগুলি সমৃদ্ধ হল।

রবীন্দ্রনাথের ছবির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যই হল তার চাঞ্চল্য। জীবনের স্রোত হয় সেখানে স্পষ্টতঃই গতিশীল অথবা কোনও গভীর আলোড়নের সম্ভাবনা বহন করছে। ভারতীয় রীতিতে আঁকা ছবির মেজাজ সাধারণতঃ স্থির, প্রকাশিত ভাব অত্যন্ত সমাহিত ও দর্শকের নিকট উপস্থাপিত ধারণা মোটামুটি-ভাবে স্নিগ্ধ ও সুন্দর। অস্থিরতা ও গতিশীলতা ইউরোপীয় চিত্রকলার বিষয়বস্তু দীর্ঘকাল ধরে। অস্থির সঞ্চালনকে ছবির বিষয়বস্তু করে মিকেলাঞ্জেলো থেকে জ্যাক্সন্ পোলোক্ পর্যন্ত সবাই ছবি এঁকেছেন ও আঁকছেন। এই অস্থিরতা ছবির মধ্যে প্রকাশ করতে হলে বস্তুর ভারসাম্যকে কিছুটা বিপর্যস্ত করবার প্রয়োজন হয়। সেখানে ভারসাম্যকে বিপর্যয়ের সীমায় এনে বিষয়বস্তুর জঙ্গমতাকে ধরবার রীতি। এ যুগের ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও অস্থির মানুষ পিকাসো নিজের আঙ্গিক সম্বন্ধে বলছেন—

"For me painting is a dramatic action in the course of which reality finds itself split apart.···The pure plastic act is only secondary as far as I am concerned. What counts is the drama of that plastic act, the moment at which the universe comes out of itself and meets its own destruction.···

"What people forget is that everything is unique. Nature never produces the samething twice.···That's why I stress the dissimilarity, for example, between the left eye and the right eye.···So my purpose is to set things in movement, to

২ Francoise Gillot: *Life with Picasso*, Signet Book (New American Library) p. 195

'তারো তারো তারো'

'এ কী চেহারা তোমার'

provoke this movement by contradictory tensions, opposing forces, and in that tension or opposition to find the moment which seems most interesting to me."[৩]

বিঘ্নকারী চাঞ্চল্য রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ চিত্রগুলিতেও বিশেষভাবে চোখে পড়ে। আলো সেখানে সব সময় পশ্চাতে। উজ্জ্বল হলুদ, লাল, সবুজ রঙের প্রলেপের উপর গাঢ় বাদামী, বেগুনী, ঘোর নীল রঙের প্রলেপ, এর ফলে ছবির একেবারে সম্মুখভাগ আলোর আড়ালে পড়ে গেছে। অন্ধকারের পরিপ্রেক্ষিতে আলো প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। ঠিক সামনের গাছ জমি জলধারা আলোকিত হলে যে সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবকে প্রকাশ করে, এক্ষেত্রে সেটা হল না। একটা স্থৈর্যকে আলোড়িত করে দেবার মতো রহস্যময় সম্ভাবনায় ছবিগুলি ভাষা পেল।

অতএব সর্বত্রই একটা অস্থির গতিবেগসম্পন্ন হল তাঁর ছবি। দ্রষ্টাকে মানসিক আলোড়নের সম্মুখীন হতে হল। গতিবেগ, এই রহস্যঘন পরিবেশ রচনার কারণ কি? সমালোচকদের মধ্যে অনেকে রবীন্দ্রনাথের অবচেতনের গভীরে এর কারণ অনুসন্ধান করেছেন, কেউ করেছেন তাঁর আগ্রহের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে। এখানে বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করেও একটা বিষয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, শুধুমাত্র বস্তুর রূপপ্রকাশই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল না। রূপের ভিত্তিতে একটা বিশেষ উপলব্ধিকে অথবা ভাবকে তিনি প্রকাশ করেছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি—

"জগতে রূপের আনাগোনা চলছে, সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক একটি রূপ, অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে। সে প্রতিরূপ নয়। মনের মধ্যে ভাঙ্গাগড়া কতই জোড়াতাড়া; কিছু বা তার ঘনিয়ে ওঠে ভাবে, কিছু বা তার ফুটে ওঠে চিত্রে।"[৪]

ফলে রবীন্দ্রনাথকে অনেক ক্ষেত্রেই ইচ্ছা করে বস্তুর স্বাভাবিক গঠনকে ভাঙতে হল। চিন্তার ধারায় এগিয়ে তাঁর ছবি হল প্রচলিত ভাষায় যাকে বলে abstract। কিন্তু এই abstraction বা বিমূর্ত প্রকৃতি থাকল প্রধানতঃ বস্তুনির্ভর। প্রথম যুগের ক্যালিগ্রাফির কথা বাদ দিলে নির্বস্তুক ছবির দৃষ্টান্ত আর মেলে না। এখানে তিনি ভাব থেকে রূপে এলেন। রূপে এখানে অনেকটাই বিশেষ মানসিকতা (সচেতন বা অবচেতন) অথবা ধারণার বাহন। অনেকটা সাহিত্যে ব্যবহৃত objective correlative এর মতো। পিকাসো চিত্রে এরই নাম দিয়েছেন attribute (ভাবপ্রতীক)। এখানে পিকাসোর একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

"The attributes were the few points of reference designed to bring one back to visual reality, recognizable to anyone···when they (অর্থাৎ দর্শক) see vaguely in their fog something they recognize, they think, "Ah, I know that." And then its just one more step to, "Ah, I know the whole thing." For me it is a vessel in the metaphorical sense just like Christ's use of parables. He had an idea, he

৩ *Life with Picasso*, p. 53-54

৪ শেষ সপ্তক— পনেরো-সংখ্যক কবিতা

formulated it in parables so that it would be acceptable to the greatest number. That's the way I use objects."[৫]

রবীন্দ্রনাথের বিমূর্ত ছবিতেও পরিচিত বিশ্বের উপকরণ নিয়ে ছবির ভাবচিত্র রচিত হল। বস্তুর সংস্থান গঠন আলোর উজ্জ্বলতা ও গাঢ়ত্ব কতগুলি চিহ্ন রচনা করল। এখানে রবীন্দ্রনাথের ছবি বিশুদ্ধ, বিমূর্ত চিত্রকলার থেকে স্বতন্ত্র। নির্বস্তুক বিমূর্ত ছবিতে রঙের ও রেখার তরঙ্গটাই লক্ষণীয়। সেখানে সুরসঙ্গতি শুধু রচনা করা হয়ে থাকে একটা বিশুদ্ধ আবেগের প্রকাশরূপ হিসাবে। বস্তুর উপর নির্ভর না করে বস্তুবিশ্বের একটা স্রোত বা সেখান থেকে উদ্ভূত একটা মানসিকতার রূপায়ণমাত্র। পশ্চিমের মাতিস্-এর ছবিতে বা এদেশে গগনেন্দ্রনাথের ছবিতে, বিভিন্ন আঙ্গিকে, এই সুরসঙ্গতি রচনার আভাসটাই বড় কথা। কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথ ভিন্নপন্থী। ভাবপ্রকাশ প্রধান উদ্দেশ্য হলেও, বক্তব্য অনুভূতি ও উপলব্ধির জগতে জন্ম নিলেও প্রকাশভঙ্গী প্রধানতঃ রূপাশ্রয়ী।

কিন্তু এখানেও আবার রবীন্দ্রনাথের যাত্রাপথ পিকাসো প্রমুখ অন্যান্য শিল্পীদের থেকে আলাদা। যে সব শিল্পীর দক্ষতা অভ্যাসসিদ্ধ, রূপের গঠন ও ভঙ্গীকে ধরবার জন্য যাঁরা প্রথাগত অনুশীলনের পথ ধরে এসেছেন তাঁরা যখন ভাবের রাজ্যে প্রবেশ করেন তখন এতদিনের অনুশীলিত দক্ষতার পরিবর্তন ও বর্জনের প্রয়োজন দেখা দেয়। অনাবশ্যক খুঁটিনাটিকে এড়ানোর চেষ্টা দেখা যায় কখনও, কখনও বা তাঁদের মধ্যে প্রকৃতিকে অনুকরণ না করে বস্তুর বিন্যাসে পরিবর্তন এনে প্রকৃতিকে আবিষ্কারের চেষ্টা চোখে পড়ে। আগেই বলেছি যে, চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথের প্রথাগত শিক্ষা ছিল না, সুতরাং বস্তুর গঠন তাঁর কাছে অন্যান্য চিত্রশিল্পীদের মতো অতটা স্পষ্ট ছিল না। খুঁটিনাটি সম্বন্ধে উদাসীনতা এই সাক্ষ্য বহন করে। অতএব রবীন্দ্রনাথ যদি রূপকে ভাবপ্রতীক (attribute) হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন তবে সেটা প্রধানতঃ ভাবকে রূপাশ্রয়ী করবার জন্য। ফলে যেখানে, সাধারণতঃ, চিত্রশিল্পীরা রূপ থেকে ভাবের রাজ্যে আসেন ভাবপ্রতীককে বাহন করে, রবীন্দ্রনাথ সেখানে ভাবপ্রতীকের ব্যবহার করলেন ভাব থেকে রূপের দিকে যাবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার আর-একটি বিস্ময়কর দিক, তার রং। সাধারণতঃ তিনি প্যালেট ব্যবহার করতেন না, বিশুদ্ধ রং সোজাসুজি কাগজের উপর লাগাতেন। দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপে ছবিতে পরিপ্রেক্ষিত ও বস্তুর ঘনত্ব ফুটিয়ে তুলবার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পীরা প্রতিযোগিতা করেছেন। বিভিন্ন রঙের মিশ্রণে এবং একই রঙের মাত্রা উঠিয়ে নামিয়ে ছবিতে দৃশ্যমান জগতের গভীরতা ও ঘনত্ব আনার চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু রঙের উজ্জ্বলতায় প্রকৃতির আলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন কোনও রং শিল্পীর ভাণ্ডারে নেই। ফলে লাল ফুলের দুই প্রান্তে ক্রমশঃ ছায়া ফেলে বস্তুর ঘনত্বকে ফুটিয়ে তুলবার এই সুদীর্ঘকালের চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে এই নূতন পথে বর্ণবিন্যাসের কথা ভাবতে হল। পরিপ্রেক্ষিত রচনার কিংবা বস্তুর ঘনত্বকে গড়ে তুলবার বিশেষ ঝোঁক ভারতীয় শিল্পীদের ছিল না কোনকালেই। তার পরিবর্তে রঙের সংঘাত ও জোটকের মধ্য দিয়ে তাঁরা প্রায় সমান জমিতে বিষয়বস্তু সাজাতেন। ফলে রঙের মাত্রা বা টোনের পরিবর্তন করবার প্রয়োজন ছিল অনেক কম, এবং বিভিন্ন রং প্যালেটে না মিশিয়ে সরাসরি ছবির জমিতে ব্যবহৃত হত। রবীন্দ্রনাথ আঙ্গিকের দিক থেকে এখানে সম্পূর্ণ ভারতীয়। স্তরে স্তরে বিভিন্ন

৫ Francoise Gillot : *Life with Picasso*; p. 66-67

রঙের প্রলেপ দিয়ে ছবির জমিকে দৃঢ়সংবদ্ধভাবে গড়ে তুলতেন। হালকা বাদামী বা সিপিয়ার উপর সবুজ তার উপর কালো রঙের প্রলেপ। উপরের রংকে ভেদ করে নীচের রং ফুটে উঠছে কখনও কখনও। এছাড়া পাশাশাশি উজ্জ্বল রং ও গাঢ় রং, আলো ও অন্ধকারের বিন্যাসে ছবি স্তব্ধতাকে অতিক্রম করে বাঙ্ময় রূপ পেল।

রবীন্দ্রনাথের ছবিতে রঙের ব্যবহার এক দিকে যেমন ছবিকে বলিষ্ঠ গঠনের গুণ -সংবলিত করেছে অন্যদিকে তেমনই অস্থির ও গতিশীল করেছে। গভীর আলোড়নের ইঙ্গিত নিয়ে ছবিগুলি দ্রষ্টার মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। সেখানে রবীন্দ্রসাহিত্যের সুকুমার পরিপূর্ণতা নেই। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুন্দর প্রশান্ত উদার পরিবেশ থেকে তাঁর ছবির মেজাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন। রঙের ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমনের অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে স্পষ্ট। রঙের উপর রং বসিয়ে গিয়েছেন ব্যগ্রতার সঙ্গে। একই ছবিতে পোস্টার কলার, জল রং, অয়েল প্যাস্টেল ও কালি-কলম ব্যবহার করতে তাঁর কুণ্ঠা নেই। সেখানে শিল্পীর অতৃপ্তি ও ব্যগ্রতা অত্যন্ত স্পষ্ট! তা ছাড়া বস্তুর গঠনে খেয়ালখুশীমতো রূপ সংযোজন ও পরিবর্তন এই অস্থিরতারই স্বাক্ষর বহন করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের আঁকা কাল্পনিক ও প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর ছবি। সেখানে হয়ত পরিচিত বিশ্বের কোনও একটি জন্তুর ছবি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই অন্য একটি জন্তুর শরীরের কোনও অংশ সংযোজিত হয়েছে। অনুরূপ প্রসঙ্গ তুলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

"ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি, আমি কোনও বিষয় ভেবে আঁকি নে— দৈবক্রমে একটা কোনও অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চল্‌তি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনক-রাজার লাঙলের ফলায় যেমন জানকীর উদ্ভব। কিন্তু সেই একটিমাত্র আকস্মিককে নাম দেওয়া সহজ ছিল, বিশেষতঃ সে নাম যখন বিষয়সূচক নয়। আমার যে অনেকগুলি— তারা অনাহূত এসে হাজির— রেজিস্টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন উপায়ে।"[৬]

একদিকে ছবির বিষয়বস্তুতে এই আকস্মিকতা অন্যদিকে অস্থিরতা ও অত্যন্ত দ্রুতবেগে ছবি এঁকে ফেলবার তাগিদ। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ছবিতে অস্বস্তিকর পরিবেশ ও গঠনে পরিপূর্ণতা ও নিটোলত্বের অভাব স্পষ্টতঃ চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅশোক মিত্র লিখছেন—

"রবীন্দ্রনাথ গেলেন বাস্তবের চেয়েও বাস্তব হ'তে, বাস্তব থেকে তার আসল সত্যরূপ ফুটিয়ে বের করতে।··· প্রত্যেক মহৎশিল্পীর মতো রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম কর্তব্য হল মিষ্টি মিষ্টি সুন্দরপানা ছবি বিষবৎ বর্জন করা, ছবিতে অসুন্দর বিষয়কে সচেতনভাবে এনে তার চিত্রগত সৌন্দর্য, সুষমা ও সামঞ্জস্য ফুটিয়ে তোলা।··· রবীন্দ্রনাথে আমরা এমন একজন শিল্পী পেলুম যিনি সজ্ঞানে 'সুন্দর' মুখ, 'সুন্দর' দেহ, 'সুন্দর' মায়ায় ঘেরা দৃশ্য ঠেলে ফেলে দিয়ে, সাধারণ, বিশ্রী, নোংরা বিষয়, সাধারণ 'অসুন্দর' মুখ, 'অসুন্দর' দেহ, এমন কি অসুস্থ বিভীষিকাময় পরিবেশের প্রবর্তন করলেন।"[৭]

এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, সাহিত্যে সঙ্গীতে তিনি দক্ষ ও সচেতন স্রষ্টা হয়েও যেখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিপূর্ণতার সৃষ্টিকে বাঁধলেন সেখানে ছবিতে অসুন্দর পরিবেশ রচনায় তিনি ব্রতী হলেন কেন?

---

৬ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠির অংশ— চিঠির তারিখ ২রা পৌষ ১৩৩৮

৭ অশোক মিত্র : 'ভারতীয় চিত্রকলা,' পৃ. ২৮৯

গভীর উপলব্ধি, বিরাট জীবনবোধ ও প্রজ্ঞা তো রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্য-সৃষ্টিতেও সর্বদা পরিচালিত করত। কবিতা গান ও গদ্য রচনায় তাঁর সচেতনতা যতটা থাকবার কথা তার থেকে বেশি সচেতনতা বা সতর্কতা তাঁর ছবিতে থাকবার কথা নয়। অতএব 'অসুন্দর' মুখ, 'অসুন্দর' দেহ ইত্যাদি রচনাকালে তাঁর সচেতন প্রয়াস সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। 'রবীন্দ্রনাথ গেলেন বাস্তবের চেয়েও বাস্তব হতে'— অর্থাৎ সুররিয়ালিস্ট, এই ধরনের বক্তব্য সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য মনে হয় না। বরঞ্চ সচেতন ও অসচেতন অস্তিত্বর গোধূলিতেই তাঁর ছবিগুলি মূর্ত বলে মনে হতে পারে। এখানে প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃত করছি—

"আমি পঞ্চাশ বছর ধরে ভাষার সাধনা করছি। সুতরাং তার সমস্ত কৌশল, তার গতিবিধির নিয়ম, সে একরকম জেনে নিয়েছি। কিন্তু এই ছবি যা অকস্মাৎ আমার স্কন্ধে আবির্ভূত হয়েছে, তার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ চেনাশোনা হয় নি। তার স্বৈরাচার আমাকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু স্বৈরাচারের অন্তর্নিহিত যে নিয়ম তাকে ভিতরে ভিতরে চালনা করে, সে আমার কাছে অত্যন্ত গোপনে আছে।"[৮]

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন মাধ্যমে বিচিত্র উপকরণ দিয়ে অজস্র ধারায় সৃষ্টি করেছেন। সেই সৃষ্টি যেমন বিপুল তেমনই মহান্। তাঁর চিত্রকলা সেই বিরাট সৃষ্টিধারার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ অংশ। ছন্দে ভাবে বর্ণসুষমায় জীবনবোধের স্বাক্ষরে রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলি ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকলার আসরে নিজেদের স্থান দাবী করে।

৮ শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়কে লিখিত। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বর্ষ ২৫ সংখ্যা ১ পৃ ১২: প্রমথ চৌধুরীর আলোকচিত্র শ্রীপরিমল গোস্বামী -গৃহীত

বর্ষ ২৫ সংখ্যা ২ পৃ ৯৫: নন্দলাল বসু -অঙ্কিত চিত্র শ্রীবিমলকুমার দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত

প্রতিমা দেবী

জন্ম ৫ নবেম্বর ১৮৯৩ · ২০ কার্তিক ১৩০০

মৃত্যু ৯ জানুয়ারি ১৯৬৯ · ২৪ পৌষ ১৩৭৫

রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী

আজ আমি তোমাদের সঁপিলাম তাঁরে —
তোমরা তাঁহারি হও আলোকে আঁধারে।
পেয়েছি অনেক শাস্তি ভোগেছি অনেক
ক্লেশ যা আমার হয় আমারি ক্লেশ।
হৃদয়ে তোলপাড়া তুফানের ঢেউ —
মাঝে ভাবি আমি ছাড়া নাই বুঝি কেউ।
আমার প্রদীপখানি অতি ক্ষীণকায়া,
যতটুকু আলো দেয় তার বেশি ছায়া।
এ প্রদীপ আজ আমি ভেঙে দিনু ফেলে।
তাঁর আলো তোমাদের নিক বাহু মেলে।
সুখী হও দুঃখী হও তাহে চিন্তা নাই
তোমরা তাঁহারি হও আশীর্বাদ চাই।

এমন করিয়াছিনু কাছে কতকাল
আজি এ তাঁহারি হাতে ছেড়ে দিনু হাল,

১৩ই আশ্বিন ১৩২১
রাত্রি
শান্তিনিকেতন

স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও গীতালি গ্রন্থটি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবীকে উৎসর্গীকৃত, এবং গ্রন্থারম্ভে মুদ্রিত এই কবিতাটি তাঁহাদের উদ্দেশেই রচিত। কবিতাটির বর্তমান পাঠ পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।
পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতন -রবীন্দ্রভবন সংগ্রহভুক্ত

আশীর্বাদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই আমি সঁপিলাম তারে—
তোমরা তাঁহারি ধন আলোকে আঁধারে।
যখনি আমারি ব'লে ভাবি তোমাদের
মিথ্যা দিয়ে জাল বুনি ভাবনা-ফাঁদের।

সারথি চালান যিনি জীবনের রথ
তিনিই জানেন শুধু কার কোথা পথ।
আমি ভাবি, আমি বুঝি পথের প্রহরী,
পথ দেখাইতে গিয়ে পথ রোধ করি।

আমার প্রদীপখানি অতি ক্ষীণকায়া,
যতটুকু আলো দেয় তার বেশি ছায়া।
এ প্রদীপ আজ আমি ভেঙে দিনু ফেলে,
তার আলো তোমাদের নিক বাহু মেলে।

সুখী হও দুঃখী হও তাহে চিন্তা নাই ;
তোমরা তাঁহারি হও, আশীর্বাদ তাই।

প্রতিমা দেবী ১৮৯৩-১৯৬৯

১

প্রতিমা দেবীর বিয়ের পর যখন প্রথম তাঁকে দেখলাম, মুগ্ধ চোখে বারবার তাঁর দিকে চেয়েছিলাম মনে আছে। এমন রূপ এমন রঙ সচরাচর চোখে পড়ে না। তেমনই সুন্দর লক্ষ্মীশ্রী।

একবার ছুটিতে শিলাইদহে বেড়াতে যাবার জন্য গুরুদেব সেনশাস্ত্রীকে[১] ধরেছিলেন। আমরাও যাই, এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

গিয়েছিলাম আমরাও। তখন আমার দুটি শিশু, তাদের নিয়েই গিয়েছিলাম। কুষ্টিয়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে পালকিতে আমরা গিয়েছিলাম।

কুঠিবাড়িতে পালকি পৌঁছতেই প্রতিমা দেবী এসে সাদরে আমাদের পালকি থেকে নামিয়ে দোতলায় নিয়ে গেলেন। তিনিই গৃহকর্ত্রী। যদিও অল্পদিন পূর্বে তাঁদের বিবাহ হয়েছিল।

সেখানে তাঁর গৃহিণীপনা দেখে আর তাঁর হাতের সুনিপুণ অতিথিসেবা পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। শিশুদের প্রতিও যে তাঁর যত্ন তা অনুভব করবার মতো ছিল। মীরা দেবীও তখন সেখানে ছিলেন। নগেনবাবু আমেরিকা থেকে অল্পদিন আগেই ফিরেছিলেন, তিনিও তখন সেখানে ছিলেন। রথীবাবু ছিলেন, গুরুদেব তো ছিলেনই।

প্রতিমা দেবীর এই পরিপূর্ণ সংসারটি দেখে আর তাঁর হাতের সেবাযত্ন পেয়ে পরমতৃপ্তি লাভ করেছিলাম। নূতন সংসারে নূতন উদ্যমে তিনি কাজ করে চলেছেন দেখতে পেতাম। ননদ মীরা দেবীকে নিয়ে সব কাজ করতেন। কখনো দেখতাম রান্নার ব্যবস্থা করতে, কুটনো কুটতে দুজনে নেমে যাচ্ছেন। কখনো দেখতাম পরিবেশন করছেন হাসি মুখে, সযত্নে, সকলের দিকে দৃষ্টি রেখে— ভারি ভালো লেগেছিল।

পরে দেখেছি, শান্তিনিকেতনে দেশবিদেশের কত মান্যগণ্য অতিথি উত্তরায়ণে অতিথি হয়ে আসতেন, তা বলবার নয়। সব নিয়ে উত্তরায়ণের সংসারটি ছিল বিরাট। আর সেই সংসারের সুনিপুণ গৃহিণী ছিলেন প্রতিমা দেবী, আর গৃহকর্তা ছিলেন রথীবাবু, নিঃশব্দে সব ব্যবস্থা তিনি করতেন; সেসব ব্যবস্থার হাঙ্গামা ছিল, দায়িত্বও কম ছিল না। বাইরে থেকে বোঝা যেত না কিছু, অনুমানে বুঝতে পারতাম।

গুরুদেব থাকতে তাঁর কোনো নাটক অভিনয় করতে হলে কি করে নাটকটি সুসম্পন্ন ক'রে তুলবেন, কি হলে অভিনয় সুন্দর হবে, আর কিরকম সাজসজ্জা হবে— এ বিষয়ে অনেক সময়েই গুরুদেব প্রতিমা দেবীর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। তার পর যাঁরা অভিনয় করবেন, সেই-সব ছেলেমেয়েদের সময়মত সংগ্রহ করে, নিয়মিত রিহার্সালে আনবার ব্যবস্থা প্রতিমা দেবী করতেন। তাই কোনো নাটক করাতে হলে প্রতিমা দেবী উপস্থিত না থাকলে নিজেকে একটু অসহায় মনে করতেন গুরুদেব। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রায়ই এক এক দলের নিমন্ত্রণ থাকত তাঁর বাড়িতে, যেমন খেলায় জেতার কি এইরকম আর-কিছুর

---

১ ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী

জন্য। দেখা যেত, সেদিন মহা আনন্দে কোলাহল করতে করতে ছেলেরা উত্তরায়ণে যাচ্ছে নিমন্ত্রণ খেতে। সেখানে প্রতিমা দেবী মাতৃস্নেহে পরমযত্নে তাদের খাওয়াতেন।

চার পাশের গ্রামের কাজ করা, তাদের শিক্ষাদীক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নতি কি করলে হয়-তা করা গুরুদেবের আদেশ ছিল। তাঁর পুত্রবধূ এ কাজ করেছেন। নিজের সংসার ছাড়া, বাইরের এই-সব অনেক কাজ তিনি করতেন। চার পাশের মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে তিনি চিন্তা করেছেন।

লেখাপড়া, শেলাই বোনা, কারুকার্য সবদিকেই দৃষ্টি ছিল। আর এই-সব শিক্ষা কিছু অর্থকরীও হয় এই উদ্দেশ্য তাঁর ছিল, যাতে সংসারে মেয়েদের কিছু সুবিধাও হয়।

প্রতিমা দেবীর ব্যবস্থায় আশ্রম থেকে অনেক মেয়ে পালা করে যাঁর যাঁর নির্দিষ্ট দিনে দূর দূরান্তরের গ্রামে গিয়েছেন শেখাতে। প্রতিমা দেবীও মাঝে মাঝে গ্রামে যেতেন দেখে আসতে। গোরুর গাড়িতে যেতেন, হেঁটেও যেতেন, সাদাসিধে বেশে যেতেন, গ্রামের বউ-ঝিরাও আপনলোক মনে করে অসংকোচে কাছে এসেছেন, আলাপ-আলোচনায় সহজভাবে যোগ দিয়েছেন তাঁরা।

চার পাশের গ্রাম নিয়ে মহিলাসমিতির প্রবর্তন তিনিই করেছেন, তা এখনো আছে। শ্রীনিকেতনে তিনদিন ব্যাপী যে বার্ষিক উৎসব হয়, তার মধ্যে একদিন ঐ মহিলাসমিতির অধিবেশন হয়। শান্তিনিকেতনের মেয়েদের নিয়ে 'আলাপিনী' নামে এক মহিলাসমিতির প্রবর্তন বহুকাল আগে থেকেই হয়েছে, এখনো সেই 'আলাপিনী'র অধিবেশন প্রতিমাসে দুবার ক'রে হয়ে থাকে। এই আলাপিনী নামটি গুরুদেব দিয়েছিলেন।

সেকালে আশ্রমবাসী মহিলাদের, আমাদের আনন্দের আয়োজনও কম ছিল না। একালের মেয়েরা শিক্ষায় দীক্ষায় স্বাধীনতায় অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গেছেন, কিন্তু সেকালে এতটা হয় নি, তাই মেয়েদের সংকোচ ছিল যথেষ্ট, কোনোরকম আনন্দের আয়োজন নিজেরা করতে গেলে অন্তরালেই করবার চেষ্টা থাকত।

'শান্তিনিকেতন' বাড়ির উপরতলায় একবার ফ্যান্সি ড্রেস হয়েছিল প্রতিমা দেবীর উদ্যোগে। এক-একজন মহিলা এক-এক রকম সেজেছিলেন। কেউ দময়ন্তী, কেউ মহাশ্বেতা, এইরকম নানাজনে নানারকম সেজেছিলেন। দুজন রাম সীতা আবার দুজন কচ ও দেবযানী সাজলেন। লব কুশ দুটি ছোটো মেয়ে সেজেছিল। প্রতিমা দেবী নিজে ইরানী মেয়ে সেজেছিলেন। স্থানীয় মহিলারা ছাড়াও রামানন্দবাবুর দুই মেয়ে শান্তা সীতাও সেজেছিলেন, তাঁরা তখন এখানে থাকতেন। এইরকম অনুষ্ঠানে তখন পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। মেয়েদের যেতে বাধা ছিল না। তবে সেদিন গুরুদেব আর রামানন্দবাবুকে ডেকে আনা হয়েছিল মনে আছে। গাড়িবারান্দার ছাদের পুবদিকে তাঁরা বসেছিলেন, তাঁরা খুশি হয়েছিলেন, বোঝা গেল। কোনো কোনো সাজের প্রশংসাও করেছিলেন তাঁরা। এইরকম ফ্যান্সি ড্রেস আরো হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে। এই ধরণের অনুষ্ঠান তবু প্রকাশ্যে ছিল, অন্তত মেয়েদের কাছে। আরো কিছু আনন্দের আয়োজন আমাদের মাঝে মাঝে থাকত, কিন্তু তা অপ্রকাশ্যে। এই সভার সভ্য অল্প কয়েকটি মেয়ে। নির্মল আনন্দের আয়োজনে তাঁরা সকলেই উৎফুল্ল থাকতেন। একটু বেশিরাত্রে এই সভা হত। গৃহিণীদের সব কাজ সারা হয়ে যেত। বাড়ির কর্তা বাড়ির ছেলেমেয়ে, পরিজনদের খাওয়া হয়ে যেত, তাঁরা শুয়ে পড়তেন। তখন সকলে গিয়ে জড় হতেন নির্দিষ্ট স্থানে।

, কোথায় হবে, কে কে থাকবেন, তা আগেই ঠিক করা হত। তার আনুষঙ্গিক আয়োজনে কি থাকবে না-থাকবে, সব নিঃশব্দে ঠিক হয়ে থাকত। এখন বলছি এতদিনে, সে-সব জিনিস অতি সুন্দরই হত। কখনো এমন হত, যাকে নাচ বলা ঠিক হবে না, পুরোনো কালের নাচের সব সুন্দর ভঙ্গী কেউ কেউ দেখিয়েছেন। কাশীর ওস্তাদদের সংগতের সঙ্গে যে ভাও বাতলানো ছিল, তার নকলও অতি সুন্দর দেখেছি।

শ্রীনিকেতনের কুঠিবাড়িতে যেদিন রথীবাবু গৃহপ্রবেশ করলেন সেদিনের কথা মনে পড়ছে। সেদিন উৎসবের স্থানটি সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল, বাড়িটির দক্ষিণে গোল বাঁধানো জায়গাটিতে অনুষ্ঠানের আয়োজন। সেখানে দুখানি আসনে উৎসব-সাজে সজ্জিত হয়ে রথীবাবু আর প্রতিমা দেবী বসেছিলেন। কী সুন্দর যে তাঁদের দেখাচ্ছিল কি বলব। গুরুদেবও ছিলেন। পুরোহিত হয়েছিলেন সেনশাস্ত্রী মশায়। সুন্দর গান ও মন্ত্র-উচ্চারণে অনুষ্ঠানটি অতি সুন্দর হয়েছিল।

গুরুদেবের সস্নেহ দৃষ্টির মধ্যে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী গৃহপ্রবেশ করলেন। সেদিনটি ছবির মতো মনে আছে।

এইখানে গুরুদেবের বউমা সম্বন্ধে তাঁর একটি সস্নেহ উক্তি বলে শেষ করি।

একদিন যখন গুরুদেবের কাছে ছিলাম, তখন প্রতিমা দেবী তাঁর কাছে আসছিলেন দেখা গেল। দূরের থেকে দেখেই সস্নেহে স্নিগ্ধ হাসি হেসে গুরুদেব বললেন, 'বউমা কাছে না থাকলে বড়ো খালি খালি লাগে। দেখেছি জীবনের আরম্ভে যেমন একটি মেয়ের দরকার, জীবনের শেষের দিকেও তেমনি একটি মেয়ের দরকার। আরম্ভে যেমন মার দরকার, শেষেও একটি মার দরকার। একটি নির্ভর করে থাকবার লোক চাই।'

কিরণবালা সেন

২

প্রতিমাদির সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার বিয়ের পরে—সে আজ পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা। তার আগে আমি তাঁকে চোখেও দেখি নি।

আমার স্বামী শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ওঁদের বহুদিনের পরিচিত, প্রায় ঘরের ছেলের মতোই। আমি বিয়ের পরে প্রথম শান্তিনিকেতনে এলাম নববর্ষের উৎসবের ঠিক আগে। রথীবাবু নিজে গিয়ে কলকাতা থেকে আমাদের নিয়ে এলেন। বললেন, "নতুন বউকে এসে নিয়ে যেতে হয়।"

বিয়ের পর প্রতিমাদির বাড়িতে আমি নতুন বউ হয়েই দেখা দিলাম। খড় দিয়ে ছাওয়া 'কোণার্ক' বাড়িতে আমার প্রথম দিনের অভ্যর্থনা আমি ভুলি নি। প্রতিমাদি সত্যিই যেন তাঁর দেওরের নতুন বউকে ঘরে তুললেন। আমার স্বামীর মুখে সর্বদা তাঁর গুণের গল্প শুনেছি। সেইদিন ওঁর সেই গল্পের বউঠানকে দেখে মুগ্ধ হলাম তাঁর অত্যন্ত স্বাভাবিক মহৎ প্রীতির প্রকাশে। রাত্রের গাড়িতে পৌঁচেছি, তখন সারা আশ্রম নিঝুম ঘুমন্তপুরী। একা প্রতিমাদি আমাদের জন্যে জেগে বসে অপেক্ষা করছেন। 'উদয়ন' তখনো তৈরি হয় নি, কেবল ওর রান্নাবাড়িটা শেষ হয়েছে; তারই আলাদা আলাদা ঘরে প্রতিমাদি মীরাদিরা থাকতেন। আমাদের জায়গা হয়েছে কোণার্কে আর রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন সুরুলের পথে যেতে 'প্রান্তিকে'। আমি এর আগে কখনো শান্তিনিকেতনে আসি নি। রাত্রে পৌঁছে অধীর আগ্রহে ভোরের অপেক্ষা করে রইলাম এই জাদুলোক শান্তিনিকেতন যে কী তাই দেখবার জন্যে। মনে আছে ভোরবেলা সবে আমি

স্নান সেরে বেরিয়েছি, তখনো চুল আঁচড়ানো হয় নি, মীরাদি এলেন আমার ছোট ননদ রেবা— যাকে আমরা সবাই বাব্‌লি বলে জানি, তাকে সঙ্গে নিয়ে। এসেই মীরাদি আমার হাতে-জড়ানো খোঁপাটি টেনে খুলে দিয়ে বললেন, "দেখি নতুন বউয়ের চুল কি রকম!" তার পর বাব্‌লির দিকে ফিরে বললেন, "বাঃ, তোর বউদির তো বেশ চুল আছে দেখছি।"

সেই হল আমার নতুন বউয়ের পালা শুরু। আমাকে সঙ্গে নিয়ে মীরাদি বেরোলেন আশ্রম দেখাতে। প্রান্তিকে গিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করলাম। আমরা এসেছি বলে তিনি খুব খুশি। বললেন, "রথীকে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলুম, নতুন বউকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হয় বলে। তুমি কি এর আগে কখনো এখানে এসেছ?" আসি নি শুনে বললেন, "মীরু তোমাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিক।"

তার পরে যে কয়দিন ছিলাম আশ্রমের সকলের কাছেই আমি নতুন বউ। প্রতিমাদির তো যত্নের শেষ নেই, কিন্তু তাতে একটুও কৃত্রিমতার আভাস ছিল না। নতুন বউকে প্রতিদিন নাপতিনিকে দিয়ে আলতা পরানো, নিজে রোজ চুল বেঁধে দেওয়া, যা-কিছু নতুন বউয়ের স্বাভাবিক পাওনা তার কিছুরই ত্রুটি হল না। প্রথম দিনের সেই প্রীতির সম্বন্ধ অতি অল্প দিনেই গভীর স্নেহে পরিণত হল। পঁয়তাল্লিশ বছরেও সেই স্নেহের সম্বন্ধ কখনো ক্ষুণ্ণ হয় নি। সুখে দুঃখে আমাদের জীবনে পরম আত্মীয়ের মতোই আমরা প্রতিমাদিকে পেয়েছি।

প্রথম যখন বিদেশে যাই ১৯২৬ সালে, তখন আমি ও আমার স্বামী য়ুরোপে পৌঁছেই রবীন্দ্রনাথের দলভুক্ত হয়ে গেলাম। তার পর পথে পথে দেশে দেশে একসঙ্গে ঘুরেছি। প্রতিমাদি ঠিক বড়ো বোনের মতো অতি স্নেহের সঙ্গে আমাকে সর্বত্র চালিয়ে নিয়েছেন। তাঁর বিদেশ ঘোরার অভিজ্ঞতা অনেক, আমি একেবারে অনভিজ্ঞ, সেই আমার প্রথম যাত্রা। প্রতিদিন সর্বদা কত যে মিষ্টি ব্যবহার পেয়েছি তা ভুলতে পারব না।

ওঁর মেয়ে নন্দিনীর তখন মাত্র তিন বছর বয়স। তার গল্প শোনার দাবি সারাদিনই। যখনই সুবিধা পেতেন প্রতিমাদি আমার কাছে ওকে রেখে দিতেন। বলতেন, 'রানী, তোমার কথা বলতে ক্লান্তি নেই, তুমি পুপুকে গল্প শোনাও। আমি আর ওর সঙ্গে বকতে পারি নে।' পুপুও গল্প শুনতে পাবে বলে রানীকাকীর বেজায় ভক্ত হয়ে গেল। ঐ মেয়ে যখন মোটে দশ মাসের, জোড়াসাঁকোতে সকলের ডেঙ্গু জ্বর হল। পাছে ঐ শিশুও জ্বরে পড়ে সেই ভয়ে প্রতিমাদি পুপুকে ওর আয়া সমেত আমাদের আলিপুরের বাসায় আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেইদিন বুঝলাম আমাকে মনের মধ্যে কতখানি গ্রহণ করেছেন। বিনা দ্বিধায় ঐ অতি আদরের মেয়েকে আমার জিম্মায় পাঠিয়ে দিতে পারলেন। পুপু তখনো হাঁটতে শেখে নি, শুধু রেলিং ধরে দাঁড়াতে পারে। একদিন যখন অমনি করে দাঁড়িয়েছে আমি দু-হাত বাড়িয়ে দিয়ে, "আয়, আমার কোলে আয়" বলে যেই ডেকেছি মেয়ে টলমল করে দু-তিন পা এগিয়ে এসে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই ওর প্রথম হাঁটা— খুশিতে মন ভরে গেল। উঠে গিয়ে প্রতিমাদিকে ফোন করলাম, "আপনার মেয়ে আজ প্রথম হেঁটেছে।" তিনিও শুনে খুব খুশি। বললেন, "রানী, ও আমার রুগ্ন মেয়ে, ডেঙ্গুর ভয়ে ওকে সরিয়েছিলুম। তোমার কাছে যাবার দশ দিন পরেই ও হাঁটল— তোমার দেখছি বাহাদুরি আছে।" পুপু যে আমার বাড়িতেই প্রথম হেঁটেছিল সেটা স্মরণ করেই ওর ছেলেবেলা থেকেই ওর উপরে আমার মায়া পড়ে গিয়েছিল, আর সেইজন্যই সারাদিন গল্পের দাবি মেটাতে আমার ক্লান্তি লাগত না। তাই তো পুপুকে সহজেই বশ করতে পেরেছিলাম।

বার্লিনে প্রতিমাদি যখন তাঁর স্বামীর হঠাৎ অপারেশনের সময় বিব্রত হয়েছিলেন সেই সময়ে এই দুর্যোগের মুহূর্তে আমরা যেন আরো কাছে এসে গেলাম। যেমন ওঁর দুর্দিনে আমরা কাছে থেকে উদ্‌বেগের ভাগ গ্রহণ করেছি তেমনি আমাদের জীবনেও দুঃখের দিনে প্রতিমাদি আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমার দেওর সকলের প্রিয় বুলা (প্রফুল্ল মহলানবিশ) যেদিন চলে গেলেন সেদিন প্রতিমাদি আমাদের কাছে বরানগরে 'আম্রপালি'তে রয়েছেন। আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে বুলাকে আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন। "বউঠানে"র উপরে বুলার অত্যন্ত টান। হার্টের ব্যামোর রুগী, চিকিৎসকদের নির্দেশ অমান্য করে প্রতিদিন সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় উঠতেন তাঁর "বউঠান"কে দেখতে। তাই বোধহয় শেষ যাত্রার সময়েও বউঠানের আশীর্বাদ নিয়ে, তাঁর নিজের হাতে পরিয়ে দেওয়া ফুলের মালা গলায় নিয়ে বাড়ি থেকে রওনা হতে পারলেন। প্রতিমাদির আবেগের সঙ্গে উচ্চারিত গভীর স্নেহের আশীর্বাদ ও ভগবানের কাছে বুলার আত্মার কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা কখনো ভুলতে পারব না।

অনেকেই প্রতিমা দেবীর অনেক সদ্‌গুণের ও নানা কর্মক্ষমতার কথা বলবেন। সে-সব তো আছেই। যাঁরা তাঁর সঙ্গে একত্রে কাজ করেছেন তাঁরা সে-সব কথা ভুলবেন কেমন করে? আমার নিজের কাছে প্রতিমাদি কল্যাণময়ী লক্ষ্মীর প্রতিমা, স্নেহপ্রেমে ভরা সহজ স্বাভাবিক অপ্রগল্‌ভ মানুষ, যাঁর সঙ্গ পেয়ে মন স্নিগ্ধ হয়েছে আনন্দিত হয়েছে, নিবিড় আত্মিক যোগ অনুভব করেছি।

আজকের এই জগতে সভ্যমনের পরিচয় পাওয়া দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে গড়া মানুষ— এমনটি না হলে কি তিনি অমনিই 'মা-মণি' বলে ডেকেছিলেন? ওঁর জীবনের সমস্ত ভাঙচুর ভূমিকম্পের দুর্যোগ কাটিয়েও যে উনি নিজের চিরকালের প্রতিষ্ঠাভূমিতে দাঁড়াতে পেরেছেন তা সম্ভব হয়েছে বাবামশাইয়ের উপর ভক্তি ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার জন্যই। নিজের সমস্ত ইচ্ছা অনিচ্ছা বিসর্জন দিয়ে তিনি তাঁর বাবামশাইয়ের সেবাতে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁর ইচ্ছাই নিজের ইচ্ছা বলে গ্রহণ করেছেন।

পৃথিবীর কত দেশের কত মনীষী এসেছেন রবীন্দ্রনাথের ভবনে। এঁদের সকলের আদর-অভ্যর্থনা সেবা-আরামের ব্যবস্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত, কারণ ঘরে যে বউমা আছেন। এই-সব দায়িত্ব বহন করা সহজ কাজ নয়। অনেক সময়ে রুগ্ন শরীরে বিছানায় শুয়েও সমস্ত ব্যবস্থা চালনা করেছেন। এটাও যে ওঁর গুরুদেবেরই সেবা, তাই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। জীবনভর অতবড় ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য ভোগ তো সহজ কথা নয়— তার ছাপ চরিত্রে তো পড়বেই। উনি সর্বদাই বলেন, "ছেলেবেলায় বাবামশাই আমাকে এ বাড়িতে এনেছিলেন। তিনি তাঁর স্নেহ দিয়ে আমাকে মানুষ করেছেন। তাঁর জয়গান করেই চলে যাব, আমার আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।" সে কথা খুবই সত্যি; গুরুদেবের স্থানেই প্রতিমাদির জীবনের সাধনা, উনি তাঁর মন্ত্রশিষ্যা।

শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ

৩

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে একসময় একটা ট্র্যাডিশন গড়ে উঠেছিল। পরিবারের সকলকে নিয়ে নাচ গান অভিনয় ইত্যাদির আয়োজন হত এবং মঞ্চস্থ করা হত ঘরোয়া রঙ্গমঞ্চেই। তা থেকে সৃষ্টি হয় ঠাকুর-

পরিবারের কালচারের একটা বিশিষ্ট দিক, যা বাংলার সংস্কৃতিসাধনার বিকাশ বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল, এর দানের তুলনা অন্য কোথাও মেলা ভার।

ঠাকুরবাড়ির সেই সজীব স্রোত পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম গড়ে তোলার কাজে প্রবাহিত করলেন। সেখানেই সরে এল বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসৃষ্টির নাভিকেন্দ্র। শান্তিনিকেতনে সংগীত নৃত্যনাট্য ও সংলাপ-নাট্যের এক নূতন ধারা ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করল। রবীন্দ্র-সংস্কৃতি নামে যা আজ অভিহিত তার নির্মাণকার্য চলতে লাগল এই শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক জুড়ে।

এই সৃষ্টিকর্মের প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়ায় যাঁর পদচারণা ছিল নিঃশব্দ, যাঁর সহায়তায় এবং রুচিশীল মনের প্রভাবে গীতি ও নৃত্য -নাট্য সফল হয়ে উঠত, তাঁর পরিচয় খুব সংক্ষিপ্ত আকারেই আমরা জানি। প্রতিমা দেবীকে যেভাবে দেখেছি স্মৃতি থেকে তা বলার ইচ্ছা স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয়।

শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজ শুরু করার একেবারে গোড়ার দিকে, ১৯৩৪ সালে, আমি লখনৌতে একটি সংগীতানুষ্ঠানের ব্যাপারে তাঁর সান্নিধ্যের সুযোগ পাই। একটি সংগীত-নৃত্যের দল গিয়েছিল সেখানে, প্রতিমা দেবী ছিলেন তার তত্ত্বাবধানে। পরিচালনাও তাঁরই ছিল। প্রথম-সাক্ষাতেই তাঁর চরিত্রে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দেখি, যা মনকে শ্রদ্ধায় নম্র করে, একটি শান্ত পরিবেশ রচনা করে।

তার পরে যতদিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম এবং অদ্যাবধি সেই একই শান্ত নির্মল প্রভাব তাঁকে ঘিরে থাকতে দেখেছি।

কিন্তু এ গেল তাঁর চরিত্রের কথা। সুস্মিত, শান্ত, সুগম্ভীর তাঁর ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রপরিমণ্ডলে এনে দিত একটি শোভন সুষমা। এর গভীর প্রভাব আমরা অনুভব করেছি সকলেই। বউঠান সম্পর্কে যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা সকলে পোষণ করতেন সে কথা অতিরঞ্জিত করে বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির বিভিন্ন দিকে তাঁর দানের কথা অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসে বউমার উপর রবীন্দ্রনাথ কতখানি নির্ভর করতেন তা তিনি লিখে গিয়েছেন, অন্যের সঙ্গে আলাপেও উল্লেখ করেছেন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের বিকাশ হয় ধীরে ধীরে। প্রায় দুই যুগ ধরে চলে একটি নূতন শিল্পরূপকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা। নৃত্যে অভিনয় করার প্রথা আমাদের দেশে যদিও কোথাও ছিল, বাংলার জনপদ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা একেবারেই নূতন। এর সূচনা হয় এইভাবে। রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা পরিশোধ ইত্যাদি কাব্যনাট্য নিয়ে নৃত্যের পরিকল্পনা মুসাবিদার কথা কখনো তেমন বিবেচনা করেন নি। এর কল্পনার প্রথম উদয় প্রতিমা দেবীর মনে। তিনি একটা খসড়া খাড়া করে বাবামশাইয়ের কাছে নিয়ে যান। আলোচনা করেন কাব্যনাট্যকে কিভাবে রূপান্তরিত করা যেতে পারে নৃত্যের ছন্দে। শুরু হল এক নূতন সৃষ্টির প্রয়াস। চিত্রাঙ্গদা, পরিশোধ (শ্যামা), পরে চণ্ডালিকা, মায়ার খেলার নৃত্যরূপ তারই সার্থক পরিণতি। এ কথা অবশ্যস্বীকার্য রবীন্দ্র-শিল্পসৃষ্টির নৃত্যের দিকটায় প্রতিমা দেবী একটি সার্বভৌম ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের নাচের শিক্ষা ও ভঙ্গিকে কী ভাবে সংকলন করে একটি নৃত্যধারার প্রবর্তন করা যায় তারই জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। মণিপুরী, কথাকলি, গুজরাতি নাচের রীতি— এ-সব নিয়েই পরীক্ষা চলেছিল। এই নৃত্যের দিক-উদ্‌ঘাটনে পরিপূর্ণ প্রেরণা ছিল প্রতিমা দেবীর।

যে পর্বে গুরুদেব নৃত্যের ভাষাকে নাট্য-সৃষ্টির কাজে পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার করছিলেন ঠিক সে সময়েই আমি শান্তিনিকেতনে কাজে যোগ দিই। লক্ষ্য করেছিলাম মূল সংগীতের বিষয়বস্তুই নৃত্য-পরিকল্পনায় প্রাধান্য লাভ করেছে, সংগীতের ভাবের প্রাধান্য এতে বিন্দুমাত্র উপেক্ষিত হয় নি। ভারতবর্ষের, এমন-কি বাইরের, প্রচলিত বিভিন্ন আঙ্গিকের নৃত্য যদিও ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু সেটা ততটা আঙ্গিকের দিক থেকে নয় যতটা প্রেরণা বা ভাবের দিক থেকে। সেইজন্যে এই-সব নৃত্যগুলিকে ভাবনৃত্য বলে অভিহিত করা চলে। এই নৃত্যপরিকল্পনার আদিপর্বে প্রতিমা দেবীর দান তৎকালীন আশ্রমবাসীদের মুখে শুনেছি। প্রতিমা দেবী সব সময়ে নৃত্য-পরিকল্পনায় সাহায্য করতেন। একেবারে একলা করে শেখাতেন, নিজে নেচে দেখাতেন। গুরুদেবের নির্দেশে মেয়েরা যখন কিছু একটা খাড়া করত তখন প্রথমে প্রতিমা দেবীকে দেখিয়ে মেয়েরা তাঁর প্রস্তাব নিয়ে গুরুদেবকে দেখাত। ১৩৩৭ সনে 'নবীন' অভিনয়ের সময় প্রতিমা দেবীই অধিকাংশ নৃত্য-পরিকল্পনা করেছিলেন, যেমন :

চলে যায় মরি হায় /
ওরে গৃহবাসী /
ওরা অকারণে চঞ্চল /
হে মাধবী দ্বিধা কেন / প্রভৃতি

আমাদের কালেও কোনো কোনো গানের সঙ্গে তাঁর নৃত্য-পরিকল্পনার বিষয় আমরা জানি— ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে এবং এপারে মুখর হল কেকা ওই -এর সঙ্গে খুব সুন্দর একটি নৃত্য-পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন।

নৃত্যের ভাষায় নাটক রচনা পূর্বে আমাদের দেশে অতি বিরল ছিল। শুধু ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বর্তমান কেরলের কথাকলি নৃত্যে অভিনয় অংশের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। এই নৃত্যকে সমালোচকেরা আখ্যাননৃত্য বলে অভিহিত করে থাকেন। মণিপুরী নৃত্যে একটি বিশেষ ভঙ্গি পুনঃপুনঃ অনুবৃত্তির দ্বারা হৃদয়াবেগের প্রকাশ হয়। কথাকলির মতো প্রত্যক্ষ অভিনয়ের প্রচেষ্টা না থাকলেও মণিপুরী নৃত্যে অভিনয়ের আভাস আছে। বাংলাদেশে অবশ্য কোনো আঙ্গিক-ভিত্তিক বা আঙ্গিক-সর্বস্ব নাচ ছিল না। এই নাচ কেবল ভাবপ্রকাশের বাহন বা সংগীতের তাল ও লয়ের প্রত্যক্ষগোচর লীলা। নৃত্যনাট্যগুলিতে আঙ্গিকের সীমানা ছাড়িয়ে নৃত্যকে চলমান শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হল। চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা নৃত্যনাট্যগুলিতেও নৃত্যাভিনয়ে নৃত্যের আঙ্গিকের চেয়ে তার প্রেরণাই বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। আজকে এই নৃত্যনাট্যগুলিতে দেহভঙ্গির সংগীতকে অভিনয়ে ব্যবহার করা হয়েছে।

একটি বিশেষ কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। সারাজীবনে রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য গান রচনা করেন, তাঁর শেষের দিকের গানগুলি স্বরলিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পড়ে আমার উপরে। কী ভাবে এই গানগুলির মূল সুর ছাড়াও তার সুরের সূক্ষ্ম গুঞ্জনগুলি অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব সে সম্বন্ধে প্রায়ই সুরকার বলতেন "স্বরলিপির সাহায্যে সবটুকু বজায় থাকে না।" পরবর্তীকালে তার সূত্র হারিয়ে গেলে মূল রূপটিকে খুঁজে বার করা একান্তই অসম্ভব হয়ে উঠবে, এ সংশয় কবির মনেও ছিল। সেইজন্যে তিনি বলেছিলেন, তাঁর গানের জন্যে এক সাত্ত্বিক ঘরানা সৃষ্টির কথা যে-সৃষ্টি যুগাতিক্রমণের ভিতর দিয়ে আপন সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য বাঁচিয়ে রেখে পরবর্তীকালে দিয়ে যেতে পারবে।

নৃত্যের ক্ষেত্রেও প্রতিমা দেবীর মনে প্রায় সমভাবের এক সংকল্পের উদয় হয়। রবীন্দ্রনৃত্য বলতে যদি কিছু থাকে তা হলে তারও কিছু স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য, আপন সৌন্দর্য সংরক্ষণের প্রয়োজন। কবির দৃষ্টিসমক্ষে যে নৃত্যরীতি পরিণতি লাভ করে তার আপন বৈশিষ্ট্যও প্রস্ফুটিত হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। শুধু নৃত্যভঙ্গিমার স্বকীয়তা নয়, বেশভূষা, অলংকরণ, অভিব্যক্তি, মঞ্চসজ্জা সব-কিছুই রাবীন্দ্রিক বলে চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। এখানে প্রতিমা দেবী উপলব্ধি করেছিলেন নৃত্য- রীতি ও ধারার বৈশিষ্ট্য অটুট রাখার জন্য স্বরলিপির অনুকরণে 'নৃত্যলিপি' সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা। প্রতিমা দেবী এই উদ্দেশ্যে আশ্রমের নতুন মেয়েদের নিয়ে নাচের ক্লাস করতেন। এই ক্লাসে— বাকি আমি রাখব না, কোন্ দেবতা সে, ওরে ঝড় নেমে আয়, ওগো বধূ সুন্দরী— ইত্যাদি গানের বিশেষ নৃত্য-পরিকল্পনাগুলির পরম্পরা সংরক্ষণ করার চেষ্টা করতেন। নাচের বোল ইত্যাদি ছাত্রীদের লিখে রাখতে বলতেন। কলাভবনের শিল্পীদের নিয়ে নৃত্যের ভঙ্গি আঁকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করতেন। এইভাবে রবীন্দ্রনৃত্যের একটি মার্গ ফুটে ওঠে তাঁর প্রেরণায়। কয়েকটি গানের নৃত্য-পরিকল্পনাও প্রতিমা দেবী নিজে করেন।

রবীন্দ্রোত্তর কালে শান্তিনিকেতনে নটীর পূজা, অরূপরতন ও ডাকঘর অভিনয়ে প্রতিমা দেবীর পরিচালনাকালে আমার সুযোগ হয়েছিল তাঁর সঙ্গে একযোগে কাজ করার। তখন যেন তাঁর নাটক-পরিচালনার রীতিতে স্বয়ং গুরুদেবের রীতিরই প্রত্যক্ষ অনুবর্তন অনুভব করতাম।

এই কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য এই যে, রবীন্দ্র-শিল্প-অভিব্যক্তির বিভিন্ন ধারাকে পরিস্ফুট করে তোলা, তাকে সুনির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত করার ব্যাপারে প্রতিমা দেবীর ছিল অক্লান্ত আগ্রহ। তাঁর কল্যাণস্নেহের সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছিলেন তাঁরাই অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের এই 'বউমা' আশ্রম-জীবনের কল্যাণশ্রী বর্ধনে কতখানি সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সংস্পর্শে এসে যে স্নেহের প্রসাদ লাভ করেছি, সেজন্যে আপনাকে ধন্য মনে করি।

শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

৪

গুরুদেব তাঁর নাম্নী কবিতাগুলির মধ্যে 'প্রতিমা' নামে যে কবিতাটি লিখেছেন শুধু সেই কয়েকছত্র কবিতাটির মধ্যেই প্রতিমা দেবীর রূপটি তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে সম্পূর্ণরূপে ফুটে উঠেছে। তাঁর কর্মজীবনের কথা ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে এর বেশি কিছুই বলার নেই।

যখন শৈশবে প্রথম শান্তিনিকেতনে আসি তখন তাঁকে দূর থেকেই দেখেছি। পরবর্তী জীবনে অভিনয় সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর শিল্পীমনের পরিচয় কিছু কিছু পেতে আরম্ভ করি। মেয়েদের অভিনয়ে সাজানোর ব্যাপারে গুরুদেব সম্পূর্ণভাবে তাঁর বউমার উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকতেন। এখন যেমন একটা ভারতীয় ধরনের সাধারণভাবে সাজ দাঁড়িয়ে গেছে গোড়ায় তা ছিল না, তাই সাজের নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। এই সাজানোর ব্যাপারে প্রতিমা দেবীর নির্দেশমতই সব হত।

তার পর আমার বিবাহের পর থেকেই তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পাই। মানুষের জীবনের খুঁটিনাটি ও অতি তুচ্ছ ঘটনার থেকেই সত্যিকার মানুষটির পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে খুড়িশাশুড়ি হিসাবে ওঁকে কাকীই বলি। কাকীর সুমধুর শান্ত ও স্নেহশীল স্বভাবের জন্য বাড়ির সকলেরই তিনি প্রিয় হতে পেরেছেন। বাইরের লোকের প্রিয় হওয়া তবু কতকটা সহজ কিন্তু ঘরের লোকের প্রিয় হওয়া খুব সহজ নয়।

গুরুদেবের পুত্রবধূ হওয়ায় বলতে গেলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে তাঁকে চলতে ফিরতে হয়েছে। বিশ্বভারতীতে দেশী বিদেশী যখন অতিথি হয়ে এসেছেন তখন তাঁদের আতিথ্যের ভারও পড়েছে প্রতিমা দেবীর উপর। রথীন্দ্রনাথের উপর দায়িত্ব ও ব্যবস্থার ভার থাকলেও গৃহিণী হিসাবে প্রতিমা দেবীকেও তাঁর সঙ্গে আদর-আপ্যায়ন করতে হয়েছে। কোনো জড়তা বা কুণ্ঠা কখনো দেখি নি, এমন সহজভাবে তিনি মিশতে পারতেন। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা সব গুরুদেবের কাছেই। বালিকা-বয়স থেকে গুরুদেবের সান্নিধ্যে থাকায় তাঁর ভাব ও ভাষা অনায়াসে সহজ হয়ে উঠেছিল।

গুরুদেবের মৃত্যুর পর যখন 'নির্বাণ' বইখানি বেরোয় সকলে তাঁর লেখার ভঙ্গি ও সংযম দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

বড়মা হেমলতা দেবীর মুখে শুনেছি যে প্রতিমা দেবী প্রথম যখন বিলেতে যান তখন এমন সহজে ও নিঃসংকোচে জাহাজে গিয়ে উঠলেন যে গুরুদেব বলেছিলেন, 'মনে হল জাহাজখানাই যেন তাঁর!'

জীবনযাত্রার বহু ক্ষেত্রেই বোধহয় তাঁর এই পরিচয় পেয়েছিলেন বলেই 'প্রতিমা' কবিতাটিতে একজায়গায় লিখেছেন—

কুণ্ঠার গুণ্ঠন নাই, ভীরুতা নাইকো তার মনে।

প্রতিমা দেবীকে খুব অস্থির ও বিচলিত হতে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। রাগ তাঁর শরীরে যেন নেই। কতবার রাগের কারণ ঘটতে দেখেছি, বিরক্তও হয়েছেন তাও দেখেছি কিন্তু কার্যকালে তখনই অতি অল্পসময়ের মধ্যেই সামলে নিয়ে শান্তভাবে কথা বলেছেন— এতটুকু উষ্মাও প্রকাশ পেতে দেন নি। বরাবরই দেখে আসছি স্বাস্থ্য তাঁর ভালো থাকত না। রোগযন্ত্রণা খুব শান্তভাবে অসীম সহিষ্ণুতার সঙ্গে ভোগ করতে দেখে এসেছি।

একবার মনে আছে প্রতিমা দেবী তখন জোড়াসাঁকোয় আছেন বিচিত্রায়— যেটাকে আমরা লালবাড়ি বলি। হঠাৎ খুব জ্বর হল, বোধহয় ১০৪ ডিগ্রির উপরই হবে, কারণ আমি গিয়ে দেখি ছটফট করছেন, গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। ওঁর সেবিকা এসে বলল ডাক্তারবাবু এসেছেন, বলামাত্রই তিনি খুবই সহজভাবে উঠে বসলেন। এমন সহজ স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বললেন যে ডাক্তার বুঝতেই পারলেন না যে এক মুহূর্ত আগে ঐ মানুষটিই জ্বরে কাতর হয়ে ছিলেন। গুরুদেব লিখেছেন,

দুঃখে শোকে অবিচল, ধৈর্য তার প্রফুল্লতা-ভরা
সকল উদ্‌বেগভার-হরা।
রোগ যদি আসে রুখে
সকরুণ শান্ত হাসি লেগে থাকে গ্লানিহীন মুখে।

জোড়াসাঁকোয় থাকতে একবার ওঁর মেয়ে পুপের জ্বর হয়েছে, আমি ভোরবেলা উঠে দেখতে যাচ্ছি এমন সময় বড়ো বারান্দায় এসে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা, তিনি বেশ একটু দ্রুত আসছিলেন। আমার কাছেই আসছিলেন পোড়ায় লাগাবার কোনো ওষুধ আছে কিনা তাই জানতে। নেই বলায়

যেমন দ্রুত আসছিলেন তেমনি ফিরে চললেন, আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কেন কি হয়েছে ?" বললেন, "পুষুর জন্য জল গরম করতে গিয়ে প্রতিমার হাতটা ইলেক্‌ট্রিকে একটু পুড়ে গেছে।" আমিও ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই এলাম প্রতিমা দেবীর ঘরে। গিয়ে দেখি হাতটি চিৎ করে রেখে বসে আছেন, চোখ দিয়ে শুধু জল পড়ছে। মনে হচ্ছে হাতটিতে কে যেন ভুষো মাখিয়ে দিয়েছে, আগাগোড়া হাতের চেটো কালো হয়ে গেছে। সেদিনও একটি কাতর শব্দ তাঁর মুখ থেকে বেরোতে শুনি নি।

কখনো কারো নিন্দা বা তীব্র সমালোচনা করতে শুনি নি। সামান্য কিছুও তাঁর জন্য কেউ করলে বরাবর তা মনে রেখেছেন। এমন নিরহংকার মানুষও কম হয় জগতে। অহংকার করার মতো তাঁর রূপ গুণ ঐশ্বর্য ও সর্বোপরি গুরুদেবের সান্নিধ্য সবই ছিল কিন্তু কোনোদিন তাঁর মুখে কোনো গর্বের কথা প্রচার করতে শুনি নি। গুরুদেবের আদরের একমাত্র পুত্রবধূ শুধু নয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের সংস্পর্শে এসেছেন কতবার কিন্তু কখনো তা বলে তাঁকে গর্ব করতে দেখি নি বা শুনি নি। উত্তরায়ণে কাচের আলমারিতে কিছু কাচের উপর কাজ করা পাত্র সাজানো দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম "বাঃ চমৎকার! এগুলি কোথাকার জিনিস ?" প্রতিমা দেবী চুপ করে আছেন দেখে রথীন্দ্রনাথ বললেন, "বলছ না কেন, ওগুলো ওঁরই করা।"

গুরুদেবের আদরের পুত্রবধূ হলেও 'জিনিয়াসে'র সঙ্গে ঘর করা বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। কখন তাঁদের কি খেয়াল হয়, কখন মেজাজ বিগড়ে ওঠে, কিন্তু কাকী অসীম ধৈর্য ও অপরিসীম সহিষ্ণুতার সঙ্গে অত্যন্ত নম্র হৃদয়ে তার সম্মুখীন হয়েছেন, সব ঝড়ঝাপ্‌টা তাঁর উপর দিয়েই বয়ে যেতে দিয়েছেন।

গুরুদেবের স্বভাব ছিল কল্পনায় মানুষকে বড়ো করে দেখা, যখনই যার স্বভাবের কোনো-কিছু তাঁকে আকৃষ্ট করত তিনি সেইদিকটা বড়ো করে দেখতে থাকতেন এবং তার সম্পূর্ণ চোটটা পড়ত তাঁর কাছের মানুষটির উপর। এ রকম মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মনের মতো হওয়া সম্ভব নয় কারো পক্ষেই। তাই অসাধারণ সহনশীলতা না থাকলে প্রতিমা দেবী গুরুদেবের সংসারে একটি দিনও টিঁকতে পারতেন কিনা সন্দেহ। গুরুদেবের খুব কাছে যাঁরা আসতে পেরেছেন তাঁরাই শুধু আমার এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

গুরুদেব নিজেও এটা যে বুঝতেন না তা নয়। একবার গরমের সময় উত্তরায়ণের বড়ো বাড়িতে গুরুদেব আছেন। পাহাড়ে যাবার কথা হচ্ছে। হঠাৎ একদিন আমায় বললেন, "বৌমারা কোথায় যাচ্ছেন জানিস ?" একটু থেমে আস্তে আস্তে বললেন, "ওঁরা বোধহয় আমার সঙ্গে যাবেন না, আমায় নিয়ে তো একটু মুশকিল আছে। হাঙ্গাম তো কম নয়।" ওঁকে নিয়ে চলা যে খুব সহজ নয়, তা জানতেন। মাঝে মাঝে যখন প্রতিমা দেবী থাকতেন না তখন বলতেন, "বউমা না থাকলে বড়ো অসহায় বোধ করি আমি।" শেষের দিকে ডাকতেন 'মামণি' বলে। প্রতিমা দেবীও গুরুদেবকে গুরুর মতোই মেনে এসেছেন। তাঁর সামান্যতম ইচ্ছাও বিনাবিচারে পালন করে গেছেন শেষদিন পর্যন্ত। তাঁর বৃহৎ সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী হয়েও তিনি কর্তৃত্ব করেন নি। কত রকম-বেরকমের মানুষ নিয়ে তাঁকে যে চলতে হয়েছে তার ঠিক নেই।

আমার মনে হয় গুরুদেবকে যদি কেউ সত্যিই বুঝে থাকেন তো সে প্রতিমা দেবী।

গুরুদেব আমায় অনেকবার বলেছেন "বউমা খুব নিরাসক্ত। কিছু দিলে খুশি হয়ে নেন কিন্তু বুঝতে

প্রতিমা দেবী

রবীন্দ্রনাথ সহ সি. এফ. এণ্ডরুজ, রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী

পারি ওঁর তাতে আসক্তি নেই।" উত্তরায়ণের অত বড়ো বাড়ি সব চলে গেল—সংসারের জাঁকজমক সব যেন হঠাৎ উবে গেল— মস্ত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে হল— কিন্তু প্রতিমা দেবীর নিরাসক্তি ছিল বলেই কত সহজে ও বিনা অভিযোগে সব কিছুকে গ্রহণ করলেন। একদিনও কোনো খেদ করতে শুনি নি এজন্য।

অমিতা ঠাকুর

৫

পরমপূজনীয়া মাতৃসমা প্রতিমা দেবীর সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু-এক কথা লিখে আমার তৃপ্তি নেই। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে পূর্ণভাবে উপযুক্ত ভাবে লিখতেও এখন পারব না।

যাঁরা প্রতিভাধর মহামানব তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন, তাঁদের কর্মজীবনের মতোই সাধারণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হতে পারে। টলস্টয়ের জীবনের, গান্ধীজীর জীবনের, দৈনন্দিন তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও প্রকাশিত হয়ে তাঁদের কর্ম ও জীবনের পূর্ণ ছবি আমাদের সামনে সত্যের স্বরূপে উদ্‌ভাসিত হয়।

কিন্তু যাঁদের জীবন প্রতিদিনের সহস্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণের অগোচরে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে ঘিরে শত কর্তব্যের স্রোতে প্রবহমান, প্রতিদিনের কুশাঙ্কুরের বেদনাকে যাঁরা স্বমহিমায় উত্তীর্ণ হয়ে তাঁদের চারপাশের সংসারকে শোভন সুন্দর ও সুখী করেছেন তাঁদের জীবনকাহিনীর সবটাই প্রকাশ্য নয়। তাই বুঝিয়ে বলা যাবে না প্রতিমা দেবীর সঙ্গে অন্যের পার্থক্য কোথায়। সাধারণত প্রবহমাণ সংসারের আঘাতে প্রত্যাঘাতে অধিকাংশ মানুষেরই জীবন যায় শুকিয়ে। মহাকাল তাকে ব্যবহার করে জীর্ণ করে ফেলে কিন্তু প্রতিমাদির মন ছিল শেষ পর্যন্ত লাবণ্যময়, তাঁর চরিত্রমাধুর্য কোমলতা ছিল অটুট।

ছোটোবেলায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রতিমাদির গলায় দেখেছি একটি মাদ্রাজী হার। হাতে দুগাছা করোগেটেড নকশার চুড়ি। প্রায় বারো-চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সে সোনার পালিশ কমে নি। যেন তাঁর অঙ্গস্পর্শে ক্রমে হয়েছে উজ্জ্বলতর। প্রতিমাদিকে ভাবলে আমার মনে আজও সেই সোনার সঙ্গে তুলনা আসে—সংসার তাঁকে কখনো কোমলভাবে গোলাপ-বিছানো পথে নিয়ে গিয়েছে, কখনো আঘাত করেছে তীব্রভাবে। কিন্তু সেই স্বর্ণলতার চিত্তকান্তিকে শ্রীহীন করতে পারে নি। আমার যখন বয়স বারো তখন থেকে আজীবন তাঁর কাছে অফুরান স্নেহ পেয়েছি। তাঁকে প্রতিমাদি বলে ডাকতুম, রথীদা বলতেন এ আবার কী সম্পর্ক পাতিয়েছ? দাদার বউ তো বউঠানই হয় জানি। সমস্ত শান্তিনিকেতনের ছিলেন তিনি বউঠান কিন্তু তাঁকে মায়ের মতোই মনে হয়েছে আমার। আমার বালিকা বয়সে দেখা তাঁর একটি দিনের মূর্তি আমার মনে চিরকালের ছবি হয়ে আছে। সেদিন ছিল জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ১১ই মাঘের উৎসব। রবীন্দ্রনাথ বসেছেন বেদিতে। দিনেন্দ্রনাথ তাঁর উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে গান ধরেছেন, সমস্ত আবহাওয়া যেন এক পরম-সুন্দর দিব্যভাবে উজ্জ্বল—তার মাঝখানে দেবীমূর্তির মতো প্রতিমা দেবী অতিথি-অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করে এগিয়ে নিয়ে আসছেন। আগেই বলেছি তিনি কখনো বেশি অলংকার পরতেন না, তাঁর গলায় সেই একদিনই মাত্র দেখেছিলাম একটি বিলম্বিত মুক্তামালা—পরে শুনেছিলাম ঐ মালাটি দিয়েই রবীন্দ্রনাথ বধূবরণ করেছিলেন। ঐ মালাটির কথা প্রতিমাদি তাঁর শেষ অভিভাষণে উল্লেখ করেছেন।

প্রতিমা দেবীর সংসার ছিল একটি শিল্প— যে নিখুঁত সৌন্দর্য তাঁরা স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে গড়ে তুলেছিলেন তা বাংলাদেশের সৌন্দর্যরুচির উপরে প্রভাব ফেলেছে। সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতিতে। ভারতের লোকশিল্পের বিবিধ উপকরণে তাঁদের গৃহসজ্জার অলংকরণ স্বদেশীয় বিশেষত্বকে মর্যাদা দিয়েছে। পুরাতনকে নূতন করে, নূতন কালের উপযোগী করে তোলা একটি বিশেষ সৃষ্টি— সে পুনরাবৃত্তি নয়, ইতিহাসের পটভূমির উপর নবীনের কল্পরূপকে প্রকাশ করা— যথার্থ শিল্পী ছাড়া এ সম্ভব নয়। প্রতিমাদির সংসারে অতিথিপরিচর্যার মধ্যেও ছিল শিল্পীর নিপুণতা। আমাদের বাঙালীর সংসারে সুন্দরের স্থান বড়ো নেই। গতানুগতিক গৃহসজ্জা অগোছাল এলোমেলো তৈজসে সাধারণত তা শোভাহীন— আর ধনীগৃহে বিদেশীয় আসবাবের ভিড় থাকলেও সৌন্দর্যরুচির পরিচয় কমই পাওয়া যায়। সারা দেশ জুড়ে তাই অসুন্দরের প্রভাব জাতীয় জীবনকে, পথঘাট যানবাহন সমস্ত কিছুকে মলিন শ্রীহীন করে ফেলেছে। এই শহরের পঙ্কিলতা থেকে যখনই প্রতিমাদির সংসারে গিয়েছি সৌন্দর্যের সুখস্বর্গে যেন স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করেছি। ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস স্বকীয় বিশেষত্বে ও অন্যান্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যে সুসম্পূর্ণ। ভৃত্যরা সুশিক্ষিত, বিনীত, অতিথিপরায়ণ। খাবার টেবিলে পাথরের থালাবাটিতে বিবিধ ব্যঞ্জন সাজিয়ে বসে থাকতেন প্রতিমাদি। কখনো বা আসন পেতে পাথরের জলচৌকিতে থালা সাজানো হত। বিদেশী টেবিলের ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা আছে তাই সেটি গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু আমাদের শ্বেতপাথরের থালায় অন্নব্যঞ্জন সাজালে যে স্বদেশী ভাবটি পাই সেটিও রক্ষা করেছিলেন ঠাকুরবাড়ির গৃহিণীরা।

প্রতিমাদির সংসারে প্রতিদিন কত বিদগ্ধজন, খ্যাতনামা ব্যক্তি, বিশ্ববিশ্রুত কীর্তিমান ব্যক্তিরা এসেছেন— তাঁদের পরিচর্যার সুখসুবিধার যেমন ব্যবস্থা হয়েছে আমাদের মতো সামান্যজনেরাও কম সমাদর পায় নি। হয়তো আমরা অনেক বেশিই পেয়েছি। আমরা যে তাঁর একেবারে ঘরের লোক, আপনজন হয়েছিলাম।

ছোটোবেলায় নন্দিনীর একটি পরিচারিকা মাদ্রাজী ঢঙে ফুলের বেণী গাঁথত। তখনো দক্ষিণী শিল্পকলা এদিকে অন্যত্র পরিচিত ছিল না, বাঙালীর মেয়েরা তো মাথায় ফুল পরা লজ্জাকর মনে করত। সেই দক্ষিণী কন্যা জুঁই ফুলের বেণীবন্ধ বিকেলবেলায় থালায় সাজিয়ে রেখে যেত— প্রতিমাদি নিজের হাতে খোঁপা বেঁধে মালা পরিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন কতবার। যখন তিনি তাঁর চাঁপার কলির মতো নিটোল আঙুলে আমার চুল বেঁধে দিয়েছেন— তখন লজ্জায় কি করব ভেবে পাই নি— কেবল মনে হয়েছে আমার চুলগুলো বেশি ময়লা নয় তো! ওঁর ঐ শুভ্র সুন্দর সুখ-স্পর্শ আঙুলগুলি ময়লা হয়ে যাবে না তো!

প্রতিমাদির যত্নের কথা যত ভাবি কত কথাই মনে পড়ে— ছোটোবেলার কথাই আজ বেশি করে মনে পড়ছে। অতিথি-অভ্যাগতেরা প্রাতরাশ খেয়ে বেরিয়ে গেলেন— দশটা নাগাদ সবাই হয়তো ফিরছেন শান্তিনিকেতনের খরগ্রীষ্মের উত্তাপে শ্রান্ত হয়ে। পশ্চিমের বারান্দা খসখসের পর্দা টানা ছায়াশীতল— তখনই ভৃত্যরা নিয়ে আসবে ঠাণ্ডা শরবত। কেউ হয়তো বসেছে— চৌকিটা সুবিধা নয়— কাউকে ডাক দিয়ে বলবেন, 'একটা কুশন এনে দিদির পিঠের কাছে দিয়ে যাও তো।' কখনো বা নিজের হাতে করেই এগিয়ে দিয়ে বলবেন, 'ঠেস দিয়ে আরাম করে বোসো।' এমনি ছিল মাতৃরূপা প্রতিমাদির সেবার অফুরান দান। ভালোবাসার যে প্রবল শক্তি মহাকালের গতিপথকে মসৃণ ও সুখময়

করেছে—জাহ্নবীর মতো সচল, বেগবান, সেই শক্তি নিজ পারিবারিক আবর্তে শেষ হয়ে যায় নি প্রতিমাদির, তা বহু শাখায় বিভক্ত হয়ে বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে।

গুরুদেবের অপূর্ণ গৃহসুখ প্রতিমা দেবীর মতো পুত্রবধূ পাওয়ায় কতকটা পূর্ণ হয়েছিল। শেষ জীবনে তাই 'মামণি'কে সর্বদা কাছে চাইতেন। বলতেন, 'এমন তো আমার কখনো ছিল না, চিরদিন স্বাবলম্বী ছিলাম, কিন্তু এখন বুড়ো বয়সে সর্বদাই 'মা' 'মা' করে মন। ঐ যে তিনি খাবার কাছে এসে বসে এটা ওটা এগিয়ে দেন, ঐটুকু আমার বড়ো দরকার।' অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে বধূমাতার সম্বন্ধে উল্লেখ করতেন রবীন্দ্রনাথ— রবীন্দ্রনাথের কর্মের বিস্তৃত প্রসার, বিবিধ পরিকল্পনা, বহুজনের সঙ্গে সংযুক্ত বিচিত্র ব্যবস্থা, এর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে তাঁর কর্মে সহযোগিতা করা সোজা কথা নয়। প্রতিমা দেবী যথাসাধ্য তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে দেবতুল্য শ্বশুরের কর্মে আত্মনিবেদন করেছিলেন। বিশেষত শান্তিনিকেতনের রূপকল্পে নৃত্য, রঙ্গসজ্জা, নাটকের পাত্রপাত্রীর বেশভূষা এই-সব দিকে প্রতিমাদির পটুতা তাঁর কর্মে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

রূপে গুণে অনুপমা, শ্বশুরকুলে সম্রাজ্ঞী প্রতিমাদি ছিলেন নিরহংকার সহজ মানুষ। নিজেকে প্রকাশ করতেন না, জাহির করতেন না বা অন্যের সঙ্গে ব্যবহারে এতটুকু অহমিকা প্রকাশ পেত না।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনের আপন, কতরকম মানুষ তাঁর কাছে এসেছেন, তাঁদের সকলেই সুযোগ্য নয়, কেহ কেহ অসহনীয়ও হতে পারত কিন্তু প্রতিমা দেবীর কাছে সকলেই সমাদৃত হয়েছে।

একটি দিনের কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। তখন কালিম্পঙে গৌরীপুরের বাড়িতে কবি বাস করছেন। একজন ধনী অতিথির আসবার কথা, সেদিন প্রতিমা দেবী আমায় বললেন, 'আজ তুমি hostess হবে, head of the tableএ বসবে।' এমনি করে সমাদর করতেন তিনি প্রিয়জনদের। হয়তো তিনি জানতেন ঐ ধনী মানী ব্যক্তির কাছে আমি অনাদৃত হব, তাই তিনি নিজে সম্মান দেখিয়ে সে পথ বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু সব মানুষ তো প্রতিমাদি নয়। সকলের অনুভূতির সূক্ষ্মতা নেই। বোধ-শক্তি তীক্ষ্ণ নয়। ধনী ব্যক্তিটি আমায় সম্মানের আসনে সহ্য করতে পারলেন না। স্পষ্টতই তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলেন। আমিও ধীরে ধীরে কপি করবার কাগজপত্র গুটিয়ে (সে সময়ে 'ছেলেবেলা' বইটি প্রেসের জন্য তৈরি করছিলাম) বারান্দার এক কোণে অদৃশ্য হলাম। ঐ ব্যক্তি সন্ধ্যা নাগাদ বিদায় না হওয়া পর্যন্ত দৃশ্যমান হলাম না। রাত্রে প্রতিমাদি ভর্ৎসনা করলেন, 'তুমি চায়ের টেবিলে এলে না কেন? ওর ব্যবহার ভালো লাগল না এই তো? তা এ রকম করলে তো চলবে না। যদি বাবামশায়ের কাছে থাকতে চাও, তাঁর সেবা করতে চাও তা হলে সকলকে সহ্য করতে হবে। তাঁর কাছে যে সবাই আসবে। ভেবে দেখো ত্রিশ বছর এ বাড়িতে বউ হয়ে এসেছি— এই দীর্ঘ দিনে কতরকম মানুষকে সহ্য করতে হয়েছে— সবাইকে কি ভালো লেগেছে ভাবো?' রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ যে কারো একলার সম্পত্তি নয় তিনি যে সকলের, এ কথা তত্ত্ব হিসাবে জানা এক আর ব্যক্তিগত জীবনে তার পরিচয় দেওয়া অন্য কথা। সাধারণত মহারথীদের আত্মীয়স্বজন, দেবতার দ্বারে মোহান্তর মতন তাদের সজীব সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হয়ে থাকেন। সেখানে তাদের অধিকারের গণ্ডি কড়া। আজকাল তো আত্মীয়স্বজনেরা গৌরবান্বিত আত্মীয়কে মূলধন রূপে ব্যবহার করে থাকে। বন্ধুবান্ধবেরাও সুযোগ পেলে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথের দরজাতেও এ রকম স্বতঃ-নিযুক্ত দ্বারীরা এসেছে গেছে।

ঈষৎ ব্যঙ্গমিশ্রিত পরিহাস করে তিনি তাঁদের ‘কাঁটাতারের বেড়া’ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ বা প্রতিমা দেবী কোনোদিনই তাঁর অনুরক্ত ভক্তদের প্রতি ঔদাসীন্য দেখান নি বা তাঁদের প্রতি বিরূপ হন নি। বরঞ্চ পরকে তাঁরা একান্ত আপন করে ঘরের লোক করে নিয়েছেন।

প্রতিমাদির সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আজ আমার নিজের অফুরন্ত ঋণের কথা না লিখে কিই বা লিখব। পুরী থেকে যেবার মংপু এলেন— রথীদা লিখলেন, “এবার বাবার সঙ্গে আমি বা প্রতিমা কেউই যেতে পারব না, তোমাদের exclusive and wholesale rights!” আমাদের মংপুর সংসার তাঁদের ছোঁয়ায় আনন্দময় হয়ে উঠত। আমাদের গৃহের যা-কিছু সুন্দর শোভন তা সবই তাঁদের কাছে শেখা। তাঁরা দুজনে আমাদের সুন্দরকে দেখতে শিখিয়েছেন। রথীদার কথা মনে পড়ে, মংপুর অরণ্যের প্রতিটি লতাগুল্ম বনফুল তিনি খুঁটিয়ে দেখতেন, চিনতেন তাদের পরিচয়। এমন করে যে দেখা যায় তা আগে জানতুম না। যে রূপসম্ভার আমার চারপাশে আবছায়া অস্পষ্ট সৌন্দর্যলোকের মায়া বিছিয়ে রেখেছিল তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় করতে শিখেছিলাম তাঁর কাছে।

আমাদের আত্মীয়র চেয়েও আত্মীয় হয়েছিলেন তাঁরা, এরকম তো তাঁদের বহু পরিবারের সঙ্গেই হয়েছে — আত্মীয়-স্বজনের গণ্ডীর চেয়েও অনাত্মীয়, অর্থাৎ জ্ঞাতিকুটুম্ব সম্পর্কহীন মানুষরাই তো তাঁদের বৃহৎ পরিবারের অঙ্গ হয়েছিল। বস্তুত গুরুদেবের জীবিতকালে শান্তিনিকেতনে তাঁদের আত্মীয়স্বজন বেশি দেখেছি বলে মনে হয় না— রবীন্দ্রনাথ বলতেন রক্তের সম্পর্ক তো একটা আকস্মিক ঘটনা, কিন্তু বন্ধুত্ব নিজের সৃষ্টি।

আমাদের সুদীর্ঘ দিনের গভীর স্নেহসম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে যে দুটি রাত্রি প্রতিমাদির ও আমার জীবনের যুগ্ম পরীক্ষার রাত্রি কালিম্পঙে সেদিনের কথা আমরা উভয়েই অন্যত্র লিখেছি। আসন্ন বিপদের মুখে সম্পূর্ণ নিঃসহায় আমরা দুই নারী আমাদের পরমপ্রিয় প্রাণটি রক্ষার জন্য মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম —সেই কালরাত্রিটির কথা কতদিন একত্র বসে আমরা পরে আলোচনা করেছি। একদিকে ডাক্তার বলছে, এখনই অপারেশন করা হোক, অন্য দিকে প্রতিমাদি নিশ্চিত জানেন গুরুদেবের মত নেই কোনো-রকম কাটাছেঁড়া করায়। সে সময়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে তিনি গুরুদেবের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবার দৃঢ়তা দেখাতে পেরেছিলেন, সে কম কথা নয়।

গুরুদেব চলে গেলেন। তার পর প্রতিমাদি ছিলেন অনেকদিন। স্নেহময় শ্বশুরের স্মৃতিই শেষ জীবনে তাঁর সম্বল ছিল— শুধু তো শ্বশুর নয়, গুরু, সেই গুরুপদে অচলাভক্তি রেখে তিনি ‘মারের সাগর’ পার হয়ে চললেন— আমরা তার নীরব সাক্ষী রইলাম। ধূপের মতো জ্বলতে লাগল দুঃখের আগুনে তাঁর মন, কিন্তু সে দহনে কালি ছিল না, সে শিখা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন নয়— তা ধূপের মতো সৌরভ বিকীর্ণ করে পবিত্র করেছিল তাঁর চারপাশ। এ কথা কবিত্বের মতো শোনালেও কবিত্ব নয়— যেদিন সময় আসবে, হয়তো বা আমাদের মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সম্বন্ধে আরো কিছু লিখতে পারব যাতে ভবিষ্যতের মানুষ জানতে পারবে সাধ্বী নারীর চিরন্তন রূপ। যার মূল দীপ্তি ক্ষমায়। ‘শ্যামা’র যে শেষ গানটি আছে— ‘ক্ষমিতে পারিলাম না যে ক্ষম হে মম দীনতা’ সেই অপূর্ব সংগীতে সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ বাণী ধ্বনিত— সে দীনতা প্রতিমাদিকে স্পর্শ করে নি। তাঁর প্রতি সমস্ত অবিচারকে প্রসন্ন মনে ক্ষমা করে স্বার্থশূন্য প্রেমের দীপ্তিতে মহিমাময়ী তাঁর মূর্তি মনে পড়লে রবীন্দ্রনাথের সেই চিরন্তনীর বর্ণনা মনে পড়ে—

কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাশালিনী
শুধু এ-কালিনী নয় যারা চিরকালিনী।
আমাদের কত ত্রুটি আসনে ও শয়নে
ক্ষমা ছিল চিরদিন তাহাদের নয়নে।

প্রতিমাদির জীবনের সকল দাহ সেই ক্ষমার মাধুর্যে মধুর হয়ে শেষ হয়েছে, এই আমাদের সান্ত্বনা।

মৈত্রেয়ী দেবী

৬

প্রথম দেখিয়াছিনু
বাহিরের রূপরাশি
কোমল মধুর মুখে
সরল মোহন হাসি।
শুনিলাম ভয়নাশা
তোমার মুখের ভাষা
স্বজনের ভালোবাসা
বিতরিলে কাছে আসি
আঁকা আছে মন-পটে
সেই মুখ সেই হাসি।

প্রেমের দাক্ষিণ্য ভরা
সেবাপরায়ণ হাত
লক্ষ্মীর প্রতিমারূপে
দেখিয়াছি দিন রাত।
সবারে আপন-করা
হৃদয় করুণা-ভরা
অভয় প্রসাদ-ঝরা
তোমার নয়নপাত
সবার সেবার লাগি
ব্যাকুল দুখানি হাত!

নবরূপে দেখিলাম
আর এক নূতন রূপ
বাণীর দেউলে যেন
একটি সুরভি ধূপ!

সুন্দরের ধ্যান ধরি
রূপে রূপায়িত করি
রঙে রসে মরি মরি
　　সাধনা কি অপরূপ।
ভারতীর বেদীমূলে
　　সুরভিত যেন ধূপ।

কল্পলোক-বিহারিণী
　　ভাবে ভোলা দুনয়ন
সুন্দরের পূজারিনী
　　ধ্যানরসে নিমগন।
আমার মানসলোকে
নবতর দীপালোকে
যখনি দেখেছি চোখে
　　বিস্ময়মোহিত মন
কল্পলোক-বিহারিণী
　　ও তোমার দু নয়ন।

আজি দেখে ভাবি শুধু
　　সে দেখাই শেষ নয়
এতদিনে পাইলাম
　　সত্য তব পরিচয়!
বাহিরে কোমল দল
অন্তরে কি মনোবল,
স্থির প্রজ্ঞা অবিচল
　　অনির্বাণ জেগে রয়!
এতদিনে পাইলাম
　　একি তব পরিচয়!
হৃদয়ের বহ্নিতাপে
　　তুমি যে গো দুঃখজয়ী
আপন মর্যাদা মাঝে
　　আপনি মহিমাময়ী!

নিরুপমা দেবী

৭

নিত্যনৈমিত্তিকতায় বহমান জীবনধারায়
প্রসন্ন অলকানন্দা-উৎসারিত মানব-জীবন
বিস্ময়ে দেখেছি চেয়ে। বারংবার করেছি গাহন
শান্ত ধৈর্য-সুশীতল কোমল আতিথ্য-পুণ্যনীরে,
আশ্রমলক্ষ্মীর স্নিগ্ধ হৃদয়-আশ্রয়চ্ছায়াতলে।

যে-একক বনস্পতি মহারণ্যে ব্যাপ্তি-পরিণত,
তাঁরে যিনি সন্তর্পণে করেছেন সস্নেহ-পালন
ধরিত্রী সমান ধৈর্যে।

সবাকার দৃষ্টি-অন্তরালে
সকলেরই তরে যিনি জননীর আত্মদান ঢেলে
নীরবে সিঞ্চন করে দিয়েছেন শিল্পরুচিধারা
আশ্রমের দিকে দিকে। নানা কর্মে, নানা জনে ঘিরে
সেবা-সুকল্যাণ-স্পর্শ পরিব্যাপ্ত দেশে, দূরদেশে।

দুঃখে সুখে অবিকার, অবিচল প্রশান্তরূপিণী,
উচ্চাবচ নরনারী পৃথিবীর বিচিত্র ভূগোলে
পবিত্রতা-সুরভিত চরিত্র-লাবণ্যে যাঁর, ঋণী।
কবির তৃতীয় নেত্রে যাথাতথ্য ফুটেছিল যাঁর
"অমরার অসীমতা মাটিতে নিয়েছে সীমা—"
তুমি সেই—অমরী প্রতিমা॥

রাধারানী দেবী

প্রতিমা দেবীর পরলোকগমনের পর বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন হইতে একটি বিশেষ বেতার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়; শ্রীকিরণবালা সেনের প্রবন্ধটির অধিকাংশ ঐ অনুষ্ঠানে পঠিত হইয়াছিল; বেতার-কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে মুদ্রিত।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ গত ৭ পৌষ প্রতিমা দেবীকে অর্ঘ্যদানকল্পে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং ঐ সময় একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ, শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শ্রীরাধারানী দেবীর রচনা এই পুস্তিকা হইতে গৃহীত। নিরুপমা দেবীর কবিতাটি এবং অমিতা ঠাকুরের প্রবন্ধও এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত।

প্রতিমা দেবী -রচিত গ্রন্থাবলী

নির্বাণ। ১ বৈশাখ ১৩৪৯। বিশ্বভারতী। পৃ [৮], ৭৬

রবীন্দ্র-জীবনের শেষ বৎসরের বিবরণ।

লেখিকা-কর্তৃক অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি এবং রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক শেষ স্বাক্ষরিত পত্র-সংবলিত ॥

চিত্রলেখা। আশ্বিন ১৩৫০। বিশ্বভারতী। পৃ [২], ॥০, ৪৭

গল্প: স্বপ্নবিলাসী, মন্দিরার উক্তি, নটী, সতেরোই ফাল্গুন, মেজোবউ, সিনতলা দুর্গ।

কবিতা: লোভ, পথ, স্মৃতি, পাহাড়ি মেয়ে, বিরহ, নিশি-পাওয়া, অন্ধকারে, দীনবন্ধুর অবসান, নীলকণ্ঠ, সঙ্গ, সাঁওতালী, গুরুদেবের প্রতি, সৃষ্টিরহস্য, সাইরেন, কোনারক।

'স্মৃতি' কবিতাটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত রূপান্তর রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে সংযোজিত।

নৃত্য। ২৫ বৈশাখ ১৩৫৬। বিশ্বভারতী। পৃ [।৵০], ৩১

সূচী॥ নৃত্যরস, চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য, চণ্ডালিকা।

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অঙ্কিত পাঁচখানি চিত্র-সংবলিত। মলাটে রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র ব্যবহৃত।

স্মৃতিচিত্র। আশ্বিন ১৩৫৯। সিগনেট প্রেস। পৃ ৯৪

লেখিকার বাল্য ও কৈশোরের ঠাকুর-পরিবারের স্মৃতি।

GURUDEVA'S PAINTINGS. বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি হইতে পুনর্মুদ্রিত। পৃ ১১

মূল বাংলা প্রবন্ধটি বিশ্বভারতী পত্রিকার ভাদ্র ১৩৪৯ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

এতদ্‌ব্যতীত চামড়ার কাজের একটি নকশা-সংগ্রহও প্রতিমা দেবী একসময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ প্রতিমা দেবী -কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রের একটি অ্যালবাম প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছেন।

সুবিমল লাহিড়ী -কর্তৃক সংকলিত

—

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী ১৫ মার্চ ১৯৬৯ : ৩০ ফাল্গুন ১৩৭৫ পরলোকগমন করিয়াছেন। বিশ্বভারতী পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বাংলার পল্লীগীতি। চিত্তরঞ্জন দেব। পরিবেশক ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা ১২। আট টাকা।

চিত্তরঞ্জন দেবের 'পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ' বইখানি সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। উৎসাহিত হয়ে তিনি এবারে বাংলার লোকগীতি সংগ্রহে মনোযোগী হন। এই উদ্যোগের ফসল বাংলার পল্লীগীতি। আগের বইয়ের পরিকল্পনা এই বইয়ের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। এই গ্রন্থে তিনি গোটা বাংলার যথাসম্ভব প্রামাণিক পল্লীগীতি সংগ্রহে মনোযোগী হয়েছেন।

ভূমিকায় লেখক বলেছেন, তিনি গান সংগ্রহ করবার জন্য বাংলাদেশের নানা অঞ্চল ঘুরেছেন। বিভিন্ন ব্যক্তির সাহায্যও পেয়েছেন তিনি অযাচিত ভাবে। সংগীতপ্রিয় চিত্তবাবু নিশ্চয়ই গানগুলি গীত হতে, অভিনীত হতে (যেখানে গীত নাটগীতের রূপ নিয়েছে) দেখেছেন। সেই কারণে গানগুলির অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই। আর সেই কারণেই চিত্তবাবুর বর্ণনায় প্রত্যক্ষের উত্তাপ-উত্তেজনার স্পর্শ পাই।

লোকগীতি পল্লীগীতি সংগ্রহ করবার আগ্রহ বিদেশে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের সংগ্রহ-প্রণালী আরও বেশি বৈজ্ঞানিক। তাঁরা কেবলমাত্র গান সংগ্রহই করেন না— গানের সুর স্বর সবটাই 'টেপ'এ ধরে রাখবার ব্যবস্থা করেন। পাশ্চাত্য দেশগুলির লোকগীতির প্রতি এই নিষ্ঠা দেশপ্রীতিরই দৃষ্টান্ত বলে ধরে নেওয়া যায়। জাতির ঐতিহ্যরক্ষা করবার জন্য আমরা যেমন প্রত্নবস্তু-সংগ্রহে অগ্রসর হয়েছি তেমনি লোকগীতি-সংগ্রহও যে জাতির ঐতিহ্য-উদ্ধারের অন্যতম সূত্র বলে পরিগণিত হতে বাধ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চিত্তবাবুর কর্ম জাতীয়কর্ম। চিত্তবাবুর সংগ্রহ পড়ে কেবলই মনে হচ্ছিল তিনি যদি আধুনিক সুযোগ-সুবিধেগুলি পেতেন তবে তাঁর শ্রম আরও সার্থক হত।

পল্লীগীতির অজস্রতা সংকলনকর্তাকে যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন করে তা হল এই গীতিগুলির বিন্যাসরীতির দুরূহতা। একরকমভাবে অবশ্য এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। বাংলাদেশকে মোটামুটি কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করে সেভাবে গানগুলির গোত্র নিরূপণ সম্ভব। কিন্তু চিত্তবাবু সে পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি। পল্লীগীতির প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য দুইই লক্ষণীয়। যতদূর বুঝতে পারি চিত্তরঞ্জনবাবু গানগুলির বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখে পর্যায়ক্রমে গীত বিন্যাস করেছেন। এই সংকলনগ্রন্থের পাঁচটি খণ্ড। পাঁচটি খণ্ডের নাম যথাক্রমে: লৌকিক ধর্ম-উৎসব ও অনুষ্ঠান, বহিঃ প্রাকৃতিক, অন্তর ধর্ম, সাময়িক গীতি, ছড়া ও প্রবচন। মোটামুটি এই পাঁচটি ভাগে সাজাবার সময়ে চিত্তবাবু আর-একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখেছিলেন। সেইটি হল সাংগীতিক রীতি। কিন্তু সংগীতরীতিতে মার্গসংগীতের মত বিশুদ্ধি পল্লীগীতিতে আশা করা যায় না। এই অসুবিধেকে মনে রেখে চিত্তবাবুর গীতবিন্যাসপদ্ধতিকে বিচার করতে হবে। বলা বাহুল্য আমরা সংগীত-বিশেষজ্ঞ নই। সংগীতবিদের কাছ থেকেই এর যথার্থ বিচার সম্ভব। চিত্তবাবুর সংকলনগ্রন্থ থেকে একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ভাওয়াইয়া গান পর্যায়ে তিনি মৈষাল ও গাড়োয়াল রীতির সংগীতকে (এগুলিকে সংগীতরীতি বলা সংগত কি?) স্থান দিয়েছেন। এই রীতিরই লঘু রূপ চট্‌কা সংগীতকেও পাশে জায়গা দিয়েছেন। আবার কিছু দেহতত্ত্বের গান যেহেতু ভাওয়াইয়া রীতিতে গেয় সেই হেতু তিনি সেই গানগুলিকেও একই পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার, ভাওয়াইয়া, সারি, ভাটিয়ালী, বারমাস্যা, বিচ্ছেদী, ধানকাটার গান, ডাঁইর শাল ইত্যাদি গীত বহিঃপ্রকৃতি নামক একটা খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রথম

ব্যাপারটির মানদণ্ড সুর, দ্বিতীয়টির মানদণ্ড সংগীতের বিষয়। কিন্তু বহিঃপ্রকৃতি খণ্ডে পালাগানগুলি যেমন চকচন্নী, ময়নামতীর গান, রূপধন কন্যা, রূপবান কন্যা ইত্যাদি স্থান পেয়েছে, এর সঠিক কারণ বোধগম্য হয় নি। গ্রন্থকারের অভিপ্রায় যদি ভূমিকায়ও উল্লেখিত হত তবে এই পরিকল্পনার অর্থ স্পষ্ট হতে পারত। বইটির পঞ্চম খণ্ড নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কিন্তু বাংলার পল্লীগীতি গ্রন্থে ছড়া ও প্রবচন স্থান পেতে পারে না। এইটি পরিশিষ্ট রূপে বিবেচনা করা উচিত ছিল।

পল্লীগীতির লেখক নেই। মুখে মুখে এইসব গান রচিত হয়ে বিভিন্ন সময়ে উৎসবে-অনুষ্ঠানে গীত হয়েছে। অনেক গান লুপ্ত হয়েছে। এমনও হওয়া সম্ভব যে একটি গানের কোনো অংশ অন্য একটি গানের অপর অংশের সঙ্গে জুড়ে বসেছে। চিত্তবাবু এইসব মুখের গানকে সংগ্রহ করেছেন। আগেই বলেছি, তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে যা সংগ্রহ করেছেন তার বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি বিস্ময়কর। একার পক্ষে এ কাজ করার জন্য যে শ্রম ও নিষ্ঠার প্রয়োজন এই গ্রন্থে তার পরিচয় আছে। গম্ভীরা, মেছেনীর গান, হুদুমা, ঝুমুর, জারি, ঝাপান ও ভাসান, টুসু গান, গারাম ঠাকুরের গান, ত্রিনাথের পাঁচালী, শনির পাঁচালী, বিয়ের গান, ব্রত-অনুষ্ঠানের গান, রয়ানী বা ভাসান গান, কবিগান, তরজা, বাউল, তুখ্যা, দেহতত্ত্ব, বৈরাগী ও বৈষ্ণবের গান, কীর্তন, স্বদেশী গান, গাজীর গান, বয়াতীর গান, হোলির গান, রাখালিয়া গান, জাগের গান, বাইস্থানীর গান ইত্যাদি বিচিত্র গানের সমাবেশে গ্রন্থটি পল্লীগীতির অমূল্য সংকলন বলে বিবেচিত হবে। কেবল গানগুলি সংগ্রহ করেই চিত্তবাবু ক্ষান্ত হন নি। প্রত্যেক প্রকার গান কোন্ ঋতুতে গেয় অথবা কোন্ অনুষ্ঠানে কোন্ গানের ব্যবহার এসব তথ্য সংগ্রহেও তিনি সতর্ক। সর্বাপেক্ষা মূল্যবান তথ্য পাই গানগুলির গেয় রূপের বর্ণনাপ্রণালীতে। কোন্ গানে কোন্ যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তা তিনি লক্ষ্য করেছেন। গানের আসর কিরকম তারও চিত্রবৎ বর্ণনা চিত্তবাবু দিয়েছেন। এগুলির মূল্য সংগীত-ইতিহাসে স্বীকৃত হবে নিশ্চয়ই।

বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় এ কথা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির পরিচয় সুপ্রাচীন কতগুলি অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিহিত। বিবাহ, সন্তানজন্ম এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম। প্রাচীনকালে এসব ঘটনাকে আশ্রয় করে যে গীত হত তাই নানাভাবে নানারূপে কালোচিত রূপ নিয়েছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশে এসব সংগীতের পটভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। বাস্তুপূজা, ব্রত-অনুষ্ঠানের মূল্যও এইখানে। চিত্তবাবুর সংকলনে এমন-সমস্ত গানের পরিচয় আছে যেগুলির মূল্য এদিক থেকে অপরিসীম। শস্য উৎপাদন থেকে শস্য ঘরে তোলা পর্যন্ত পল্লীবাসীদের চিত্তে আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব চলে, কোনো কোনো গানে তার স্পর্শ পাই। সেই ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হলে আমাদের এই কৃষ্ণধূমশ্বসিত নাগরিক জীবনে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাওয়া যায়। আবার এসব গানের সারল্য আন্তরিকতা এবং অনাবৃত সত্য-কথনের সাহস বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

পল্লীগীতিগুলির রচনাকাল নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কালে কালে এর পরিবর্তন ঘটেছে। চিত্তবাবুর সংকলনে অন্তত সাহিত্যের দিক থেকে দুই জাতের পল্লীগীতি পাওয়া যায়। কতগুলি গীতিতে পৌরাণিক দেবদেবীমাহাত্ম্যখ্যাপন প্রধান, কতগুলিতে সমসাময়িক ঘটনা অথবা সাধারণ মানুষের প্রণয়মধুর জীবন, সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ পরিবেশ এবং ঘরকন্নার কথা স্থান পেয়েছে। এসব বর্ণনায়ও ঐতিহ্যকে মান্য করা হয়েছে। নিতান্ত ঘরোয়া কথাতেও পৌরাণিক প্রসঙ্গ উপেক্ষিত হয় নি। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার স্মৃতি

বার বার সাধারণ জীবনের প্রণয়সংগীতে ঘুরে ফিরে এসেছে। কিন্তু কোনো কোনো সংগীতে সমসাময়িক জীবনের ছবি দেখে পাঠক শ্রোতা সকলেই প্রীত হবেন। লোকগীতির এই রূপান্তর আমাদের অলক্ষে ঘটছে। এ গীতি নদীর স্রোতের মত। পরিবর্তনশীলতাই এর ধর্ম। এ নদীর উৎসের সন্ধান নেওয়া যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি প্রয়োজন আছে সন্ধান নেবার এর প্রতিটি বাঁকের এবং অগ্রগতির। কণ্ট্রোল, বেরুবাড়ী, বন্যা— এরকম নানা বিষয়ের গান সংগ্রহ ক'রে চিত্তবাবু একালের পল্লীগীতির পরিচয় আমাদের উপহার দিয়েছেন। অধিকাংশের মনে পল্লীগীতি বলতে কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট সুরে গেয় গানকে বোঝায়। কিন্তু এই সংকলন পড়ে আমরা বুঝতে পারি পল্লীগীতি চলিষ্ণু এবং তা সৃজনধর্মী।

চিত্তবাবু তাঁর সংকলনে পল্লীগায়কদের মনের কথাটি নিজের ভাষায় বলবার চেষ্টা করেছেন। তিনি সংকলনে সব গান তাঁর সংগ্রহে থাকলেও উল্লেখ করতে পারেন নি। সেসব ক্ষেত্রে তিনি হারানো খেইটি ধরিয়ে দিয়েছেন মাত্র। সংকলনে চিত্তবাবুর ভূমিকা সূত্রধারের। সেজন্য বইটি পড়বার সময় ক্লান্তি আসে না।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিত্তবাবুর বক্তব্য সংশয়ের ঊর্ধ্বে নয়। ঝুমুর, তরজা, ত্রিনাথের পাঁচালী সম্বন্ধে লেখকের সিদ্ধান্ত বোধহয় ঠিক নয়। অন্তত এ সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ আছে। তরজা গানকে এক শো বছরের প্রাচীন বলি কি করে? চৈতন্যচরিতামৃতে তরজার উল্লেখ আছে। ঝুমুর গান সম্বন্ধে চিত্তবাবু যা বলেছেন তা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সংগীতবিদ্‌রা এ গান সম্বন্ধে প্রাচীনত্বের নিদর্শন উপস্থিত করেছেন। গম্ভীরা প্রসঙ্গে শিব সম্বন্ধে চিত্তবাবুর বক্তব্য আদৌ প্রামাণিক নয়। এসব ত্রুটি সামান্য। পরবর্তী সংস্করণে চিত্তবাবু আধুনিক গবেষকদের মতামতকে গ্রাহ্য করলে সুখী হব।

বিজিতকুমার দত্ত

জনশিক্ষা ও সংস্কৃত। শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। প্রকাশিকা উষা দেবী, 'ঋষিধাম', দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা। ৫.৫০ টাকা।

বর্তমান ভারতের প্রধান সমস্যাগুলির অন্যতম হল ভাষা-সমস্যা। গত বিশ বছর ধরে ভারতের বহু মনীষী-শিক্ষাবিদ্ সরকারী ও বেসরকারী স্তরে এই সমস্যার স্বরূপ নির্ধারণ করে তার সমাধানের প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু বহু-আলোচিত এই সমস্যার সমাধান আজও হয় নি। আর, এই কারণেই বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ আরও দৃঢ়মূল হয়ে উঠছে। বৈচিত্র্যের মাঝে মহামিলনের সূত্রটি গাঁথার সকল প্রয়াস দুরূহ হতে চলেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রিভাষানীতি প্রবর্তনের প্রয়াসের ফলে এই সমস্যাটি নতুন রূপে দেখা দিয়েছে। এই ত্রিভাষানীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বৃহত্তর ভাষাগোষ্ঠীর জননী সংস্কৃতের স্থান কোথায় তা আজও নির্ধারিত হয় নি। কারণ এই ত্রিভাষানীতির যাঁরা উদ্ভাবক তাঁরা এবং দেশের বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজ সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তেমন যেন মনোযোগী নন। জাতীয়-সংহতির কথায় আমরা মুখর, আসমুদ্রহিমাচল ভাব-সংযোগ সাধনে আমরা কৃতসংকল্প, কিন্তু যে ভাষার মাধ্যমে সেই সংযোগ সাধন সম্ভব তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি তেমন নেই। তার যথাযথ মূল্যায়নে আমরা বিমুখ।

আজ থেকে দেড় শো বছর আগে সংস্কৃত শিক্ষার এমনই সংকট মুহূর্ত এসেছিল। তখন বিদেশী শাসকগণ এগিয়ে এসেছিলেন সংস্কৃতের প্রচার ও প্রসার -কল্পে। ভারতীয় জনমানসে প্রবেশলাভ এ ভাষার চর্চা ছাড়া সম্ভব নয়, এ সত্যটি তাঁরা বুঝেছিলেন। 'সংস্কৃত ভাষার সমুন্নতি ও এই ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা'র জন্য তাঁরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েকটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত বহু বিদেশী মনীষী এই ভাষাচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন, যাঁদের কাছে প্রতিটি ভারতীয় চিরকৃতজ্ঞ। এমনই একজন মনীষী হোরেস হেম্যান উইলসন লিখেছিলেন—

> যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্যহিমাচলৌ।
> যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্॥

তার পর গত দেড় শো বছর ধরে স্কুল-কলেজের শিক্ষায় সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্যরূপে গৃহীত হয়ে এসেছে। ইউরোপের, বিশেষ জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গ্রীক বা লাতিন অবশ্যপাঠ্য। এই দুটি ভাষার একটিতে উত্তীর্ণ না হলে কোনো বিদেশী ছাত্রের ওদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ সম্ভব নয়। কারণ তাঁরা বলেন, গ্রীক বা লাতিনের সঙ্গে পরিচয় না হলে ইউরোপীয় মননের গভীরে প্রবেশ লাভ অসম্ভব। তাঁরা যে তুলনায় প্রাচীন ভাষার প্রতি আগ্রহী, আমরা ততই আমাদের প্রাচীনতম ভাষার প্রতি উদাসীন।

এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টা স্মরণীয়। সংস্কৃত ভাষার দুরূহতা উপলব্ধি করে একে সর্বজনবোধ্য করায় তাঁর প্রচেষ্টার কথা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে জাতি স্মরণ করে। তাঁর এই দূরদর্শিতা বাংলাভাষাকেও কতদূর উন্নত করেছে তা বঙ্গভাষাসেবী কারও কাছেই অজ্ঞাত নয়। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অধ্যাপক চক্রবর্তী বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় ব্রতী হয়েছেন সন্দেহ নেই। লেখকের প্রতিপাদ্য: আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার সকল স্তরে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত; এবং এর সপক্ষে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে লেখক নানান্ যুক্তির উপন্যাস করেছেন। স্বাধীনতালাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী মহলে যে প্রয়াস ও বিরোধিতা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখক উপস্থাপন করেছেন। দেশাত্মবোধের বিকাশে, ধর্ম ও নীতিশিক্ষায়, মাতৃভাষার উন্নতি সাধনে, জাতীয়-সংহতি সাধনে, আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জনে ও সর্বোপরি আত্মশক্তির উদ্বোধনে সংস্কৃতের কার্যকারিতা কোথায় লেখক তা বিভিন্ন অধ্যায়ে গভীর অনুরাগ ও মননশীলতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর প্রতিটি উক্তি তথ্যসমৃদ্ধ, যুক্তিনিষ্ঠ। স্বল্পপরিসরে এত তথ্যের অবতারণা সত্ত্বেও গ্রন্থটি সুখপাঠ্য, কারণ লেখকের একটা নিজস্ব স্টাইল আছে।

পুস্তিকাটির পরিশিষ্ট অংশ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিশেষ মূল্যবান্। সংস্কৃতকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করার জন্য লোকসভায় ১৯৬৩ সনে যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল তার বিস্তৃত বিবরণ লেখক সরকারী নথিপত্র থেকে উদ্ধার করেছেন।

শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য

স্বরলিপি

নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা'র গান

ছি ছি, মরি লাজে, মরি লাজে—
কে সাজালো মোরে মিছে সাজে। হায়॥
বিধাতার নিষ্ঠুর বিদ্রূপে নিয়ে এল চুপে চুপে
মোরে তোমাদের দুজনের মাঝে।
আমি নাই, আমি নাই— আদরিণী লহ তব ঠাঁই
যেথা তব আসন বিরাজে। হায়॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II না -র্রা । র্সা -া I -না -ধা । ধা ধনা I না -ধা । ধা -মা I
ছি ০ ছি ০ ০ ০ ম রি লা ০ জে ০

I -া -া । মা পা I পা -গা । গা -ঋা I -সা -া । -া -া I॥
০ ০ ম রি লা ০ জে ০ ০ ০ ০ ০

I সা সমা । মা মা I মা মা । মপা গা I মা -ধা । ধা -া I
কে সা০ জা লো মো রে মি০ ছে সা ০ জে ০

I -া -া । -া -া I গা -মা । -ধা -না I -র্সা -ঋা । নর্সা -ধা II
০ ০ ০ ০ হা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

II ধা ধা । না র্সা I র্সর্গা -ঋা । -ঋা র্সা I র্সা -না । না -ধা I
বি ধা তা র নি০ ষ্ ঠু র বি ০ দ্রূ ০

I ধা -না । না নধা I ধা -মা । মা -া I -া -া । মা মা I
পে ০ নি য়ে০ এ ০ ল ০ ০ ০ চু পে

I মগা -পা । মা -া I -া -া । মা মা I মা ^মপা । মা গা I
চু০ ০ পে ০ ০ ০ মো রে তো মা দে র

I মা ধা । ধা গা I মা -ধা । ধা -া I গা -মা । -ধা -না I
দু জ নে র মা ০ ঝে ০ হা ০ ০ ০

I -র্সা -ঋর্া । -^নর্সা -ধা I -া -া । র্সা র্গা I র্গা -র্পা । -া -া I
০ ০ ০ য়্ ০ ০ আ মি না ০ ০

I -র্পা -র্গা । র্গঋর্া ঋর্া I র্সা -া । -া -া I না র্সা । ঋর্া ঋর্সা I
০ ই আ০ মি না ০ ০ ই আ দ রি ণী০

I র্সা র্সনা । না নধা I ধা -া । -া -পা I -া -া । -া -া I
ল হ০ ত ব০ ঠাঁ ০ ০ ই ০ ০ ০ ০

I পা পমা । মা মা I মা মা । মা মা I মগা -পা । মা -া I
যে থা০ ত ব আ স ন বি রা০ ০ জে ০

I গা -মা । -ধা -না I -র্সা -ঋর্া । -^নর্সা -ধা II II
হা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

বিশ্বভারতী পত্রিকা

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশের স্থান : ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
২. প্রকাশের সময়-ব্যবধান : ত্রৈমাসিক
৩. মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় (ভারতীয়)
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯
৪. প্রকাশক : শ্রীসুশীল রায় (ভারতীয়)
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
৫ সম্পাদক : শ্রীসুশীল রায় (ভারতীয়)
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
৬. স্বত্বাধিকারী : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
পো : শান্তিনিকেতন। বীরভূম। পশ্চিমবঙ্গ

আমি, শ্রীসুশীল রায়, এতদ্দারা ঘোষণা করিতেছি যে উল্লিখিত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

১ মার্চ ১৯৬৯ স্বা: সুশীল রায়

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়   বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৪   বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬

কাহিনী
রবীন্দ্রনাথ
চিত্রনাট্য
সঙ্গীত
পরিচালনা
অরুন্ধতী দেবী
শ্রেষ্ঠাংশে
নবাগতা হাসু ব্যানার্জী
কে.এল.কাপুর
প্রোডাকসন্সের
নিবেদন
মেঘ ও রৌদ্র

বিশ্বভারতী পত্রিকা

নন্দলাল বসু বিশেষ সংখ্যা

আচার্য নন্দলাল বসুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। আচার্য নন্দলাল-অঙ্কিত একবর্ণ ও বহুবর্ণ অনেকগুলি চিত্রে ও বিশিষ্ট লেখকদের রচনায় এই সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। মূল্য দশ টাকা।

বিশ্বভারতীতে টাকা জমা দিয়ে যাঁরা নন্দলাল বসু সংখ্যা প্রকাশের পূর্ব থেকে বার্ষিক গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত আছেন এই সংখ্যাটি তাঁরা সাড়ে সাত টাকায় সংগ্রহ করতে পারবেন। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

Khalid B. Sayeed

PAKISTAN

The Formative Phase
1857-1948

This book is an attempt by a political scientist to evaluate the strength and weaknesses of the Muslim separatist movement that eventually culminated in the creation of Pakistan. Both in the narrative and in the analysis, the author tries to understand the depth and intensity with which certain ideas were held or put forward by both the Muslim and the Congress leaders.

Second edition 45s

Allen J. Greenberger

THE BRITISH IMAGE OF INDIA

A Study in the Literature of Imperialism

British policy towards India grew out of a combination of factors. Among them was the way the British viewed India, the Indians, and themselves.

'His book deals with the unique and intricate relationship of Britain with India through an analysis of 130 works by 50 British authors. Dr Greenberger's style is agreeable . . .' —*Sunday Telegraph*

Rs 37.50

Oxford University Press

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬ · ১৮৯১ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য দেড় টাকা

রাঙামাটির পথ

শিল্পী রামকিংকর

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬ · ১৮৯১ শক

চিঠিপত্র প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পোস্টমার্ক
২৩ এপ্রিল, ১৯১৫

কল্যাণীয়েষু

কোনো ভদ্রলেখকের পক্ষে বারো মাসে বারোটা করে গল্প লেখা কি সম্ভব, না উচিত? এ'তে একরকম স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয় যে তুমি চুরি করে ব্যবসা চালাও—কিন্তু ঐ বিদ্যাটা লেখকদের জোয়ান বয়সে কতকটা মানায়, শেষ বয়সে না। এ রকম নিয়ত রচনা করে যাওয়া প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ—ফুল ফোটার এবং ফল ধরার ঋতু আছে—প্রকৃতির সবুজপত্রে বারোমেসে লিপিকর ক'টা আছে? যাই হোক্, মণিলালের সঙ্গে তক্‌রার করে পেরে উঠবনা। একটা গল্প লিখ্‌তে লাগব।

কালিঘাটের হরিদাস হালদারকে জান? লোকটি লিখতে পারে সন্দেহ নেই। আমাকে তাঁর রচিত "গোবর গণেশের গবেষণা" বলে একখানা বই পাঠিয়েচেন—আমার ত পড়ে ভাল লাগ্‌ল। মনে হল অনেকটা সবুজপত্রের কায়দার লেখা—অর্থাৎ খুব হাল্কা এবং উজ্জ্বল—লোকটার সাহসও আছে। তোমরা এঁকে যদি পাকড়া কর ত মন্দ হয় না।

তুমি একবার কোমর বেঁধে গল্পে লাগলে আমি ত খুসি হই। আমার বিশ্বাস তুমি পারবে—অবশ্য, সম্পূর্ণ তোমার নিজের ধাঁচার একটা জিনিষ হবে—অর্থাৎ ইস্পাতে গড়া মূর্ত্তি হবে—ঝক্‌ঝক্ করবে অথচ কঠিন হবে—কড়া আগুনে গালাই করা ঢালাই করা জিনিষ।

তোমার সেই কাঠের পুতুলটাতে একবার হাত দিলে কেমন হয়?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
মার্চ, ১৯১৬

কল্যাণীয়েষু

আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করচি সাহিত্য-সতরঞ্চের বোড়ের দল তোমার কিস্তি মাৎ করবার জন্য ভারি চঞ্চল হয়ে উঠেচে। আমাদের দেশের মুস্কিল ঐ। যার যা ক্ষমতা আছে সেটাকে আমরা অভ্যর্থনা করে নিতে জানিনে—যেখানেই শক্তির প্রকাশ দেখি সেখানেই শক্তিশেল হানবার জন্যে

আমাদের হাত নিস্‌পিস্‌ করে। এই বিরুদ্ধতায় বিশেষ ক্ষতি হত না যদি অনুকূলতাও সমাজের মধ্যে থাক্‌ত। সেটা কোথাও নেই— লেখককে নিতান্তই নিজের তাগিদে কিম্বা সম্পাদকের তাড়ায় লিখ্‌তে হয়— অর্থাৎ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে হয়— তার উপরে মোষের গুঁতোটা উপরি-পাওনা।

এখন মনে হচ্চে তোমার গল্পগুলো উল্টো দিক দিয়ে সুরু হলে ভালো হত। তোমার শেষ গল্পটা সব চেয়ে human। গল্পের প্রথম পরিচয়ে সেইটে সহজে লোকের হৃদয়কে টান্‌ত— তার পরে অন্য গল্পে মনস্তত্ত্ব এবং আর্টের বৈচিত্র্য তারা মেনে নিত। এবারকার দুটি নায়িকাই ফাঁকি— একটি পাগল, আর একটি চোর। কিন্তু নায়িকার প্রতি, অন্তত পুরুষ পাঠকের যে একটা স্বাভাবিক মনের টান আছে, সেটাকে এমনতর বিদ্রূপ করলে নিষ্ঠুরতা করা হয়। সব পাঠকের সঙ্গেই ত তোমার ঠাট্টার সম্পর্ক নয়— এইজন্যে তারা চটে ওঠে। তাদের পেট ভরাবার মত কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলেও ইতরে জনাঃ খুসি থাকত। তুমি করালে কি না "ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং"— কিন্তু কথাটা একেবারেই সত্য নয়— বস্তুত, ঘ্রাণেন দ্বিগুণ উপবাস। মানুষ যখন ঠকে তখন সহজে এ কথা বল্‌তে পারেনা যে, ঠকেচি বটে কিন্তু চমৎকার!

ছাত্রশাসনটা ইংরেজি করা হয়েচে— Modern Reviewতে যাবে। Lord Carmichaelকে পাঠিয়েছিলুম— তাতে কিছু ফল হয়েচে বলে খবর পেয়েচি। কিন্তু শুনচি আ··· বিশেষ কারণে বিরুদ্ধ-পক্ষ নিয়েচেন— তা যদি সত্য হয় তাহলে শিশুপালবধ হবে, কেউ ঠেকাতে পারবেনা— দ্বাপরযুগে কৃষ্ণভক্তিতে সেটা ঘটেছিল কলিযুগে ঘট্‌বে গোরার ভক্তিতে। দুঃখ করে কি করব? মরে তারাই যাদের মরণদশা। দেবা দুর্ব্বলঘাতকাঃ।

তোমার যে সব প্রবন্ধ ছাপতে চাও একবার চোখ বুলিয়ে দেখা যাবে— প্রশ্নপত্রের বাংলা নমুনার টুক্‌রোটি কার আমি তাই ভাবছিলুম। অনেক চিন্তা করে শেষকালে ভাবলুম হয়ত বা "ছিন্নপত্রের" কোনো চিঠির মধ্যে ঐ কটা লাইন লিখেও বা থাক্‌ব। এত লিখেচি যে নিজের লেখার হিসেব রাখা শক্ত হয়ে উঠেচে।

মানসীতে তোমার লেখার বিরুদ্ধে যদি কিছু বেরিয়ে থাকে তার কারণ বোধ হয় তোমার ভাষাটার সঙ্গে নাটোরের ঝগড়া মিট্‌চে না। বৈশাখের মানসীতে কিছু লেখা দেবার জন্যে প্রভাতকুমার আমাকে বিষম পীড়াপীড়ি লাগিয়েচে। তুমি বৈশাখে একটা কিছু শীতলভোগ দিলে হয়ত যুগল সম্পাদক প্রসন্ন হতে পারেন। পূর্ব্বে যখন ভোগ জোগাতে তখন ত তোমার দিন ভালই চলছিল!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পোস্টমার্ক, য়োকোহামা
২০ জুলাই, ১৯১৬

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, এখানে এসে অবধি লেখবার সময় পাইনি। প্রথমত এখানকার জন্যে গোটা তিনেক লেকচার লিখ্‌তে হয়েচে— তার পরে আমেরিকার জন্যে লেকচার লিখতে বসেচি। আসচে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি

আমেরিকার লেকচার স্বরু হবে তার আগে যতগুলো পারি লিখে ফেলতে হবে। পশ্চিমের দিকে মুখ ফিরিয়েচি এখন পূবের দিকে মন দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত হয়েচে। আমার উদয়কাল আমি পুবকে দিয়েচি, আমার অস্তকালটা পশ্চিমকে দেওয়া যাক্। জাপানে একরকম আসর জমেচে মন্দ নয়। এদের সঙ্গে ব্যবহারে মনে খুব একটা আনন্দ হয় যে এরা অন্তরের সঙ্গে আমার কাছে আসে। এদের সত্যি দরকার আছে বলে এরা চায় সেইজন্যে আমার যা কিছু সত্যি আছে সেটা এদের সামনে এনে দেওয়া আমার পক্ষে খুব সহজ হয়। য়ুরোপেও তাই। আইডিয়া তাদের জীবনের খোরাক। তারা গভীর প্রয়োজন থেকে আইডিয়াকে চায় এইজন্যে গভীর উৎস থেকে আইডিয়া তাদের জন্যে উৎসারিত হয়। আমাদের অজীর্ণের দেশ, আইডিয়ার ক্ষুধা নেই— এইজন্যেই আইডিয়াকে খাদ্যরূপে চাইনে, চাট্‌নিরূপে চাই। কিন্তু চাট্‌নির ব্যবসা আর ভাল লাগে না। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জেনো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
১৩ এপ্রিল, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, অর্জ্জুনের একটা সময় এসেছিল যখন সে নিজের গাণ্ডীব নিজে আর তুল্‌তে পারেনি। আমার কি গাণ্ডীবের কারবার ছেড়ে দেবার দিন আস্‌বে না, মনে করচ? মাঝে মাঝে নোটিস্ পাই, বুঝতে পারি মানে মানে আসর ছেড়ে দেওয়াই সুবুদ্ধির কাজ। কিছুদিন থেকে আমার কানের মধ্যে কি একটা উৎপাত হয়েচে তাতে যে কেবল শোনা কমেচে তা নয় মগজের মধ্যে জড়তা এসেচে— কিছুতে লিখ্‌তে পড়তে গা লাগ্‌চে না। এই ত গেল প্রথম দফা। দ্বিতীয় হচ্চে এই যে, এতদিন যখন কলম সতেজ ছিল তখন অন্য সকল কাজ অবহেলা করে তার পিছনেই দিন কাটিয়েচি। এখন কলমের চঞ্চলতা আপনিই কমে গেছে বলে বিদ্যালয়ের কাজে সমস্ত মন ঝুঁকেচে। আমি যে-বয়সে এসে পৌচেছি, সে-বয়সের ভয়ানক একটা সঙ্গহীনতা আছে। এই মরুভূমির মাঝখানে স্থাণু হয়ে বসে থাকা, না সুখকর, না স্বাস্থ্যকর। তবু যতদিন লেখার আবেগ প্রবল ছিল ততদিন নিজের রচনালোকের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো যেত। এখন বুঝতে পারচি সেই লেখার উপর নিয়ত ভর করবার মত জোর তার নেই। তাই, নিতান্ত পথে বেড়িয়ে না-পড়ে' আমার জীবনের একটা-কোনো আশ্রয় পাকা করে নিতে হবে। আমি ছেলেগুলোকে সত্যিই ভালোবাসি অথচ তাদের সঙ্গে আসক্তি বা স্বার্থের যোগ নেই বলে মন মুক্ত থাকে— এইজন্যে ওদের সেবায় যদি পুরোপুরি লাগি তাহলে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সের জীর্ণতার সমস্ত ফাঁকগুলো ভরে যাবে অথচ ছাড়াও থাক্‌ব। সব-শেষ দফার কথাটা কাউকে বলবার কথা নয়। মোটামুটি সে হচ্চে এই যে, জীবনটাকে ত ত্যাগ করতেই হবে— এ কথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। সেই ত্যাগটা যাতে নিছক লোকসান না হয় সে দিকে ভিতর থেকে বারবার তাগিদ আসে। তাই এখন পাঁচ কাজে আর মন লাগে না। নিন্দা প্রশংসার উত্তেজনা এড়িয়ে চল্‌তে পারলে তবেই লক্ষ্যটা স্থির থাকে— নইলে মাতালের মত পা টলে টলে যায়। এই সব কারণেই, যে-জীবনটা এতদিন বহন করে এসেচি সেটাকে আর খাতির করতে পারিনে

—তার বোঝা এইবার নামাব। তার মজুরি যা জুটেছে তা আমার যথেষ্ট হয়েছে, এখন সেইটেকে ট্যাঁকে নিয়ে অন্য কারবারে নাববার ইচ্ছা। তোমার কাছে সমস্তটা খোলসা করেই বল্লুম।

এ কথা বলা আমার তাৎপর্য্য নয় যে, লেখা আমি একেবারে ছেড়ে দেব। বল্লেও সেটা বাজে কথা হবে— কেননা কম্‌লি নেই ছোড়্‌তি হ্যায়। ওটা ম্যালেরিয়ার বিষ, কোনো নোটিস্ না দিয়ে হঠাৎ ক্ষণে ক্ষণে কাঁপন ধরাবে। কিন্তু সেটা তার নিজের অসাময়িক উত্তেজনায়, সাময়িক পত্রের বাঁধা মৌতাতের উত্তেজনায় নয়। এটুকু বলে রাখতে পারি— লেখবার কথাটা মনে রেখে দিলুম— এবং যখন লিখব তখন তোমাদের পেয়াদা পাঠাতে হবে না। সুতরাং আমার তরফ থেকে তোমাদের যেটা জুটবে সেটা উপরি-পাওনা। বাঁধাবরাদ্দর জন্যে অন্য পাকা বন্দোবস্ত রাখ্‌তেই হবে।

আমার মন অনেকদিন থেকেই ছুটির দরখাস্ত করচে— কিন্তু আপিসের কর্ত্তাদের কাছ থেকে কোনোমতেই ছুটি মঞ্জুর হচ্ছিল না। তাই এবার বিনা মঞ্জুরিতেই ছুটি নিয়ে দৌড় মারবার উদ্যোগ হচ্চে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের জেরটাকে Gordian-গ্রন্থির মতই ছেদন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

এইবার নতুন লেখকদের খুব কষে নাড়া দাও। আমরা যে এতদিন সাহিত্যের দরবার করে এসেচি সে ত নেহাৎ সৌখীন চালে করি নি। যখন তম্বুরা ধরবার হুকুম পেয়েছি তখন ভৈঁরো থেকে সুরু করে মালকোষে এসে শেষ করেচি। আবার যখন ঢাল সড়কির পালা তখন নিজের বা অন্যের মাথার পরে দরদ রাখি নি। গালমন্দর তুফান বেয়ে পাড়ি লাগিয়েচি, হাল ছাড়িনি। দিন রাত যে মাথার পরে কোথা দিয়ে গেচে খবর রাখিনি। যাঁরা নবীন সাহিত্যিক তাঁরা একথা মনে রাখবেন। সাহিত্যের পেয়ালা একেবারে চুমুক মেরে উজার করতে হয় এতে বাইরে থেকে ঠোকর মেরে কোনো ফল হয় না। যাঁরা লাগবেন তাঁদের পুরোপুরি লাগ্‌তে হবে।

বিবিকে আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ দিয়ো। ক্লান্ত হয়ে আছি— আজ এই পর্যন্ত। ইতি ৩১ চৈত্র ১৩২৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১৯ এপ্রিল, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, গড়িয়ে গড়িয়ে দিন যাচ্চে, লেখাপড়ার কাজ বন্ধ। কানের দিক দিয়ে মগজের উপর একটা পর্দ্দা পড়ে আস্‌চে। এর আয়োজন কিছুকাল থেকেই চল্‌চে। তাই মনটা ভারি একলা হয়ে পড়েচে। শুধু কেবল লেখাতে এখন ফাঁক ভরবে বলে মনে হয় না। বিদ্যালয় আমার সঙ্গী। ওখানে মানুষের সংসর্গ পাই, হৃদয়ের অন্ন জোটে— অথচ ঝগড়াঝাঁটি নেই। তাই আর সমস্ত ছেড়ে এই শিশু নরনারায়ণের মন্দিরে সেবায়েৎগিরির কাজেই লাগব মনে করচি। ঐ মন্দিরের পথটা নিষ্কণ্টক। আমাদের দেশে সাহিত্য-ব্যাপারটা এত বেশি মানবসঙ্গবর্জ্জিত, এত বেশি সৌখীন যে, ওতে হৃদয়টা উপবাসী থেকে যায়। অথচ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার গুঁতোগুলো ষোলো আনা খেতে হয়। সাহিত্য থেকে আমাদের দেশের

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী

বিশ্বভারতী সম্মিলনী · জোড়াসাঁকো বিচিত্রা-ভবন · ১৯৩৯(?)

সমাজ বহুদূরে। আমি স্বভাবতই নিছক বুদ্ধিব্যবসায়ী নই— এইজন্যে, যে তাস একলা বসে খেলতে হয় সে তাস খেলায় আমার দিন আর কাটে না।

বিদ্যালয়ের ছুটি হবে ২৬শে বৈশাখে— তারপরে একবার কানের তদ্বির করা যাবে।

সেই যে বাংলা Home Library পর্য্যায়ের বই লেখাবার প্রস্তাব করেছিলে— সেটা ভুলোনা। ভারি দরকার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[১৯২১]

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, বিশ্বভারতী ক্রমেই এর সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ হয়ে উঠ্‌চে। এইবার ৭ই পৌষের সাম্বৎসরিকে এ'কে সাধারণের হাতে দেব। তার Constitution তৈরি হচ্চে। আমি নামে মাত্র Founder President রূপে মাথায় বসে থাকব। কিন্তু একজন সত্যকার কর্ম্মকর্ত্তা চাই— ইংরেজিতে যাকে বলে Vice-Chancellor। অনেক ভেবে দেখলুম। শেষকালে এই স্থির করচি তুমি যদি রাজি হও তবে তোমাকে এই পদে বসাই। আশা করচি অর্থসম্বল হবে— কিন্তু আপাতত এই পদের বেতনস্বরূপে কোনোমতে মাসিক ৩০০ তিনশত টাকা বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। অবশ্য এখানেই থাকতে হবে— প্রথম organise করবার যে মেহন্নত ও চিন্তা ও দায়িত্ব তার সমস্তটাই তোমার উপরে পড়বে। চেষ্টা করব তোমাদের একটা বসতির সুবিধা করে দিতে। এই কথাটি বিশ্বাস কোরো যে এই institutionটার প্রসার সমস্ত সভ্যপৃথিবীতে— এর প্রতিষ্ঠা এর মধ্যেই হয়েছে, এখনো সকলে তা দেখ্‌তে পাচ্চে না— অতএব এর কর্ণধার হবার সম্মান কারো পক্ষেই অল্প নয়। সংক্ষেপে এইটুকু বল্‌লুম। যদি একবার আস্‌তে পার তাহলে আলোচনা করবার সুযোগ হবে— কিন্তু বেশি বিলম্ব করা চল্‌বে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

প্রমথ চৌধুরী

আজ ৭ই অগস্ট, আমার জন্মদিন ও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন। এ দিনে যে আমাকে একটি নূতন পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে, তার কারণ বোধ হয় বহুপূর্বে ১৩২১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে ২৫শে বৈশাখে আমি 'সবুজ পত্র' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করি।

সে পত্রের গোড়াতেই আমি লিখি যে, নতুন-কিছু করবার উদ্দেশ্যে এ পত্র প্রকাশিত হচ্ছে না। এ স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও সবুজ পত্র ভাবে ও ভাষায় একখানি অপূর্ব নূতন পত্র বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

সেকালে আমি ছিলুম সাহিত্যক্ষেত্রে একজন অজ্ঞাতকুলশীল লেখক। অবশ্য সবুজ পত্র প্রকাশ করবার পূর্বে আমি স্বনামে ও বিনামে কিছু-কিছু গদ্যপদ্য লিখেছিলুম। আমার সেইসব লেখা পড়ে রবীন্দ্রনাথ আমার হস্তে সবুজ পত্র সম্পাদনার ভার ন্যস্ত করেন। আমি সে দায়িত্ব প্রসন্নমনে গ্রহণ করি। কেননা রবীন্দ্রনাথ আমাকে ভরসা দেন যে, তিনি তাঁর গদ্যপদ্য রচনা সব সবুজ পত্রে প্রকাশিত করবেন।

এ স্থলে আমি উক্ত পত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চাই। বহু লেখক সবুজ পত্রের নূতনত্বের বিরোধী হয়ে ওঠেন। তার কারণ আমি মামুলী ধরণের লেখা লিখতুম না। অর্থাৎ ছোট বড় মাঝারি সেকালের লেখকদের পদানুসরণ করিনি। ভঙ্গিতে ও ভাষায় প্রচলিত পথ ছেড়ে স্বকীয় পথ ধরেছিলুম। অপর লেখকদের মতে এটি একটি মহা অপরাধ। আমি বিরুদ্ধ সমালোচনায় বিচলিত হই নি। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ আমার নিজ ভাষায় নিজ মত প্রকাশ করতে আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এ ছাড়া সবুজ পত্র সম্বন্ধে আমার আর-কোনো সম্পাদকীয় কৃতিত্ব ছিল না। রবীন্দ্রনাথই তাঁর কবিতা গল্প ও প্রবন্ধে ও-পত্রপুট পূর্ণ করে রাখতেন। সবুজ পত্র যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, সে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় উদ্ভাসিত ছিল ব'লে।

রবীন্দ্রনাথ এখন নেই। কিন্তু শান্তিনিকেতন এখনো আছে। শান্তিনিকেতন একটি চিত্তাকর্ষক idea। এ ideaর জন্ম রবীন্দ্রনাথের মনে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে এ idea দেহধারণ করেছে। বীরবল বহুকাল পূর্বে লিখেছিলেন যে, আমাদের বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের প্রবেশ নিষেধ। প্রথমেই চোখে পড়ে যে, রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের চর্চা যথেষ্ট স্থান লাভ করেছে। প্রমাণ, শান্তিনিকেতনের সংগীতভবন ও কলাভবন। সংগীতের চর্চা ও চিত্রকলার চর্চা যে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার প্রধান অঙ্গ, সে জ্ঞান রবীন্দ্রনাথের ছিল।

শিক্ষায় সংগীতের চর্চা যে নিতান্ত আবশ্যক, সে ধারণা আজকাল ইউরোপের শিক্ষাচার্যদের মনকে অধিকার করেছে। কিন্তু গ্রীসে এবং ভারতবর্ষে পুরাকালেও শিক্ষিত লোকদের মধ্যে সংগীতচর্চার রেওয়াজ ছিল। তার প্রমাণ প্রায় সমস্ত সংস্কৃত স্যাহিত্যে পাওয়া যায়। এবং সংগীতের চর্চা যে পাণ্ডিত্যের বিরোধী ছিল না তা বাণভট্টের একটি কথায় বোঝা যায়। তিনি যে স্থলে নিজের পূর্বপুরুষের গুণগ্রামের পরিচয় দিয়েছেন সেখানে বলেছেন যে, তাঁরা সকলেই বেদ অভ্যাস করতেন ও নানাপ্রকার শাস্ত্রের আলোচনা করতেন ; তা হলেও তাঁরা সংগীত ও কলাবিদ্যার বাহ্য ছিলেন না। সেকালের মহিলারা যে চিত্রাঙ্কণ করতেন তার পরিচয়ও সংস্কৃত সাহিত্যে ছড়ানো রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মন ছিল একসঙ্গে

অতি নূতন ও পুরাতনের আধার। আমরা আজকাল যাকে culture বলি তা নানারূপ আর্টের সমবায়। আর, এই cultureই হচ্ছে মানবসভ্যতার প্রাণ।

কাব্যে রবীন্দ্রনাথের দান অপূর্ব। তাঁর ভাষার ঐশ্বর্য অতুলনীয়। তিনি বাঙালী জাতের মুখে ভাষা দিয়েছেন। আর, আর্টের চর্চা কাব্যেরও কান্তি পুষ্ট করে। শান্তিনিকেতনের মুক্তির বাণী যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছেন তাঁদের লেখায় যে রবীন্দ্রনাথের spirit অল্পবিস্তর প্রতিফলিত হবে, এ আশা আমি করি।

কোন্ কাগজ কি রকম দাঁড়াবে তা আগে থেকে বলা যায় না। বিশেষতঃ আজকের দিনে, যখন সকলেরই ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। আমাদের নবপত্রিকা যে সবুজ পত্রের নব সংস্করণ হয়ে উঠবে, তার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গেই সে সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ সবুজ পত্রের সুলেখক হয়ে উঠছিলেন, যথা— অতুল গুপ্ত, ধূর্জটি মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। আশা করি তাঁদের সহায়তায় আমি এবারও বঞ্চিত হব না এবং নবীন লেখকরাও আমাদের দলপুষ্টি করবেন। যদিচ দিন-কাল এমনি পড়েছে যে, সাহিত্যরচনায় লোকের তেমন প্রবৃত্তি নেই, সুযোগও নেই।

আজকের দিনে আমরা সকলেই ত্রস্ত ও ব্যস্ত। তবু, আজও আমরা সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হতে পারি নি— এই পত্রিকাই তার প্রমাণ। এ পত্রিকার নাম বিশ্বভারতী পত্রিকা। বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন হতেই উদ্ভূত। এই অশান্তির দিনে আমরা সকলেই বিশ্বশান্তির জন্য লালায়িত। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা না হলে বিশ্বculture ব্যাপ্ত হবার কোনো অবসর পাবে না। আর, এই বিশ্বcultureই বিশ্বশান্তি আনয়ন করবে।

সম্পাদকীয় নিবন্ধ, বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৯ (১৯৪২)

প্রমথ চৌধুরী -প্রসঙ্গ

সুশীল রায়

"কোনো রকমে শেষ করেছি লেখাটা। কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু কি জান, লিখতে আজকাল তেমন ফুর্তি পাই নে।"

ত্রিশ বছর আগে এই কথাটি শুনেছিলাম প্রমথ চৌধুরীর মুখে। কথাটা আজও স্পষ্ট মনে আছে। দুটি কারণে তাঁর ঐ কথা ভুলতে পারা যায় নি: প্রথমত, সত্তর-বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধের মুখে এমন স্বীকারোক্তি শুনতে পাওয়া; এবং দ্বিতীয়ত, ঐ স্বীকারোক্তির মধ্যেই সাহিত্যসৃষ্টির মৌলিক উপাদানের সন্ধান পেয়ে যাওয়া।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁর সঙ্গে নিয়মিত ভাবে কিছুকাল দেখা হবার সুযোগ ঘটেছিল। সে হচ্ছে ১৯৪০-৪১ সালের কথা। দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধ তখন চলেছে। কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউএ অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ির কাছেই তখন শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর ভ্রাতা অধ্যাপক অজিত চক্রবর্তী থাকতেন। রোজ সন্ধ্যায় অতুলচন্দ্রের গৃহে যাবার পথে কিছুক্ষণের জন্যে প্রমথ চৌধুরী সেখানে আসতেন। একটা ইজিচেয়ার ছিল তাঁর বরাদ্দে। তিনি পা এলিয়ে বসতেন। আমরা কয়েকজন অনুচ্চ মোড়ায় তাঁকে ঘিরে বসে থাকতাম— অজিতবাবু, শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) ইত্যাদি। সোনার একটি সিগারেট-কেস্ থেকে একটার পর একটা সিগারেট বের ক'রে তিনি টানতেন। সোনার ঐ কেস্‌টি চকচক করত, মনে হত তাঁর বুদ্ধির দীপ্তির মতনই যেন ওর চাকচিক্য। একের পর এক গল্প বলে যেতেন তিনি। তাঁর বার্ধক্য হেতু কথা খুবই অস্পষ্ট শোনাত, কিন্তু বক্তব্য ছিল বেশ স্পষ্ট। আমরা উন্মুখ হয়ে শুনতাম। এক-একটি গল্প এক-একটি স্ফুলিঙ্গের মতন যেন জ্বলে উঠত। বয়সে তিনি বৃদ্ধ বটে, কিন্তু মন ছিল কিরকম নবীন, গল্পগুলো তারই দৃষ্টান্ত।

তার পর লড়াই খুব জোরে বেধে উঠলে কলকাতা ছেড়ে অনেকে চলে যান। প্রমথ চৌধুরীও চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে।

এর কিছুকাল পরেই শান্তিনিকেতন থেকে বের হল বিশ্বভারতী পত্রিকা। তার প্রথম সংখ্যাটি কলকাতার স্টল থেকে সংগ্রহ করে তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করলাম। সেই উদ্বোধনী সংখ্যার সম্পাদকীয় ভূমিকা[1] কত আগ্রহের সঙ্গে পড়েছিলাম তা আজও বেশ মনে পড়ে।

তাঁর সঙ্গে অবশ্য প্রথম সাক্ষাৎ হয় এর কিছু আগে— ১৯৩৯ সালে। তার মাস-কয়েক আগে আমরা ছোট একটি মাসিক পত্রিকা বের করতে আরম্ভ করি। সেই পত্রিকার জন্য প্রমথ চৌধুরীর একটি লেখা সংগ্রহ করতেই হবে— এইরকম সংকল্প আমাদের এল। আমাদের পত্রিকাটি বস্তুতই খুবই ক্ষুদ্র ছিল, প্রমথ চৌধুরীর মতন একজন লেখকের কাছে সেই পত্রিকার জন্যে এরকম অনুরোধ নিয়ে উপস্থিত হওয়া সংগত বা শোভন কি না, সে কথা আমরা ভেবে দেখি নি। তখন আমাদের বয়স এমনই যে, সাহস ছিল যতটা বেশি, বিবেচনাবোধ ছিল সেই অনুপাতে কম।

১ এই সংখ্যার পৃ ৩১০-১১ দ্রষ্টব্য

শীতের এক সকালে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। তিনি মনোযোগ দিয়ে আবেদন শুনলেন, পত্রিকার যে সংখ্যাটি তাঁকে দেখাবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলাম, পাতা উল্টে-উল্টে সেটি দেখলেন। তার পর জানালেন যে, লেখা তিনি দেবেন।

এটা যেমন বিস্ময়ের তেমনি আনন্দের ঘটনা। আনন্দ আর বিস্ময় একাকার হয়ে গিয়ে মনের অবস্থা সেদিন কি রকম হয়েছিল, আজ তা তেমন মনে নেই। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে যখন তাঁর কাছ থেকে লেখাটা আনতে যাই সেদিনের সেই শীতের বিকেল বেলাটার কথা খুব মনে আছে।

লেখা জিনিসটা যে স্বতঃস্ফূর্ত, কৃত্রিম ফোয়ারার মত যে তার স্বভাব নয়, প্রাকৃতিক ঝরনার মতনই যে তার চরিত্র— সে কথাটা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলাম সেদিন।

লম্বালম্বি ভাঁজ করা ফুলস্ক্যাপ কাগজে ছোট-ছোট কাঁপা-কাঁপা অক্ষরে কপিং পেন্সিলের কালির রঙে লেখা তাঁর রচনাটি তিনি দিলেন। এবং ঐ সময়ে উক্ত মন্তব্য তিনি করলেন। এবং বললেন, "তোমাদের পত্রিকার আয়তন ছোট, লেখাটাও তাই ছোটই হল। কবিতার পত্রিকা তোমাদের, তাই কাব্যপ্রসঙ্গেই কয়েকটি কথা বলেছি। পছন্দ হলে ছেপো।"

এ রকম ঘটনা এখন অনেকটা বিরল হয়ে এসেছে। এ রকম কথাও এখন তেমন যেন শোনা যায় না। নির্দিষ্ট দিনে গিয়েই এমন লেখা পাওয়া এবং পছন্দের ভার অন্যের উপর এভাবে দিয়ে দেওয়া।

লেখাটা আমরা ছেপেছিলাম। লেখাটা সেই ছোট পত্রিকাতেই[২] এখন পর্যন্ত আটক হয়ে আছে।

বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রথম-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী। সেই পত্রিকার পঁচিশ বছর পূর্ণ হল। এবং এই বছরই তাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তি-উৎসবের সমাপ্তি বৎসর। এই উপলক্ষে তাঁর ঐ লেখাটি এখানে উদ্ধার করে দিলে সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমরা লেখাটা এখানে তুলে দিলাম—

কাব্যে অলংকার

কাব্যবস্তু যে কি, তা নিয়ে আজকাল আমাদের মধ্যে একটা মহা তর্ক উঠেছে। কাব্য লৌকিক কি অলৌকিক, স্বতন্ত্র কি পরতন্ত্র, ভাবপ্রাণ কি ভাষাপ্রাণ, বাস্তবিক কি কাল্পনিক, শ্রেয় কি প্রেয়— এইসব ইচ্ছে আমাদের তর্কের বিষয়। এসব তর্ক আমাদের পূর্বপুরুষেরাও তুলেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এই যে তাঁরা নানা মতের বিচার ক'রে কাব্য সম্বন্ধে একটি শাস্ত্র গড়েছিলেন— তার নাম অলঙ্কারশাস্ত্র; আমরা বিনাবিচারে প্রত্যেকেই এক-একটি শাস্ত্র গড়ছি— যার নাম অহঙ্কারশাস্ত্র।

ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় অলঙ্কারের নামে ভয় পান। তাঁদের বিশ্বাস— অলঙ্কার মদমত্ত প্রতিভার পায়ের শৃঙ্খল। আলঙ্কারিকেরা যে শৃঙ্খলার পক্ষপাতী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে তাঁরা যাকে শৃঙ্খলা বলেন— তা কাব্যের গতির বাধা নয়, সহায়। তাঁদের মতে 'বর্ণবিচ্ছেদ চলনং শৃঙ্খলা'— অর্থাৎ এ উপায়ে বর্ণের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তার চাল মুক্ত করা যায়।

অনেকের আবার বিশ্বাস— অলঙ্কারের অর্থ আমরা যাকে বলি গহনা। সরস্বতীর গা

২ কবিতার মাসিক পত্র 'জীবাণু', দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৫ (১৯৩৯)

সাজিয়ে দেওয়া যে সেকালের পণ্ডিতদের অনভিপ্রেত ছিল, তা নয়। অলঙ্কার তাঁদের কাছে গ্রাহ্য হলেও তা যে কাব্যের প্রাণ নয়, তা তাঁদের জানা ছিল। তাঁদের মতে—

কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মা গুণাঃ

টীকাকার এ সূত্রের ব্যাখ্যা এই করেছেন

যে খলু শব্দার্থয়োর্ধর্মাঃ কাব্যশোভাঃ কুর্বন্তি তে গুণাঃ।
ন যমকোপমাদয়ঃকৈবল্যে তেষাম্ কাব্যশোভাকরত্বাৎ।

যমক, উপমাদি যে মুখ্যতঃ কাব্যের গুণ নয়, তার কারণ 'তদতিশয় হেতবস্ত্বলঙ্কারাঃ' অর্থাৎ অলঙ্কারের সৌন্দর্য হচ্ছে কাব্যের উপরি-পাওনা। কাব্যে যদি অর্থের গৌরব না থাকে ত অলঙ্কার সে কাব্যের গায়ে মানায় না। এ বিষয়ে দুটি শ্লোক আছে—

যুবতেরিব রূপমঙ্গ কাব্যং স্বদতে শুদ্ধগুণং তদপ্যতীব।
বিহিতপ্রণয়ং নিরন্তরাভিঃ সদলংকারবিকল্পকল্পনাভিঃ॥
যদি ভবতি বচশ্চ্যুতং গুণেভ্যো বপুরিব যৌবন বন্ধ্যজঙ্গনায়াঃ।
অপি জনদয়িতানি দুর্ভগত্বং নিয়তমলংকারাণি সংশ্রয়ন্তে॥

অস্যার্থ, রূপই যুবতীর শুদ্ধগুণ। অলংকার রূপসী নারীর অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করে; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, রূপ না থাকায় যাদের যৌবন ব্যর্থ, সেইসকল নারীই নিয়ত অসংখ্য অলংকার দেহে ধারণ করেন।

'সাহিত্যের বিশ্বামিত্র' : প্রমথ চৌধুরী

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রদ্ধেয়া রাধারানী দেবী 'প্রমথ চৌধুরী' নামে যে ফরাসী সনেটটি লিখেছিলেন ১৯২৯এ, ১৯৬৮তে তার একটি চরণার্ধ পরিবর্তিত করেছেন। কারণস্বরূপ জানিয়েছেন, "১৯২৯ সালে লিখেছিলাম— 'সাহিত্যব্রাহ্মণ একা প্রমথ চৌধুরী'। সরস্বতীর অর্ঘকে চৌধুরীমশায় কখনও পণ্য করেন নি। সবুজ পত্রের মৃত্যু স্বীকার করেছেন, তবু ব্যবসায়িকতার মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখেন নি। তাঁর এই সাহিত্যিক-সাত্বিকতাকে আমি ব্রহ্মণ্যগুণ বলতে চেয়েছিলাম সেদিন। এখন মনে হয় প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে সাহিত্যিক-ক্ষাত্রগুণের দার্ঢ্য উজ্জ্বল, অকৃত্রিম। ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্রকে তাই উপমায় স্মরণ করেছি।"[১]

ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য ক্ষত্রিয়ের সাধনায় বিশ্বামিত্র-কাহিনীর এক বিচিত্র সৃষ্টি ত্রিশঙ্কু। স্রষ্টামাত্রেরই আপন স্বর্গ রচনার অধিকার স্বীকার্য। তবু স্বর্গ ও মর্ত্যের সম্বন্ধবিহীন অনির্ণেয় অনিশ্চিত জগতের অধিবাসীরূপে ত্রিশঙ্কুর দুঃসহ অবস্থাটিই আমাদের উপমালোকে ঘুরে-ফিরে দেখা দেয়। অথচ ত্রিশঙ্কু হওয়ার দুঃসাহস আমাদের ঐতিহ্যলালিত জীবনে বা সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ। আমরা হয় স্বর্গের দেবতা, নয় মর্ত্যের মানবক, কিন্তু আমাদের দ্বৈতসত্তার দ্বন্দ্বই যে আসল মানসিক অবস্থা— সেই ত্রিশঙ্কুত্ব আমরা সহজে স্বীকার করতে চাই না।

প্রমথ চৌধুরীর ব্রাহ্মণোচিত তপস্যা ও ক্ষত্রিয়োচিত সংগ্রামের কথা সত্যই 'সাহিত্যের বিশ্বামিত্র' কথাটিতে একাধারে ফুটেছে। একান্ত সার্থক এই বিশেষণ সূত্রেই আমার মনে জেগেছে 'ত্রিশঙ্কু'-কাহিনীর দোলাচল-ব্যক্তিত্ব। রবীন্দ্রচ্ছায়া থেকে মুক্তির প্রয়াসে যে মননের স্বাতন্ত্র্য প্রমথ চৌধুরীর প্রধান অবলম্বন, সেই মননের তীব্রদ্যুতি তাঁর ব্যক্তিসত্তার আবেগ-কম্পিত স্বরূপটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ভারতচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্ত দ্বিজেন্দ্রলাল বা ফরাসি-সাহিত্যের বৈদগ্ধ্য ও বুদ্ধিবাদ যেমন তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব অনুধাবনের বিভিন্ন মানদণ্ড হতে পারেন, তেমনি কালিদাস রবীন্দ্রনাথ এবং সামগ্রিকভাবে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের হৃদয়প্রধান রোমাণ্টিক-চেতনাও নানাভাবে তাঁর অন্তরবাসী সত্তার জাগরণ ঘটিয়েছে।

বার্নার্ড শ নামধেয় সনেটটিতে সমকালীন আর-এক সমানধর্মার উদ্দেশে তিনি লিখেছেন—

> মানবের দুঃখে মনে অশ্রুজলে ভাস'
> অপরে বোঝে না তাই নাটকেতে হাস'॥
> হয় মোরা মিছে খেটে হই গলদ্‌ঘর্ম,
> নয় থাকি বসে, রাখি করেতে চিবুক।
> এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম,
> হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক।[২]

১২ অক্টোবর ১৯১২তে লেখা এ সনেটের অনতিকাল পরে প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের অনন্য ভূমিকায়

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫

২ সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা : পৃ. ১১

প্রবেশ করলেন, কিন্তু হাতে চাবুকের বদলে 'সবুজ পত্র'। আর 'সবুজ পত্র' -রচনাটিতে যে সবুজের প্রেরণারহস্যের প্রকাশ দেখি তা একাধারে জীবনায়ন ও জীবন-সমালোচনা। যা গভীরে চোখের জল, তাই বাইরে হাস্যরসের নিপুণ চাতুরী। এক দিক থেকে দেখলে যুক্তিধর্মী শাণিত গদ্য, আর-এক দিক থেকে বুদ্ধির জগৎ অতিক্রমকারী কাব্যদৃষ্টির নিশ্চিত প্রকাশ। বার্নার্ড শ ও প্রমথ চৌধুরী— দুজনেই জীবন-প্রেমিক বলেই অত বড়ো জীবন-সমালোচক।

কিন্তু সাহিত্যের ভঙ্গী অনেক সময় পাঠককে তো ভোলায়ই, লেখকও ভঙ্গীকেই স্বভাবে পরিণত করে ফেলেন। 'পরিহাসবিজল্পিত' অন্তর-সত্য অনেক সময় পরিহাসের বেশি মর্যাদা পায় না, হয়তো আশাও করে না। সাহিত্যের কাছে আমরা কেবল নির্দেশ চাই না, অনুভবই সবচেয়ে বড়ো প্রার্থনীয়। হয়তো এই কারণেই বার্নার্ড শ বা প্রমথ চৌধুরীর মতো মননযোদ্ধাদের শেষ অবধি ব্যঙ্গ-মহাকাব্যের নায়কের মতো সহজ বিস্মৃতি ললাটলিখন। বলা বাহুল্য, খুব কাছের দিনের মানুষের পক্ষেই এ বিস্মৃতি সম্ভব। শ বা প্রমথ চৌধুরী— দু-জনেরই শতবর্ষ-পালনের আয়োজনে এত স্বল্পতার কারণ তাঁদের ব্যক্তিত্বেই নিহিত। একদা বুদ্ধিবাদের সমুজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যে তাঁরা পাঠকদের আচ্ছন্ন করেছেন, কিন্তু যতটা প্রভাবিত করতে চেয়েছেন, ততটা আপন করতে পারেন নি। স্বল্পকালের ব্যবধানেই পাঠক তাঁদের কাছ থেকে দূর সরে গেছে। কিন্তু তাতে এই সমুজ্জ্বল মণিখণ্ড দুটির স্বমহিমা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি, কেবল যোগ্য জহুরীর আবির্ভাবের অপেক্ষামাত্র। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের যুগেই ঈশ্বরগুপ্ত বিস্মৃতপ্রায় হয়েছিলেন, অথচ এ যুগে ঈশ্বরগুপ্তের প্রতিভা আপন গুণেই আবার আধুনিক মনের সম্ভ্রম ও সমাদর আদায় করেছে।

উনিশ শতকের বাঙালী মন যেমন ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় প্রথম আধুনিকতার আভাস পেয়েছিল, তেমনি একালে তার চেয়ে অনেক গভীর অর্থে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যকৃতিতে আধুনিক মনোভঙ্গীর নবপর্যায়ের সূচনা। আমরা রবীন্দ্র-ঐতিহ্যবাহী হয়েও চিন্তার মুক্তি ও স্বচ্ছতার আদর্শে অনেকাংশে প্রমথ চৌধুরীর অনুবর্তী। শুধু ভাষা-ভঙ্গিমায় নয়, চলতিভাষার প্রাণবেগে আমাদের জড়ধর্মী অস্তিত্বের জঙ্গমতা-সাধনও যে অনেক পরিমাণে প্রমথ চৌধুরীর দান— এ কথা নবীন সমালোচকেরা যথেষ্ট ভেবে দেখেন বলে মনে হয় না। যেহেতু প্রমথ চৌধুরী 'চুট্‌কি' নামক একটি মজাদার রচনা লিখেছেন, অতএব তাঁর যাবতীয় রচনাই চুট্‌কি জাতীয় বা তাঁর হালখাতা শুধুমাত্র 'খেয়ালখাতা'— এমন মনে করার কোনো কারণই নেই। বস্তুতঃ প্রমথ চৌধুরীর অতি সমান্য রচনাই ঠিক ঠিক ব্যক্তিগত নিবন্ধ বা personal essay -জাতীয়। বলার ভঙ্গী কেমন করে বক্তব্যের গভীরতাকে আড়াল করে প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলীতে তার অনেক উদাহরণ মেলে। কিন্তু তার জন্য লেখকই কেবল দায়ী নন, অনবহিত পাঠকের ত্রুটিও উপেক্ষণীয় নয়।

বাংলা সাহিত্য -বিষয়ে গবেষণাপ্রসঙ্গে কিছুকাল আগেও প্রমথ চৌধুরী বিষয়ে গবেষণার প্রস্তাব পণ্ডিতজনের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছিল। যতদূর জানি, তার কারণ সবুজ পত্রের আমল থেকে সাধু ও চলতিভাষার কৃত্রিম কলহের জের। কিন্তু একালে আবার আর-এক ধরণের মানসিক উন্নাসিকতা দেখা দিয়েছে, যার স্থূলভ প্রচেষ্টা প্রমথ চৌধুরীকে নিতান্ত বাক্‌সর্বস্ব বিদূষকের ভূমিকায় দেখা। কিন্তু ইংরেজি বা সংস্কৃত কোনো সাহিত্যের বিদূষকই বাক্যবলে জয়ী নন, বুদ্ধিবলেই স্মরণীয়। তদুপরি প্রমথ চৌধুরীর আরাধিত বাগ্‌দেবতা যথার্থই বসন্তের প্রতীকী প্রতিমা। কারণ, তাঁর 'সবুজ পত্র' মানবমানসের চিরন্তন যৌবনের প্রতীক। গ্রীক মানবিকতার যৌবন ও ভারতীয় জীবনদর্শনের প্রজ্ঞাদৃষ্টি— এ দুয়ের এক অজ্ঞাতপূর্ব সম্মেলন

ঘটেছিল প্রমথ চৌধুরী -মানসে। বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর সমুচ্চ মর্যাদা তাই সঙ্গত কারণেই স্বীকার্য।

'চুট্‌কি'-প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী খেয়ালের পটভূমিকায় যে কথা বলেছিলেন, সে কথাটি এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে স্মরণীয়— "চুট্‌কিও আমার অতি আদরের সামগ্রী, যদি সুর খাঁটি থাকে ও ঢং ওস্তাদী হয়। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের আজকাল প্রধান অভাব গুণপনাযুক্ত ছিব্‌লেমী।"[৩] ঐ একই পটভূমিকায় খেয়ালীরচনা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য— "খেয়ালের চাল ধ্রুপদের মত সরল নয় বলে মাতালের মত আঁকাবাঁকা নয়, নর্তকীর মত বিচিত্র। খেয়াল ধ্রুপদের বন্ধন যতই ছাড়িয়ে যাক-না কেন, সুরের বন্ধন ছাড়ায় না ; তার গতি সময়ে সময়ে অতিশয় দ্রুতলঘু হলেও ছন্দঃপতন হয় না। গানও যে নিয়মাধীন, লেখাও সেই নিয়মাধীন। যাঁর মন সিধে পথ ভিন্ন চলতে জানে না, যাঁর কল্পনা আপনা হতেই খেলে না, যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে পারেন না, অথবা ছেড়ে দিলে আর নিজ বশে রাখতে পারেন না— তাঁর খেয়াল লেখার চেষ্টা না করাই ভালো।"[৩]

কিন্তু স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী ঠিক এ ধরণের খেয়ালী রচনা খুব কমই লিখেছেন। 'বর্ষার কথা' 'ফাল্গুন' অথবা 'সবুজ পত্র' 'আমরা ও তোমরা' -জাতীয় রচনাসৃষ্টির অজস্র অধিকার থাকলেও তিনি তা সংবরণ করেছেন আরো সংহত মননধর্মী প্রবন্ধসাহিত্যের প্রয়োজনে। প্রবন্ধসাহিত্যেও খেয়ালী রচনার স্বাদ ও সৌরভ সঞ্চারের দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর ছিল। 'গুণপনাযুক্ত ছিব্‌লেমি' তাঁর প্রবন্ধসংগ্রহকে ভারমুক্ত প্রসন্নতায় পাঠকহৃদয়ে ও বুদ্ধির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে স্থাপন করেছে। তবু তুলাদণ্ডের বিচারে ওই লঘু পরিহাসের সুর তাঁর সৃষ্টির একটি দিক— একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যবিচারে তিনি যখন হাস্যরসের প্রাধান্যের কথা বলেন, তার দ্বারাই তাঁর কৃষ্ণনাগরিক সত্তার অন্যতম প্রবণতার পরিচয় মেলে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মূলমন্ত্র 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা'— হাস্যরসে সেই প্রাণের সুস্থ প্রকাশভঙ্গিমার পরিচয়।

উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রথম ফসল বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গে 'সবুজ পত্রের মুখপত্র' প্রবন্ধটিতে প্রমথ চৌধুরী নবীন য়ুরোপ ও প্রাচীন ভারতের মিলিত প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন— "সুন্দরের আগমনে হীরা মালিনীর ভাঙা মালঞ্চে যেমন ফুল ফুটে উঠেছিল, ইউরোপের আগমনে আমাদের দেশে তেমনি সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠেছে।· · ইউরোপের কাছে আমরা একটি অপূর্ব জ্ঞান লাভ করেছি। সে হচ্ছে এই যে, ভাবের বীজ যে দেশ থেকেই আনো-না কেন, দেশের মাটিতে তার চাষ করতে হবে। চীনের টবে তোলামাটিতে সে বীজ বপন করা পণ্ডশ্রম মাত্র। আমাদের এই নবশিক্ষাই ভারতবর্ষের · ·অতিবিস্তৃত অতীতের মধ্যে আমাদের এই নবভাবের চর্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র চিনে নিতে শিখিয়েছে।· · ইউরোপের নবীন সাহিত্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের আকারগত মিল না থাকলেও অন্তরের মিল আছে। সে হচ্ছে প্রাণের মিল— উভয়ই প্রাণবন্ত।"[৪]

এই প্রাণের আহ্বানই কবিতা হয়ে উঠেছে 'সবুজ পত্র'-রচনায়— "আমরা· ·দেশী কি বিলেতি পাথরে-গড়া সরস্বতীর মূর্তির পরিবর্তে বাংলার কাব্যমন্দিরে দেশের মাটির ঘটস্থাপনা করে তার মধ্যে সবুজ পত্রের

---

৩ খেয়ালখাতা : এই প্রবন্ধ এবং এই নিবন্ধে উল্লিখিত অন্যান্য প্রবন্ধ প্রমথ চৌধুরীর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে দুই খণ্ডের একত্র মুদ্রণ 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' (১৯৬৮) দ্রষ্টব্য।

৪ সবুজ পত্রের মুখপত্র

প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু এ মন্দিরের কোনো গর্ভমন্দির থাকবে না, কারণ সবুজের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য আলো চাই আর বাতাস চাই। অন্ধকারে সবুজ ভয়ে নীল হয়ে যায়। বন্ধ ঘরে সবুজ দুঃখে পাণ্ডু হয়ে যায়। আমাদের নবমন্দিরের চার দিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রকাশ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, এ মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাকবে। উষার গোলাপি, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীল-লোহিত, বিরোধালংকারস্বরূপে সবুজ পত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে তার মরকতদ্যুতি কখনো উজ্জ্বল কখনো কোমল করে তুলবে। সে মন্দিরে স্থান হবে না কেবল শুষ্ক পত্রের।"[৫]

ভাষান্তরে এই আহ্বানই রবীন্দ্রকাব্যে ধ্বনিত, যখন শুনি—

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি। —'সবুজের অভিযান', বলাকা

রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'র যুগ থেকে ঘুরে-ফিরে যে যৌবনের মন্ত্রোচ্চারণে আগ্রহী তার অনেকখানি প্রেরণা ও সিদ্ধির উদাহরণ কি প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলীতেই মেলে নি? এই কারণেই মনে হয়, প্রমথ চৌধুরীর গদ্যে ও পদ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেরই আর-একটি সত্তার উপস্থিতি দেখতে পেতেন, যা তাঁর পক্ষে পুরোপুরি হওয়া সম্ভব নয়, অথচ যা তাঁর অন্তরের অগোচরে আকাঙ্ক্ষিত।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার আদর্শবাদের দিকটিকে রবীন্দ্রনাথ বড়ো করে দেখেছেন, প্রমথ চৌধুরী দেখেছেন তার পূর্ণবিকশিত যৌবনসুষমা। গ্রীক যৌবনের সঙ্গে ভারতীয় যৌবনের মিলনের ফলেই একালে আমাদের নবসভ্যতার সূচনা— এই মূল সত্যটি তাঁর মনের চোখে ধরা পড়েছিল বলেই তাঁর প্রবন্ধ গল্প কবিতা সর্বত্র অসামান্য সৌন্দর্যচেতনা ও অসাধারণ ধীশক্তির এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটেছে। কবিতায় হয়তো তিনি rhymeএর সঙ্গে কিঞ্চিৎ reason মিশিয়ে থাকেন, কিন্তু সেই কারণেই তাঁর কবিতা মাত্রেই গদ্যের ছদ্মবেশ নয়। আবার, যে আদালতের সওয়াল-জবাবে তাঁর সাফল্য ঘটে নি, গদ্যভঙ্গিমায় নিজের সঙ্গে নিজেই সেই সওয়াল-জবাবের অখণ্ড প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ক্ষণে ক্ষণেই তাঁর অন্তরবাসী সৌন্দর্যমুগ্ধ সত্তাটির বিদ্যুৎ আমাদের মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করতে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ 'সনেট পঞ্চাশতে'র সেইসব কবিতারই একটি স্মরণ করা যাক, যে কবিতা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সরস্বতীর বীণায়· · ইস্পাতের তার'—

প্রতিমা

প্রতিমা গড়েছি আমি প্রাণপণ করে।
আঁধারে আবৃত কত খুঁজে গুপ্ত খনি,
এনেছি তারার মত জ্যোতির্ময় মণি—
রত্ন দিয়ে দেবীমূর্তি গড়িবার তরে।
স্ফটিকে গড়েছি অঙ্গ নিশিদিন ধরে,
পরায়েছি শ্যামশাটি মরকতে বুনি,

৫ সবুজ পত্র

রক্তবিন্দু-পারা দুটি সুলোহিত চুনি
বিন্যস্ত করেছি আমি দেবীর অধরে ॥

প্রজ্বলিত ইন্দ্রনীলে খচিত নয়ন,
প্রান্তে লগ্ন প্রবালেতে গঠিত শ্রবণ,
মুকুতা-নির্মিত যুগ্ম ঘন-পীন-স্তন,
সুগঠিত পদ্মরাগে গঠিত চরণ।
অপূর্ব সুন্দর মূর্তি, কিন্তু অচেতন—
না পারি পূজিতে কিম্বা দিতে বিসর্জন!

এ কবিতার নির্নিমেষ সৌন্দর্যচেতনায় কবিতা ছাড়া আর কিছু নেই, অথচ এর রচনাভঙ্গীটি 'সনেট পঞ্চাশতে'র অন্যান্য কবিতার মতোই।

আবার 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ' আলোচনা-প্রসঙ্গে পুরাকালের ও একালের সাহিত্যচেতনার পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি যখন উপমার পর উপমার বিস্ময় উপস্থাপিত করেন তেমন একটি মুহূর্ত—"দর্শনের কুতবমিনারে চড়লে আমাদের মাথা ঘোরে, কাব্যের তাজমহলে রাত্রিবাস করা চলে না, কেননা অত সৌন্দর্যের বুকে ঘুমিয়ে পড়া কঠিন। ধর্মের পর্বতগুহার অভ্যন্তরে খাড়া হয়ে দাঁড়ানো যায় না, আর হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ালেই যে কোনো অমূল্য চিন্তামণি আমাদের হাতে ঠেকতে বাধ্য এ বিশ্বাসও আমাদের চলে গেছে। পুরাকালে মানুষে যা-কিছু গড়ে গেছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সমাজ হতে আলগা করা, দু-চারজনকে বহু লোক হতে বিচ্ছিন্ন করা। অপর পক্ষে নবযুগের ধর্ম হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা; কাউকেও ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে দেওয়া নয়।"[৬]

'চার-ইয়ারি কথা' থেকে প্রমথ চৌধুরীর কবিদৃষ্টির আর-একটি স্মরণীয় উদাহরণ—"সকলে যখন চুপ করলেন, সেই ফাঁকে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি মেঘ কেটে গেছে, আর চাঁদ দেখা দিয়েছে। তার আলোয় চারি দিক ভরে গেছে, আর সে আলো এতই নির্মল, এতই কোমল যে, আমার মনে হল যেন বিশ্ব তার বুক খুলে আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে তার হৃদয় কত মধুর আর করুণ। প্রকৃতির এ রূপ আমরা নিত্য দেখতে পাই নে বলেই আমাদের মনে ভয় ও ভরসা, সংশয় ও বিশ্বাস, দিন-রাত্তিরের মতো পালায়-পালায় নিত্য যায় আর আসে।"[৭]

কখনো কখনো এই সুন্দরের অনুধ্যানে জাতীয়-চেতনার পটভূমিটিও তাঁর কাছে আপন স্বরূপে প্রকাশিত। যেমন ধরুন, 'বাঙালি-পেট্রিয়টিজ্‌ম্' প্রবন্ধটিতে—

"আমার পুঁথিপড়া মন সংস্কৃত-বিলেতি হলেও তার নীচে যে মন আছে তা মূলতঃ বাঙালি। বাঙালি হিন্দুর মনের ধর্মের পরিচয় নিতে হলে বাঙালির চিরাগত ধর্মের পরিচয় নিতে হয়। তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, বাংলা ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথাও দুর্গোৎসব জাতীয়-উৎসব নয়। এ

৬ বীরবলের হালখাতা

৭ চার-ইয়ারি কথা : পৃ. ৫৯ : শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ (১৯৬৮)

বিষয়ে আমার শেষ কথা এই যে, আমাদের পারিবারিক ও সেইসঙ্গে আমাদের সামাজিক ধর্ম আমাদের মনের ঘরে যে রূপ রস গন্ধ ও তেজ সঞ্চিত রেখে গিয়েছে তার জন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। ষোড়শোপচারে এই মূর্তিপূজার প্রসাদেই বাঙালিজাতির মনের poetic এবং aesthetic অংশ গড়ে উঠেছে। কোনো ধর্মবিশ্বাস মানুষের মন থেকে চলে গেলেও তার রূপটুকু তার সৌরভটুকু কখনো মারা যায় না, হয় শুধু রূপান্তরিত ?· · রবীন্দ্রনাথ পৌত্তলিক ধর্মের আবহাওয়ায় মানুষ হন নি, অথচ তাঁর কবিতা আদ্যোপান্ত ধূপবাসিত, দীপালোকিত, পুষ্পচন্দনে সুরভিত, শঙ্খঘণ্টায় মুখরিত। এই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, যার পারিবারিক ধর্ম যাই হোক-না কেন, বাঙালির জাতীয়-পূজার প্রভাব বাঙালির সৌন্দর্যজ্ঞানকে পরিচ্ছিন্ন করেছে, বাঙালির হৃদয়বৃত্তিকে পরিপুষ্ট করেছে।"[৮]

অন্তরে একান্ত রবীন্দ্রনিষ্ঠ হয়েও প্রমথ চৌধুরী যে স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ক্বচিৎ তাঁর কোনো কোনো রচনায় সেই ভেদাভেদের রেখাটি মুছে এসেছে, বিশেষতঃ খেয়ালী রচনার অন্যমনস্কতায়। কোনো এক বর্ষার দিনে তাঁরও মনে হয়েছিল—"আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের একটি পুরনো গানের প্রথম ছত্রটি ঘুরে ফিরে ক্রমান্বয়ে আমার কানে আসছে—'এমন দিনে তারে বলা যায়', এমন দিনে যা বলা যায়, তা হয়তো রবীন্দ্রনাথও আজ পর্যন্ত বলেন নি, শেক্‌স্‌পীয়রও বলেন নি। বলেন যে নি, সে ভালোই করেছেন। কবি যা ব্যক্ত করেন তার ভিতর যদি অব্যক্তের ইঙ্গিত না থাকে, তা হলে তাঁর কবিতার ভিতর কোনো mystery থাকে না, আর যে কথার ভিতর mystery নেই, তা কবিতা নয়, পদ্য হতে পারে।"[৯]

পর পর এই সৌন্দর্যচেতনার অন্তরঙ্গ উদাহরণমালা পাঠকের সামনে তুলে ধরার কারণ প্রমথ চৌধুরীর সেই অন্তরতম সত্তাটির অন্বেষণ— যার অধিকারে তিনি এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্ররসিক। অথচ আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত থেকেই তিনি রবীন্দ্রপ্রভাবের সদর্থক গুণাবলী অনেক পরিমাণে আয়ত্ত করতে পেরেছেন। 'কল্লোল'যুগের লেখকদের সচেতন রবীন্দ্রবিরোধিতার তুলনায় প্রমথ চৌধুরীর এই গুণগ্রাহী চারিত্রস্বাতন্ত্র্যই আধুনিক মননকে বেশি প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের আবেগমন্থর অভিজাত-চেতনার সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে বাঙালীমনকে যে 'জ্ঞানমিশ্রা' অনুরাগের পথে প্রমথ চৌধুরী আহ্বান করেছিলেন তার দ্বারা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কম প্রভাবিত নন। সাধুভাষা ও চলতিভাষার মুখোমুখি সংগ্রামে এই আদর্শেরই আর-একটি দিক প্রতিফলিত।

একটু আগে বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ -প্রসঙ্গে যে গণধর্মের আদর্শ প্রমথ চৌধুরীর রচনায় ব্যক্ত, নবযুগের চলতি বাংলায় তারই স্বাভাবিক প্রকাশ। এ বিষয়ে অনেকেই টেকচাঁদ-হুতোম প্যাঁচা থেকে একলাফে প্রমথ চৌধুরীর যুগে এসে উপনীত হন। সাহিত্যের ইতিহাসে কিন্তু মাঝখানের সেতুসঙ্গতি উপেক্ষিত থাকে না। সেখানে অলক্ষ্যে চলতিভাষার ভূমিকারচনা চলেছে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের 'ডায়ারী' ও চিঠিপত্রে, আর স্বামী বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষভাবে 'কলকেতার ভাষা'কেই সাহিত্যের একমাত্র প্রকাশ-মাধ্যমরূপে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন 'উদ্বোধন' পত্রিকায়। এ বিষয়ে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারীতে লেখা স্বামীজীর বিখ্যাত পত্রটি উদ্ধৃতিযোগ্য—

---

৮ বর্ষা
৯ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড : পৃ. ৩৫-৩৬
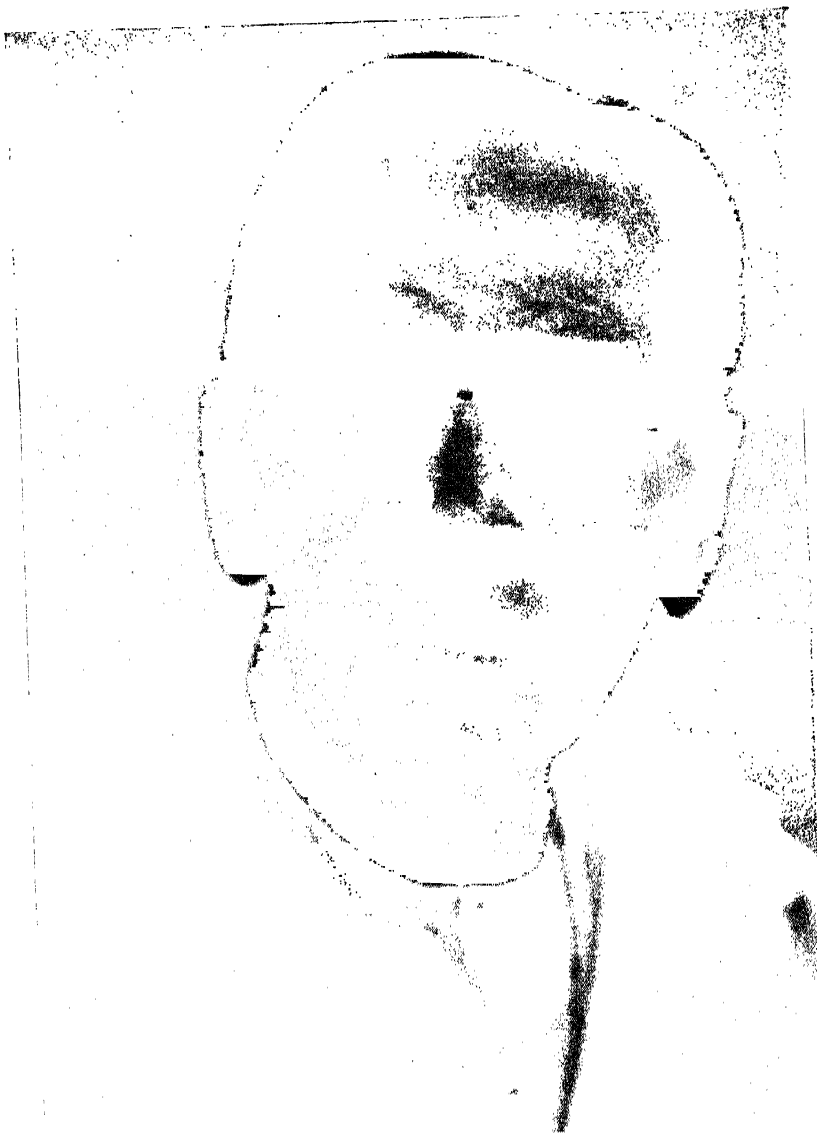
প্রমথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী

"আমাদের ভাষা—সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়—লক্ষণ।

"যদি বল ওকথা বেশ, তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারী ভাষা, কোনটি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম যে দিক হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন ভাষা লিখতে হবে··। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।"[১০]

বিবেকানন্দ এই 'কলকেতার ভাষা'তেই তাঁর 'ভাব্‌বার কথা'র বেশির ভাগ প্রবন্ধ এবং 'পরিব্রাজক' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' লিখে তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করে গেছেন। তার বারো বছর পরে (পৌষ ১৩১৯) প্রমথ চৌধুরীর চলতিভাষার সপক্ষে ঘোষণা—"আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে কলকাতার মৌখিক ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠবে··আধুনিক কলকাতার ভাষা বাঙালি জাতির ভাষা···"[১১]··বলা বাহুল্য, এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম কৃতিত্ব স্বামী বিবেকানন্দের, প্রমথ চৌধুরীর নয়। কিন্তু চলতিভাষার যে আদর্শ বিবেকানন্দের মনে ছিল—"ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত", প্রমথ চৌধুরীর ভাষা সে আদর্শের নিকটতম।

কিন্তু সাধু ও চলতি -ভাষার মাধ্যমের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের মনেও কিছু সংশয় ছিল। 'ভাববার কথা'র 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' 'বর্তমান সমস্যা' বা ভারত-ইতিহাসের মূলসূত্র, 'বর্তমান ভারত' পুস্তিকাটির ভাষা একান্ত সংস্কৃত সমাসবদ্ধ রীতির অনুসরণ। প্রমথ চৌধুরীর রচনায় প্রথম যুগের সামান্য কিছু উদাহরণ ছাড়া আর সর্বত্র চলতিভাষার নিরঙ্কুশ ব্যবহার। তবু মনে হয়, সাধু গদ্যের একটি নিজস্ব মানদণ্ড এমনভাবে আমাদের মনোভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার প্রভাবমুক্ত হওয়া সহজ নয়, সর্বত্র কাম্যও নয়।

কিন্তু বিবেকানন্দের সংস্কৃতনির্ভর গদ্যরীতি শেষ অবধি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত, নবযুগের সাহিত্যভাষার রাজপথ চলতিভাষায় নির্মিত— আর সে রাজপথ-নির্মাণে এগিয়ে এসেছিলেন বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর মতো শ্রেষ্ঠ প্রতিভাত্রয়ী এ কথা সগৌরবে স্মরণীয়।

প্রতিভার সাধর্ম্যসন্ধানে আরো-একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে জাগে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে অন্যতম একটি প্রধান সূত্র ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক বিচার ও পারস্পরিক প্রভাবের সার্থকতা আলোচনা। প্রাচীন ও নবীন ভারতবর্ষের এই যোগসূত্র সন্ধান আমাদের আত্মানুসন্ধানেরই আর-একটি দিক। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের কথা প্রথমেই মনে পড়বে। কিন্তু সামান্য বয়ঃকনিষ্ঠ প্রমথ চৌধুরীও স্বাভাবিকভাবেই এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামতের স্বচ্ছ ঋজুতা এ ক্ষেত্রেও সমান শ্রদ্ধার যোগ্য।

---

১০ বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা

১১ 'সনেটপঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা' : পূর্বকথা : পৃ. ১৪৫

পূর্বস্থরী বিবেকানন্দের মতে "· ·প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতি-নীতি সেই উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী হয়ে গড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতির জীবন ঐ উদ্দেশ্যটি এবং তদুপযোগী উপায়রূপ আচার ছাড়া, আর সমস্ত রীতি-নীতিই বাড়ার ভাগ।"[১২] আপন বক্তব্যের সপক্ষে স্বামীজী ফরাসী ইংরেজ ও হিন্দু— এই তিনটি জাতির তুলনা করে দেখিয়েছেন ফরাসীদের 'জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড রাজনৈতিক স্বাধীনতা,' ইংরেজের 'ব্যবসাবুদ্ধি,' হিন্দুর 'পারমার্থিক স্বাধীনতা— মুক্তি'। "অবশ্য আমাদের অন্যান্য জাতের কাছে অনেক শেখবার আছে। যে মানুষটা বলে, আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে; যে জাতটে বলে আমরা সবজান্তা, সে জাতের অবনতির দিক অতি নিকট! 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি'। তবে দেখ, জিনিসটে আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এইমাত্র।"[১২]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, সঠিক বলতে গেলে ভারতীয় ও ইংরেজ— এই দুই জীবনদৃষ্টির সম্মেলন প্রসঙ্গে উত্তরসূরী প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্যের একটি সুন্দরতম উদাহরণ তাঁর 'তরজমা' প্রবন্ধটিতে। আধুনিক ইংরেজ ও প্রাচীন হিন্দু— এই দুই জীবনধারার বিপরীত আকর্ষণে আমাদের দোলাচলবৃত্তির কথা স্মরণ করে তিনি লিখেছেন— "আমরা ইংরেজ জাতিকে কতকটা জানি, এবং আমাদের বিশ্বাস যে, প্রাচীন হিন্দু জাতিকে তার চাইতেও বেশি জানি; আমরা চিনি নে শুধু নিজেদের।· ·আমরা নিজের পথ জানি নে বলে আজও মনঃস্থির করে উঠতে পারি নি যে, পূর্ব এবং পশ্চিম এই দুটির মধ্যে কোন্ দিক অবলম্বন করলে আমরা ঠিক গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌছব। কাজেই আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার দিকে তিন পা এগিয়ে আবার ভারতবর্ষের দিকে দু পা পিছিয়ে আসি, আবার অগ্রসর হই, আবার পিছু হটি। এই কুর্নিশ করাটাই আমাদের নব সভ্যতার ধর্ম ও কর্ম।"[১৩]

অন্ধ অনুকরণের দুর্বলতা কাটিয়ে প্রমথ চৌধুরী আমাদের আহ্বান করেছেন স্বীকরণের পথে এবং সেই স্বীকরণকেই বলেছেন 'তরজমা'। "অনুকরণ ত্যাগ করে যদি আমরা এই নবসভ্যতার অনুবাদ করতে পারি, তা হলেই সে সভ্যতা নিজস্ব হয়ে উঠবে, এবং ঐ ক্রিয়ার সাহায্যেই আমরা নিজেদের প্রাণের পরিচয় পাব এবং বাঙালির বাঙালিত্ব ফুটিয়ে তুলব।"[১৩]

জাতীয়-ঐতিহ্যে এই স্বীকরণের উদাহরণস্বরূপ প্রমথ চৌধুরী উপনিষদ ও বাউল গানের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের কথা স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত করেছেন এবং তার দ্বারা আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে গোটা দেশের সাধারণ মানুষের মনোজগতের দুস্তর ব্যবধানের কথা সুস্পষ্ট করে তুলেছেন—

"আমরা ইংরেজিভাব ভাষায় তরজমা করতে পারি নে বলেই আমাদের কথা দেশের লোকে বোঝে না, বোঝে শুধু ইংরেজি-শিক্ষিত লোকে। এ দেশের জনসাধারণের নেবার ক্ষমতা কিছু কম নয়। কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তারা যে কিছু পায় না, তার একমাত্র কারণ আমাদের অন্যকে দেবার মত কিছু নেই· ·। অপরপক্ষে আমাদের পূর্বপুরুষদের দেবার মত ধন ছিল। তাই তাঁদের মনোভাব নিয়ে আজও সমগ্র জাতি ধনী হয়ে আছে। ঋষিবাক্য-সকল লোকমুখে এমনি সুন্দরভাবে তরজমা হয়ে গেছে যে, তা আর তরজমা বলে কেউ বুঝতে পারেন না। এ দেশের অশিক্ষিত লোকের রচিত বাউলের গান

১২ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ. ১৫৮-১৬৩

১৩ তরজমা

কাউকে আর উপনিষদের ভাষায় অনুবাদ করে বোঝাতে হয় না। অথচ একই মনোভাব ভাষান্তরে বাউলের গানে এবং উপনিষদে দেখা দেয়। আত্মা যেমন এক দেহ ত্যাগ করে অপর দেহ গ্রহণ করলে পূর্বদেহের স্মৃতিমাত্রও রক্ষা করে না, মনোভাবও যদি তেমনি এক ভাষার দেহ ত্যাগ করে অপর একটি ভাষার দেহ অবলম্বন করে, তা হলেই সেটি যথার্থ অনূদিত হয়।

"উপযুক্ত তরজমার গুণেই বৈদান্তিক মনোভাবসকল হিন্দুসন্তানমাত্রেরই মনে অল্পবিস্তর জড়িয়ে আছে। এ দেশে এমন লোক বোধ হয় নেই যার মনটিকে নিঙড়িয়ে নিলে অন্ততঃ এক ফোঁটা গৈরিক রং না পাওয়া যায়। আর্য সভ্যতার প্রেতাত্মা উদ্ধার করবার চেষ্টাটা একেবারেই অনর্থক, কারণ তার আত্মাটি আমাদের দেহাভ্যন্তরে সুষুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, যদি আবশ্যক হয় তো সেটিকে সহজেই জাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ঠিক কথাটি বলতে পারলে অপরের মনের দ্বার আরব্য-উপন্যাসের দস্যুদের ধনভাণ্ডারের মত আপনি খুলে যায়।"[১৪]

য়ুরোপীয় সভ্যতাকেও এমন ভাবে সর্বজনের মানসস্তরে বিস্তারের দ্বারাই সে সভ্যতা আমাদের স্বকীয় হয়ে উঠতে পারে। বিবেকানন্দের ভাষায় 'আমাদের ঢঙে ফেলে নেওয়া'। উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দী অবধি আমাদের শিক্ষা ও সাহিত্যচিন্তা কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজের এক সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থেকে গেছে। প্রমথ চৌধুরীর আকাঙ্ক্ষিত 'তরজমা'র কাজ বেশির ভাগই বাকি।

'রায়তের কথা'র লেখক প্রমথ চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' বা 'বঙ্গদেশের কৃষক' -জাতীয় রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। চলতি ভাষা, সংস্কৃতির বিস্তার বা অর্থনৈতিক অধিকার— সর্বক্ষেত্রেই প্রমথ চৌধুরী প্রচলিত নিয়মে ঘোড়ার আগে গাড়ি না জুড়ে, গাড়ির আগেই ঘোড়াকে জুড়তে চেয়েছিলেন।[১৫] তিনি সহজাত স্থির বুদ্ধিতেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন— "বাংলার উন্নতি মানে কৃষির উন্নতি।· ·আমাদের দেশে যা দেদার পতিত রয়েছে সে হচ্ছে মানবজমিন; আর আমরা যদি স্বদেশে সোনা ফলাতে চাই তা হলে আমাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য হবে এই মানবজমিনের আবাদ করা।"[১৫] এদিক থেকে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর গণচেতনার মিল লক্ষণীয়। ভারতের দরিদ্র শ্রমজীবীর উদ্দেশে বিবেকানন্দের বন্দনামন্ত্র[১৬] বা রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে' -জাতীয় কবিতা— এ সবই ভাবীকালের পূর্বাভাস— যা উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে অন্যতম প্রধান স্বর।

এক দিকে এই 'অন্নময়' সমাজ চেতনার অধিষ্ঠান, আর-এক দিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচিত্র ঐশ্বর্যসম্ভারের অন্তরতম পরিচয়ের অনুসন্ধান— এই দুই জীবনপ্রান্ত সম্বন্ধেই প্রমথ চৌধুরী সমান ভাবে সজাগ। তাই সমগ্র ভারতীয় সভ্যতার মননসূত্রটি উপলব্ধি করতে গিয়ে তিনি লেখেন—

"আমার বিশ্বাস, একটি ক্ষুদ্র দেশের এক রাজার শাসনাধীন জাতির মন একেশ্বরবাদের অনুকূল। ঐরূপ জাতির পক্ষে বিশ্বকে একটি দেশ হিসাবে এবং ভগবানকে তার অদ্বিতীয় শাসন ও পালন -কর্তা হিসেবে দেখা স্বাভাবিক এবং সহজ। অপর পক্ষে যে মহাদেশ নানা রাজ্যে বিভক্ত এবং বহু রাজা-উপরাজার

---

১৪ তরজমা

১৫ কালান্তর : রায়তের কথা : রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড

১৬ পরিব্রাজক : স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ষষ্ঠ খণ্ড : পৃ. ১০৬

শাসনাধীন, সে দেশের লোকের পক্ষে আকাশ দেশে বহু দেবতা এবং উপদেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করাও তেমনি স্বাভাবিক।··যে দেশের পূর্বপক্ষ একেশ্বরবাদী সে দেশের উত্তর পক্ষ নাস্তিক, এবং যে দেশের পূর্বপক্ষ বহুদেবতাবাদী সে দেশের উত্তরপক্ষ অদ্বৈতবাদী।···

"সোহহং হচ্ছে ইনডিভিজুয়ালিজ্‌মের চরম উক্তি। সুতরাং বেদান্তমত আমাদের মনোজগৎকে যে পরিমাণে উদার ও মুক্ত করে দিয়েছে, আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে সেই পরিমাণে বদ্ধ ও সংকীর্ণ করে ফেলেছে। বেদান্তের দর্পণে প্রাচীন যুগের সামাজিক মন প্রতিফলিত হয় নি, প্রতিহত হয়েছে। বেদান্ত-দর্শন সামাজিক জীবনের প্রকাশ নয়, প্রতিবাদ। অদ্বৈতবাদ হচ্ছে সংকীর্ণ কর্মের বিরুদ্ধে উদার মনের প্রতিবাদ, সীমার বিরুদ্ধে অসীমের প্রতিবাদ। বিষয়জ্ঞানের বিরুদ্ধে আত্মজ্ঞানের প্রতিবাদ। এককথায় জড়ের বিরুদ্ধে আত্মার প্রতিবাদ। সমাজের দিক থেকে দেখলে জীবের এই স্বরাটজ্ঞান শুধু বিরাট অহংকার মাত্র।···

"কেন যে পুরাকালে অদ্বৈতবাদীরা কৌপীন-কমণ্ডলু ধারণ করে বনে যেতেন, তার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি না করতে পারায় এ কালের অদ্বৈতবাদীরা চোগাচাপকান পরে অফিসে যান। উভয়ের মতের মিল এইটুকু যে, একজন হচ্ছেন উদাসী আর একজন শুধু উদাসীন— পরের সম্বন্ধে।"[১৭]

জাতির ইতিহাস থেকে জাতীয় দর্শন -বিশ্লেষণের এই প্রয়াসের সব কথাই যে গ্রহণীয় তা নয়। কিন্তু অদ্বৈতবাদ যে 'সীমার বিরুদ্ধে অসীমের প্রতিবাদ'— এই মূল ভাবসত্যটি প্রমথ চৌধুরী যেভাবে প্রকাশ করেছেন তার দ্বারা তাঁর কবিমানস ও অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা দুয়েরই সার্থক প্রমাণ। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর সংশয় আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজে সুপ্রচলিত চিন্তাধারারই প্রকাশ। বেদান্তজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত রাজর্ষিদের ইতিকথা মনে থাকলে ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা সম্বন্ধে এ সংশয়ের অবকাশ থাকে না। এদিক থেকে প্রাচীন বেদান্ত ও আধুনিক মানবিকতার সার্থক সমন্বয় সাধন করেছেন বিবেকানন্দ।

ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ-অনুসন্ধান -প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী বিশ্বসভ্যতার একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এই আলোচনাটির বস্তুগত তথ্য বাদ দিয়ে কল্পনাগত সত্যটি তাঁর কবিদৃষ্টির আর-এক আশ্চর্য উদাহরণ—

"··যে-ক'টি প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, সে সবগুলিই, আমার মনে হয়, একজাতীয়, অর্থাৎ আমার কাছে তার প্রতিটি হচ্ছে এক-একখানি কাব্য। কাব্যে-কাব্যে যে প্রভেদ থাকে এদের পরস্পরের ভিতর সেই প্রভেদ মাত্র আছে। আমার মতে গ্রীক সভ্যতা হচ্ছে নাটক, রোমান সভ্যতা মহাকাব্য, ইহুদি সভ্যতা লিরিক এবং অর্বাচীন যুগের ইতালীয় সভ্যতা সনেট, আর ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা হচ্ছে রূপকথা।··

"সত্য কথা এই যে, সভ্যতা হচ্ছে একটা আর্ট এবং সম্ভবতঃ সব-চাইতে বড় আর্ট। কেননা এ হচ্ছে জীবনকে স্বরূপ করে তোলবার আর্ট, আর বাদ-বাকি যত কিছু শিল্পকলা আছে, সে সবই এই মহা আর্ট হতে উদ্ভূত এবং তার কর্তৃকই পরিপুষ্ট।"[১৮]

---

১৭ ভারতবর্ষের ঐক্য

১৮ ভারতবর্ষ সভ্য কি না

ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতাকে প্রমথ চৌধুরী রূপকথা বলেছেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ আমাদের অতীতের সাক্ষী ইতিহাস নয়, পুরাণ। আর এ কথাও সত্য— "· ·ভারতবাসী আর্যদের কৃতিত্ব সাম্রাজ্যগঠনে নয়, সমাজগঠনে; এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় শিল্পে-বাণিজ্যে নয়, চিন্তার রাজ্যে।"[১৭] আজকের ভারতের, বিশেষতঃ স্বাধীনতার বাইশ বছর পরের ভারতবর্ষের, সমস্যা এই চিন্তা ও কর্মকুশলতার সংযোগ, ব্রাহ্মণ্য আদর্শবাদের সঙ্গে শূদ্র কর্মশক্তির সহযোগিতা-স্থাপন। বলা বাহুল্য, অনেক পুরাতন মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকাই বর্তমানে সনাতনপন্থীদের প্রধান কর্তব্য। আর অধুনাতন বিপ্লবকামীদের প্রয়োজন ভারতীয় ইতিহাসের নিজস্ব ধারার অনুসন্ধান।

বাঙালী মানসের চিন্তার এই যুগান্তরসূচনায় প্রমথ চৌধুরীর দান তাঁর সদাজাগ্রত বর্তমান চেতনা। পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাতে বাঙালীর অতিরিক্ত অতীত বা শুধুমাত্র পরদেশ -নির্ভরতার কোনোটিকেই মার্জনা তিনি করেন নি, কোনো নিশ্চিত সামাজিক রাজনৈতিক বা আধ্যাত্মিক পন্থার প্রতি অঙ্গুলিসংকেত করেন নি, কেবল আমাদের মজ্জাগত সুপ্তিকে আলোড়িত করে সবুজের আহবান ধ্বনিত করেছেন। মননের রজোগুণ তাঁর স্বধর্ম বলেই কোনো আপ্তবাক্যে তাঁর চলিষ্ণু চেতনা জড়তাগ্রস্ত হয় নি, তাঁর সমগ্র রচনাবলীর প্রথম থেকে শেষ অবধি তিনি নিঃশঙ্ক দীপ্তিতে যুধ্যমান শাণিত তরবারির ব্যক্তিত্ব। তাঁকে ঘিরে তাই নির্দিষ্ট কোনো মতবাদের গণ্ডী টানা সম্ভব নয়, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো যা— আধুনিক মননের প্রেরণা ও প্রকাশের অক্ষয় যৌবনধর্ম— এ যুগের বাংলা সাহিত্যে তাই তাঁর দান। তাঁর সম্পাদনায়, সবুজ পত্র থেকে বিশ্বভারতী পত্রিকা অবধি বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস তাই যৌবনকে রাজটীকা দেবার ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের কলমে বাংলাদেশের হৃদয় নানাভাবে প্রমথ চৌধুরীকেও সে রাজসম্মানে ভূষিত করেছে। শতবর্ষপরের সে তারুণ্য নবযুগের তরুণদের চিন্তাকে সজীব ও কর্মকে নব নব মুক্তির পথে আহ্বান করবে— প্রমথ চৌধুরীর রচনা-পাঠে এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল।

কবি ও কাব্য : রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বাংলা দেশের এক শ্রেণীর পাঠক এবং সমালোচকের হাতে রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকাল নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে। তা হলেও বাংলা দেশকে এই কৃতিত্ব দিতে হবে যে নোবেল প্রাইজ পাবার পূর্বেই সে রবীন্দ্রনাথকে মহাকবির আসনে বসিয়েছে। কবির পঞ্চাশ বৎসর-পূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সমগ্র বঙ্গদেশের হয়ে কবিকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে। গুণগ্রাহিতার ব্যাপারে বাঙালী পরমুখাপেক্ষী, এ অপবাদ সত্য নয়।

সাহিত্যে বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজের মহিমা অনস্বীকার্য। যথার্থ গুণী ব্যক্তি যে শুধু 'স্বদেশে পূজ্যতে' নন, 'সর্বত্র পূজ্যতে'— নোবেল প্রাইজ সেটি কার্যত প্রমাণ করেছে। তা হলেও একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। সর্বত্র পূজ্যতে কথাটা কতকটা আলংকারিক, গুণী ব্যক্তির আসল পূজা স্বদেশেই হয়। স্বদেশে বেঁচে থাকাটাই আসল বাঁচা। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে শেক্সপীয়ারের বিশ্বখ্যাতি নিজগুণে যতখানি হয়েছে তার চাইতে ঢের বেশি হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গুণে। নইলে দান্তে গ্যয়টেও কবি হিসাবে শেক্সপীয়ারের তুলনায় নগণ্য নন, কিন্তু বিদেশে তাঁদের খ্যাতি মুষ্টিমেয় বিদগ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কারণ ইতালি জার্মেনির আজ সাম্রাজ্য নেই, বিদেশীকে বাধ্য হয়ে সে ভাষা শিখতে হয় না। শেক্সপীয়ারকেও শেষ পর্যন্ত আপন দেশের উপরেই নির্ভর করতে হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংকোচনের ফলে শেক্সপীয়ার-সাম্রাজ্যও সংকুচিত হয়ে আসবে। তবে এ কথাও সত্য যে ইংরেজ সমাজ চার শ বছর ধরে শেক্সপীয়ারকে যে মূল্য দিয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতে দেবে সে মূল্যই দেশে দেশে পরিব্যাপ্ত হবে। তার বিস্তার কমতে পারে কিন্তু তার বৈভব কমবে না। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এই কথাটি স্মরণ রাখার প্রায়োজন আছে। পশ্চিম মহাদেশে তাঁর খ্যাতি স্তিমিত হয়ে এসেছে, সেই কারণে শোক করবার কোনোই কারণ দেখি না। ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাংলা দেশ, তাঁকে যে মূল্য দেবে তার দ্বারাই বহির্বিশ্বে তাঁর মূল্য নির্ধারিত হবে। নোবেল প্রাইজ-ধারী বহু সাহিত্যিক আজ বিস্মৃতপ্রায়। এরূপ মনে করা অযৌক্তিক নয় যে নিজ দেশেই তাঁদের খ্যাতি রাহুগ্রস্ত এবং সেই কারণেই বিদেশেও তাঁদের স্মৃতি অস্তমিত।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা বিশ্বকবি আখ্যা দিয়েছি; কিন্তু মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে যা দিয়েছেন তা বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাঙালীর হাত দিয়েই দিয়েছেন। কাজেই তাঁর মর্যাদা বাঙালীকেই রাখতে হবে। নোবেল প্রাইজ যদি নাও পেতেন তা হলেও রবীন্দ্রনাথের মহিমা বাঙালীর কাছে কিছুমাত্র কম হত না। ভবিষ্যৎ বংশীয়দের কথা বলতে পারি নে কিন্তু এ যুগের বাঙালীমনে রসে সৌন্দর্যে তিনি যতখানি মায়া বিস্তার করেছেন, মনে যতখানি পুষ্টি দিয়েছেন— এমন আর কেউ নয়। নোবেল পুরস্কার রবীন্দ্রনাথের মহিমা বৃদ্ধি করে নি, তাঁর মহিমাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সে কৃতিত্ব নোবেল-সংস্থার। নোবেল প্রাইজের মাহাত্ম্যকে ছোট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু দেখা গিয়েছে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গপ্রিয়তা কোনো জিনিসকেই রেহাই দেয় না, নোবেল প্রাইজকেও দেয় নি। ওকে লক্ষ্য করে অনেক ব্যঙ্গোক্তি উচ্চারিত হয়েছে। যাঁরা ব্যঙ্গ করেছেন তাঁরাও নিতান্ত নির্গুণ ব্যক্তি

নন। এমন কথা কোনো কোনো গুণী সাহিত্যিকের মুখে শোনা গিয়েছে যে নোবেল প্রাইজ -প্রাপ্তি সাহিত্যিকের পক্ষে গঙ্গাপ্রাপ্তির ন্যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে কোনো সাহিত্যিক নোবেল প্রাইজের সম্মান যখন পেলেন তখন তাঁর থলি নিঃশেষিত, ক্ষমতা লুপ্ত ; অর্থাৎ এ পুরস্কার যেন পরোক্ষভাবে অবসরগ্রহণের নির্দেশ। কামু, হেমিংওয়ে প্রভৃতি তুচার জন যাঁরা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে নোবেল প্রাইজ লাভ করেছিলেন তাঁরা অল্পকাল মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। বেঁচে থাকলে আর কতটা দিতে পারতেন সেটা অনুমানসাপেক্ষ।

২

রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনায় আমরা এখন যেখানটায় পৌচেছি সেখানে এটি একটি মস্ত বড় প্রশ্ন— নোবেল প্রাইজ তাঁর প্রতিভাকে নির্বাপিত করেছে, না উদ্দীপিত করেছে। পুরস্কার লাভের পরে তিনি আর কতখানি দিলেন এবং নূতন কিছু দিলেন কিনা। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ লাভ করেছেন বাহান্ন বৎসর বয়সে। এটাকে খুব একটা বেশি বয়স বলা চলে না। নোবেল প্রাইজের পরে তিনি আটাশ বছর বেঁচে ছিলেন অর্থাৎ ষাট বৎসরের অবিরাম সাহিত্যসাধনার বলতে গেলে আদ্ধেক নোবেল পুরস্কার -প্রাপ্তির আগে, আদ্ধেক পরে। হিসেব করলে দেখা যায় নোবেল প্রাইজের পূর্বে তিনি যত গ্রন্থ রচনা করেছেন, পরে তার চাইতে বেশি ছাড়া কম করেন নি। কিছু সংখ্যক গ্রন্থ অবশ্য পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের রূপান্তর —কোনো কোনো ক্ষেত্রে গল্পের নাট্যরূপায়ণ। বলা বাহুল্য, পরিমাণটাই বড় কথা নয়। সাহিত্যের বিচার পরিমাণে নয়, উৎকর্ষে। দেখতে হবে নোবেল প্রাইজ -পরবর্তী রচনায় রবীন্দ্রনাথ কি শুধু পূর্বকৃতির পুনরাবৃত্তি করেছেন, না তাঁর সৃজনীশক্তিকে নূতন কোনো দিগন্ত আবিষ্কারে নিয়োজিত করেছেন।

গীতাঞ্জলির অসামান্য সাফল্য— অনতিকাল মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ, বৎসরকাল মধ্যে ইংলণ্ডে সতেরোটি সংস্করণের প্রকাশ, পশ্চিমী মনীষীদের অকুণ্ঠ স্তুতিবাদ যে-কোনো মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারত। অতিসাফল্যের আত্মপ্রসাদ অনায়াসে প্রতিভার মৃত্যু ঘটাতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বেলায় সে বিপত্তি ঘটে নি কারণ আত্মপ্রসাদজনিত তুষ্টি রবীন্দ্রচরিত্রে নেই। জীবনে শোক-দুঃখের আঘাত যেমন তাঁর সৃজনীশক্তিকে বিকল করতে পারে নি, অতিসাফল্যের স্বাভাবিক প্রশ্রয় এবং অগণিত মানুষের স্তুতিপ্রশস্তিও সেই শক্তিকে অবসাদগ্রস্ত করতে পারে নি। এ কথা বললে খুব অন্যায় হয় না যে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজের জাগতিক মূল্য যতখানি সাহিত্যিকমূল্য ততখানি নয় অর্থাৎ প্রাইজের দৌলতে তাঁর কবিখ্যাতি জগতে প্রচারিত হয়েছে কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার পূর্ণ ফসলের মূল্য সেখানে নেই। ১৯১৩র পরে তাঁর প্রতিভার যে বিকাশ হয়েছে য়ুরোপ তার পরিচয় সামান্যই পেয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে বিশেষ করে এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির পথকে নতুন নতুন দিকে বিস্তারিত করেছেন। যে গীতাঞ্জলি তাঁর দিগ্বিজয়ের সূচনা করেছিল, গীতাঞ্জলির যে মিস্টিক সুর পশ্চিমী মনকে মুগ্ধ করেছিল সেই মিস্টিক সুরকে তিনি সর্বসাধ্যসার বলে আঁকড়ে বসে থাকেন নি। য়ুরোপ আমেরিকা তাঁকে যেখানে পেয়েছিল সেখানেই ধরে বসে আছে। তাদের কাছে আজও তিনি গীতাঞ্জলির কবি বলেই পরিচিত। গীতাঞ্জলিকে পিছনে ফেলে তিনি যে ভিন্ন পথে ভিন্ন দিকে অগ্রসর হয়েছেন সে খবর তারা রাখে না। নোবেল প্রাইজের অব্যবহিত পরের কাব্য

বলাকায় এবং তারও পরে পূরবী মহুয়ায় গীতাঞ্জলি আর ফিরে আসে নি। গীতাঞ্জলিপর্ব অবধি তাঁর সংগীত বেশির ভাগ devotional, পরবর্তী কালের গানে মানুষ এবং প্রকৃতি যতখানি স্থান গ্রহণ করেছে দেবতা ততখানি নয়। আধ্যাত্মিকের চাইতে এ গানে ইস্‌থেটিক আবেদন বেশি। নাটকে প্রচলিত পথ ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন পথে তিনি পা দিয়েছেন। শেক্সপীরীয় নাট্যরীতি বর্জন করে এ যুগে যাঁরা বিভিন্ন দেশের নাট্যসাহিত্যে বিবর্তন আনবার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। কাব্যে গদ্যরীতির ব্যবহার নোবেল প্রাইজের পরে করেছেন। গল্পে উপন্যাসেও নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দিয়েছে। গল্পগুচ্ছে যে সরল পল্লীজীবনের ছবি ফুটে উঠেছিল এখন সে স্থান গ্রহণ করেছে শহুরে sophisticated জীবন। এ গেল সাহিত্যচর্চার দিক, চিত্রবিদ্যার চর্চা নোবেল প্রাইজের বহু পরে। সব দিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচিত্রতর এবং বহুধা প্রকাশ নোবেল প্রাইজের পরেই হয়েছে।

তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে রবীন্দ্রপ্রতিভার এই বিবর্তনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না হলেও নোবেল প্রাইজের একটি পরোক্ষ যোগ আছে। নোবেল প্রাইজের ফলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়েছে, পাশ্চাত্য মনের সঙ্গে আদানপ্রদান বেড়েছে। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে এবং য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারীতে তিনি ছিলেন দর্শকের ভূমিকায়। এখন তিনি কেবলমাত্র দর্শক নন, এখন অন্তরঙ্গ জন, সুখ-দুঃখের অংশীদার, আশা-আকাঙ্ক্ষার সমজদার। এ নতুন সম্পর্ক শুধু ইংলণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল না, গীতাঞ্জলি যেমন যেমন য়ুরোপের বিভিন্ন ভাষার অনূদিত হয়েছে আত্মীয়তা সেই ভাবে ব্যাপ্তি লাভ করেছে। পশ্চিমের সঙ্গে এই নতুন পরিচয় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে নানা দিক থেকে নতুনত্ব এনে দিয়েছে, মনকে এক নতুন পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা ভালো। নোবেল প্রাইজের ফলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছিলেন, কিন্তু সে খ্যাতির রং বদলেছে এক দশকের মধ্যে। ১৯২০র পরে অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের পরে তিনি যে য়ুরোপে রাজকীয় সম্মান লাভ করেছেন তা সাহিত্যিক হিসাবে ততখানি নয় যতখানি শান্তির দূত হিসাবে। এটা খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। মহাযুদ্ধের পরের অধ্যায় মহাপ্রস্থান। প্রচলিত বহু ধ্যানধারণার অবসান ঘটেছে, বহু প্রত্যয় প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। গীতাঞ্জলির কবিই একমাত্র casualty নয়, সমগ্র ভিক্টোরীয় যুগ এবং তারও পরবর্তী সকল সাহিত্যরথীরাই মহাপ্রস্থানের পথে একে একে ভূপাতিত হয়েছেন। যুদ্ধপরবর্তী জেনারেশনের কাছে এসব কবির কণ্ঠস্বর এক অতি দূর জগতের কণ্ঠস্বর বলে মনে হয়েছে। যুদ্ধোত্তর য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর অন্যতম চিন্তানায়ক হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর চিন্তা ভাবনাও সব সময়ে খুব যে তাদের মনঃপূত হয়েছে এমন নয়। কারণ শান্তিপর্বে রবীন্দ্রনাথ অশান্তির কথাও অনেক বলেছেন। উগ্র জাতীয়তাবাদের নিন্দা করে আমেরিকায় এবং জাপানেও কিছু বিরূপতাই অর্জন করেছিলেন। এ কথা সত্য যে পশ্চিমকে রবীন্দ্রনাথ যতখানি বুঝেছিলেন পশ্চিম দেশ রবীন্দ্রনাথকে ততখানি কোনোকালেই বুঝতে পারে নি। অবশ্য যে মানুষের চিন্তার একটা নিজস্বতা আছে সে মানুষকে ঘরেবাইরে কেউ বুঝতে পারে না। রবীন্দ্রনাথকে সে জন্যে সারা জীবনই দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে।

৩

বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোনোকালেই উদাসীন ছিলেন না। বাল্যাবধি তিনি যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন সেই শিক্ষাই তাঁকে বহির্জগৎ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিল। জীবনস্মৃতিতে গৃহপরিবেশ এবং বাল্য-

শিক্ষা সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেই তার আভাস পাওয়া যায়। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সাহিত্য দর্শন সংগীত নাট্যের -চর্চায় এবং আলোচনায় জ্যেষ্ঠরা সর্বদা মশগুল। কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ তার সবই যে গ্রহণ করতে পারতেন এমন নয়। 'সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কি না জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না, কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম; তারই আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।' এই যে পরিবেশের কথা বলা হল, এটি বাংলা দেশের নবজাগরণের ইতিহাসের অঙ্গ। রামমোহন যে বিশ্বমানবতার বাণী প্রচার করেছিলেন তার প্রথম প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে। রামমোহন-প্রচারিত জীবনাদর্শের প্রধানতম ধারক এবং বাহক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরসাধক। রামমোহনে যার সূচনা রবীন্দ্রনাথে তার সম্পূর্ণতা।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ কেবলমাত্র বহুভ্রমণ বহুদর্শন বহুশ্রুতির ফল নয়, এটি তাঁর জীবনের মুখ্য সাধনা। বিশ্বসৃষ্টির রহস্য যেমন তাঁর মনকে চিরকাল আন্দোলিত করেছে তেমনি বিশ্বমানবের রহস্য। বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে গ্রহ নক্ষত্র থেকে শুরু করে জলস্থল জীবজন্তু পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বৃক্ষলতা সমস্তর মধ্যে যেমন একই প্রাণের লীলা দেখেছেন তেমনি বিশ্বমানবের বহুবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে— নানা বর্ণ নানা ধর্ম নানা ভাষা নানা রীতিনীতির মধ্যে একই প্রাণধর্ম এবং মননক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছেন। এই কারণে দেশ জাতি এবং ইতিহাস ভূগোলের ব্যবধানকে অতিক্রম করে সর্বমানবের ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। বিশ্ববিধান এবং বিশ্ববিধাতা— দুএর সঙ্গে তাঁর মনকে তিনি মিলাতে চেয়েছেন। এ শুধু আধ্যাত্মিক চিন্তার ব্যাপারে নয়, কাব্য শিল্প -চর্চার ব্যাপারেও। 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, তোমার সাথে সেথায় যোগ আমারও'— বিশ্বের সঙ্গে যেমন নিজের মনের সুর মিলিয়েছেন তেমনি তাঁর কাব্যলক্ষ্মীকেও বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। সংগীতশিল্পী এবং চিত্রশিল্পীর একটা সুবিধা আছে, তাঁরা ভাষায় কথা বলেন— সুর এবং রেখা— সেটা কোনো বিশেষ দেশ বা জাতির ভাষা নয়, সেটা সর্ব মানবের ভাষা, অল্পবিস্তর সকলেরই বোধগম্য। সাহিত্য-শিল্পীর সে সুবিধা নেই। তাঁকে একটা বিশেষ দেশের ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতে হয়, সেটা সকলের বোধগম্য নয়। এমনকি অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হলেও যে তার রসটুকু পুরোপুরি আয়ত্তে আসবে এমন আশা করা যায় না। এ ছাড়াও আরো কথা আছে। সব শিল্পেই জীবনের প্রকাশ, কিন্তু জীবনের বিভিন্ন স্তর আছে। যেখানে উপরিস্তরে শুধু নিত্যকার জীবনের অব্যবহিত রূপটি প্রকাশ পায় সেটি এক-এক দেশে এক-এক রকম। সেখানে মানুষের গায়ে যেমন স্থানকালের ছাপ লেগে যায় তেমনি মনেও সে মানুষ বিদেশী পাঠকের কাছে অনেকাংশে অপরিচিত। অপর পক্ষে যেখানে জীবনের গভীরতর স্তর সেখানে দেশ এবং কালের রেখা অস্পষ্ট হয়ে আসে। সেখানে মানুষ বিশেষ কোনো পারিপার্শ্বিকে গড়ে উঠলেও স্থানকালের ছাপ অনেকাংশে পরিহার করে আপন স্বরূপে দেখা দেয়। গ্রীক পুরাণে বর্ণিত প্রটিয়ুস্ যেমন বহুরূপী দেবতা, মানুষ তেমনি বহুরূপী জীব। সন্ধানকারীদের ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যেই প্রটিয়ুস্ ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাতেন। তাঁর আপন স্বরূপে কদাচিৎ কেউ তাঁকে ধরতে পেরেছে। মানুষের বেলায়ও ঠিক তাই। তার প্রকৃত রূপ কেবলমাত্র মহাকবি মহাজ্ঞানীর চোখেই কদাচিৎ কখনো ধরা পড়েছে। 'সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন-অন্তরালে / তার কোনো পরিমাপ নাই দেশে-কালে'— সেই মানুষের সন্ধানই মহাকবির সন্ধান বা সাধনা।

সে সন্ধান যেমন সহজসাধ্য নয়, তার প্রকাশরীতিও সহজায়ত্ত নয়। মানুষের দুই ভাষা— একটা

কার্যনির্বাহের, আর-একটা মননক্রিয়ার। কার্যনির্বাহের জন্য যে ভাষা তার প্রয়োজন অব্যবহিত, অয়োজন সীমাবদ্ধ। মননের ভাষা অব্যবহিতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। সে স্বভাবতঃ স্বতঃস্ফূর্ত, সহৃদয় এবং সর্বত্রগামী। সে ভাষা বিশেষ কোনো সমাজ বা গোষ্ঠীর ভাষা নয়, মানুষের ভাষা। সে ভাষার ব্যাকরণ প্রাদেশিক হলেও ইডিয়াম দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে। আমি যাকে বিশ্বসাহিত্যের স্থর বলেছি তা হচ্ছে সেই জিনিস যা বিশেষ পরিবেশে জন্মলাভ করেও সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে নিজেকে অনায়াসে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। পরের হয়েও সে ঘরের হয়ে ওঠে।

ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়ে গীতাঞ্জলি যখন পশ্চিম মহাদেশে প্রচারিত হল তখন তাকে আপন জিনিস বলেই তারা গ্রহণ করেছে। Exotic বা বিদেশী বিজাতীয় জিনিসের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক কৌতূহল থাকে এটা সেই কৌতূহল নয়। তাদের মনের কথা বলা হয়েছিল বলেই তাকে গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সহজ হয়েছে। গীতাঞ্জলি এককালে যে সমাদর লাভ করেছে সাহিত্য-জগতে আর কোনো গ্রন্থের ভাগ্যে তা ঘটে নি। ইংরেজ কবি ইয়েটস্ ভূমিকা লিখে দিয়ে তার প্রচারসচিবের কাজ করেছেন, ফরাসী ভাষায় তর্জমা করেছেন আঁদ্রে জিদ্, স্প্যানিস ভাষায় কবি হিমানেথ। পরে এই তিনজনই নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। এ যুগের আর-কোনো গ্রন্থই এ সম্মানের অধিকারী নয়।

একের জিনিস কি করে অপরের জিনিস হয়ে ওঠে কাব্যজিজ্ঞাসায় এটি একটি মূল প্রশ্ন। কাব্যের স্বভাবধর্ম নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা বলেছেন কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি থেকেই কবিতার জন্ম; কিন্তু কবিতাটির যখন সৃষ্টি হল তখন সে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কবির দখলীস্বত্ব থেকে সে তখন মুক্তি পেয়েছে। তখন কবিতাটিই আছে, কবি সেখানে নেই। কারণ কবিতা কখনোই কবির সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত আত্মকথা নয়, কবিতার আবেদনটি সংবেদনশীল পাঠকমাত্রেরই সম্পত্তি। Veléry নিশ্চয় এই অর্থেই বলেছিলেন, 'I write half the poem ; the reader writes the other half.'। আবার কোনো কবিতারই আবেদন rigid নয়। কারণ কবিতার মধ্যে কবির individuality লুপ্ত হয়ে কবিতাটিরই একটি নিজস্ব individualityর সৃষ্টি হয়। সে তখন নিজের কথা নিজেই বলে, কবির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে না। কবি যে কথা দেবতাকে উদ্দেশ করে বলেছেন পাঠক সে কথা প্রেমাস্পদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত বলে অনায়াসেই গ্রহণ করতে পারেন। আবার এর উল্টোটাও হতে পারে। 'কেহ দেয় দেবতাচরণে, কেহ রাখে প্রিয়জন তরে।' তা হলেই দেখা যাচ্ছে কবিতা একান্তভাবে কবিপরায়ণা নয়, সে বহুচারিণী। সে সকলের কাছে আত্মদান করতে প্রস্তুত— 'আমি তারি যে আমারে যেমনি দেখে চিনতে পারে।'

এই যে কবির একান্ত নিজস্বতা থেকে কবিতার উত্তরণ, একেই বলা যেতে পারে কাব্যের objectivity ; অন্ততঃ objective দৃষ্টিভঙ্গির গুণেই এটি সম্ভব। রবীন্দ্রনাথকে আমরা কেবলমাত্র subjective কবি হিসাবেই জানি। কবির কাব্য যদি একান্তভাবে নিজস্ব ব্যাপার হত তাহলে তার আবেদন অপরের মনে সহজে সঞ্চারিত হত না। সাবজেক্টিভ, অব্‌জেক্টিভ কথাগুলিকে rigid অর্থে গ্রহণ করলে সকল কবির প্রতিই খানিকটা অবিচার করা হয়। খাঁটি কাব্যমাত্রই subjectivityসঞ্জাত, কিন্তু তার আবেদন objectivityর গুণসন্নিপাতে।

আত্মনিবেদনের কাব্য— তা সে প্রেমাস্পদের প্রতিই হোক আর দেবতার প্রতিই হোক— সে

আন্তরিকতায় তার চরম পরীক্ষা। গীতাঞ্জলি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। একমাত্র সেই কারণেই প্রকাশমুহূর্তেই তার আবেদন এত ক্ষিপ্রগতি এবং দূরগামী হতে পেরেছে। What comes from the heart goes straight to the heart। সে হার্ট কেবলমাত্র স্বদেশের নয়, বিদেশেরও। হৃদয়ের ভাষা সকলেই বুঝতে পারে। এই সঙ্গে আরেকটি কথাও উল্লেখযোগ্য। মানুষের গভীরতম অনুভূতি সরলতম ভাষায় প্রকাশ পায়। লক্ষ্য করবার বিষয় যে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে গীতাঞ্জলির ভাষাই সহজতম ভাষা। বাক্যালংকার বা বাক্‌চাতুর্য প্রকাশের কোনোই চেষ্টা নেই। 'আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার'— সমগ্র গীতাঞ্জলি সম্পর্কে প্রযোজ্য।

এখানে আরেকটি কথাও বলে নেওয়া প্রয়োজন। পশ্চিম দেশে একদিন গীতাঞ্জলির যে কদর হয়েছিল আজকে সে কদর নেই। কিন্তু তাই বলে যে মূল্য একদিন তাকে দেওয়া হয়েছে আজকে তা অলীক প্রতিপন্ন হয়েছে এমনও ভাববার কোনো কারণ নেই। গীতাঞ্জলি কাব্য কবির গভীরতম অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি থেকে জাত, সাময়িক ভাবে রাহুগ্রস্ত হলেও এর মূল্য কোনো কালে বিনষ্ট হবে না।

কবির জীবন থেকেই কাব্যের উৎপত্তি। কাব্যকে বলা যেতে পারে জীবন-মন্থন-ধন। গীতাঞ্জলির প্রতিটি সংগীত এর সাক্ষ্য বহন করে, সেখানেই তার মাহাত্ম্য। গীতাঞ্জলি কবির অন্তর-জীবনের ইতিহাস। ১৯০২ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে বিপর্যয়ের কথা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে[১] বলেছি তার থেকে তাঁর উত্তরণের ইতিহাসে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দৈহিক ক্ষতিপূরণের একটা শুশ্রূষা-ক্ষমতা যেমন মানুষের দেহের মধ্যেই বিদ্যমান তেমনি মানসিক ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের ক্ষমতাও মনের মধ্যেই নিহিত। কবি-দার্শনিকের মনে অনেকখানি রিজার্ভ বা সঞ্চিত শক্তি থাকে। শোক দুঃখ আঘাতকে শুধু বহন করা নয়, গ্রহণ করার মধ্যেও বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন আছে। ঐ যে বলেছিলেন, 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া'— ঐটিই সে শক্তির মূলে। আপন দুঃখকে ভুলে গিয়ে তাকে অপর সকলের দুঃখের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া সেই শক্তির উৎস। নিজস্ব অভিজ্ঞতার একান্ত নিজস্বতা ঘুচিয়ে দেওয়া, ব্যক্তিগতকে নৈর্ব্যক্তিক করে তোলা কবিমনের সহজাত ক্ষমতা। সাবজেকটিভ অবজেকটিভ প্রসঙ্গে এর উল্লেখ পূর্বেই করেছি। আপন অভিজ্ঞতাকে দূর থেকে দর্শকের দৃষ্টিতে দেখতে হয় নতুবা প্রকাশ সম্ভব হয় না। নিজ সুখদুঃখ যতক্ষণ মনকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে থাকে ততক্ষণ কবি অভিভূত, তখন তিনি প্রকাশে অক্ষম। 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া'— এটি শিল্পী-মনের একটি বিশেষ লক্ষণ। কবি-ধর্মের কথা বলতে গিয়ে টি. এস্. এলিয়ট বলেছেন— 'The more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates'।

এই প্রসঙ্গের আলোচনায় আরেকটি কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা সাধারণ মনে হলেও এর মধ্যে একটি অসাধারণ মনের পরিচয় আছে। শুধু তাই নয়, পূর্বোল্লিখিত কবিধর্মের সঙ্গেও এর একটি মিল আছে। দৈহিক যাতনাকে ভুলে থাকবার জন্যে তিনি একটি উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে কারো কারো কাছে এর উল্লেখ করেছেন। একবার গভীর রাত্রিতে সকলে যখন নিদ্রিত তখন তাঁকে বিছায় কামড়ে দিয়েছিল। যন্ত্রণায় অস্থির, কিন্তু অত রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪

কাউকে উদ্ব্যস্ত করতে চান নি। ভাবতে লাগলেন, যে অঙ্গটাতে বিছায় কামড়িয়েছে সে অঙ্গটা তাঁর নয়, যে ব্যক্তিকে কামড়িয়েছে সে ব্যক্তিটি রবীন্দ্রনাথ নয়, তৎক্ষণাৎ যেন ব্যথার উপশম হল। নিজেকে নিরাসক্ত নির্বিকার দর্শকের দৃষ্টিতে দেখার দরুণ ব্যথাবোধটাকে তিনি নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিলেন। সংসারের বৃশ্চিকজ্বালায়ও তিনি এই মানসিক প্রক্রিয়াটিরই ব্যবহার করেছেন। দৈহিক যন্ত্রণার বেলায় যতটুকু সহনশক্তি আবশ্যক অন্যবিধ যাতনায় তার চাইতে ঢের বেশি মানসিক স্থৈর্যের প্রয়োজন। স্থৈর্য ধৈর্য জিনিসটা একটা negative আত্মসমর্পণ নয়। আগে যাকে কবিমনের রিজার্ভ বা সঞ্চিত শক্তি বলেছি, এ তারই ফল। অনেকখানি সঞ্চয় ব্যয় করে ঐ স্থৈর্য লাভ করতে হয়। আবার ঐ ব্যয়ই সঞ্চয় বৃদ্ধি করে।

গীতাঞ্জলির আলোচনায় এসব কথা অবান্তর নয়। ১৯০৬-৭ সাল থেকে গীতাঞ্জলি রচনার শুরু। পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের ইতিহাস-পাঠকমাত্রেরই জানা আছে। তাঁদের পক্ষে বোঝা শক্ত নয় যে গীতাঞ্জলি এক অগ্নি-শুদ্ধ চিত্তের সৃষ্টি। এমন একান্তে, এমন নিঃশব্দে শোকতাপ বহন এবং সহনের দৃষ্টান্ত বড় একটা দেখা যায় না। ব্যক্তিগত শোক দুঃখ সম্পর্কে আলোচনা পারতপক্ষে তিনি করেন নি। চিঠিপত্রে যেখানে এ প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে একটি শাস্ত্রবাক্য কখনো উল্লেখ করেছেন—

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসিত হৃদয়েনাপরাজিতা

সুখ দুঃখ, প্রিয় অপ্রিয়— সকল-কিছুকে অপরাজিত হৃদয়ে গ্রহণ করবেন, এই শক্তি প্রার্থনা করেছেন। শোকদুঃখকে নিয়ে ঘর করেছেন, সকলকেই করতে হয়। তবে অসাধারণের বেলায় সমস্তই যেমন বেশি, দুঃখের ভাগটাও তেমনি বেশি। অসাধারণকে অসাধারণত্বের মূল্য দিতে হয়। সে মূল্য তিনি দিয়েছেন। সংসারে থাকতে গেলে ক্ষয়ক্ষতি ঘটবেই, কিন্তু 'নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়', এইটি তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা। কঠিনতম দুঃখের মধ্য দিয়ে জীবনের সঙ্গে গভীরতম পরিচয় হয়েছে। এটিকে তিনি জীবনের পরমতম লাভ বলে গণ্য করেছেন। গানে কবিতায় মন্দিরভাষণে এই পরমলভ্যটিকে তাঁর দেবতার পায়ে তিনি নিবেদন করেছেন। এই আত্মনিবেদনমূলক সংগীত রচনা (গীতাঞ্জলির পরে গীতিমাল্য গীতালিতেও ঐ একই সুর ধ্বনিত) নিঃসন্দেহে তাঁর অন্তরের ক্ষত নিরাময়ে সহায়তা করেছে।

আরেকটি সান্ত্বনাস্থল ছিল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের কাজে নিজেকে আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। সে কাজ তাঁর পীড়িত মনকে শুশ্রূষা করেছে। নিজেই আনন্দের সঙ্গে বলেছেন, শিশু মহারাজের দ্বাররক্ষকের কাজ নিয়েছি। শিশুর বিনোদনকার্যে নিজেকে নিয়োজিত করে নিজ দুঃখকে তিনি ভুলতে পেরেছিলেন। লক্ষ্য করবার বিষয় যে 'শিশু' কবিতাগ্রন্থটি এই সময়েই (১৯০৯-১০) প্রকাশিত। অধিকাংশ কবিতা আগেই রচিত হয়েছিল। বিদ্যালয়ের কথা ভেবেই তখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল।

৪

ঐ সময়কার আরেকটি ঘটনারও উল্লেখ প্রয়োজন। সেটি বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে নিজেকে ঐ আন্দোলনের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বাংলা দেশের এমন একটি

বেদনার তন্ত্রীতে আঘাত দিয়েছিল যে ব্যক্তিগত দুঃখবেদনা তার তুলনায় ছোট হয়ে গিয়েছিল। এই যে কটি বিষয়ের উল্লেখ করা গেল, এর প্রত্যেকটি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত দুঃখকে sublimate করায় সহায়তা করেছে, দুঃখের অবরোধ থেকে মনকে মুক্তি দিয়েছে।

রাজনৈতিক আন্দোলন পৃথিবীর সব দেশেই হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেটা তাণ্ডবে পরিণত হয়েছে, জনচিত্ত এমন শান্ত সুসংযত ভাবে আন্দোলিত হতে অল্পই দেখা গিয়েছে। বাংলা দেশের রাখীবন্ধন রাজনৈতিক আন্দোলনকে যে শ্রী সৌন্দর্য এবং সৌষ্ঠব দিয়েছিল এমনটি পৃথিবীর কোথাও দেখা যায়নি।

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।

সেদিনকার বঙ্গজননীর ঐ অপরূপ রূপ অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথের নিজ হাতে গড়া।

রাজনীতির গলা বড় বাজখাই, কবি ছাড়া আর কেউ তাতে সুর লাগাতে পারে না। আজকের রাজনীতি যে এত কর্কশ তার কারণ রাজনীতির আসরে এখন শুধু বক্তৃতা আছে, গান নেই। যেখানে গান নেই শুধু বক্তার সভা সেখানে প্রাণ নাহি জাগে। রাজনীতি শুধু ভাঙতেই জানে, গড়তে জানে না। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান ভাঙা দেশ জোড়া লাগিয়েছিল, পরবর্তীকালের গানহীন রাজনীতি জোড়া দেশ ভেঙে দুখানা করেছে। রাজনীতির ঢক্কানিনাদের চাইতে কবির বীণা অনেক সহজে হৃদয়কে স্পর্শ করে। একটি দেয় উত্তেজনা, অপরটি চেতনা। উত্তেজনা সহজে প্রশমিত হয় কিন্তু মন একবার জেগে উঠলে তাকে সহজে ঘুম পাড়ানো যায় না। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত— কীর্তন বাউল ভাটিয়াল রামপ্রসাদী সুরে সমস্ত বাংলা দেশের চিত্তকে শুধু বিগলিত নয়, উদ্বুদ্ধ করেছিল।

স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান শুধু সংগীতে আর সৌষ্ঠবে নয়। কবি হয়েও তিনি অত্যন্ত প্র্যাকটিকেল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা তখনই করেছিলেন। রাজনৈতিক নেতারা তাতে কর্ণপাত করেন নি। পরে সেই পরিকল্পনাকেই শ্রীনিকেতনে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। জাতীয়-শিক্ষা পরিকল্পনার খসড়াও তাঁরই রচনা। এ সময়কার সাহিত্যকর্মের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'গোরা'। বাংলা দেশের একটি যুগসন্ধিক্ষণের এমন সুসম্পূর্ণ চিত্র বাংলাসাহিত্যে আর নেই। এ ছাড়া দেশ এবং সমাজ সম্বন্ধে তাঁর সেদিনকার ভাবনা চিন্তা ঐ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে অনেকখানি প্রকাশ পেয়েছে। তখনকার দিনে আজকের মত বিরাট আকারের গ্রন্থ রচনার রেওয়াজ ছিল না। কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, গোরা গ্রন্থাকারে এখন যতখানি প্রায় ততখানি অংশ পাণ্ডুলিপি থেকে তিনি বর্জন করেছেন। অনুমান করা যেতে পারে যে আলোচনা অংশই অনেকটা বাদ পড়েছে। কথা এবং কাহিনী দুই মিলে উপন্যাস। কাহিনীর মান রাখতে গিয়ে বোধকরি কথার অংশ বাদ দিয়েছেন। মহৎ সহিত্যের বর্জিত অংশেরও একটা মাহাত্ম্য থাকে। বাংলা দেশের পাঠকসমাজ সেদিক থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তবে এনার্জি যেমন লোপ পায় না আইডিয়াও তেমনি লোপ পায় না, অন্যত্র অন্য আকারে প্রকাশ পায়। অনুমান করা যেতে পারে সেই বর্জিত অংশের অনেক কথা দেশ এবং সমাজ সম্বন্ধীয় আলোচনায় পরে প্রকাশ পেয়েছে।

স্বদেশী যুগে কবি রবীন্দ্রনাথকে দেশবাসী কর্মী রবীন্দ্রনাথ রূপে দেখেছিল। দেশপ্রেমের উন্মাদনাকে তিনি দেশসেবার উদ্দীপনায় নিয়োজিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি; সেজন্যেই

রাজনীতি থেকে ধীরে ধীরে সরে এসেছিলেন। রাজনীতি যেখানে বাক্যবাগীশ কিন্তু কর্মবিমুখ সেই রাজনীতিকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দেন নি। কাজ করতে গেলেই বাধা পেতে হয়, নিরাশ হতে হয়; হয়েছেনও। তথাপি এ কথা বলতে হবে যে জীবনের এক অতি দুঃসময়ে বাহিরের বিচিত্র কর্মযোগে অন্তরের বিয়োগব্যথা কতক পরিমাণে ভুলতে পেরেছিলেন। তবে এ কথাও সত্য যে কবিমনের সব চাইতে বড় মুক্তি সৃষ্টির কাজে। যথার্থ সান্ত্বনা তিনি আপন সাহিত্যকর্মের মধ্যেই পেয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের যে মাসে মৃত্যু হয় সে মাসেও 'গোরা'র মাসিক কিস্তিটি যথাসময়ে প্রবাসী আপিসে পৌঁছে দিয়েছেন। পূর্ব প্রবন্ধেই বলেছি যে সাহিত্যসৃষ্টির দিক থেকে তাঁর জীবনের এই অধ্যায়টিই সর্বাপেক্ষা productive period। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলে নেওয়া ভালো। কাব্যরচনার দিক থেকে গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালি পর পর প্রকাশিত; শেষোক্ত দুটি নোবেল প্রাইজের অব্যবহিত পরে। কিন্তু এর অধিকাংশ কবিতা এবং গান আগেই লেখা হয়েছে অর্থাৎ এরা অনেকাংশে গীতাঞ্জলির সমকালীন এবং সমগোত্রীয়। একেই আগে ভক্তি-রসাপ্লুত আত্মনিবেদনমূলক কাব্য আখ্যা দিয়েছি। এ জাতীয় জিনিসে তাঁর পীড়িত হৃদয় কতকাংশে সান্ত্বনা লাভ করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তথাপি এ জিনিস চলতে থাকলে তাঁর কাব্যে একঘেয়েমি এসে যাবার আশঙ্কা ছিল, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। খুব সুখের কথা যে ঠিক এখানেই তাঁর সাহিত্যজীবনে পালাবদলের সূচনা হয়েছে।

৫

রবীন্দ্রনাথের বিলাতগমন সতেরো বৎসর বয়সে, দ্বিতীয় বার ত্রিশের কোঠায় পৌঁছোবার পূর্বাহ্ণে। এর পরে বহুকাল তিনি বিদেশে যান নি, গেলেন একেবারে পঞ্চাশ পার করে। ততদিনে দেশে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, দেশের সর্বোত্তম কবি হিসাবে সম্বর্ধিত হয়েছেন। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ কি উদ্দেশ্যে বিদেশযাত্রা সেটা খুব স্পষ্ট করে কোথাও বলা হয় নি। তবে এ কথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে কয়েক বৎসর ধরে তাঁর উপর দিয়ে যে ঝড়ঝাপটা গিয়েছে তাতে দেহমন নিঃসন্দেহে ছুটির জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়তঃ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে এই প্রথম তিনি বিদেশে যাচ্ছেন। শান্তিনিকেতনে তিনি একটি অতি অভিনব শিক্ষাপ্রণালীর পরীক্ষাকার্যে নিযুক্ত; পশ্চিমদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন কি পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে স্বভাবতই তা দেখবার ঔৎসুক্য ছিল। এর প্রমাণ, প্রবাসকালে বিদেশে থেকে এখানকার শিক্ষকদের কাছে অনবরত চিঠি লিখেছেন, শিক্ষা-বিষয়ক নানাবিধ গ্রন্থাদি পাঠিয়েছেন। এ ছাড়া শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ ভূমিকা সম্বন্ধেও তখন থেকেই তিনি ভাবতে শুরু করেছেন। তাঁর বিদ্যালয়কে তিনি কখনোই ছোট করে দেখেন নি। সাহিত্যসৃষ্টির বেলায় যেমন তার বঙ্গজ রূপটিকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন তেমনি তাঁর শিক্ষাবিধির সঙ্গেও বাইরের পৃথিবীকে যুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এ ছাড়াও গভীরতর কোনো উদ্দেশ্য মনে থাকা বিচিত্র নয়; তবে এও অনুমানের কথা। তাহলেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁদের কাছে কথাটা খুব অযৌক্তিক মনে হবে না। রবীন্দ্রনাথ বরাবর মনে এই আশা পোষণ করে এসেছেন যে পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের একটি আদানপ্রদানের সম্পর্ক গড়ে উঠবে; কিন্তু নিরাশ হয়েছেন এই দেখে যে ব্যাপারটা এ যাবৎ এক-তরফাই হয়ে আসচে। আমরা হাত পেতে শুধু গ্রহণই করছি, আমাদেরও যে অনেক কিছু

দেবার আছে সে কথা আমরা ভুলেই গিয়েছি। জগদীশচন্দ্র বসু যখন বিলাতে গবেষণায় নিযুক্ত তখন তাঁকে ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখেছেন, আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রাখবার জন্যে ভিক্ষার ঝুলি হাতে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার পশ্চিমের বিজ্ঞানী মহলে সমাদৃত হলে ভারতবর্ষের গৌরব বাড়বে, এই ছিল তাঁর নিজ উৎসাহের প্রেরণা। জগদীশচন্দ্রকে এক চিঠিতে লিখেছেন, 'আমরা জগৎকে অনেক জিনিস দান করিয়াছি, কিন্তু সে কথা কাহারো মনে নাই— আর একবার আমাদিগকে গুরুর বেদীতে আরোহন করিতে হইবে, নহিলে মাথা তুলিবার আর কোনো উপায় নাই।' লক্ষ্য করবার বিষয় যে উক্ত চিঠিটি রবীন্দ্রনাথের এই বিলাতযাত্রার খুব বেশি আগে লেখা নয়। বোধকরি এসব কথা ভেবেই এবারকার বিদেশযাত্রায় একেবারে শূন্য হাতে যান নি, নিজ কবিতার কিছু তর্জমা সঙ্গে নিয়েছিলেন। এর পরবর্তী ইতিহাস সকলের জানা আছে। অবশ্য এ যাত্রা যে দিগ্বিজয়ের যাত্রা হবে এমন কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি। এই সূত্রে যে কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় সেটি হল, গীতাঞ্জলির জয়যাত্রা কেবলমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে নি। এর ফলে রবীন্দ্রনাথ যা চেয়েছিলেন— ভারতবর্ষের মান-মর্যাদা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বহুযুগ পরে জ্ঞানগরিমার মানচিত্রে আবার ভারতবর্ষের স্থান হল। বললে ভুল বলা হবে না যে গীতাঞ্জলির নোবেল প্রাইজ পরোক্ষভাবে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামেও সহায়তা করেছে। আমেরিকান পণ্ডিত উইল ডুরাণ্ট বলেছিলেন, যে দেশে এমন মানুষের জন্ম হয়েছে সে দেশকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত রাখা অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। এই জন্যে গীতাঞ্জলি শুধু আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে নয় সমগ্র দেশের ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য। পশ্চিম মহাদেশ যে এ যুগে নতুন করে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করল সেই Discovery of Indiaর মূলে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি। পশ্চিমী সাহিত্যিক মহলে আজ গীতাঞ্জলির সেই প্রতিপত্তি নেই ; কিন্তু এ কথাও নিশ্চিত যে একদিন গীতাঞ্জলির পুনরভ্যুত্থান হবে, কারণ এর মধ্যে কিছু নিত্যকালীন সম্পদ আছে।

নোবেল প্রাইজের পরে রবীন্দ্রসাহিত্যে কোনো কোনো দিকে কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, এ কথা মানতেই হবে। নোবেল প্রাইজকে রবীন্দ্রনাথ খুব শান্ত মনেই গ্রহণ করেছিলেন, সম্পদে বিপদে কোনো ব্যাপারেই তাঁকে খুব একটা বিচলিত হতে কখনো দেখা যায় নি। এক্ষেত্রেও এত বড় সম্মান লাভের পরেও— তেমন কোনো মানসিক বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায় নি। তাহলেও এ কথা স্বীকার করতে হবে যে রবীন্দ্রনাথের জীবনে এখন থেকে যে অধ্যায়ের শুরু হল তাতে নোবেল প্রাইজের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ প্রভাব যথেষ্টই পড়েছে— এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, যে খ্যাতি এতদিন ছিল দেশের সীমানায় আবদ্ধ এখন তা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হল। এটাই একটা মস্ত বড় পরিবর্তন। খ্যাতি শুধু বিড়ম্বনাই ঘটায় এমন নয়, অনেক শুভ সম্ভাবনারও সূচনা করে। খ্যাতির ব্যাপ্তি জীবনেও ব্যাপ্তি আনে। প্রতিভাবান মানুষের stature বা ব্যক্তিত্ব যত বেশি মহিমান্বিত হবে তাঁর শক্তি-সামর্থ্যও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ দেশে-বিদেশে বহু জনের বহু দাবি তাঁকে মেটাতে হয়। রবীন্দ্রনাথের বেলায় এটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছে। পৃথিবীর যেখানে যা ঘটছে সেখানেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। সংকটে সংশয়ে বিপদে বিরোধে তাঁর উপদেশ সমর্থন এবং সহায়তা প্রার্থনা করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মাত্রই সমগ্র মানবসমাজের মুখপাত্র। রবীন্দ্রনাথকে কার্যত ঐ ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল বলে সাহিত্যের যে মূল উপকরণ সহানুভূতি তাকে তিনি সমগ্র মানবসমাজে প্রসারিত করতে পেরেছিলেন। পৃথিবীর যেখানে

যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তারই ঢেউ তাঁর মনকে আন্দোলিত করেছে। 'আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি'— এটি সকল কবির মনের কথা। সাহিত্যিকের মন স্বভাবতই সহানুভূতিপ্রবণ এবং সাহিত্যের আবেদন প্রধানত সহানুভূতিজাত।

পাশ্চাত্য মনীষী সমাজের সঙ্গে প্রথম-পরিচয় গীতাঞ্জলি-পর্বেই প্রথম ঘটল। আগেই বলেছি ইতিপূর্বে দু বার তিনি বিদেশে গিয়েছেন— প্রথম বার বালকবয়সে শিক্ষালাভের জন্যে, দ্বিতীয় বার অতি স্বল্পকালের জন্যে (মাত্র সাড়ে তিন মাস) বলা যেতে পারে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। কাজেই এই প্রথম ইংলণ্ডের কবি সাহিত্যিক শিল্পী জ্ঞানীগুণীদের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে তিনি এলেন। ধরেই নেওয়া যেতে পারে এঁদের প্রভাব অল্পবিস্তর তাঁর উপর পড়েছে যেমন তাঁর প্রভাব পড়েছিল ওঁদের উপরে। দীর্ঘদিন পরে য়ুরোপের সংস্পর্শ, পশ্চিম মহাদেশে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি স্বভাবতই মনকে এক নতুন উৎসাহে সঞ্জীবিত করেছে। সে উৎসাহ তাঁর একলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, সমগ্র দেশে সঞ্চারিত হয়েছে। প্রমাণ, অনতিকাল মধ্যে সবুজ পত্রের প্রতিষ্ঠা। সবুজ পত্র প্রকৃতপক্ষে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তিতে রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দনপত্র। কারণ পুরস্কারপ্রাপ্তির কয়েক মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখ তারিখে সবুজ পত্রের প্রথম প্রকাশ। অপর পক্ষে বাংলা সাহিত্যের এই গৌরবে সাহিত্যিকদের মনে যে আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চার হয়েছিল সবুজ পত্র তারই অভিজ্ঞানপত্র। এই কারণে ঐ সময়ে সবুজ পত্রের প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রবীন্দ্র-সাহিত্যের নবায়নে সবুজ পত্রের বিশেষ একটি ভূমিকা আছে। প্রথম চৌধুরী রথী, রবীন্দ্রনাথ সারথি— সবুজ পত্রের আসরে বাংলাসাহিত্যে এক নতুন literary movementএর সূচনা হল। পশ্চিমের সঙ্গে নিবিড়তর যোগের ফলে রবীন্দ্রনাথের মনে যে বিশ্বনাগরিকতার বোধ এসেছিল তার নিঃসংশয় ছাপ পড়েছে এই পর্বের সকল রচনায়। বলাকার পক্ষ সঞ্চালনে যেমন সান্ধ্য নৈঃশব্দ ভঙ্গ হয়েছিল তেমনি হঠাৎ নতুন চেতনার সংঘাতে রবীন্দ্রসাহিত্যে এক নব রূপায়ণ দেখা দিল। কবিতার ছন্দে নতুন বৈচিত্র্য, ভাষার অলংকরণপ্রিয়তা পূর্ববৎ থাকলেও ভাষায় নতুন শক্তিমত্তার পরিচয়, গদ্যে অধিকতর দার্ঢ্য— চতুরঙ্গে তার সাক্ষ্য। চতুরঙ্গ সাধুভাষায় লেখা কিন্তু পূর্বেকার গদ্যের সঙ্গে এর পার্থক্য সুস্পষ্ট। ক্রমে সাধুভাষা ত্যাগ করে চলতি ভাষা গ্রহণ করেছেন কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে পরবর্তী কালের গদ্যে যে দৃপ্তভঙ্গি তা চতুরঙ্গের ভাষারই ক্রম পরিণতি।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত যৌবনের কবি। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে যৌবনের যে তরঙ্গবেগ মুক্তিলাভ করেছিল প্রথম যুগের কাব্যে তা অব্যাহত ভাবে চলেছে। চল্লিশের কাছাকাছি এসে ক্ষণিকা কাব্যে যৌবনের কাছে বিদায় নিচ্ছেন। কিন্তু মুখে বললে কি হবে সে বিদায়ের ভাষায় যৌবনের উচ্ছলতা উপচে পড়েছে। চল্লিশে পদার্পণ করে মন অন্য দিকে ফিরেছিল। ঐ সময়ে তাঁর জীবনে যে ঝড়ঝঞ্ঝা গিয়েছে তার উল্লেখ পূর্বেই করেছি। তাঁর ভগ্নহৃদয় ভগবৎপ্রেমের মধ্যে শান্তি খুঁজেছে। গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালি সেই সন্তপ্ত পর্বের পার্বণী।

নোবেল প্রাইজের অব্যবহিত পরে রচিত বলাকা কাব্য রবীন্দ্রজীবনে সম্পূর্ণ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। কবির যৌবন আবার নতুন করে ফিরে এসেছে। বলা বাহুল্য মন যাঁর সৃষ্টিপ্রয়াসী তাঁর মন

থেকে যৌবন কখনো লুপ্ত হয় না। যৌবন সৃজনীশক্তির প্রতীক, যেমন দেহের জীবনে তেমনি মননের। জীবন যেমন বিচিত্ররূপী, যৌবনও তেমনি। প্রথম যুগের যৌবন গতিবেগে উচ্ছল, শুধু চলার আনন্দে চলা। এ একটা নেশার মতো। প্রভাতসংগীতের নির্ঝর যে কথা বলছে বলাকার চঞ্চলাও (৮-সংখ্যক কবিতা) সেই কথাই বলছে— অবিরাম চলার কথা। কিন্তু চঞ্চলার চলা শুধু নেশার চলা নয়, এটা জীবনের দায়— জীবনের ধর্মও বলা যেতে পারে। থেমে যাওয়ার নামই মৃত্যু। 'যদি তুমি মুহূর্তের তরে / ক্লান্তিভরে / দাঁড়াও থমকি / তখনি চমকি / উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ; / পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা / স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা / সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে।' পূর্ব পর্বের উচ্ছলতা ত্যাগ করে সেই যৌবনই এখন গভীরতা লাভ করেছে। চিত্রা কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার মর্মবাণীই বলাকার শঙ্খ কবিতায় (৪-সংখ্যক) পুনরায় ধ্বনিত হয়েছে। প্রথমটিতে কাব্যবিলাস ত্যাগ করে মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবার মনস্থ করেছেন ; শেষোক্তটিতে ভক্তিযোগ থেকে নিজেকে কর্মযোগে ফিরিয়ে আনবার কথা বলেছেন। বোধকরি গীতাঞ্জলি পর্বের কথা স্মরণ করেই বলেছেন— 'চলেছিলাম পূজার ঘরে সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ'— পৃথিবী ব্যাপী কর্মযজ্ঞের মহাশঙ্খধ্বনি শুনে শান্তিস্বর্গের স্বপ্ন ত্যাগ করে কর্মের পথে পা বাড়িয়েছেন। অবশ্য গীতাঞ্জলিতেও ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনাকে নিরর্থক জ্ঞান করেছেন। তথাপি দৃষ্টি প্রধানত দেবতার প্রতিই নিবদ্ধ ছিল, সে দৃষ্টিকে এবার তিনি দেবালয় থেকে লোকালয়ে ফিরিয়ে আনলেন। এই মনোভাবটিই পূর্ণতর রূপ পেয়েছে পরে যখন বলেছেন— 'সকল মন্দিরের বাহিরে / আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল / দেবলোক থেকে / মানবলোকে' (পত্রপুট : ১৫-সংখ্যক কবিতা)। তাঁর ধর্মচিন্তায়ও এটিই শেষ কথা। লোকে যে দেবতাকে বাইরে খুঁজে বেড়ায় তাঁকে তিনি মানুষের মধ্যেই আবিষ্কার করেছেন। বলেছেন, আমার দেবতা মানুষের বাইরে নেই। একটি চিঠিতে লিখেছেন, আমার ভগবান মানুষের যা শ্রেষ্ঠ তাই নিয়ে। তিনি মানুষের স্বর্গেই বাস করেন।

কবির মনটিকে বলা চলে একটি ঘর-ছাড়া মন। মানসীর মেঘদূত কবিতায় যাকে বলেছেন, 'গৃহত্যাগী মন মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন, উড়িয়াছে দেশদেশান্তরে'। সেই মনের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষাই গৃহত্যাগী হংসবলাকার পক্ষধ্বনিতে উচ্চারিত হয়েছে। উৎসর্গ কাব্যের 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী' একই মর্মের বাণী। কিন্তু বলাকা কবিতাটিতে (৩৬-সংখ্যক কবিতা) যা বলেছেন তা শুধু উদ্‌ভ্রান্ত মনের ঘর-ছাড়া ব্যাকুলতা নয়, কেবলমাত্র অনির্দিষ্ট অজানার মোহ নয়। এটি প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম। সমস্ত বিশ্বপ্রাণের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা অনুপ্রবিষ্ট— 'মাটির আঁধার-নীচে, কে জানে ঠিকানা, / মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা / লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।'— গিরি নদী বন এমনকি আকাশের নক্ষত্রে সর্বত্র ঐ পাখার ঝটপটানি। সকলেরই মনে এক কথা 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে'— আপন বেষ্টনী থেকে মুক্তি। এসব দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যাবে যে, যে-সব ধারণা পূর্বগামী কাব্যে আভাসে প্রকাশ পেয়েছে এখনকার কাব্যে তাই পূর্ণতর অভিব্যক্তি লাভ করেছে। এই সম্পর্কে আরেকটি কথাও লক্ষ্য করবার বিষয়। সাহিত্যকে আমরা সাধারণত জীবনের প্রতিচ্ছবি বলেই জানি। জীবন বলতে আমরা বুঝি মানবজীবন। কিন্তু জীবনের চাইতেও বৃহত্তর জিনিস আছে, তার নাম প্রাণ। শুধু মানুষ নয়, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ তরুলতা নদীগিরি গ্রহনক্ষত্র— জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে প্রাণ সমস্ত বিশ্বভুবনকে ব্যাপ্ত করে আছে রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায় গানে সেই সর্বব্যাপী প্রাণশক্তির বন্দনা-

গান করেছেন। ইংরেজ কবিদের মধ্যে কোলরিজ তাঁর সাহিত্য-দর্শন সম্পর্কিত আলোচনায় ঐ প্রাণশক্তির কথা নানা ভাবে উল্লেখ করেছেন।

বলাকা সম্বন্ধে আরেকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবির মন সিস্‌মোগ্রাফ্ যন্ত্রের ন্যায় একটি অতিশয় sensitive যন্ত্র। ভূপৃষ্ঠের যেখানেই কোনো আলোড়ন ঘটে সেই মুহূর্তে সেটি উক্ত যন্ত্রে ধরা পড়ে। কবিকে যাঁরা দ্রষ্টা আখ্যা দিয়ে থাকেন তাঁরা নিশ্চয় এমন কথা বলেন না যে মহাকবিরা সব ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ। কবি—তিনি মহাকবি হলেও—ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ নন; কিন্তু এ কথা সুনিশ্চিত যে নিজ কাল সম্বন্ধে তিনি যতখানি সজ্ঞান এমন আর কেউ নয়। নিজের যুগ সম্পর্কে কবির মনকেই বলা চলে highest point of consciousness। যুগের সমস্ত রকম সম্ভাবনাকে তিনি পূর্বাহ্ণেই অনুধাবন করতে পারেন, অনাগতের নিঃশব্দ পদসঞ্চারণও তিনি দূরে থেকেই শুনতে পান। বলাকার অধিকাংশ কবিতা ১৯১৪ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে লেখা। কিছু কবিতা প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার আগেই রচিত। আশ্চর্যের বিষয় যে এর কোনো কোনো কবিতায় একটি আসন্ন দুর্যোগের আভাস আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ২-সংখ্যক কবিতাটির ('এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো') উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য নিজেই বলেছেন যে যুদ্ধের কথা ভেবে লেখেন নি। তবে এই রকম তাঁর ধারণা হয়েছিল যে একটি যুগের অবসান হতে চলেছে; দুর্যোগের মধ্য দিয়ে নতুন যুগের অরুণাভা দেখা দেবে। যুদ্ধারম্ভের পরে লেখা কোনো কোনো কবিতায় যুদ্ধের বেদনা স্পষ্টতঃ ছায়াপাত করেছে, বিশ্বের অকল্যাণ-আশঙ্কায় তিনি ব্যথিত। বহু দূরে সমুদ্রপারে অপর এক মহাদেশে যে প্রলয়কাণ্ড চলেছে সে যে কেবলমাত্র ইউরোপের ব্যাপার নয়, সকল দেশের সকল মানুষ ভুক্তভোগী তো বটেই কতকাংশে এর জন্যে দায়ীও বলতে হবে —'এ আমার এ তোমার পাপ'—সর্বমানবের ভবিষ্যৎ যে এর সঙ্গে জড়িত সেদিনকার আর কোনো কবি সেই প্রলয়ংকর ঘটনাকে ঠিক এভাবে দেখেন নি।

বলাকার কবিতায় যে প্রাণচাঞ্চল্যের প্রকাশ তার গদ্যরূপ চতুরঙ্গের কাহিনীতে। বাঙালী সমাজ এখন আর পুরোপুরি বঙ্গজ নয়। দেশী-বিদেশী নানা বিপরীতমুখী ভাবের সংঘাতে সমাজচিত্ত নিত্য আন্দোলিত। চতুরঙ্গে যে চারটি জটিল চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে তারা সেদিনকার বিক্ষুব্ধ সমাজের অশান্ত কিছু বা বিভ্রান্ত প্রতিনিধি। দামিনী স্বনামধন্যা। আমাদের নারীসমাজে সবে যে বিদ্যুৎস্ফুরণ দেখা দিয়েছে দামিনী তারই প্রতীক। সামাজিক বিপ্লব তখনই সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে যখন তা অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। তাতে সমাজে কিছু হয়তো ভাঙচুর ঘটায় কিন্তু ভেঙেচুরে যেটা থাকে সেটাই স্থিতি লাভ করে। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিল তখন 'ঘরে-বাইরে'র বিমলার মতো দু-চার জনের মতিবিভ্রম ঘটলেও নির্মলারা নির্মলাই ছিলেন। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ঐ আন্দোলনের ফলে বাংলা দেশে নারীজাগরণের পথ সুগম হয়েছিল। পরবর্তী আন্দোলন-সমূহে সে পথ প্রশস্ততর হয়েছে।

নারীসমাজের সাধারণ স্তরেও যে এক নতুন চেতনা এসেছিল যে সময়কার কিছু কিছু গল্পে তা প্রকাশ পেয়েছে। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্মরণ করা যেতে পারে যে ইতিমধ্যে ইব্‌সেন য়ুরোপীয় সমাজে এক প্রচণ্ড সোরগোলের সৃষ্টি করেছেন। নারীসমাজে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, পুরুষের সঙ্গে তাঁরা সমান অধিকার দাবি করছেন। ইংলণ্ডে মেয়েরা ভোটাধিকারের জন্যে সংগ্রাম শুরু করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন ইংলণ্ডে। ওখানকার নারীসমাজের বিক্ষোভ তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। নারীজাগরণে রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি সহজেই অনুমেয় এবং এ কথাও অনুমান করা যেতে পারে যে সমুদ্রপারে নারীজাগরণের দৃশ্য দেখে আমাদের নির্জীব নিপীড়িত নারীসমাজের কথা স্বভাবতই তাঁর মনে হয়েছে। আমাদের সমগ্র নারীসমাজটিই তখন একটি Doll's House। দেশে এসে অনেক দিনের ব্যবধানে যখন আবার গল্প লেখায় হাত দিলেন তখন নারীস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটা যে তাঁর মনকে বিশেষ করে অধিকার করে ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রকারান্তরে বলা যেতে পারে যে এ সময়টাতে ইব্‌সেন-এর প্রভাব খানিকটা তাঁর মনে ক্রিয়া করেছে। এদিক থেকে 'পলাতকা'র কবিতার সঙ্গেও এসব গল্পের একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। এখানেও অন্তঃপুরিকাদের অন্তর্বেদনার কাহিনী। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, যে ক'টি গ্রন্থের উল্লেখ করেছি— বলাকা চতুরঙ্গ ঘরে-বাইরে গল্পসপ্তক বা নবপর্যায় গল্পগুচ্ছ এবং পলাতকা সব কটিই সবুজ পত্রে প্রকাশিত। এজন্যেই সবুজ পত্রকে একটি movement আখ্যা দিয়েছি। এ movement হল সবুজের বা যৌবনের অভিযান। ক্ষণিকায় যে যৌবনের কাছে কবি বিদায় নিয়েছিলেন সে যৌবন আবার খরতর বেগে ফিরে এসেছে।

৭

এ সময়কার আরেকটি স্মরণযোগ্য ঘটনা হল প্রচলিত নাট্যরীতি ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুন রীতিতে নাটক রচনা। শেক্সপীরীয় নাট্যরীতি এবং পরবর্তীকালের naturalistic বা বাস্তবধর্মী নাটকের পথ ত্যাগ করে তিনি এক নতুন পথ আবিষ্কার করলেন। নাট্যশাস্ত্রকাররা নাটকের যে চেহারা এবং বাঁধুনি বেঁধে দিয়েছিলেন তার মধ্যে আর নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। এর শুরু হয়েছে গীতাঞ্জলি-পর্ব থেকেই, এমনকি বলা যেতে পারে তারও আগে ১৯০৮-০৯ সালে শারদোৎসব নাটকে। একে নাটক না বলে ঋতু-উৎসব বলা শ্রেয়ঃ। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে লেখা, ইচ্ছে করেই নাটকের বাঁধুনিকে বেশ একটু আল্‌গা করে দিয়েছেন। ছেলেরা শরতের উৎসবে মত্ত। উৎসবে নিয়মো নাস্তি, উৎসবান্ত নাটকেই বা থকেবে কেন? নাটকের উপকরণ যৎসামান্য কিন্তু সমস্তটা মিলিয়ে ব্যাপারটা নাটকীয়। শরৎকালে রাজারা যেতেন রাজ্যজয়ের অভিযানে, শারদোৎসবের রাজা বেরিয়েছেন মানুষের হৃদয়জয়ের অভিযানে। শারদোৎসবে যে নাট্যরীতি পরীক্ষামূলক ভাবে গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তী অধিকাংশ নাটকে— ডাকঘর অচলায়তন ফাল্গুনী প্রভৃতি নাটকে— সেই রীতিরই অনুসরণ করেছেন। প্রত্যেকটি নাটকেই খানিকটা রূপকের ছোঁয়াচ লেগেছে, তাতে নাটকের রূপ তো বদলেছেই, তার অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতি পাঠক বা দর্শকের দৃষ্টিকে একাগ্রনিবদ্ধ করেছে। গল্পে উপন্যাসে যেখানে বিস্তার, নাটকে সেখানে সংহতি। নাটককে ভাষান্তরে বলে দৃশ্য-কাব্য। দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থাপিত বলেই একে বিশেষভাবে compact বা concentrated হতে হয়। নাট্যকারের অন্যতম প্রধান গুণ একাগ্রনিবদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি, কার্লাইল যাকে বলেছেন— 'The thing he looks at reveals not this or that face of it, but its inmost heart, and generic secret'— সেই secretকে জানতে হলে মনের অনেক গ্রন্থি মোচন করতে হয়, এবং তাকে প্রকাশ করতে হলেও প্রকাশভঙ্গিকে গ্রন্থিমুক্ত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একে বলা চলে নাটকের সহজিয়া রীতি। এ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই নাট্যরীতিতে নানা বিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নাটকের নাটুকেপনা ত্যাগ। ভয়ংকরের ভ্রূকুটি দেখিয়ে কিম্বা আকস্মিকের উত্তেজনা ঘটিয়ে নাটুকেপনাকে প্রশ্রয়

দেওয়া হত। এ ছাড়া নাটক জিনিসটা স্বভাবগুণেই হোক আর স্বভাবদোষেই হোক একটু বেশি রকম বাক্যবাগীশ। সেজন্তেই ওর একটু বাক্‌সংযম অভ্যাস করা প্রয়োজন। পূর্বগামী নাট্যকারেরা এ ব্যাপারে খুব একটা সংযম দেখান নি, তাঁরা কথার ফুলঝুরি ছড়াতেন— বলা যেতে পারে কথার explosion ঘটিয়ে নাটকের নাটকীয়তা প্রমাণ করতে চাইতেন। শেক্সপীয়ারের মহিমা সম্পূর্ণ স্বীকার করেও বেন্ জনসন বলেছিলেন যে, কবি তাঁর কবিত্বশক্তিকে সব সময় বাগ মানিয়ে রাখতে পারেন নি, অস্থানে অপাত্রে কবিত্বের অনাবশ্যক ছড়াছড়ি ঘটিয়েছেন। এটা আর্টিয় পরিপন্থী। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের পরিমিতি-বোধ অত্যাশ্চর্য। তাহলেও একটি কথা স্বীকার করতে হবে যে শেষ পর্বের গল্প উপন্যাসে sense of proportionএর একটু অভাব ঘটেছে। সেখানে প্রত্যেকটি চরিত্র কথায়-বার্তায় সমান চটকদার। তারা অতিমাত্রায় বাক্যবাগীশ না হলেও একটু অস্বাভাবিক রকমে বাক্‌পটু। তবে যে সময়কার কথা বলছিলাম তখন তিনি যে নাটককে অতি-নাটকীয়তা থেকে উদ্ধার করেছিলেন, এ কথা মানতেই হবে। নাট্যকলাকে তিনি কখনোই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী রূপে দেখেন নি। নাটক সম্পর্কে নানান দেশেই তখন ভাবনা শুরু হয়েছিল। সে ইতিহাস যাঁদের জানা আছে তাঁরা জানেন যে রবীন্দ্রনাথ সে উদ্যোগের অন্যতম অগ্রদূত।

রবীন্দ্রনাট্যকল্পনার বিবর্তন

কানাই সামন্ত

রবীন্দ্রনাথ ক্ষণজন্মা পুরুষ। প্রায় তাঁর জন্মমুহূর্তেই বঙ্গবাণীর মন্দিরে নূতন দ্বার উদ্‌ঘাটন করলেন শ্রীমধুসূদন।[০] তাঁর কম্বুকণ্ঠে ধ্বনিত হল নবযুগের নূতন সুর, অতল অকূল সমুদ্রের উদাত্ত গম্ভীর আরাব, দেশ-দেশান্তর যুগ-যুগান্তর প্লাবিত করে যার বেগবান প্রবাহ অপূর্ব ছন্দে গানে নিত্য আন্দোলিত। মধুসূদনের দুঃখদ্বন্দ্বময় অচির জীবনে যার প্রথম প্রতিশ্রুতি, রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘতর জীবনে ও সাধনায় তারই পরমাশ্চর্য সফলতা।[১] সারা জীবনের একাগ্র ও অবিশ্রান্ত সারস্বত সাধনার দ্বারা একা তিনি বহু-শত বৎসরের সমৃদ্ধি দিয়ে গেছেন জাতিকে— তার প্রকার ও পরিমাণ শুধু নয়, প্রকৃতি এবং প্রক্রিয়াও বিস্ময়জনক। জন্মার্জিত প্রতিভার অব্যর্থ ধীর বিকাশে স্বভাবের শক্তি বা স্বতঃস্ফূর্তি যেমন ভিতরের কথা, আসল কথা বা প্রকৃত ঘটনা, বাহিরের দিকে তেমনি ছিল যত্ন, পরিশ্রম এবং অনুশীলন— তবেই তো অন্তরের সামগ্রী বাহিরেও অপূর্ব আকার পেয়ে রূপসৌষ্ঠবে সৌন্দর্যে ও রসমাধুর্যে ভরে উঠেছে। এভাবে দেখলে যোগী বা সাধকের থেকে কবির প্রকৃতি কিছু ভিন্ন নয় এবং সর্বাঙ্গীণ এই প্রক্রিয়াটিও অতন্দ্র অটুট এক তপস্যা। তপস্যার ফললাভে আমরা ধন্য হয়েছি নিঃসন্দেহ, কিন্তু তপস্যার মাঝখানেও তপস্বীকে চিনে নিতে চাই— তাতেও অল্প লাভ হবে না। এজন্য আমাদের দিক থেকেও যত্ন ও পরিশ্রম চাই, অনুশীলন চাই, অধ্যবসায় অপরিহার্য। একজনের কাজ নয়। অনেকের অনেক কালের চেষ্টায় ও অভিনিবেশে কবির জীবনব্যাপী সারস্বতসাধনার রহস্য, নিগূঢ় মর্ম ও বৈশিষ্ট্য, একটু হয়তো উদ্‌ঘাটিত বা উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠবে।

এ ক্ষেত্রে কিছু কাজ[২] অবশ্যই করা হয়েছে, কত যে বাকি আছে বলা যায় না। উপস্থিত সীমাবদ্ধ একটি বিষয়েই আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট, সেটির সংজ্ঞা এই হতে পারে: রবীন্দ্রনাট্যকল্পনার নানা পরিবর্তন ও বিবর্তন। কিন্তু 'নানা' বলতেই 'সব' নয়। বিশেষ কবিকল্পনা কোনো একটি নাটকে যে আকার-অবয়বে প্রাণবান্‌, শরীরী হয়ে উঠেছে, পরে কিভাবে, কেনই বা, তার রূপান্তর অথবা জন্মান্তর, তারই আলোচনা করা যেতে পারে প্রায়শ্চিত্ত পরিত্রাণ মুক্তধারা'র পারস্পরিক তুলনায়; হয়তো শাপমোচন রাজা অরূপরতনের বৈচিত্র্যধারায় অনুস্যূত ঐক্যের সন্ধানও দুরূহ হবে না; কিন্তু তার বাইরেও আলোচনার বহু বিষয় রয়েছে যে, বর্তমানে এটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

বিভিন্ন রচনায় যা-কিছু পরিবর্তন করেছেন কবি বিভিন্ন সময়ে আর বিচিত্র মনোভাব থেকে, সবই এক-জাতীয় বলা যায় না। কখনো আকারে, কখনো প্রকারে, কখনো প্রকৃতিতেই প্রভেদ ঘটেছে। কখনো কাঁচা লেখার সংস্কার করেছেন পরিণত বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা থেকে। কখনো নানারূপ যোগ বিয়োগ করে পরিবর্তন করেছেন বলা যায়। আর, কখনো বা সম্পূর্ণ জাত্যন্তর জন্মান্তর ঘটিয়েছেন কাব্য বা নাটকের সূক্ষ্মশরীরেও— এই প্রক্রিয়াকেই যথার্থ বিবর্তন বলা চলে।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতায় কিম্বা সন্ধ্যাসংগীত কাব্যেরও মুদ্রণ-পরম্পরায় সংস্কার কতদূর যেতে পারে তার পরিচয় আমরা পেয়েছি বটে, কিন্তু এজাতীয় সংস্কারের দ্বারা কবি যে কখনোই শেষ তুষ্টিলাভ

করতে পেরেছেন এমন মনে হয় না। পক্ষান্তরে চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যের প্রথম মুদ্রণ (১২৯৯) থেকে দ্বিতীয়ে (১৩০১) ও তৃতীয়ে (১৩০৩) যে পরিবর্তন তাকেও আক্ষরিক কিম্বা আভিধানিক অর্থে সংস্কারই বলতে হয় বোধ করি, পাত্রপাত্রী অথবা ঘটনার সমাবেশে যোগ বিয়োগ কিছু করা হয় নি, অথচ আদ্যন্ত রচনায় যত্রতত্র শব্দের পরিবর্তন অথবা শব্দগোষ্ঠীর বিন্যাসের পরিবর্তন আর তারই ফলে যতিপতনের পার্থক্য কেবলই পরিমাণগত এমন বলা যায় না, পঞ্জীকৃত পাঠভেদে তার যথার্থ হিসাব মেলে না— কবি ও রসিক উভয়কেই অপ্রত্যাশিতের প্রকটনে চমৎকৃত ক'রে তা গুণগত পরিবর্তনেরই রূপ নিয়েছে কখন্ কী উপায়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা সুকঠিন। এইমাত্র বলা চলে চিত্রাঙ্গদার প্রথমপ্রচারিত রূপ আর তারই রূপান্তর-দুটির মধ্যে কালের ব্যবধান যেমন দুস্তর নয়, যেভাবেই হোক কবিভাবনার মুড বা মেজাজটিও ছিল অবিচ্ছিন্ন, অবিকৃত। অর্থাৎ, যে রসপ্রেরণা থেকে ঐ নাট্যকাব্যখানি প্রথম লেখা (ভাদ্র ১২৯৮) হয়, একই সেই প্রেরণা সংস্কারকার্যেও সজাগ সক্রিয়; ফলে পরিবর্তন শুধু শব্দশরীরেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, কাব্যের প্রাণময় সূক্ষ্মশরীরেও বেজেছে, আদ্যন্ত কাব্যের ছন্দোদোলায় কী যেন নূতন বেগ, নূতন সুর, নূতন আনন্দ-উল্লাস জেগে উঠেছে। ছন্দই তো অনির্বচনীয় রসের ধারক, বাহক। তাই রসাত্মক রচনার সামগ্রিক সত্তায় কী এক সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটেছে আর অভূতপূর্ব সৌন্দর্যে মাধুর্যে সংরাগে আমাদের বিস্মিত করেছে। সতর্ক সজাগ বুদ্ধির দ্বারা নিষ্পন্ন, বুদ্ধিগ্রাহ্য, সংস্কার এ নয়; মৌলিক পরিবর্তন বা বিবর্তনই বলা চলে। চিত্রাঙ্গদার প্রাথমিক রূপটিকে পরবর্তী সার্থক রচনার অর্থাৎ আসল চিত্রাঙ্গদার খসড়াও বলা যায়— সেটি কবি-কারিগরের কারখানা-ঘরের নেপথ্যে থাকবারই কথা, দৈবাৎ সর্বসাধারণের গোচরীভূত হয়েছে, ভাবীকালের গবেষকগণ অভাবিত আবিষ্কারের ও আত্মশ্লাঘার দুর্লভ সুযোগ একটি হারিয়েছেন।

রাজা ও রানী, বিসর্জন[৩], এই নাটকগুলিতেও রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন মুদ্রণে বা সংস্করণে বহু পরিবর্তনই করেছেন, আক্ষরিক সংস্কার নয়, পাত্রপাত্রীর যোগ বিয়োগ (বিসর্জনের ক্ষেত্রে) আর অঙ্ক বিভাগ ও দৃশ্যসন্নিবেশের বিভিন্নতা, ঘটনার তারতম্য— ফলে সামগ্রিক ভাবেই পুরাতন রচনার নূতন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত।

রাজা, অরূপরতনে এই একই প্রক্রিয়ার সাক্ষাৎ পাই।

বউঠাকুরানীর হাট আর রাজর্ষির কাহিনী যথাক্রমে প্রায়শ্চিত্ত আর বিসর্জনের নাট্যরূপে বিবর্তিত (রচনার কালক্রমে বিসর্জন নাটকখানি প্রায়শ্চিত্তের অগ্রগামী) এ কথা প্রায় সকলেই জানেন। প্রায়শ্চিত্তের পরিবর্তিত রূপ— পরিত্রাণ। বিসর্জন নাটকের বিভিন্ন মুদ্রণে বহুবিধ পরিবর্তন এ তো পূর্বেই বলা হয়েছে, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত থেকে আঙ্গিকে বা প্রকরণে, রূপরসের আবেদনে আর বক্তব্যেও মুক্তধারার যে পার্থক্য তাকে পরিবর্তন বলাই যথেষ্ট নয়, বলতে হয় বিবর্তন। এই ভাবেই রাজা ও রানী নাটকেরও বিবর্তন ঘটেছে তপতীতে এ কথা উল্লেখযোগ্য। বিসর্জনের এমন কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটে নি তার একটা কারণ এই যে, এই পঞ্চাঙ্ক বিয়োগান্ত নাটক তার প্রচলরূপে 'চিরায়ত' ট্র্যাজেডির আদর্শেই যথেষ্ট রসোত্তীর্ণ সার্থক ও সন্তোষজনক হয়েছে সহৃদয় সামাজিকের দৃষ্টিতে আর কবির কাছেও।

এইসব পরিবর্তন বা বিবর্তনের ধারাবিবরণ ও পর্যাবলোকন অল্প কৌতূহলজনক নয়। কার্যকারণনির্দেশ দুরূহ সন্দেহ নেই, কেননা স্রষ্টার অন্তর্লোকে সব সময় আমাদের প্রবেশলাভ সম্ভবপর হয় না। সৃষ্টি যে

কেমন, তার উপাদান, তার গঠন, তার ক্রমবিকাশেরও ধারা, কতকটা বর্ণনা করা গেলেও, সে যে কী ও কেন প্রায়শই বলা যায় না। এ যেমন বিশ্বসৃষ্টিতে তেমনি মনোভবলোকেও অতিশয় সত্য। তাই রসোত্তীর্ণ কাব্য ও নাটকের প্রকার ও প্রকরণ নিয়ে যতই-না আলোচনা করা যাক, তার কার্যকারণনির্দেশ সংশয়াতীত বা অভ্রান্ত না হতে পারে।

অন্য আলোচনার পূর্বে, দৃষ্টান্ত হিসাবে, রবীন্দ্ররচনার অনালোকিতপ্রায় এক অধ্যায়ে দৃষ্টিপাত হয়তো অনুচিত হবে না।

১২৯৫ অগ্রহায়ণে মায়ার খেলা গীতিনাট্যের প্রথম প্রচারের বিজ্ঞপ্তিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন— 'আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকার সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারই সংশোধনস্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।'

আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি চরিত্রচিত্রণে ও ঘটনার ছকে কিম্বা রচনাকালের হিসাবেও নলিনীর সঙ্গে মায়ার খেলার যতই নৈকট্য থাক্‌, অন্তরে অন্তরে বেশি মিল তার ভগ্নহৃদয়ের সঙ্গেই। মায়ার খেলার অমর ও প্রমদার পূর্বাভাস আছে ঐখানে কবি ও নলিনী চরিত্রে। এ কথা বলা যায়— রবীন্দ্রনাথের ষোলো থেকে কুড়ি-একুশ বৎসর বয়সের ভিতর লেখা ও ছাপা কবিকাহিনী, বনফুল, ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড, চারখানি কাব্যগ্রন্থের (তৃতীয় ও চতুর্থ ক্ষেত্রে, যথাক্রমে, 'গীতি'কাব্যের ও নাট্যকাব্যের) প্রত্যেকটি একটা-না-একটা কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে এবং প্রত্যেকটিতেই নায়কের ভূমিকায় এক কবি। বিশেষভাবেই 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' কবির এই কল্পরূপ রচনা করেছেন তরুণ কবি প্রত্যেক ক্ষেত্রে। প্রমূর্ত, বাস্তব, সত্য ততখানি নয় যতটা কল্পনাবিষ্ট চিত্তের মায়া মোহ অনুরাগ দিয়ে রচিত ও রঞ্জিত।

সে যাই হোক, নলিনী[৪] -রচনার কিছুকাল পরে ওটি অকিঞ্চিৎকর মনে হয়েছে এবং বিশেষ এক উপলক্ষে ওটিকেই যেন ঢেলে সাজতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, কবির এই স্বীকারোক্তি তাৎপর্যপূর্ণ ই বটে। প্রতিভার ক্রমপরিণতি যে বয়সে স্বাভাবিক সুস্পষ্ট এবং দ্রুত, আনুমানিক চার বৎসরের ব্যবধানে দৃষ্টি ও সৃষ্টি -ক্ষেত্রে বহু বৈপ্লবিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। অন্তত রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ভাবনা কল্পনা বেদনার স্থায়ী এবং সার্থক আকার -লাভের মাহেন্দ্র লগ্ন আসে নি নলিনীর জন্মকালে। নলিনীর জন্মান্তর ঘটেছে মায়ার খেলায়। কিন্তু তৎপূর্বেই ওটির ভাবান্তর বা রূপান্তর -সাধনের যে চেষ্টা হয় সে বিষয়ে সম্প্রতি জানা গিয়েছে। শ্রীবসন্তবিহারী চন্দ্রের সংগ্রহে নলিনীর যে প্রতি[৫] আবিষ্কৃত, তাতে কবির স্বাক্ষর তো আছেই,[৬] স্বহস্তের বহু সংযোজনও রয়েছে, পাতায় পাতায় না হলেও, নানা স্থানে— বিশেষতঃ গ্রন্থশেষে।

মুদ্রিত নলিনী নাটকে চারটি মাত্র গান ছিল প্রথম দৃশ্যে, আর গান ছিল না অবশিষ্ট পাঁচটি দৃশ্যে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনায়, বিশেষতঃ এমন রচনায় প্রেমই যার উপজীব্য, গানের এতটা দুর্ভিক্ষ অভাবিত সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের রূপান্তরে যখন মন দিলেন, শেষ দৃশ্য বাদে অন্যত্র আর কোনো সংযোজনের দিকে গেলেন না, পরিবর্তন করলেন না, কেবল কয়েকটি নূতন গান সন্নিবিষ্ট করলেন— প্রথম দৃশ্যে দুটি, দ্বিতীয় দৃশ্যে একটি, তৃতীয় দৃশ্যে তিনটি, পঞ্চম দৃশ্যে দুটি, ষষ্ঠে একটি— মোট নয়টি। গানের প্রথম ছত্র অথবা সূচনাই তিনি নির্দেশ করেছেন, পূর্বরচিত কিম্বা সুপরিচিত গানের সবটা লিখে দেন নি।

কবিকল্প নীরদের গান দিয়ে ('হা কে ব'লে দেবে') নাটকের সূচনা সন্দেহ নেই। পরে নলিনী ও বালিকা ফুলির প্রবেশ, আরও পরে নবীনের, ফুলির গান ('ও কেন ভালোবাসা জানাতে আসে') আর নবীনেরও ('ভালোবাসিলে যদি সে ভালো না বাসে') এবং বালিকা ফুলি ও নলিনী ছাড়া কেউ যখন কাননে নেই শেষ গানটি—

মনে রয়ে গেল মনের কথা,
শুধু চোখের জল, প্রাণের ব্যথা!
... ...
বুঝিল না, সে যে কেঁদে গেল,
ধুলায় লুটাইল হৃদয়লতা!

এ গানে কণ্ঠ ফুলির কিন্তু মর্মবেদনা নলিনীরই সেটি বেশ স্পষ্ট।

রূপান্তর-প্রয়াসে প্রথম গানটি যোগ করা হয়েছে 'কেন রে চাস ফিরে[২]', গেয়েছে নীরদ, নলিনীর প্রস্থানের একটু আগে[৭]; দ্বিতীয় গানটি সেই গেয়েছে নিজেও চলে যাবার আগে[৮]— 'গেল গো, ফিরিল না'।

দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথমেই নবীনের উপস্থিতি ও দীর্ঘ উক্তি, পরে[৯] গান— 'কেহ কারো মন বোঝে না'।

তৃতীয় দৃশ্য বিদেশে। নীরদের স্বগত উক্তি দিয়ে সূচনার পরে প্রেমময়ী নীরজার উপস্থিতি আর নীরদের স্ফুট উচ্চারণ— 'আহা কি সুধাময় স্বর! কে বলে স্ত্রীলোকের প্রাণ কঠিন?... এস, আমরা দুজনে মিলে গান গাই।'[১০] নূতন গান— 'দেখে যা'। অতঃপর নীরজার উক্তি ও নীরদের পুনরুক্তির পরেই[১১] পুনরায় নূতন গান— 'ধীরে ধীরে প্রাণে আমার'। এই দৃশ্যের অপর গানটি প্রায় শেষ দিকে সন্নিবিষ্ট, 'হাসি খেলার চপলতার মধ্যে আমাদের মিলন হয় নি, আমাদের ভয় কিসের'[১২] নীরদের এই উক্তির পরেই— 'দুখের মিলন'।

পঞ্চম দৃশ্যে নলিনীর উদ্যানে বসন্ত-উৎসব, নীরজা -সহ স্বদেশে প্রত্যাগত নীরদ, তাদেরই গান— 'ঐ বুঝি'।[১৩] দৃশ্যশেষে নলিনীর প্রতি নীরজার উক্তি 'আমি তোর দিদি হই বোন'[১৪] আর তার পরেই নূতন গান— 'কিছুই তো হল না'।

ষষ্ঠ দৃশ্যে যেখানে গ্রন্থ শেষ হয়েছিল,[১৫] রবীন্দ্রনাথ নূতন যোগ করেছেন কালীর লেখায়—

নীরজা। আজ আমার কি সুখের দিন! আজ আমি নিজহাতে তোমাদের মিলন করে দিলুম— পৃথিবীর মধ্যে দুজনকে আমি সুখী করতে পারলুম।

নবীন। আর তোমার নিজের সুখ দেখ্‌লে না?

নীরজা। সেই ত আমার সুখ— প্রদীপ দগ্ধ হয়ে আলো দেয় তা না হলে তার আর আবশ্যক কি আছে!

নবীন। তা বটে!

কেন এলি রে! ইত্যাদি!

নীরদ। তুমি আমাকে নলিনীর হাতে সমর্পণ করলে, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় কি তাকে দিতে পারবে? তোমাকে যা দিয়েছি তা তুমি ফেরাতে পারবে না। আমাদের মিলনের মধ্যে তুমিই চিরদিন

অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে জেগে থাকবে। আমাদের দুজনের এই মিলিত হৃদয়ের সমুদয় সুখ দুঃখ হাসি অশ্রুজল তোমারি উদ্দেশে উৎসর্গ করে রেখে দিলুম। চিরকাল তোমারি পুজার জন্যে আজ আমাদের এই দুজনের জীবনের মিলনমন্দির প্রতিষ্ঠিত হল। /

এই নূতন রচনা বা রচনার খসড়াটি কী উপলক্ষে কবে রচিত আমরা বলতে পারি নে। এটুকু দেখা যায় আদ্যন্তে গান দিয়ে আর সমাপনটুকু আরও মধুর এবং ভাবগর্ভ করে, পুরোনো কাঠামো বজায় রেখেই নাটকটিকে যথাসম্ভব মঞ্চোপযোগী করার চেষ্টা হয়েছে। তবু মঞ্চে হয়তো অভিনীত হয় নি কোনোদিন। (বাস্তব সংসারে বা সত্যলোকে, 'আরো সত্যে'র লোকে, প্রতিষ্ঠা হয় নি।) নূতন নয়টি গানের পূর্বসূত্রানুসন্ধানে[৬৪] দেখা যায় ১২৯২ বৈশাখে প্রকাশিত রবিচ্ছায়ায় রয়েছে সাতটি—

১ কেন রে চাস্ ফিরে ফিরে
২ গেল গো, ফিরিল না
৩ কেহ কারো মন বুঝে না
৪ দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা
৫ ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এস হে
৬ কিছুই তো হল না
৭ কেন এলি রে

অবশিষ্ট দুটি গানের মধ্যে একটি ('দুখের মিলন টুটিবার নয়') মায়ার খেলায় (১২৯৫ অগ্রহায়ণ) আর অন্যটি ('ঐ বুঝি বাঁশি বাজে') রাজা ও রানীতে (১২৯৬ শ্রাবণ) প্রথম প্রচারিত হলেও কয়েক বৎসর পূর্বে রচিত হওয়ার বাধা নেই।

এইখানে বিবাহ-উৎসব বলে আর একটি অখ্যাত এবং ক্ষুদ্র গীতিনাট্যের প্রসঙ্গ আপনিই এসে পড়ে। এর বিশদ পরিচয় অল্প লোকে জানেন, কেননা আমন্ত্রিত স্বজনগোষ্ঠীর গণ্ডীর বাইরে হয়তো অভিনয় বড়ো একটা কেউ দেখেন নি, পুস্তিকার মুদ্রিত প্রতিও দুর্লভ, অথচ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এর রচনার সময় ও উপলক্ষ মোটের উপর সবই জানা যায়। সবটাই রবীন্দ্রনাথের না হলেও রবীন্দ্ররচনাই এখানে মুখ্য— পরিমাণে, হয়তো গুণেও। যেহেতু এটি পুরোপুরি গীতিনাট্য, অল্পবিস্তর-পরিচিত গানগুলির প্রথম পংক্তি পর পর উল্লেখ করলেই, সন্ধানী ব্যক্তির পক্ষে সামগ্রিক নাট্যরূপের একটি আদল মনে মনে কল্পনা করা অসম্ভব হবে না—

১ ধর্ লো ধর্ লো ডালা, এই নে কামিনী-ফুল
২ হোথায় একটি গাছের আড়ালে
৩ যা, যা, তুল্ গে লো তোর সাধের কুসুম
৪ এই মল্লিকাটি পরাইব চুলে
৫ মানিনু মানিনু হার তোর কাছে, সখি
৬ কেমন, সখি, আমার সাথে, পারিলি নে তো, তুই
* ৭ নাচ শ্যামা তালে তালে
* ৮ ওই জানালার কাছে বসে আছে

* ৯ সাধ করে কেন সখা ঘটাবে গেরো
* ১০ ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এস হে
* ১১ তুমি আছ কোন্ পাড়া
১২ গেছ গেছ যাও মন এস না আমার কাছে
* ১৩ রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে বরিষে
* ১৪ তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ (খুলে গো)
* ১৫ দেখ ঐ কে এসেছে, চাও সখি চাও
* ১৬ ভাল যদি বাস সখি কি দিব গো আর
* ১৭ ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে
* ১৮ ভাল বাসিলে যদি সে ভাল না বাসে
* ১৯ বনে এমন ফুল ফুটেছে
* ২০ কেন রে চাস্ ফিরে ফিরে
* ২১ মনে রয়ে গেল মনের কথা
২২ এ সুখ বসন্তে সই কেন লো এমন
* ২৩ প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন
২৪ ছি ছি আ ছি ও কি কথা রঙ্গিনী বল
* ২৫ বুঝি বেলা বহে যায়
২৬ আর বুঝতে বাকী নাইক হে শ্যাম
* ২৭ কথা কোস্ নে লো রাই
* ২৮ ও কেন চুরি করে চায়
২৯ একা একা এত দিন কেটে গেল
৩০ এত হাসি কেন আজ
৩১ তুমি কি বুঝিবে সখা সে যে কি রতন
৩২ ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ ঘ্যানর্
* ৩৩ সখা সাধিতে সাধাতে কত সুখ
* ৩৪ এত ফুল কে ফুটালে (কাননে)
* ৩৫ আমাদের সখিরে কে নিয়ে যাবে রে
* ৩৬ সখি সে গেল কোথায়
* ৩৭ কোথা ছিলি সজনি লো
৩৮ সখি কাননে কুসুম ফুটিবে
* ৩৯ ওকি কথা বল সখি ছি ছি
৪০ আজ তোমারে ধরব চাঁদ আঁচল পেতে
* ৪১ মধুর মিলন

৪২ এ মধু যামিনী এ মধু চাঁদিনী
৪৩ দেখে যা দেখে যা দেখে যা লো তোরা
* ৪৪ মা একবার দাঁড়া গো হেরি চন্দ্রানন
* ৪৫ মা আমার কেন তোরে ম্লান নেহারি
* ৪৬ যে তোরে বাসেরে ভাল, তারে ভাল বেসে বাছা[১৬]

তারকাচিহ্নিত সব-কটি রচনা (সব-শেষের আবৃত্তিযোগ্য কবিতাটিও) রবীন্দ্রনাথের, অর্থাৎ ৪৬টির মধ্যে ২৯টি। প্রথম ছ'টি গান স্বর্ণকুমারী দেবীর বসন্ত-উৎসব গীতিনাট্যের প্রথম দৃশ্যেই পাওয়া যায়, একটি গানের কেবল একটি সামান্য পাঠান্তর রয়েছে। (সাহিত্যসাধক-চরিত-মালা অনুযায়ী উক্ত গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১৮৭৯ নভেম্বরে বা বাংলা ১২৮৬ সনে।) কতকগুলি গান (সংখ্যা ২২, ২৪, ২৬, ৩২, ৪০, ৪২) কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি-গীতিমালা গ্রন্থ থেকে ইঙ্গিতে জানা যায়।[১৭] অবশিষ্ট পাঁচটি গান (সংখ্যা ১২, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৮) কে রচনা করেন[১৮] সে বোধ করি বন্ধুবর শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সন্ধানের বিষয়। আমাদের বিশেষ কৌতূহল জাগবার কারণ এই যে, মুদ্রিত ও প্রচারিত নলিনীর চারটি গানের মধ্যে তিনটি বিবাহ-উৎসবে (সংখ্যা ১৭, ১৮, ২১) পাওয়া যায় আর নলিনীর অপ্রকাশিত যে খসড়া বা রূপান্তর তারও তিনটি গান বিবাহ-উৎসব থেকেই নেওয়া (সংখ্যা ১০, ২০, ৪৩) এমন বলা যায় না কি ? অবশ্য, এই ছয়টি গানই রবিচ্ছায়ায় নেই এমন নয়। (মুদ্রিত নলিনীর চারটি গান আর খসড়ায়-নির্দেশিত নয়টি গানের মধ্যেও সাতটি, সবই রবিচ্ছায়ায় সংকলিত।) কিন্তু এটা জানা যায় যে, নলিনী ও রবিচ্ছায়ার প্রকাশ ১২৯১ বৈশাখে, পক্ষান্তরে বিবাহ-উৎসবের অভিনয় সম্ভবতঃ ১২৯০ ফাল্গুনে। এ সম্পর্কে তৃতীয় খণ্ড গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয়ে (ভাদ্র ১৩৭১, পৃ ৯৭৭) বলা হয়েছে ' 'কোনো পারিবারিক বিবাহ-উৎসবোপলক্ষে' ইহার যৌথ রচনা।' 'দ্রষ্টব্য শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী -রচিত 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থের 'নাট্যস্মৃতি' অধ্যায়ে 'বিবাহ-উৎসব' প্রসঙ্গ। অপিচ দ্রষ্টব্য সরলাদেবী চৌধুরানী -প্রণীত 'জীবনের ঝরা পাতা'... তদনুযায়ী (পৃ ৫৬) হিরণ্ময়ীদেবীর বিবাহ-উপলক্ষে ইহার রচনা। জানা যায় শেষোক্ত ঘটনা রবীন্দ্রনাথের বিবাহ (২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০) হইতে ৩ মাস পরে।'[১৯]

ফলতঃ এমন হতে পারে যে, বিবাহ-উৎসব রচিত ও অভিনীত হয় নলিনীর পূর্বেই। যৌথ রচনা-প্রচেষ্টায় কবির মনে যে বেগ সঞ্চারিত হয় তারই ক্রিয়া কি চলতে থাকে নলিনী-রচনায় ? কেননা রবীন্দ্রজীবনীর প্রথম খণ্ডে যে তথ্য পাই তাতে দেখি পুনর্বার যৌথ প্রযত্নে কিছু-একটা খাড়া করবার সংকল্পই ছিল বটে, তবে শেষ পর্যন্ত কবির একক কল্পনাকৃতিত্বেরই পরিণাম হল— নলিনী। নলিনীর অপ্রকাশিত রূপান্তর কোন্ সময়ের, নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে 'দুখের মিলন টুটিবার নয়' মায়ার খেলায়[২০] এবং 'ঐ বুঝি বাঁশি বাজে' রাজা ও রানীতে পরবর্তী কালে সংকলিত হয়েছে ; এ দুটি গান নলিনীর পরিকল্পিত সংস্করণে থাকলেও রবিচ্ছায়ায় পাওয়া যায় না। সুতরাং রবিচ্ছায়া-প্রকাশকের 'বক্তব্য' যদি যথার্থ হয়— '১২৯১ সনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রবীন্দ্রবাবু যতগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন প্রায় সেগুলি সমস্তই এই পুস্তকে দেওয়া গেল' তা হলে নলিনীর উল্লিখিত সংস্কারকার্য ১২৯১-৯৪ বঙ্গাব্দের অন্তর্বর্তী কোনো সময়ে সমাধা হয় এপর্যন্তই অনুমান করা যেতে পারে। নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হয় ১২৯১ বৈশাখে। এই অতর্কিত বিচ্ছেদবিষাদের প্রগাঢ় ছায়াপাতেই নলিনীর অভিনয় হতে পারে নি এ কথা রবীন্দ্রজীবনীকারও বলেন। নলিনীর সংস্কারকার্য তাই কোনোদিন কোনো কাজে লাগে নি। অথচ ১২৯৪ সনে (ইতিমধ্যে তরুণ কবি-

মানসের পরিণতি বহু দূর এগিয়েছিল সন্দেহ নেই) শ্রীমতী সরলা রায়ের বিশেষ অনুরোধে একমাত্র মহিলাদের অভিনয়োপযোগী নূতন এক গীতিনাট্যে হাত দিতে হয়, সেই নাটকই মায়ার খেলা। বিস্মৃত বা পরিত্যক্ত 'অকিঞ্চিৎকর' নলিনী এই ভাবে নূতন প্রাণে আর রূপে রসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, পরিণত নূতন প্রতিভার দ্যুতিময় স্বাক্ষর তার সর্বত্র দেখা যায় আর রবীন্দ্র-গীতিপ্রতিভারও অভাবিত নূতন ঐশ্বর্য উদ্‌ঘাটিত হয়।[২১]

কাজেই ভগ্নহৃদয় ও মায়ার খেলার মধ্যে অন্তরে অন্তরে মিল যেমন সত্য, অমূলক কল্পনা নয়, কবির সচেতন প্রয়াসে বা অব্যবহিত অভিজ্ঞতায় নলিনী গদ্যনাট্যের মায়ার খেলায় পরিণতিও বাস্তব ঘটনা। সংস্করণ বা পরিবর্তন নয়— সে চেষ্টায় তেমন ফললাভ হয় নি বা পরিণত কবিমানসের পরিতৃপ্তি ঘটে নি— বিস্ময়কর বিবর্তনেরই সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গীতিনাট্য মায়ার খেলার নৃত্যনাট্যে রূপান্তর কতদূর আশ্চর্যজনক সে আমরা অন্যত্র বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করেছি।

১৩১৭ পৌষে রাজা প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, কিন্তু ঐ নাটকের এটি প্রাথমিক রূপ নয়। প্রাথমিক পাঠ প্রকাশিত হয় দশ বৎসর পরে ১৩২৭ বঙ্গাব্দে। ইতিমধ্যে ১৩২৬ মাঘে অরূপরতন এই নামান্তরে রাজা নাটকেরই অন্য একটি রূপও আত্মপ্রকাশ করে। ১৩৪২ কার্তিকে অরূপরতনের নূতন সংস্করণ দেখা দেয়। বস্তুতঃ রাজার চতুর্বিধ রূপ আমাদের গোচরে আছে, রচনার পারম্পর্যে উল্লেখ করতে হলে বলা যায়— রাজা (১৩২৭ দ্বিতীয় মুদ্রণ), রাজা (১৩১৭ পৌষের প্রথম মুদ্রণ), অরূপরতন (১৩২৬ মাঘ) এবং অরূপরতন (১৩৪২ কার্তিক)। তা ছাড়া শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহশালায় রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে রাজা বা অরূপরতনের আরও দুটি অসম্পূর্ণ পাঠ দেখা যায়— একখানি জাপানি খাতায় (পাণ্ডুলিপি ১৭১)[২২] আর বর্জিত প্রেসকপির খুচরা কতকগুলি পাতায়।[২৩] এগুলির রচনা শেষোক্ত সংস্করণের পূর্বেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রসদনের খাতায়-পত্রে ১০ নভেম্বর ১৯৩৫ (২৪ কার্তিক ১৩৪২) তারিখে উল্লেখ দেখা যায়— 'রাজা ও অরূপরতন নাটক দুটি মিলাইয়া রাজা নাটকের সংশোধন সভায় পাঠ।'

অসম্পূর্ণ পাঠ সভাস্থলে পঠিত হয়েছিল এমন মনে করবার কোনো কারণ দেখা যায় না। কাজেই জাপানি খাতার পাঠ পড়া হয় নি। মনে হয় সম্পূর্ণ যে পাঠ কবি সভাস্থলে উপস্থিত করেন তারই প্রথমাংশ (২১ পাতা বা পৃষ্ঠা) বর্জিত প্রেস-কপি হিসাবে রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত আর অবশিষ্ট পাতাগুলির সন্ধান নেই— অল্প-বিস্তর পরিবর্তনে, বর্জনে বা সংযোজনে, ১৩৪২ কার্তিকে মুদ্রিত অরূপরতনের অঙ্গীভূত হয়েছে হয়তো এমনই হতে পারে। সভাস্থলে শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী (আমাদের গোঁসাইজি) উপস্থিত ছিলেন; বর্তমানে অসুস্থ ও শয্যাশায়ী তিনি, এটুকুই জেনেছি— নূতন পাঠ তেমন ভালো লাগে নি তাঁর। ভালো না লাগার সম্ভাবনা কিসে যে, হয়তো পরবর্তী আলোচনায় বা পাঠবিচারে জানা যাবে। ছাপাখানার কাজ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরেও কবিকর্তৃক আংশিক (?) বর্জনে, রবীন্দ্রভক্ত সুধীসামাজিকের পূর্বোক্ত অনভিমতের কতকটা সমর্থন পাওয়া যায়।

রাজা-অরূপরতনের অন্তত চারটি মুদ্রিত পাঠ ও দুটি অমুদ্রিত অসম্পূর্ণ পাঠ নিয়ে আমাদের পর্যালোচনা করতে হবে। আর তার আগে রাজা বা অরূপরতনের সূত্রানুসন্ধানও অনুচিত হবে না। এ কথা জানা

চাই— রাজা বা অরূপরতন -রূপ বিচিত্র নাট্যকল্পনার এক সীমায় আছে বৌদ্ধ কুশজাতক উপাখ্যান[২৪], অন্য সীমান্তে শাপমোচন[২৫] কবিতাটি। উপাখ্যান কিম্বা কবিতার সঙ্গে রাজা-অরূপরতনের অন্তরের মিল নেই, তবু বাহ্য সাদৃশ্য কতকটা আছেই।

বারাণসীরাজ ইক্ষ্বাকুর পাঁচ শো রানী আর পাঁচ শো পুত্রসন্তান। তার মধ্যে প্রধানা মহিষীর পুত্র কুশ বলবীর্যে বুদ্ধিমত্তায় অদ্বিতীয় হলেও অত্যন্ত কুৎসিত দেখতে। ইক্ষ্বাকুর মৃত্যুতে তিনি সিংহাসন লাভ করেন আর কান্যকুব্জরাজের সুন্দরী কন্যা সুদর্শনার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় প্রতীক বা প্রতিনিধি (?) -যোগে। স্বামীর কুৎসিত রূপ দেখে পাছে রানী আত্মহত্যা করেন তাই রাজমাতার ব্যবস্থায় পাতালে অন্ধকার কক্ষে হল তাঁর মিলনবাসর ; বলা হল ইক্ষ্বাকুকুলের এই রীতি। কিন্তু প্রাণপ্রিয় দয়িতকে দিনের আলোয় না দেখে সুদর্শনা স্থির থাকতে পারেন না। সুতরাং কুশের সুরূপ এক বৈমাত্র ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসিয়ে স্বয়ং কুশ ধরে রইলেন রাজছত্র। রাজকন্যা 'স্বামী'-সন্দর্শনে পুলকিতা হলেও কালো কুৎসিত ছত্রধারীকে দেখে হল তাঁর ক্ষোভ। কিন্তু এ বঞ্চনাও স্থায়ী হল না। একদা করভোদ্যানে[২৬] লাগল আগুন আর কুশের বলবিক্রমেই হল তা নির্বাপিত। মুখে মুখে তাঁর গুণগান, মসীকৃষ্ণ যাঁর তনু, আয়ত রক্তচক্ষু যেন আগুনের ভাঁটা। সুদর্শনার মোহময় ভ্রান্তি ঘুচে গেল ; রোষে ক্ষোভে অধীর হয়ে, রাজমাতার অনুমতি নিয়ে, পিতৃগৃহে হল তাঁর আত্মনির্বাসন। মহারাজ কুশ ছদ্মবেশে সেখানে গিয়ে পাকশালায় ভর্তি হলেন। গোপনে রাজকন্যাকে বোঝাতে গেলেন, ফল হল না। এ দিকে সুদর্শনার স্বামীত্যাগের বৃত্তান্ত গোপন রইল না। সাতজন সামন্তরাজা এলেন পাণিপ্রার্থী হয়ে, যুদ্ধ বাধল। কান্যকুব্জরাজ বললেন পরাজয় যদি ঘটে পতিত্যাগিনী কন্যাকে সাত টুকরো ক'রে দেবেন তিনি সাতজন রাজাকে। শঙ্কায় অনুশোচনায় শেষে স্বামীরই শরণ নিলেন সুদর্শনা। রাজা তাঁকে দিলেন বহুমান। রণক্ষেত্রে গজবাহন কুশ অমানুষিক এক হুঙ্কারে বা চীৎকারে আতঙ্কিত শত্রুরাজাদের অনায়াসে করলেন পরাজিত। জামাতার অনুরোধে কান্যকুব্জরাজ প্রত্যেকের সঙ্গেই এক এক রাজকন্যার বিবাহ দিলেন। কুশও পত্নীকে নিয়ে ফিরে চললেন আপনার রাজধানীতে। পথে স্বচ্ছ এক জলধারায় আপনার কদাকার রূপ হঠাৎ দেখে কুশ আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে, করুণাময় ইন্দ্র এসে দিলেন তাঁকে দিব্যরত্নগ্রথিত এক মালা। সেই মালিকা পরে অচিরে কুশ হলেন পরমসুন্দর চিরযুবা আর সুদর্শনাও যার-পর-নেই আনন্দিতা হলেন।

সংক্ষেপে এই হল কাহিনীটি। এই গল্পে অলৌকিকের সমাবেশ আছে যথারীতি, সেকালের শ্রোতাদের মনোহরণের উপযোগী উপাদানও আছে প্রচুর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ভাবসম্পদে বা অর্থগৌরবে ভরে দিয়েছেন এই বাঁধা ছাঁদের কাহিনী, কল্পনা ও কবিত্বের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যে অপরূপ করে তুলেছেন, গভীর গম্ভীর জীবনদর্শনের বিগ্রহ রচনা করেছেন অভিনব নাট্যরূপে, দুর্লভ কবিপ্রতিভার গুণেই তা সম্ভবপর। নাট্যরূপ না দিয়ে গাথা বা কবিতাও অবশ্যই লেখা যেত। বৌদ্ধ কথাবস্তুর আধারে রচিত পূজারিনি অভিসার পরিশোধ স্মরণ করা যেতে পারে। কুশজাতক নিয়েও বহু বৎসর পরে, ১৩৩৮ পৌষে, লিখলেন শাপমোচন গদ্য কবিতা ; সেটি হয়তো ঐ নামেরই নৃত্যনাট্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল, পরে স্বতন্ত্র কবিতা হিসাবেই পুনশ্চ কাব্যে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে পরিমাণ বক্তব্য বা জীবনদর্শন সচল শরীরী বেগবান্ প্রাণবান্ করে দেখতে ও দেখাতে চান কবি, নাট্যরূপই তার উপযুক্ত বাহন আর সে নাটক যুগোপযোগী।

দুঃখের তপস্যায় কর্মক্ষয় আর তারই ফলে শাপমোচন ও চরম এক ক্ষণে অরুণেশ্বরের দিব্যকান্তিলাভ, এটুকু অলৌকিকতা থাকলেও (ভারতীয় বিচারবুদ্ধির কাছে এ আর এমন কী অলৌকিক) শাপমোচন কবিতায় আদ্যন্ত কাহিনীটি আছে লৌকিক স্তরে। মর্তমানুষের সুখদুঃখ আশানিরাশা আকাঙ্ক্ষা-আবেগের ঘাত-প্রতিঘাত -ময় পরিচিত জীবনছন্দ। পূর্বজীবনের ভূমিকায় ইঙ্গিতে বলা হয়েছে ছন্দোময় দিব্যজীবন; ছন্দঃপতনই তার যা-কিছু দুঃখের হেতু, তার বিশেষ অপরাধ। উষা সন্ধ্যার তারার কিরণে, দেওদারবনে হাওয়ার হাহাকারে, কৃষ্ণপক্ষ চাঁদের আলোয়, অতন্দ্র তরঙ্গের কলক্রন্দনে, নিমফুলের সৌগন্ধে, ঝিল্লির ঝঙ্কারে, নিষুপ্ত-নীড়ের-পাশ-দিয়ে-উড়ে-যাওয়া রাতের পাখির ডানার চঞ্চলতায়, স্বপ্নে-কথা-কওয়া অরণ্যের আকৃতিতে, আর তারই সঙ্গে বিরহীহৃদয়ের নৃত্যে গানে ও বেণু-বীণার পরজে বেহাগে একতানে মিলিয়ে অশরীরী বেদনাকে কী অপূর্বভাবেই না ব্যঞ্জিত করা হয়েছে কবিতায়। মানবমনের পথ-না-জানা সব গুহায় গহ্বরে জেগে উঠেছে ধ্বনি প্রতিধ্বনি। অবশেষে মিলনের লগ্নটি উদয় হয়েছে অন্তহীনপ্রায় বিরহের পরপারে। এ তো শুধু রবীন্দ্ররচনাশৈলীতেই সম্ভব। সবই আসলে তবু পার্থিব অভিজ্ঞতা, বহু এবং বিচিত্র মানবভাগ্যেরই করুণে মধুরে মেশানো এক কাহিনী— কাব্যের ভাষায় অপরূপ সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে।

রাজা অরূপরতনের তাৎপর্য আরও গূঢ়, গভীর, সর্বগ্রাসী। যথালব্ধ আখ্যান রবীন্দ্রপ্রতিভার ইন্দ্রজালে নিখিলমানবজীবনেরই প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ তত্ত্ববুদ্ধির-ছাঁচে-ফেলা বা জোড়তালি-দেওয়া অ্যালেগরি তো নয়, জীবন্ত প্রতিমা। বুদ্ধিজীবী সমালোচক কিভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন কবি তা জানতেন, তাই বিশেষ জোর দিয়েই বলেছেন লেডি ম্যাক্‌বেথের মতোই সুদর্শনাও তাঁর সত্য এবং বাস্তব।[২৭] আমাদেরও তাই নিশ্চিত প্রতীতি। কবি বলছেন— যেমন বাইরের জীবনে বহু ঘটনা ঘটে অন্তর্জীবনও তেমনি রুদ্ধ স্থির বা নির্দ্বন্দ্ব নয়, 'the human soul has its inner drama'। কাব্যে নাটকে সেই অন্তর্জীবনই যদি মূর্ত বাঙ্‌ময় হয়ে ওঠে (কায়াহীন মায়া বা ছায়াছবি নয়) তাই বা অবাস্তব হবে কেন? আর, রাজাও সব জীবনেরই জীবনেশ্বর যদিও, নিরাকার কল্পনা হয়ে থাকেন নি, অনুভবে ধরা দিয়েছেন।[২৮] তারই সচল সবাক্ বিগ্রহ তিনি, কোনো দেশে কোনো কালে নিঃশেষে যার নাম রূপ ও সংজ্ঞার্থ দেওয়া যায় নি; এক দিকে যিনি ভয়েরও ভয়, ভীষণ থেকেও ভীষণ, আর অন্য দিকে পরম সুন্দর, সুচির মধুর। প্রেম আনন্দ এবং কল্যাণ -স্বরূপ। মানুষী সত্তার অন্তরের রঙ্গমঞ্চে যা সর্বকালে সব রকমেই সত্য, মানুষের সীমাবদ্ধ ভাবে ও ভাষায় কবি তাকে প্রাণ ও শরীর দিতে পেরেছেন এইটেই আশ্চর্য। পূর্বকালের রচনায় যেমন এর তুলনা নেই, এ কালের নাট্যে বা কবিতায় এই রূপান্তর তেমনি অবশ্যম্ভাবী। সুদর্শনা মানবহৃদয়েরই প্রতিমা আবার মান অভিমান আশা আকাঙ্ক্ষা প্রেমাবেগ নিয়ে অত্যন্ত বিশিষ্ট সুনির্দিষ্ট এক নারীও বটে। নারীর আর-এক রূপ সুরঙ্গমা; যদিও সে পার্শ্বচরিত্র, তার মধ্যেও অবাস্তবতা কিছু নেই। অন্য সব চরিত্র যদি এক-একটি টাইপও হয়ে থাকে— ঠাকুরদা ও বিক্রমবাহুকে টাইপ বলব কি?— তাতে এ রচনার নাটকীয়তার ক্ষতি হয় নি।

রাজার প্রথম পাঠ (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ও দ্বিতীয় পাঠ (প্রথম মুদ্রণ) দুটিতেই দৃশ্যসংখ্যা বিংশতি। বিশেষ পরিবর্তন এই যে, প্রথম মুদ্রণে প্রথমেই পাওয়া যায় পথের দৃশ্য আর দ্বিতীয় দৃশ্য হল রাজান্তঃপুরের অন্ধকার

কক্ষে অদর্শন রাজাধিরাজের সঙ্গে রানী সুদর্শনার মিলন— সে মিলনে রানীর প্রেমতৃষার পরিপূর্ণ তৃপ্তি নেই, কেননা দুই চোখ ভরে তিনি দেখতে চান দয়িতকে ; জানেন না সে দেখা সহজ নয়, সে দেখায় ভ্রান্তির অবকাশ আছে, আছে দুঃখ এবং আঘাত। প্রথম পাঠে এই দুটি দৃশ্যের সমাবেশ ছিল বিপরীত এবং সেইটেই বুঝি সংগত। 'অন্ধকার' রঙ্গমঞ্চে যবনিকা-অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে দুটি ছায়াময়ী মূর্তির আলাপন আর 'অশরীরী' রাজার আবির্ভাব দর্শকদের পক্ষে কিভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সে সমস্যা পৃথক্— হয়তো সংগীতের জাদুতে অসম্ভব হয় না— এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই নাটকের মূল সুরটি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে এভাবে, তার মর্মকথার ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব হয়েছে সূচনাতেই। কাজেই প্রথম-মুদ্রণ-গত পরিবর্তন ত্যাগ করে প্রথম পাঠে ফিরে যাওয়া অহেতুক নয়। দুটি পাঠের মধ্যে অন্য যে পার্থক্য তা হল গানের সংখ্যা ও নাটকের সংহতি নিয়ে। প্রথম পাঠে গান ছিল ছাব্বিশটি ; তার মধ্যে 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না', 'আমি কেবল, তোমার দাসী', 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে,' 'অন্ধকারের মাঝে আমার ধরেছ দুই হাতে' গান-ক'টি বাদ দেওয়ায় দ্বিতীয় পাঠে গানের সংখ্যা বাইশটি। এটিও উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম পাঠের 'ভয়েরে মোর আঘাত করো ভীষণ, হে ভীষণ' ত্যাগ ক'রে ঠিক সেই স্থলে সেই সুরঙ্গমার কণ্ঠেই দেওয়া হয়েছিল— 'আমারে তুমি কিসের ছলে পাঠাবে দূরে।' কিন্তু অন্তরে অন্তরে যখন সুদর্শনার "শাস্তি শুরু হয়েছে" আর হালভাঙা নোঙরছেঁড়া নৌকার মতো কোন্ সর্বনাশে ছুটে চলেছে উন্মাদিনী জানা নেই, সেই ক্রান্তিক্ষণের উপযোগী সুর ঐ ভয়ের আঘাতে ভয় যেখানে ভাঙে, কঠিনের পাদস্পর্শেই কান্ত করুণ কল্যাণকে চেনা যায়। প্রথম পাঠে কুঞ্জদ্বারবর্তী দুটি দৃশ্যে (তৃতীয় ও পঞ্চম) যাত্রীজনতার অংশরূপে ছিল মেয়েদের দল ; সহজ মানুষ ঠাকুরদার সঙ্গে ছিল তাদের সহাস্য অন্তরঙ্গতা ; রূপে রসে বর্ণে, আনন্দের উচ্ছলতায়, উৎসবকে তারা সত্যই উৎসবময় ও বিচিত্র করে তোলে নি কি— প্রথম মুদ্রণে বর্জিত হয়েছে। পঞ্চম দৃশ্যে সুরঙ্গমার সঙ্গে ঠাকুরদার আলাপ সংক্ষিপ্ত করে তার স্থান দেওয়া হয়েছে দৃশ্যের শেষে ; রাজবেশী ভণ্ডের সঙ্গে কাঞ্চীর মন্ত্রণা, দৃশ্যের মাঝখানে চলে এসেছে শেষ দিক থেকে আর ঠাকুরদার সঙ্গে তার দেখাও হয় না। দ্বিতীয় পাঠে এইসব পরিবর্তন যেমন পাত্রপাত্রীর সংখ্যা কমাবার উদ্দেশে (উৎসবামোদী জনতার থেকে মেয়েরা তাই বাদ গেছে) তেমনি সংহতির অনুরোধে এমন মনে করা যেতে পারে।

অবরেণ্যকে বরমাল্য পাঠিয়ে সেই কৃতকর্মের অনুশোচনায় রাজকন্যা তো পিতৃগৃহে চলে এলেন, পিতার কাছে পেলেন অনাদর এবং তিরস্কার। দশম দৃশ্যের শেষে দেখা যায় দুরন্ত অভিমান যে কথা বলাচ্ছে তাঁর মুখ দিয়ে, মন তা বলছে না— 'তবে তো সে [সুবর্ণ] আসছে ! ভেবেছিলুম আবর্জনার মতো বুঝি বাইরে এসে পড়েছি, কেউ নেবে না, কিন্তু আমার বীর তো আমাকে উদ্ধার করতে আসছে··· কিন্তু সুরঙ্গমা, তোর রাজা কেমন বল্ তো ! এত হীনতা থেকেও আমাকে উদ্ধার করতে এল না ?··· আমি এখানে··· দাসীগিরি করে তার জন্যে চিরজীবন অপেক্ষা করে থাকতে পারব না। তোর মতো দীনতা আমার দ্বারা হবে না। আচ্ছা, সত্যি বল্, তুই তোর রাজাকে খুব ভালোবাসিস ?'[২৯]

একাদশ দৃশ্যে অল্প কিছু কথোপকথন বাদ গেছে।

ত্রয়োদশ দৃশ্যে বন্দীকৃত কান্যকুব্জরাজ, অন্যান্য রাজা আর ভণ্ডরাজ সুবর্ণ। স্বয়ংবরের প্রস্তাব এনেছিলেন কাঞ্চী। পরিবর্তিত পাঠ শুধু কাঞ্চীরাজ আর সুবর্ণকে নিয়ে, স্বয়ংবরের প্রস্তাব নেপথ্যেই স্থির হয়ে গেছে।

পরবর্তী দৃশ্যে অনুতাপানলে সুদর্শনার প্রায়শ্চিত্ত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, স্বয়ম্বরসভায় তবু তাঁকে যেতেই হবে, নইলে পিতার প্রাণরক্ষা হবে না। বুকের আঁচলে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা লুকিয়ে রেখেছেন, মৃত্যুকে বরণ করতে প্রস্তুত হয়েই বলছেন— 'তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ, উচিত বিচারই করেছ। কিন্তু আমার অন্তরের কথা কি তুমি জানবে না ?··· তোমার সেই মিলনের অন্ধকার ঘরটি আমার হৃদয়ের ভিতরে আজ শূন্য হয়ে রয়েছে— সেখানকার দরজা কেউ খোলে নি প্রভু। সে কি খুলতে তুমি আর আসব না ? তবে দ্বারের কাছে তোমার বীণা আর বাজবে না ? তবে আসুক মৃত্যু আসুক— সে তোমার মতোই কালো, তোমার মতোই সুন্দর— তোমার মতোই সে মন হরণ করতে জানে— সে তুমিই, সে তুমি।'[৩০]

স্বয়ম্বরসভা ছত্রভঙ্গ হল, যুদ্ধ শেষ হল, সুদর্শনা মিছে অপেক্ষা করে রইলেন— 'এখন আমার রাজা আসবেন কখন্?' রাজা তো এলেন না। অভিমানের জোয়ারের বেগে বুক আবার দুলে ওঠে, কেঁপে ওঠে— 'চাই নে তাকে চাই নে! সুরঙ্গমা, তোর রাজাকে আমি চাই নে! কিসের জন্যে সে যুদ্ধ করতে এল! আমার জন্যে একেবারেই না! কেবল বীরত্ব দেখাবার জন্যে!'[৩১] এই-যে শেষ 'আমি'-টুকু এ যেন কিছুতেই ছাড়া যায় না, সুরঙ্গমার মতো আত্মনিবেদনে নত হয়ে বলা যায় না— 'আমি কেবল তোমার দাসী'। সুরঙ্গমাকেও তাই সহ্য করা যায় না— 'যা যা চলে যা— তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্চে। এত নত করলে তবু সাধ মিটল না! বিশ্বসুদ্ধ লোকের সামনে আমাকে এইখানে রেখে দিয়ে চলে গেল!'

তার পরে সুদর্শনাকে তো পথে বেরোতেই হল। যে পথে ঠাকুরদা চলেছেন, পথই তাঁর আপন। কাঞ্চীও চলেছেন আত্মনিবেদনের কাঙাল। সুরঙ্গমা চলেছে আর রানীও চলেছেন ধূলিধূসর অভিসারে, পথের ধূলিতেই তাঁর অঙ্গরাগ— ধুলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে আজ ধুলোমাটিতেই মিলন হচ্ছে এ সৌভাগ্যের তুলনা নেই।

সবশেষের দৃশ্যটি আবার সেই অন্ধকার ঘরেই। শুধু সুদর্শনা আর রাজা। রাজা বললেন— 'আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম, এখানকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো— আলোয়।'

এখানেই রাজা নাটক শেষ হল— মধুর রসের কথায় আর বৈষ্ণবসাধনার নিগূঢ় তত্ত্বে শুধু নয়— বাউলের প্রাণের কথা, বিশ্বসংসারে সহজের সন্ধান, যুগপৎ প্রেম আর মুক্তির বার্তা, সবেরই ইঙ্গিতে, আভাসে, ব্যঞ্জনায়। রবীন্দ্রনাথ একাধারে ছিলেন বৈষ্ণব আর বাউল— জ্ঞানের, প্রেমের, মুক্তির সাধক।

ইচ্ছা না থাকলেও, প্রয়োজন না'ই থাক্— পাঠক পাঠিকার অপঠিত নয় রাজা অরূপরতন এ তো মেনে নিতেই হবে— তবু মূল ঘটনাধারার আমরা আনুপূর্বিক অনুসরণ করলেম। প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠে কী প্রভেদ, কেন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'খাতায় যেমনটি লিখিয়াছিলাম তাহার কতকটা কাটিয়া ছাঁটিয়া বদল করিয়া' ছাপায় 'হয়তো কিছু ক্ষতি হইয়া থাকিবে'— তারও সাধ্যমত আলোচনা করা গেল।

অরূপরতনের প্রথম প্রকাশ -কালে রবীন্দ্রনাথ বলেন— 'সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল।··· অন্তরের নিভৃত কক্ষে··· তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না; নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ কথা

মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারি দিকে আগুন লাগিল… দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল… হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গ লাভ করিল, যে প্রভু কোনো বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই; যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়— এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই নাট্যরূপকটি "রাজা" নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ… পুনর্লিখিত।'

সংক্ষিপ্ত করার যে ঝোঁকে প্রথম হতে দ্বিতীয় পাঠের উদ্ভব, বলা যায়, অরূপরতন (১৯২৬) তারই বিশেষ পরিণতি। তখনও প্রথম পাঠ-প্রচারের কল্পনা মনে আসে নি। আশ্চর্যের বিষয় মনে হতে পারে রাজা এ নাটকে নেই, তাঁকে চোখে যেমন দেখা যায় না তাঁর স্বরও শোনা যায় না— অথচ তিনি সব সময় সর্বত্রই আছেন এ কথাও সত্য। রাজা 'না থাকায়' অন্ধকার ঘরের দৃশ্য আদি-অন্তে কিম্বা মধ্যেও নেই। 'চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো / ধনের বাটে, মানের বাটে, রূপের হাটে দলে দলে গো'— গানের দলের এই গানেই নাটকের সার্থক প্রস্তাবনা, 'আমি আমার রাজাকে চোখে দেখতে চাই' সুদর্শনার এই অন্ধ আবেগে তার সূচনা, 'ঐ সূর্য উঠল… আজ আমার অন্ধকারের দ্বার খুলেচে' এই আন্তরিক প্রত্যয়ে তার শেষ, আর গানের সুরের অনিঃশেষ ব্যঞ্জনা: 'অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে'। গান আছে এই নাটকে উনচল্লিশটি,[৩২] এজন্য গানের দল, বাউলের দল, বালকের দল আর পাগলের প্রয়োজন আর ঠাকুরদাও অবশ্যই গানে গানে উচ্ছল। আশ্চর্য এই যে, গীতমূর্তিমতী সুরঙ্গমার কণ্ঠে একটি গানই শুনি— 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।'[৩৩]

সংক্ষিপ্ত হয়েছে কিনা গজ-ফিতেয় না মেপেই বলা যায় সংহত হয় নি এই নাট্যরূপ, হয়তো সাধারণভাবে অভিনয়যোগ্যও হয় নি। বস্তুতঃ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মিথ্যা বলেন নি— 'কবিতা গল্প উপন্যাসের লেখক সম্পূর্ণ নিজের মতো করে লিখতে পারেন।… কিন্তু নাটকের বেলা লেখকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে না। কাদের নিয়ে নাটক করানো হবে,… দেখবে কারা… ভেবে দেখতে হয়। প্রযোজনার নানা সুবিধা অসুবিধা বিচার করে নাটক করতে হয়।'[৩৪]

তা হলে আমাদের জানা দরকার অরূপরতনের এই রূপটির কী উপলক্ষে আর কেমনভাবে উদ্ভব এবং প্রযোজনা। রবীন্দ্রসংগীত গ্রন্থে যতদূর জানা যায়— '১৩৩১ সালে কোলকাতায় ১৩২৬ সালের অরূপরতন অবলম্বন করে একটি মূকাভিনয় করা হয়।… বিদ্যালয়ের মেয়েরাই অংশগ্রহণ করেন। পিছন থেকে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে গান গেয়ে ছিলেন। কিন্তু গান অনেক কমে যায়, গুরুদেব কেবল আবৃত্তি করে ছিলেন।'[৩৫] অপিচ রবীন্দ্রজীবনীকার বলেন— 'কবি তখন সুররাজ্যের মধ্যে বাস করিতেছেন,… গানগুলি মূকাভিনয়ে রূপ দেওয়া হয়। এই অভিনয়ের দেহভঙ্গিতে কোথাও কোথাও একটু নাচের আমেজ দেখা না গিয়াছিল তা নয়।… কাঠিয়াবাড়ের ও গুজরাটের লোকনৃত্যের স্পর্শ তাহাতে ছিল'[৩৬] এবং 'ছিল একটুখানি 'ভাও বাৎলানো' নৃত্যপদ্ধতি।'[৩৭]

তথ্যগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গানে জোয়ার এসেছে যেমন স্বতউদ্‌বেল অন্তরের আবেগ থেকে, নৃত্যে গানে আবৃত্তিতে নূতন রসরূপসৃষ্টির নানা পরীক্ষাও করে দেখছেন কবি (প্রযোজনায় গানের সংখ্যা কিন্তু কমাতে হয়েছে), সুতরাং অভিনেতব্য সাধারণ নাটক তো নয়ই, এমন-কি শারদোৎসব

ডাকঘর অচলায়তন ফাল্গুনীও যতটা চরিত্র ও ঘটনাঘাত -ময় তাও নয়— বিশেষ ক'রেই ভাব ভাষা ও সুরের ইন্দ্রজাল, নৃত্যের ছন্দে ছন্দে অপরূপ বা অরূপ'কেই রূপ দিতে উৎসুক। অভিনয়গত এর সফলতা বিশেষ করে সেই সুর ও ছন্দের গুণেই। রঙ্গমঞ্চে উৎসবপতি কবির প্রত্যক্ষ উপস্থিতিও কিছু সামান্য ঘটনা নয় আর সামাজিকগণও বিশিষ্ট। এই সব বিবেচনা করে আমাদের মনে হয় অরূপরতন (১৩২৬) হয়তো সাধারণভাবে অভিনেতব্য নাটক নয়, অথচ রীতিমত গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যও নয়— রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য তখনো কারণলোকে বা অপ্রকটিত কবিকল্পনায়।

বহুবিধ পাঠভেদ ও বিচিত্র পরিবর্তন সত্ত্বেও রাজা ও অরূপরতন বস্তুতঃ একই নাটক এ কথা মনে রাখা ভালো। কবির জীবনকালে রাজা-অরূপরতনের সর্বশেষ মুদ্রণে (অরূপরতন ১৩৪২) তৎপূর্ববর্তী মুদ্রণের (রাজা ১৩২৭) কিছুটা অনুস্মৃতি থাকা স্বাভাবিক— ঘটনাচক্রে শেষ পাঠ (চতুর্থ মুদ্রণ) প্রথমেরই (তৃতীয় মুদ্রণ) কাছাকাছি এসেছে, অথচ যথাসম্ভব সংক্ষেপীকৃত ও সংহত হয়েছে। কতখানি সংক্ষিপ্ত ও সংহত এতেই কতকটা বোঝা যাবে— যে ক্ষেত্রে রাজার উভয় পাঠেই কুড়িটি দৃশ্য ছিল, এ ক্ষেত্রে (তেমনি ১৩২৬ সনের অরূপরতনে) ছয়টির বেশি নয়। পাত্রপাত্রী ও ঘটনা -সংস্থানের দিক দিয়ে প্রথম পাঠের অনুস্মৃতি এই দেখা যায়— অরূপরতনের প্রথম মুদ্রণে সাক্ষাৎভাবে রাজার উপস্থিতি জানা যায় না, রাজার প্রথম মুদ্রণে অন্ধকার ঘরেই নাটকের সূচনা হয় না, উৎসবক্ষেত্রে মেয়েদের উপস্থিতি দেখা যায় না, বর্তমানে প্রথম পাঠের অনুসরণে রাজা সাক্ষাৎভাবেই উপস্থিত, অন্ধকার ঘরের দৃশ্যে নাটকের সূচনা (প্রথমপ্রকাশিত অরূপরতনের গীতপ্রস্তাবনা অবশ্যই যথাস্থানে আছে), মেয়েরাও বসন্তোৎসবে যোগ দিয়েছে। পার্থক্য কি নেই? তাও আছে— নাটকের প্রথমে আর শেষে রাজা উপস্থিত থাকলেও মাঝের কোনো দৃশ্যে তাঁর আবির্ভাব ঘটে নি, রোহিণী চরিত্র বর্জিত আর মন্ত্রীসহ কান্যকুব্জরাজও 'পাদপ্রদীপের আলোয়' সামাজিকের সামনে আসেন নি। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। সংহতির উদ্দেশে এত সব পরিবর্তন করলেও, গানের সংখ্যাও কমিয়ে দিলে (প্রথম পাঠের তুলনায় বিশেষ কমে নি),[৩৮] নাটকের চরিত্রই বদলে যাবে এমন নয়। কিন্তু বিশেষ ও সূক্ষ্ম পরিবর্তন কিছু হয়েছে স্থান কালের অভিনব সংঘটনে আর সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা -চরিত্রের অভিব্যক্তিতে। সূক্ষ্ম বলেই হয়তো আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, আসল পার্থক্য কোথায় ঠিক বুঝতে পারি নে। আমাদের পক্ষে বুঝতে না পারার বিশেষ একটি হেতুও আছে— হয়তো রাজা বা অরূপরতনের যে রূপেই মনোনিবেশ করতে যাই অন্যান্য রূপও মনের নেপথ্যে জেগে থাকে, অদৃশ্যপ্রায় হলেও আমাদের ধ্যান-ধারণাকে প্রভাবিত করে। বস্তুতঃ কোনো একটি পাঠ বিচ্ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন -ভাবে গ্রহণ করা বড়ো কঠিন হয়ে পড়ে। সে যাই হোক, এই বিশেষ ও সূক্ষ্মপরিবর্তন কেমন করে ঘটল জানতে হলে, রাজা-অরূপরতনের অপ্রকাশিত অসম্পূর্ণ যে দুটি পাঠের কথা পূর্বে বলা হয়েছে সে দুটির বিশেষ আলোচনা অপরিহার্য। অপ্রকাশিত ঐ দুটি পাঠ প্রকাশিত হলে লেখকের বক্তব্য -অনুধাবনে পাঠকের অনেক সুবিধাই হয় সন্দেহ নেই, না হলেও চেষ্টা করে দেখতে দোষ নেই।

জাপানি খাতায় অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির ছিয়াশি পৃষ্ঠা আর ছাপাখানার কালিমালাঞ্ছিত বর্জিত ('Cancelled') একুশখানি পাতা, উভয়ই কবির নিজের হাতের লেখায়; যথাক্রমে এদের পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রণপ্রতি (প্রেসকপি) বলেই উল্লেখ করা হবে। পাণ্ডুলিপির বিশেষত্ব এইগুলি—

১ রাজাধিরাজ ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষচরিত্র দেখা যায় না। যিনি রাজার রাজা তিনি তো অদৃশ্যই, শুধু তাঁর কণ্ঠ শোনা যায়। বাণীমূর্তি তাঁর। বোধ করি রবীন্দ্রনাথ নটীর পূজার মতো আর একখানি নাটক রচনা করতে চেয়েছিলেন, যা সহজে শুধু মেয়েদের দিয়েই অভিনয় করানো চলে।

২ ঘটনাস্থল কান্যকুব্জ-রাজগৃহে আর সুদর্শনাও কুমারী কন্যা।

৩ সুরঙ্গমা কোথা থেকে এল কেউ জানে না আর সেও বলে না। রাজা তাকে কারাগারে পাঠিয়ে রাত্রে ঘুমোতে পারেন না, শৃঙ্খল পরে সে ভূষণের মতো —রাজমহিষীর মুখে বর্ণনাচ্ছলে এসব জানা যায়। মহিষী তাকে ভয় করেন আর ভক্তি না ক'রে পারেন না।

৪ রাজাধিরাজ প্রসঙ্গে কুমারী সুদর্শনাকে সুরঙ্গমাই আকৃষ্ট এবং উতলা করেছে। আবার এও বলেছে, 'কাঞ্চীরাজের মতো রাজার [বিবাহের] প্রস্তাব তোমার মতো রাজকন্যারই যোগ্য।' কেননা সবার যিনি শ্রেষ্ঠ, যিনি অতুলনীয়, তাঁকে পাওয়ায় গৌরব আছে বটে, কিন্তু কেউ জানবে না, কোনো সমারোহই হবে না ; ঘোষণা মানেই আত্মঘোষণা— তাতেই অপমান। সুদর্শনা বলেন— 'তবে কোথায় আমায় যেতে হবে ?'

'কোথাও না এইখানেই।'

'কখন সময় আসবে' তারও উত্তর— 'তুমি যখনই চাইবে।'

বুঝতে বাকি থাকে না সুদর্শনার রাজা আছেন সব সময় সবখানেই। তাঁর আলাদা কোনো রাজ্য নেই, হৃদয়ের অন্ধকার ঘরে আছেন। যে আলোয় তাঁকে দেখা যাবে আপনি জ্বলে ওঠে নি ব'লেই তাঁকে দেখা হয় না।

৫ রাজমহিষীর পার্শ্বচারিণী রোহিণী, হিসাবী বুদ্ধি তার, সুরঙ্গমার বিপরীত। সুরঙ্গমার প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ তার প্রচুর।

৬ কাঞ্চীরাজ শৌর্যশালী রাজা, দূতী পাঠিয়েছেন সুদর্শনার পাণি প্রার্থনা ক'রে। সুবর্ণ তাঁর পার্শ্বচর বিদূষক, তাকে রাজাধিরাজ সাজিয়ে তাঁর ছলনা আর সুদর্শনা-হরণের মন্ত্রণা —এসব পাঁচজনের মুখে মুখে জানা গেল।

৭ সুবর্ণকে চেনে সুরঙ্গমা। অথচ 'রাজাধিরাজ'-জ্ঞানে তাকেই মালা পাঠালেন সুদর্শনা। ভুল ধরা পড়তেই এল আত্মধিক্কার। আগুন লাগল প্রাসাদে। রাজকন্যা সেই জ্বলন্ত পুরীতে প্রবেশ করলেন।

৮ 'অন্ধকার হয়ে গেল'। সুদর্শনাকে রক্ষা করেছেন রাজার রাজা, আশ্বাস দিচ্ছেন ভয় নেই।— 'ভয় নেই কিন্তু লজ্জা! সে যে আগুন হয়ে আমাকে ঘিরে রইল।··· আমি অশুচি, তোমার কাছে থাকলে আত্মগ্লানি আমাকে অস্থির করবে।' সুদর্শনা তাই পালাতে চান। কোথায় পালাবেন সর্বময় রাজার অধিকার ছেড়ে? থাকতেও চান— 'কেশের গুচ্ছ ধরে আমাকে টেনে রেখে দাও-না। আমাকে মারো, মারো আমাকে।··· রাখলে না! আমাকে বাঁধলে না! আমি চল্লুম।' তৎক্ষণাৎ ফিরে আসেন— 'রাজা! রাজা!' সুরঙ্গমা বলে তিনি চলে গেছেন।— 'চলে গেলেন ? আচ্ছা বেশ! তা হলে আমাকে ছেড়েই দিলেন! আমি ফিরে এলুম। তিনি অপেক্ষা করলেন না! ভালোই হল! আমি মুক্ত। সুরঙ্গমা, আমাকে ধরে রাখবার জন্যে তিনি তোমাকে কিছু বলেচেন ?'

'না, কিছুই বলেন নি।'

'আচ্ছা, ভালো, আমি মুক্ত।'

'কী করতে চাও তুমি?'

'এখন কিছুই জিজ্ঞাসা কোরো না— কিছুই ভেবে পাচ্ছি নে।' /

পাণ্ডুলিপিতে এর বেশি পাওয়া যায় না। পাণ্ডুলিপি আর মুদ্রণপ্রতি যতটা পাওয়া যায় উভয়ের মধ্যে এইসব মিল আর অমিল—

১ ঠাকুরদা, প্রতিহারী, কান্তিকরাজ (কান্যকুব্জ), এই পুরুষচরিত্রগুলি প্রেসকপির পাঠে প্রত্যক্ষ।

২ পূর্বের মতোই ঘটনাস্থল কান্যকুব্জ, সুদর্শনা কুমারী আর রোহিণী-সহ রাজমহিষীর ভূমিকাও থেকে গেছে।

৩ সুরঙ্গমা চরিত্র যতটা মুখ্য হয়ে উঠছিল পূর্বপাঠে, সেটা কিছু পরিমাণে কমানো হয়েছে।

৪ কাঞ্চীরাজের প্রস্তাব সুদর্শনা প্রত্যাখ্যান করলে রাজমহিষী ভয় পেলেন, কিন্তু কান্তিকরাজ কন্যাকে বাধ্য করতে চাইলেন না— মরণপণ করে যুদ্ধে গেলেন।

খণ্ডিত মুদ্রণপ্রতির আবিষ্কৃত প্রথমাংশে এই তো দেখা যায়। অনাবিষ্কৃত অবশিষ্টাংশে কী ছিল বলবার উপায় নেই, কতটা তার কিভাবে মুদ্রিত গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়েছে (অথবা হয় নি) সে জল্পনা-কল্পনা নিরর্থক। পাণ্ডুলিপি অথবা প্রেসকপির সঙ্গে উত্তরকালীন কিম্বা প্রায়-সমকালীন অরূপরতনের মিল কতটা আর কতখানি অমিল সেটাই বিশেষ দ্রষ্টব্য—

১ বাংলা ১৩৪২ সনের অরূপরতনে প্রথম দৃশ্যটি প্রায় যথাযথ প্রেসকপি থেকে নেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে পাণ্ডুলিপির প্রথম ও তৃতীয় দৃশ্য মিলিয়ে, কিছু অংশ ত্যাগ ক'রে, মুদ্রণপ্রতির এই প্রথমাংশ।

২ পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষাংশ নিয়ে— যাতে রাজবাড়ির মেয়েরা, সুনন্দা, কমলিকা, সুরোচনা, বসন্তোৎসবে আমন্ত্রণ করছে রাজমহিষীকে— মুদ্রণপ্রতির দ্বিতীয় অংশ, গ্রন্থে বর্জিত হয়েছে।

৩ গ্রন্থের দ্বিতীয় দৃশ্যে 'আজি দখিনদুয়ার খোলা' গানের পূর্বেই মেয়ের দলের মধ্যে ঠাকুরদা, এটুকুই মুদ্রণপ্রতির তৃতীয় অংশ বলা যায় আর পাণ্ডুলিপিরও চতুর্থ দৃশ্যের একাংশ। প্রভেদ এই যে, পাণ্ডুলিপিতে ঠাকুরদার স্থান নিয়েছিল সুরঙ্গমা।

৪ পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রণপ্রতির রাজমহিষী ও রোহিণী চরিত্র, মুদ্রণপ্রতির কান্তিকরাজ চরিত্র, পূর্বেই বলা হয়েছে গ্রন্থে এগুলি বর্জিত। রাজমহিষী বা রোহিণীর কোনো প্রসঙ্গই নেই, আর নাটকে সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত হন না কান্যকুব্জরাজ।

৫ খণ্ডিত মুদ্রণলিপিতে দৃশ্যবিভাগ পরিষ্কার ক'রে দেখানো হয় নি। অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিতেও 'প্রথম দৃশ্য' (পৃ ১১-২৮) শুধু পাওয়া যায়, আর-সব অনুমানসাপেক্ষ— রাজমহিষী ও রোহিণীকে নিয়ে দ্বিতীয় দৃশ্য (পৃ ১-১১ ও ২৯-৪৮), 'ধীরে ধীরে আলো নিবে গিয়ে' সুদর্শনা সুরঙ্গমা ও রাজাকে নিয়ে তৃতীয় দৃশ্য (পৃ ৪৯-৫৪), উৎসবক্ষেত্রে সুদর্শনা সুরঙ্গমা রোহিণী এবং আরো অনেককে নিয়ে চতুর্থ দৃশ্য ('ওগো শুনচ? রাস্তা কোন্ দিকে' ইত্যাদি পৃ ৫৫-৮০), শেষ কয়টি পৃষ্ঠায় (পৃ ৮০-৮৫) 'অন্ধকার হয়ে গেল'— এর বিষয়বস্তু তো পূর্বেই আলোচিত। পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রণপ্রতির সমুদয় দৃশ্যই

কান্যকুব্জে, কুমারী সুদর্শনার পিতৃরাজ্যে। প্রশ্ন এই যে, পরিবর্তিত অরূপরতনে কোথায় ঘটছে ঘটনাগুলি ? মোট ছয়টি দৃশ্যের কোনোটিই যে কান্যকুব্জরাজপুরীর বাইরে বা কান্যকুব্জের সীমানা পেরিয়ে বহু দূরে —এমন মনে হয় না।

৬ সর্বোপরি সুদর্শনাও কুমারী কন্যার রূপেই প্রথম দেখা দিয়েছেন এই গ্রন্থে। বিষয়টি বিস্তারিত অলোচনার অপেক্ষা রাখে। 'রাজকন্যা সুদর্শনা যে তোমাকেই বরণ করতে চায়' প্রায় এই কথাতেই নাটকের সূচনা। কিছু পরে—'ঐ আসছেন রাজকুমারী সুদর্শনা'। দ্বিতীয় দৃশ্যে কাঞ্চীরাজ বিক্রমবাহু 'কান্তিক-রাজকন্যা' বলেই সুদর্শনার উল্লেখ করছেন, পুনশ্চ 'রাজকুমারী সুদর্শনাকে দেখতে চাই'— তদুত্তরে সুবর্ণও বলে 'রাজকুমারীর পিতা-মহারাজের কাছে দূত পাঠিয়ে কন্যাকে যথারীতি প্রার্থনা করুন-না'। পূর্ব পূর্ব গ্রন্থে ছিল রানী সুদর্শনাকে দেখবার জন্য রাজাদের লুব্ধ আকাঙ্ক্ষা ও ষড়যন্ত্র ; তিনি পতিকুল ত্যাগ করে পিতৃগৃহে গেলে বিক্রমবাহু ও অন্যান্য রাজাদের কান্তিকনগর বা কান্যকুব্জ রাজ্য-আক্রমণ, এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু হয় নি— কেবল ভণ্ডরাজ সুবর্ণকে নিয়ে মন্ত্রণা হচ্ছে করভোদ্যানে আগুন লাগাবার। করভোদ্যান কান্যকুব্জেও হতে পারে। ঠিক পরের দৃশ্যে সুদর্শনা বলছেন— 'আমি হব রানী। ঐ তো আমার রাজাই বটে।' এই দৃশ্যেই সুদর্শনার আহ্বানে প্রতিহারীও বলছে— 'কী রাজকুমারী ?' পরবর্তী চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের প্রথমেই নাগরিকদলের প্রস্থানের পরে সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার প্রবেশ, কেবল এখানেই দেখি সুরঙ্গমা বলছে— 'মা, যতক্ষণ না সেই রাজার ঘরে' ইত্যাদি। এটুকু পূর্ব পূর্ব মুদ্রণের অনুরূপ। অথচ এই দৃশ্যেই কান্তিকরাজ বন্দী হওয়ার খবর এলে সুরঙ্গমার মুখে আবার শুনি— 'কী রাজকুমারী !' পূর্বের মুদ্রণগুলিতে সুদর্শনাকে সবসময়েই সুরঙ্গমা 'মা, অথবা 'রানী মা' বলে সম্বোধন করেছে। ফলতঃ কুমারী সুদর্শনা কোন্ ক্ষণে রাজাধিরাজের রানী হয়ে উঠলেন অন্তরে অন্তরে —কোনো অনুষ্ঠানই তো হয় নি—এ নাটকে তা বলা হয় নি, হয়তো সেই অভাব বা অসংগতিটুকু আমাদের বুদ্ধিকেও পীড়া দেয়। (তীব্র দুঃখ দহনের কোন্ সুদুঃসহ প্রক্রিয়ায় অবশেষে রাজাধিরাজের যোগ্য হয়েছেন সুদর্শনা সে আমরা জানি।) পূর্বোক্ত দৃশ্যে আছে 'আমার আর হবে না দেরি' গানটির পূর্বে —'সেই আমার অন্ধকারের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন, হঠাৎ চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত, এও সেইরকম'। আর শেষ দৃশ্যে আছে— 'আমার প্রমোদবনে আমার রানীর ঘরে তোমায় দেখতে চেয়েছিলুম'। বলা যেতে পারে এ দুটি উক্তির কোনোটিরই সূক্ষ্ম হিসাব মিলত না রসিকের মনে, রাজা-অরূপরতনের অন্য রূপ এবং অন্য পাঠও যদি 'মগ্নমানসে' না জাগত তাঁর।[৩৯]

রাজাধিরাজের রাজ্য কোথায় পূর্বে জানা ছিল না আমাদের, এখন নিশ্চিত জানা গেল— সবখানেই। রাজকন্যাকে পিতৃরাজ্যের বাইরে তো যেতে হবে না। বিবাহ হল কবে ? পিতা তো দান করেন নি কন্যাকে, রাজকন্যা নিজেই জেনে না-জেনে কখন বরণ করেছেন রাজার রাজাকে। অগ্নিমণ্ডলের মধ্যেই দেখেছেন দুর্দর্শ রূপ, তার পর সেই 'কালো' কখন্ আলো হয়ে উঠেছে অন্তরের অন্তরে ; দুঃখ পাপতাপ অভিমান আত্মগ্লানি সবই অলক্ষ্যে ঘুচে গেছে, মুছে গেছে।[৪০]

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে আর-একটুকু বলা দরকার। খাতাখানি হারিয়ে গিয়েছিল বলেই রচনা সম্পূর্ণ হয় নি এমন নয়। বস্তুতঃ রচনা সম্পূর্ণ হতে চায় নি ব'লেই কবি ঐ খাতাখানি শ্রীমতী মীরা দেবীকে দিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ হয় নি বা হতে চায় নি কেন ?—

১ বহুদিনের রচনা, বহুবার অভিনয়ও হয়েছে, তাতে এতখানি পরিবর্তন চলে না যা তার মূল চরিত্রই বদ্‌লিয়ে দেয়।

২ খাতাখানি ছাপা হলে দেখা যাবে— সুরঙ্গমা চরিত্র কতটা প্রধান হয়ে উঠছিল, আর নটীর পূজার শ্রীমতীর ছায়াপাতও হয়েছিল কখন্ অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে— ধনঞ্জয়বৈরাগীর সজাতীয়া, ভগিনী বা দুহিতা বলে মনে হয় নি এমন নয়— এ ব্যাপারটি এক সময়ে কবির কাছেও ধরা পড়ে আর অবাঞ্ছিত মনে হয়। সুদর্শনাই এ নাটকের নায়িকা, সুরঙ্গমাকে নায়িকার থেকে মুখ্য করে তুললে তো চলে না।

৩ সমস্ত পুরুষ চরিত্র বাদ দিতে গিয়ে (রাজাধিরাজের কথা স্বতন্ত্র) যে মানসিক কসরতের প্রয়োজন হয়েছিল, তাতে কিছু কি কৃত্রিমতা এসে যায় নি? প্রতিভা অঘটনঘটনপটিয়সী হলেও, সর্ব অবস্থায় সমান স্বাচ্ছন্দ্য থাকতে পারে না। বিশেষ দৃষ্টান্ত মনে আসে— 'চটি বিসর্জন' একখানি খাড়া করে দেন কবি (শুনতে পাই) সমুদয় নারী চরিত্র বাদ দিয়ে, তাতে লাভ হয়েছে কী?

৪ পাণ্ডুলিপিতে রাজমহিষী চরিত্র আর তাঁকে ঘিরে অন্যান্য নাটকীয় ব্যাপার, তেমনি প্রেসকপিতে কান্যকুব্জরাজ ও রাজমহিষী, শেষ পর্যন্ত প্রসঙ্গের পক্ষে অনাবশ্যক ও অতিরিক্ত মনে হয়েছিল। প্রথমে কমিয়ে দিয়েছেন, পরে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছেন। ঘটনার প্রবহমাণ ধারাকে যা বেগবান্ করে তোলে না, পৃথক্ রচনা হিসাবে যত সুন্দরই হোক, নাট্যকল্পনায় তাকে নির্মমভাবে ত্যাগ না করে উপায় কী?

শেষ পর্যন্ত নাটক হিসাবে (রূপকনাট্য বা গীতিনাট্য হিসাবে নয়) রাজা-অরূপরতনের প্রথম ও শেষ এই দুটি পাঠই বিশেষ আদরণীয় মনে হয়, তার মধ্যেও কোন্‌টিকে বেছে নেব সে বিচার নির্ভর করবে কোন্ নাটকে— রাজা (১৩২৭) বা অরূপরতন (১৩৪২) কোন্ গ্রন্থে— সুদর্শনা চরিত্র সব থেকে উজ্জ্বল হয়ে, বাস্তব হয়ে, সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে, তারই নির্ণয়ে। কবির কথার প্রতিধ্বনি করে পুনর্বার বলি —সুদর্শনা 'সিম্বল' অথবা 'অ্যালেগরি' নয়, টাইপ নয়, সব-নারী হয়েও বিশিষ্ট এক নারী, যেমন কুমু, সুচরিতা, বিমলা অথবা দামিনী।

'অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে এক সময়ে মন··· প্রবেশ করলে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল··· সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে··· নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারই প্রথম প্রয়াস দেখা দিল 'বউঠাকুরানীর হাট' গল্পে— একটা রোম্যান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারে, সেও অল্প বয়সেরই খেলা। চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের ধর্ম প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি।' —পরিণত বয়সে এই কথাতে কবি বউঠাকুরানীর হাট বইখানি লেখার ইতিবৃত্ত দিয়েছেন আর যে মূল্য নির্দেশ করেছেন তাতেও কিছুমাত্র পক্ষপাত দেখা যায় না, বরং তার বিপরীত। বাংলা ১২৮৮-৮৯ সনে এ রচনা ধারাবদ্ধভাবে যখন ভারতীতে প্রকাশ পাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন কুড়ি-একুশ আর বাংলা গদ্যসাহিত্যেরও বয়স বেশি নয়। বঙ্কিমের অধিকাংশ গল্প উপন্যাস প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিম আর তৎকালীন অন্য গল্পলেখক বা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রতিভার ব্যবধান দুস্তর। সে হিসাবে তরুণ রবীন্দ্রনাথের এই নূতন উদ্যমের প্রশংসনীয়তা অল্প নয়। আর, অযাচিতভাবে একখানি চিঠি লিখে বঙ্কিমচন্দ্রই সে প্রশংসা করেছিলেন, অনুজ সাহিত্যিককে

অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বলা যায়— তাঁর মধ্যে মহৎ ও বৃহৎ সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন। বউঠাকুরানীর হাটে বঙ্কিমের প্রভাব তো আছেই প্লট-আশ্রিত গল্প বলার কৌশলে আর চরিত্রচিত্রণেও,[৪১] তার বিস্তারিত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে। নূতন প্রতিভার চমৎকারজনক স্বাক্ষরও আছে, কবিত্ব কল্পনা ও চিত্রাঙ্কনের বহু চারুতা ও সূক্ষ্মতা। বঙ্কিমের পরে ভাব-ভাষার এতখানি শ্রী ও সৌষ্ঠব সেদিন আর-কারও লেখনীতেই এমনভাবে ফুটে ওঠে নি। সে কথা যাক্। বউঠাকুরানীর হাট গল্পের প্লট আর 'সজীব পুতুল' ব'লে উনোক্তি করা হয়েছে যাদের নিয়ে সেই-সব চরিত্র, কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে প্রায়শ্চিত্ত নাটকে সেটুকুই আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়। প্রায়শ্চিত্ত-পরিত্রাণেরও পরিণতি কোন্ দিকে সে আলোচনা পরে।

বউঠাকুরানীর হাট যে নাটকে পরিণত হল তার নানা কারণই ছিল। ঘটনা ও চরিত্রের বৈচিত্র্যে ও ঘাত প্রতিঘাতে নাটক হয়ে থাকে। সেই গুণ বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিতে নেই কি? দুঃখের বিষয় তিনি নাটক লেখেন নি; অন্যে তাঁর গল্পগুলি নাটকে পরিবর্তিত করে মঞ্চস্থ করেছিলেন যেমন স্বাভাবিক আকর্ষণে তেমনি একান্ত প্রয়োজনেও বটে। যথাকালে বউঠাকুরানীর হাটেও তাঁদের মুগ্ধ দৃষ্টি পড়েছিল এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। জানা যায় খ্যাতিমান অভিনেতা 'রাধারমণ করের আগ্রহে ও দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মতিতে কেদারনাথ চৌধুরী' 'রাজা বসন্ত রায় নাম দিয়ে এই গল্পের এক নাট্যরূপ প্রণয়ন' করেন— ঠিক কোন্ সময়ে জানা না গেলেও ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[৪২] কেননা ঐ সময়ে উপন্যাসখানির যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় তার আখ্যাপত্রে উপন্যাসের নামের সঙ্গেই ছাপা হয়েছে— (রাজা বসন্ত রায়)। / উপন্যাস। / বস্তুতঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' (১৯৪৫) গ্রন্থেও বলছেন— ৩ জুলাই ১৮৮৬ তারিখে 'ন্যাসনাল' রঙ্গমঞ্চে 'রাজা বসন্ত রায়'এর অভিনয় এবং ৬ এপ্রিল ১৯০১ তারিখে 'মিনার্ভা'য় তার পুনরভিনয় হয়েছিল। অবশ্য, অন্যান্য রঙ্গমঞ্চে অন্য সময়ে অভিনয় হয় নি তা নয়; বিশেষ সাফল্যে অভিনীত হয়েছিল সেও তো নিশ্চিত। কেননা, ১৩০২ জ্যৈষ্ঠের 'অনুশীলন ও পুরোহিত' মাসিক পত্রে লেখা হয়— 'এমারেল্ডে··· 'রাজা বসন্ত রায়ের' অভিনয় বরাবর উত্তমই হইয়া থাকে। বসন্ত রায়, উদয় সিংহ, সুরমা, বিভা ইত্যাদি প্রধান প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অংশ সুচারুরূপে সমাহিত হইয়া থাকে। বসন্ত রায়ের অভিনয় সর্ব্বোত্তম।··· বহু পূর্ব্বের অভিনেতা [মাধুকর বা] রাধামাধব করের অভিনয় যাঁহারা অবলোকন করিয়াছেন [যেমন অক্ষয়চন্দ্র সরকার] তাঁহাদের ইহা তেমন ভালো লাগে না।··· আমরা সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা রাধামাধব বাবুর বসন্ত রায়ের অভিনয় দর্শনে বঞ্চিত।··· ইহার··· অভিনয় দেখিয়াই সুখ পাইয়াছি।' ইত্যাদি। কাজেই ১২৯৩ আষাঢ় থেকে ১৩০৭ চৈত্র অবধি ন্যূনাধিক পনেরো বৎসরও যদি মাঝে মাঝে অভিনয় হয়ে থাকে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে আর অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মতো বিশিষ্ট সজ্জনও বারবার দেখতে এসে থাকেন, তবে এ নাটক যে লোকপ্রিয় হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। হাস্য করুণ মধুর রস, অপ্রত্যাশিত বা চমৎকারজনক ঘটনা, সুমধুর সংগীত ও সুন্দর সাজসজ্জা— লোকপ্রিয় হবার উপকরণ যথেষ্টই ছিল। কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী শেষ বয়সে স্মরণ করেছেন— 'বাইরে নাটক দেখতে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না; কেবল একবার স্টার থিয়েটারে রাজা বসন্ত রায়··· দেখতে গিয়ে বুড়ো বসন্ত রায়ের গান ও অভিনয়ে খুব কেঁদেছিলুম মনে পড়ে।'[৪৩]

মনে হয় রাজা বসন্ত রায় নাটকে বসন্তরায় চরিত্রই প্রাধান্য পেয়ে থাকবে। কবি-কৃত প্রায়শ্চিত্ত নাটকেও বিশেষ ন্যূনতা ঘটে নি, তবে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে এর একটি সার্থক জুড়ি মিলেছে।[৪৪] রাজকুলে জন্মলাভ সত্ত্বেও বসন্তরায়ের যে স্বাভাবিক পরিণতি, স্বভাবে যেমন তেমনি সচেতন সাধনাতেও ধনঞ্জয়ে তারই পরিপূর্ণ বিকাশ। ধনঞ্জয়ই প্রায়শ্চিত্ত নাটকে নূতন সৃষ্টি।

যা হোক, কেদারনাথ চৌধুরী 'রাজা বসন্ত রায়' নাট্যরূপটি রচনা করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র 'দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মতিতে' এ কথার অর্থ কবিরও অসম্মতি ছিল না, তবে সহযোগিতা কতটা জানা যায় না। কেবল 'মুখের হাসি চাপলে কী হয়'[৪৫] রাজা বসন্ত রায়ের এই গানটি উত্তর কালে (১৩১২ জ্যৈষ্ঠে) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের নামেই প্রচারিত; বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসে বা কবির অন্য কোনো গ্রন্থে ছিল না; অতএব নূতন নাটকের জন্য নূতন রচনা সন্দেহ নেই। অথচ এটি যে রবীন্দ্র-রচনা নয় সে বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হয়েছে। সে যাই হোক, বক্ষ্যমান গল্পে নাট্যবস্তু যথেষ্ট আছে, পেশাদার 'থিয়েটারি' লেখকের চেষ্টাতেই নাট্যীকৃত হয়ে তার সমাদরের অভাব হয় নি, ফলে কোনো এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের আধারেই নূতন একটি নাটক লিখতে উৎসাহিত হয়ে উঠবেন এ তো স্বাভাবিক। অন্যের সীমিত কল্পনায় বা মর্মজ্ঞতায় অথবা নৈপুণ্যে যে সার্থক রূপান্তরের আশা করা যায় না, কবিপ্রতিভার বিশেষ অভিনিবেশে ও যত্নে সেটি তো নিশ্চিত সিদ্ধ হতে পারে।

তবু, ১২৮৮-৮৯ সনে গল্পের ধারাবাহিক প্রকাশ আর ১৩১৫ বঙ্গাব্দে প্রায়শ্চিত্তের রচনা (১৩১৬ বৈশাখে প্রকাশ), মধ্যে দুই যুগেরও বেশি ব্যবধান। এ সময়ে রবীন্দ্রপ্রতিভা পূর্ণ পরিণত। নাটক-রচনার বিশেষ কী উপলক্ষ ঘটেছিল কোথাও তার ঘোষণা নেই, অথচ এ নাটকে বউঠাকুরানীর হাট গল্পের অতিরিক্ত নূতন যে উপাদান আছে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও তাঁর দলবল নিয়ে, তাতে অবশ্যই মনে হয় এসময় দেশ ব্যেপে যে আবেগ-উত্তেজনার আবহাওয়া ছিল, দেশপ্রেম গুপ্তহত্যাকেও উপায় বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করে নি, অন্তরে অন্তরে গৌরবই বোধ করেছিল, তারই প্রতিবাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য তাঁর ছিল। আর, এই সময়েই দূর সিন্ধুপারে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের নূতন প্রয়োগ শুরু করেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, 'সত্যের পরীক্ষা', তারও বার্তা বৈরাগীর বাণীতে বিঘোষিত। রবীন্দ্রনাথ দেশের লোকের বিরাগভাজন হয়েও নানা প্রবন্ধে যে কথা বলতে চেয়েছিলেন স্পষ্ট ভাষায়, নাটকেও একরূপ তাই বলা হয়েছে। উগ্র স্বাদেশিকতা তাঁর কোনোদিনই ছিল না, রাজনীতিতে উদার মানবিক নীতির কোনো বালাই নেই আর ক্ষেম প্রেমের শাশ্বত ধর্ম অনায়াসেই লঙ্ঘন করা চলে, এমন কখনো মনে করেন নি। তৎকালীন নানা ঘটনায় তিনি বরং মর্মাহত হয়েছিলেন— তরুণ বয়সেও প্রতাপাদিত্য তাঁর 'হিরো' ছিলেন না, 'যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য'র সুরে সুর মেলানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল —সম্ভবতঃ ১৩১৫ বঙ্গাব্দে তাই এ নাটকের কল্পনা।[৪৬] এটি দুই যুগ আগে লেখা উপন্যাসের অনুবৃত্তি যেমন, তেমনি সম্পূর্ণ নূতন।[৪৭]

হিংসা দ্বেষ বলদর্প বিষয়বাসনা এগুলি দুর্বুদ্ধি আর দুর্বুদ্ধিই পাপ, অবুদ্ধি আর দুর্বলতাও পাপ —প্রতাপ ও রামচন্দ্রের এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন এঁদের আত্মজন প্রাণ দিয়ে কিম্বা মরণাধিক মর্মান্তিক দুঃখ সহ্য ক'রে। প্রতাপাদিত্যের বা রামচন্দ্রের প্রায়শ্চিত্ত কোথায় নাটকে তা দেখানো হয়

নি বটে, তবু 'কর্মফল' যদি সত্য হয় সেও কোনো কালে কোনো আকারে সুনিশ্চিত এমন মনে করা যেতে পারে। একের কর্মফলে অন্যে দুঃখ পায় কেন, চিরন্তন এ জীবনজিজ্ঞাসার কোনো জবাব হয়তো নেই। কিম্বা এ সংসারে 'আমরা যে কেউ একলা নই'[৪৮], বিচ্ছিন্ন নই, আর চরম দুঃখেরও পার আছে— সার্থকতা আছে— এইমাত্র বলা যায়। দুঃখেই দুঃখের শেষ নয়, যে প্রাণ খুলে বলতে পারে 'আমি / মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ে বায়ে / তোমার / ভয়ভাঙা এই নায়ে'[৪৯] সেই দুঃখের পারে গিয়ে অন্তরে স্থায়ী সুখ ও শান্তি লাভ করে এই তত্ত্ব সাকার হয়েছে ধনঞ্জয়বৈরাগীর জীবনে ও জীবনদর্শনে। (রাজা বসন্তরায়ও স্বভাবতই এই পথের পথিক)। এজন্যই এই নাটকে বৈরাগীর অবতারণা। নূতন এই বৈরাগীর বিশেষ ধর্ম নয় সংসারবিমুখ বৈরাগ্য, কিন্তু আপন প্রাণের-ঠাকুরের অনুরাগে সকল মানুষে আর সর্বভূতে অনাসক্ত অনুরাগ। ব্যক্তিবিশেষ, বসন্তরায় বা উদয়াদিত্য, স্বভাবতঃ যেরূপ আচরণ করেন, শিক্ষাদ্বারা সচেতন ভাবেই সব সময় তার প্রয়োগ হতে পারে সমষ্টিজীবনে— এ কারণেই মাধবপুরের বা শিবতরাইয়ের[৫০] সরল নিরভিমান প্রজাদেরও ডাক পড়েছে।

উপন্যাসের মতোই নাটকেও উদয়াদিত্য ও সুরমাকে নিয়ে গল্পের সূচনা। প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্যহত্যার জল্পনাকল্পনা, রমাই ভাঁড়ের অশালীন আচরণে জামাতার প্রতি তাঁর ক্রোধ, রামচন্দ্রের কোনো প্রকারে পলায়ন, 'ওষুধ' করার ফলে সুরমার মৃত্যু, রাজ্যলোভে উদয়াদিত্য বুঝি ষড়যন্ত্র করছেন এই ক্ষীণ সন্দেহে তাঁর কারাবরোধ, ভাইয়ের দুঃখের দিনে বিভার স্বামীগৃহে যেতে অস্বীকৃতি ও রামচন্দ্রের আক্রোশ, কারাগার থেকে উদয়াদিত্যকে উদ্ধার করে বসন্তরায়ের রায়গড়ে পলায়ন, প্রতাপ-কর্তৃক তাঁর প্রাণদণ্ডবিধান, রাজ্যত্যাগী মর্মাহত উদয়ের ভগিনীকে নিয়ে চন্দ্রদ্বীপ-যাত্রা, সেখানে সেদিন আর-এক বিবাহের আনন্দোৎসব, সংগীত ও দীপাবলি, সবশেষে নৌকার মুখ ফিরিয়ে উদয়াদিত্য বিভা রামমোহন ধনঞ্জয় সকলেরই হিন্দুর শিবস্থান মুক্তিতীর্থ বারানসী -অভিমুখে প্রয়াণ— মূলের এই গল্পধারার নাটকেও কোনো পরিবর্তন বা ব্যাঘাত উৎপাদন করা হয় নি। মাধবপুরের প্রজাদের নিয়ে বা একাকী ধনঞ্জয় এই নাটকের আদ্যন্তে গানে কথায় আচরণে কবির অভিনব বক্তব্যের মূল সুরটি ধরিয়ে দিচ্ছেন —সপ্রেমে স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ ক'রে দুঃখতরণের কী কৌশল, মুক্তির কোন্ পথ, তাই নির্দেশ করে চলেছেন। মুক্তিদাতা হরি, দয়াময় প্রেমময় ভগবান, কী বিচিত্র তাঁর লীলা। বৈরাগী বলেন—'কী আনন্দ! তোমার একি আনন্দ! ছাড় না, কিছুতেই ছাড় না। শ্বশুরবাড়ির রাস্তার ধারেও ডাকাতের মতো বসে আছ।' বিভাকে বলেন— 'দিদি, এই মাঝরাস্তায় আমাদের পাগল প্রভুর তলব পড়েছে!··· চল্ চল্! পা ফেলে চল্। খুশি হয়ে চল্! হাসতে হাসতে চল্! রাস্তা এমন পরিষ্কার করে দিয়েছে —আর ভয় কিসের!'

পাপের ফল যেমন দুঃখ, প্রায়শ্চিত্ত তেমনি স্বেচ্ছায় সানন্দে দুঃখবরণে, পরিণামে মুক্তি —এটুকুই বোধ করি প্রায়শ্চিত্ত নাটকের মর্মের কথা, নূতন সুর। বিভাকে দেখে মনে পড়ে আর-এক রাজকন্যার কথা যিনি গেয়ে উঠেছিলেন আনন্দে আবেগে—

মীরাকে প্রভু গিরিধরলাল
অওর ন কোঈ।

সানন্দে সচেতনভাবে সকলেই এ কথা বলতে পারে না সত্য, তবু বলতেই হয়। ভুল করলেও ভুলের সংশোধন অবশ্যই হয়। সে তো রানী সুদর্শনাতেও দেখেছি। সত্যলোকে আব বাস্তবলোকে কাহিনী আসলে একই।

বউঠাকুরানীর হাট গল্পে উদয়াদিত্য-সুরমার এক কাহিনী, বিভা-রামচন্দ্রের আর-এক কাহিনী, রাজা বসন্তরায়ের প্রতিহত স্নেহের দুঃখবেদনার কাহিনীও অপ্রধান নয়— এই ত্রিধারা বা দুই ধারাই একত্র বয়ে চলেছে। সুরমা আর বসন্তরায়ের মৃত্যুতে এক-একটি ধারা শেষ হয়ে, অবশেষে বিভার দুঃখকাহিনীই বাকি রয়েছে, চরম আশাভঙ্গে সেই ধারারও সমাপ্তি— সাগরসঙ্গমে মুক্তি যে, সে কথা জানা যায় না।

রুক্মিণী তথা মঙ্গলাকে নিয়ে উদয়াদিত্যের জীবনে ও গল্পের ধারায় হয়তো অনাবশ্যক জটিলতাই সৃষ্টি করা হয়েছিল, নাটকে সেটি একেবারে পরিহার করা হয়েছে সে ভালোই। রাজমহিষীর দাসী বিষ এনে দিয়েছে বটে কোন্ মঙ্গলা ডাইনির কাছ থেকে— নাম আছে, পরিচয় নেই।

গল্প যেমন ধীরে সুস্থে রসিয়ে এবং ফলিয়ে বলা চলে, বিশেষ মুহূর্তের দ্যোতক বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনাতেও ভয় বিষাদ ঔদাস্য আর শিহরণ জাগানো চলে, নাটকে তার সুযোগ নেই এ তো সুবিদিত। আকারে ইঙ্গিতে অল্প কথায় এমন-কি অর্ধোচ্চারিত শব্দে বা অসম্পূর্ণ বাক্যে অনেক সময় গূঢ় গভীর মনোভাব ব্যক্ত করতে হয়। গল্পের নাটকীয় সেই বিবর্তন মনোযোগী পাঠক পদে পদে লক্ষ্য করবেন, বিস্তারিত আলোচনার সম্ভাবনা বা প্রয়োজন নেই। গল্পের পরেই নাটকটি পড়তে গেলে আরও একটি উপলব্ধির স্বতই উদয় হবে— বিভা এবং উদয়াদিত্য দুজনেরই চরিত্রের বিশেষ পরিণতি হয়েছে, ব্যক্তিত্ব স্ফুটতর। এমন-কি স্বভাবনির্বোধ রামচন্দ্রেরও কিছুটা বয়স বেড়েছে। আরও অনেকের সম্বন্ধেই সে কথা বলা যায়। প্রত্যেকেই বিশেষ ব্যক্তি, সজীব পুতুল কেউই নয়। প্রতাপাদিত্য 'আদর্শ' চরিত্র না হলেও, উচ্চাভিলাষী অভিমানী ও বলদর্পী রাজা হিসাবে যথোচিত।

বিভার বিষাদকরুণ অপরিণামী জীবন নিয়ে মূল কাহিনীটি দ্বিধাবিভক্ত নয় এই নাটকে। অন্যান্য ঘটনা ও চরিত্র নানাভাবে তার সঙ্গে সুসম্বদ্ধ। নানাভাবে, অর্থাৎ এই ট্র্যাজেডির হেতু ও পরিণাম -রূপে কিম্বা পরিবেশরূপে।

প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণের অন্তর্বর্তীকালে মুক্তধারার রচনা, তার জাত আলাদা, আলোচনা পরে করাই সংগত হবে। প্রায়শ্চিত্তের পরিচ্ছন্ন পরিণত রূপ হল পরিত্রাণ। ১৩৩৪ সনের শারদীয়া বার্ষিক বসুমতীতে প্রচার। পূর্বতন রচনার রূপান্তর হলেও জাত্যন্তর হয় নি।

পরিত্রাণে তেইশটি দৃশ্য (এক অঙ্ক) বর্জিত বা দৃশ্যান্তরে সংবৃত, তাই প্রায়শ্চিত্ত নাটকের তুলনায় বহু-গুণে সংহত এ কথা চোখ বুজেই বলা যায়, কিন্তু বিশেষ পর্যালোচনারও বিষয়।[৫১]

পূর্বের মতো উদয়াদিত্য ও সুরমাকে নিয়ে এর প্রথম দৃশ্য নয়, ধনঞ্জয় ও মাধবপুরের প্রজাদের নিয়ে এর সূচনাটি নূতন পরিকল্পনা। এই রাজপথের দৃশ্যেই বসন্তরায় আর হত্যাব্যবসায়ী পাঠানের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎকার, প্রায়শ্চিত্ত নাটকের তৃতীয় দৃশ্য এই ভাবে পরিত্রাণের প্রথম দৃশ্যের অন্তর্গত আর বহুগুণে সংহত। প্রতাপাদিত্যের দুরভিসন্ধি অন্যের অগোচর এবং এ ক্ষেত্রে বিভারও তা জানবার অথবা জানাবার কারণ ঘটে নি। ঘটনাচক্রে মনিবের হুকুম তামিল করা অসম্ভব দেখে পাঠান নিজে থেকে সব স্বীকার করেছে, উদয়াদিত্যকে এ দৃশ্যে আনবার কোনো প্রয়োজন হয় নি। প্রায় সমধর্মী বসন্তরায় ও ধনঞ্জয়ের মিলনে

সূচনাতেই এ নাটকের মূল সুরটি ধরিয়ে দেওয়ার সুযোগ ঘটেছে। দ্বিতীয় দৃশ্যেই প্রায়শ্চিত্তের দ্বিতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যের ব্যাপার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনে সংহতভাবে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় দৃশ্যের অন্তর্গত যেমন প্রায়শ্চিত্তের প্রথম দৃশ্য, তেমনি 'আজ তোমারে দেখতে এলেম' গাইতে গাইতে বসন্তরায়ের প্রবেশে পঞ্চম দৃশ্যের পরিবর্তিত কিয়দংশ আর একাদশ দৃশ্যেরও পরিবর্তিত পরিবর্ধিত বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ। জামাতা রামচন্দ্রকে যশোরে আনার উদ্যোগপর্ব এ নাটকে নেই ; তাঁর সঙ্গে রমাই ভাঁড় এসে রাজমহিষীকে অনুচিত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে এবং বিভা রামমোহনকে ডেকে অন্তঃপুর থেকে তাকে বহিষ্কারও করেছে এই সংবাদ নিয়েই পরিত্রাণের তৃতীয় দৃশ্যের মাঝখানে হঠাৎ লজ্জিতা ভীতা বিভার প্রবেশ, উদয়াদিত্য ও সুরমার সঙ্গে পরামর্শ ও প্রস্থান, অধিকতর উত্তেজিত হয়ে পুনঃপ্রবেশ— কেননা নির্বোধ রামচন্দ্রের দল রমাইয়ের ধৃষ্টতার কাহিনী ইতিমধ্যে নিজেরাই প্রচার করেছে আর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কানেও উঠেছে।

প্রায়শ্চিত্তের আলোচনায় আমরা পূর্বেই বলেছি বউঠাকুরানীর হাটের বহু পাত্রপাত্রী 'পুতুলের ধর্ম' সম্পূর্ণ পরিহার করে জীবৎসত্তা আর স্ফুটতর ব্যক্তিত্ব নিয়ে ঐ নাটকে দেখা দিয়েছে, কালক্রমে সাহিত্যস্রষ্টার অজ্ঞাতসারেই যেন ধীরে ধীরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে উঠেছে। বর্তমান নাটকে আরও যে পরিবর্তন তা মূল চরিত্রের বিবর্তন বলা চলে, আরও বিস্ময়কর। পূর্বোক্ত দৃশ্যে বিষয়বস্তুর নূতন বিন্যাসের অবকাশে বিভার বাক্যে ও আচরণে তা সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ নির্বোধ স্বামীর অবিবেচনায় ও বিদূষকের স্থূল বেয়াদবিতে লজ্জিতা ও মর্মাহতা বিভা নিজে যথোচিত তার প্রতিবিধান করেছে রমাইকে বিদায় ক'রে। দ্বিতীয়তঃ কুলগরিমার বোধও তীব্র, এজন্যই প্রতাপাদিত্য যখন তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন জামাতার অপরাধের জন্য তার প্রাণদণ্ড দিলে সেটা কি অন্যায় হবে, বুক ফেটে গেলেও মুখ ফুটে তবু উচ্চারণ করল— 'না।' এই স্বল্পাক্ষর একটি কথায় তার কতটা দুঃখ বেদনা লজ্জা ও হতাশা আর আত্মনিগ্রহ তা নিঃশেষে বলা যায় না— দৃঢ়তাও। এই দৃশ্যেই দেখি প্রতাপাদিত্য জেদী অথচ অপদার্থ বলে পুত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছেন না, উপেক্ষার যোগ্যও নয় উদয়াদিত্য— প্রকারান্তরে শিক্ষা অথবা শাস্তি দেবার অভিপ্রায়ে জামাতা সম্পর্কে নির্মম দণ্ডাদেশ শুনিয়ে দিয়ে তাঁর উপরেই ভার দিলেন অন্তঃপুররক্ষার। উদয় বললেন— 'পাহারা দেবার লোক মহারাজের অনেক আছে, তাদের স্নেহ নেই··· তাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ··· আমার উপরে পাহারা দেবার ভার দেবেন না।' প্রতাপ বললেন— 'লোক থাকবে আমার, কিন্তু দায় থাকবে তোমার।' উদয় দৃঢ়ভাবে বললেন— 'আমি আমার স্নেহকে অতিক্রম করতে পারব না।' 'না পারো তো তারও জবাবদিহি আছে' বলে রুষ্ট প্রতাপ চলে গেলেন এবং দাদামশায়ের উদ্‌বেগে কান না দিয়ে উদয়াদিত্য রামচন্দ্রকে রক্ষার চেষ্টায় উদ্যোগী হলেন।

প্রায়শ্চিত্তের সপ্তম নবম ও ত্রয়োদশ দৃশ্য পরিত্রাণ নাটকে বর্জিত। সপ্তমে ছিল চন্দ্রদ্বীপে চাটুকারপরিবৃত রামচন্দ্ররায়ের 'রাজসভা' আর রমাইয়ের স্থূল ভাঁড়ামি— যতটা স্থূল করে লেখা আমাদের কবির পক্ষে সম্ভব। নবমে যশোর-প্রাসাদে বিভার কক্ষে রামমোহনের উপস্থিতি, মোহনের কণ্ঠে রাজমহিষীর আগমনী গান শোনা, বিভার সুখে বসন্তরায় আর সুরমার আনন্দকৌতুক। ত্রয়োদশে অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা— কিভাবে রামচন্দ্রকে রক্ষা করা যায়— ভীত রামচন্দ্র, ক্রন্দনমুখী বিভা, উতলা উদ্‌বিগ্ন বসন্তরায় আর উদয়াদিত্য, নির্ভীক রামমোহন সে'ই শেষে উপায় একটা উদ্ভাবন করেছিল। অনাবশ্যক অথবা অসংগত বোধ হওয়ায় পরিত্রাণে এসবই বর্জিত। এখন পরিত্রাণের এই তৃতীয় দৃশ্যে বিভাতেও যেমন দৃঢ়তা ও ধৈর্য দেখি, উদয়েরও তেমনি স্থিরবুদ্ধি ও নিশ্চিত

সংকল্প, পলায়নের উপায়- উদ্ভাবনে বা আয়োজনে নাটকের বেশি জায়গা জোড়ে নি— বস্তুতঃ দণ্ডাদেশ-ঘোষণার পূর্বেই উভয়ের নির্দেশে রামমোহনকে দিয়ে তার ব্যবস্থা এগিয়েছে। রামমোহন গেল যখন, তখনই বিভা ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে। বসন্তরায় বলেন— 'দিদি, ভয় করিস নে ভগবানের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বেঁচে থাকতে তোর ভয় নেই রে!'

'ভয় না, দাদামশায়, লজ্জা! ছি ছি কী লজ্জা!··· জন্মের মতো আমার যে মাথা হেঁট হয়ে গেল।··· অপরাধ করলে আমি নিজে মহারাজের কাছে মাপ চাইতে যেতুম।··· এ যে নীচতা। আমার মাপ চাইবার মুখ রইল না।'

কার্যকালে মাপ চায় নি সেও আমরা দেখেছি। অথচ স্বামী তার জীবনসর্বস্বই। কী ধাতুতে এই চরিত্রের গঠন তা কল্পনা করা যেতে পারে— হিন্দুঘরের যে মেয়ে শান্ত অশঙ্কিতচিত্তে স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতারোহণ করে, এ সেই মেয়েই।

প্রায়শ্চিত্তের দশম দ্বাদশ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ দৃশ্যের প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু পরিত্রাণের চতুর্থ দৃশ্যেই সংগৃহীত। স্থান যশোররাজের অন্তঃপুর। পুনঃ পুনঃ বিপদের সংকেত এসে রামচন্দ্রের নাচগানের আসর ভেঙে গেল। 'বাতিগুলো নিবে আসচে,' বাদকেরা ঢুলছে, 'গা ছম্ ছম্ করছে,' একটা না-জানা আতঙ্কের আবহাওয়া, নটীরা বলাবলি করছে 'আমাদের কয়েদ করলে নাকি'— রাজমহিষীও বুঝছেন না 'মোহন' কোথায় গেল, প্রহরীরা কোথায়, এ মহলে ও মহলে দরোজা বন্ধ কেন— এই অবস্থায় রামচন্দ্র কোনো রকমে পালিয়ে বাঁচলেন আর প্রতাপাদিত্যের উদ্যত রোষ গিয়ে পড়ল উদয়াদিত্য ও সুরমার উপর— এইখানেই চতুর্থ দৃশ্য বা প্রথম অঙ্ক শেষ হল।

আসন্ন বিপদের কালো পটভূমিতে অচিরস্থায়ী প্রমোদের সমুজ্জ্বল বর্ণাঢ্য চিত্র, এ থেকে উপস্থিত সামাজিকের চিত্তে যে বিশেষ উপলব্ধি ও শিহরন— পরিত্রাণে দৃশ্যসমাবেশের পরিবর্তনে তা অনায়াসে সিদ্ধ হয়েছে। প্রায়শ্চিত্তে তা ছিল না এবং দুটি দৃশ্যের স্থলে অনেকগুলি দৃশ্যই ছিল।

পরিত্রাণের পঞ্চম দৃশ্যে (দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে) মাধবপুরের পথে ধনঞ্জয় ও প্রজাদল। অভয়ের দ্বারা ভয় আর প্রেমের দ্বারা হিংসা জয় করতে হয়— 'অর্ধেক রাজত্ব প্রজার', রাজার উপরেও যে রাজা আছেন শেষ পর্যন্ত তাঁর দরবারে দীন দুর্বলের ন্যায়বিচারের আবেদন গিয়ে পৌছোয়— বৈরাগী এই কথা বোঝাতে চান তাঁর অনুগত ভক্তদের। উদয়াদিত্য তাদের হৃদয়ের রাজা, প্রতাপাদিত্যকে তারা মানবে না, অথচ সামনে এসে দাঁড়ালেই ভয়ে ভক্তিতে নত হয়— তখন রাজায় আর ফকিরে হয় বোঝাপড়া। প্রতাপ ঠিকমত বুঝতে পারেন না, ধনঞ্জয়কে কয়েদ করে উপস্থিত সংকটের সমাধান করতে চান। প্রায়শ্চিত্তের ষোড়শ দৃশ্যে যা আছে এখানেও তাই, তবে সূচনা থেকে উদয়াদিত্যের প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিবর্তনে মুক্তধারা থেকে গৃহীত। পঞ্চম দৃশ্যের এই প্রথমাংশে গান আছে— 'আরো আরো, প্রভু, আরো আরো', 'আমরা বসব তোমার সনে', 'আমাকে যে বাঁধবে ধ'রে', 'কে বলেছে তোমায়, বঁধু, এত দুঃখ সইতে'। তুলনার্থে বলা যায় মুক্তধারায় চতুর্থ গানটি নেই এবং দ্বিতীয় গানের সাদৃশ্যে আছে 'ভুলে যাই থেকে থেকে'— দ্বারকার রাজার দ্বারে বৃন্দাবনের গোপ-গোপীর সহজ সরল সুরের আবেদন মনে পড়ে বৈকি।

পরিত্রাণের ষষ্ঠ দৃশ্যে প্রায়শ্চিত্তের সপ্তদশ অষ্টাদশ সংহত। বিষৌষধিতে সুরমার মৃত্যুর পর উদয়াদিত্য

রাজপুরী ত্যাগ করে যাবেন, নীচে মাধবপুরের প্রজাদের কলরব শুনে বলেন— 'ওদের বিদায় করে দিয়ে আসি গে।'

বর্তমান সপ্তম দৃশ্যে আর প্রায়শ্চিত্তের উনবিংশে প্রভেদ অল্পই। 'আমাদের মালক্ষ্মী কোথায় গেল রাজা? আমাদের দয়া করেছিল ব'লেই সে গেল' ইত্যাদি কয়েক ছত্র বর্জিত।

অষ্টম দৃশ্যে প্রায়শ্চিত্তের একবিংশ চতুর্বিংশ ষড়্‌বিংশ সপ্তবিংশ আর ত্রিংশ দৃশ্যের বিশেষ বিশেষ অংশ সংকলিত আর এরই মাঝামাঝি রামমোহন তার মাকে নিতে এসে— ভাই কারাগারে, বিভা যেতে চাইলেন না— হতাশাক্ষুণ্ণমনে ফিরে চলেছে। সীতারামের দল কারাগারে আগুন লাগালো। উদয়াদিত্য মুক্ত হয়েও অন্যদের বিপদের জালে জড়িয়ে পালাতে রাজী হলেন না— 'যদি পালাই মুক্তি আমার ফাঁদ হবে'। প্রায়শ্চিত্ত নাটকের তুলনায় এতে তাঁর চরিত্রের বিশেষ পরিণতি ও অপ্রমত্ততা পরিস্ফুট হল। গল্পের জালও অনর্থক জটিল হয়ে উঠল না, কেননা বসন্তরায়ের রাজ্যে ফেরা হল না— রায়গড়ে তাঁর হত্যার ব্যাপারও সম্পূর্ণ বর্জিত হল। কারাগার-থেকে-মুক্ত ধনঞ্জয়ের গান শোনা গেল— 'আগুন আমার ভাই'। প্রতাপাদিত্য সবিস্ময়ে দেখলেন এ মানুষ কারাগারের রুদ্ধদ্বার আর লোহার গরাদের ভিতরেও মুক্ত, বুঝলেন না 'গারদে এত আনন্দ কিসের' ('মহারাজ, রাজ্যে তোমার যেমন আনন্দ তেমনি আনন্দ'), জিজ্ঞাসা করলেন— 'এখন তুমি যাবে কোথায়?'

'রাস্তায়।'

তাই শুনে বলতেই হল— 'বৈরাগী, আমার এক-একবার মনে হয় তোমার ওই রাস্তাই ভালো, আমার এই রাজ্যটা কিছু না।'

এ-সবই প্রায়শ্চিত্তেও আছে, কিন্তু বহুপূর্বের উপন্যাসে কল্পনাও করা যায় না। তাই বলতে হয় প্রতাপাদিত্য চরিত্রেরও কিছু পরিণতি অবশ্যই হয়েছে। যা হোক, উদয়াদিত্য ধরা দিতেই ইচ্ছুক। প্রতাপাদিত্য বিস্মিত হলেন— 'কী, তুমি যে মুক্ত দেখি?'

'কেমন করে বলব মহারাজ। কারাগার পুড়লেই কি কারাবাস যায়?'

'তুমি যে পালিয়ে গেলে না?'

'মেয়াদ না ফুরোলে পালাব কী করে? মহারাজের সঙ্গে আমার যে চিরবন্ধনের সম্বন্ধ, সেটা যখন নিজে ছিন্ন করে দেবেন সেই দিনই তো ছাড়া পাব।'

রাজপুত্র স্বেচ্ছায় সকল স্বত্ব ত্যাগ করে রাজত্ব হতে অব্যাহতি চাইলেন। পূর্বের নাট্যপ্রযোজনায় 'দাদামহাশয় কোথায় দাদা' ('দাদা মহাশয় কেমন আছেন') বিভার এ প্রশ্নের কোনো জবাব ছিল না। এখন উদয়াদিত্য বললেন— 'এখনই দেখা হবে।'

প্রতাপাদিত্য— 'না, দেখা হবে না। কোনোদিন না।... তাঁর বিচার বাকি আছে। সে-সব... তোমাদের ভাববার কথা নয়।'

উদয়াদিত্য— 'না হতে পারে, কিন্তু এই ব'লে গেলুম, মহারাজ, রাজ্য তো মাটির নয়, রাজ্য হল পুণ্যের; সে পুণ্য রাজাকে নিয়ে, প্রজাকে নিয়ে, সকলকে নিয়ে। বিভা, আর কাঁদিস নে। দাদামহাশয় তো মহাপুরুষ, ভয়ে তাঁর ভয় নেই, মৃত্যুতে তাঁর মৃত্যু নেই। আমাদের মতো সামান্য মানুষই ঘা খেয়ে মরে।'

প্রতাপাদিত্য— 'এখন এসো উদয়, কালীর মান্দিরে এসো, মায়ের পা ছুঁয়ে শপথ করতে হবে।'

প্রায়শ্চিত্তের দ্বাবিংশ পঞ্চবিংশ অষ্টাবিংশ আর ঊনত্রিংশ দৃশ্য সংগত কারণেই বাদ গিয়েছে। এর মধ্যে পঞ্চবিংশের ক্ষুদ্র পরিসরে, কারাগারে আগুন লাগাবার পূর্বে, উদয়াদিত্যকে দেখা গিয়েছিল। অন্য দৃশ্যগুলি ছিল রায়গড়ের— প্রথমতঃ সীতারাম যুবরাজকে মুক্ত করবার মন্ত্রণা নিয়ে খুড়ো মহারাজের কাছে গিয়েছিল, যুবরাজ মুক্ত হয়ে কর্তব্য স্থির করতে না পেরে দ্বিধাগ্রস্ত মনে দাদামশায়ের সঙ্গে গেলেন, উদয়কে ধরে আনবার এবং বসন্তরায়কে হত্যা করবার পরোয়ানা পাঠানো হল মুক্তিয়ারের হাতে— এই ঘটনাগুলি আসল নাট্যব্যাপারকে অহেতু বাহুল্যে শিথিল ও শ্লথ করে তুলেছিল মাত্র। পরিত্রাণে যুবরাজ স্বেচ্ছায় ধরা দেওয়াতে ও-সমস্তই অবান্তর ও অনাবশ্যক হয়ে পড়ল।

পরিত্রাণে নবম দৃশ্যের সূচনা বরবেশী রামচন্দ্র আর পুরাতন বিংশ দৃশ্যের আদি-অন্ত-বর্জিত অল্প একটু নিয়ে, সেই সঙ্গে যুক্ত ত্রয়োবিংশ দৃশ্যের শেষাংশ আর দ্বাত্রিংশ। দৃশ্যশেষে নূতন গান— 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে।'

দশম বা শেষ দৃশ্যে প্রায়শ্চিত্তের একত্রিংশ আর ত্রয়স্ত্রিংশ দৃশ্য সামান্য পরিবর্তনে গৃহীত। চন্দ্রদ্বীপের ঘাটে নৌকা ভিড়ল বটে— ময়ূরপংখি সাজানো, দীপাবলি জ্বলছে, বাঁশি বাজছে, সবই বুঝি প্রত্যাশিত, যথোচিত— কিন্তু ঐ ময়ূরপংখি, ঐ আলো, ঐ গান, কিছুই বিভার জন্য নয়, আর-এক রানীর 'আগমনী'তে।

বিভা— 'আর-এক রানী ?'

রামমোহন— 'হাঁ, আর-এক রানী। আজ মহারাজের বিবাহ।'

বিভা— 'ওঃ! আজ বিবাহের লগ্ন।' শেষ আশাভঙ্গের এ দুঃখের কোনো ভাষাই নেই।

রামমোহন কেঁদে ওঠে— 'অমন চুপ করে রইলে কেন মা ? কেমন ক'রে কাঁদতে হয় তাও কি ভুলে গেলে ?'

এর পরেও স্বামীসন্দর্শনে যেতে চেয়েছিল বিভা কাঙালিনির মতো পায়ে হেঁটে, মোহন যদি সঙ্গে না'ও যায়। কিন্তু যাওয়া হল না। উদয়াদিত্য সামনে আসতেই মনে পড়ল দুস্ত্যাজ্য কুলগৌরব— 'আমার মান অপমান সব চুকে গেছে। কিন্তু দাদার অপমান হত যে। দাদা, এবার নৌকা ফেরাও।'

মোহন সত্য বলেছে— 'মা, তোমার পিতার হাতের আঘাত সেও তুমিই মাথায় করে নিয়েছ, আবার তোমার স্বামীর হাতের আঘাত সেও তুমিই নিলে।··· সকলের চেয়ে বড়ো দণ্ড পেলে তোমার স্বামী। সে আজ দ্বারের কাছ থেকেও তোমাকে হারালো।'

এর পরেই বৈরাগীর প্রবেশ ও গান—

'আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর,
ফিরব না রে!

যাত্রার গান, অভয়ের গান, মুক্তির গান, হয়তো মৃত্যুঞ্জয় আনন্দের গানে কোনোদিন কোনো লোকে শেষ হবে।

'আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম— শেষ হয়ে গেছে, তাই আজ আমার ছুটি। এ

নাটকটা প্রায়শ্চিত্ত নয়, এর নাম 'পথ'। এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয়বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই। সে গল্পের কিছু এতে নেই, সুরমাকে [তেমনি বিভাকে] এতে পাবে না।' ৪ মাঘ ১৩২৮

—ভানুসিংহের পত্রাবলী। পত্র ৪৩

'পথ' নিশ্চয়ই কালভৈরবের পরিক্রমাপথ, যে পথে নিরন্তর চলার সূত্রেই এ নাটকের সকল নরনারীর জীবন গ্রথিত। 'পথ' থেকে 'মুক্তধারা' অবশ্যই আরও অর্থদ্যোতক, শ্রুতিমধুর, কিম্বা অভিনব; পরে সেই নামে নাটকটি ১৩২৯ বৈশাখের প্রবাসীতে প্রকাশ পায়।

কবি বলে দিয়েছেন ধনঞ্জয় ব্যতীত পুরাতন পরিচিতের আর কেউ নেই। ঠিকই। তবে ধনঞ্জয়ের সঙ্গের সাথিরা আছে গণেশ সর্দার-সমেত, মাধবপুর থেকে এসে উত্তরকূটের সীমানায় শিবতরাইয়ে বাস করছে; আর, প্রতাপাদিত্য উদয়াদিত্য বসন্তরায় রাজসচিব এঁরাও নামান্তর এবং জন্মান্তর গ্রহণ করেছেন এই নাটকে। সুরমা এবং বিভা নেই নাটকের ভিতরে এ কথা সত্য, তবে সকালে অভিজিতের পূজার আসনের পাশে শ্বেতপদ্মটি গোপনে যে সাজিয়ে রেখে যায়, জানতে দেয় না সে কে, না-দেখা না-জানা পুষ্পের সৌরভে যেমন হয়, তার অস্তিত্বের অনুভবেই আমাদের উন্মনা করে দেয়। 'এই-যে তার পূজার ফুলগুলি এখনও শুকায় নি, সকাল বেলার পুজোর পরে··· দিয়ে গেল, তখন তার মুখে দেবীকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছিলুম'[৫২]— সে ছিল বিভা, আর এ যেন আত্মনিবেদিতা উমার মতো কুমারী সুরমা, অথবা কী নাম তাও তো জানি নে।

সে কথা যাক্। 'পথ' শব্দটি এবং বস্তুটি রবীন্দ্রমানসে বিশেষ অর্থদ্যোতক সন্দেহ নেই। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' থেকে 'কালের যাত্রা' পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাট্যে পথ এবং মেলার দৃশ্য কতবার ফিরে ফিরে এসেছে, কবির তরুণ বয়সে শিলাইদা সাজাদপুর পতিসরের পল্লী-বসবাসের স্মৃতির সঙ্গে কিভাবে জড়িত রয়েছে, সুধীজন[৫৩] তার আলোচনাও অবশ্যই করেছেন। কিন্তু 'মুক্তধারা' আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, আরও বেশি ব্যঞ্জনা ঐ কথাটিতে— সকলেই স্বীকার করবেন। পথের অবারিত বুক বেয়ে বিশ্বের নরনারী রাত্রদিন চলে আর ঝর্নার ধারা, শত ধারার মিলনে বেগবান নদীর প্রবাহ, সে যে নিজেও ক্ষণমাত্র থেমে থাকে না— নিরন্তর চলার, সর্বসত্তা সর্বাঙ্গ দিয়ে চলার, সেই তো প্রতিমা। সে তৃষ্ণা মেটায়, জীবনদান ও অন্নদান করে। সেই মুক্তধারাকে কয়েদ করা পাপ, অপরাধ। অবরুদ্ধ ধারার মোচন সেই তো বীরের ব্রত, সমাজের সেবা, শিবের আরাধনা।

প্রায়শ্চিত্তে মুক্তধারায় অন্তরের মিল কোথায়, সম্পর্ক কিসের, সেটি বিচারের বিষয়। এমন যদি হয় প্রায়শ্চিত্তের প্রসঙ্গবিশেষ ছিন্ন করে নিয়ে মুক্তধারায় জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তা হলে সেটি বাহ্যিক যোগ মাত্র, অন্তরের মিল নয়, এবং মুক্তধারাকে প্রায়শ্চিত্তের পরিবর্তন বা বিবর্তন বলাই বৃথা। আসলে, যে সমস্যা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে প্রায়শ্চিত্তে আকার পরিগ্রহ করেছিল, মুক্তধারার ক্ষুদ্র পরিসরে সেটি প্রায় জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষের আকারে দেখা দিয়েছে। এক দিকে কল্যাণ অন্য দিকে কামনা, একদিকে প্রাণ অন্যদিকে জড়জঞ্জাল, যন্ত্র, এক দিকে স্নেহ প্রেম অন্য দিকে শক্তির উপাসনা, হিংসা, এক দিকে জীবন অন্য দিকে মৃত্যু —এই মীমাংসারহিত দ্বন্দ্বই ব্যক্তির জীবনে, সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায়, মানবসভ্যতার স্তরে স্তরে দেখা দিয়েছে আর নাটক-দুটির বিষয়বস্তুও তাই। জীবন বলতে অন্নময় জীবন শুধু নয়, মৃত্যুও নয় শুধু দেহের। অমর জীবনে যাদের অভিলাষ ও আস্থা, বরং তারা দেহের মৃত্যুকেই

সহাস্যে বরণ করে বীর্যের সঙ্গে, প্রেমের সঙ্গে। অহংমুখী যার জীবন, বিষয়সংগ্রহই যার লক্ষ্য, ছল বল হিংসা যার অস্ত্র, বাহ্যতঃ জয়শীল হলেও অন্তরে অন্তরে তার মৃত্যু। যে বীর মরে না, মরতে প্রস্তুত, আসলে সেই অমর। সেই বীরজীবনের আলেখ্যে প্রথম রেখাপাত যেমন উদয়াদিত্যে, অভিজিৎও সেই পরম বীরত্বেরই প্রতিমূর্তি। প্রতাপাদিত্য বা রণজিৎ এক দিকে আছেন নিজেদের যন্ত্রী, মন্ত্রী, স্তাবক, আশ্রিত হত্যাব্যবসায়ী সৈন্য ও সেনাপতিদের নিয়ে; অন্য দিকে উদয়াদিত্য বা অভিজিতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন —বসন্তরায়, ধনঞ্জয়, সুরমা, বিভা, বিশ্বজিৎ, সঞ্জয়, মাধবপুর আর শিবতরাইয়ের সাধারণ প্রজা, আরও অনেকে— সজ্ঞান সচেতনভাবে না হলেও অজ্ঞানে, প্রাণের আকর্ষণে। শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে উদয়াদিত্য ও বিভা তীর্থযাত্রা করেছেন কামনার কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে, প্রাপ্তি তাঁদের পথে-পথে পদে-পদে; আর মুক্তধারায় অভিজিতের মৃত্যুও বন্দী জীবনেরই বন্ধন-মোচনের ইঙ্গিত দিয়ে গেছে— অতঃপর স্থির হয়ে কেউ বসে থাকতে পারবে না গৃহ পরিবার রাজ্য সাম্রাজ্যের গড়-বন্দী হয়ে, জড়বস্তু স্তূপীকৃত ক'রে কিম্বা নির্জিত শোষিত শঙ্কিত হয়ে চিরপরাভবের কয়েদখানায়— দ্বন্দ্ব হয়তো শীঘ্র শেষ হবে না— তবু মনুষ্যত্ব অপরাজিত থাকবে, জীবনের পথ বাধামুক্ত হবে আরও শত শত বীরের জীবনদানে।

অহংবুদ্ধি স্বার্থ ও বিষয়বাসনার অন্ধ ক্ষুদ্র কারাগার থেকে মুক্তি, ক্ষেম ও প্রেমের পথে চলা, এ যেমন প্রায়শ্চিত্তের ইঙ্গিত তেমনি মুক্তধারারও নিহিত তাৎপর্য।

কিন্তু যে বিষয় ছিল ব্যক্তি বা ব্যষ্টির স্তরে সেইটেই মোটের উপর সামাজিক বা রাষ্ট্রিক স্তরে উন্নীত হওয়ায় নাটকের রূপ একেবারে বদলে গেছে, 'টাইপ' প্রাধান্য পেয়েছে, ঘটনা সাংকেতিক ও ভাষা ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে— নইলে সংহতি বা পরিমিতি রাখা যেত না। রক্তকরবীতে এই সংকেতধর্ম বা ইঙ্গিতময়তার পরবর্তী পদক্ষেপ এটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে।

মুক্তধারায় (তেমনি রক্তকরবীতে) গল্প স্বল্পই, ঘটনাধারার দ্রুতি অত্যদ্ভুত। অঙ্ক বা দৃশ্য -বিভাগের দ্বারা নাটকে স্থান ও কালের বহু ব্যবধান ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। মুক্তধারায় (রক্তকরবীতে) দৃশ্য একটিই, সে হল পথ। **চলাই যে জীবনের ধর্ম— মানুষের জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, সেও যে পথ বা চলারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ** —এটি রবীন্দ্রনাথের একটি মৌল আদর্শ বা ভাবনা। পথেই যা-কিছু ঘটনা ঘটছে অবিচ্ছেদে; বিচিত্র নরনারী, বিবিধ জনতা ফিরে ফিরে আসছে, যাচ্ছে। তত্ত্বনাট্য বা সংকেতনাট্য হোক, তবু তো প্রয়োজন ছিলই নারীচরিত্রের— জীবননাট্যের মূল সুরটি না হলে বাজবে কেন নানাভাবে মধুরে করুণে মিলে। অভিজিতের জীবনের অন্তরালে আছে যে নামহারা পূজারিনি তাকে নাই বা জানালেম, নারীর বিচিত্র ব্যথা ও সুখ এই নাটকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করেছে পাগলিনী অম্বা, দেওতলীর তুথ্‌নি ফুলওয়ালি আর ঐ যে মেয়েটি মাসির সঙ্গে মেলায় এসেছে, রাজপুত্র তার কৈশোর কল্পনায় দেবতার মতোই এ কথা যে নির্ভয়ে বলেছে।

উত্তরকূটে দেবতার বেদীতে কখন্ তৃষ্ণারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ভৈরবের নামে তারই পদতলে সকলে অর্ঘ্য আনছে, মন্ত্র উচ্চারণ করছে 'মারো মারো' আর যন্ত্রাসুর নিরীহ প্রজার ধন প্রাণ কবলিত করে উদ্ধত মাথা তুলে আকাশের আলো'কে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। বিভূতি এই যন্ত্রশক্তির অধিকারী, বিষয়-লোলুপ বৈশ্যের প্রতিভূ, নূতন ক্ষত্রিয়। রাজা তাকে ক্ষত্রিয় বলে না মেনে পারেন না। আজ শুধু বাহুবলে রাজ্যরক্ষা বা পররাজ্যশাসন অসম্ভব। রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি আসন্ন ক্রান্তির মুখে। নিঃস্বকে

শোষণ করতে, নিরন্নের অন্ন হরণ করতে তার লজ্জা বা কুণ্ঠা নেই। দেশে দেশান্তরে ব্যাপ্ত তার ছলনাজাল। মিথ্যাপ্রচারের কুহকে সত্য আচ্ছন্ন; পাঠশালার গুরুমশায় অবধি সেই প্রচারের বাহন আর নিষ্পাপ সরল শিশুরাই তার শিকার। 'ন্যায় অন্যায় ভাববার স্বাতন্ত্র্য' যেখানে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, অন্যায় যেখানে অন্যায় নয়; নৈর্ব্যক্তিক পার্টি বা রাষ্ট্রই হল ন্যায়ের 'রক্ষক' বা ভক্ষক। কুলক্রমাগত রাজাকে সরিয়ে বা শিখণ্ডীরূপে রেখে যন্ত্ররাজ বিভূতি তার স্থান নিতে প্রস্তুত। 'উত্তরকূটে কেবল যন্ত্রের রাজত্ব নয়··· দেবতাও আছেন' এ কথায় তার আস্থা না থাকাতেই বুক ফুলিয়ে বলে— 'যন্ত্রের জোরে দেবতার স্থান নিজেই নেব'। যেমন রাজা তেমনি ভৈরবও যদি নিঃস্ব দুর্বলের ধন প্রাণ-হরণে সহযোগী হন ভালোই— 'তৃষ্ণার শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধ ক'রে··· উত্তরকূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন'— নইলে তিনিও উত্তরকূটের দেবতা নন।

রাজার মধ্যে পুরাতন নীতিধর্মের আদর্শ কিছু অবশিষ্ট আছেই, তাই তাঁর মধ্যে আছে দ্বিধা, আছে পুত্রস্নেহ। অভিজিৎকে তিনি রক্ষা করতে চান প্রজাসাধারণের ক্রোধ থেকে, হয়তো রাজধর্মে— কিছু ধর্ম কিছু অধর্ম— প্রবর্তিত করতেও চান।

অভিজিৎ তবু কুলছাড়া, অভিনব। মুক্তধারার ঝর্নাতলায় তার জন্ম এ তার কাছে বিশেষ অর্থপূর্ণ।[৫৪] 'যে সব পথ এখনও কাটা হয় নি' দুর্গমের উপর দিয়ে 'সেই ভাবীকালের পথ' দেখে সে চোখ-মেলা ধ্যানে— 'দূরকে নিকট করবার পথ'। সত্যই রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ যার, উত্তরকূটের সিংহাসনটুকুর মধ্যেই তাকে আটকে রাখা যাবে কেন! বিশ্বে তার অধিকার, সকল জাতি সকল মানুষই তার আপন। সেই অধিকার— সেই সম্বন্ধ— প্রাণ উৎসর্গ করে সে প্রমাণিত প্রতিষ্ঠিত করে যাবে। প্রত্যেক মানুষকেই দিয়ে যাবে এই দুর্লভ উত্তরাধিকার।

অভিজিৎকে পুত্ররূপে লালন করলেও, অভিজিৎকে বোঝবার ক্ষমতা নেই রাজার। ধনঞ্জয়ই অভিজিতের সজাতি। বাইরে তার বৈরাগীর বেশ, ভিতরে বিশুদ্ধ অনুরাগেরই রঙ, আসক্তির মলিনতা নেই— সকলের কল্যাণই তার একমাত্র অভীষ্ট। অভয় তার মন্ত্র। 'মরব তবু মারব না' এই তার সংকল্প। 'শত্রুকে জয় করব প্রেম দিয়ে, মৈত্রী দিয়ে— আসলে সে তো শত্রু নয়' এই তার ব্রত। রবীন্দ্রকল্পনায় ধনঞ্জয় নূতন নয়, বহু পুরাতনই বটে। রাজর্ষি গল্পের বিল্বনেও তার প্রতিরূপ, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের অহিংসানিষ্ঠার যিনি পরিপোষক। নানা নাটকে নানা পরিবেশে ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর রূপেও তাঁর উপস্থিতি। কবিমর্মের কথাটি সহৃদয়ের মর্মস্পর্শী মর্মঙ্গম হবে ব'লে গানই তার ভাষা। এ দেশের যাত্রা বা পালা-গানেও এমনটি ছিল না তা নয়, মূর্তিমান বিবেক বা নারদমুনি-রূপে ক্ষ্যাপা বা বাউলের বেশে। কবি সেই কৌশল তাঁর নানা নাটকে আরও সূক্ষ্ম সুচারু-রূপে প্রয়োগ করেছেন। বাংলার (তেমনি ভারতের) লোকজীবনেও এর প্রতিরূপ আছে যে। একাধিক বাউল দরবেশ ফকিরের সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে থাকবেন রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ জীবনে। এক কালে তারাই ছিল পল্লীবাংলার প্রাণ, দ্বারে দ্বারে মন্দিরে মেলায় তাদের গতাগতি, পথ তাদের প্রাণাধিক প্রিয়, গান তাদেরও ভাষা। ভেবে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথ বাউল ছিলেন অন্তরে অন্তরে। ধনঞ্জয় ঠাকুরদা কবিশেখর বা অন্ধবাউল চরিত্রের তাই বিশেষ তাৎপর্য, বিশেষ সার্থকতা। সে যে কবিরই আপন স্বরূপ, নিজস্ব সত্তা।

এই স্বভাব-অনুরাগী বা বৈরাগীর সঙ্গে তাঁর অনুরক্ত ভক্তদের সম্পর্ক কিসে প্রতিষ্ঠিত? বুদ্ধিবিদ্যায়

জ্ঞানে তো নয়। স্বাভাবিক প্রাণের টানে। অথচ 'সহজ' মানুষকে সহজে বোঝাও যায় না। সমাজ যে কৃত্রিম, মানুষের জীবনও। 'তোমাকেই আমরা বুঝি, কথা তোমার নাই বা বুঝলুম' এ বলে যেমন গোঁজামিল দিতে চায় শিবতরাইয়ের মানুষ, তেমনি কুম্ভও তো বলে— 'ঠাকুরদা, তোমার কথা··· তেমন বুঝি নে কিন্তু তোমাকে বুঝি। তা, আমার রাজায় কাজ নেই, তোমার পাছেই রয়ে গেলুম— কিন্তু ঠকলুম না তো?'[৫৫]

গুরুঠাকুর বা দাদাঠাকুর হওয়ার এই এক যন্ত্রণা।[৫৬] তবু সাধারণকে নিয়েই অসাধারণের কারবার, তারা অজ্ঞানও হতে পারে, জ্ঞানপাপী নয়। সব কথার অর্থ তারা বুদ্ধি দিয়ে সত্যই বোঝে না। না বুঝলেও সাড়া দেয় অবিলম্বে। তারা খুঁজে বেড়ায় কোথায় তাদের হৃদয়ের রাজা— তাদের উদয়, তাদের অভিজিৎ। তাকে বাইরের থেকে হারিয়ে হায় হায় করে, বাউল বা বৈরাগী আশ্বাস দেয়— 'চিরকালের মতো পেয়ে গেলি।' সে কথার অর্থ বুঝতে দেরি লাগে।

প্রথাসম্মত 'চিরায়ত' ট্র্যাজেডি যখনই কবি মনীষীর ব্যাপক গভীর জীবনদর্শনের বা সমাজভাবনার বাহন হয়েছে, তত্ত্বনাট্যের রূপ নিয়েছে, তার 'মানবিক' আবেদন হ্রাস পেয়েছে সন্দেহ নেই— এরা যে ঠিক-ঠিক রক্তমাংসের মানুষ নয়, টাইপ বা ভাব ও আদর্শের মূর্তি অনেকেই। তবু কী পর্যন্ত এই নাটকেরও (তেমনি রক্তকরবীর) অভিনয়যোগ্যতা সেই এক আশ্চর্য! গানের-সুরে-সুরে-রচিত অলৌকিকের ইন্দ্রজালে যেমন আকাশ-ছোঁওয়া পটভূমিকা, পাগ্‌লা বটুক বা পাগলিনী অম্বার ব্যথায় ও আর্তিতে এর স্পন্দিত হৃদয়ের ধ্বনি, সেটি সহৃদয় সামাজিকের হৃৎস্পন্দন দ্রুততর করে তোলে। ভাবীযুগের নাটকের এ হয়তো পূর্বাভাস, তত্ত্ব বা ভাবনা যে কালে সম্পূর্ণই সচল শরীরী হয়ে উঠবে। ব্যাস বাল্মীকি হোমার দান্তের কাব্যে তাই কি হয়ে ওঠে নি? অথচ সম্ভাবী নাট্যরূপে তারই যে পুনরাবৃত্তি হবে তাও নয়। কেননা এক-যুগ আর-এক যুগের নকল হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ, সে পথ দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। দিগ্‌যবনিকা সরিয়ে যে নটনটীরা ভবিষ্যতে দেখা দেবে, যে নাটক অভিনীত হবে, আজ সে আমাদের কল্পনাতীত।

মুক্তধারার যে আলোচনা করা গেল তা অপ্রচুর আর অসম্পূর্ণ হয়তো। সন্তোষজনক মনে হয় না। অগত্যা মূল নাটকের উপরেই বরাত দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করতে হয়।[৫৭] অথচ শেষ হয়েও শেষ হয় না, এই আলোচনায় রক্তকরবীর উল্লেখ না ক'রে। উল্লেখের বেশি নয়।

মুক্তধারার অনতিকাল পরে[৫৮] লেখা হয় রক্তকরবী। একটি থেকে আর-একটির উদ্ভব না হলেও গোত্রকুল একই— সংকেতময় প্রতীকী নাটক -রচনায় পরবর্তী শুধু নয়, বুঝি শেষ পদক্ষেপ।[৫৯] চরম বা পরম বলাই সংগত। নাট্যকল্পনার এই বিশেষ ক্ষেত্রে এতটা শক্তির প্রকাশ, কবিপ্রতিভার এমন স্ফূর্তি, পূর্বে বা পরে আর দেখা যায় নি। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে কবি সর্বগ্রাসী industrial civilisation বা যন্ত্রসভ্যতা যতটা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, প্রতিভা দিয়ে তারই এমন সার্থক বিগ্রহ-রচনা বিস্ময়কর। একটি দৃশ্যে এবং অব্যাহত একই কালে ঘটনাধারা ছুটেছে যার-পর-নেই দ্রুত গতিতে।[৬০] একা নন্দিনীর প্রাণস্পন্দনে সমস্ত নাট্যব্যাপার— মাটি জল আকাশ বাতাস— বিদ্যুন্ময়, প্রাণময়। সে'ই এ নাটকের প্রাণ। সে'ই প্রাণই মারণব্রতী সর্বনাশা সভ্যতার নিশ্চিত মরণ এবং নূতন জীবনেরও ধ্রুব আশ্বাস। একই কালে জ্ঞান বিজ্ঞান যন্ত্রশক্তি— ব্রাহ্মণের বুদ্ধিবৃত্তি, ক্ষত্রিয়ের বলবীর্য উৎসাহ আর বৈশ্যের নৈপুণ্য ও চাতুরী—

উত্তুঙ্গ শরীর বা অদৃশ্য দানবীয় আকার পেয়েছে রক্তকরবীর রাজায়। সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের সে বিগ্রহ—, সমাজ যখন নামমাত্রে পর্যবসিত, কায়াহীন ছায়ামাত্র। মানুষ কি হারিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল তবে? তাই হয়তো পরিণাম, তারই প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে বহু দিক থেকে— মানুষ তবু আছে খণ্ড-বিখণ্ড বিকৃত-বিধ্বস্ত বা অপরিণত আকারে। ৪৭ফ আর ৬৯ঙ শুধু? না, বিশু, ফাগুলাল, কিশোর। আর, নন্দিনীর মতোই পথ চেয়ে আছি আমরা রঞ্জনের। সেই প্রাণের মানুষ, পূর্ণ সচেতন মানুষ এই জড়ের জগতে, যন্ত্রের রাজত্বে। না জেনে রাজা তাকে মেরেছে, তার পরে নিজের সৃষ্টিকেই চুরমার করে ভাঙতে ছুটেছে নন্দিনীর প্রেরণে, আহ্বানে। কেননা, ভয়াবহ পরিণাম হয়েছে প্রত্যক্ষ। দেখেছে যন্ত্র তাকে মানছে না, জেনেছে যন্ত্রই প্রভুত্ব কেড়ে নিচ্ছে যন্ত্রতাড়িত যন্ত্রচালিত মানুষের।

কেউবা[৬১] বলেন রাজাই রঞ্জন, জন্মান্তরে, রূপান্তরে। সে কথাও ভেবে দেখবার মতো। কারণ, রাজা কি আসলে মানুষ নয়? তবে আনন্দরূপিনী প্রাণস্বরূপিনী মানবনন্দিনীর দিকে কেন তার দুর্নিবার এই আকর্ষণ?

এ নাটকেই প্রতীক-রচনার পরিপূর্ণতা। প্রাচীন দেবতারাও কেউ নেই, ধ্বজাপূজার শুধু উৎসব— জড়োপাসক যন্ত্রবাহন রাষ্ট্রেরই জয়ধ্বজা।[৬২] নন্দিনী নিখিলনারীর প্রতীক হয়েও প্রতীক নয়, জীবন্ত, সত্য। রবীন্দ্রনাট্যের আর-এক স্তরে সুদর্শনা সম্পর্কে আমাদের যা উপলব্ধি, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। বাস্তবে না হলেও, সত্যলোকে সে শরীরিণী।[৬৩]

মুক্তধারা রক্তকরবীর পর রবীন্দ্রনাথ অন্য জাতের নাটক লেখেন পুরাতন গল্প কবিতা কিম্বা নাটক প্রহসনের আধারে। তারও পরে নৃত্যনাট্যের কল্পনায় মনোনিবেশ করেন।[৬৪]

১২. ২. ১৯৬৭

প্রমাণ ও তথ্য -পঞ্জী

রবীন্দ্রনাথের মতো লোকোত্তর প্রতিভাশালী বা মনীষী যাঁরা, তাঁদের রচনায় টীকা-টিপ্পনী প্রায় দেখা যায় না, উদ্ধৃতিও বিরল। আলোচনা-সমালোচনাও তাঁদের মৌলিক রচনা বা সৃষ্টি। সাধারণ লেখকের কথা স্বতন্ত্র। টীকা-টিপ্পনী না দিলে চলে না, কদাচিৎ প্রবন্ধের থেকেও তথ্য বা প্রমাণ -পঞ্জী পরিমাণে বেশি হয়ে পড়ে। হয়তো-আবশ্যকীয় হয়তো-অবাঞ্ছিত সেই মাত্রাহীন 'বাহুল্য' একটু দৃষ্টির অন্তরালে থাকা মন্দ কী? এজন্যই পাদটীকার বদলে উত্তরটীকা -সংযোজন। যে পাঠকের অবকাশ অল্প, ক্ষমা বা সহিষ্ণুতাও বেশি নয়, টীকা-টিপ্পনী বাদ দিয়েই প্রবন্ধ পড়ে যদি কোনো বস্তু লাভ করেন ও খুশী হন —সেটাই লেখকের আশাতীত সৌভাগ্য বলতে হবে।—

০ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের রচনা শেষ ক'রে, রবীন্দ্রনাথের জন্মকালেই, অর্থাৎ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে, মাইকেল মধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশ করেন এবং, বলা যেতে পারে, বাংলা সাহিত্যকে সত্যই বিশ্বসাহিত্যের পদবীতে উত্তীর্ণ করে দেন— বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর আনেন। উত্তরকালে 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে (১৯০৭) রবীন্দ্রনাথ এই যুগান্তকারী সৃষ্টির প্রকৃত তাৎপর্য অত্যন্ত নিপুণভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

করেন। বাল্যকালেই তিনি মেঘনাদবধ কাব্যখানি পড়েন— 'আমরা যখন মেঘনাদবধ পড়িতাম তখন আমার বয়স বোধ করি নয় বছর হইবে'— "বাধ্যতামূলক" কাব্যপাঠের আশু ও সচেতন প্রতিক্রিয়া ভালো হয় নি বটে, তবু স্বীকার করতে হয়, প্রতিভায় ও প্রকৃতিতে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র হয়েও, রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনেরই ধারাবাহী।

১ এ স্থলে ফলশ্রুতি শব্দটিই প্রত্যাশিত ছিল, সার্থকতা থাক্‌ বা নাই থাক্‌। লেখকের সংস্কারে বাধল।

২ কিছুকাল পূর্বে শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় শ্রীপুলিনবিহারী সেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের এবং সন্ধ্যাসংগীতের বিস্তারিত পাঠভেদ -সংকলনে এজাতীয় কাজের যথার্থ সূত্রপাত করেছেন। এ কাজের গুরুত্ব কতদূর ব'লে শেষ করা যায় না। কিন্তু দ্বিরুক্তি দোষাবহ হবে না— এ কি একজনের কাজ অথবা এক জীবনের? পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্যজিজ্ঞাসার দৃষ্টান্তে এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায়। শেলী কীট্‌স্‌ নিয়েও এপ্রকার কাজ আজ কত দিন ধরে চলছে! রবীন্দ্রকৃতি পরিমাণে আরও বহুগুণে বেশি, প্রকারে আরও শতগুণ বিচিত্র। গুরুত্বেও কম কি? সুখের বিষয়, বিশ্বভারতী স্বয়ং এ বিষয়ে অবহিত হয়েছেন এবং সন্ধ্যাসংগীত কাব্যের পূর্বোক্ত পাঠপুঞ্জিত বা পাঠপঞ্জীকৃত সংস্করণ গত পঁচিশে বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

৩ বিশ্বভারতী-প্রচারিত ১৩৬৬ এবং তদুত্তর মুদ্রণে বহুবিধ পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে গ্রন্থপরিচয়ে। ১৩৬৮ সনের মুদ্রণে শেষ পৃষ্ঠায় একাক্ষর একটি পাঠপ্রমাদ যেভাবে সংশোধিত হয়েছে, কবির পরলোক প্রয়াণের প্রায় ২০ বৎসর পরে, তারও কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ পাওয়া যাবে বর্তমান লেখকের রবীন্দ্রপ্রতিভা (১৩৬৮) গ্রন্থের ৩৮০-তম পৃষ্ঠায়।

৪ [রবীন্দ্রনাথের বিবাহের পরে ১২৯০ সনের শেষ দিক জোড়াসাঁকো-ঠাকুর-] পরিবারের সকলেই কলিকাতায়··· আনন্দ-উল্লাসকে সম্পূর্ণভাবে সম্ভোগ করিবার জন্য একটি অভিনয় করিবার প্রস্তাব হইল; কিন্তু স্থির হইল এই নাটকের রচয়িতা হইবেন অভিনেতারা স্বয়ং।··· একটা প্লট খাড়া করিয়া অভিনয়ের অংশ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল— একজন নিজ অংশ লিখিয়া দিলে অপরজন তাঁহার অংশ লিখিবেন, এইরূপে··· একটা জিনিস খাড়া হইল বটে, তবে তাহাকে সাহিত্য বলা যায় না।··· শেষকালে রবীন্দ্রনাথকেই··· ছাঁটিয়া কাটিয়া একটা চলনসই নাটক খাড়া করিতে হইল। নাটকখানির নাম··· 'নলিনী'··· ইহাই তাঁহার প্রথম গদ্যনাটক।

—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড, (১৩৬৭), পৃ ১৭৭

শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রসদনে নলিনী নাটকের যে খসড়া পাণ্ডুলিপি আছে, তার সবটাই প্রায় রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা হলেও, বর্জনচিহ্নিত প্রথমাংশের কয়েক স্থলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এবং সম্ভবতঃ মেজবৌঠান জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর লিখন দেখা যায়।

৫ শ্রীবসন্তবিহারী চন্দ্র, এম. এ, এক কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। রবীন্দ্রশতবর্ষ-পূর্তির সময় নলিনীর উল্লিখিত প্রতি 'রবীন্দ্র স্মৃতিভবন'এ উপহার দেন, বর্তমানে এটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালের সংগ্রহ-ভুক্ত আছে— তাঁদেরই সৌজন্যে গ্রন্থখানির পর্যালোচনা করা গেল। শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় তাঁর গ্রন্থে নলিনীর এই বিশেষ প্রতির প্রথম উল্লেখ করেন।

৬ কবিপত্নীর স্বাক্ষর নেই কি পেন্সিলের কাঁচা লেখায়?

৭ বিশ্বভারতী-প্রচারিত 'অচলিত' রবীন্দ্ররচনাবলীর প্রথম খণ্ডে, পৃ ৪০৭, নীচের দিকে 'আজই বিদেশ যাব! এত দিনের পরে আমি ঠিক বুঝতে পেরেচি যে আমিই স্বার্থপর। কিন্তু আর নয়।'— এরই পরে।

৮ তদেব, পৃ ৪০৮, নবম ছত্রের পর।

৯ তদেব, পৃ ৪০৯।

১০ তদেব, পৃ ৪১২।

১১ তদেব, পৃ ৪১৩।

১২ তদেব, পৃ ৪১৫, নীচের দিকে।

১৩ তদেব, পৃ ৪১৮।

১৪ তদেব, পৃ ৪২০।

১৫ তদেব, পৃ ৪২১।

১৬ অনূদিত কবিতা, গান নয়। দ্রষ্টব্য 'বিসর্জন' কবিতা, শিশু।
বিবাহ-উৎসব গীতিনাট্যে ৮-সংখ্যক গানে দ্বিতীয়, ১৩-তে তৃতীয়, ২১-এ চতুর্থ, ২৯-এ পঞ্চম, ৩৪-এ ষষ্ঠ এবং ৪৪-এ সপ্তম দৃশ্য শুরু হয়েছে।

১৭ কথা অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর, সুর নয়। ৩২-সংখ্যক গানের কথাও আবার অক্ষয়চন্দ্র ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উভয়ের যৌথ রচনা।

১৮ তালিকার ২৯-সংখ্যা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'দায়ে প'ড়ে দার-গ্রহ' প্রহসনে দেখা যায় এটুকুই বলা চলে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকে প্রহসনে অন্যের, বিশেষতঃ স্নেহের অনুজ 'রবি'র, গান বা কবিতা এত অজস্রভাবে ব্যবহার করেছেন বিনা বিজ্ঞপ্তিতে, যে, ঠিক কোন্‌গুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিজের রচনা সে এক স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়।

১৯ ইন্দিরাদেবীর বিবরণে 'আমার পিসতুতো বোন সুপ্রভা দিদির বিবাহের সময়ে' এই নাটকের অভিনয়। ঐ বিবাহের সময় আমাদের জানা নেই। ইন্দিরাদেবী বলেন সরলাদেবী রঙ্গমঞ্চে নেমে গান গেয়েছিলেন। কাজেই 'ঝরা পাতা'য় লেখা স্মৃতিকথাই বা ভুল হবে কেন? হতে পারে মহর্ষির দুই দৌহিত্রী, সুপ্রভা ও হিরন্ময়ী, দুজনের বিবাহ হয় অল্প দিনের ব্যবধানে আর বিবাহ-উৎসবেরও অভিনয় হয়েছিল একাধিকবার। ইন্দিরাদেবীর বিবরণে জানা যায়— 'দিদুর মা সুশীলা বউঠান নায়ক সেজেছিলেন' আর 'সরলাদিদি সখা সেজে তাঁর মোহভঙ্গের উদ্দেশে' গান করেন। সখীসমিতি-কর্তৃক অভিনীত মায়ার খেলায় যেমন পুরুষ অভিনেতার স্থান হয় নি, মেয়েরাই পুরুষ সেজেছিলেন, বিবাহ-উৎসবের অভিনয়েও তবে কি সেরূপই ঘটে? হয়তো এমন একটি সাদৃশ্যসূত্রেও বিবাহ-উৎসব - নলিনী - মায়ার খেলা একত্র গাঁথা বাস্তবে আর কবিকল্পনায়। অর্থাৎ, নলিনী না'ও যদি অভিনীত হয়ে থাকে, তবু মেয়েরাই আদ্যন্ত অভিনয় করবেন এ কল্পনা ছিল নাকি?

তৃতীয় খণ্ড গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয়ে (১৩৭৩ বৈশাখেও) বিবাহ-উৎসবের রচনা বা অভিনয় সম্পর্কে আলোচনা -কালে আখ্যাপত্র-যুক্ত বিবাহ-উৎসব পুস্তিকা আমাদের হাতে আসে নি। সুখের বিষয় মলাট বা আখ্যাপত্র -যুক্ত একখানি বই শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সংগ্রহে দেখবার সুযোগ এখন

পেয়েছি (পূর্বেও তাঁরই সংগ্রহের অন্য একখানি বই ব্যবহার করি)— তাতে গ্রন্থপ্রকাশের সন-তারিখ অবশ্যই নেই, কিন্তু মলাটের তৃতীয় ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় বহু বিজ্ঞাপন তো আছে (তৃতীয় পৃষ্ঠায় "ভারতী ও বালক" পত্রের কার্যাধ্যক্ষ শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য 'শীতল প্রলেপ'ও বিজ্ঞাপিত!) —তাতেই মনে হয় পুস্তিকাখানির মুদ্রণ ১২৯২ সনের পরে, এমন-কি খুব সম্ভব ১২৯৫ অগ্রহায়ণেরও পরে, কেননা বিজ্ঞাপিত গ্রন্থতালিকায় 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত' আট আনা মূল্যের মায়ার খেলাও বাদ যায় নি। আর, বিবাহ-উৎসবের 'মূল্য চারি ।০ আনা।' এটি যে জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়িতে প্রকৃত বিবাহ-উৎসবের সমকালীন মুদ্রণ নয় সে হয়তো বিনা বিতর্কে মেনে নেওয়া যায়। দীনহীন চেহারার পুস্তিকাখানি ভারতী ও বালকের ম্যানেজার মহাশয়ের ব্যাবসাবুদ্ধির ছাপ অঙ্গের আবরণ তথা আভরণ করেছে। তবু এটি তাঁর নিজেরই ইচ্ছায় ছাপা হয় নি, তারও কিছু প্রমাণ আছে। ১২৯৯ ভাদ্রে ভারতী ও বালক পত্রে এই গীতিনাট্যের সূচনাংশের মুদ্রণ (পৃ ২৪৪); সেখানে 'মহিলা শিল্পমেলায় অভিনীত' এটুকু 'বিজ্ঞপ্তি' দেখা যায়। পুনশ্চ কার্তিকে (পৃ ৫২৬ পাদটীকা) সরলাদেবী বলেন : মহিলাশিল্প মেলায় অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে "বিবাহ উৎসব" পুস্তক ছাপাইবার পূর্ব্বে ইত্যাদি। সম্ভবতঃ ১২৯৯ বঙ্গাব্দের কোনো সময়ে 'বিবাহ-উৎসব' পুস্তিকা ছাপা হয়। আশ্চর্যের বিষয় সাহিত্যসাধক-চরিতমালাতেও 'বিবাহ-উৎসব' স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। সে কালে স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলীর বিজ্ঞাপনে বিবাহ-উৎসব বাদ যেত না, এই একটি কারণ দেখা যায়। আখ্যাপত্র-যুক্ত পুস্তিকার কোথাও কোনো লেখকের নাম নেই এই যা ভালো। এর মুদ্রণকাল সম্বন্ধে অনুমানের কিছু সুবিধা হতে পারে, এটি বেঙ্গল-লাইব্রেরির গ্রন্থ-তালিকা-ভুক্ত হয় কবে জানা গেলে। সাহিত্যসাধক-চরিতমালা -অনুসারে ১৩ মে ১৮৯২ (১২৯৯) সেই তারিখ।

২০ মায়ার খেলা গীতিনাট্যের অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে কতকগুলি পূর্বরচিত গান, প্রাসঙ্গিক-বোধে উল্লেখ করা যায়—

'তারে দেখাতে পারি নে' ও 'সখী, সে গেল কোথায়' গান দুটি দেখা যায় বিবাহ-উৎসবে।

'ও কেন ভালোবাসা জানাতে আসে' নলিনীর এই গানেরই চমৎকার রূপান্তর হল— 'তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা'।

উল্লিখিত প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় গান রবিচ্ছায়াতে সংগৃহীত।

'বিদায় করেছ যারে নয়নজলে' গানটি মায়ার খেলায় গৃহীত হয়েছে কড়ি ও কোমল (১২৯৩) কাব্য থেকে।

২১ কথার সঙ্গে সুর রবিকাকার মতো কেউ মেলাতে পারে নি।··· মায়ার খেলার মতো অপেরা হয় নি।··· মায়ার খেলায় তিনি প্রথম সুরকে পেলেন, কথাকেও পেলেন।··· ওতে তাঁর নিজের কথার সঙ্গে সুরের পরিণয় অদ্ভুত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওখানে একেবারে তাঁর নিজস্ব সুর।

—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঘরোয়া (১৩৫১), পৃ ৮২

২২ 'রাজা' নাটক নূতন করে লিখতে শুরু করেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট পাতা লেখা হয়ে গিয়েছিল।··· লেখা এগোত না, অনেকদিন এমনিতে তা পড়েই ছিল। 'রাজা' নাটক অভিনয়ের সময় একদিন

যখন খোঁজ পড়ল, দেখা গেল সেটির পাত্তা নেই কোথাও।··· বছরখানেক বাদে··· নব-পরিণীত দৌহিত্রী-জামাতা শ্রীকৃষ্ণকৃপালনীর কাছে প্রকৃত ব্যাপারটা শুনা গেল,— কে বলে হারিয়েছে, সেটা যে রয়েছে সযত্নে তাঁর কাছেই ! কবিই একদিন দান করেছেন সেটি নিজ কন্যা মীরাদেবীকে। সেখান থেকে স্নেহোপহারে জিনিসটি হস্তান্তরিত হয়েছে মাত্র··· কবিকে এক সময়ে বলা গেল ব্যাপারটা।··· কিন্তু সে-লেখা আর এগোল না।

—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। কবি-কথা (১৯৫১), পৃ ৪১-৪২

মনে হয় করমহাশয় জাপানি খাতায় এই অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির কথাই বলছেন (পাণ্ডুলিপি ১৭১)। ৫০।৬০ পাতার পরিবর্তে আসলে ৮৪ পৃষ্ঠার লেখা দেখা যায়। এই অসম্পূর্ণ রচনার আধারে, বহু পরিবর্তনে, পরে সম্পূর্ণ যে পাঠ প্রস্তুত হয় সম্ভবতঃ তাই সভাস্থলে পড়া হয় ১০ নভেম্বর ১৯৩৫ তারিখে, তারই প্রথমাংশ বর্জিত প্রেস-কপি হিসাবে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত।

অরূপরতনের শেষ সংস্করণ ছাপানোর কাহিনী, অবিরাম পরিমার্জন ও পরিবর্জনের কথা, শ্রীসুধীরচন্দ্র করের পূর্বোক্ত গ্রন্থে ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে এই পাণ্ডুলিপিগুলি দেখার ও আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে। ১০ নভেম্বর ১৯৩৫ তারিখটির বিষয় জানিয়েছেন সদৈবানুকূল বন্ধুবর শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

২৩ 'Cancelled' প্রেস-কপির ক-খ-গ তিনটি গুচ্ছে যথাক্রমে ১১, ২ ও ৮, মোট ২১ পাতা তথা পৃষ্ঠা।; এগুলি ব্যবহৃত প্রেস-কপির প্রথমাংশ, যথারীতি ছাপাখানার কালিমা-লাঞ্ছিত। (শান্তিনিকেতন-ছাপাখানায় ১৯৩৫ সনের কোনো রেকর্ড থাকলে অবশ্যই তা বিশেষ সন্ধানের বিষয়।) 'ক'এর ৮ পাতা (সুরঙ্গমা সুদর্শনা ও অদর্শন রাজাকে নিয়ে) এবং 'খ' ২ পাতা (ঠাকুরদা ও বিদেশিনী মেয়ের দল) ১৩৪২ সনের অরূপরতনে প্রায় সবটাই নেওয়া হয়েছে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে।

২৪ ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রণীত The Sanskrit Buddhist Story of Nepal (pp 124-25) গ্রন্থে সংকলিত। মিত্রমহাশয়ের The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal গ্রন্থে এই আখ্যানই সামান্য পরিবর্তনে ও সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হয়েছে।

২৫ শাপমোচন নৃত্যনাট্যের আলোচনা এ ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। ঐ নৃত্যনাট্যে নাট্যরস বা কথাবস্তুই মুখ্য নয়। নৃত্য গীত সাজ সজ্জা সব মিলিয়ে যা দাঁড় করানো হয়েছে, কবির জীবদ্দশায় প্রত্যেক অভিনয়-কালে নাচে গানে কল্পনায় প্রচুর পরিবর্তনও করা হয়েছে, শুধু সাহিত্যজিজ্ঞাসায় বা কাব্যবিচারে তার মর্মে প্রবেশ করা যাবে না। কবিকে অনেকের মুখাপেক্ষা করতে হয়েছে ; কে কেমন গাইতে পারে বা নাচতে পারে, উপস্থিত সামাজিকবৃন্দের রুচি বা গ্রহণক্ষমতাই বা কিরূপ, কিছুই উপেক্ষা করা যায় নি। বহু পরিবর্তনের মধ্যে, ১৩৪৭ পৌষে কবিজীবনের সর্বশেষ অভিনয়ে, শাপমোচন যে রূপ পরিগ্রহ করে সেটি সর্বোত্তম মনে হয়, সুপরিণত, সমুজ্জ্বল— দ্বাবিংশখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলী গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত (পৃ ৫০৮-৫০৯) দৃশ্যবিভাগ ও সংগীতসূচী দ্রষ্টব্য।

২৬ ইংরেজিতে : elephant park।

২৭ Critics and detectives are naturally suspicious. They scent allegories and bombs where there are no such abominations··· the human soul has its inner

drama, which is just the same as anything else that concerns Man, and Sudarsana is not more abstraction than Lady Macbeth who might be described as an allegory representing the criminal ambition in man's nature··· it does not matter what things are according to the rule of the critics. They are what they are, and therefore difficult of classification.

—Rabindranath, Letters to a Friend

১৫ নভেম্বর ১৯১৪ তারিখে সি. এফ. এণ্ড্রুজকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির একাংশ, বিষয় রাজা অথবা The King of the Dark Chamber। এ চিঠি লেখা হয় এণ্ড্রুজ সাহেবের যে চিঠির উত্তরে সেটি (তারিখ ১৩ নভেম্বর ১৯১৪) শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে সংরক্ষিত আছে; তারও একাংশ অবশ্যই উদ্ধারযোগ্য—

Brajendra Babu's criticism astounded me. রাজা not human! Allegorical! What next? Why! The character of the Queen so absorbed me that I could think of nothing else for days. It was a living soul going through an agony of conflict and entering at last into peace, a soul so living that I knew her intimately and could almost speak to her.

—C. F. Andrews

দেখা যাচ্ছে সুদর্শনার সজীব সত্যতা বা 'বাস্তবতা' সম্পর্কে রসিক পাঠকের প্রত্যয় স্রষ্টা কবির প্রতীতির থেকে একটুও কম নয়। এই সাক্ষ্যের বিশেষ মূল্য আছে।

প্রসঙ্গতঃ বলা উচিত The King of the Dark Chamber গ্রন্থ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন -কৃত প্রথম-প্রচারিত রাজা নাটকেরই স্বচ্ছন্দ অনুবাদ, মধ্যে মধ্যে অল্প কিছু বাদ দেওয়া হয়েছে আর তারই ফলে মূলের কয়েকটি গানও বাদ পড়েছে। এসবই কবি-কর্তৃক নির্দেশিত বা অনুমোদিত মনে হয়।

২৮ অন্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, নাটক না হলেও, The Hound of Heaven কবিতায় ত্রিকাল-ত্রিলোক-ব্যাপী যে inner dramaর যবনিকা সরে গেছে সে কি জীবন্ত সত্য না অলীক দিবাস্বপ্ন?—দুঃস্বপ্ন? উপলব্ধির যাথার্থ্যে ঐক্যে ও নিবিড়তায় সব কি প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব হয়ে ওঠে নি?

২৯ শেষ বাক্যটি এবং তার পরে সুরঙ্গমার গান 'আমি কেবল তোমার দাসী' দ্বিতীয় পাঠে বা প্রথম মুদ্রণে বাদ গেছে। বলাই বাহুল্য সুরঙ্গমার মধুরভাবের মধ্যে দাস্যভাব বা দাসীভাব প্রাধান্য পেয়েছে। অপর পক্ষে পুরোপুরি মধুরভাবের দুরূহতম সাধনায় সুদর্শনাকে বহু দুঃখদহন ভ্রান্তি অপরাধ পার হয়ে যেতে হচ্ছে—নাটকের শেষ দিকে সেই প্রেমের মাধুরী যখন শুচি শুদ্ধ হয়ে উঠেছে, পূর্ণতা পেতে চলেছে, তখন দাসীভাবও তার পক্ষে সহজ স্বতঃসিদ্ধ হয়েছে। বৈষ্ণবীয় রসবিচারে বলা হয়—মধুরভাবেরই অঙ্গীভূত হয়ে থাকে শান্ত দাস্য সখ্য এবং বাৎসল্য।

৩০ তুলনীয়: মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যামসমান ইত্যাদি।

৩১ উদ্ধৃতির স্থানে স্থানে স্থূলাক্ষর ব্যবহার করেছি আমরা।

৩২ এমন-কি ফাল্গুনীতেও ত্রিশটির বেশি গান নেই, এ ক্ষেত্রে গান উনচল্লিশটি হলেও, কেবল দশটি গান

রাজার পূর্বের দুটি পাঠে এবং অতিরিক্ত একটি প্রথম পাঠে পাওয়া যায়, এগারোটি গীতিমাল্য গীতালি থেকে সংকলন, সম্ভবতঃ সতেরোটি গান নূতন রচনা।

৩৩ রাজার প্রথম পাঠে রানী সুদর্শনার কাছে রাজারই এই প্রেমের আবেদন আর সেই ভাবেই সার্থকতর।

৩৪ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। রবীন্দ্রসংগীত (১৩৬৯), পৃ ২৩২।

৩৫ তদেব, পৃ ২৩০। স্থূলাক্ষর আমরা ব্যবহার করেছি।

৩৬ তৃতীয় খণ্ড রবীন্দ্রজীবনী (১৩৬৮), পৃ ১৯২। স্থূলাক্ষর আমাদের।

৩৭ রবীন্দ্রসংগীত (১৩৬৯), পৃ ২৩৭।

৩৮ প্রথম পাঠে ছাব্বিশটি গান ছিল। সর্বশেষ পাঠে পঁচিশটি, তার মধ্যে একটি প্রস্তাবনায় আর একটি উপসংহারে; ঠিক-ঠিক নাটকেব ভিতরে গান তেইশটি। শাপমোচনের বিভিন্ন অভিনয়ে নানা কাব্য থেকে নানা গান আহৃত, যখন যেগুলি প্রযোজনার পক্ষে সুবিধাজনক মনে হয়েছে। অরূপরতনের প্রথম প্রকাশ-কালে বা অভিনয়েও অনুরূপ প্রক্রিয়াই দেখা যায় না কি? রাজা অরূপরতনের অপর পাঠগুলি সম্পর্কে এরূপ অনুযোগের কারণ দেখা যায় না, 'অতিশয়' মনে হয় না, সমস্তই যথাযথ এবং সুন্দর— গানগুলি নাটকেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

৩৯ এই অনুচ্ছেদে, প্রয়োজনবোধে, বিভিন্ন উদ্ধৃতির স্থানে স্থানে স্থূলাক্ষর দেওয়া হয়েছে।

৪০ নূতন অরূপরতন কলিকাতার নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় ১৩৪২ সনের ২৫-২৬ অগ্রহায়ণ (১১-১২ ডিসেম্বর ১৯৩৫) তারিখে; কবি ঠাকুরদার বেশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ বলেন (রবীন্দ্রসংগীত, পৃ ২৩১)— 'তাঁর বয়স ৭৪ বছর।··· কণ্ঠে আগের মত আর শক্তি না থাকায় ঠাকুরদার কতকগুলি গান তিনি আমাকে গাইতে নির্দেশ দেন।··· চেলা সেজে সব সময় তাঁর পিছনে রঙ্গমঞ্চে ঘুরব··· তাঁর সঙ্গে গান গাইব। এই ভাবেই কয়েকটি গান আমি গেয়েছিলাম।' নাটকের ভিতরেও এ ইঙ্গিত আছে— 'ওরে, তোরা ধর্‌-না ভাই, গান।' শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর ও দৌহিত্রী নন্দিতা যথাক্রমে সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা সেজেছিলেন (রবীন্দ্রসংগীত, পৃ ২৩১)। পূর্বের অরূপরতনে সুরঙ্গমার গান ছিল না একটির বেশি, বর্তমানে অন্যরূপ— গানে গানে বিরাম বিচ্ছেদ কুণ্ঠা বা ক্লান্তি ছিল না। শুধু গানের দিক দিয়েই নয়, সুরঙ্গমার স্বচ্ছন্দ সত্তা আরও নানা দিকে নানা ভাবেই ফুটেছে। তার বিস্তারিত বিবরণ না'ই দেওয়া গেল, এটুকু স্পষ্ট যে কুমারী সুদর্শনার বিশেষ নির্ভরস্থলই হল সুরঙ্গমা— দিশারি নয় তাই বা বলি কেমন ক'রে? ভণ্ডরাজার ছলনা ধরা পড়তেই সুদর্শনা আগুনে ঝাঁপ দিতে গেলেন আবার ভয়ও পেলেন, তখন সুরঙ্গমাই এসে বলল—'ওই আগুনের ভিতর দিয়েই চলো।'

'সেকি কথা!'

'রাজাই আছেন ঐ আগুনের মধ্যে।··· আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, আগুনের ভিতরকার রাস্তা জানি।'

অতঃপর উভয়ের প্রস্থান, 'আগুনে হল আগুনময়' এই গানটি, উভয়ের পুনঃপ্রবেশ। তখন সুরঙ্গমাই আশ্বাস দিচ্ছে সুদর্শনাকে 'ভয় নেই তোমার ভয় নেই', আবার সুরঙ্গমাই প্রশ্ন করছে— 'কেমন দেখলে?'

'ভয়ানক, সে ভয়ানক! সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো! আমার মনে হল ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো কালো, ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো!'

সুদর্শনার প্রস্থানের পর সুরঙ্গমা বলে— 'যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে ভালোবাসা কিসের?'

'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' ইত্যাদি।

(বৈষ্ণবের প্রাণবল্লভ ভগবান্‌ও কালো, তবে 'ভয়ানাং ভয়ং' কখনো নয়— আচারী সংস্কারবদ্ধ বৈষ্ণব কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করেন না।) বলা বাহুল্য নয়— ১৩২১ সনের রাজায়, অর্থাৎ প্রথম পাঠে, এটুকু এবং আরও অনেকটা নাটকের মাঝখানেই অন্ধকার কক্ষের ঘটনা, পাত্রপাত্রী অদৃশ্য রাজা ও সুদর্শনা। বর্তমানে সমস্ত ব্যাপারটি আশ্চর্যভাবে সংহৃত আর রাজার কথাগুলিও সুরঙ্গমার উক্তিতেই আমাদের শ্রুতিগোচর। সুরঙ্গমার ব্যক্তিত্ব স্ফুটতর, 'নটীর পূজা'র শ্রীমতী'র সাজাত্যও স্পষ্ট— এসবই অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির তথা বর্জিত মুদ্রণপ্রতির প্রভাব তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৪১ রুক্মিণী (মঙ্গলা), হীরার (বিষবৃক্ষ) কনিষ্ঠা ভগিনী বলা চলে।

৪২ তৃতীয় খণ্ড গীতবিতান (১৩৭১), পৃ ৯৮১।

৪৩ রবীন্দ্রস্মৃতি (১৩৬৯), পৃ ৩৪। লক্ষ্য করবার বিষয়: ন্যাশলাল, মিনার্ভা, এমারেল্ড্‌, স্টার (?), এতগুলি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন সময়ে রাজা বসন্তরায় নাটক অভিনীত।

৪৪ রাজা বসন্তরায় বিচিত্র উপাদানে গঠিত (ইতিহাস-আশ্রিত কতটা জানি না)— রবীন্দ্রনাথের আপন সত্তা ও আদর্শভাবনা, সেই সঙ্গে রায়পুরের শ্রীকণ্ঠসিংহের চমৎকারজনক ব্যক্তিসত্তা মিলিত মিশ্রিত হয়ে যেন এই আকার পেয়েছে। আবার, পদকর্তা বসন্তরায় পৃথক্ ব্যক্তি হলেও, তিনিও কি এই কবিকল্পনার অঙ্গীভূত হয়ে নেই? (১২৮৯ শ্রাবণের ভারতীতেই 'বসন্তরায়' প্রবন্ধে উক্ত পদকর্তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর প্রশংসা করেন।) ফলতঃ এই চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের নূতন সৃষ্টি, ঠাকুরদা দাদাঠাকুর ধনঞ্জয় প্রভৃতির অগ্রজ। বঙ্কিমের অভিরাম (দুর্গেশনন্দিনী), রমানন্দ (চন্দ্রশেখর) বা সত্যানন্দ (আনন্দমঠ) আর-এক জাতের মানুষ।

৪৫ 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামাঙ্কিত এই গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয় ১৩১২ জ্যৈষ্ঠের 'সঙ্গীতপ্রকাশিকা'য়। গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডে (১৩৫৭ আশ্বিন) সংকলিত। ১১ জুন ১৯৫৩ (১৩৬০) তারিখের এক চিঠিতে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন বটে— 'গানটি রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া মনে হয় না। বিশেষ ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী" পুস্তকে ইহা কেদারবাবুর রচনা বলিয়া মুদ্রিত হয়। কিন্তু সঙ্গীতমুক্তাবলীতে একের রচনা অন্যের নামে সংকলনের দৃষ্টান্ত দুর্লভ না হওয়ায়, এ পর্যন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সঙ্গীতপ্রকাশিকার সাক্ষ্য একেবারে অগ্রাহ্য করার কোনো উপায় ছিল না। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথকে লেখা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একখানি পত্রের আবিষ্কারে সন্দেহের নিরসন হয়েছে বলা যায়, জানা গিয়েছে সত্যই এ গান রবীন্দ্রনাথের রচনা নয়। (দ্রষ্টব্য: দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫, পৃ ১৫২, পত্র ১৮।) রবীন্দ্রনাথের না হলেও, রবীন্দ্রনাথেরই ভাব-ভাষার অনুকরণে এই নূতন

রচনা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বউঠাকুরানীর হাটের অষ্টম পরিচ্ছেদে বিভাকে লক্ষ্য করে বসন্তরায় বলেন—

হাসিরে পায়ে ধরে রাখিবি কেমন করে,
হাসির যে প্রাণের সাধ ঐ অধরে খেলা করে!

রাজা বসন্তরায় -প্রক্ষিপ্ত গানটি ত্যাগ করে প্রায়শ্চিত্ত নাটকে রবীন্দ্রনাথ নূতন গান যোজনা করেছেন: হাসিরে কি লুকাবি লাজে ইত্যাদি।

৪৬ দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় খণ্ড রবীন্দ্রজীবনী (১৩৬৮), পৃ ১৯১-৯২ : শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ইঙ্গিতে ও তথ্যসমাহারে আমরা উপকৃত। এ বিষয়ে আমাদের সাধ্যমত একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে চাই, তারও উপযোগিতা আছে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 'কলিকাতার জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট' কিংস্‌ফোর্ড্ সাহেবকে হত্যার চেষ্টা হয় ১৩১৫ বৈশাখে। ভ্রমক্রমে 'ব্যারিস্টার কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা বোমার আঘাতে নিহত' হন। 'হত্যাকারী দুইজন যুবক— ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র চাকী।' (ইতিপূর্বে ১৮৯৭ জুনে পুনায় মহারানী ভিক্টোরিয়ার হীরক-জুবিলির দিনে 'প্লেগ-কমিশনার Mr. W. C. Rand এবং তাঁহার সহকারী Lt. Ayerst'কে হত্যা করেন 'দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার নামে দুই চিৎপাবন ভ্রাতা'। কিংসফোর্ড -হত্যার ব্যর্থ প্রয়াসের অল্পকাল পরেই কলিকাতার মানিকতলায় বোমার কারখানা ও বিপ্লবের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে।*

এই হল এক দিকে রক্তাক্ত বিপ্লবের পূর্বসংকেত ও প্রস্তুতিতে নানা মর্মান্তিক ঘটনা। অন্য দিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের ক্রান্তিকাল এসে গিয়েছিল এই সময়েই; সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি আমাদের জানা দরকার—

(১) ঘটনাচক্রে খৃষ্টীয় ১৮৯৬ সনেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি অন্যায় অত্যাচার ও অপমানের প্রতিবিধানে নবীন ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন। ভারতবর্ষে এসে বোম্বাই মাদ্রাজ কলিকাতায় বহু প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলেন, সংবাদপত্রে প্রচার করেন, সভাতেও বক্তৃতা দেন— টিলক গোখলে ভাণ্ডারকর প্রভৃতির সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করেন। অল্প কালের মধ্যে দেশে বিদেশে এই আন্দোলনের প্রতি সমাজসচেতন অনেকেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কেবল রাজনীতিক ক্ষেত্রের নেতৃবৃন্দ নয়, অন্য দেশপ্রেমিক মানবপ্রেমিক মনীষীরাও কতটা অবহিত ছিলেন তারই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আভাস

---

* দ্বিতীয় খণ্ড রবীন্দ্রজীবনী (১৩৬৮), শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের অগ্নিযুগ (১৯৪৮?) এবং টেণ্ডুল্‌করের Mahatma গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে পূর্বোক্ত তথ্যগুলি জানা গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ সম্পর্কে যেসব তথ্য পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে সমাহৃত, তারও বিস্তারিত উল্লেখ এবং আলোচনা পাওয়া যাবে শেষোক্ত গ্রন্থে।

১৯০৮ ফেব্রুয়ারির মডার্‌ন্ রিভিয়ু আমরা দেখেছি আর সুরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলী কাগজের উদ্ধৃতি পেয়েছি শ্রীমনোরঞ্জন গুহের সৌজন্যে— ১৮৯৬ থেকে শুরু করে পরবর্তী বহু বৎসরের স্টেট্‌স্‌ম্যান ইংলিশম্যান বেঙ্গলী ও অমৃতবাজার পত্রিকা ঘেঁটে গান্ধীজির সম্পর্কে বহু তথ্য ও সংবাদ তিনি সংকলন করেছেন, করছেন।

পাওয়া যায় স্বামী বিবেকানন্দের একখানি চিঠিতে (জয়পুর থেকে ২৭ ডিসেম্বর ১৮৯৭ তারিখে গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দকে লেখা)—

Mr. Setlur of Girgaon, Bombay,··· writes to me to send somebody to Africa to look after the religious needs of the Indian emigrants.··· The work will not be very congenial at present, I am afraid, but it is really the work for a perfect man. You know the emigrants are not liked at all by the white people there. To look after the Indians, and at the same time maintain coolheadedness so as not to create more strife—is the work there. No immediate result can be expected, but in the long run it will prove a more beneficial work for India than any yet attempted. I wish you to try your luck in this.··· And godspeed to you!

—Complete Works of Swami Vivekananda (1963), vol. VIII, pp. 440-41

(২) কলিকাতায় ১৯০১ ডিসেম্বরে ভারতীয় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশনে বিষয়টি উত্থাপিত হয়। ১৯০৪, ১৯০৫, ১৯০৬ সনে কংগ্রেসের বোম্বাই, বারানসী ও কলিকাতার অধিবেশনে উক্ত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়।

(৩) ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে দক্ষিণ আফ্রিকার এই আন্দোলন সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে বহু সংবাদ, পত্র ও প্রবন্ধ, প্রকাশিত হতে থাকে। ভারতের রাজধানী কলিকাতায় The Englishman, The Statesman, The Amrita Bazar Patrika, The Bengalee এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হন। তন্মধ্যে শেষোক্ত পত্রিকা থেকে একটি এবং The Modern Review থেকে অন্য একটি উদ্ধৃতি দিলেই সমকালীন প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মডার্‌ন্‌ রিভিয়ুর ঐ সংখ্যায় গান্ধীজির ছবিও ছাপা হয়।

The Bengalee, January 1, 1908

Passive Resistance in the Transvaal.

The following telegram will be read with interest in this country :—

Gandhi, the Indian leader in the Transvaal, besides five other Indians and three Chinese residents, have been sentenced at Johannesburg to quit within forty-eight hours for refusing to register there names. There are about 70,000 Indians at present in the Transvaal and they have declined to conform to the Act. Gandhi says he awaits arrest.

So the Government of the Transvaal must now be face to face with a serious situation. 70,000 Indians declining to conform to the Registration Act is a spectacle which is as humiliating to the authorities as it redounds to the glory of the Indians themselves.

The Modern Review, February 1908, p. 192

Mr. M. K. Gandhi and other Passive Resisters.

Mr. M. K. Gandhi, the well-known Indian leader of the Transvaal, with many others of his way of thinking, have been sent to jail for not registering themselves according to the notorious anti-Asiatic regulations of that colony. All honours to these sturdy patriots. May we be able to follow there example in thousands when the occasion comes!

(৪) ফলতঃ ট্রান্স্‌ভালে ১৯০৮ থেকেই সত্যাগ্রহীরা দল দলে অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, সাহস শৃঙ্খলা ও বীর্যের সঙ্গে, প্রভূত দুঃখক্লেশ ও কারাবাস বরণ করতে থাকেন আর গান্ধীজিকেও কয়েদ করা হয়। ১৫ অক্টোবর তারিখে দ্বিতীয়বার তাঁর সশ্রম কারাদণ্ডের পরে ১৬ তারিখেই লণ্ডনে যে প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে লাজপতরায়, সভারকর, খাপার্দে, বিপিনচন্দ্র পাল ও আনন্দকুমারস্বামী যোগ দেন।

(৫) ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ঋষি' টলষ্টয় 'A Letter to a Hindu' পত্র-প্রবন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করেন: পশুশক্তির দ্বারা পশুশক্তিকে ঠেকাতে পারে নি ব'লে ভারত পরাধীন; শতগুণে মহত্তর আত্মিক বলের দ্বারাই, অত্যাচার অবিচার -পরায়ণ, যূথবদ্ধ, বাহুবল অস্ত্রবল ও কূট রাজনীতির পরাজয় সুনিশ্চিত। এই বহুপ্রচারিত প্রবন্ধের নিহিতার্থ গান্ধীজি স্পষ্টই অনুধাবন করেন এবং ১ অক্টোবর ১৯০৯ তারিখে যখন টলষ্টয়কে প্রথম চিঠি লেখেন, প্রবন্ধটি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করার অনুমতিও প্রার্থনা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় অহিংস প্রতিরোধের বিবরণ জেনে টলষ্টয় অত্যন্ত খুশী হন আর ৭ সেপ্টেম্বর ১৯১০ তারিখে লেখেন: Therefore, your activity in Transvaal··· is the most essential work, the most important of all the work now being done in the world, wherein not only the nations of the Christian, but all the world, will unavoidably take part.*

উল্লিখিত বিবরণ থেকে এটুকু স্পষ্ট হয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দেই সূচনা (১৯০৮ জানুয়ারিতে সহকর্মীগণ-সহ গান্ধীজির এবং আরও বহু শত সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড) তার গুরুত্ব ও বিশেষত্ব, ঐ সময়েই বা অব্যবহিত পরে, দেশ-বিদেশের মনীষী ও মানব-প্রেমিকদের দৃষ্টি এড়ায় নি, তার গভীর গম্ভীর ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যও কেউ কেউ বুঝেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে 'প্রসঙ্গকথা'য় (ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫) বলেন 'ইংরেজের এই পরবিদ্বেষ, বিশেষত প্রাচ্যবিদ্বেষ, নেটাল অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশে কিরূপ নখদন্ত বিকাশ করিয়া উঠিয়াছে তাহা

* টেণ্ডুল্‌করের গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি অংশতঃ উদ্‌ধৃত হয়েছে বটে, দুঃখের বিষয় কোন্‌ তারিখে কী উপলক্ষে লেখেন সেসব অস্পষ্ট থেকে গেছে। তা হলেও এখানে তুলে দেওয়া যাক: **Tagore referred to the struggle in South Africa as the "steep ascent of manhood, not through the bloody path of violence but that of dignified patience and heroic self-renunciation.**

—Mahatma, vol. I (1960), P. 145

কাহারও অবিদিত নাই' আর প্রায়শ্চিত্তের প্রায় সমকালীন এক প্রবন্ধে ('সমস্যা', প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৫) পুনশ্চ লিখলেন: 'য়ুরোপের যে-কোনো জাতি হোক্-না কেন, সকলেরই কাছে ইংরেজের উপনিবেশ প্রবেশদ্বার উদ্‌ঘাটিত রাখিয়াছে আর এশিয়াবাসী মাত্রই যাহাতে কাছে ঘেঁষিতে না পারে সেজন্য তাহার সতর্কতা সাপের মতো ফোঁস করিয়া ফণা মেলিয়া উঠিতেছে।'

পথ ও পাথেয়, সমস্যা, সদুপায়, দেশহিত—প্রবন্ধ কয়টি† মোটের উপর একই সুরে বাঁধা, একই বক্তব্য-খ্যাপনে ১৩১৫ সনের জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ও আশ্বিনের সাময়িক পত্রে প্রকাশিত; শেষোক্ত প্রবন্ধের সূচনাতে রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'এ কথা নিশ্চিত মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশের কোনো উদ্‌যোগ যদি দেশের সর্বসাধারণকে আশ্রয় করিতে চায় তবে তাহা ধর্মকে [নিত্যধর্মকে] অবলম্বন না করিলে কোনোমতেই কৃতকার্য হইবে না। কোনো দেশব্যাপী সুবিধা, কোনো রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-সাধনের প্রলোভন কোনোদিন আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে শক্তি সঞ্চার করে নাই। অতএব আমাদের দেশের বর্তমান উদ্দীপনা যদি ধর্মের উদ্দীপনাই হইয়া দাঁড়ায়, দেশের ধর্মবুদ্ধিকে একটা নূতন চৈতন্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলে, তবে তাহা সত্য হইবে, স্থায়ী হইবে, দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।'

একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ নানা প্রবন্ধে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন, প্রায়শ্চিত্ত নাটকে, বিশেষতঃ ধনঞ্জয়-চরিত্রে, তাই সাকার করে তুলছেন, আর সমুদ্রপারে গান্ধীজির অভিনব সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে তা বহুজীবনে জীবন্ত এবং বহু ঘটনায় বাস্তব হয়ে উঠছিল—ভেবে দেখতে গেলে এতে বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই।

প্রায়শ্চিত্ত নাটক ১৩১৫ বঙ্গাব্দে (১৯০৮-১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে) ঠিক কোন্ সময়ে লেখা আমাদের জানা নেই। ধনঞ্জয়বৈরাগীর চরিত্র গান্ধীচরিত্রের মুকুরিত প্রতিবিম্ব না হলেও, রূপান্তর বলা চলে। স্বরূপের পার্থক্য ঘটে নি; উভয়ের জীবনদর্শন মূলতঃ এক। এই আন্তরিক ঐক্যের এটিও বিশেষ কারণ যে, কবির ধ্যান-ধারণায় বা স্বভাবে অসত্য ও অন্যায় সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা, পৌরুষ, বীর্য, এই গুণগুলি যেমন ছিল, সবার উর্ধ্বে ছিল প্রেম মৈত্রী ও করুণার স্থান— হিংসা বিদ্বেষ বৈরভাব ও একান্ত জাত্যভিমান ছিল অধর্ম বা পরধর্ম। অর্থাৎ, উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথে ও গান্ধীতে স্বভাবের সম্পূর্ণ মিল ছিল। তবে একজন ছিলেন কবি ও মনীষী, আর-একজন কর্মযোগী ও তপস্বী।

৪৭ গ্রীষ্মের ছুটির আগে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ছাত্ররা মিলে এর অভিনয়। বিভার ভূমিকায় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য নারীচরিত্রে কারা নামেন জানা যায় নি। দ্বিতীয় অভিনয় হয় ৪ অক্টোবর ১৯১০ তারিখে পূজার ছুটির পূর্বে, এবারে কবি ধনঞ্জয়বৈরাগী রূপে অভিনয় করেন।

৪৮ অরূপরতন (১৩৪২), সুরঙ্গমার উক্তি। রাজার প্রথম পাঠেও অনুরূপ উক্তি আছে।

৪৯ এ নাটকে নেই, ধনঞ্জয়ের এই গানটি আছে মুক্তধারায়। প্রায়শ্চিত্ত-পরিত্রাণে বৈরাগীর অন্যান্য গানের তাৎপর্য কিন্তু অভিন্ন।

৫০ মাধবপুর ঈশ্বরের পুরী, শিবতরাই কল্যাণের ভূমি—মনে করা অসংগত নয়। মাধবপুর মুক্তধারায় হয়ে উঠেছে শিবতরাই।

† দশমখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্রষ্টব্য; এতৎসম্পর্কিত সমুদয় তথ্য এবং উদ্‌ধৃতি উক্ত গ্রন্থ থেকে আহৃত।

৫১ পরবর্তী আলোচনার সুবিধার জন্য নাটকের অঙ্কবিভাগ আমরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছি এবং পর পর দৃশ্যগুলি গণনা ক'রে পরিত্রাণ ও প্রায়শ্চিত্তের তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছি। পরিত্রাণ বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিংশ খণ্ডে।

৫২ প্রায়শ্চিত্ত, কারাগারের দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্ক, পঞ্চম।

৫৩ যেমন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

৫৪ ভগবান্ বুদ্ধের জন্ম, বোধিলাভ, পরিনির্বাণ— সবই তরুতলে, সুবিশাল মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে, পথিপার্শ্বে। রবীন্দ্রনাথের অন্য মানসপুত্র গোরার জন্মলাভ রাষ্ট্রবিপ্লবের রাত্রে, ঠিক যে ঘরে তা বলা যায় না। তাৎপর্যের দিক দিয়ে, পুরাণে ইতিহাসে বা সাহিত্যে, কোনো ঘটনাই সামান্য হয় নি।

৫৫ রাজা (১৩২৭), তৃতীয় দৃশ্য।

৫৬ মহাত্মাজি হওয়ারও সেই বিপদ, 'বাপু' তা মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন আর তারই আশঙ্কায় কবিও নাটকে প্রবন্ধে বার বার সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন।

৫৭ রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারার ভাবব্যাখ্যা দেন শ্রীকালিদাস নাগকে লেখা ২১ বৈশাখ ১৩২১ তারিখের চিঠিতে। প্রচল পুস্তকের অথবা চতুর্দশখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

৫৮ 'যক্ষপুরী', পরে 'নন্দিনী' নাম ছিল। লেখা হয় ১৩৩০ সনের গ্রীষ্মে শিলঙ শৈলাবাসে।

৫৯ 'কালের যাত্রা' বা 'কবির দীক্ষা'কে আমরা রীতিমত নাটক বলতে চাই নে, রঙ্গমঞ্চে রূপদান অসম্ভব না হলেও।

৬০ বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই, তবু উল্লেখযোগ্য যে, মুক্তধারা থেকে রক্তকরবীর নাট্যগতি যেন দ্রুততর। (অনুভব থেকেই বলছি, ঘড়ি ধ'রে বা অঙ্ক ক'ষে বলছি না— নাটক দুটির অভিনয়ও দেখি নি।) মুক্তধারার পথটি প্রদক্ষিণপথ, 'সানুতে সানুতে আরোহণ' করলেও কম্বুরেখায়িত তার আকার-প্রকার— পাত্রপাত্রীরা সকলেই ফিরে ফিরে আসছে। এর তুলনায় যক্ষপুরীর জটিল জালায়নের সামনে যে পথ তা সোজা চলেছে কোন্ লক্ষ্যে বা নির্লক্ষ্যে কে জানে। যাত্রী নরনারীদেরও সেই গতি, সেই মতি। ঈশান কোণে ঝঞ্ঝাবাতের সংকেত আছে, সর্বনাশের। মানুষগুলো সুস্থ স্বাভাবিক নয়, অর্থাৎ মুক্তধারার 'পেট্রিয়ট' মানুষগুলোর থেকেও অসুস্থ, অস্বাভাবিক। কাজেই নাট্যব্যাপারের দ্রুতি তার চরম সীমায় পৌছুবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

৬১ কবিগুরুর রক্তকরবী (১৩৫৯) গ্রন্থে শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬২ জড়োপাসকদের প্রতীক নিজেদের বানানো ধ্বজপতাকা, প্রাণপূজারীদের প্রতীক ঈশ্বর বা প্রকৃতির সৃষ্টি রক্তকরবীর ফুল।

৬৩ একাধিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবীর আলোচনা করেছেন; প্রচল সংস্করণে (১৩৬৭) কিছু পাওয়া যাবে। তন্মধ্যে The Manchester Gurdianএ লেখা কবির বক্তব্য বিশেষ দ্রষ্টব্য। অনেক সময়েই রবীন্দ্রকূটের ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ যা বলেন, উপমায় অলঙ্কারে বক্রোক্তিতে বা সকৌতুক পরিহাসে সুন্দর হলেও, অল্পবুদ্ধি অরসিকের কাছে যথেষ্ট প্রাঞ্জল হয় না। এঁদের প্রতি কবির যেন নিবেদন: 'যদি বুঝে না থাকো, তোমার বুঝেও কাজ নেই।' ইংরেজি লেখাটি অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সংক্ষিপ্ত, সুন্দর।

৬৪ প্রবন্ধরচনা শেষ করার কয়েক মাস পরে রবীন্দ্রনাথের পুরাতন পাণ্ডুলিপিতে কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যায়। সেসব তথ্য যেমন বিশ্বভারতী পত্রিকার দুটি সংখ্যায় ('পুষ্পাঞ্জলি' ও 'নলিনী' শিরোনামে যথাক্রমে ১৩৭৫ সনের শ্রাবণ-আশ্বিনে ও কার্তিক-পৌষে) পাওয়া যাবে, তেমনি তৃতীয়খণ্ড গীতবিতানের চতুর্থ সংস্করণেও (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬) সংকলিত। এ ক্ষেত্রে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তালিকার চতুর্থ গানটি নলিনীর বহু পুরাতন পাণ্ডুলিপিতে বা খসড়ায় পাওয়া যায় না তা নয় তবে তার প্রয়োগের নির্দেশ ছিল স্থানান্তরে, আর শেষ পর্যন্ত গ্রন্থে ছাপা হয় নি। ষষ্ঠ গানটি ভগ্নহৃদয় কাব্যের একাদশ সর্গের অংশ বিশেষের সংকলন। প্রথম তৃতীয় এবং সপ্তম গান রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহের 'পুষ্পাঞ্জলি' পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়, ১২৯১ বৈশাখে বা অব্যবহিত পরে রচিত মনে হয়। ১২৯০ ফাল্গুনে অভিনীত বিবাহ-উৎসবে প্রথম গানটি তা হলে কেমন করে পাওয়া গেল বোঝা যায় না। বিবাহ-উৎসব পুস্তিকার যে প্রতি আমাদের করগত, সেটি ছাপা হয় বহুবৎসর পরে— এটাই কি কৈফিয়ত ?

১ জুন ১৯৬৯

সংযোজন-সংশোধন

'প্রমাণ ও তথ্য -পঞ্জী'র ৪৬ সংখ্যা :

প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬) নাটকের রচনা ১৩১৫ চৈত্রে বা ১৩১৬ বৈশাখে সমাধা হয় এরূপ অনুমান করা যায় ; কেননা, প্রায়শ্চিত্ত-ধৃত ৪টি গান -রচনার তারিখ ১১, ১৩, ১৪ ও ১৯ চৈত্র নানা সূত্রে জানতে পারি আর নাটকে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'বিজ্ঞাপন'এর তারিখ : ৩১ বৈশাখ ১৩১৬।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজি-পরিচালিত সত্যাগ্রহ সম্পর্কে কবির যে মন্তব্য টেণ্ডুলকরের গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড, পৃ ১৪৫) পাওয়া যায় তার প্রথম প্রকাশ Indian Opinionএর Golden Numberএ ; গান্ধীজি ঐ পত্রের সম্পাদক ছিলেন, ঐ সংখ্যা তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকা -ত্যাগের পূর্বে প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সনে। শ্রীক্ষিতীশ রায়ের এক প্রবন্ধে এই তথ্য পাওয়া গেল।

৪ জুলাই ১৯৬৯

বাংলার সংগীতশিল্পে রবীন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

১

দু-একটি বিরল এবং গদ্যধর্মী ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে, প্রাচীন ও মধ্য যুগের সমস্ত বাংলা কবিতাই একাধারে কবিতা এবং গান। বাংলা গানও তাই, চিরদিনই একাধারে গান এবং কবিতা। বাংলা সংস্কৃতিতে কাব্য ও গানের এই যুক্তবেণী আংশিকভাবে মুক্ত হয়েছে অষ্টাদশ শতকে, বিশেষ করে উনবিংশ শতকে, তার আগে নয়। এই ছাড়াছাড়ির গরজটা এসেছে কাব্যের তরফ থেকেই, গানের তরফ থেকে নয়। আধুনিক বাংলা কাব্য গান-বর্জিত কাব্য, কিন্তু আধুনিক বাংলা গান কাব্য-বর্জিত গান নয়। বাংলার সংগীত-সংস্কৃতিতে কাব্য-বর্জিত গান কখনোই খুঁজে পাব না। প্রাচীন কালেও না, আজও নয়।

বাংলা সংগীত চিরদিনই, আজকাল যাকে আমরা কাব্যসংগীত বলে থাকি, মোটামুটি সেই জাতের জিনিস। কাব্যগুণ কোথাও বেশি কোথাও কম, কোথাও সূক্ষ্ম কোথাও স্থূল, কখনো সুমার্জিত কখনো সরল সাদামাটা, কিন্তু নেই এমন কখনোই নয়। নিতান্ত অরসিক না হলে লোকসংগীতের কাব্যগুণকে আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারব না, এবং তা যদি না পারি, তা হলে অনায়াসেই বলব যে, বৌদ্ধ সহজিয়াদের চর্যাগান থেকে শুরু করে বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী ও পালাকীর্তন, শাক্ত সাধক-কবিদের আগমনী বিজয়া কালীকীর্তন বা সাধনতত্ত্বের গান, বাউল-দরবেশীদের গান, নিধুবাবুর প্রণয়সংগীত থেকে নজরুল ইসলামের গজল, কিংবা একেবারে হাল আমলের আধুনিক-মার্কা গান, এর সবই কাব্যসংগীত। অন্যদিকে সারি-জারি-ভাটিয়ালী গান, নানা রকমের আনুষ্ঠানিক বা ক্রিয়াকর্ম-আশ্রিত গান, একটু বিস্তৃত অর্থে ধরলে এরাও কাব্যসংগীত। এইসব নানা জাতের নানা মূল্যের কাব্যসংগীতের বাইরে, আর কোনো স্বতন্ত্র সংগীতধারার এমন কোনো সংগীত যাকে স্বপ্রতিষ্ঠ ধ্বনিশিল্প বলতে পারি তার অস্তিত্ব বাংলাদেশে সম্ভবত কোনো কালেই ছিল না। বাংলা গানের আবেদন সব সময়ই কথা ও সুরের মিলিত আবেদন, কখনোই কেবল সুরের আবেদন নয়।

সংগীত জিনিসটা অবশ্য দু রকমেরই হতে পারে। এক-রকম হচ্ছে বিশুদ্ধ ধ্বনিশিল্প, কেবল ধ্বনিকে নিয়ে রূপ-নির্মাণ। দ্বিতীয় হচ্ছে ধ্বনির রূপ আর বাণীর রূপ উভয়কে মিলিয়ে এমন যৌগিক চরিত্রের রূপ-নির্মাণ যা কেবল ধ্বনিরও নয়, কেবল বাণীরও নয়।[১] বাংলার সংগীত-সংস্কৃতিতে এই দ্বিতীয়টিরই সাক্ষাৎ পাই, প্রথমটির পাই না।

আদৌ পাই না বললে হয়তো একটু বাড়িয়ে বলা হবে। কিন্তু যেভাবে পাই তাতে অনায়াসে বলা যায়, তা বাঙালীর নিজস্ব জিনিস নয়, উত্তর-ভারত থেকে আমদানী-করা বস্তু। এটা নিন্দা-প্রশংসার কথা নয়, ইতিহাসের সত্য। বাংলা গানের এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের মূলে একদিকে আছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির গ্রামীণতা এবং অন্য দিকে আছে বাঙালীর জাতীয় স্বভাবের টান।

১. উচ্চাঙ্গ সংগীতে 'বাণী' কথাটির একটি পারিভাষিক অর্থও আছে। এখানে 'বাণী' সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। কথা বা অর্থযুক্ত বাক্য— এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

সংগীতের এই দুই ধারার মধ্যে, বিশুদ্ধ ধ্বনিশিল্প আর ধ্বনি-বাণীর মিলিত শিল্প, এদের মধ্যে কোন্‌টি যে মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীনতর, তা বলা কঠিন। খুব সম্ভব শেষোক্তটিই। অর্থাৎ ধ্বনি ও বাণীর মিলিত রূপটিই সম্ভবত সংগীতের গোড়াকার রূপ। সংগীতের উদ্‌ভবের বিষয়ে সংগীতবিদ্যার গবেষকদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু, সংগীতের জন্ম যে ভাবেই হোক, তার প্রাথমিক বিকাশ যে আদিম রিচুয়ালে, গোষ্ঠীজীবনের সম্মিলিত ক্রিয়াকাণ্ডে, এ বিষয়ে প্রায় সব গবেষকই অল্পবিস্তর একমত। এই আদিম সংগীত নিশ্চয়ই খাঁটি ইস্থেটিক বস্তু ছিল না, ছিল মুখ্যত ব্যবহারিক। কিন্তু শিল্পও তার মধ্যে মিশে ছিল। তা ছিল একই সঙ্গে আনন্দ এবং ইন্দ্রজাল; একই সঙ্গে প্রার্থনা এবং ফলপ্রাপ্তি; একই সঙ্গে গান নাচ এবং অভিনয়; একই সঙ্গে বাক্য এবং বচনাতীত আকূতি।

এই জটিল সংমিশ্রণের মধ্যে থেকে তিনটি অঙ্গকে বিশেষভাবে লক্ষ করতে পারি: এদের প্রত্যেকটিকে নিয়েই পরে স্বতন্ত্র শিল্প গড়ে উঠেছে। এই তিনের একটি হল সুর-সম্বলিত কথা, বা গান। দ্বিতীয় নৃত্য। তৃতীয় অভিনয়। যেমন করে নৃত্য ও অভিনয়ের আপন আপন পৃথক্‌ শিল্পরাজ্য স্থাপিত হয়েছে, গানের শিল্পরাজ্যও তেমনি করে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। গানের এই স্বতন্ত্র স্বপ্রতিষ্ঠ রূপেই শিল্প হিসেবে সংগীতের প্রাথমিক আত্মপ্রতিষ্ঠা।

সংগীতের এই প্রাথমিক শিল্পরূপের উপাদান কিন্তু অমিশ্র নয়। ধ্বনি যেমন তার উপাদান, কথাও তেমনি তার অপরিহার্য উপাদান। তা ধ্বনি ও বাণীর যৌগিক-শিল্প।

কথারও অবশ্য একটা আলাদা শিল্পরূপ আছে, আলাদা শিল্প-জগৎ আছে— যাকে বলি কাব্যজগৎ। সে জগতে সংগীতের ধ্বনির, সংগীতের সুরের প্রবেশ নেই। তা যদি হয়, তাহলে ধ্বনিরই বা আলাদা একটা শিল্পভূমি থাকবে না কেন, যেখানে ধ্বনিরই স্বাধিকার, কথার নয়?

গানের মধ্যে থেকে— কথা ও ধ্বনির যুক্তবেণীকে মুক্ত করে দিয়ে— কালক্রমে স্বতন্ত্র সুর-জগৎও গড়ে উঠল। এ'কে বলতে পারি সুর-লহরীর, সুর-সংগতির শিল্প, বিশুদ্ধ ধ্বনিশিল্প। উপাদানের অমিশ্রতার দিকে তাকিয়ে একে 'বিশুদ্ধ-সংগীত' আখ্যাও দিতে পারি।

বিশুদ্ধ-সংগীতের উদ্‌ভব কিন্তু ধ্বনি ও বাণীর যৌগিক শিল্পরূপের বিকাশে কোনো বাধা ঘটায় নি। সংগীতের এই দুই ধারাই দীর্ঘকাল পরস্পরের পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে আজকের কালে এসে পৌঁছেছে। দুই ধারাই পরস্পরকে পুষ্ট করতে করতে এগিয়ে চলেছে। বিশুদ্ধ সংগীতের দানে ধ্বনি-বাণীর যৌগিক-শিল্পের— অথবা বলি গানের— সাংগীতিক ভিত্তি দৃঢ়তর হয়েছে, তার শিল্পরূপ ক্রমশ পরিচ্ছন্নতর ও সমৃদ্ধতর হয়েছে।[২] অন্যদিকে গানের দানে— অথবা বলতে পারি কাব্যগীতির দানে, এবং তার মধ্যে লোকসংগীতের দানও অবশ্য-গণনীয়, বিশুদ্ধ-সংগীতে ব্যাপকতা এসেছে, বৈচিত্র্য এসেছে, জনজীবনের সঙ্গে তার যোগ অক্ষুণ্ণ থেকেছে, তার মধ্যে অভাবিত প্রাণশক্তির সঞ্চার ঘটেছে।

উচ্চাঙ্গের সংগীতশিল্প সব দেশেই আজ বিশুদ্ধ ধ্বনি-শিল্প। দেশভেদে তার রূপ ও চরিত্র ভিন্ন। কিন্তু ধ্বনিই— ধ্বনি ও নীরবতাই— তার একমাত্র উপাদান। অন্য কোনো শিল্পের উপর সে নির্ভরশীল নয়।

২. অতঃপর এ প্রবন্ধে 'গান' কথাটির দ্বারা ধ্বনি ও বাণীর যৌগিক-শিল্পকেই বোঝানো হবে। অমিশ্র ধ্বনিশিল্প বোঝাবার জন্য 'বিশুদ্ধ-সংগীত' কথাটি ব্যবহৃত হবে। 'সংগীত' কথাটি সাধারণভাবে উভয়কেই একসঙ্গে বোঝানোর কাজে প্রযুক্ত হবে।

কবিতায় যাকে আমরা বলি অর্থ বা বাগর্থ— তা সে বাচ্যার্থ ই হোক আর ব্যঞ্জনাই হোক, তা তার লক্ষ্য নয়। যন্ত্রসংগীতেও তাই, কণ্ঠসংগীতেও তাই। তার একমাত্র লক্ষ্য ধ্বনির সহায়তায় বিশিষ্ট রূপ-নির্মাণ। কথা যদি আদৌ স্থান পায়, তো সে নিতান্তই অনুগামী বা অনুষঙ্গ হিসেবে।

কিন্তু কোনো দেশের সংগীত-সংস্কৃতিই কেবলমাত্র বিশুদ্ধ-সংগীতেরই সংস্কৃতি নয়। সব সভ্য দেশেই বিশুদ্ধ-সংগীতের পাশাপাশি গানের অর্থাৎ কথা ও সুরের যৌগিক-শিল্পেরও সাক্ষাৎ পাই। গান আছে, বিশুদ্ধ-সংগীত নেই, এমন সংস্কৃতির সন্ধান অনেক পাওয়া যাবে। বিশুদ্ধ-সংগীত আছে, গান নেই, এমন দেশ এমন সংস্কৃতি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নিতান্ত অনগ্রসর জন-গোষ্ঠীর কথা বাদ দিলে, প্রায় সর্বত্রই গানের ধারা, দুটি অল্পবিস্তর পৃথক্ খাতে প্রবাহিত হয়ে থাকে। তার একটি হল লোকসংগীতের খাত। দ্বিতীয়টির কোনো নাম নেই। এ গানের স্বভাবে উচ্চাঙ্গের বিশুদ্ধ-সংগীতের সাংগীতিক আভিজাত্য নেই বটে, কিন্তু এ গান লোকসংগীতের মতো অনভিজাতও নয়, একেবারে জনসমাজগতও নয়। এ হল মধ্যবর্তী স্তরের গান। সমাজের শিক্ষিত স্তরের গান। অনেক সময় এই মধ্যগা-সংগীতই উচ্চাঙ্গ সংগীত আর লোকসংগীতের মাঝখানের যোগসূত্র।

ভারতীয় সংগীত-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই তিন ধারাই— উচ্চাঙ্গ বা বিশুদ্ধ-সংগীত, মধ্যগাসংগীত বা শিষ্ট সমাজের গান এবং লোকসংগীত বা জনসমাজের গান— অনেক কাল ধরে পাশাপাশি বয়ে চলেছে। এ দেশের উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচলিত নাম ক্লাসিক্যাল সংগীত বা রাগসংগীত। কখনো কখনো, সম্ভবত একটু ভুল করেই, একে মার্গসংগীতও বলা হয়ে থাকে। দক্ষিণের কথা বিস্মৃত হয়ে কেউ কেউ একে হিন্দুস্থানী সংগীতও বলে থাকেন!

উত্তর-ভারতের বিশুদ্ধ-সংগীতের ধারাটি যেমন সুসমৃদ্ধ সেই তুলনায় এবং সেখানকার লোকসংগীতের তুলনায় মধ্যবর্তী স্তরের গানের ধারাটি লক্ষণীয় রকমের শীর্ণ। বাংলাদেশে তা নয়। এখানে লোকসংগীত এবং মধ্যবর্তী স্তরের সংগীত এই দুই ধারাই শক্তিশালী। বিশুদ্ধ-সংগীতের সন্ধান নেই। ব্যতিক্রমের মতো যদি কোথাও তাকে পাওয়াও যায়, তো সে না-পাওয়ারই সামিল। তা বাঙালীর নিজের জিনিস নয়। উত্তর-ভারত থেকে আমদানী-করা। বাংলাদেশের উচ্চ-নীচ সব সংগীতই গান— কথা ও সুরের যৌগিক-শিল্প।

যৌগিক-শিল্প যৌগিক বলেই যে শিল্প হিসেবে নীচু হবে, সব সময় এমন বলা যায় না। বেশির ভাগ অল্প-স্বল্প অনভিজাত ক্ষেত্রে হলেও, সব ক্ষেত্রে নয়। আসলে তুলনার কথাই ওঠে না। কেননা যৌগিক-শিল্পের জাত আলাদা, স্বাদ আলাদা। গানের ক্ষেত্রে বলতে পারি, অভ্যস্তের কাছে তার আকর্ষণই আলাদা। যেমন বাঙালীর কাছে। বাঙালী কথাকেও চায়, সুরকেও চায়, দুয়ে মিলে তবে তার কাছে গান পূর্ণ হয়।

গানে কথার আবেদন আসলে বাগর্থের আবেদন, বাচ্যার্থ ও ব্যঞ্জনার আবেদন। ঠিক যে-আবেদন কাব্যের। কথার আবেদন মানেই কাব্যগত আবেদন। কথা ও সুরের সংযোগ আসলে হল বাণীশিল্প আর ধ্বনিশিল্পের সংযোগ, কবিতা আর বিশুদ্ধ-সংগীতের যৌগিকতা। যৌগিক বলে যে অ-শিল্প তা মোটেই নয়। যৌগিক-শিল্প হলেও বাংলা গানের শিল্পত্ব আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

২

যৌগিক-শিল্প যৌগিকতার কম-বেশি নিয়ে নানা রকমের হতে পারে। নাট্যাভিনয় একটা বিচিত্র রকমের যৌগিক-শিল্প। তার মধ্যে সাহিত্য আছে, অভিনয়কলা আছে, সংগীত আছে, চিত্রশিল্পেরও দান আছে, এমনকি তার দৃশ্য-পরিকল্পনায় স্থাপত্যেরও দান আছে। অনেকে বলবেন, প্রয়োগ-কলাই নাট্যভিনয়কে ঐক্যে গ্রথিত করে, তাকে একটি সামগ্রিক শিল্পবস্তুতে পরিণত করে। নাট্যশিল্পে এদের সকলের গুরুত্ব নিশ্চয়ই সমান নয়, কিন্তু কে যে প্রধান, কার আপেক্ষিক গুরুত্ব কতখানি তা নিশ্চিত করে বলা সহজ নয়। তার মধ্যে আবার নাটকে-নাটকে ভেদ আছে।

গানের ক্ষেত্রে অবশ্য যৌগিকতাটা এমন বহু-শিল্পের নয়— মাত্র দুটি শিল্পের। কিন্তু সেখানেও গানে-গানে ভেদ আছে। যে-সব বিভিন্ন শিল্প-উপাদানকে সম্মিলিত করে যৌগিক-শিল্পের সমগ্রতা রচিত হয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, সমগ্রতার মধ্যে তারা সবাই তুল্যমূল্য নয়। একটিই প্রধান, অপরটি বা অপরগুলি তার অনুগামী। একটিকে আশ্রয় করেই মূল রস, অপরদের কাজ তার পুষ্টিসাধন, তার মধ্যে কিছু স্বাদবৈচিত্র্যের সঞ্চার। গানের ক্ষেত্রেও তাই। অধিকাংশ সময়ই দেখতে পাব, গানে কথা আর সুর দুই-ই সমান প্রধান নয়। প্রায় গানেই দেখি, একটি মুখ্য, অপরটি অনুগামী। কিন্তু কোন্‌টি যে মুখ্য আর কে যে অনুগামী তার কোনো বাঁধা নিয়ম নেই। গানে-গানে ভেদ আছে। কথা বা সুরের আপেক্ষিক গুরুত্ব নানান্‌ রকমের হতে পারে। কোনো গানে কথাই মুখ্য, মূল রস কথাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে, সুর কেবল সেই কাব্যরসকে অধিকতর ব্যঞ্জনাময় করে তোলার কাজে ব্যাপৃত। আবার কখনো দেখি, ধ্বনিই রসের অবলম্বন, বাগর্থ তার মৃদু প্রতিধ্বনি মাত্র।

গানে-গানে এর নানান্‌ মাত্রাভেদ সম্ভব। বাগর্থ এমন গৌণও হতে পারে যে সে-গানকে বিশুদ্ধ ধ্বনিশিল্প বলে গণ্য করাই সংগত। যেমন অনেক হিন্দি গানে দেখতে পাই। সেখানে ভৈরবী বা ভৈরোঁ'র, বেহাগ বা বাহারের, কাফী বা কানাড়ার রাগ-রূপ প্রকাশের দিকে, তার বিশিষ্ট মেলডিক প্যাটার্নের প্রতিষ্ঠার দিকে গায়কের দৃষ্টি এতই একাগ্র যে, গানের কথার বিশুদ্ধির দিকে, তার অর্থের যথার্থতার দিকে অমনোযোগ অবশ্যম্ভাবী।

তাতে ক্ষতিও নেই। রাগরাগিণীর আত্মবিস্তারে শ্রোতার শ্রবণমন এমনভাবে আবিষ্ট যে, বাগর্থের ক্ষতিবৃদ্ধিতে তাঁর চৈতন্যে গানের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ ঘটে না। এ যেমন হয়, তেমনি কখনো কখনো ধ্বনি এমন গৌণও হতে পারে যে, সে গানকে আদৌ গান বলা যায় কি না, তা আদৌ সংগীতগোত্রের অন্তর্গত কি না, তাতেই সন্দেহ করা যায়।

কখনো কখনো এমনও হয়তো হয়, যেখানে কাব্যরস ও সংগীতরস উভয়ের মিলনটা পার্বতী-পরমেশ্বরের মিলনের মতো। অথবা বলি, অর্ধনারীশ্বরের মতো— দুয়ে-এক এবং একে-দুই।[৩] এমন যেখানে ঘটে— যদি সত্যিই এরকম ঘটা আদৌ সম্ভব হয়— সেখানে প্রধান অপ্রধানের কোনো প্রশ্নই নেই। এ মিলন পরস্পরের কাছে পরস্পরের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মিলন। যেখানে একের মধ্যে অপরের সম্পূর্ণ আত্মবিগলন ঘটে, সেই রকম মিলন।

৩ রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ করি: "বাংলাদেশে সংগীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ।" —সংগীতচিন্তা, পৃ ১৩৩

গানে এই রকম মিলন সত্যিই সম্ভব কি না তা বিচারসাপেক্ষ। যদি সম্ভবও হয়, গান-বিশেষে তা হয়েছে কি না, তা অনুভব করা যেতে পারে, প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা দুঃসাধ্য। এ রকম মনে হতে পারে যে, কথা ও সুরের সমানাধিকারই এই মিলনের ভিত্তি। কিন্তু সে-অনুমান কতদূর তথ্য-ভিত্তিক হবে সন্দেহ আছে। সমানাধিকারের ভিত্তি ছাড়াও মিলন হতে পারে— এবং সার্থক শিল্পও হতে পারে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে তাকে অর্ধনারীশ্বর রূপ বলব কেন? বলব তাকেই, যার মধ্যে কথা ও সুর দুয়েরই সমান গৌরব।

দু-একটি ব্যতিক্রম থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কথা ও সুরের সমান অধিকার প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাংলা গানের সচেতন বা স্বীকৃত আদর্শ কোনোকালেই ছিল না। আদর্শ যদি-বা হয়ে থাকে, তা কেবল নামেই আদর্শ। কথা ও সুরের সমান গুরুত্ব বাংলা গানের ক্ষেত্রে বাস্তব সত্য নয়। সুর যতই সুন্দর হোক না কেন, বাংলা গানে তার অধিকার সব সময়ই সীমাবদ্ধ। শিষ্ট বা মধ্যগাসংগীতেও তাই, লোকসংগীতেও তাই। বিভিন্ন ধর্মীয় সংগীতেও তাই, অন্যান্য গানেও তাই। এ প্রসঙ্গে হয়তো কেউ কীর্তনের কথা তুলতে পারেন। ক্ষেত্রবিশেষে কীর্তনে সুরের অধিকার যে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সে-অধিকার কখনোই বাগর্থের আবেদনকে ছাপিয়ে যায় নি, বাগর্থের সমকক্ষও হয় নি, গানের কাব্যগত আবেদনের প্রাধান্যকে তা কখনোই অস্বীকার করে নি।

সুরের অধিকার কথাটার বোধ করি একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। গানে কথার অধিকার যেমন আসলে কাব্যের অধিকার, সুরের অধিকার তেমনি বিশুদ্ধ-সংগীতের অধিকার। আমাদের দেশে বিশুদ্ধ-সংগীত বিভিন্ন রাগরাগিণীর মধ্যে দিয়েই বিকশিত হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে, সুরের অধিকার অর্থ রাগরাগিণীর আত্মপ্রকাশের অধিকার, বিশিষ্ট মেলডিক প্যাটার্নের রূপ-প্রতিষ্ঠার অধিকার। যন্ত্রে হোক কণ্ঠে হোক, বাণীযুক্ত হোক বাণীবর্জিত হোক, যে সংগীতে রাগরাগিণীর আত্মপ্রকাশ সম্পূর্ণ অব্যাহত, বুঝব— সুরের অধিকার সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত। সুরের পূর্ণস্বীকৃতি আমাদের দেশে ক্লাসিক্যাল সংগীতেই সম্ভব ও সার্থক হয়ে উঠেছে। একটি বিশিষ্ট ধ্বনি-প্যাটার্নকে প্রস্ফুটিত করে তোলা, মূল প্যাটার্নের ঐক্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে তার অন্তর্নিহিত বিবিধ রূপ -সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করে তোলা, শ্রোতার শ্রবণে-মনে সমগ্র ধ্বনি-রূপটিকে জীবন্ত করে তোলা, এই তো ক্লাসিক্যাল সংগীতের একমাত্র লক্ষ্য। রাগরাগিণীর অজস্র মিশ্রণ ঘটতে পারে, শাস্ত্রোক্ত রীতি-নীতির অনেক লঙ্ঘন ঘটতে পারে, পুরানো পরিচিত পথ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুন রকমের সুরের প্যাটার্ন রচনা—নতুন রাগের সংরচন, তা-ও হতে পারে। তাতে সুরের অধিকার কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। প্রথারক্ষাটা লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হল শ্রবণমন-গম্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ধ্বনি-রূপের সমগ্রতাকে প্রতিষ্ঠিত ও জীবন্ত করা।

কোনো বিশেষ গানের ক্ষেত্রে সুরের অধিকার অব্যাহত আছে কি না বিচার করতে হলে দেখতে হবে, সে গানের লক্ষ্যটা কী। ধ্বনি-প্যাটার্নই যদি সে গানের চরম লক্ষ্য হয়, তা হলে তাকে ক্লাসিক্যাল বলি আর না বলি, তার ক্ষেত্রে সুরের অধিকার সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই নেই। সঙ্গে যদি কাব্য স্থান পেয়ে থাকে, তাতে আপত্তির কিছু নেই। অন্তত ততক্ষণ নেই যতক্ষণ কাব্যের টানে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হচ্ছে।

গানের ক্ষেত্রে সুরের এই রকম নিঃসপত্ন অধিকার কখনোই পুরোপুরি বজায় থাকতে পারে না।

অথবা পারে মাত্র তখনই, যখন সে গান তার কাব্যগত আবেদনকে একেবারে গৌণ করে ফেলেছে। অর্থাৎ যখন সে যথার্থ গানই নয়, বিশুদ্ধ-সংগীতের বেনামদার। গানে যদি কাব্যের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়, গায়কের বা শ্রোতার মন যদি কাব্যের রসে আবিষ্ট থাকে, তা হলে সুরের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবেই।

সুরের আংশিক অধিকার কি হতে পারে না? তা হয়তো পারে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। ভালো গান কখনোই আধ-খানা কথা আর আধ-খানা সুরের যোগফল নয়; এরকম আক্ষরিকভাবে অর্ধনারীশ্বর নয়। ভালো গানে এই তো দেখি যে, তার মধ্যেকার কবিতা আরো যেন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে; সুরের সহায় পেয়ে কবিতার অধিকার যেন ষোলো-কলায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় সুরের আংশিক-অধিকারকে যথার্থ অধিকার বলা যায় কি?

বাংলা গানের ক্ষেত্রে ধ্বনি-রূপের প্রকাশ কখনোই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে নি। এমনকি অন্যতম লক্ষ্যও নয়। রাগরাগিণী যে কখনোই স্থান পায় নি তা নয়, কিন্তু রাগ-রূপকে পূর্ণ-প্রস্ফুটিত করে তোলা, এটা কখনোই বাংলা গানের অভীষ্ট নয়। হৃদয়ের যে আবেগ গানের বাণী-রূপের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে, রাগরাগিণী অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মতো সেই শকুন্তলাকেই স্ফুটতর করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। বাংলা গানে সুর কাব্যের আকৃতিকেই ব্যাপকতর গভীরতর ও তীব্রতর করে, হয়তো তাকে বহুগুণায়িতও করে, যেমন আমরা রবীন্দ্রসংগীতে দেখতে পাই। বাংলা গানে সুর কখনোই গানকে রাগরাগিণীর নিজস্ব এলাকার দিকে, রাগরাগিণীর নিজস্ব রস-রূপের দিকে টেনে নিয়ে যায় না। এরও প্রমাণ আমরা রবীন্দ্রসংগীতেই দেখতে পাব। কিন্তু সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে।

৩

চর্যাপদই বাংলা কবিতা ও বাংলা গানের প্রাচীনতম নিদর্শন। চর্যাপদের শিরোনামায় রাগরাগিণীর নাম দেওয়া আছে। সম্ভবত পদগুলি কোনো সময় রাগরাগিণীতেই গাওয়া হত। এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। যদি ধরেই নিই যে সত্যিই তাই হত, তা হলেও একটা কথা কিন্তু ভুললে চলবে না। রাগরাগিণীকে আশ্রয় করে গান গাওয়া আর রাগরাগিণীর রূপকেই প্রকাশ করা এক কথা নয়। চর্যাগীতি সাধন-সংগীত। তা স্পষ্টতই সাধন-তত্ত্ব ও সাধন-পদ্ধতির বর্ণনা। সাংগীতিক রূপ-নির্মাণ তার লক্ষ্যই নয়। সাংগীতিক আবেগের অবকাশ তার মধ্যে যৎসামান্য।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও রাগরাগিণীর নাম আছে। অনুমান করা হয়তো অসংগত নয় যে, এক সময় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও রাগরাগিণীতেই গাওয়া হত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সংগীত হিসেবে বাংলা দেশে কতখানি প্রচলিত ছিল তা আমরা জানি না। তার গীত-রীতিও আমাদের অজানা। মনে হয়, সংগীত-মূল্যের বিষয়ে চর্যা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার অনেকখানিই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কেও প্রযোজ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অবশ্য সাধন-সংগীত নয়, কিন্তু কাহিনীর আবেদন সেখানে এমনই সর্বগ্রাসী যে, সংগীতশিল্পের পক্ষে নিতান্ত গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া সেখানে আর কোনো গত্যন্তর নেই।

পদাবলী-কীর্তন সম্পর্কে কিন্তু মোটেই এ রকম বলা চলবে না। পদাবলী-কীর্তনের সঙ্গে রাগরাগিণীর ব্যবহারিক যোগ অনেক ঘনিষ্ঠতর।

তা সত্ত্বেও কীর্তনকে ক্লাসিক্যাল সংগীত বলা সংগত হবে না। তার কারণ, কীর্তনও ধর্মসংগীত। তা সাধন-সংগীতেরই নামান্তর। কেননা কীর্তনে সংগীতই সাধনা এবং সাধনাই সংগীত। কীর্তন সংগীতের জন্য সংগীত নয়, ধ্বনি-রূপের প্রকাশ তার অভিপ্রায়েরই অন্তর্গত নয়। কীর্তনের বাণী-আশ্রিত ভাব-সম্পদ অসামান্য। এই ভাব-সম্পদের প্রকাশই তার মুখ্য লক্ষ্য।

কীর্তনের সঙ্গে রাগরাগিণীর যোগ যতই ঘনিষ্ঠ হোক, তা গ্রহণের যোগ, যথার্থ একাত্মতা নয়। রাগসংগীত এবং লোকসংগীত এই দুই দিকেই কীর্তনের দরজা খোলা। কেবল আখরের পথ দিয়েই নয়, নানা পথে নানা ভাবে তার মধ্যে লোকসংগীতের অনুপ্রবেশ বড় কম হয় নি। যা তার বাণী-ব্যঞ্জনার অনুকূল তাকেই সে বিনা বাধায় স্বাঙ্গীকৃত করে নিয়েছে। গীত-পদ্ধতিটি তার নিজস্ব বস্তু। ক্লাসিক্যাল গীত-পদ্ধতি তার বাণী-ব্যঞ্জনার অনুকূল নয়। ক্লাসিক্যাল গীত-পদ্ধতিকে ক্লাসিক্যাল মেজাজকে সে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেয় নি।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

"বাংলা দেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না…। অথচ হিন্দুস্থানী সংগীতের রাগরাগিণীর উপাদান সে বর্জন করে নি, সেসমস্ত আপন নূতন সংগীতলোক সৃষ্টি করেছে।"[৪]

নিয়েই সে অপর একটি চিঠিতে লিখেছেন—

"কীর্তনসংগীত আমি অনেক কাল থেকেই ভালোবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর-কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানি নে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়· · ···কখনো কখনো কীর্তনে ভৈরোঁ প্রভৃতি ভোরাই সুরেরও আভাস লাগে, কিন্তু তার মেজাজ গেছে বদলে—রাগরাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক।"[৫]

রবীন্দ্রনাথের নিজেরও রাগরাগিণীর রূপের প্রতি মন নেই, তাঁরও ঝোঁক ভাবের রসের প্রতিই। কিন্তু সে কথায় আমরা পরে আসছি। আপাতত তাঁর চিঠি থেকে আরো একটু উদ্ধৃত করি।—

"বাঙালীর কীর্তনগানে সাহিত্যে সংগীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল···। তার মধ্যে যে বহুশাখায়িত নাট্যরস আছে তা হিন্দুস্থানী গানে নেই।"[৬]

কীর্তনের উদ্ভব যে সময়েই হোক, তার প্রসার চৈতন্যের সময় থেকে। কিন্তু সে-কীর্তন ছিল একই সঙ্গে গীত এবং নৃত্য, ভাব-সংক্রমণ এবং সমধর্মী-সম্মেলন, ধর্মাচরণ এবং ধর্মপ্রচার। তার মধ্যে ধ্বনি-শিল্পের স্বাধীন আত্মপ্রকাশের অবকাশ খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না।

প্রাচীন কীর্তন যে ঠিক কী রকম ছিল, তা বলা কঠিন। পরবর্তীকালের যে-কীর্তনের সঙ্গে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত, যে-কীর্তনের সঙ্গে ক্লাসিক্যাল রাগরাগিণীর যোগের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে,

---

৪. সংগীতচিন্তা, পৃ ১৭৩-১৭৪

৫. সংগীতচিন্তা, পৃ ২৩৮-২৩৯

৬. সংগীতচিন্তা, পৃ ১৭৬

কীর্তন বলতে— অন্তত উচ্চাঙ্গের কীর্তন বলতে সাধারণত আমরা এই কীর্তনকেই বুঝে থাকি। এর প্রতিষ্ঠা ও উৎকর্ষলাভে নরোত্তম ঠাকুরের দানের কথা সর্বজনবিদিত। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী এই কীর্তনের যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে মনে হয়, এ কীর্তন রীতিমত গুরুভার এবং অভিজাত সংগীত, অর্থাৎ অনেক পরিমাণে ক্লাসিক্যাল বস্তু। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি কাল থেকেই বৃন্দাবনের সঙ্গে, এবং সেই সূত্রে সাধারণভাবে উত্তর-ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বৈষ্ণবসমাজের যোগাযোগ বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। পরে, তিন বৈষ্ণব-প্রধান শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের প্রসাদে এই যোগাযোগ তখনকার মতো বেশ একটি দূর-প্রসারী সংস্কৃতি-সংযোগে পরিণত হয়েছিল। কীর্তন গানে ক্লাসিক্যাল সংগীতের অনুপ্রবেশ এই পথেই ঘটেছে।

ঘটেছে বটে, কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে নয়। রাগরাগিণী যে পরিমাণে গৃহীত হয়েছে, ক্লাসিক্যাল গীত-পদ্ধতি সে পরিমাণে নয়। তালের উৎকর্ষলাভ ঘটেছে। কিন্তু তালের ঐতিহ্য বাংলা দেশের নিজেরই। নরোত্তম-প্রবর্তিত ধ্রুপদ চালের গরাণহাটি কীর্তনই সব থেকে উচ্চাঙ্গের, সব থেকে গুরুভার কীর্তন-ধারা। পরে যে মনোহরসাহি কীর্তন-ধারার উদ্‌ভব হল তা সরলতর এবং লঘুতর। রেনেটি এবং মন্দারিণী ধারা আরো সরল এবং আরো লঘু। কীর্তন লোকসংগীত না হলেও লোকপ্রিয় সংগীত। এই লোকপ্রিয়তার টানেই তার অঙ্গের আমদানী-করা ক্লাসিক্যাল ভূষণ— তার উচ্চাঙ্গ গাম্ভীর্য —আপনা থেকেই ধীরে ধীরে তার শরীর থেকে খসে খসে গিয়েছে। রাগরাগিণী ভূষণ মাত্র নয়, তা তার বাণী-ব্যঞ্জনার পক্ষে মূল্যবান সহায়। সেইটেই স্থায়ী হয়েছে।

লোকসংগীতের কথা বাদ দিলে সাধারণভাবে এ কথা বলা যায় যে, রাগরাগিণীকে বাংলা দেশ কখনোই বর্জন করে নি। এবং ক্লাসিক্যাল গায়ন-পদ্ধতিকে কখনোই সে পুরোপুরি গ্রহণ করে নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—

> "হিন্দুস্থানী গানের রীতি যখন রাজা বাদশাদের উৎসাহের জোরে সমস্ত উত্তর ভারতে একচ্ছত্র হয়ে বসল তখনও বাঙালীর মনকে বাঙালীর কণ্ঠকে সম্পূর্ণ দখল করতে পারে নি।"[৭]

পারবার কথাও নয়। তার কারণ হিন্দুস্থানী গানের রীতি বাঙালীর কাব্যসংগীতের পক্ষে, গানের বাণী-ব্যঞ্জনার পক্ষে সম্পূর্ণ ভাবে অনুপযুক্ত।

মাঝে মাঝে যে-সব সময় উত্তর-ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের উপলক্ষ ঘটেছে, তখনই তার সংগীত-ধারায় কিছু ক্লাসিক্যাল সংগীতের ঢেউএর আঘাত লেগেছে। তখনকার মতো কিছু বাহ্য ভূষণাদির আমদানী যেমন হয়েছে, তেমনি সেইসব সুযোগে তার সংগীতে রাগরাগিণীর প্রতিষ্ঠাও কিছু দৃঢ়তর হয়েছে। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠা কখনোই তাকে তার আপন লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে, একদিকে দুর্ভিক্ষ ও রাষ্ট্রবিপ্লব এবং অন্যদিকে উৎসব ও ব্যসন, এই বিচিত্র সমাবেশের মধ্যে আবার এক বৃহৎ যোগাযোগের পর্ব শুরু হয়েছে, যার ফলে আমরা আধুনিক কালকে পেলাম। এর সঙ্গে সঙ্গে, লোকসংগীতে নয়, বাংলার শিষ্ট বা মধ্যগামী সংগীত-

---

৭. সংগীতচিন্তা, পৃ ১১০

ধারায়— এখন থেকে এ'কে আমরা মধ্যবিত্তের সংগীত-ধারাও বলতে পারি— এক অভিনব রূপান্তর ঘটতে শুরু করল। এর মধ্যে দিয়ে যে নতুন ধরণের গানের জন্ম হল, অদ্যাবধি তার কোনো নামকরণ হয় নি। কিন্তু যে-অর্থে মধুসূদন থেকে বাংলাসাহিত্যকে আমরা আধুনিক বাংলাসাহিত্য বলি, সেই অর্থে একেও আমরা আধুনিক বাংলা গান নাম দিতে পারি।

এর আধুনিকতা প্রধানত ভাবের ক্ষেত্রেই পরিস্ফুট। এই প্রথম বাংলা গান ভাবের দিক থেকে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক হয়ে উঠল। এই প্রথম বাংলা গান খাঁটি ব্যক্তিগত শিল্পরচনার ব্যাপার হয়ে উঠল। অন্যদিকে, এই প্রথম বাংলা গান তার গ্রামীণ চরিত্রকে পরিত্যাগ করে শহুরে শিল্প হয়ে উঠল।

৪

আধুনিক বাংলা গান ধর্মের দিক দিয়ে অসাম্প্রদায়িক হলেও সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের দিক থেকে অসাম্প্রদায়িক বলা যায় না। এ গান বাঙালী 'ভদ্রলোক'-সম্প্রদায়ের গান, শহুরে মধ্যবিত্তের গান। এই বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্ম অষ্টাদশ শতকে, পলাশী যুদ্ধের অল্পকাল আগে-পরে। এর প্রতিষ্ঠা বা যৌবনকাল উনবিংশ শতকে। প্রৌঢ়-পরিণতি বিংশ শতকেব প্রথম পর্বে। আধুনিক বাংলা গানে ভাবের যে নতুনত্ব দেখতে পাই, তা এই 'নবজাগ্রত' মধ্যবিত্তসমাজেরই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন।

আধুনিক শহুরে বাঙালীর গান হলেও, তার ভাব-বস্তু অভিনব হলেও, গানের চিরকালীন প্রবাহের মধ্যেই সে জন্মলাভ করেছে, হঠাৎ শূন্য থেকে পড়ে নি। সে দিক থেকে দেখলে, বাংলার বরাবরকার সংগীত-ঐতিহ্যের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ দেখতে পাব।

এটাই স্বাভাবিক। গান জিনিসটা হৃদয়ের ভাষা, তার উৎসার চৈতন্যের মর্মমূল থেকে। তার পক্ষে হঠাৎ বিজাতীয় হয়ে ওঠা— এমন কি হঠাৎ একেবারে সর্বাঙ্গীণভাবে অভিনব হয়ে ওঠা— খুব সহজ নয়। চিন্তা বা আইডিয়ার ক্ষেত্রে স্বদেশী-বিদেশীর ভেদ সব সময় তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু গান তো বিশুদ্ধ আইডিয়া নয়, গানের ভাবও বিশুদ্ধ চিন্তা নয়, তার পক্ষে আপন-পরের ভেদ সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ। গানের পক্ষে রাতারাতি কায়মনবাক্যে আধুনিক হয়ে ওঠা— ছিন্নমূল আধুনিকতায় অধিষ্ঠিত হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার।

অনেক দিক থেকে আধুনিক হলেও, নতুন কালের বাংলা গান সম্পূর্ণভাবে পূর্বসূত্রহীন নয়। ভাব রূপ ও সুরের দিক থেকে তার মধ্যে আমরা তিনটি বিশিষ্ট প্রভাবের সংযোগ দেখতে পাই।

এক, বাংলার নিজস্ব সংগীত-ধারার প্রভাব। এক দিকে পদাবলী কীর্তন পালাকীর্তন শ্যামাসংগীত ও অন্যান্য সুমার্জিত কাব্যসংগীত, আর অন্যদিকে বাউল প্রভৃতি গোষ্ঠীগত এবং অন্যান্য নানা ধরণের লোক-সংগীত, এই উভয়ের দানে এ গান পুষ্ট। কিন্তু এ'কে প্রভাব না বলে জাতীয় উত্তরাধিকার বলাই সংগত।

দুই, হিন্দুস্থানী ক্লাসিক্যাল সংগীতের প্রভাব। অন্য ক্ষেত্রে নয়, শুধু সুরের ক্ষেত্রে। এও জাতীয় উত্তরাধিকারই বটে। বাংলার একেবারে নিজস্ব জিনিস না হলেও সুদীর্ঘকালের সান্নিধ্যের ফলে এও বাঙালীর আপনার হয়ে গিয়েছে।

এর দুটোই পুরানো, কিন্তু তৃতীয়টি সম্পূর্ণ নতুন। এইটেই বিশিষ্টভাবে আধুনিক। এ হল গানের ভাবের দিক। এই ভাবের উৎস শহুরে বাঙালীর নতুন জীবনযাত্রায়, নতুন শিক্ষাদীক্ষায়, নতুন জীবন-

দর্শনে। এই ভাব আধুনিক জীবনের সেকুলারিটি, ব্যক্তিতান্ত্রিকতা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বাংলা গানে ভাব যেহেতু বরাবরই তার রূপকে অনেকখানি পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে আসছে, সেই কারণে আধুনিক বাংলা গানের রূপ-রীতিও অনেকখানি পরিমাণে এই ভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে আরম্ভ করেছে।

অন্যদিক থেকে দেখলে, এই আধুনিক ভাবকে আমরা রোমান্টিক ভাব বলেও আখ্যা দিতে পারি। সেদিক থেকে আধুনিক বাংলা গান রোমান্টিক স্বভাবের গান। এ রোমান্টিকতা সমকালের বাংলা সাহিত্যের সুপরিব্যাপ্ত রোমান্টিকতারই নিকট-আত্মীয়।

বাঙালী শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়ের এই আধুনিক গানের পাশাপাশি বাংলা দেশে আরো কয়েকটি গানের ধারা ছিল। তার একটি, যা সকল কালেই ছিল এখনও আছে, সে হল বাংলার লোকসংগীতের ধারা। যেমন— সারি জারি ভাটিয়ালী, কি টুসু ভাদু ঝুমুর, কিংবা গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, নানা রকমের আনুষ্ঠানিক গান, মেয়েলী গান— এই সব। বাউল, দরবেশী প্রভৃতি জনজীবনাশ্রিত সাম্প্রদায়িক গানকেও আমরা এই ধারার অন্তর্গত বলে ধরতে পারি।

এ যেমন ছিল, তেমনি অন্যদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল কবিগান যাত্রা পাঁচালী তরজা ইত্যাদি। এরা আধা-শহুরে আধা-গ্রাম্য। এরা লোকসংগীত নয়, কিন্তু লোকজীবনের নিকটবর্তী। শহুরে সংগীতও নয়, কিন্তু প্রধানত শহরের পৃষ্ঠপোষকতাতেই পরিপুষ্ট। পাশাপাশি প্রবাহিত শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়ের গানের সঙ্গে— অন্তত তার উন্মেষকালের প্রাথমিক প্রকাশের সঙ্গে— এ ধারার অনতিপ্রচ্ছন্ন যোগ অনেকেরই নজরে পড়ে থাকবে।

আরো একটি ধারা ছিল। সেটি হল আমদানী-করা ক্লাসিক্যাল ধারা। বলতে পারি নকল-দরবারী ধারা। সকলেই জানেন, উত্তর-ভারতের ক্লাসিক্যাল সংগীত মুখ্যত রাজসভার সংগীত— দরবারী-সংগীত। তা ছিল নবাব, রাজা ও ভূস্বামীদের প্রসাদপুষ্ট। বাংলা দেশের কোনো বিশিষ্ট দরবারী ঐতিহ্য কোনোকালেই গড়ে ওঠে নি। যেটুকু ছিল, তা-ও মোগল আমলে ছিন্নভিন্ন এবং তার পর পলাশীর পরে আরো বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তা হলেও, তার সবটাই একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় নি। এখানে-ওখানে যে দু-একটি টুকরো অবশিষ্ট ছিল তাদের আশ্রয় করে, এবং হঠাৎ-বড়লোক নতুন-অভিজাতদের আশ্রয় করে শহরে-বাগানবাড়িতে কিছু নতুন দরবার গজিয়ে উঠছিল। বাংলা দেশে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের ক্লাসিক্যাল সংগীতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল এইসব দরবার বৈঠকখানা জলসাঘর বাগানবাড়ি। বাঁধা হিন্দুস্থানী ওস্তাদও থাকত, আবার উপলক্ষ-বিশেষে উত্তর-ভারত থেকে ওস্তাদদের শুভাগমনও ঘটত। আর ছিল নিত্য এবং নৈমিত্তিক, আবাসিক এবং অভ্যাগত বাইজীর দল। ধ্রুপদও চলত, টপ্পা-ঠুংরিও কম চলত না।

এ গান বাংলার গান নয়, বাংলা গানও নয়। এর ভাষা হিন্দি, গীত-পদ্ধতিও সম্পূর্ণই উত্তর-ভারতের। বাংলা দেশের সঙ্গে এ গানের ধারায় কখনোই কোনো প্রাণের সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি।

কিন্তু একেবারে কোনো সম্পর্কই ছিল না বললে একটু বাড়িয়ে বলা হবে। সেকালের কলকাতার আখড়াই গান এই আদর্শেরই বৈঠকী গান, তার মানটা হয়তো একটু নীচু। হাফ-আখড়াইও খানিকটা তাই। তার মান অনেকখানি নীচু। তখনকার দিনের আধুনিক বাংলা গানের সঙ্গেও এর একটা পরোক্ষ যোগ ছিল। সে যোগ রাগরাগিণীরও সঙ্গে পরিচয়-স্থাপনের যোগ, আহরণের যোগ।

ইতিহাসের নিয়মেই এই আমদানীকরা ক্লাসিক্যাল ধারা ধীরে ধীরে শুকিয়ে এসেছে।[৮]

কিন্তু কোথাও কোনো পলি রেখে যায় নি বললে কিংবা সেই পলির মূল্যকে খুব ছোট করে দেখলে নিশ্চয়ই ভুল করা হবে। তার কারণ এ পলি একদিনের নয়। অন্তত ষোড়শ শতক থেকেই এই সঞ্চয়ের সূত্রপাত হয়েছে। অল্পপরিসর ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও, এর মধ্যে থেকেই বাঙালীর নিজস্ব-ধরণের দু-একটি ক্লাসিক্যাল ঘরানারও উদ্ভব ঘটেছিল। যেমন বিষ্ণুপুর ঘরানা। এই প্রক্রিয়া আধুনিককালের মুখে এসেও একেবারে থেমে যায় নি। এই প্রসঙ্গে কলকাতার ঠাকুরবাড়ির কথা যদি উল্লেখ করি, এমনকি রবীন্দ্রনাথের নামও যদি উল্লেখ করি, খুব বেশি ভুল হবে না।

ইতিহাসের দিক থেকে আধুনিক বাংলা গানকে আমরা তিনটি পৃথক্ পর্যায়ে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথম পর্যায়টা এর উন্মেষের কাল। প্রারম্ভের দিকটা স্বভাবতই অস্পষ্ট ও অনতিব্যক্ত। এই পর্যায়ের গানের মধ্যে নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রমুখ গীতকারদের প্রণয়-সংগীতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিধুবাবুর টপ্পা খাঁটি উত্তর-ভারতীয় টপ্পা নয়, তা টপ্পা হয়েও বাঙালীর টপ্পা। কবিগান পাঁচালী প্রভৃতি পাঁচ-মিশেলী গানকেও এ-ধারা থেকে একেবারে বাদ দেওয়া যাবে না।

আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্যায়েই ভাবের আধুনিকতার যথার্থ প্রতিষ্ঠা। এইখানে এসে বাংলা গানে সেকুলারিটি স্পষ্ট হয়েছে, নাগরিক বৈদগ্ধ্য স্ফুটতর হয়েছে, ব্যক্তিমনের সংস্পর্শ নিবিড় হয়েছে। এইখানে এসে বাংলা গানে রোমান্টিকতা ও শৈল্পিক আত্মচেতনা প্রখর হয়ে উঠেছে। এ পর্যায়ের গানের প্রথম প্রতিষ্ঠা বাংলা থিয়েটারে। পরে আসরে-বাসরে, গ্রামোফোন-রেকর্ডে, ঘরোয়া পরিবেশে, একলা ঘরে। এই পর্যায়ের সব থেকে উল্লেখযোগ্য নাম, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ।

এই পর্বের একটি বিশেষত্ব এখানে উল্লেখ করার মতো। সে হল বাংলা গানে পাশ্চাত্য-সংগীতের অনুপ্রবেশচেষ্টা। অপর উল্লেযোগ্য বিশেষত্বটি অবশ্য অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। তা হল লোকসংগীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংযোগস্থাপন। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিমেয়। দুঃখের কথা, ভাবীকালের বাংলা গানের পক্ষে এই দানের গুরুত্ব আমরা আজও ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি নি।

দ্বিতীয় পর্বের অবসান না ঘটতেই আধুনিক বাংলা গানের তৃতীয় পর্ব এসে উপস্থিত হয়েছে : হাল আমলের বাংলা গানের পর্ব। সিনেমা, রেডিয়ো, বিচিত্রানুষ্ঠান ইত্যাদির প্রসাদে এ গান আজ জনপ্রিয়তার শিখরে।

চলতি কথায় কেবল এরই নাম 'আধুনিক বাংলা গান'। প্রয়োগটা এমনই প্রচলিত যে অপপ্রয়োগ হলেও এ নামকে এখন আর অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই। শুধু এইটুকু স্মরণ রাখতে হবে যে, এর মধ্যে এমন কোনো নতুন গুণের সঞ্চার হয় নি যার কারণে একে আলাদা করে আধুনিক বলে চিহ্নিত করা যায়। এর যা-কিছু নতুনত্ব সবই ঋণাত্মক, সবই বিয়োগ-বিচ্ছেদের ফল। রাগরাগিণীর সঙ্গে বিচ্ছেদ, বাংলার সংগীত ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ, পূর্বসূরীদের সৃষ্টির সঙ্গে বিচ্ছেদ। বোধ করি নিজের বাঙালীত্বের সঙ্গেও বিচ্ছেদ।

---

৮. সম্প্রতি বাংলাদেশে ক্লাসিক্যাল সংগীতচর্চার নতুন উদ্যম দেখা যাচ্ছে। এর সঙ্গে সেকালের দরবারী গানের ইতিহাসের দিক থেকে কিছু যোগ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে যোগ যৎসামান্য।

৫

এইবারে রবীন্দ্রসংগীতের প্রসঙ্গ।

কীর্তনাদি পূর্বকালের কাব্যসংগীতের সঙ্গে রাগরাগিণীর ব্যবহারের দিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতের খুব বড় রকমের কোনো পার্থক্য নেই। যেটুকু আছে তাকে মৌলিক বলা যায় না। স্টাইলের পার্থক্যটা কিন্তু বেশ বড় রকমেরই। কীর্তন গোষ্ঠীগত সংগীত, বড় আসরের উপযোগী। রবীন্দ্রসংগীত একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথেরই। তা আত্মগত, অন্তরঙ্গ গুঞ্জনের মতো। কীর্তনের সুর ও প্রকাশ-পদ্ধতি উচ্ছলিত আবেগ-প্রকাশের অনুকূল, তার রূপ আবেগের বিস্তারের দ্বারা নিরূপিত। রবীন্দ্রসংগীতে আবেগ গানের রূপগত ঐক্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তার প্রকাশে কঠিন সংযম।

আরো বড়ো তফাত ভাবের ক্ষেত্রে। এ তফাত একেবারে মৌলিক। ভাবের পার্থক্যই উভয় সংগীতের মধ্যে অনেকখানি রূপের পার্থক্য এনে দিয়েছে।

প্রচলিত অর্থে নয়, ঐতিহাসিক অর্থে যাকে আধুনিক বাংলা গান বলছি, তার সঙ্গে সুর বা ভাব কোনো দিক থেকেই রবীন্দ্রসংগীতের কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। তবু পার্থ্যক্য অনেক। এ পার্থক্য প্রধানত স্টাইলের, রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তার। এ পার্থক্যের উৎস রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের অসামান্য দীপ্তিতে।

আরও পার্থক্য আছে। তা হল উৎকর্ষের পার্থক্য। অসাধারণ উৎকর্ষের কারণেই রবীন্দ্রসংগীত অনন্য, দোসরহীন।

কিন্তু গোত্র-পরিচয়ের দিক থেকে দোসরহীন নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের গান যে গোত্রের, অতুলপ্রসাদের গান যে গোত্রের, নজরুলের গান যে গোত্রের, রবীন্দ্রনাথের গানও সেই একই গোত্রের। রবীন্দ্রকাব্য যেমন দ্বিতীয়-রহিত হয়েও আধুনিক বাংলা কাব্যধারারই অন্তর্গত, রবীন্দ্রসংগীতও তেমনি দ্বিতীয়-রহিত হয়েও আধুনিক বাংলা গানের ধারারই অন্তর্গত।

রবীন্দ্রসংগীতের উৎকর্ষের বিশিষ্ট পরিচয় পেতে হলে তিনটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের তিনটি ভিন্ন রকমের কৃতিত্বের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এক, সুরের ক্ষেত্রে। একদিকে ক্লাসিক্যাল রাগরাগিণীর বিপুল বৈভবকে এবং অন্যদিকে লোকসংগীতের সরল নিরাভরণ সুরগুলিকে, তার সহজ লাবণ্যকে সম্পূর্ণভাবে সাঙ্গীকৃত করে নেবার কৃতিত্বের দিক। দুই, বাণীর ক্ষেত্রে। গানের বাণী-অঙ্গের অসামান্য রসাত্মকতার দিক। আর তিন হল সুর ও বাণীর সমন্বয়ের দিক। সংগীত ও কাব্য এই দুই ভিন্ন শিল্পের ভিন্ন ধরণের রসাবেদনকে এক করে দেবার দিক।

প্রথম দুটি দিক নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু তৃতীয় ক্ষেত্রটি নিয়ে একটু প্রশ্ন উঠতে পারে। দুই ভিন্ন শিল্পের স্বতন্ত্র রসাবেদন কোন্ ভিত্তিতে মিলে এক হয়ে যেতে পারে?

রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুরের মিলন ঘটেছে, এই সত্যটাকে অস্বীকার করি না। কিন্তু এ মিলন সমান-অধিকারের ভিত্তিতে নয়। এ মিলন কথার প্রাধান্যের ভিত্তিতে, কাব্য-রূপের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। এইটেই বাংলা গানের চিরকালের লক্ষ্য। এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন পূর্বে কখনো সম্ভব হয়েছিল কি না জানি না। এটা জানি যে, মিলনের ভিত্তিটা চিরকালই এক রকম।

সুরের দ্বারা কথা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, সুরের প্রয়োজনে গানের রূপ নিরূপিত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রসংগীতের বিরাট ভাণ্ডারে যৎসামান্য। প্রথম দিকের শিক্ষানবিশী পর্বে বিলিতি সুরের বাজনার সঙ্গে

সঙ্গে কথা বসাবার সাধনায় এবং পরে হিন্দি-ভাঙা কিংবা দক্ষিণী গানভাঙা সুরের দু-পাঁচটি গানে ছাড়া আর কোথাও এ-রকম দৃষ্টান্ত বিশেষ পাওয়া যাবে না। বিপরীত দৃষ্টান্তই সর্বত্র মিলবে।

রবীন্দ্রসংগীত বাণীশিল্প ও ধ্বনিশিল্প এই দুয়ের মিলন-সঞ্জাত যৌগিক-শিল্প। কিন্তু, আবার বলি, এ যৌগিকতা দুই শিল্পের সমানাধিকারের যৌগিকতা নয়। বাংলা গানের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

"বাঙালীর চিত্তবৃত্তি প্রধানত সাহিত্যিক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ··· ।"[৯]

রবীন্দ্রসংগীত বাঙালীর চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক পথকেই বেছে নিয়েছে। এর রসও প্রধানত সাহিত্যরস। তবে অমিশ্র সাহিত্যরস নয়, সংগীতসমন্বিত সাহিত্যরস।

গান যে কথা-প্রধান আর সুর-প্রধান দুরকমই হতে পারে এবং এ দুই যে রসের দিক থেকে পরস্পরের বিপরীত, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণমাত্রায় সচেতন। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

"সত্যের খাতিরে এ কথা মানতেই হবে যে, বিশুদ্ধ সংগীতে হিন্দুস্থান বাংলাকে এগিয়ে গেছে। যন্ত্রসংগীতে তার প্রধান প্রমাণ পাওয়া যায়। যন্ত্রসংগীত সম্পূর্ণই সাহিত্যনিরপেক্ষ।···পরজ রাগিণীতে একটা হিন্দি গান জানতুম, তার বাংলা তর্জমা এই : কালো কালো কম্বল, গুরুজি, আমাকে কিনে দে, রাম-জপনের মালা এনে দে আর জল পান করবার তুম্বী।

ঐ ফর্দে উদ্ধৃত ফর্মাশী জিনিসগুলিতে সে সুগম্ভীর বৈরাগ্যের ব্যঞ্জনা আছে পরজ রাগিণীই তা ব্যক্ত করবার ভার নিয়েছে। ভাষাকে দিয়েছে সম্পূর্ণ ছুটি। আমি বাঙালী, আমার স্কন্ধে নিতান্তই যদি বৈরাগ্য ভর করত, তবে লিখতুম—

গুরু, আমায় মুক্তিধনের দেখাও দিশা।
কম্বল মোর সম্বল হোক দিবানিশা।
সম্পদ্ হোক জপের মালা
নামমণির-দীপ্তি-জ্বালা,
তুম্বীতে পান করব যে জল
মিটবে তাহে বিষয়তৃষা।

কিন্তু এ গানে পরজ তার ডানা মেলতে বাধা পেত। পরজ হত সাহিত্যের খাঁচার পাখি।"[১০]

বাঙালীর গানে ভাব-প্রকাশের ভার রাগিণীর উপর নয়, সাহিত্যের উপর। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"বাঙালী গাইলে—

ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসি নে
আমার যে ভালোবাসা তোমা বই আর জানি নে।··

যা-কিছু বলবার, আগেভাগে তা ভাষা দিয়েই ব'লে দিলে, ভৈরবী রাগিণীর হাতে খুব বেশি কাজ রইল না।

বাঙালীর এই স্বভাব নিয়েই তাকে গান গাইতে হবে ··· ।"[১১]

---

৯. সংগীতচিন্তা, পৃ ১৭৪

১০ সংগীতচিন্তা, পৃ ১৭৪-১৭৫

১১ সংগীতচিন্তা, পৃ ১৭৫-১৭৬

শেষের কথাটার একটা বাড়তি তাৎপর্য আছে। কেননা রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাঙালীর এই স্বভাব নিয়েই গান গেয়েছেন, তাঁর নিজের গানেও বাঙালীর সাহিত্যিক চিত্তবৃত্তিরই জয় হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য একাধিক বার এ কথাও বলেছেন, বেশ জোর দিয়েই বলেছেন যে, গানে সুরের গৌরবকে কথার গৌরবের চেয়ে হীন করলে চলবে না। কিন্তু বললে কী হবে? বাঙালীর স্বভাব যে গানে রাগরাগিণীর হাতে খুব বেশি কাজের ভার ছেড়ে দেয় নি, এ-ও তো তিনি নিজেই বলেছেন। তাঁর নিজের গানের ক্ষেত্রেও কি আমরা এই জিনিসই দেখতে পাই না?

একটু আগেই আমরা দেখলাম, রবীন্দ্রনাথ পরজ রাগিণীতে একটি হিন্দি গানের প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সেখানে ভাবের ব্যঞ্জনাকে ব্যক্ত করবার ভার পরজ রাগিণীর নিজের, 'ভাষাকে দিয়েছে সম্পূর্ণ ছুটি'। ওই একই বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে 'গুরু আমায় মুক্তিধনের'— ইত্যাদি গানটি রচনা করে মন্তব্য করেছেন, এ গানে পরজ হত সাহিত্যের খাঁচার পাখি। অর্থাৎ এখানে ভাবের ব্যঞ্জনাকে ব্যক্ত করার পুরো ভার সাহিত্যের। এখানে পরজকেই ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাই যদি হয়, তা হলে একই গানে রাগিণী আর কাব্য সমান গৌরবের ভিত্তিতে মেলে কী করে?

এ-ও তো ঠিক যে পরজ যা ব্যক্ত করে, কোনো কবিতার সাধ্য নেই ঠিক সেই জিনিসকে ব্যক্ত করার। কবিতা যা বলতে পারে, কোনো পরজ কখনোই অবিকল সেই জিনিস বলে না, বলতে পারে না। দুয়ের রসরূপ এত ভিন্ন যে একটা আর-একটার বিকল্প কখনোই হতে পারে না। উভয়ে একসঙ্গে হাজির হলে মনকে শ্যাম অথবা কুল একটিকেই বেছে নিতে হবে। আর জোর যদি দুয়েরই সমান হয়, তাহলে শিল্পের শিল্পগত ঐক্যই নষ্ট হয়ে যাবে।

কথা ও সুরের মিলন অতি সুলভ উক্তি। কিন্তু ব্যাপারটাকে একটু ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার। মিলন হয় না, এমন কথা বলতে চাই না। আপাতত আমাদের প্রশ্ন মিলনের ভিত্তি নিয়ে, মিলনের চরিত্র নিয়ে। পূর্বেই এ প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে। এখানে তারই জের টেনে আমাদের বক্তব্যকে আর-একটু বিশদ করতে চেষ্টা করব।

সংগীতের আবেদন থেকে শুধু যে কবিতারই আবেদন ভিন্ন তা নয়, সংগীতের মধ্যেই রসাবেদনের অসংখ্য বৈচিত্র্য আছে। আমাদের দেশের রাগরাগিণীগুলির প্রত্যেকেরই সাংগীতিক আবেদনের নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে। ভৈরবীর রসাবেদন বেহাগের রসাবেদন থেকে ভিন্ন, রামকেলির রসাবেদন ছায়ানটের থেকে ভিন্ন, ভোঁরো-র রসমূর্তি আর পূরবীর রসমূর্তিতে মিল হবে না। মিল নেই বটে, কিন্তু আত্যন্তিক দূরত্ব না থাকলে কখনো কখনো পরস্পরের সঙ্গে মিলতেও পারে। মিলতে পারে, তার কারণ মিলনের ভিত্তিটা সাংগীতিক।

রাগরাগিণীর আবেদনের বিশিষ্টতা যে ঠিক কী, তা আর-কিছু দিয়ে বোঝানোর উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ ভাষা দিয়ে এই বিশিষ্টতার কিছু আভাস দিতে চেষ্টা করেছেন। যেমন—

"...পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা; কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি; ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহ বেদনা ... ।"[১২]

ধরে নিতে পারি, যে-গানে ভৈরবী রাগিণী খাটবে, সেখানে পরজ বা কানাড়া খাটবে না। যার

১২. সংগীতচিন্তা, পৃ ৫৩-৫৪

সঙ্গে পরজের মিল হবে, তার পক্ষে পরজ— এবং একমাত্র পরজই অনিবার্য। রবীন্দ্রসংগীতে অধিকাংশ সময়ই আমরা এই রকম একটা অনিবার্যতার ভাব অনুভব করি। কিন্তু সব সময় নয়।

কথা আর সুরের মিলন যদি সত্য হয়, তাহলে বুঝতে হবে, বিশেষ কথা বিশেষ সুরকেই চায়, আর কাউকেই নয়। রবীন্দ্রনাথ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কথার আবেদনের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে রাগিণী নির্বাচন করেছেন। কিন্তু এই সমতা পরিমাপ করবার কোনো নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নেই, যন্ত্র নেই। সমতা হল কি হল না, কখনোই নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যাবে না। একটা মোটামুটি ধরণের সমতা হয়তো অনেক সময়ই অনুভব করা যায়। কিন্তু তা খুব অনিবার্যতার প্রমাণ দেয় না। রবীন্দ্রনাথ ভৈরবীতে বীররসের গানও রচনা করেছেন, বাগেশ্রীতে বর্ষার গানও রচনা করেছেন। একই রাগিণীতে এমন বিভিন্ন ধরণের গান রচনা করেছেন যাদের কাব্যগত আবেদনে একের সঙ্গে অপরের কিছুমাত্র মিল নেই। কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

'ভয় হতে তব অভয় মাঝে' আর 'বলি ও আমার গোলাপবালা' এই গান দুটির, অথবা ধরা যাক, 'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে' আর 'বিরহ মধুর হল আজি' এই গান দুটির কথার আবেদন নিশ্চয়ই আলাদা। কিন্তু সুরের আবেদন চারটি গানেরই মোটামুটি একরকম, চারটি গানই বেহাগ রাগিণীতে বাঁধা। 'সার্থক জনম আমার' 'ঝরা পাতা গো' আর 'জীবনের পরম লগন' অথবা 'নীলাঞ্জন ছায়া', এদের কাব্যগত রসরূপ পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সুরে এতটা দূরত্ব নেই, চারটিই ভৈরবী। 'অল্প লইয়া থাকি' আর 'আয় তবে সহচরী' দুটিই ছায়ানট। অথচ বাণী-ব্যঞ্জনায় এরা কত পৃথক! 'রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি' আর 'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত', দুই-ই খাম্বাজ। কথার দিক থেকে দেখলে, 'হৃদয়ে ছিলে জেগে' এক রকমের, আর 'বাদল বাউল বাজায়' সম্পূর্ণ আর-এক রকমের। কিন্তু সুর দুয়েরই গৌড় সারং-য়ে বাঁধা। 'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে' আর 'এসো শরতের অমল মহিমা' রাগিণীর রূপে এক হয়েও কাব্য-আবেদনে কত স্বতন্ত্র! 'আমারে কর জীবন দান' আর 'কাঁদিতে হবে রে পাপিষ্ঠা' ভাবে কত আলাদা আর সুরে কত নিকট! রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কেদারা'র গান, বিভিন্ন পিলু'তে-বাঁধা-গান ভাব -ব্যঞ্জনায় প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র। 'কত অজানারে জানাইলে তুমি' এ-ও হাম্বীর, আবার 'মধ্য দিনে যবে গান', এ-ও সেই হাম্বীর। এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। অনিবার্যতার দাবি খণ্ডন করবার পক্ষে যে-কোনো একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

বিশেষ কথা যদি বিশেষ সুরেরই অপেক্ষা করবে, তাহলে এক-গানের মাত্র এক-রকমই সুর হত। রবীন্দ্রনাথ একই গানে একাধিক বিকল্প সুরও বসিয়েছেন। সেই বিকল্প সুরগুলির মধ্যে চরিত্রের মিল নেই। একটি হয়তো রাত্রে গাইবার, একটি ভোরে। যেমন, 'বাজাও আমারে বাজাও'। এই-সব গানের যখন যেটিকে যে-সুরে গাওয়া হয়, তখন সেইটিকে অনিবার্য বলে মনে হয়। এটা প্রকৃত অনিবার্যতার প্রমাণ নয়, সুরকারের অসাধারণ ক্ষমতারই প্রমাণ।

কবিতা হিসেবে দেখলে রবীন্দ্রনাথের কোনো গানেই রসের মধ্যে কোনো দ্বিত্ব বা বহুলত্ব নেই, সব গানই কাব্য-আবেদনে অখণ্ড একক। সুরের ক্ষেত্রে কিন্তু সব সময় তা দেখি না। যেমন 'হে নিরুপমা'-গানটি। এর ভাবে নিটোল ঐক্য, কিন্তু সুরে এক-এক স্তবকে এক-এক রাগিণী— মিশ্র বসন্ত, মিশ্র রামকেলি, সিন্ধু, দেশ। কিংবা, ধরা যাক, 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে' গানটি। এর সুরে

কখনো খাম্বাজ, কখনো পরজ, কখনো কালাংড়া। বাণীকে আশ্রয় করে যে ভাবটি অভিব্যক্ত হয়েছে, সে কিন্তু অকম্পিত শিখার মতো একটিমাত্র স্থস্থির কেন্দ্রেই অবিচল।

রবীন্দ্রনাথ বাণীর প্রয়োজনে রাগরাগিণীর ইচ্ছামত মিশ্রণ ঘটিয়েছেন; ইচ্ছামত রাগমালা গ্রথিত করেছেন; রাগরাগিণীগুলিকে তাদের আপন-আপন প্রথাসিদ্ধ প্রচলিত ভাবভূমি থেকে সরিয়ে, বাগর্থের সঙ্গে তাদের সমতা ঘটিয়ে, সম্পূর্ণ ভিন্নতর ভাবভূমিতে এনে তাদের বসিয়ে দিয়েছেন। তাঁর অসামান্য প্রতিভার সম্মোহনে রাগরাগিণীরা সানন্দে কাব্যের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। যাকে আমরা কথা ও স্থরের মিলন বলি, রাগরাগিণীর এই আত্মস্বার্থ-বিসর্জনের মধ্যে দিয়েই তা রবীন্দ্রসংগীতে সম্ভব হয়ে উঠেছে।

এ চেষ্টা পূর্বে কখনো হয় নি এমন বলি না। বস্তুত, এইটেই বাংলা গানের বরাবরের লক্ষ্য। কিন্তু এতখানি সিদ্ধি এতাবৎ অলব্ধ ছিল। এ সিদ্ধি কেবল কবিত্বশক্তির গুণে হয় না। স্থরকে দিয়ে এমনভাবে নিজের কাজ করিয়ে নেওয়া সাধারণ স্থরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু রাগরাগিণীর ক্ষেত্রে নয়, লোকসংগীতের স্থরকে এমন অনায়াসে নিজের করে নেওয়ার, নিজের মতো করে ব্যবহার করার ক্ষমতাও স্থরকারের অসাধারণত্বেরই পরিচায়ক।

এই অসাধারণ শক্তির কারণেই রবীন্দ্রসংগীতকে পৃথক্ জাতের গান বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা স্থরকারের ক্ষমতারই নিদর্শন, গোত্রগত স্বাতন্ত্র্যের নয়।

স্থরের প্রশ্নটাও অবশ্য খুবই জরুরি। স্মরণ রাখতে হবে যে, কথার প্রাধান্য থাকলেও, রবীন্দ্রসংগীত কখনোই কবিতামাত্র নয়। তা যদি হত তাহলে তাকে যৌগিক-শিল্প বলতাম না। সব কবিতাতেই স্থর বসানো যায় না। যদি বা যায়ও, স্থরের সংযোগ ঘটলে তা আর সেই কবিতা থাকে না। কবিতা, বিশুদ্ধ-সংগীত আর গান, তিনটিই স্বতন্ত্র শিল্প, প্রত্যেকের স্বাদ আলাদা। রবীন্দ্রসংগীত কবিতা হয়েও গান, এবং যখন গান হিসেবে তাকে গ্রহণ করছি, সেই মুহূর্তে সে একেবারেই কবিতা নয়, খাঁটি গান। স্থরের শক্তিতে কবিতা গান হয়। প্রাধান্য যারই থাক্, স্থরের সংযোগ ঘটলেই তা সেই ইন্দ্রজালে পরিণত হয়, যা কেবল গানেরই ইন্দ্রজাল, আর কারো নয়।

আরও একটা কথা এখানে স্মরণ রাখা দরকার। স্থরকে নিজের কাজে খাটানো আর স্থরকে অবহেলা করা মোটেই এক জিনিস নয়। প্রাধান্য যারই হোক, স্থরকে অবহেলা করার উপায় নেই। কাব্যসংগীতেও না। কথা যদি দুর্বল হয়, তাতে কাব্যসংগীত অবশ্যই দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু সে গানে যদি স্থরের সম্পদ থাকে, তাহলে কথার অনেক দুর্বলতা ঢাকা পড়ে যায়। মাত্র কথার দুর্বলতায় গানের ভরাডুবি ঘটে না। অতুলপ্রসাদ অথবা নজরুলের কিছু কিছু বিখ্যাত গানেও এর প্রমাণ মিলবে। অপর অনেক গীতকারের গানেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যাবে। সেসব ক্ষেত্রে গানের ক্ষতি হয়েছে বটে, কিন্তু ভরাডুবি হয় নি। অপর পক্ষে, স্থরের দুর্বলতায় গানের ভরাডুবি, তা সে যে জাতেরই গান হোক। এর সব থেকে প্রত্যক্ষ উদাহরণ আজকের দিনের 'আধুনিক' বাংলা গান।

স্থরের দৈন্যে গানের দৈন্য যতখানি অবশ্যম্ভাবী, কথার দৈন্যে ততখানি নয়। গানে ধ্বনিমূল্যের এই অপরিহার্যতা, স্থরের সমৃদ্ধির সঙ্গে গানের উৎকর্ষের এই যে অত্যাগসহন সম্পর্ক, এ থেকে বোধকরি এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, যতই যৌগিক-শিল্প হোক, গান জিনিসটা শেষ পর্যন্ত ধ্বনিশিল্পেরই সগোত্র, কবিতার নয়। কাব্যের সম্পদ গানকে প্রায়শই ঐশ্বর্যশালী করে বটে, কিন্তু অনেক সময় তাকে স্বধর্ম-

ভ্রষ্টও করে ফেলতে পারে। অতিরিক্ত কাব্যধর্মিতা তার পক্ষে— অন্তত গান হিসেবে তার পক্ষে— সব সময় হিতকর নয়। বাঙালীর স্বভাব অনেক সময় তার গানকে যে পথে চালিত করেছে, তা ঠিক ধ্বনিশিল্পের পথ নয়, এমনকি যৌগিক-শিল্পেরও পথ নয়, তা কাব্যধর্মিতারই পথ। এই কাব্যধর্মিতার পথে গানের যে সিদ্ধি, তা সন্দেহজনক সিদ্ধি। কখনো কখনো তা বিপজ্জনক সিদ্ধি। অবশ্য, বিপজ্জনক হলেও তা যে মহৎ সিদ্ধি হতে পারে, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গানকে দিয়ে যে অসাধ্যসাধন করিয়েছেন, এ কেবল তাঁর মতো স্বরসিদ্ধ মহাকবির পক্ষেই সম্ভব, সকলের পক্ষে নয়।

৬

আজকের দিনের বাংলা গান যে একেবারে ভরাডুবির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, সুরের দৈন্যেই এর প্রধান কারণ। এর মূলে এক দিকে আছে রাগসংগীতের সঙ্গে অপরিচয়, অন্য দিকে আছে লোকসংগীতের সঙ্গে বিচ্ছেদ। কী ভারতীয় ঐতিহ্য, কী বাংলার ঐতিহ্য, কী অভিজাত সংগীত-সংস্কৃতি, কী লৌকিক দেশজ সংগীত-সংস্কৃতি, সকল সংস্কৃতি, সকল ঐতিহ্য থেকেই আধুনিকেরা আজ বিচ্যুত। এই সংযোগের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা ছাড়া বাংলা গানের বাঁচবার আর দ্বিতীয় পথ নেই। শুধু গানের নয়, সব শিল্পেরই।

কথার দৈন্যের দিকটাও অবশ্য নিতান্ত অবহেলা করবার মতো নয়। সেখানেও এই সাংস্কৃতিক নিঃসঙ্গতার অমোঘ পরিণাম থেকে শিক্ষিত বাঙালীর আজ পরিত্রাণ নেই। তবু, অপরিচয়ের থেকেও সেখানে ব্যক্তিগত অক্ষমতার প্রশ্নটাই বড়। ইচ্ছা করলেই কেউ রবীন্দ্রনাথের মতো কবিতা বা গান লিখতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সংগীত-রচয়িতার পক্ষে কথার দিকে অধিকতর যত্নবান হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করার নেই।

কথার প্রসঙ্গে একটা জিনিস লক্ষ করবার মতো। কাব্যের প্রতি বাংলা সংগীতের যে অবিচল নিষ্ঠা, সংগীতের প্রতি বাংলা কবিতার— বিশেষ করে আধুনিক বাংলা কবিতার— সে নিষ্ঠা দেখতে পাই না। আধুনিক বাঙালী কবিরা নিজেদের উপর কবিতার নিঃসপত্ন অধিকার সানন্দে স্বীকার করে নিয়েছেন। আধুনিক কবিদের মধ্যে এমন কমই আছেন যিনি এমনকি অবসর-বিনোদন হিসেবেও গানরচনায় উৎসাহী। আরও কম আছেন যিনি সেই সঙ্গে সংগীত-রসিক এবং সংগীতজ্ঞ। আধুনিক বলতে যদি একেবারে সদ্যস্তন কালকে না ধরি, তাহলে 'নবজীবনের গান'এর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রই বোধ করি এর একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। হাল-আমলে ব্যতিক্রম কে আছেন জানি না।

আরও একটা কথা আছে। আজকের আধুনিক বাঙালী কবিরা যদি আন্তরিকভাবেই গানরচনায় ব্রতী হতেন, তাহলে তাঁরা যে-গান লিখতেন, গানের সেই আধুনিকতাকে শ্রোতারা কী ভাবে গ্রহণ করতেন বলা কঠিন। বাঙালী রসিক-সাধারণ কবিতার ক্ষেত্রে যে-বস্তুকে কবিতা বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত, অনুমান করি, গানের ক্ষেত্রে সেই ধরণের বস্তুকে তাঁরা গানের বাণীরূপে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবেন না। আজকের দিনের আধুনিক কবিতা গানের বাণী হবার পক্ষে কতটা উপযোগী সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, গান জিনিসটা আজকাল প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ব্যবসার কুক্ষিগত, ব্যাপক উৎপাদন ও ব্যাপক ভোগের বাজারী পণ্য। আজকের দিনে গানের হতশ্রী নিঃস্ব দশার আসল কারণ আমাদের সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক দৈন্যের মধ্যেই নিহিত। শুধু গান নয়, সমস্ত শিল্পেরই।

সংগীত-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যবসায়িকতার কৃষ্ণমেঘে ক্ষীণ যে রজত-রেখাটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সে হল এই যে, ক্লাসিক্যাল সংগীত আজ দরবারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সংগীত-সম্মিলনীতে নেমে এসেছে। মুক্তি পেয়েছে ঐতিহাসিক কারণেই— তার গতি ব্যবসারই অভিমুখে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ক্লাসিক্যাল সংগীত ষোলো-কলায় কমার্শিয়াল হয়ে উঠবার অবকাশ পায় নি। আজকের দিনের সংগীত-রসিক, গীতকার ও সুরকারদের পক্ষে ক্লাসিক্যাল সংগীতের সঙ্গে সংযোগ আগের তুলনায় অনেক সহজসাধ্য হয়েছে। আশা করি, আজ যাঁরা নিছক সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের আকর্ষণে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে ভিড় করছেন, তাঁদের সঙ্গে অনেক গীতকার সুরকারও আছেন এবং কালক্রমে এর থেকে তাঁরা অনেক বিত্ত সঞ্চয় করতে পারবেন। ভরসা করি, সেই সঞ্চয় একদিন বাংলা গানের পুষ্টির কাজে লাগবে।

লোকসংগীতেরও একটা ব্যবসায়িক শাখা গড়ে উঠেছে। জনসংস্কৃতির হিতৈষীদের সমাদরে এই শাখা দিনে দিনে পুষ্ট হয়ে উঠছে এবং লোকসংগীতের ইতরীকৃত একটা চেহারা উত্তরোত্তর স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে।

সমস্যাটা যত-না লোকসংগীতের নিজের, তার থেকে অনেক বেশি তথাকথিত ভদ্রসম্প্রদায়ের পক্ষে— ভদ্রসম্প্রদায়ের গানের পক্ষে। তবে সমস্যাটা নিছক সাংগীতিক নয়। সমাধানও নিছক সংগীতের পথে হবার নয়। এর সমাধান সত্যিকারের জনসংযোগ। তার পথ কী তা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়।

আধুনিক সুরকারেরা পাশ্চাত্য সংগীতের সুর আহরণে এবং বাংলা গানে পাশ্চাত্য সংগীতের হার্মনি প্রয়োগে বিশেষ উৎসাহী। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথও এক সময় খুব আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত খুব বেশি দূরে অগ্রসর হন নি।

এ ব্যাপারে আত্যন্তিক বাধা কিছু নেই, কিন্তু সতর্কতার কারণ আছে। ভারতীয় সংগীতের আনুভূমিক (horizontal) সুর-লহরী— যাকে বলা বলা হয় মেলডি, তার সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীতের উল্লম্ব (vertical) সুর-বিন্যাস, অর্থাৎ সুর-সংগতি বা হার্মনি সত্যিই কতটা শিল্প-সৌষম্যে সংগত হতে পারবে, তা বিবেচনা করে দেখা দরকার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সংগীতে অভিজ্ঞ আর্নল্ড বাকে-র একটি উক্তি এখানে উদ্‌ধৃত করি।—

> "Mistaken attempts to foist the finished Western system of harmony on to the perfect modal system of Indian monophony have been made for the last hundred years, not only by missionaries but also by enthusiastic Indian admirers of European culture. In this process the delicate structure of Indian music is crushed out of existence."[১৩]

আহরণ দোষের নয়, কিন্তু যে-কোনো সময়ে যে-কোনো আহরণ লাভজনক হয় না। সব আহরণ সব সময় পরিপাকও করা যায় না। আহরণ অমৃতও হতে পারে, আবার বিষও হতে পারে। বাকে-সাহেবের কথা মানি, কিন্তু পুরোপুরি মানি না। প্রাণশক্তি প্রবল থাকলেও বিষও অমৃত হয়ে উঠতে পারে।

একদিন ভারতের ক্লাসিক্যাল সংগীতের প্রাণশক্তি যখন প্রবল ছিল, তখন অসংখ্য উৎস থেকে সে অবাধে

---

১৩ New Oxford History of Music, vol I-গ্রন্থের (Egdon Wellesz সম্পাদিত) A. Bake-কৃত The Music of India প্রবন্ধাংশ, পৃ ২২৫।

আহরণ করেছে, সমস্ত সংগ্রহকে আত্মস্থ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। এ আহরণে দেশ-বিদেশ বা জাতি-বর্ণের ভেদ ছিল না। শুনেছি, প্রাচীনকালের ভীরবা নামের কোনো অনার্য গোষ্ঠীর গানই নাকি আজকের দিনের ভৈরবীতে পরিণত হয়েছে। কলিঙ্গের কোনো আদিবাসী জাতির চতুঃস্বরের গান পরিস্রুত ও পরিবর্ধিত হয়ে আজকের কালাংড়া হয়েছে। গোপ আভীর জাতির লোকগীতি আহিরী হয়েছে। এখনকার মালকোশের আদি উৎস নাকি আর্যেতর মালব জাতি। শুনতে পাই, ইমন এসেছে ইরান থেকে। জিলফ্-ও তাই।

খাম্বাজ সম্ভবত ভারতের পশ্চিমের কোনো দেশ থেকে আগত। আশাবরীও নাকি তাই। সর্ফর্দা-র পূর্ব-পরিচয় তার নাম থেকেই খানিকটা আন্দাজ করতে পারি।

ক্লাসিক্যাল সংগীতের আহরণের তালিকা বহুবিস্তৃত। আজ যা লোকসংগীত, কাল তা ক্লাসিক্যালের ভাণ্ডারে গিয়ে ঢুকেছে। গোয়ালিয়র অঞ্চলের গোয়ালিনীদের গীত-রীতি কালক্রমে ক্লাসিক্যালের উচ্চাঙ্গ গীত-রীতিতে পরিণত হয়েছে। মরুভূমির উষ্ট্রচালকদের কম্পিত-কণ্ঠ গীত-রীতি সাদরে গৃহীত হয়েছে। আজ ক্লাসিক্যাল সংগীতের সে প্রাণশক্তি নেই। আজ তার লক্ষ্য কেবল টিঁকে থাকা, কেবল পুনরাবৃত্তি করা। কিন্তু তার ভাণ্ডারে বিপুল সম্পদ্। আধুনিক গানে যেদিন প্রবল প্রাণশক্তির সঞ্চার ঘটবে, সেদিন সে অবাধে আহরণ করবে, কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। কিন্তু এই প্রাণশক্তি-সঞ্চারের প্রাথমিক শর্তই হল ক্লাসিক্যাল সংগীতের বিপুল ঐশ্বর্যের যতটা সম্ভব নিজের মধ্যে সঞ্জীবিত করে তোলা, জাতীয় উত্তরাধিকারকে আত্মস্থ করা।

বলা বাহুল্য, বাংলা গান গানই থাকবে। বাংলা গান ইমন বা কেদারাকে, বেহাগ বা বাহারকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার দায়িত্ব কখনোই নেবে না। কিন্তু ইমনে-কেদারায় বেহাগে-বাহারে নিজেকে প্রকাশ করার শক্তি তাকে অর্জন করতে হবে। অন্য পথ নেই।

দ্বিতীয় শর্তটি প্রথমটির থেকে, জানি না, হয়তো সহজসাধ্য। কিন্তু কিছুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সে হল লোকসংগীতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, লোকজীবনের অফুরন্ত সংগীত-উৎস থেকে নিজের মধ্যে প্রাণরসের সঞ্চার করা।

আহরণে নয়, দোষ শক্তিহীন অনুকরণে। আধুনিক বাংলা গান সারা বিশ্ব থেকে আহরণ করুক। কিন্তু তার আগে তাকে সেই দৃঢ়ভিত্তি আত্মতা অর্জন করতে হবে, যার শক্তিতে বিবিধ উৎস থেকে সংগ্রহ করা উপাদানকে সে অনায়াসে নিজের করে নিতে পারবে।

সঙ্গীতচন্দ্রিকা। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রভারতী সংস্করণ। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ৭। পনেরো টাকা।

গীতকলিতা। শ্রীমতী বাসন্তী বাগচী ও শ্রীকিশোরকান্তি বাগচী। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা ৩৭। সাড়ে তিন টাকা।

যে সময়ে বহু ওস্তাদ স্বরলিপি দেখে গান শেখাকে নিরতিশয় অবজ্ঞার চোখে দেখতেন সে সময়ে ওস্তাদ হয়েও সংগীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সংগ্রহ থেকে বহু উৎকৃষ্ট রাগসংগীত স্বরলিপি করে 'সঙ্গীতচন্দ্রিকা' নামক্ গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের আরও কেউ কেউ এই কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন, যথা— রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই সময়ে দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপির প্রচলন অধিক ছিল বলে গোপেশ্বরবাবু এই প্রথাই অবলম্বন করেছিলেন। স্বরলিপিগুলি এত যত্নের সঙ্গে এবং পরিচ্ছন্নভাবে করা হয়েছিল যে এই গানগুলি তুলতে বেগ পেতে হত না। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন গ্রন্থকার আমাদের পরম কৃতজ্ঞতাভাজন, কেননা তিনি সে কালেই উপলব্ধি করেছিলেন যে এই ধ্রুপদ ধামারের স্বরলিপিগুলি আমাদের সংগীতভাণ্ডারে গৌরবের সঙ্গে সংরক্ষিত হবে, গায়ক-পরম্পরা এদের অস্তিত্ব থাকবে কি না সন্দেহ। যথার্থই এই দু শো একষট্টিটি ধ্রুপদ ধামারের সংকলন আমাদের একটি অমূল্য সঞ্চয় হয়ে আছে। গায়কদের কণ্ঠে এসব গান আজকাল কদাচিৎ শোনা যায়। বিষ্ণুপুরের সংগ্রহে যে কত প্রাচীন ধ্রুপদ ধামার সঞ্চিত ছিল তার একটি ধারণা এই গ্রন্থ থেকে করা যায়। এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলছেন, "ইহাতে যেসকল প্রাচীন গীত প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই নায়ক গোপাল, নায়ক বৈজুবাওরা, তানসেন প্রভৃতি প্রথিতনামা অমরকীর্তি সংগীতগুরুগণের রচিত; তাঁহাদের রাগরাগিণীর সমাবেশ সম্পূর্ণ সুন্দর ও মধুর, এবং তজ্জন্য তাহা সর্বপ্রযত্নে রক্ষণীয়। অধিকাংশ পুরাতন হিন্দী গীত ও যাবতীয় সংগীতসংক্রান্ত বিষয়, আমার পিতৃদেব সংগীতগুরু স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলাম। এক্ষণে বিষ্ণুপুরে যেসকল সংগীতশিক্ষক আছেন তাঁহারা সকলেই আমার পিতৃদেবের শিষ্য। ফলতঃ তাঁহারই কৃপাতে এখন পর্যন্ত বিষ্ণুপুরে সংগীতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।"— প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপন, ১৩১৬। দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপনে (১৩২১) গ্রন্থকার জানাচ্ছেন, "এই গ্রন্থে অধিকাংশ গীতই নায়ক গোপাল, বৈজুবাওরা, তানসেন, বিলাস খাঁ, ধোধি খাঁ, সুরদাস, তানতরঙ্গ, সদারঙ্গ, অদারঙ্গ, শোরী প্রভৃতি ভারতবিখ্যাত গায়ক এবং বাংলার স্বনামধন্য গীতিকারগণ বিরচিত। গীত, সঙ্গীত, ধারু, প্রবন্ধ, ছন্দ প্রভৃতি বহু পুরাতন গান এবং কতকগুলি রাগিণী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।" এই দুটি উক্তি থেকে বোঝা যাবে কত প্রাচীন গীতিকারদের সংগীত এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থটি প্রকাশের কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিশেষ সমাদরলাভ করে, এমনকি অন্যান্য ভাষাতেও এর কয়েকটি স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল— এর কারণ গানগুলির বিশুদ্ধ ঢং। বিষ্ণুপুর ধ্রুপদের এই বিশুদ্ধ রীতির জন্যই বিখ্যাত। বিষ্ণুপুরের ঋজু গায়নভঙ্গী, সঙ্গীতের ক্রম, সুনির্দিষ্ট বিস্তার এবং সংগঠনশিল্প একটি বিশেষ রীতিতে পরিণত হয়েছে।

বিষ্ণুপুরে একটি ধারণা প্রচলিত যে তানসেনের বংশধর কোনো একজন বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরে এসে

ধ্রুপদের প্রবর্তন করেন। রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তদীয় 'সঙ্গীতমঞ্জরী'তে উক্ত বাহাদুর খাঁর একটি গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেন। কিন্তু এই বাহাদুর খাঁ সম্বন্ধে সন্দেহ বর্তমান, কেননা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে এঁর যথার্থ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয় না। বিষ্ণুপুরের রীতি কিভাবে গড়ে উঠেছিল বলা শক্ত, কিন্তু সে রীতি শুদ্ধরীতি এবং প্রাচীন ধারার অনুসরণে বর্ধিত। তথাকথিত সেনী ধারাই যে বিষ্ণুপুরকে গৌরব প্রদান করেছে এটা বড় কথা নয়, বিষ্ণুপুর যে নিরপেক্ষভাবে একটি রীতির প্রতিষ্ঠা করেছে ও ঐতিহ্য স্থাপন করেছে— এটাই গৌরবের বস্তু।

ইদানীংকালে বিষ্ণুপুরের ধারা রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ও অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়— এই দুই সংগীতগুরুর চেষ্টায় তাঁদের শিষ্যপরম্পরা রক্ষিত হয়ে এসেছে।

'সঙ্গীতচন্দ্রিকা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৬ সালে। এর দ্বিতীয় খণ্ডটি বেরোয় ১৩২১ সালে। তারপর ১৩৩২ সালে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রভারতী এতকাল পরে আবার দুটি খণ্ড একত্র প্রকাশ করলেন। এবারকার বৈশিষ্ট্য স্বরলিপিগুলির আকারমাত্রিকে পরিবর্তন। কাজটি পরিশ্রমসাধ্য— এজন্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ধন্যবাদার্হ এবং একটি দীর্ঘকালের প্রয়োজন তাঁরা মিটিয়েছেন, এজন্য তাঁরা কৃতজ্ঞতাভাজন।

তথাপি দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, সম্পাদনার দিক থেকে গ্রন্থে গুরুতর ত্রুটি থেকে গেছে। সম্পাদকের কর্তব্য হচ্ছে পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের কোনও পরিবর্তন সাধন না করা। তিনি তাঁর নিজস্ব মতগুলি উপযুক্ত স্থলে সন্নিবেশিত করতে পারেন। কিন্তু গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে এই আদর্শ বজায় রাখা হয় নি। সঙ্গীতচন্দ্রিকার দুটি খণ্ডই বর্ধমানের মহারাজ বিজয়চন্দ মহ্‌তাবের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থকার বহু বিনয়ের সঙ্গে এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সংস্করণে উদ্ধৃত ভূমিকা দুটি থেকে উক্ত অংশগুলি বিলুপ্ত করা হয়েছে। এঁর কয়েকটি গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলিও এবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। এবারকার সংস্করণের ভূমিকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যে ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে পাওয়া সাহায্য স্বীকার করা হয়েছে অথচ গ্রন্থকার একদা যে মহানুভব ব্যক্তির সাহায্যে প্রথম এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরেছিলেন তার স্বীকৃতি মুছে দেওয়া হয়েছে। এই অনুল্লেখের উদ্দেশ্য বোঝা গেল না। এ ছাড়া গ্রন্থকারের প্রদত্ত বহু পাদটীকা বর্জিত হয়েছে। এইগুলিতে সংগীতসমূহের দুরূহ শব্দের অর্থ দেওয়া ছিল এবং গ্রন্থকারের মতামত সহ আরও কিছু মূল্যবান আলোচনা ছিল। গ্রন্থকারের ভাষা ইচ্ছামত পরিবর্তিত, সংক্ষিপ্ত বা পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। গানগুলির ক্রমও যথাযথভাবে রাখা হয় নি। স্বরলিপির পরিবর্তনও বড় কম করা হয় নি। স্বরলিপি বহুলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এমন গানও আছে; কিন্তু তার আবশ্যকতা যদি ছিল তাহলে গ্রন্থাকারে মূল স্বরলিপিটি আলাদা সন্নিবেশিত করলে ক্ষতি ছিল না। বরঞ্চ সেটাই ছিল বাঞ্ছনীয়। এতগুলি গানের প্রত্যেকটি খুঁটিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে পরিবর্তনগত আরও বহু ত্রুটি ধরা পড়বে। কয়েকটি গান অপর গ্রন্থ থেকে যোজনা করা হয়েছে বলে মনে হল। এরও কোনও উল্লেখ দেখা গেল না। এত পরিবর্তন করা হয়েছে অথচ বিষ্ণুপুরের সাঙ্গীতিক ইতিহাস বা গ্রন্থকারের জীবনী এমনকি তাঁর একটি আলেখ্য পর্যন্ত দেওয়া হল না।

যাই হোক, এই গ্রন্থে ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ পাঠক-পাঠিকা উপকৃত হবেন কিন্তু বিশেষজ্ঞদের

পুরাতন সংস্করণই দেখতে হবে, এই সংস্করণটিকে তাঁরা নির্ভরশীল বলে মনে করতে পারবেন না। প্রস্তুতির ব্যাপারে যথেষ্ট যত্ন নিলে এই অসুবিধার কারণ ঘটত না।

দ্বিতীয় আলোচ্য গ্রন্থ 'গীতকলিতা'য় পাঁচটি প্রবন্ধ রয়েছে। চারটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন লেখিকা এবং শেষ প্রবন্ধ "উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" লিখেছেন তাঁর পুত্র কিশোরকান্তি। লেখিকা সাধারণভাবে ভারতীয় সংগীত এবং বাংলা গানের ইতিহাস ও কয়েকটি বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থ থেকে জিজ্ঞাসুদের কৌতূহল অনেক পরিমাণে মিটবে এবং আরও জানবার আগ্রহ জাগরিত হবে। সংগীতবিচারের উদ্যম হিসাবে গ্রন্থটি প্রশংসনীয়।

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

রবিবাসর। সম্পাদনা শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল বুক্‌স, কলিকাতা ৯। পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট 'রবিবাসর' নামক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানটির পরিচয় অনেকেই জানেন। কিন্তু রবিবাসরের নিজস্ব কোনো সংকলনগ্রন্থ ছিল না। এই সাহিত্য-সংস্থাটির চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষে এই প্রথম সংকলন প্রকাশিত হল। মোট পঞ্চাশটি রচনা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। সবগুলিই রবিবাসরে পঠিত বা গীত। শান্তিনিকেতনে কবির আহ্বানে রবিবাসরের বিশেষ অধিবেশনে কবির ভাষণটি এই সংকলনগ্রন্থের একটি উল্লেযোগ্য অবদান। রবিবাসরের সপ্তম বর্ষের সপ্তম অধিবেশনে (৩ শ্রাবণ ১৩৪৩) শরৎচন্দ্রের আহ্বানে কবি কলকাতার অশ্বিনী দত্ত রোডস্থ শরৎচন্দ্রের বাড়িতে আয়োজিত রবিবাসরে যোগ দেন এবং 'বলাকা' হতে 'তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা' কবিতাটি স্বকীয় বিশেষ ভঙ্গিতে আবৃত্তি করেন এবং পরে একটি সুদীর্ঘ ভাষণও দেন। এই অধিবেশনেই রবীন্দ্রনাথ সানন্দে রবিবাসরের 'অধিনায়ক'পদ গ্রহণে সম্মতি দেন এবং তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ ছিল। এই দিনটিকে বলা যেতে পরে— সূর্যচন্দ্রতারার মেলা।

এই সংকলনে শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ থেকে লিখিত শরৎ-সম্বর্ধনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রও মুদ্রিত হয়েছে। কবি একদিন 'রবিবাসর'কে সম্বোধন করে বলেছিলেন—"যতদিন তোমাদের এই রবিবাসর বেঁচে থাকবে ততদিন তোমরা এর ভেতর দিয়ে দেশের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করবে, উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে দেবে, কাকেও নিরাশ হতে দেবে না— অলস হতে দেবে না, দেশের কাজকে ও সমাজের কল্যাণকে বড় করে লোকে দেখতে পারে এমন একটা প্রেরণা তোমরা সমাজের বুকে দেশের বুকে ছড়িয়ে দেবে।"

বর্তমান সর্বাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবাসরের একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেটি হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে আছে একটি শুচিশুভ্র রুচির নির্মলতা ও অন্তরের উদার দাক্ষিণ্যের আত্মপ্রকাশ। এই সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে দিগ্বিজয়ী রথীদের সংখ্যাধিক্য না থাক এঁরা সকলেই যথার্থ সাহিত্যরসিক ও সমজদার, এঁরা পক্ষান্তে সমবেত হয়ে একটি বিশুদ্ধ প্রীতিস্নিগ্ধ

ও আনন্দময় সাহিত্য-পরিবেশ ও সাহিত্যিক-সম্প্রাণতা ও সহৃদয়তার এক নিবিড় আত্মীয়তাবন্ধন রচনা করেন, যা আজকের দিনে সাহিত্য-সংস্থাগুলিতে বিরল। তাই আজকের রবিবাসর যৌবনোত্তীর্ণ প্রাক্‌প্রৌঢ় বা প্রবীণদের সাহিত্যসভা হলেও নবীনতার দাবি করে।

রবিবাসরে পঠিত ও প্রকাশিত গান প্রবন্ধ গল্প নাটক রসরচনাগুলি সুনির্বাচিত। আলোচ্য বিষয়গুলিও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে; যেমন, পল্লীবাংলার পালপার্বণ, পটশিল্পের কথা, নাট্যশালার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, শব্দ ও প্রবচনে প্রাণীনাম, ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু, রবিবাসরের স্মৃতিচিত্রণ, রঙ্গভরা বঙ্গদেশ, দক্ষিণেশ্বরের কথা, কাব্যসাহিত্যে মানদণ্ড ও গতিপ্রকৃতি, রবীন্দ্রচেতনায় শিব প্রভৃতি।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সংশোধন

বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৩ পৃ ২৮০ : 'আশীর্বাদ' · রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছত্র ১ শুদ্ধপাঠ : এই আমি একমনে সঁপিলাম তাঁরে

ছত্র ১২ : তার স্থলে তাঁর

স্বরলিপি

নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা'র গান

আর নহে, আর নহে—
বসন্তবাতাস কেন আর শুষ্ক ফুলে বহে ॥
লগ্ন গেল বয়ে   সকল আশা লয়ে,
এ কোন্ প্রদীপ জ্বালো,   এ যে বক্ষ আমার দহে ॥
কানন মরু হল,
আজ এই সন্ধ্যা-অন্ধকারে সেথায় কী ফুল তোলো।
কাহার ভাগ্য হতে বরণমালা হরণ করো,
ভাঙা ডালি ভরো—
মিলনমালার কণ্টকভার কণ্ঠে কি আর সহে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II মগা -ণা । ণা -া I ণা -দা । দপা -ণা I ণদা -া । পা -া ! -া -া । -া -া I
আ ০ র্ ন ০ হে ০ আ র্ ন ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

I না -া । র্সা -া I র্সঋা -া । র্সা -া I না -র্সা । -া র্সনা I দা -া । পা -া I
ব ০ স ন্ ত০ ০ বা ০ তা ০ স্ কে০ ন ০ আ র্

I পা -দা । -া র্সা I ণা -দা । দপা -ণা I ণা -দা । দা -পা I পা -া । মা -গা I
শু ০ ষ্ ক ফু ০ লে০ ০ ব ০ হে ০ ন ০ হে ০

I মা -গা । মা -দা I -া -া । -া -া II
ন ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

II {মদা -া । দা -া I না -া । র্সা -া I র্সঋা -া । র্সা -া I -া -া । -া -া I
ল০ গ্ ন ০ গে ০ ল ০ ব০ ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০

I ^ন^র্সা -া । দা -া I না -া । র্সা -া I র্সা -ঋ্রা । ঋ্রা -া I -া -া । -া -া } I
স ০ ক ল্ আ ০ শা ০ ল ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -া । র্সা -জ্ঞ্রা I জ্ঞ্রা -ঋ্রা । ঋ্রা -র্সা I র্সা -ণা । ণা -দা I দা -পা । পা -া I
এ ০ কো ন্ প্র ০ দী প্ জ্বা ০ লো ০ এ ০ যে ০

I পা -দা । -া র্সা I ণা -া । ণপা -ণা I ণা -দা । দা -পা I দা -পা । মা -গা I
ব ০ ০ ক্ষ আ ০ মা০ র্ দ ০ হে ০ ন ০ হে ০

I মা -গা । মা -দা I -া -া । -া -া II
ন ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

II {সা -া । সা -দা I দা -া । দপা -ণা I দা -া । পা -া I -পা -দা । -মা -া I
কা ০ ন ন্ ম ০ রু০ ০ হ ০ ল ০ ০ ০ ০ ০

I মপা -মা । পা -া I পা -ণা । দা -পা I মা -পা । -জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা -রা । জ্ঞা -া I
আ০ জ্ এ ই স ন্ ধা ০ অ ০ ন্ ধ কা ০ রে ০

I মা -া । পা -দা I মা -ণা । ^ণ^দা -পা I মা -জ্ঞা । ঋা -সা I -া -া । -া -া } I
সে ০ থা য়্ কী ০ ফু ল্ তো ০ লো ০ ০ ০ ০ ০

[দা]
I { মদা -া । দা -া I না -া । র্সা -া I ^র্স^ঋ্রা -া । র্সা -া I না -া । র্সা -ঋ্রা I
কা০ ০ হা র্ ভা ০ গ্য ০ হ ০ তে ০ ব ০ র ণ্

I নর্সা -া । র্সদা -া I না -া । র্সা -ঋ্রা I না -া । র্সা -া} I -জ্ঞ্রা -া । -া -া I
মা০ ০ লা০ ০ হ ০ র ্ ক ০ রো ০ ০ ০ ০ ০

I র্জ্ঞা -া । র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞা -র্রা । র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞা -র্রা । র্মজ্ঞা -া I -া -া । -ঋা -র্সা I
ভা ০ ঙা ০ ডা ০ লি ০ ভ ০ রো ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -র্জ্ঞা । র্জ্ঞা -ঋা I র্জ্ঞঋা -র্সা । র্সা -া I র্সা -ঋা । র্সণা ণা I ণদা -পা । -া -া I
মি ০ ল ন্ মা ০ লা র্ ক ণ্ টে ক ভা ০ ০ র্

I পা -দা । -া র্সা I ণা -া । ণপা -ণা I ণা -া । দা -পা I দা -পা । মা -গা I
ক ০ ণ্ ঠে কি ০ আ ০ র্ স ০ হে ০ ন ০ হে ০

I মা -গা । মা -দা I -া -া । -া -া II II
ন ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

স্বীকৃতি

শ্রীরামকিংকর-অঙ্কিত চিত্র শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রমথ চৌধুরী এবং প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর আলোকচিত্রদ্বয় শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সংগ্রহ থেকে শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বিচিত্রা ভবনে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর আলোকচিত্র শ্রীবীরেন্দ্র সিংহ কর্তৃক গৃহীত এবং তাঁর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

পঞ্চবিংশ বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৭৫ - আষাঢ় ১৩৭৬ · ১৮৯০-৯১ শক

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী